স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন-৩৫-২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

৵২৷৷৹,৵৫,।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ- শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

ছোটদের ভাল ভাল বই ঃঃ নামকরা বই

ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর -

কাঠ ও কাঠের কাজ	১৷৷
বাঁশ, বেত, পাতা ও সোলার কাজ	১৲
তন্তুশিল্পের কাজ	১৲

আলোক চক্রবর্ত্তীর—

মনসামংগল	১৲
চৈতন্যমংগল	১৲
কুমারসম্ভব	১৲

শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তীর—

রঘুবংশ	১৲
রাণী রাসমণি	১৲
জাগ্রত মেদিনী	১৲

ছোটদের অভিনব মাসিক পত্রিকা

চয়নিকা

১৮ বছরে পড়ল : বার্ষিক মূল্য মাত্র ৩৲

যে কোন মাসে টাকা পাঠালেও বৈশাখ থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক হতে হয়। নমুনার জন্য ।৹ আনার ডাক টিকিট অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা মাত্র। আনা। অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গ ও সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত।

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ

১৩৬৪

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

রামধনু কার্য্যালয়
১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫
ফোন : ৪৮-৩১৮১

বার্ষিক ৪ টাকা প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন. প. ষাণ্মাসিক ২·২৫ টাকা

রামধনু

বার্ষিক সূচী (বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
অকালে রেনি ডে	(কবিতা)	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	৩৮৪
অঙ্ক মাথায় ঢুকবে না তা করব কি ?	(ঐ)	শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ	৫৯৬
অভিমান	(ঐ)	" জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য	৮১
অমুর অভিযান	(ঐ)	" বেণু গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ	৩৯৩
আজব কাণ্ড	(সচিত্র)	...	৪২৯
আজব চুল দাড়ি গোঁফ	(প্রবন্ধ)	" অমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্	৫৪০
আজব নেশা	(কাহিনী)	" অজিতকুমার তারণ	৪৫৯
আফগানিস্থানের ফুটবল খেলা	(খেলাধুলা)	অধ্যাপক শ্রীঅমলকুমার মিত্র, এম্. এড	৪৭৯
আফ্রিকার জুজু	(প্রবন্ধ)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ. বি এল্	১৪৮
আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ		...	৬০, ৩৮৯, ৬৩৪
ইচ্ছাপূরণ	(গল্প)	শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী	৫৪১
ইন্দোচীনের গল্প	(ভ্রমণ)	শ্রীঅজিতকুমার তারণ	১১
ইংরেজী বারের নাম কোথা থেকে এল			৩৭৬
উদয় মাঝারে অস্ত	(কবিতা)	শ্রীহিমালয়নিঝ র সিংহ	৪৭৮
একখানি ফটো	(গল্প)	সৈয়দ আব্দুল বারি	১০৪
একজন নতুন ধরণের শিল্পী	(সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	১৬৭
একটি সত্যিকার বাঘের গল্প	(শিকার-কাহিনী)	" এস. ডি. মুখার্জ্জী	৬১২
এক যে ছিল	(সচিত্র কবিতা)	শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী	২৯৬
এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেস	(প্রবন্ধ)	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	৫৬২
কেলো ভুলো	(গল্প)	" জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী	২০
কেশকলাপ	(ঐ)	" অরবিন্দ গুহ	৫৯০
খেলাধূলা	(খেলাধূলা)	" অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য্য	৯২১
খেলোয়াড়দের কাহিনী	(ঐ)	অধ্যাপক অমলকুমার মিত্র. এম. এড.	৫৭৮
খোকন এলে	(কবিতা)	শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র	৪৪৯
খোকনমণি	(কবিতা)	সৈয়দ আব্দুল বারি	২৫৪
গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প	(গল্প)	শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়	১৩৩, ৪৯৪
গান ভাসাস প্রাণ	(গল্প)	" আশা দেবী, এম্. এ, বি. টি	৩২০
গানের আসর	(কাহিনী)	" ইন্দিরা দেবী	২৯৭

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
গোপাল ভট্ট	(জীবন-কথা)	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৬৪
ঘুম পাহাড়ের বাড়ী	(কবিতা)	" উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	৪৩৯
চন্দ্র বাবুর ব্রিজ	(গল্প)	" কল্যাণী দেবী	৩৪৪
চল দিল্লী	(ভ্রমণ)	" কুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	৩৬১
চলো ভাই চাঁদে যাই	(বিজ্ঞান)	ঐ	৪২১
চিঠিপত্র			৬২, ১২০, ১৭৫, ২২৬, ২৭৬, ৩৩৭, ৩৮৭, ৪৩৬, ৪৮০, ৫২৯, ৫৭৯, ৬৩৭
চিরদিনের বোনটী	(কবিতা)	৺ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৮৩
জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক প্রাপ্তিতে	(কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৮৫
জিজ্ঞাসা	(ঐ)	" নবগোপাল সিংহ	৫৩৩
ঝন্ ঝন্ ঝন্	(সত্য কাহিনী)	" যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৮১
ঝুম্না বনে	(কবিতা)	" সুচেতা ভট্টাচার্য্য	৫৭১
টিকিট কোথায়	(নাটিকা)	" সমর চট্টোপাধ্যায়	৪১৭
টেলিফোনেও এল ছবি	(বিজ্ঞান)	" ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	২২৪
ট্রেন ছুটে যায় সাগর-জলে	(দেশবিদেশ)	" মাধব পাল	১৮৫
তটস্থ	(কবিতা)	" অলক চক্রবর্ত্তী	৫০৯
তাসের রাজা তাসের রাণী	(ম্যাজিক)	যাদুকর এ. সি. সরকার	৪৭৭
তিন চোর	(গল্প)	শ্রীযামিনীকান্ত সোম	১৪৪
তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস	(ভ্রমণ)	তীর্থঙ্কর	৪৬৮, ৫২০, ৫৫৫, ৫৮৫
দক্ষিণারঞ্জন স্মরণে	(কবিতা)	শ্রীপলাশ মিত্র	৩৬
দাস রঘুনাথ	(জীবনকথা)	" পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩১৫, ৩৫৪, ৩৯৬, ৪৫০, ৪৯০
দেবতার রোষ	(গাথা)	বন্দে আলী মিয়া	৩৫২
দৃষ্টির বাইরে	(গল্প)	শ্রীরেণুকা দেবী	২৪৫
ধরিত্রীর সৃষ্টি	(গল্প)	শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৭২
ধাঁধার উত্তর			৬৩, ১২২, ১৭৮, ২২৭, ২৭৮, ৩৩৭, ৩৯০, ৪৩৮, ৪৮৪, ৫৩১ ৫৮১, ৬৩৯
নতুন দিনের প্রার্থনা	(কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্ এ	৩৫
নতুন বই	(সমালোচনা)	...	৫৫, ২১৮, ৩২৫, ৪৭৩
নববর্ষ	(কবিতা)	স্বপনবুড়ো	১
নববরষায়	(রূপক)	বেগম জেবু আহমদ	১৫৩
নানা প্রসঙ্গ	(প্রবন্ধ)	শ্রীকৌটিল্য	১৩৭
নালন্দা	(ভ্রমণ)	" ধীরেন্দ্রলাল ধর	২৪০, ৩১২, ৩৪০, ৪২৪
নীল পায়রা	(গল্প)	" অরবিন্দ গুহ	৪০৯
নূতন ধাঁধা			৬৩, ১২২, ১৭৮, ২২৮, ২৭৮, ৩৩৮, ৩৯০. ৪৩৮, ৪৮৪, ৫৩২, ৫৮২, ৬৪০

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
পথিক মেঘের দল	(ভ্রমণ)	শ্রীআশা দেবী, এম্. এ, বি টি	২৪, ১০১, ২৫০
পল্টুর পরামর্শ	(গল্প)	" রবিদাস সাহা রায়	৪৩১
পলটুর পলায়ন	(ঐ)	" খগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৯৩
পাহাড়ী	(গল্প)	" সুকুমার দে সরকার	২২০
পাঁচমিশেলী		" ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	৫৮, ১১৫, ২৬৯, ৩৩২, ৪৮১, ৫৭৫, ৬৩০
পিস্তল	(গল্প)	শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এ	৩২৬
পুতুলের বিয়ে	(গল্প)	" সাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, এম্. এ	৫২৯
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা		...	৬৩জ, ১২২ক, ১৭৭খ, ৩৩৭ঘ
পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল		...	৩৩৫, ৫২৬
পূজার পদ্ম	(কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ✓	২৭৯
পূজোর চিঠি	(ঐ)	" প্রভাকর মাঝি	৩২৪
প্রজাপতি	(ঐ)	ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্. এ পি. আর. এস্ ডি. লিট্	৩৯১
প্রতিশোধ	(ঐ)	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	৪২৮
প্রফেসর হোঁদারামের ডায়েরী	(গল্প)	শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু	৬, ৯৬
প্রবাদের ছবি	(সচিত্র)	...	৫৬১, ৫৬৬
প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো. চি. মিন্‌হ	(জীবনকথা)	শ্রীঅজিতকুমার তারণ	৬০৯
বইয়ের যত্ন	(প্রবন্ধ)	" বিনায়ক সেন	৫৫৯
বনবেড়ালী	(সচিত্র কবিতা)	" রেবতীভূষণ ঘোষ	৩২৩
বাবরের গল্প	(ইতিহাস)	" জয়দেব রায়, এম্. এ	১৩৭
বাংলার মন্দির	(সচিত্র)	...	৩৫০
বিজ্ঞানের টুকিটাকি	(বিজ্ঞান)	শ্রীকৌটিল্য	৩১০
ব্যাংএর ছড়া	(ছড়া)	" উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২৫৯
ভট্ট রঘুনাথ	(জীবনকথা)	" পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৯২
ভয়ে কি না হয় !	(গল্প)	" শামুক	২৩০
ভাগ্যিস	(সত্য ঘটনা)	" জয়দেব রায়, এম্. এ	৩৫১
ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক			৫৩, ১১১, ১৭৬ ২২২, ২৭৩, ৩৩৬, ৩৮৫, ৪৩৫, ৪৭৫, ৫২৭, ৫৮০, ৬৩৩
ভৈরব-শঙ্করী	(গল্প)	৺ সতীশচন্দ্র ঘটক	৪৮
মগজের গল্প	(বিজ্ঞান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৬২৪
মজার ম্যাজিক	(ম্যাজিক)	যাদুশ্রী শঙ্কর দাস	৩১৮, ৫০৮, ৬১৬
মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা		...	৬২৯

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল		...	২২০
মন্দিরে মর্ন্দিরে	(ভ্রমণ)	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৩৩, ৭২, ১৪০
মহাকালের অভিশাপ	(উপন্যাস)	" অপূর্ব্বমণি দত্ত	৩৬৫, ৩৯২, ৪৪২, ৫০৪, ৫৩৫, ৫৯৭
মৎস্য-পুরাণ	(গল্প)	" বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৭
মানুষের গল্প	(ঐ)	" আশাপূর্ণা দেবী	৩০৫
মুকুন্দ ভট্টর পুঁথি	(উপন্যাস)	" অপূর্ব্বমণি দত্ত	৩, ৭৮
মুক্তি	(গল্প)	" উৎপল সেনগুপ্ত	৫৬৭
মুর্শিদাবাদে	(ভ্রমণ)	শ্রীকৃষ্ণা সুর	৬২০
মৌসুমী	(কবিতা)	" দীপালি সেনগুপ্তা, এম্. এ	১৭৯
ম্যাজিক শেখ	(ম্যাজিক)	যাদুকর এ. সি সরকার	৪৭, ১৫৫
ম্যাজিক শেখ	(ঐ)	যাদুরাজ এস. ডি. মুখার্জ্জী	১৯০, ৪৩০
ম্যাজিকের খেলা	(ঐ)	যাদুশ্রী শঙ্কর দাস	২০৬
যুদ্ধ ও শান্তি	(ইতিহাস)	শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	৪৫৫
যে না জানে টিপের ঘা	(রূপকথা)	" ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ	৪৬১
রকেটে আকাশ জয়	(বিজ্ঞান)	" রজত চন্দ	৫৪৭
রবিনসন ক্রুশো রচয়িতা ডিফো	(জীবনী)	" অমলশঙ্কর রায়	৩৫৬
রবিন্সন ক্রুশোর ছায়ায়	(প্রবন্ধ)	" ঐ	৫১৪
রসময় ভাদুড়ী	(গল্প)	" শামুক	৬১৮
রামকৃষ্ণ-স্তুতি	(গান)	" শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৫৭৪
রামধনুর দাদু	(জীবনকথা)	" মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য	৯০
রায় বরুয়ার শিকার-কাহিনী	(গল্প)	ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল	১৫, ৮২, ১২৫, ১৮১, ২৩৩, ২৮৫
রূপ ও সনাতন	(জীবনকথা)	শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৮, ৬৬
রূপকথার দক্ষিণারঞ্জন	(কবিতা)	" নগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার	৩৬
রূপকথার যাদুকর দক্ষিণারঞ্জন	(জীবনকথা)	" ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	৪৯
রুশ বিজ্ঞানী মেনডেলীফ	(বিজ্ঞান)	অধ্যাপক সুবর্ণকমল রায়, এম্. এস্-সি	৫২২
রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশে	(ভ্রমণ)	শ্রীমঞ্জুশ্রী বসু (মিত্র)	১৯৮
লাল গাঁ : আষাঢ়ী রূপকথা	(কবিতা)	" অরুণিমা সেনগুপ্তা	১২৩
লাল শঙ্খ	(উপন্যাস)	" মণিলাল অধিকারী	৩৭, ১০৬, ১৬৩, ২০৮, ২৬০, ৩৭৭, ৪১০, ৪৪৬, ৪৮৬
শরৎ এলো	(কবিতা)	" পূর্ণেন্দু মল্লিক	২৮৪

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
শান্তির প্রস্তাব	(গল্প)	শ্রীঅজিতকুমার তারণ	৫৫৯
শিবাজীর অভিনয়	(নাটিকা)	" যামিনীকান্ত সোম	৪৯৯
শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি	...		৫৬, ১১৪, ১৭৪, ২১৯, ৩৮৩, ৪৩৭
শুভলগন	(কবিতা)	স্বপনবুড়ো	৩১১
শেষ বর্ষণ	(ঐ)	শ্রীদীপালি সেনগুপ্তা, এম্. এ	২২৯
শ্রীজীব গোস্বামী	(জীবনকথা)	" পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৫৭
সন্ধ্যা ঘনায় কোথায় কেমন	(কবিতা)	" নবগোপাল সিংহ	২০৫
সবুজ চিঠি	(ঐ)	" দীপালি সেনগুপ্তা, এম্. এ	৩৩৯
সিংহের গল্প শোন	(সচিত্র প্রবন্ধ)	" ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৩৬৯
সুখময় বাবুর সুখ্যাতি	(গল্প)	" রবিদাস সাহা রায়	৮৬
সুরযাতুকর বিঠোফেন	(জীবনী)	" নীলিমা চক্রবর্ত্তী, বি. এ	৫২৪
সেই বনের গল্প	(গল্প)	" সুকুমার দে সরকার	২৫৫
সোনামণি যাতুমণি	(কবিতা)	" প্রভাকর মাঝি	৬৫
স্মৃতির পটে	(স্মৃতিকথা)	" বিজয়কান্ত রায় চৌধুরী, এম্. এ	৪০৭, ৫১৬
হাটতলা	(কবিতা)	" পূর্ণেন্দু মল্লিক	৮১
হাতের কাজ	(গল্প)	" অরবিন্দ গুহ	৪৬৩
হারজিত	(ঐ)	৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	৬০৬
হাসিপাতালে	(ঐ)	শ্রীশামুক	৩৮০

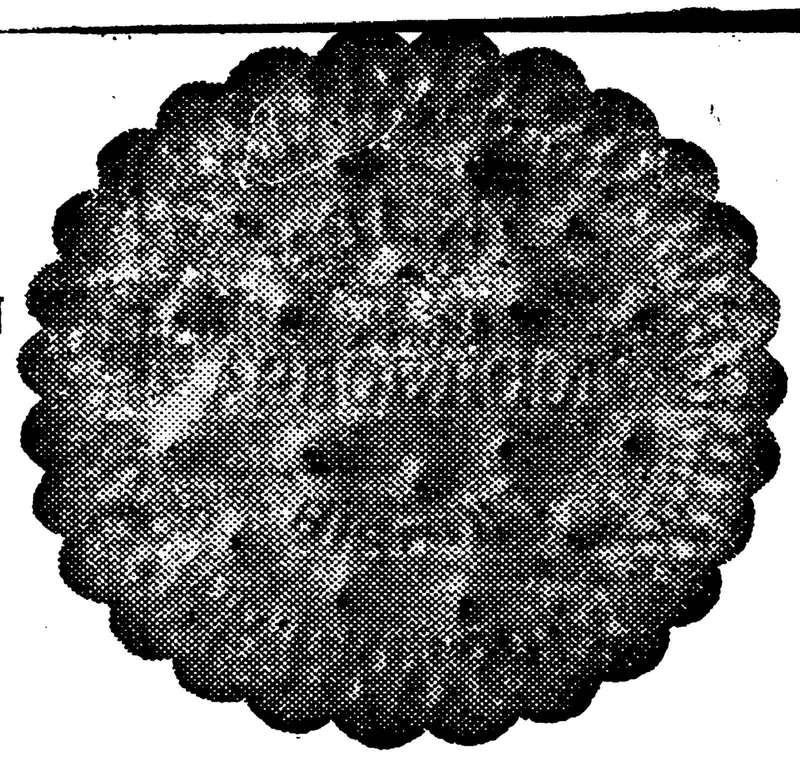

বিজ্ঞাপনের মতামতে

কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?

স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,

'থিনের' মধ্যে; গুণে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,

সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

Kirti ADVERTISING AGENCY
REPRESENTATIVE OF
FAMOUS NEWS PAPERS & MAGAZINES
72, HINDUSTHAN PARK • CALCUTTA-29

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

মা

শিল্পী শ্রীচিন্তামণি করের সৌজন্যে

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৬৪ { ১ম সংখ্যা

নববর্ষ

স্বপনবুড়ো

আজ সকালে ঘুম ভেঙেছে কেবল পাখীর ডাকে—
অবাক্ রে ভাই, পূবের গগন লাল করে কে ফাগে!
জোয়ার লাগে হাজার প্রাণে
জাগ্‌লো সবাই নতুন গানে—
এই ভুবনে রাঙিয়ে দিল কোন্ অপরূপ রাগে!

ও অতসী, চোখটি মেল, ডাক্‌ছে দখিন বায়,
কুঞ্জবনে হাজার কুসুম এদিক্-ওদিক্ চায়।
থলকমলে ঘোম্‌টা খোলে—
কলমী লতা আপনি দোলে—
কোকিল বুঝি মন-কাননে নতুন সুরে গায়!

ময়দানে আজ লক্ষ ছেলে নিশান দোলালো—
প্রীতির পরশ দিয়ে আজি সবায় ভোলালো।
নদীর জলে তরুণ রবি
আঁকল কেমন মোহন ছবি—
শিশুর মুখে মোহন মায়া কে ভাই বোলালো!

আয় রে সবাই পাশাপাশি মনের মেলাতে—
ঝাঁপিয়ে পড়ি ঝর্ণা-জলে প্রীতির খেলাতে।
রামধনুকের রঙীন ভেলায়
উধাও হতে মন শুধু চায়—
এই বছরের প্রথম দিনে সকাল বেলাতে।

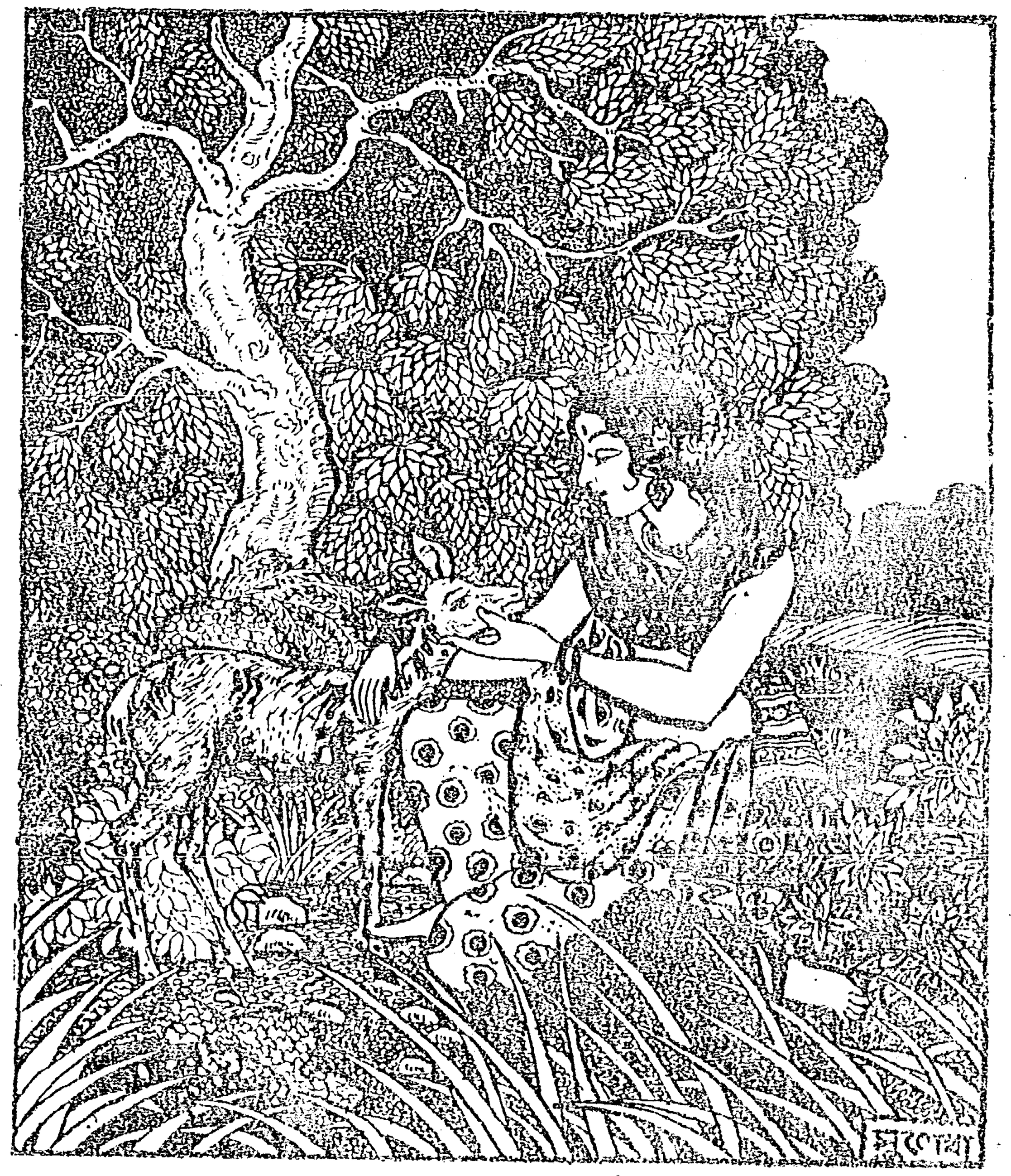

পূর্ব্বকথা : কৌতূহল বশতঃ একখানা পুরোনো পুঁথি কিনেছিলাম কাশীর ভবানী ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে—বসন্ত গাঙ্গুলীর মারফৎ। পুঁথিখানা ছ'শো বছর আগে দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ টোগলকের বিশ্বস্ত বাঙ্গালী কর্মচারী মুকুন্দ ভট্ট'র লেখা। তাতে তাঁর আত্মজীবনী, সমসাময়িক নানা ঘটনা এবং তৈমুর লঙ্গের আক্রমণের সময়ে লুকিয়ে-রাখা বেগম-মহলের গুপ্তধনের কথা লেখা আছে। পুঁথিখানি রহস্যজনক ভাবে চুরি যায় এবং নানা ঘটনাচক্রে ভাগ্নে প্রভাসের সাহায্যে সেটি পুনরুদ্ধার করে গুপ্তধনের খোঁজে দিল্লী আসি। এখানে দেখা হ'ল ঐতিহাসিক ডক্টর ভিট্টল রাওয়ের সঙ্গে। তিনিও, ঐ পুঁথির ভিতরকার একটা নক্সা পেয়ে, এখানে এসেছেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। তাঁরই কাছে আমাকে লেখা বসন্ত গাঙ্গুলীর একটি চিঠি পেলাম—কি করে সে পুঁথিখানা ভিট্টল রাওকে দেখাবার জন্য আমায় না জানিয়ে নিয়ে গিয়ে অবস্থা বিপর্য্যয়ে আর ফেরৎ দিতে পারে নি তারই কৈফিয়ৎ দিয়েছে তাতে।

২৪

বসন্ত গাঙ্গুলীর চিঠির শেষ অংশটুকু এই রকম :

মশাই, ভাগ্যচক্র কিংবা গ্রহের ফের মানেন? আমিও সব সময়ে মানি না, কিন্তু মানতে হোল। পাটনায় তো নামলাম, বেলা তখন প্রায় একটার কাছাকাছি। কাশীতেই, সেদিন সকাল থেকে, হাতের আঙ্গুলগুলো চুলকোতে লাগলো। ভাবলাম হয়তো উচ্চিংড়ে কিংবা কোনও পোকায় কামড়েছে। পাটনায় যখন নামলাম তখন

সর্ব্বশরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। এ্যাসপিরিন খেলাম, ভাবলাম রাত্তিরের বেনারস এক্‌স্‌প্রেসে যখন মাসীমার সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি, তখন সেখানে গিয়ে যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে।

কিন্তু আমার যাওয়া সম্ভব হোল না। বিকেলের দিকে এল বেশ জ্বর, সঙ্গে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা আর বমি। মাসতুতো ভাইরা বললে—এ অবস্থায় কিছুতেই কলকাতায় যাওয়া হতে পারে না। কি করি? অথচ পুঁথিখানা ভিট্টল রাওকে তো দুই-একদিনের মধ্যে না দিলেই নয়! অবশেষে মাসীমার কাছে সেটা দিয়ে বললাম, এটা নিতে একজন ভদ্রলোক আসবেন, এলেই দিয়ে দিও। আমি একটু সুস্থ হলেই যাচ্ছি কলকাতায়। পাটনা থেকেই গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে টেলিগ্রাম করে দিলাম যে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় আমি যেতে পারলাম না, পুঁথি পাঠিয়ে দিলাম। শ্যামবাজার যদু মিত্তির লেন থেকে যেন সেটা নিয়ে যাওয়া হয়। আমি চার-পাঁচ দিন পরে গিয়েই যাতে ওটা আবার ফেরত পাই তার ব্যবস্থা যেন করা হয়, কারণ জিনিষটা আমার নয়।

মাসীমা তো পুঁথি নিয়ে রওনা হলেন। আমার সে কি যন্ত্রণা, ভাষায় বলবার নয়। আঙ্গুলগুলো বিষিয়ে উঠেছে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। আইস ব্যাগ দিয়েও যায় না। প্রায় একটি সপ্তাহ ভুগে তবে কলকাতায় রওনা হবার মত অবস্থা হোল।

কলকাতায় পৌঁছে মাসীমার কাছে যা শুনলাম তাতে তো আবার মাথা খারাপ হ'য়ে যাওয়ার অবস্থা। ভিট্টল রাও সাহেবকে চলে যেতে হ'য়েছিল, তবে তাঁর নির্দ্দেশ মতো আর দু'জন এসে পুঁথি দেখে গিয়েছেন, কিন্তু পুঁথি ফেরত দেবার কথা তাঁরা জানতেন না, কাজেই তাঁরা বলেন যে রাও সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে দিন কতক পরে ফিরে এসে যা হয় ব্যবস্থা করবেন। ইতিমধ্যে মাসীমা যাঁদের বাড়ী থাকতেন কলকাতায়, সেই মুরারি বাবু—তাঁরও নাকি আমারই মত অবস্থা! একই লক্ষণ সব। সেই আঙ্গুলে যন্ত্রণা, ফুলো, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। ডাক্তারি ওষুধে কোনও ফল হোল না দেখে ওদের বাড়ীর ঝি কোথাকার এক স্বামীজিকে নিয়ে এলো, তাঁর জলপড়া নাকি অব্যর্থ। সেই বুজরুকটা, পুঁথির উপর বসে হোম না কি ছাই করতে হবে এই সব ধাপ্পা দিয়ে, সেই পুঁথি নিয়ে সেই যে উধাও হ'য়েছে আর তার পাত্তা নেই।

এখন আপনিই বলুন, আমি ভিট্টল রাওয়ের কাছেই বা মুখ দেখাই কি করে, ভবানী ভট্টাচর্য্যির দরুণ টাকাগুলো খরচ করেছি—তার কাছেই বা মুখ দেখাই কি করে? আর আপনার কাছে তো আমার অপরাধের আর সীমা নেই। অথচ বাবা বিশ্বনাথ জানেন, আমার মনে কোনও অসৎ অভিপ্রায় ছিল না। কিছু টাকা হয়তো ভিট্টল রাওয়ের কাছে পেতাম, সেটার উপরেই যা লোভ ছিল, তা নইলে আপনার পুঁথি

আপনাকে নিশ্চয়ই ফেরত দিতাম। কি বিপাকে ফেললেন বাবা বিশ্বনাথ, তাই ভাবি!

ভিট্টল রাওয়ের কাছে সব কথা খুলে বললাম। তিনি পুঁথিখানা হারানোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমার রাহা খরচটা অবশ্য দিয়ে দিয়েছেন। ভবানী ভট্টাচার্য্যকে পঞ্চাশ টাকা এখনও দিতে পারি নি, এইবারে দেখা হলেই দেবো। তারপর ভিট্টল রাও বললেন যে এই ছেঁড়া পাতায় যে নক্‌সা আছে সেটার উপরেই তিনি অনুসন্ধান করবেন। আমাকে ছাড়লেন না, নিয়ে এলেন দিল্লী। মাঠ, জঙ্গল সব ঘুরে বেড়ানো হোল কয়েক দিন। তারপর একদিন হঠাৎ মাঠের একদিকে অনেক দূরে দেখা গেল তিনজন লোক। বাইনকুলার দিয়ে ইরুলকর আমাকে দেখালেন। তিন জনের মধ্যে আপনাকেই চিনতে পারলাম। তখনও ভাবছিলাম কি করে আপনার কাছে মুখ দেখাবো। এঁদের বললাম আপনার পরিচয়। পুঁথির প্রকৃত অধিকারী যে আপনি সে ইতিহাসটা আগেই এঁদের জানিয়েছিলাম।

কাশীর বাড়ী থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম—একজন চীনা ভদ্রলোক কাশীতে এসেছেন, তিনি একটা বিশেষ ধরণের বুদ্ধ-মূর্ত্তি কিনতে চান, ঠিক সেই জিনিষ আমার কাছে আছে। ব্যবসাদার মানুষ আমি, কাজেই একটা অলীক ব্যাপারের পেছনে ঘুরে নিজের ব্যবসা নষ্ট করতে পারি না। আমি আজ সে জন্য ফিরে যাচ্ছি কাশী।

আপনার সঙ্গে দেখা হোল না, তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে রাও সাহেব এবং ইরুলকর—এঁরা আপনাকে খুঁজে বের করবেনই। সে জন্য এই চিঠিখানি রাও সাহেবের কাছে রেখে যাচ্ছি। আমার আশা আছে, এই চিঠি আপনার হস্তগত হবে এবং সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করবেন।

বসন্তর চিঠি শেষ হোল।

প্রভাস বললে, বাবা, এ যে কালী সিংহির মহাভারত! তবে অনেকগুলো সমস্যা, যা এতদিনে জট পাকিয়ে ছিল, সেগুলোর সমাধান হ'য়ে গেল। কিন্তু সেই বুজরুক স্বামীজিটাকে কেউ ধরতে পারলে না এইটাই ট্র্যাজেডি!—প্রভাস হঠাৎ হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

ভিট্টল রাও বললে, হোয়াট ইজ ইট্‌?

হঠাৎ একটু উচ্ছ্বাস মনে আসায় প্রভাস আত্মসংবরণ করতে পারে নি, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম রাও সাহেবের কাছে।

তিনি বললেন, যদি আপনাদের কোনও আপত্তি না থাকে তা হ'লে এই পুঁথির

রহস্যটা আমাকে বলবেন দয়া করে ? আমি তো পেয়েছি একখানা নক্‌সা মাত্র, তাতে অবশ্য কতগুলি বিবরণ লেখা আছে, কিন্তু বিস্তৃত ব্যাপারটা তো আমরা জানি না। এই যে দেখুন না নক্‌সাখানা।— বলে তিনি একটা স্যুটকেসের চাবি খুলে আমাদের সামনে ধরলেন সেই ছিন্নপত্র।

প্রভাস বললে, একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন মামাবাবু! এ পৃষ্ঠাটা নাড়াচাড়া করায় কিন্তু বিষের কোনও ক্রিয়া হয় নি কারো উপর।

কথাটা সত্য বটে। মনে হয় শেষের পাতাটা তেমন ভাল ক'রে বিষসিক্ত করা হয় নি, আর তা ছাড়া দীর্ঘকাল ভবানী ভট্টাচার্য্যের পিতার আমলের রামায়ণের মধ্যে থাকার জন্য এর যা কিছু বিষ হয়তো সেই গ্রন্থের পাতায় মিলিয়ে গিয়েছে।

(ক্রমশঃ)

---

* হিপ্‌নোটিজ্‌ম্ *

হিপ্‌পোপটেমাসের মতো জাঁদ্‌রেল জানোয়ারও নাকি হিপ্‌নোটিজ্‌মে কাবু হয়ে পড়ে। বাংলায় হিপ্‌পোকে বলে জলহস্তী! আমার তো মনে হয় বরং একে জল-গণ্ডার বলা উচিত, শুঁড় নেই যখন। অবশ্য এর চামড়া গণ্ডারের চামড়ার মতো শক্ত নয়; আর সেই জন্যই বোধ করি হিপ্‌নোটিজ্‌মের পাল্লায় পড়ে কাবু হয়।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নাকি একটা হিপ্‌পো আমাদের ভাষা খানিকটা খানিকটা বুঝতে পারতো। তাই একবার 'হিপ হিপ্ হুর্‌রে' শুনে চট্ করে ক্ষেপে উঠেছিল। ভেবেছিল হয়তো ওভাবে হিপ্ হিপ্ ক'রে হিপ্‌পোকেই ঠাট্টা করা হচ্ছে। তারপর চিড়িয়াখানার লোকেরা এসে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করে।

আর ঐ হিপ্‌পোটাই একদিন একটা বাচ্চা ছেলেকে আরেকটু হলেই গিলে ফেলেছিল আর কি! ছেলেটা রেলিংএর ওপর দিয়ে ঝুঁকে হিপ্‌পোটাকে নানা কায়দায় ভেঙ্‌চি কাটতে কাটতে টাল সামলাতে না পেরে হঠাৎ উল্‌টে, পড়বি তো পড় একেবারে হিপ্‌পোর সাম্নে মাটীর ওপর। নরম মাটীর তালের ওপর পড়েছিল, তাই রক্ষে। তেমন চোট লাগলো না। কিন্তু বাইরের সবাই ভয়ে ভয়ে বল্‌লে, "এই রে! এবারে ছোকরাকে হিপ্‌পোটা আস্তই গিলে খাবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না। হিপ্‌পো নাকি, শুনেছি, নিরমিষাশী,—মাছ-মাংস নাকি খায় না! কিন্তু ছোকরাকেও হয়তো নিরামিষ বলেই ভাববে।"

বাইরে দাঁড়িয়ে সবাই ভাবছে যে কোন মুহূর্ত্তে সুড়ুৎ করবে হিপ্‌পোর বিরাট হাঁ-এর মধ্যে দিয়ে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাবে ছেলেটা। কিন্তু কেউ কিছু করছে না তাকে বাঁচাবার জন্যে। ভেবেই ঠিক ক'রে উঠতে পারছে না কি করা যায়। একজনের কাছে একটা পিস্তল ছিল, কিন্তু সে গুলি চালাতে সাহস করলে না। গুলি খেয়ে হিপ্‌পোটা যদি মরে যায়, সেজন্যে জবাবদিহি করবে কে? সে কি একটা বইতে পড়েছিল হিপ্‌পো পাওয়া যায় সুদূর আফ্রিকা মহাদেশে। অতদূর থেকে আবার নতুন ক'রে একটা হিপ্‌পো আনানো তো আর চাট্টিখানি কথা নয়!

হিপ্‌পোটা ধীরে ধীরে ছেলেটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ছেলেটা ভয়ানক ভয় পেয়ে চুপচাপ, আধমরা। এমন সময় রেলিংএর এধারে, অর্থাৎ বাইরে, শুনতে পাওয়া গেল মানুষের গলার এক অদ্ভুত আওয়াজ: হিপ্! হিপ্! হিপ্! হিপ্! হিপ্!

আওয়াজ শুনে হিপ্‌পোটা ঐ ছেলেটীর দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে এদিকে তাকিয়েছে, আর ব্যস্, অম্নি সঙ্গে সঙ্গে বাইরের এই হিপ্-হিপ্-হিপ্ আওয়াজ-করা লোকটার সঙ্গে তার চোখোচোখি হয়ে গেল। তখন বেচারা আর চোখ ফেরাতে পারে না। বেচারা মানে ঐ হিপ্‌পো।

ঐ লোকটি আসলে একজন পাকা হিপ্‌নোটিষ্ট্। অনেক বছর ধরে সম্মোহন বিদ্যা অর্থাৎ হিপ্‌নোটিজ্‌ম্ মক্‌সো ক'রে ক'রে এমনি হিপ্‌নোটিক চোখ হয়েছিল তার, যে, ঐ চোখের দৃষ্টি এড়ানো হিপ্‌পোপটেমাসের কর্ম্ম নয়। হিপ্‌নোটিস্‌ট্ যতক্ষণ না চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ততক্ষণ হিপ্‌পোর বাবারও সাধ্য হবে না চোখ ফিরিয়ে নেবার।

হিপ্‌নোটিষ্ট্ তখন ঐ ভাবে চোখের দৃষ্টি দিয়ে বিরাট হিপ্‌পোটাকে আট্‌কে রেখে ছেলেটাকে বল্‌লে, "খোকা, আমি জানোয়ারটাকে আটকে রেখেছি, এই ফাঁকে শীগ্‌গীর সরে যাও, পালাও।"

ছেলেটী তখন ভরসা পেয়ে সরে গেল সেখান থেকে অন্য দিকে। কিন্তু উঠে

আসবে কি করে? চারদিকের দেয়ালগুলো ভারি উঁচু। তখন কে একজন বুদ্ধি খাটিয়ে কোথা থেকে একটা দড়ি সংগ্রহ করে রেলিং-এর ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে ভেতর দিকে। সেই দড়ি বেয়ে বেয়ে উঠে এলো ছেলেটী। বেঁচে এলো সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে: ভাগ্যিস্ হিপ্‌নোটিষ্ট ভদ্রলোক ঠিক সময় মতো এসে হাজির হয়েছিলেন!

ছেলেটী নিরাপদে ওপরে উঠে অসতেই হিপ্‌পোটাকে আট্‌কে রাখবার আর প্রয়োজন রইল না। হিপ্‌নোটিষ্ট্‌ ভদ্রলোক চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন। তাঁকে কয়েকজন মিলে পাঁজাকোলা করে তুলে প্রাথমিক শুশ্রূষার জন্যে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

আর ঐ হিপ্‌পো? সে তো ঐ হিপ্‌নোটিক দৃষ্টির বন্ধন থেকে হঠাৎ ছাড়া পেয়েই বোঁটা-ছেঁড়া আপেল, নারকেল বা ডাবের মতো ধপাস্ করে মাটিতে পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেল। অথবা, হয়তো অজ্ঞান হয়েই, পড়ে গেল। তখন তার চোখে জলের ঝাপ্‌টা, মাথায় আইস্ ব্যাগ আর পায়ে হট্‌ ওয়াটার ব্যাগ দিয়ে অনেক কষ্টে তার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তাকে ছুদিন শ্রেফ সাবু-বার্‌লি খাইয়ে রাখা হলো। হিপ্‌নোটিজ্‌ম্ এম্নি কড়া চীজ!

এ গল্প আমার রামকাঠির মুখে শোনা। গল্পের ডুবোজাহাজ রামকাঠি। রামকাঠির মুখে জগবন্ধু বাবুর গল্পও শুনেছি; নরোত্তমপুরের জগবন্ধু ভৌমিক। ভদ্রলোক একটা বড় আফিসে ছোট কেরাণীর কাজ করতেন। কাজ বেশী, মাইনে কম। অথচ তিন মেয়ে আর চার ছেলে মিঠাই খেতে ভারী ভালোবাসে। রাজভোগ, চন্দ্রপুলি, দরবেশ, আইস্‌ক্রীম সন্দেশ, রসোমালাই, ক্ষীরকদম্ব, চম্‌চম্ নামগুলো তাদের যেমন মুখস্থ, এই মিঠাইগুলোকেও তারা তেমনি ঘন ঘন 'মুখস্থ' করতে চায়। কিন্তু ঘন ঘন এই সাতজনকে অমন দামী দামী মিঠাই খাওয়াবার মতো অতো টাকা পাবেন কোথায় অল্প মাইনের কেরাণী জগবন্ধু বাবু?

জগবন্ধু বাবু তখন করলেন কি? না, হিপ্‌নোটিজম্ শিখলেন। একজন নামজাদা ওস্তাদের হাতে পায়ে ধরে, হিপ্‌নোটিজম্ শিখলেন। আর বেশ পাকা হয়ে উঠলেন এ বিদ্যায়। তখন আর মিঠাই খাইয়ে ছেলেমেয়েদের খুশী করবার ভাবনা রইল না। বড় ছেলে পট্‌লা একদিন বললে, "বাবা লেডিকেনি আর রাজভোগ খাবো।" জগবন্ধু বাবু বললেন, "শুধু লেডিকেনি আর রাজভোগ কেন রে? যা খেতে চাস্ খাওয়াবো। আয় আমার সঙ্গে।" বলে পট্‌লাকে নিয়ে বসালেন চুপি চুপি একটা চেয়ারে। বললেন, "সোজা তাকিয়ে থাক আমার চোখের দিকে। আমি তোর চোখের সাম্নে হাত ঘোরাবো, আর তুই—"

কিছুক্ষণের ভেতর সম্মোহিত হয়ে গেল পট্‌লা,—যাকে বলে হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্।

তখন এমন অবস্থা পট্‌লার, যে, হিপ্‌নোটিস্ট জগবন্ধু বাবু যা করাবেন তাই করবে, যা ভাবাবেন তাই ভাব্‌বে। ঘরে কিছু বাতাসা, কিছু মুড়ি ছিল। জগবন্ধু বাবু তাঁর সম্মোহিত ছেলেকে, মানে পট্‌লাকে, ঐ বাতাসা আর মুড়ি খাইয়েই বল্‌তে লাগলেন, "এই যে লেডিকেনি খাচ্ছিস্ তুই। এই নে রাজভোগ। এই রসোমালাই। এই হলো কেষ্টোনগরের সরপুরিয়া। এই চন্দ্রপুলি...।"

হিপ্‌নোটিজমের এম্নি বাহাদুরি যে পট্‌লাও ভারী খুশী হ'য়ে ভাব্‌লে সত্যি সত্যিই সে ঐ সব মিঠাই খাচ্ছে। হিপ্‌নোটিজমের মেয়াদ ফুরাবার আগেই জগবন্ধু পট্‌লাকে হিপ্‌নোটিক হুকুম দিয়ে রাখলেন—"জেগে উঠেও তোর মনে হবে সত্যি সত্যি মিঠাইয়ের ভোজ খেয়েছিস্!" তাই হিপ্‌নোটিজ্‌ম্ থেকে জেগে উঠেও পট্‌লা ঠিক তাই ভাব্‌তো।

শুধু পট্‌লাকে নয়, ভোঁদড়, নন্তু, নন্দা ইত্যাদি তাঁর সব ছেলেমেয়েদেরই তিনি এম্নি ক'রে মিঠাই খাওয়াতেন। বেশ কম খরচেই হ'য়ে যেতো।

এ কাহিনী শু'নে রামকাঠিকে বলেছিলাম, "তা হ'লে জগবন্ধু বাবুর মত দেশশুদ্ধ অল্প-রোজগারী বাবারা হিপ্‌নোটিজম্ শেখে না কেন, বিশেষ ক'রে যাদের অমন মিঠাই-খোর ছেলেমেয়ে আছে?"

রামকাঠি বলেছিল, "হিপ্‌নোটিজম্ রপ্ত করা তো সহজ নয়, প্রফেসর!" ব'লে শুনিয়েছিল হীরালাল হিঙ্গোরাণীর কাহিনী।

হিঙ্গোরাণী ডাকযোগে সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত 'এশিয়াটিক কলেজ অভ্ হিপ্‌নোটিজম্' থেকে। কলেজ থেকে ফুল্‌স্‌ক্যাপ কাগজে টাইপ করা পাঠ প'ড়ে প'ড়ে হিঙ্গোরাণী দৃষ্টি-সাধন করতেন, অনেকক্ষণ একদিকে তাকিয়ে থেকে থেকে।

একদিন হিঙ্গোরাণী রেলগাড়ী চ'ড়ে চলেছেন, একটী বড় স্যুট্‌কেস্ আছে সঙ্গে। তাতে বেশ কিছু দামী জিনিষ আছে—কিছু হীরের, কিছু মুক্তোর, কিছু সোনার তৈরী। যখনকার কথা বলা হচ্ছে তখন ট্রেনে এখনকার মতো ভিড় হ'তো না। হিঙ্গোরাণীর কামরায় আর একটী মাত্র লোক ছিল। বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের ভেতর, আয়তনে ছোটখাট, পায়ে চটি, চেহারা নিরীহ গোছের। ঝাড়া হাত-পা, অর্থাৎ সঙ্গে মালপত্র কিছু নেই।

এখন, হ'য়েছে কি, হিঙ্গোরাণীর ক্ষিদে পেয়ে গেল। হিঙ্গোরাণী ঠিক কর্‌লেন পেছনে রেস্তোরাঁ-কামরায় গিয়ে খানা খেয়ে আস্‌বেন। খানা এ কাম্‌রাতেও আনিয়ে নেওয়া যেতো বটে, কিন্তু তার চাইতে খানার কামরায় গিয়ে খানা খাওয়াই ভালো, তাতে

খাওয়াটা সুবিধের হয়। এটা ওটা চেয়ে খাওয়া যায়। কিন্তু নিজের কামরায় খাবার আনিয়ে নিলে একবারে থালাবাটীতে যা সাজিয়ে দিয়ে যাবে ঐ খেতে হবে।

কিন্তু ভাবনা হলো ঐ বড় স্যুট্‌কেসটাকে নিয়ে। সেটীকে খানা খাবার কামরায় বয়ে নিয়ে খাওয়া চলে না। অথচ এটাকে একা ফেলে যাওয়াও নিরাপদ নয়; যদি চুরি যায়!

এই ভেবে হিঙ্গোরাণী একবার ভাবলেন দরকার নেই রেস্তোরাঁ-কামরায় গিয়ে, খাবারটা আনিয়েই নেওয়া যাক। কিন্তু তারপরেই তাঁর মনে হলো হিপ্‌নোটিজমের কথা। অ্যাদ্দিন অনেক খরচা আর অনেক মেহনৎ ক'রে যে হিপনোটিজম্ বিদ্যে শেখা গেল, তাকেই কাজে লাগানো যাক্ না কেন? হিঙ্গোরাণী তীব্রভাবে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন লোকটির দুটী চোখের মাঝখানে, ঠিক নাকের ওপর, ডাকযোগে শেখা কৌশল অনুযায়ী। দেখা গেল লোকটা বেশ হক্‌চকিয়ে গেছে। হিপ্‌নোটিজমের পয়লা দাপটেই কাবু হ'য়েছে লোকটা। তার মুখের কাছাকাছি দু'হাত হাওয়ায় বুলিয়ে বুলিয়ে হিঙ্গোরাণী বল্‌লেন, 'তোমার চোখ, হাত, পা—সব ভারী হ'য়ে আস্‌ছে। আমি যা আদেশ করবো তাই তুমি পালন কর্‌বে।"

গোবেচারা লোকটা বল্‌লে, "আজ্ঞে, তা কর্‌বো।"

"এই যে আমার স্যুট্‌কেসটী দেখছো, এটিকে পাহারা দেবে।"

"দেবো।"

"দেখবে যেন কেউ এটিকে নিয়ে নেমে না যায়।"

লোকটী বল্‌লে, "আজ্ঞে, তা দেখবো।"

হিঙ্গোরাণী বল্‌লেন, "খুব সাবধান।"

লোকটী বিনীত ভাবে বল্‌লে, "আজ্ঞে।"

"কথার যেন নড়চড় না হয়।"

"আজ্ঞে, হবে না।"

"আমি খেয়ে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি হিপ্‌নোটাইজ্‌ড্ হ'য়ে থাকো। আমি ফিরে এসে তোমার হিপ্‌নোটিজম্ ভাঙ্গাবো।"

"আজ্ঞে, তাই কর্‌বেন।"

হিপ্‌নোটিজমে ধরেছে দেখে খুশী আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে রেস্তোরাঁ-কামরায় খেতে চ'লে গেলেন হীরালাল হিঙ্গোরাণী।

ফিরে এসে দেখেন সেই লোকটি নেই, স্যুট্‌কেসটিও নেই।

ইন্দোচীনের গল্প

শ্রীঅজিতকুমার তারণ

—সাইগন—

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজধানী ও প্রধান সহর সাইগনের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। এখানে ব্যবসায় ও চাকরীর সূত্রে অনেক ভারতবাসীই রয়েছেন সপরিবারে, বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই। তবে মাঝে মাঝে যে এখানকার আবহাওয়া কিছুটা গরম হ'য়ে ওঠে তা' তোমরা, যারা খবরের কাগজ পড়, হয়তো দেখে থাকবে।

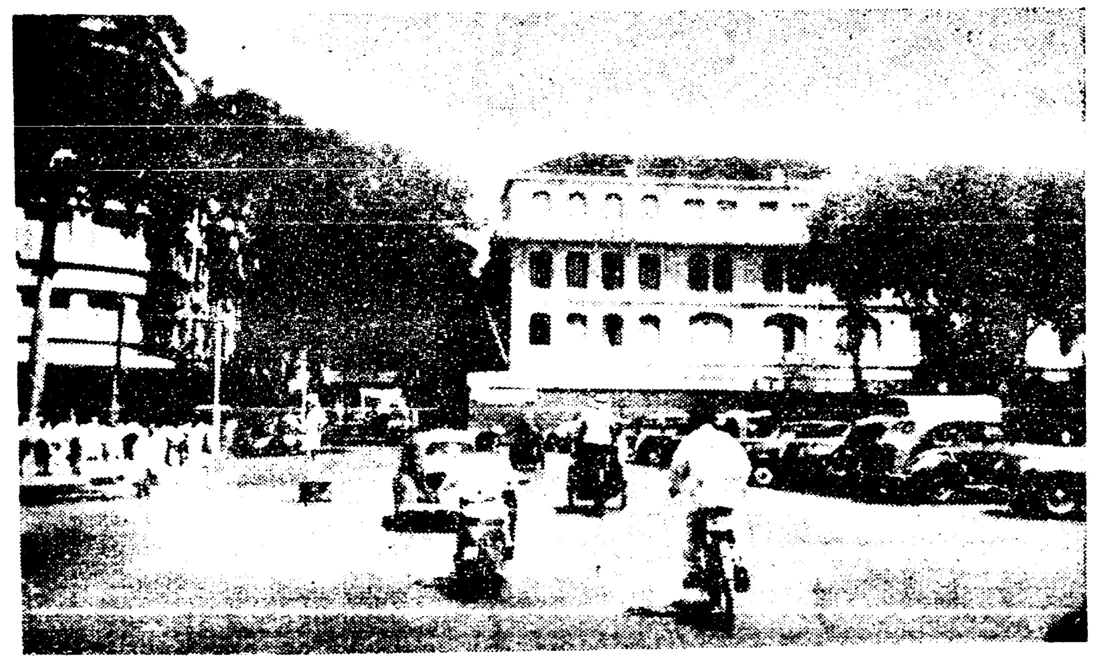

সাইগন সহরের একটি রাস্তা

সামরিক তদারকী কমিশনের সদস্য হিসাবে আমাদের প্রায়ই ওখানে যেতে হ'ত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করলেন তখন তাঁদের রেডিও ষ্টেশন বা বেতার-কেন্দ্র এই সাইগনেই ছিল এবং এখান থেকেই নেতাজী নানান্ ভাষায় ভারতীয়দের উদ্দেশ্য অনেক প্রয়োজনীয় ও জরুরী সংবাদ প্রচার করতেন। এই ষ্টেশনটী

বেশ শক্তিশালী, ভারতবর্ষ থেকে তো বটেই, যুদ্ধের সময়ে আমি মধ্য প্রাচ্যের সুদূর আরব মুল্লুক থেকেও পরিষ্কার ভাবে শুনেছি "আজাদ হিন্দ রেডিও, সাইগন থেকে বলছি"—নেতাজীর প্রচারিত বাণী।

১৯৫৪ সালে সাইগনে প্রথমে পৌঁছেই আমার প্রবল ইচ্ছে হোল নেতাজীর আপিস ও রেডিও ষ্টেশনটী কোথায় ছিল দেখবার এবং তাঁর বিষয়ে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করবার। কয়েকজন ভারতীয় ও এ দেশীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা আমায় এ সম্পর্কে সযত্নে সাহায্য করলেন। নেতাজী বেঁচে আছেন কি নেই সে সম্পর্কে নির্ভুল সংবাদ কেউই অবশ্য দিতে পারলেন না। রেডিও ষ্টেশনের বাড়ীতে (তখন ওটা আমাদের কমিশনের ডাকঘর ও সংকেত আপিস বা সিগ্‌ন্যাল আপিস রূপে ব্যবহৃত হচ্ছিল) গিয়ে আমার মনে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি জেগেছিল সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

সাইগনে ঘুরে ঘুরে অনেক কিছুই দেখা গেল। তখনও ওখানে অনেক ফরাসী ছিল এবং দেখলাম তখনও ওদেরই পরিচালনায় চলছে সব কিছুই। বেজায় তৃষ্ণা পাওয়ায় গেলাম একটা রেস্তোরাঁয়। কিন্তু জলের বদলে পেলাম বীয়ার (মদ)। ওখানে সবাই তা-ই পান করে থাকে জলের পরিবর্ত্তে। আমি আপত্তি করায় কিছুক্ষণ পরে সরবৎ ও জল পাওয়া গেল বটে কিন্তু রেস্তোরাঁর সকলেই আমার দিকে অবাক্ দৃষ্টিতে তাকাল এবং একচোট হাসলও। শুধু তাই নয়, বিদায় নিয়ে আসবার সময় ওখানকার ফরাসী মহিলা পরিচালিকা যে ভাবে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন তা আমাদের চোখে হয়তো খুবই বিসদৃশ লাগবে। কিন্তু ঐ হচ্ছে ওদের আদবকায়দা। আমি একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। সামলে নিয়ে মুখে শুধু বললাম—'মার্সি বুকু'—বহুৎ ধন্যবাদ। আমার আনাড়িপানা দেখে আবার ওদের মধ্যে বেশ হাসির খোরাক মিলে গেল। ফরাসীদের নিজের দেশ প্যারীতে শুনেছি আদব-কায়দা আরও গোলমেলে।

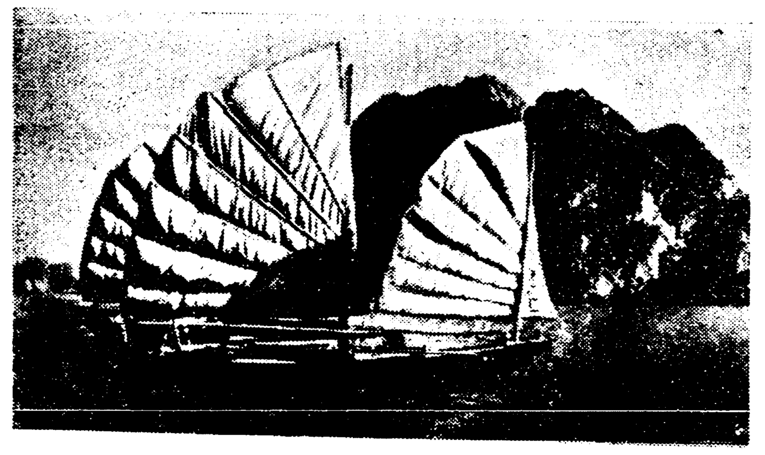

সাইগনের কাছে নদীতে পাল তোলা নৌকো
পালগুলো কেমন অদ্ভুত দেখছ!

এর পর একটা ভাষা শিখবার বই সংগ্রহ করবার জন্য সাইগনের কয়েকটী ফরাসী বইএর দোকানে গেলুম। পছন্দসই বই তো পেলুমই না—উল্টে যে সব বই আর মাসিক পত্রিকার ছড়াছড়ি দেখলাম তাকে মোটেই সুরুচির পরিচায়ক বলা চলে না।

অবশেষে ক্যাপ্টেন দাশগুপ্ত মশাইয়ের পরামর্শে গেলুম একটা ভাল বইয়ের দোকানে। এ দোকানটী বাস্তবিই সুরুচিপূর্ণ। দোকানের মহিলা মালিক খুবই যত্ন নিয়ে ও ভদ্রভাবে দেখালেন বইপত্তর। প্রায় বিশ মিনিট সেখানে ছিলুম। এরই ভেতরে, লক্ষ্য করলুম, ফরাসী ভাষায় অনূদিত মহাত্মা গান্ধীর জীবনী বই বিক্রী হ'ল তিনটী। মনে বেশ আনন্দও পেলুম। কয়েকজন আমাকে সেখানে গান্ধীজীর বিষয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেসও করলেন, কারণ সেদিন তারিখটা ছিল ২রা অক্টোবর,—মানে মহাত্মাজীর জন্মদিন।

সাইগনের চারদিকটা খুব মনোরম দেখতে। আশেপাশে ছড়ানো রয়েছে কত খাল, নদ-নদী-নালার তীরে শস্যে ভরা সবুজ মাঠ। তার ওধারে আরো মাঠ। এখানে ওখানে রয়েছে মন্দির বা বৌদ্ধ প্যাগোডা।

পাহাড় অঞ্চলে রয়েছে আমাদের দেশের নাগাদের মত পাহাড়ী জাতের লোক। তা ছাড়া বাঘ, হাতী, জেব্রা প্রভৃতি বন্য জন্তুও আছে ঐ সব অঞ্চলে। শুধু কি তাই? সাইগন সহরেই পেয়ে গেলুম বাব্‌লু নামে বছর ৩।৪ বয়সের একটী বাঙ্গালী শিশুকে, ওর মা-বাবার সাথে। ওর কথাই এখন তোমাদের বলব।

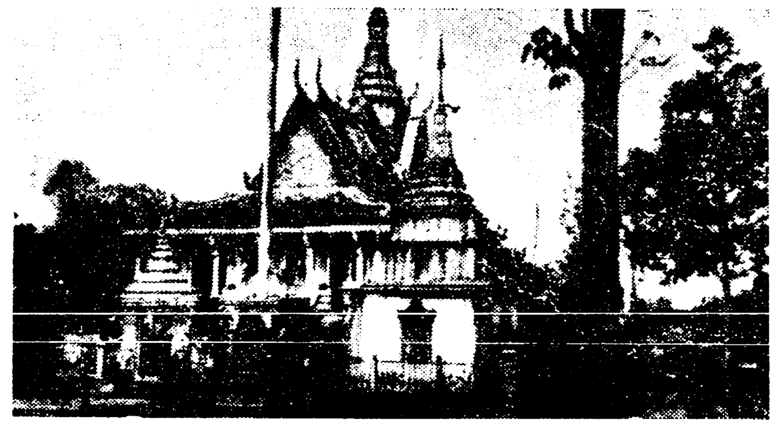

সাইগনের বৌদ্ধমন্দির বা প্যাগোডা

গেল নভেম্বর মাসের শেষ দিকে ইন্দোচীন থেকে ভারতে এক মাসের ছুটীতে আসবার পথে দু'তিন দিন ছিলুম সাইগনে। চন্দননগরের গুপ্ত বাবু কাজ করেন সেখানে। ভদ্রলোক শ্রীপ্রাণেশচন্দ্র রায়কে ও আমাকে নেমন্তন্ন জানালেন তাঁর বাসায়। রায় বাবু একজন পাকা গায়ক, তিনি গান-বাজনা করে বেশ আনন্দ দিলেন। বাবলুর আবার দু'টী মা। একটী ওর আপন মা,—বাঙালী, আর একটি ইন্দোচীনের। বাবলুর দু' মা-ই বেশ গান করলেন। সেখানে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও হয়েছিল বেশ প্রচুর ও ভাল। আর, বলতে লজ্জা নেই,—ও বিষয়ে আমার একটু দুর্ব্বলতা আছে। ভাল খাবারের আয়োজন দেখলে তোমাদের অনেকের মতই আমার জিভ রসসিক্ত হয়ে ওঠে।

যাক্, শোন বাবলুর কথাই। বাবলুর "মা", "বাবা" এবং ঐ রকম আরো দু'-একটি শব্দ ছাড়া আর কোনো বাঙলা শব্দই জানা নেই। তবে এ দেশের ভিয়েৎনামী ভাষায় ও বেশ কথা বলতে পারে। কিন্তু ও যে বাঙ্গালী সে জ্ঞান ওর টনটনে।

আমাকে দেখে ওর এদেশী মাকে বার বারই বলছিল, ও-ও আমার সঙ্গে চলে যাবে নিজের দেশে, এখানে ওর ভাল লাগছে না মোটেই। একবার ওকে বলা হ'ল, আমি দেশে গিয়ে ওর কাকু ও ঠাকুমাকে বলে আসব বাবলু আরো কিছুদিন পরে ফিরবে ওর মা-বাবার সাথে, কাজেই ওর জন্যে সব কিছুই ভাল ভাল জিনিষ রেখে দিতে হবে, ইত্যাদি। এতে কিন্তু বীরবর বাবলু ভীষণ ভাবে কান্না শুরু করে দিল। অগত্যা কান্না থামাবার জন্যে আমায় রাজী হ'তে হ'ল ওকেও নিয়ে বাঙলাদেশে ফিরতে। তখন আর বাবলুর আনন্দ দেখে কে? একবার আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে সকলের অজান্তে আমার পকেটে কিছু চীনেবাদাম, লজেন্স ও চকোলেট প্রভৃতি রেখে দিল আর বলল, আমরা দু'জনে ঐ সব রাস্তায় এরোপ্লেনে বসে বসে মজাসে খাব, আর কেউ-ই পাবে না। বার বারই বলতে লাগল ও ওর নিজের দেশে চলে যাবে, কত রকমের ফল আর মিষ্টি খাবে, বিদেশে আর থাকবে না। আনন্দের আতিশয্যে লাফাতে লাফাতে ওর মায়ের হাতের গরম চায়ের পেয়ালার সঙ্গে লাগল ওর মাথায় গুঁতো, গালে গরম চা ছলকে পড়ায় সেখানে পড়ে গেল ফোস্কা। কিন্তু দেশে যাবার আনন্দে পরক্ষণেই যেন ভুলে গেল সব। সারাটা পথে, ব্যাঙ্ককে এবং ভারতে আমার একমাস ছুটীর সময়ে একদিনও আমি বাব্‌লুর কথা ভুলতে পারি নি। আমার ছেলেমেয়েদের কাছেও ওর গল্প করেছি, ওর ফটোও দেখিয়েছি তাদের।

বাবলু, বাবলুর দুই মা, ছোট বোন ও ওদের পরিবারের এক বাঙ্গালী বন্ধু।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। সম্প্রতি শুনে খুবই আনন্দ পেলুম, স্বদেশের টানে বাবলু নিরাপদেই চন্দননগরে ফিরে এসেছে,—বাঙলার ছেলে বাঙলায়। তবে এখনও সে ভিয়েৎনামী ভাষায়ই কথা বলে থাকে। কিছু কিছু বাঙলাও শিখছে বটে, হয়তো শীগ্‌গিরই আরো রপ্ত করে ফেলবে।

রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী

কথায় বলে "শিকারী বেরালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়", কিন্তু শ্রীযুক্ত রায় বরুয়ার সঙ্গে যার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নি, সে ধারণাই করতে পারবে না কথাটা কতদূর সত্য। জীবনে বিস্তর গোঁফ দেখেছি। যেমন ধরো—সাইকেলের-হ্যাণ্ডেল-মার্কা গোঁফ, দই-সন্দেশ গোঁফ, আতরের-ছিপি-বোলানো গোঁফ, পর্দা-তোলা-হাসি-হাসি গোঁফ, কিছুতেই-প্রোমোশন-দেবো-না গোঁফ দাঁতের-বুরুশ গোঁফ, জুতো-সেলাই-করা-ছুঁচ-মার্কা গোঁফ, চড়াই-ডানা গোঁফ, জী-হুজুর গোঁফ, বার-কার্ত্তিক গোঁফ, গলবস্ত্র গোঁফ, এই রকম সব কত কী! সবগুলো জড়ো করলে একখানা গোঁফের শিশুভারতী হয়ে যাবে।

রায় বরুয়ার গোঁফ একেবারে অন্য চীজ্‌। ঠোঁটের উপর যেন সারি সারি সজারু-কাঁটা বসানো। নখ-দন্তের মত ওটাও যেন একটা অস্ত্র। দেখলেই দমে যেতে হয়।

থাকেন শিলঙে, আমাদেরই পাশের বাড়ীতে। অনেকখানি বাগানের ব্যবধানে প্রায় রোজই প্রত্যূষে দেখি বড় বড় বসরাই গোলাপের আঘ্রাণ গ্রহণ করছেন, ডাল-শুদ্ধ ফুলগুলোকে নাসিকাগ্র পর্যন্ত নুইয়ে ধরে। সংসারে কেউ নেই, চাকরবাকর আর দুটো নেকড়ে-কুকুর ছাড়া। আর আছে ঘরে ঘরে বাঘ, ভাল্লুক, চিতা আর বুনো শূয়োরের খড়-ঠাসা দেহ। বাড়ীর বাইরের দেওয়ালে সারি সারি বুনো মোষের শিং।

আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় তুমুল কলহে, ওঁর গাছের একটি গোলাপ তুলেছিলাম ব'লে। অবশ্য আমারই অন্যায়। লোভ সম্বরণ করতে পারি নি। তা' ছাড়া গাছটা ওঁর বেড়া ডিঙিয়ে, আমাদের বাগানের ওপর ঝুঁকে পড়ে, একটি

ডালের হাত বাড়িয়ে "লহ-লহ" ভঙ্গীতে যে ভাবে ফুলটি নিবেদন করছিল তাতে সেটি প্রত্যাখ্যান করলে নিতান্ত অভদ্রতা হতো। কেউ কিছু দিতে চাইলে আমি আবার "না" বলতে পারি না। ওটা আমার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। ছেলেবেলায় ছোট ভাইদের ভক্তি-ক'রে-দেওয়া মাছ আর কমলালেবু-লবেঞ্চুস্ থেকে আরম্ভ ক'রে বুড়ো বয়েসে বিন্দী ঝির দেশ-থেকে-আনা ট্যাপ খইয়ের মুড়কী পর্যন্ত আমি কিছুই গ্রহণ করতে অস্বীকার করি নি। তা' ছাড়া ব্রাহ্মণ-সজ্জনের পাওনা টাকাটা সিকেটা তো আছেই। কারো মনে দাগা দেওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

ফুলটি তোলার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। "ফ্যাঁস" কিংবা "ফোঁস্" বোঝা গেল না। মোটের ওপর হিংস্র আওয়াজ। তারপর তিব্বতী আলখাল্লা পরে একমাথা টাক নিয়ে যে দীর্ঘাকার পুরুষটি আমাদের বেড়ার ওধারে দাঁড়ালেন তিনিই যে শ্রীযুক্ত রায় বরুয়া সে বিষয়ে সন্দেহ থাকবার কারণ নেই। ওরকম ফাঁক ফাঁক সজারু-কাঁটা গোঁফ মানুষের ওষ্ঠ-পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না। ও ধরণের গোঁফ রাঙিয়ে অনেক কাজ হাসিল করা যায়।

পরিষ্কার বাংলায় বললেন: 'মশায়ের ওটা কি না তুললেই চলতো না?"

"আজ্ঞে, ওটা আমাদের দিকে এসে পড়েছিল তাই···"

'গাছের দিক্-বিদিক্ জ্ঞান থাকে না মশাই, তবে আপনার তো কাণ্ডজ্ঞান আছে! ধরুন, আমার একটা কুকুর যদি আপনার বাগানে ঢোকে তো আপনি কি তার লেজটি কেটে রাখবেন?"

"বেশী কথার দরকার নেই, মশাই। এই নিন্ আপনার ফুল।"

"ওটা আপনিই রাখুন, ভেজে খাবেন।"

নানা অপ্রিয় কথা কাটাকাটি করতে করতে প্রায় হাতাহাতি। উনি আস্ফালন করতে লাগলেন: "চাবুক! চাবুক!" আমিও বীরত্বে কম যাই না। হাঁকতে লাগলাম: "পুলিস্! পুলিস্!"

পরস্পর প্রিয় সম্বোধনের সোরগোলে ভিড় হ'য়ে গেলো। খাসীয়া আয়া, বেহারী গয়লা, সীলেটী বাঙ্গালী নাপিত, নেপালী চৌকিদার, ওড়িয়া ঠাকুর আর অসমীয় কেরাণী। সবাই সবাইকে প্রশ্ন করতে লাগলো, অবশ্য রাষ্ট্রভাষায়: 'ক্যা হুয়া? ক্যা হুয়া?'

ঠিক এই সময়টিতে শ্রীযুক্ত রায় বরুয়া যে চালটি চাললেন তাতে হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। বেড়ার ওপর দিয়ে কোদালের মত একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: হাউ ডু য়্যু ডু?" উচ্চৈঃস্বরে। তারপর স্বর নিখাদে নামিয়ে গোপনে ভর্ৎসনা

করার সুরে: "আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি! পুলিস্ পুলিস্ বলে পাড়া মাথায় করছেন! পুলিসের বদলে কারা এসেছে দেখুন। ছি, ছি!" তারপর বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করলেন: "অল্ রাইট্, দেন্, আজ ডিনারে আসবেন দয়া করে। ভেরী প্লীজ্‌ড্ টু হ্যাভ্ মেট্ ইউ।"

সুতরাং আমাকেও অশনিনিনাদে প্রতিধ্বনি করতে হলো: "ভেরী প্লীজ্‌ড্ ইন্‌ডীড্। ধন্যবাদ। আসবো ডিনারে। আটটায় তো? অশেষ ধন্যবাদ।"

শ্রীযুক্ত রায় বরুয়ার সঙ্গে শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকে আমাদের দুই বাড়ীতে আসা-যাওয়া ঘন ঘন হ'য়ে উঠেছে। ওঁর পেশা কি জানি না। কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন্, সে অনেক আগে। তারপর সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন শিকারে। বলেন, এখন পেন্সন নিয়েছেন। তাঁর শিকারের গল্প অফুরন্ত। রাত্রে খাওয়ার পর ছোট এক পেয়ালা কড়া কালো কাফী নিয়ে, পাইপ ধরিয়ে যে গল্পটি বললেন সেদিন সেইটেই তোমাদের শোনাচ্ছি।

* * * *

ডিব্রুগড় তখন সমৃদ্ধ শহর। ১৯৫০ সালের ভূমিকম্পের পর ব্রহ্মপুত্রের নদগর্ভ এখন অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। তাই তাকে, আপন বিশাল বপুকে কোনো রকমে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়ে, দুই তীরের বহু অংশ অধিকার করতে হয়েছে। ডিব্রুগড়ের ওপারে পাহাড়। সুতরাং এপারের শহরের অনেকখানি গ্রাস করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না নদগর্ভ ওপরে উঠে গেছে বলে তো আর জলের বিরাম নেই! ডিব্রুগড়ের প্রায় অর্দ্ধেকের এখন আর কোনো চিহ্ন নেই। নদের অন্যান্য অংশের মত বর্ষায় টইটুম্বুর, শীতে বালুচর আর স্থানে স্থানে জলস্রোত। এখন তো বলে ব্রহ্মপুত্র এখানে প্রস্থে তিন-চার ক্রোশ। আগে অনুমান ক্রোশ দুই ছিল। তবে ব্রহ্মপুত্রের আগের মত আর দোর্দণ্ড খরতা নেই। বর্ষায় তখন নৌকোয় পার হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। তবে ওপারে যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল না বিশেষ। এখনো নেই। কারণ ওপারের পাহাড়গুলোয় গভীর জঙ্গল।

রায় বরুয়ার পৈতৃক ভিটা ছিল এখনকার নদের প্রায় মাঝামাঝি। অর্থাৎ তখনকার দিনে ব্রহ্মপুত্রের একেবারে কিনারায়। প্রকাণ্ড বাংলো। চারিপাশে বাগান। ওঁর শখ গোলাপের। ছিল অজস্র গোলাপ। ছিল ইউক্যালিপ্‌টাস্ আর গুল্‌মোহর, বাগানের ধারে ধারে, আর বেড়া ছিল সুগন্ধ চা গাছের, কেয়ারী করে কাটা। জলপথে আমদানী-রপ্তানী করে ওঁর পিতা প্রচুর ধনসঞ্চয় করেছিলেন। সুতরাং রায় বরুয়াকে

কখনো অর্থচিন্তা করতে হয় নি। তাঁর শখ ছিল নানান্ রকমের। ভাগলপুরী গাই আনিয়ে করেছিলেন গোশালা। রেখেছিলেন তু'টো মস্ত মস্ত ঘোড়া। ব্রহ্মপুত্রের ধারে বাঁধা থাকতো মোটর-বোট, আর শোবার ঘরের এক কোণে থাকতো তাঁর একমাত্র বন্ধু ও সুহৃৎ, 465 (৪৬৫), ঝকঝকে ঘষা-মাজা, চকচকে পালিস করা চামড়ার খাপে। বন্দুকটা নাকি ডাকলে কথা কইতো। অসমীয় না বাংলায়, তা অবশ্য জিজ্ঞেস করি নি।

একদিন গভীর রাত্রে, রায় বরুয়া তখন একখানি ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস প্রায় শেষ করে এনেছেন, হঠাৎ এক গুরুগম্ভীর গর্জন শোনা গেলো। গর্জনের জোর এত যে তাঁর বিছানার পাশের টেবিলে রাখা গ্লাসের জল চল্‌কে উঠলো। শুধু একটি গর্জন। তার পর আর সাড়াশব্দ নেই। ঠিক মেঘডাকাও নয়, ভূমিকম্পও নয়, পাহাড় থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঁই খসে পড়াও নয়, অথচ যেন তিনে মিশিয়ে এই আওয়াজ! ভাবলেন ওটা ওঁর মনের ভুল, হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছিলেন। স্বপ্ন যে শুধু দেখা নয়, শোনাও যায় এ কথা কে না জানে?

এর কয়েকদিন পরে নানা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটতে লাগলো ও অঞ্চলে। পাড়ার লোকের তু'টি-একটি করে গরু হারাতে শুরু করলো। গরু চুরি এমন কিছু বিস্ময়কর ঘটনা নয়। গোধন-লুণ্ঠন আদিকাল থেকে চলে আসছে সব দেশে। পুলিশে খবর গেলো। গরু চুরি বা পুকুর চুরি নিয়ে তখনকার পুলিশের মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। হ্যাঁ, হীরেজহরৎ চুরি, খুন কিংবা কোনো বাঙ্গালী অসমীয়দের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আসাম-বঙ্গকে পুনরায় সংযুক্ত করবার চেষ্টা করছে কিনা সে কথা আলাদা। গরু চুরি বন্ধ হ'লো না। রোজ বড় হ'লে একটি, ছোট হ'লে কিংবা বাছুর হ'লে তু'টি। যেন কোনো দানবের দৈনিক বরাদ্দ। চুরি যায় কী ভাবে কেউ জানে না। রাত্রে খুব আলতো আলতো একটা শব্দ হয় "ঝপ্" করে, তারপর চক্ষের নিমেষে গরু উধাও। দিনের পর দিন আর কেউ সারারাত চোখ পাকিয়ে গরু চৌকী দিতে পারে না! যারা ঘুমিয়ে পড়ে তাদের গরু লোপাট। কেউ কেউ বললে, বাঘ। কিন্তু বাঘ শহরে সাধারণতঃ ঢোকে না, আর বাঘ এলে মানুষকেও তো নিতে পারে। তা ছাড়া পাঁচীল টপকে একটা বাঘ যে তু'টো গরুমুখে করে নিয়ে সরে পড়বে সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেউ কেউ বললে, কুমীর। কুমীর সরীসৃপ জাতীয়। ওদের পক্ষে পাঁচীল টপকানো সম্ভব নয়।

অবশেষে সবাই বললে, একদল কসাই ঐ কাজ ক'রছে, ইংরেজদের পাতে দিয়ে পয়সা লোটবার জন্যে। হৈ চৈ পড়ে গেলো। হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধে আর কী! ক'লকাতা থেকে মারোয়াড়ীরা এসে একটা গোসত্র খোলবার আয়োজন করতে লাগলো,

এবং তুলসী আর রুদ্রাক্ষের মালা বেচে বেশ তু'পয়সা ক'রে নিলে। উপরন্তু কোথায় কোথায় তেলের কল, আটার কল আর কাপড়ের দোকান খোলা চলে তারও একটা মোটামুটি জরিপও করে গেলো।

কিন্তু সমস্যার সমাধান হ'লো না। সমানে গরু চুরি হ'তে লাগলো। তারপর মোষ। তখন সবাই বললে, উঁহুঁ, ওগুলো শুধু ইংরেজেরই প্লেটে পড়ছে না, কসাইদের সঙ্গে নেপালীদেরও যোগ আছে। মোষগুলোকে ভুটানের ভেতর দিয়ে নেপালে পাঠাচ্ছে কাটামুণ্ডুতে মুণ্ডু কাটার জন্যে। আশ্চর্য্য, কিন্তু ডিব্রুগড়ের আনাচে কানাচে, ধোপার মাঠে, কুমোরের উঠোনে, পথের ধারে, খানায়, প্রতিবেশীর ফুলের বাগানে এত পাঁঠা, চালাক বোকা সব রকমের,—অথচ একটারও কেউ রোমস্পর্শ করছে না! এ থেকে কাষ্ঠানিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা অনুমান করলেন, এই নগর-জোড়া লুণ্ঠনকার্য সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় হিন্দুবিদ্বেষী। ওঁদের পাতে যে তু'-এক টুকরো ছাগমাংস, মেটে বা তু'-একটা ফুকো হাড় পড়বে তার ব্যবস্থা একেবারেই নেই!

এই ধরণের জল্পনা-কল্পনা-আলোচনা-বিবেচনা হ'চ্ছে, এমন সময়ে রায় বরুয়ার গোশালা থেকে উধাও হ'লো তাঁর ষোল-সের-তুধোলো একটা ভাগলপুরী গাই। নদীর দিকের শক্ত কাঠের দেওয়ালের অনেকখানি কে যেন এক ধাক্কায় ভূমিসাৎ ক'রে দিয়েছে। ও কাজ ষণ্ডামার্কা দশটা কাশীর গুণ্ডার পক্ষেও সম্ভব নয়। কাঠের উপর কাটারী, শাবল, সিঁদ কিছুরই দাগ নেই। এক হাতী দিয়ে ঐ ধরণের ঘর ভাঙ্গা যায়। বুনো হাতী এদিকে আসে না। এলেও তারা গরু নেবে কেন? হাতীরা গোখাদক নয়। ওরা পরম নিরামিষাশী। এমন কি মাছ, ডিম, তুর্গাবড়ী কিছুই স্পর্শ করে না। তবে কসাইরা কি হাতী দিয়ে গরু ধরছে? এ ধারণা একেবারে আজগুবী। অথচ···

অথচ – রায় বরুয়া নদীর দিকে একটু নেমে এসে আবিষ্কার করলেন কাদার ওপর আড়াই সেরা কুনকের মত একটা গর্ত, তারপর হাত কুড়ি পেরিয়ে আর একটা গর্ত। আর এক পাশেও ঐ ধরণের গর্ত। হাতীর মত কী এক অতিকায় জন্তু সন্তর্পণে একটি একটি ক'রে পা ফেলে ওপরে উঠে আবার নীচে নেমে গেছে। বেশী দাগ পাওয়া গেলো না। এবং, সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার,—তু'টি। এক, জন্তুটা জল থেকে উঠেছিল। এবং তুই, যদি সে-ই গরুটাকে নিয়ে গিয়ে থাকে তো তাকে মাটিতে পড়তে দেয় নি। কাদার ওপর গরুর ক্ষুরেরও দাগ নেই, তাকে যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তারও কোনো চিহ্ন নেই।

(ক্রমশঃ)

কেলো-ভুলো

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

কেলো আর ভুলো। কেলোর মাথায় দুই কানের মাঝখানে কালোর ছোপ আর ভুলোর লেজের ডগাটা কালো। কিন্তু গায়ের রং দু'জনের এক রকম। ছাই ছাই রংয়ের। মাথাতেও দু'জনে সমান। গায়েতেও সমান জোর। যমজ কিনা!

হেতমদের বাগান পেরিয়ে যে মাঠটা পড়ে সেই মাঠে একদিন ওরা দুটিতে পা দিয়ে একটা জায়গা খুঁড়ছিল।

মাটি খুঁড়ছে ত খুঁড়ছেই। খুঁড়তে খুঁড়তে শেষে একটা হাড় পেয়ে গেল। কচি পাঁঠার হাড়। গন্ধে ভুর ভুর। ওদের মুখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

—'হাড়টা আমার',—বললে কেলো,—'আমিই প্রথম দেখেছি।'

—'না, আমার',—বললে ভুলো,—'আমিই প্রথম ছুঁয়েছি।'

হাড়টা মাঝখানে রেখে ওরা দু'জনে ঝগড়া বাধিয়ে তুললে। হাতাহাতি হয় আর কি!

কেলো যত বলে—'আমার', ভুলো তত রুখে ওঠে—'না আমার।'

এক চাষী যাচ্ছিল সেই মাঠ দিয়ে গরুর গাড়ীতে বিরাট খড়ের পাহাড় চাপিয়ে।

—'চল, ঐ চাষীকে জিজ্ঞেস করা যাক্'—বললে ভুলো।

—'বেশ, তাই চল।'—বললে কেলো।

হাড়টা গর্তের কাছে রেখে দুজনে ছুটল চাষীর কাছে।

—'চাষী ভাই, হাড়টা আমার না ভুলোর?'- বললে কেলো। 'আমিই প্রথম দেখেছি।'

—'কিন্তু আমিই প্রথম ছুঁয়েছি।' ভুলোও পিছু হটবার পাত্তর নয়।

চাষীর গাড়ীটা তখন কাদায় আটকে গেছে। চাষী বললে—'এস ত' তোমরা দুজনে। আমার গাড়ীটাতে একটু হাত লাগাও দিকিনি। ঠেলাঠেলি করে আগে গাড়ীটা কাদা থেকে তুলে নি', তারপর ধীরেসুস্থে বিচার করা যাবে—হাড়টা কার।'

তখন দুই কুকুর, গরু দুটো আর চাষীতে মিলে ঠেলাঠেলি করতে করতে চাকাটা কাদা থেকে উঠে এল। গাড়ী আবার চলতে লাগল।

—'এবার বিচার করে দাও হাড়টা আমার না ভুলোর।'—চাষীকে বলল কেলো।

—'হাড়!' চাষী যেন আকাশ থেকে পড়ল।—'কিসের বিচার? আমার ত'

আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কুকুরের ঝগড়া মেটাই। পালাও পালাও। নাও, এক মুঠো খড় চিবোও বসে বসে। হাড়ের চেয়ে খারাপ লাগবে না খেতে।'

এই বলে চাষী এক আঁটি খড় ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল। ওরা দুজনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

মাঝখানে এক আঁটি শুকনো খড় নিয়ে কেলো ভুলো ভাবতে থাকে। কি করবে এখন?

এমন সময় এক রামছাগল সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। ওরা তাকেই ধরে বসল।

—'ছাগল দাদা, ছাগল দাদা! একটা বিচার করে দাও ত'।'

ছাগল ওদের দিকে দাড়িওয়ালা মুখ তুলে চোখ পিট পিট করতে লাগল।

—'হাড়টা আমার না ভুলোর? আমিই প্রথম দেখেছি।'

—'কিন্তু আমিই প্রথম ছুঁয়েছি!'

—'বাঃ, বেড়ে খড় ত।'—বললে রামছাগল।

টাটকা খড় ফেলে আর কি আজেবাজেতে মাথা ঘামান যায়?

—'আগে খড়টা খেয়ে নি', তারপর বিচার করব। বড় কঠিন বিচার কিনা! অনেক মাথা ঘামাতে হবে।'

রামছাগল লেজ নেড়ে নেড়ে আর দাড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে নিমেষের মধ্যে সব খড় উদরসাৎ করে ফেললে। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে দাড়িটা পরিষ্কার করে নিয়ে বেশ গম্ভীর মুখ করে তাকাল ওদের দিকে। ঠিক বিচারকের মতই হয়ে উঠল মুখের ভাবখানা; আর তেমনি মুরুব্বী চাল।

—'এবার বল কার হাড়? আমার না ভুলোর?'—বললে কেলো।

'হাড়! হাড়ের খবর কে রাখে? আমরা ঘাসপাতা খাই, ঘাসপাতার খবর বলতে পারি। যাও যাও, মেলা ঝামেলা করো না। তবে যাবার আগে একটা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি। যতদিন না তোমাদের দাঁত রামছাগলের শিংয়ের চেয়ে শক্ত আর ধারাল হচ্ছে ততদিন রামছাগলের পিছনে লাগতে যেও না। খুব সাবধান।'

তারপর ব্যা ব্যা শব্দে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে রামছাগল ভারিক্কী চালে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। কেলো ভুলো শুধু বোকার মত তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার ভুলো প্রস্তাব করলে—'চল, বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি; কেউ এলেই তাকে ধরব।'

এ প্রস্তাব মন্দ নয়। কেলোরও সম্মতি আছে।

দুই মূর্তিমান তখন হাড়টা মাটি চাপা দিয়ে বড রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এক নাপিত সেই পথ দিয়ে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। নাপিত ভায়া তার কাজে এখনও পোক্ত হয়ে ওঠে নি। সবে হাত পাকানোর রিহার্সেল চলেছে, কিন্তু হাতের কেরামতি পরীক্ষা করবার সুযোগ পাচ্ছে না একদম। কেউ তার কাছে গাল বা মাথা এগিয়ে নিয়ে আসতে ভরসা পায় না। তাই সে লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়েই ভুলো গদগদ হয়ে বললে,—'নাপিত ভায়া! নাপিত ভারা! আমরা দুজনে একটা হাড় কুডিয়ে পেয়েছি। হাড়টা আমার না কেলোর বিচার করে দাও না! হাড়টা আমিই প্রথম ছুঁয়েছি।'

— 'কিন্তু আমিই প্রথম দেখেছি'— সঙ্গে সঙ্গে কেলোর প্রতিবাদ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

—'এ ত' অতি সহজ ব্যাপার। এক্ষুণি বিচার আমি করে দিতে পারি। আমার পূর্ব্বপুরুষরা ত' বিচারকই ছিলেন। তাঁদের ন্যায়বিচারের গল্প ইতিহাসের পাতায় পাতায় ঠাসা। কিন্তু একটা সর্ত আছে। আগে আমাকে তোমাদের উপর আমার হাতের কেরামতি পরীক্ষা করতে দিতে হবে। তারপর বিচার করব।'

কেলো ভুলো নিজেদের মধ্যে কি ফিস্ফাস্ করে তক্ষুনি রাজী হয়ে গেল।

নাপিত কাঁচি আর চিরুণী নিয়ে কঁ্যাচ কঁ্যাচ করে ভুলোর মুখের আর ল্যাজের চুল ছেঁটে দিলে। কেলো ছল ছল চোখে দেখতে লাগল।

ভুলোর লোম কাটা হলে কেলোর পালা এল। নরসুন্দরকে তারিফ করতে হয়। অদ্ভুত তার কাঁচি চালাবার কারসাজি আর হাতের প্যাঁচ! নিমেষের মধ্যে কেলোর পিঠের লোম সাবাড় হয়ে গেল। ভুলো ছল ছল চোখে লক্ষ্য করতে লাগল।

লোম কাটা হলে নাপিত তার ছোট্ট আয়নাটা ভুলোর চোখের সামনে তুলে ধরল।

বাঃ, মন্দ হয়নি ত! এদিকে ওর চেহারা দেখে কেলো ত' হেসেই খুন।

তারপর নাপিত ভায়া আয়নাটা কেলোর চোখের সামনে তুলে ধরল।

বাঃ, বেশ হয়েছে!

কিন্তু এর পর হাড়ের কথা উঠতেই নাপিত বললে—'হাড়! হাড় নিয়ে কি করব? আমি চুলের কারবার করি, হাড়ফাড় নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না।'

নাপিত তার চিরুণী-কাঁচির বাক্স নিয়ে একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেল। আর হতভম্ব কুকুর দুটো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সেই দিকে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ই একটা বড় কুকুর জিভ লক্ লক্ করতে করতে সেখানে এসে হাজির। অমনি কেলো তাকে ধরে বসল—'আমি আর ভুলো একটা হাড় কুড়িয়ে পেয়েছি। কিন্তু হাড়টা কে নেবে? আমিই প্রথম দেখেছি।'

—'আমিই প্রথম ছুঁয়েছি।'—ভুলো উৎসুখ মুখে তাকাল বড় কুকুরটার মুখের দিকে।

—'ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে'—নাক কুঁচকে, মুখটা গম্ভীর করে বললে বড় কুকুর। লেজটাও দুলতে লাগল দুলকি তালে।

—'আগে জানা দরকার কিসের হাড়, কেমন হাড়।'

—'পাঁঠার হাড়। এমন আর কি!'—বললে কেলো।

—'কত বড় হাড়, কোথায় পেলে, কেমন দেখতে—এ সব আগে না জানলে কেমন করে মতামত দেব? আগে হাড়টা দেখাও—'

প্রায় এক সঙ্গেই ওরা তিনজন ছুটল গর্তটার দিকে।

কেলো ভুলো পা দিয়ে মাটি সরাতেই হাড়টা বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মন মাতান গন্ধে বাতাস আমোদিত হয়ে উঠল। বড় কুকুরের মুখ থেকে টস্ টস্ করে জল গড়াতে লাগল।

— 'বাঃ, চমৎকার হাড় ত'!'

বড় কুকুর হাড়টার দিক্ থেকে আর যেন চোখ সরাতে পারছে না।

'হাড়টা আমার জিম্মায় থাক। তোমার সব ছোট ত'—কেউ ভুগ্‌গি দিয়ে কেড়ে নিতে পারে।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই বড় কুকুর হাড়টা মুখে করে হেতমদের বাগানের দিকে পা বাড়াল। কেলো ভুলোর মুখের দিকে তাকাল। ভুলো তাকাল কেলোর মুখের দিকে। কেলো এক লাফে বড় কুকুরের টুঁটিটা কামড়ে ধরল, আর ভুলো কামড়ে ধরল তার লেজ। তারপর চলল ভীষণ কামড়াকামড়ি—হুড়োহুড়ি। শেষ পর্যন্ত বড় কুকুরটা হাড় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাবার পথ পেলে না। কিঁউ কিঁউ করতে করতে লেজ গুটিয়ে দে পিট্টান। একেবারে হেতমদের বাগান পেরিয়ে তাদের বাড়ীর দিকে।

কেলো এবার ভুলোর মুখের দিকে তাকাল। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাড়ের একটা দিক্ কামড়ে ধরল। ভুলোও কেলোর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে হাড়ের আর একটা দিক বাগিয়ে ধরলে। তারপর নিঃশব্দে চলতে লাগল চর্বণ-ক্রিয়া।

পথিক মেঘের দল

শ্রীআশা দেবী, এম্. এ, বি. টি

ধূ—ধূ মাঠের মাঝখানে আকাশের দিকে ঠায় তাকিয়ে বসে আছি। ঘাড় প্রায় ব্যথা হয়ে গেল, তবু উড়োজাহাজ এলো না। ছোড়দা বললেন : উড়োজাহাজ দেখা এত সোজা নয়! প্রথমে পোঁ - ফর—র্—র্—করে শব্দ 'হবে'। তারপর চিলের মত পাখা মেলে শোঁ করে উড়ে যাবে। দেখে দেখে তোর আর সাধ মিটবে না।

সাধ সত্যিই মেটে না। মেটবার মত সাধ কি আমার-ই? মাথার ওপর দিয়ে যখন সত্যিই উড়ে গেল গোঁ গোঁ করে তখন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না যে আমিই দেখলাম নিজের চোখ দিয়ে। মফঃস্বল সহরের মেয়ের কচি মনের ওপর কালির আঁচড়ে পড়লো অভিজ্ঞতার রেখাপাত।

তারপর রাত্তে আকাশ ভরে মেঘ এসেছে দলে দলে—কালো কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে, ঝড় এসেছে ধূলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে সবার আগে, বৃষ্টি পাল্লা দিয়ে ঝম্ ঝম্ করে দামাল মেয়ের মত মল পায়ে দিয়ে নেচে ফিরেছে আমাদের টিনের চালের ওপর। মার নরম মিষ্টি বুকের নিশ্চিন্ত আশ্রয় নিয়ে তিনটি ভাইবোন বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখেছি আমাদের নারকোল গাছ তুটোর উদ্দাম নৃত্য। মড়মড়িয়ে আমের ডাল—আমলকির গাছ ভেঙে পড়েছে। মার বুক জড়িয়ে ধরে আমরা কানে আঙ্গুল দিয়েছি। আবার বৃষ্টিতে ধোয়া মিঠে সকালের রোদে বসে মা কুটনো কুটতে কুটতে বলেছেন : উড়োজাহাজ—সে দেখা কি সোজা কথা! আমরা ছোটবেলা শুনেছি রামনগরের কে যেন কোন লাখপতির বৌ উড়োজাহাজে উঠে বমি করে ফেলেছিল। তারপর তাকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি। ওতে চড়া কি মেয়েদের কাজ, না উচিত? মা এঁচোড় কুটছেন আর আমরা তু হাতে তেল মেখে কাঁচা ভুতি থেকে টিপে টিপে বীচি বের করছি। আবার নখে খুঁটে খুঁটে হলদে খোসা তুলছি। মা বলছেন, ভালো করে ওঠা, ওটা পেটে যাওয়া ভালো নয়, পেট ফাঁপে।

ঘরে বসে বসে ডাক্তারী পরীক্ষার্থী দাদা হাসছেন : কোন বইয়ে ওটা লেখা আছে?

: চুপ কর বাপু, অতশত কথা জানি না—যা শুনি তাই বলি।

আমরা ধরে পড়ি : রেলগাড়ীর গল্প বল না মা!

: আমরা গল্প শুনেছি—মা বলতে লাগলেন : যখন প্রথম এখানে রেল চলে তখন এদেশী দেহাতী লোকেরা টিকিট করে রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো। গাড়ী

এলো – গাড়ী চলেও গেল হুস্ হুস্ করে, কিন্তু চড়া হলো না তাদের। কারণ, টিকিট করলে কি হবে, তারা তো গার্ড সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে নি। তা ছাড়া গার্ড সাহেবই তো গাড়ীর মালিক, গার্ড সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করলে কি গাড়ীতে চড়া যায়? আবার সকালবেলা ছাগল, ভেড়া, মুরগী রেল লাইনের ওপর বলি দিয়েছে। কারণ কাল যে টিকিট করে গাড়ীতে ওঠা হয় নি তাতে নিশ্চয়ই ইঞ্জিন ঠাকুর রাগ করেছেন। তাই তাঁকে শান্ত করবার জন্য এই চেষ্টা।

* * * *

মাটি থেকে হাজার হাজার ফুট ওপরে বসে ভাবতে ভালো লাগছে। ভাবতে ভাবতে মাথা ঝিম ঝিম করছে। কোন কাজ নেই—শুধু অলস চিন্তা ছাড়া। যাত্রী আমরা, সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের দেশে চলেছি ভেসে। পায়ের তলায় তুরন্ত সাগরের ঝাঁপাঝাঁপি। আরবের মরু-মরীচিকা—মাঝে মাঝে জেগে-থাকা দ্বীপ। উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে দেখছি। মেঘেরা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে উড়োজাহাজ। বাতাসের পকেটে পড়ে পাকা আমটির মত পড় পড় হচ্ছে এরোপ্লেন, আর আমাদের মনে হচ্ছে পেটের ভেতরটা যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। আবার উঠে পড়ছে বোঁ বোঁ করে কত ওপরে! এয়ার-হোস্টেস্ গায়ে দিচ্ছে কম্বল জড়িয়ে। ভারী শীত করছে, বুকের ভেতরটা ভিজে গেছে। কলমটা ভরা ছিল কালিতে, সেটার কালি বাতাসের চাপে উপছে পড়েছে। কত মেঘের রাজ্য, চাঁদের বাড়ীর পথ এই মহাশূন্য, কত পাখীর উড়ে বেড়াবার ক্ষেত্র, কিন্তু তবু মন খুঁজে ফিরছে মাটি—শ্যামল স্নেহের আঁচলে ঢাকা মা'র নরম বুকের আশ্রয়। শূন্যচারণা সে কত ক্লান্তিকর তার তিক্ততা বার বার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছিল।

একটু বোধ হয় ঘুম এসে পড়েছিল। কানের ভেতরে একটা অসহ্য যন্ত্রণা, যেন টুকরো-টুকরো হয়ে ফেটে যাবে! একখণ্ড তূলোর সাধ্য কি যে কানকে রক্ষা করে?

যন্ত্রণা ভুলতে চেষ্টা করি। আবার স্মৃতির মধ্যে মন হারিয়ে যায়।

: এই বাবু, সরে বোসো।—বলতে বলতে নাকে এক তীব্র লাঠির খোঁচা। হাতে-ধরে-থাকা পুঁটলিটা দিয়ে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে ভদ্রলোক কাঁচা-পাকা গোঁফ নেড়ে হাসলেন।

: একটু বসবো মশা—

: বসবেন তো আমার মুখে অমনি করে পুঁটলির খোঁচা দেবার অর্থ কি?

ওটায় যে বিশ্রী গন্ধ, আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তুর্গন্ধে !—পশ্চিম দেশীয় লোকটিকে প্রশ্ন করছেন আহত যাত্রীটি।

একটি নিটোল ফুটবলের মত ভুঁড়ি। ছোট হয়ে যাওয়া কোটটা দিয়ে বৃথা সে ভুঁড়ি ঢাকবার চেষ্টা করে লোকটি বললেন,—একটু পান খাবেন ? বনারসী জর্দ্দা দিয়ে ? যাবেন কোথায় ? রাজগীর ? তা বাবু মার্টিনের গাড়ীতে একটু ভীড় হবেই ; কষ্ট করে বসতে হবে আমাদের। মানি হচ্ছে কি কথা, আমরা সকলেই ভাই ভাই !

মরুভূমির বাসিন্দা

কথার যেই মানেই হোক, আমার ভারি বিরক্ত লাগলো ভদ্রলোককে দেখে। খানিক পরেই দেখলাম, পাশের সেই যাত্রীটির মুখের দিকে চেয়ে, একটু হেসে, পচ্ করে খানিকটা পানের পিচ গাড়ীর ভেতরেই ফেলে, বললেন : চলুন না আমার ঘরে, এক রাত আমার গরীবখানায় থাকবেন। রাজগীরে হোটেলের সুবিধা নেই, আর এই রাতে কোথায় খুঁজবেন ?

চট্ করে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এ-ই ভারতবর্ষের রূপ। আমাদের স্নেহ, আমাদের প্রীতি মাটির মতই একান্ত অন্তরঙ্গ। বার বার মনে হচ্ছিল, এর চেয়ে অনেক ভালো

রেলগাড়ী লোকের গোলমাল, ওঠানামা, ভীড়, লাঠির খোঁচা, পান-বিড়িওয়ালা ও মুটের চেঁচামেচি। তবু সে মাটি ; তার প্রাণ আছে, স্নেহ আছে।

মরুভূমির ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলছে উড়োজাহাজ। আমরা আরবে নামবো। বাহরিণ প্রায় এসে গেল। তার রুক্ষ প্রান্তরে মরু-উত্তাপ,—যেন মহাব্যোমেও আমাদের স্পর্শ করলো। তেষ্টা পেতে লাগলো তীব্র ভাবে ! আমরা গায়ের কম্বল সরিয়ে দিলাম। ওপরের বাতাস আসবার পথের মুখ ঘুরিয়ে নিজেদের দিকে নিয়ে এলাম।

: এই যে দাদা, আপনার টাইয়ের নট্টা যে একবারে গিঁট হয়ে বসে আছে !

আমাদের সহযাত্রী তিনটি বাঙালী ছাত্র বিলেতে পড়তে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে একটি অপর একটিকে ঠাট্টা করছেন, যেন তিনি পুরোদস্তুর ইংরেজ, আর বাকী সব ব্ল্যাক নিগার।

অন্য ভদ্রলোকটি কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে কি বলবার আগে সেই ভদ্রলোক, মিঃ বোস, বললেন : আমরা চার পুরুষ বিলেতে। তবে হ্যাঁ, আমার বাবা-দাত্থ অবিশ্যি নাটোর সহরের কামারদিয়ার গ্রামে মানুষ। আমার গ্রাম ভালো লাগে না। আমি কলকাতায় থাকি। আচ্ছা দাদা, আপনার সুটটার কাট্ তো ভাল নয় ! কোথায় বানালেন ? বোলঘাটা ? আরে ছ্যোঃ ; বানাবেন সব মার্কেট থেকে, মানে নিউ মার্কেট। হ্যাঁ, কাটছাঁট ওরা একটু বোঝে-সোঝে। পয়সা ? তা একটু বেশী নেবে বটে, কিন্তু সুটের নামে এ রকম চোঙ্গা বানিয়ে দেবে না।

অন্য ভদ্রলোকটি যেন ফুটো-করে-দেওয়া বেলুনের মত ক্রমাগতই চুপসে ছোট হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সমস্ত ঘটনার পরেও ছিল আসল ঘটনার উপসংহার পর্ব্ব। প্লেন মাটিতে নামলো। গরমে আমরা বেশীর ভাগ যাত্রীই বমি করে ফেললাম। কিন্তু বমি করলেই কি নামা যাবে ? আমাদের বীজাণুমুক্ত করবার জন্যে ডি. ডি. টি. বোমার গ্যাস দিয়ে বেরুবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু মিঃ বোস, অর্থাৎ সেই সুট্-টাই-বিশারদ, দেখি তখনও একটা ভারি কম্বল চাপিয়ে ঝর ঝর করে ঘামছেন।

কী হ'ল ?

আমরা কিছু বোঝবার আগেই, যাঁর উদ্দেশ্যে এতক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তাঁরই হাত চেপে ধরে, কেঁদে বললেন,—বাঁচান মশাই, আমাকে বাঁচান। আমি যে গেলাম !

প্লেনের সমস্ত যাত্রী অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে রইলো সে দিকে। হঠাৎ এমন সাহেব-মার্কা লোকটির কী ঘটলো !

সে কথা আজ থাক্, আসছে বারে বলবো।

রূপ ও সনাতন

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেব বৃন্দাবন যাত্রার পথে গৌড়ের নিকট-বর্ত্তী রামকেলীতে উপস্থিত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার অজস্র লোক। কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গায় গান রামকেলী সহর হরিনামে মাতিয়া উঠিল। সহরের বাহিরে মস্ত বড় এক বটগাছ, গাছের নীচে আলো করিয়া বসিয়া আছেন সোনার গৌরাঙ্গ—রসে ঢল ঢল, ভাবে গর গর। তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিয়াছে উদ্দাম হরিসঙ্কীর্ত্তন।

হুসেন শাহ তখন বাংলার স্বাধীন সুলতান, গৌড় নগরী তাঁহার রাজধানী। রামকেলীর খবর পাইয়া তিনি তাঁহার কর্ম্মচারী কেশব ক্ষেত্রীকে পাঠাইলেন ব্যাপার কি জানিয়া আসিবার জন্য। মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া কেশব কৃতার্থ হইলেন এবং পাছে বিধর্ম্মী সুলতান তাঁহার কোন অনিষ্ট করেন এই জন্য সুলতানের কাছে গিয়া বলিলেন যে একজন সামান্য সন্ন্যাসী রামকেলীতে আসিয়াছেন, তাই তাঁহাকে লইয়া লোকে একটু কীর্ত্তনাদি করিতেছে মাত্র, আর কিছু নয়।

সুলতান কিন্তু কেশবের কথায় ভুলিলেন না। সামান্য সন্ন্যাসী হইলে কি এত লোক উন্মাদের মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে? ইনি নিশ্চয়ই কোন অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষ ইহা স্থির করিয়া তিনি আদেশ দিলেন যে সন্ন্যাসী তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করুন, তাহাতে কেহ যেন বাধা না দেয়। আর যায় কোথায়? তুমুল উৎসাহে রামকেলীতে হরিনামের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল।

এই সহরে বাস করিতেন সুলতানের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী সাকর মল্লিক অমর, আর দবির খাস সন্তোষ। ইঁহারা দুই ভাই অত্যন্ত ভক্তিমান্ আর সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের চালচলন অনেকটা মুসলমানের মত হইলেও

ভিতরে ভিতরে প্রেমভক্তির স্নিগ্ধ প্রবাহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতেছিল, সুযোগ পাইয়া এবার তাহা ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিল। দুই ভ্রাতার মনেই রাজকার্য্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল।

এইরূপ করিবার আরও কারণ ছিল। হুসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের কিছুকাল ধরিয়া বিবাদ চলিতেছিল। সুলতানের আদেশে সেনাপতি ইসমাইল গাজী বহু সৈন্য লইয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন কিন্তু পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে পলাইয়া আসিতে হয়। পলায়নের পথে গাজী সাহেব বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া আসেন। এই সমস্ত শুনিয়া অমর আর সন্তোষের প্রাণে অত্যন্ত আঘাত লাগে এবং তাঁহারা রাজকার্য্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে মনস্থ করেন। কিন্তু সুযোগ আর আসে না। ঠিক এই সময় রামকেলীতে হইল মহাপ্রভুর আবির্ভাব। দুই ভাই বুঝিতে পারিলেন যে ইনিই প্রকৃত লোক যাঁহার কাছে সত্য সত্য পথের সন্ধান মিলিবে। যেমন ভাব তেমন লাভ। একদিন গভীর রাত্রে দুই ভাই আসিয়া মহাপ্রভুর শরণ লইলেন। তাঁহাদের দৈন্যভাব আর মনের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং অভয় দিয়া বলিলেন

"উত্তম হইয়া হীন করি মান আপনারে।
অচিরে উদ্ধার কৃষ্ণ করিবে তোমারে॥"—চঃ চঃ

"বাইরে কাজকর্ম্ম করছো কর; মন কিন্তু রেখো সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণপদে। সময় হলেই ডাক পড়বে।"

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দুই ভাই মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। মহাপ্রভু চলিয়াছেন বৃন্দাবনে অথচ তাঁহার সঙ্গে এত লোক—ইহা সন্তোষের মনে ধরিল না। তিনি যাইবার সময় চুপে চুপে বলিলেন—

"যাঁর সঙ্গে হয় এই লক্ষ লোক কোটী।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটি॥"—চঃ চঃ

"অপরাধ নেবেন না প্রভু, আপনি সন্ন্যাসী, বৃন্দাবন দর্শনে যাবেন, অথচ লোক সঙ্গে চলেছে কাতারে কাতারে। বৃন্দাবন যাত্রার পথে এত হট্টগোল কি ভাল?"

কথাটা মহাপ্রভুরও মনে ধরিল। দিনরাত তিনি প্রেমানন্দে মাতিয়া থাকেন, কোন্ দিক্ দিয়া কি হইতেছে সেদিকে তাঁহার দৃষ্টিই নাই। এখন সন্তোষের কথায় সেইদিকে দৃষ্টি পড়িল, তিনি আবার পুরীতে ফিরিয়া চলিলেন।

যাইবার পূর্ব্বে মহাপ্রভু দুই ভাইয়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়া গেলেন, তাঁহারা যেন পুরীধামে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন। অমরের নাম হইল রূপ, আর সন্তোষের নাম হইল সনাতন।

ইহার কয়েক মাস পরে একদিন রূপ রাজকার্য্য শেষ করিয়া বাড়ী আসিলেন এবং আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। মধ্যরাত্রে হঠাৎ তঁাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পায়ে বিষম জ্বালা করিতেছে, বোধ হয় কোন কিছুতে কামড়াইয়াছে।

পাশের খাটেই ছিলেন তঁাহার স্ত্রী। স্বামীর ডাকে তঁাহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অন্ধকার ঘরে তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালাইতে গিয়া তিনি স্বামীর মূল্যবান্ আলখাল্লাটাতেই আগুন ধরাইয়া ফেলিলেন। ইহাতে দুঃখ করিয়া রূপ বলিলেন, আঃ, কি করলে বল ত'! এমন দামী জিনিষটা নষ্ট করে ফেললে!"

নির্ব্বিকার চিত্তে স্ত্রী উত্তর দিলেন, "তুমি বড়, না ঐ আলখাল্লাটা বড়? আমার কাছে তুমি ছাড়া আর কোন কিছুই বড় নয়, তা সে সব যতই না মূল্যবান্ হোক। তোমার সুখের জন্য আমি সব কিছু পরিত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত নই।"

অবাক্ হইয়া গেলেন রূপ স্ত্রীর কথা শুনিয়া। ভাবিলেন, এই রমণী ত' মনপ্রাণ দিয়া তাহার প্রভুর সেবা করিতেছে, কিন্তু তিনি ত' তাহা করিতেছেন না! দিনরাত পরের সেবা করিয়াই বৃথা সময় কাটাইতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে রূপ স্থির করিলেন আর সংসারে থাকা নয়, এইবার বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। এই স্থির করিয়া তিনি পরদিনই গভীর রাত্রে সংসার ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি তঁাহার সমস্ত সম্পত্তি চার ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ ব্রাহ্মণদের, অন্য ভাগ দুঃখী-দরিদ্রদের, আর বাকী অংশের এক ভাগ পরিবারের সকলকে ও অন্য ভাগ সনাতনের নামে লিখিয়া দিয়া গেলেন। দানপত্রের সঙ্গে সনাতনের জন্য ছোট্ট একখানি চিঠিও লিখিয়া রাখিয়া গেলেন।

রূপের চিঠি পাইয়া সনাতন ভাবিতে লাগিলেন, অতঃপর কি করা যায়? মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিয়া তঁাহারও বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। তিনি স্থির করিলেন, তিনিও আর ভূতের বোঝা বহিবেন না, দাদার মত বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবেন। এই স্থির করিয়া সনাতন দরবারে যাওয়া বন্ধ করিলেন। সুলতানকে জানাইলেন যে তিনি অসুস্থ, কাজেই কিছুদিন তঁাহাকে ছুটি দিতে হইবে।

এই খবর পাইয়া সুলতান তাঁহার খাস হেকিমকে পাঠাইলেন দবির খাসের চিকিৎসার জন্য। হেকিম আসিয়া দেখিলেন দবির খাসের ত' কোনও অসুখ নাই, বেশ ভালই আছেন তিনি। হেকিম গিয়া সুলতানকে জানাইলেন এই কথা। সুলতান তখন একদিন নিজেই আসিয়া উপস্থিত দবির খাসের বাড়ীতে। সনাতন তখন পণ্ডিতদের সঙ্গে বসিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেছিলেন। ইহাতে সুলতান অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দবির খাস, এ তোমার কি রকম ব্যবহার? এই তুমি জানালে তোমার শরীর খারাপ,

কিন্তু এখন দেখছি সব ফাঁকি, তুমি ত' বেশ ভালই আছ! এ রকম করার অর্থ কি বল ত'?"

সুলতানের কথায় সনাতন চুপ করিয়া রহিলেন মাথা নত করিয়া, কোন উত্তর দিলেন না। ইহাতে সুলতানের আরও রাগ হইল। তিনি বলিলেন, "তোমার বড় ভাই ফকির হয়ে পালিয়ে গেল, আবার তুমিও কাজে টাল-বাহানা আরম্ভ করেছো, এ রকম হ'লে ত' চলবে না।"

এইবার সনাতন হাতযোড় করিয়া বলিলেন, "জঁাহাপনা, আমাদ্বারা আর কোন

"জঁাহাপনা, আমাদ্বারা আর কোন কাজ হবে না।

কাজ হবে না, আমাকে বিদায় দিন।" সুলতান তখন তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া কাজে যোগ দিতে বলিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সনাতন তাঁহার সঙ্কল্পে অটল রহিলেন। ক্রুদ্ধ সুলতান তখন তঁাহাকে কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

কারাগারে বন্দী হইয়া সনাতন একমনে মহাপ্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের ডাকে ভগবানের আসন টলিল। সনাতনকে বন্দী করিয়া সুলতান উড়িষ্যা-অভিযানে চলিয়া গেলে সনাতনের আত্মীয়েরা কারাধ্যক্ষ মীর হাবুলকে সাত হাজার টাকা ঘুষ দিয়া

তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। মুক্তি পাইয়াই সনাতন ফকিরের বেশে দেশত্যাগ করিলেন। সঙ্গে চলিল বিশ্বস্ত ভৃত্য ঈশান।

গঙ্গা পার হইয়া দুইজনে পাতড়া পাহাড়ের নীচে একটি ছোট গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা সেই গ্রামে এক ভূঁইয়ার বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। পাহাড় পার হইলেই বিহার প্রদেশ। স্থির হইল যে শেষরাত্রে ভূঁইয়া তাঁহাদের পাহাড় পার করিয়া দিবে। এখন, হইয়াছিল কি, ঈশান আসিবার সময় পনেরোটি সোনার মোহর সঙ্গে আনিয়াছিল। কি করিয়া ভূঁইয়া তাহা টের পাইয়াছিল এবং স্থির করিয়াছিল যে গভীর রাত্রে দুইজনকে হত্যা করিয়া মোহরগুলি আত্মসাৎ করিবে। ভূঁইয়ার হাবভাব দেখিয়া সনাতনের কেমন যেন সন্দেহ হইতে লাগিল, তিনি ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশান, তোমার সঙ্গে অর্থ বা মূল্যবান্ কিছু আছে নাকি?" ঈশান বলিল, "হাঁ প্রভু, পথে কাজে লাগতে পারে মনে করে আমি পনেরটি সোনার মোহর নিয়ে এসেছি।"

এই কথা শুনিয়া

"ক্রুদ্ধ সনাতন তারে করিল ভৎ´সন।
সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম॥" চঃ চঃ

"দাও সব আমার হাতে এখনি।" মোহরগুলি লইয়া সনাতন ভূঁইয়াকে দিয়া বলিলেন, "ভদ্র, এই নাও আমাদের সঙ্গে যা কিছু ছিল। আমি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে চলেছি, কিন্তু যত গোল বাধিয়েছিল আমার সঙ্গীটি। এখন যত শীঘ্র পার আমাকে পাহাড় পার করে দাও, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"

সনাতনের কথায় ভূঁইয়া খুব খুসী হইল এবং ভোর রাত্রে তাঁহাকে পাহাড় পার করিয়া দিয়া আসিল। আসিবার সময় সে একটী মোহর সনাতনকে দিয়া বলিল, "আপনার ব্যবহারে বড়ই খুসী হলাম, এটী সঙ্গে রাখুন, কাজে লাগবে।"

সনাতন তখন সেই মোহরটি ঈশানের হাতে দিয়া বলিলেন, "বাবা, এখনো তোমার সঞ্চয়ের ভাব যায় নি, কাজেই এ পথে আসতে পারবে না। এই মোহরটি নিয়ে বাড়ী ফিরে যাও।"

ভৃত্য ঈশান সঙ্গে যাওয়ার জন্য কত কাঁদাকাটি করিল, কিন্তু সনাতন কিছুতেই তাহাকে সঙ্গে লইলেন না, সোজা চলিলেন মহাপ্রভুর উদ্দেশে।

তারপর কি হইল সে কথা আর একদিন বলিব।

মন্দিরে মন্দিরে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ত্রিচিনপল্লী।

প্রাচীন সহর। সম্রাট্ অশোকের শিলালিপিতে এই সহরের নাম পাওয়া যায়। তখন এই জনপদের নাম ছিল উরেউর। ত্রিচিনপল্লীর মাইল খানেক দূরেই এই জনপদ।

ত্রিচিনপল্লীর রক্ টেম্পল্ বা শৈল-মন্দির। সামনের পাহাড়টি সবটাই মন্দির, সবার উপরে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

এই সহরে অনেকবার অনেক যুদ্ধ হয়েছে। হিন্দুদের কাছ থেকে মুসলমান, মারাঠা, নিজাম, ফরাসী ও ইংরাজ প্রভৃতির কাছে কয়েকবার এই নগরটির হাতবদল হয়। সেই সব শাসকদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন অষ্টাদশ শতকের রাজা বিশ্বনাথ নায়েক। তিনি এখানকার মন্দিরটির সংস্কার করেন, নগরটিকে সুন্দর করেন।

নগরের মাঝেই রক্ ফোর্ট— শৈল-মন্দির।

দুশো তিয়াত্তর ফুট উঁচু একটা পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় একটি মন্দির। নীচে থেকে উপর অবধি বরাবর সিঁড়ি গেছে। পাহাড়ী সিঁড়ি। কিছুটা উঠলেই যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেই জন্য মাঝে মাঝে বিশ্রামের মণ্ডপ করা আছে। প্রথমেই একখানি বড় ঘর। তারপর সুরু হোল সিঁড়ি। পঞ্চাশটি সিঁড়ি ওঠার পর একটি মণ্ডপ। মণ্ডপে একশোটি

স্তম্ভ। এখানে স্তম্ভ কখনও মসৃণ সাধারণ স্তম্ভ হয় না, স্তম্ভ হলেই তার গায় কারুকার্য থাকবেই। দেয়ালেও অনেক দেবদেবীর চিত্র আছে।

আবার একশো দশটি সিঁড়ি। তারপর আবার একটি মণ্ডপ। এখানে দেয়ালের গায় একটি গল্পের ছবি দেওয়া আছে। রত্নাবলী নামে এক চেটী-বালিকা শ্বশুর-বাড়ীতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার মা থাকতেন কাবেরী নদীর অপর পারে। মায়ের কাছে খবর গেল। মা তখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু নদীর তীরে যখন এলেন তখন জলঝড় সুরু হয়ে গেছে। সেই দুর্যোগের মাঝে মা আর নদী পার হতে পারলেন না।

এদিকে মেয়েটি একান্ত ভাবে ভগবান্‌কে ডাকতে লাগলো। আপনভোলা মহেশ্বরের কানে সেই ডাক পৌঁছালো। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না, পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে রত্নাবলীর কাছে এলেন। পার্বতী এলেন রত্নাবলীর মায়ের রূপ ধরে। সারা রাত মেয়েটির সেবা করে তাকে সুস্থ করে সকাল বেলা হর-গৌরী চলে গেলেন।

পাহাড়ের উপর থেকে ত্রিচিনপল্লীর একাংশ; দূরে কাবেরী নদী

তখন জলঝড় থেমেছে। রত্নাবলীর মা এবার নদী পার হয়ে মেয়ের বাড়ী এলেন। বললেন—সারারাত নদীর তীরে বসে ছিলাম, পার হতে পারি নি।

মেয়ে তো অবাক্, বললো—তবে যে সারারাত তুমি আমার পাশে বসে ছিলে!

এবার তারা বুঝলো দেবতার করুণার কথা।

এই কাহিনী থেকে এখানকার দেবতার নাম মাতৃ-ভূদেবেশ্বর। আবার কেউ কেউ বলেন—মথুর ভূতেশ্বর।

একশো চল্লিশটি সিঁড়ি পার হয়ে সিঁড়ির পাশে পাওয়া গেল একটি জানালা। সেই জানালা দিয়ে নীচেকার সহরটি দেখায় ছবির মত। উড়োজাহাজ থেকে তোলা ছবি যেন!

একশো পঁচাশীটি সিঁড়ি উঠলে একটি মণ্ডপে লক্ষ্মীদেবীর এক মূর্তি আছে।

দুশো ষোলটি সিঁড়ি উঠলে শ্রীদুর্গা ও কার্তিকের মূর্তি ছোট ছোট মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত।

তিনশো ষাটটি সিঁড়ি পার হয়ে মূল মন্দির। এখানে শিব ও পার্বতী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের সামনে বৃহৎ এক বৃষমূর্তি। দেয়ালে নটরাজ-মূর্ত্তি, আর অনেক পৌরাণিক্ মূর্তি খোদাই করা আছে। মূল মন্দিরের আশেপাশে আরও অনেক দেবতা রয়েছেন। এখানকার জানালা দিয়ে বহুদূর অবধি দৃষ্টি চলে যায়, দূরে কাবেরী নদী ও শ্যামল বনরাজির দৃশ্য মনকে স্নিগ্ধ করে তোলে।

আরও উপরে উঠতে হোল। এতক্ষণ সিঁড়ি উঠছিলাম পাহাড়ের ভিতর দিয়ে, মাথার উপর ছাদ ছিল। এবার সিঁড়ি এলো পাহাড়ের গা বেয়ে। দুপাশে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা—একেবারে চূড়া অবধি। উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের এক বিশালকায় মূর্তি।

নীচে সমগ্র ত্রিচিনপল্লী। বাড়ীর ছাদ, গির্জার চূড়া, রেল-ষ্টেশন, পথ, শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির, জম্বুকেশ্বরের মন্দির, কাবেরীর পুল, পিছনে দিগন্তবিস্তারী বন-প্রান্তর, বিলীয়মান পাহাড়ের সারি, সব একাকার হয়ে গেছে। নীচে যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে উপর থেকে তা সমভূমির একটা বিচিত্র ব্যতিক্রম শুধু। নীচের বিরাটত্ব উপর থেকে নগণ্য, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ।

শৈল-মন্দির থেকে যখন নামলাম, তখন বেলা হয়েছে।

নতুন দিনের প্রার্থনা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এ

নতুন দিনে কর মোদের আনন্দে উছল,
আশীর্ব্বাদে মাগো, তোমার ফিরুক বুকে বল।
না হই যেন অবাধ্য আর,
পাই মা, ফিরে প্রীতি সবার,
মুছতে পারি সর্ব্বহারার দুই নয়নের জল।

চাই—হতে চাই পরিশ্রমী পিপীলিকার মত,
সাজ না করি কাজ করিব আমরা অবিরত।
কাটব পাথর, খুঁড়ব মাটি,
ধরব লাঙল পরিপাটি,
সার করিব সবাই মোরা আর্তসেবার ব্রত।

মৌমাছিদের মত মোরা কর্মী হতে চাই,
রবার্ট ব্রুসের অধ্যবসায় কেমন করে পাই!
সব্যসাচীর শক্তি দিয়ে,
তুলসীদাসের ভক্তি দিয়ে,
রামপ্রসাদের সুরে যেন দেশের গাথা গাই।

দক্ষিণারঞ্জন-স্মরণে

শ্রীপলাশ মিত্র

হাজার কচি-কাঁচার মনে তোমার স্বপনপুরী—
কল্পনার এক রঙ্গীন জগৎ : জাগালে বিস্ময়,
গল্প-কথার মালা গাঁথায় নেইকো তোমার জুড়ি,
ঝুলি তোমার সোনার খনি,—তাতেই সে সব রয়।

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি কে ছোঁয়াবে আর ?
রাজকন্যে হারিয়ে গেল—নেইকো বরণডালা,
রূপকথারই রাজার রাজা, তোমায় বারে বার
প্রণাম জানাই, চরণে দিই স্নেহপ্রীতির মালা।

রূপকথার দক্ষিণারঞ্জন

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদার

হারিয়ে গেছ সত্যি কি আজ ?—হারাও নি ত' তুমি,
স্বপ্ন হলেও সত্যি হয়ে ভাস্‌ছ সবার চোখে ;
মা-ঠাকুমার মুখে মুখে গল্প-গাথা-লোকে
রূপকথাতে তোমার স্মৃতির বাজ্‌ছে যে ঝুমঝুমি !

ঘুমায় মানুষ, আবার জাগে—ঘুম আর জাগার পালা,
ঘুম ভাঙ্গানো, ঘুম পাড়ানো—মন ভুলানো কথা,
স্পর্শে তোমার যাদুর কাঠির ঘুচিয়ে সকল ব্যথা—
তেম্‌নি ধারা ঘুমায়, জাগে তোমার কথার মালা।

আমরা যুবা ছিলেম শিশু,—ভাবীকালের যারা
আস্‌বে পেয়ে নতুন নতুন এই ধরণীর আলো,
মোদের মতো তেম্‌নি তারা বাস্‌বে তোমায় ভালো,
তাদের মনের নীল আকাশে তুমিই ধ্রুবতারা !

শ্রী মনিলাল অধিকারী

[পূর্ব্বকথা : বন্ধু সুজিতের আমন্ত্রণে বিখ্যাত অপরাধবিজ্ঞানী তাপস চৌধুরী ওদের সুন্দরবনের জঙ্গল-কুঠিতে এল রহস্যময় লাল শঙ্খ চুরির তদন্তে—যার মধ্যে নাকি সুজিতের পূর্ব্বপুরুষ জঙ্গল-কুঠির প্রতিষ্ঠাতা বসন্ত রায় গুপ্তধনের নিশানা দিয়ে গেছেন ব'লে কিংবদন্তী আছে। এই বসন্ত রায় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু হলুদ-কুঠির প্রতিষ্ঠাতা মতিলালের সঙ্গে জুয়া খেলতে বসলে ঝগড়া হয় এবং দু'জনেই নিখোঁজ হন। পরে বসন্ত রায় এক রাতের জন্য গোপনে ফিরে এসে এই লাল শঙ্খ ও একটা চিঠি রেখে ফের নিরুদ্দেশ হন। মতিলাল মৃত বলে জানা যায় কিন্তু তাঁর মৃতদেহের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। তদন্তে পাওয়া গেল চিন্তাহরণ রায় নামে এক অপরিচিতের চিঠি—সুজিতকে লেখা ; সে-ই যে লালশঙ্খ নিয়েছে তা সে জানিয়েছে চিঠিতে। তাপসের তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে ও তার সহকারী মলয়ের সাহায্যে বেরিয়ে পড়ল যে এই চিন্তাহরণ আসলে মতিলালের নাতি বিজয়ের দৌহিত্র—তরুণ বিজ্ঞানী অরুণকুমার, হলুদ-কুঠির বর্ত্তমান মালিক। সুজিতের তোলা লাল শঙ্খের একটা পুরোনো ফটো এন্‌লার্জ করে পাওয়া গেল জলটুঙ্গির ছবি আর এক হেঁয়ালী ছড়া। তাপস হেঁয়ালীর অর্থ উদ্ধার করল, তারপর তিনজনে গুপ্তধনের খোঁজে জলটুঙ্গিতে গিয়ে সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান পেল। সেখানে ঢুকে আড়াল থেকে দেখল তাদের আগেই অরুণকুমার সেখানে এসে গুপ্তধনের সন্ধান করছে। অরুণকুমারকে কিন্তু ওখানে গুপ্তধন না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হ'ল। তারপর…]

—বারো—

তারপর দু'দিন কেটে গেছে।

দু'দিন একেবারে নীরব হয়ে গেছে তাপস। দক্ষিণের বারান্দায় ঈজিচেয়ারের উপর দেহ

এলিয়ে দিয়ে বসে থাকে সুদূর নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে। কারুর সঙ্গে কথা বলে না। শুধু নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে।

তাপসের সামনে ছোট্ট একটা টিপয়ের উপর রয়েছে লাল শঙ্খের এন্‌লার্জ করা ফটো আর বসন্ত রায়ের লেখা জীর্ণ চিঠিটা।

এন্‌লার্জ করা ফটোটা চোখের সামনে তুলে ধরে তাপস। পরীক্ষা করে গভীর মনোযোগ দিয়ে। তারপর ফটোর দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে—অনেকক্ষণ ধরে।

তাপসের মনের গভীরে বসন্ত রায়ের লেখা চিঠির একটি নির্দেশ বার বার উদয় হতে থাকে। ...'শঙ্খের কারুকার্য্যের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিও কিন্তু কাহাকেও দেখাইও না।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় তাপস। বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পায়চারি করে ঘুরে বেড়ায় চিন্তিত মনে।

বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে সুজিতকে আসতে দেখে তাপস স্থির হয়ে দাঁড়াল।

—'তোকেই মনে মনে খুঁজছিলাম।'

সুজিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকায় তাপসের দিকে।

—'দেখ সুজিত, লাল শঙ্খটা আমাদের চাই-ই। লাল শঙ্খটা না পেলে নতুন করে বসন্ত রায়ের গুপ্তধনের অনুসন্ধান করা একেবারে অসম্ভব।'

—'কিন্তু সেটা তো? অরুণকুমারের কাছে আছে।'

—'তা আমি জানি। অরুণকুমারের কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে।'

—'কিন্তু কি উপায়ে?'

—'যে কোন উপায়ে। যেমন করে হোক শঙ্খটা আমাদের চাই।'

—'বেশ। আমাকে কি করতে বল?'

একটু চিন্তা করে নিয়ে তাপস জিজ্ঞাসা করল,—'অরুণকে এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে?'

—'খুব সম্ভব পাওয়া যাবে। অরুণ সাধারণতঃ এ সময় বাড়িতেই থাকে।'

—'তাহ'লে যাওয়া যাক চল।'

—'কোথায়?'

—'কোথায় আবার? হলুদ-কুঠিতে। অরুণের সঙ্গে দেখা করে আসি চল।'

—'এখুনি?'

—হ্যাঁ, এই মুহূর্ত্তে।'

তাপস আর সুজিত অরুণের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলে তক্ষুনি।

জঙ্গল-কুঠি আর হলুদ-কুঠির গঠন একই ধরণের—একই আকৃতির। বিশাল বিশাল থাম-ওয়ালা সেকেলে ধরণের উঁচু চত্বরের ওপর বিরাট দ্বিতল অট্টালিকা।

অরুণের ভৃত্য মধুর দেখা পাওয়া গেল সদর দরজায়।

সহাস্য অভ্যর্থনা জানাল মধু সুজিতকে। বলল,—'আসুন বড়বাবু, আসুন!'

সুজিত জিজ্ঞাসা করল, 'অরুণ বাড়িতে আছে মধু?'

মধু বলল, 'আছেন। আপনারা বসুন, আমি বাবুকে খবর দিই গে।'

অল্পক্ষণ পরে মধু ফিরে এল। বলল, 'আপনারা আসুন—বাবু দোতালায় লাইব্রেরী ঘরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

দোতালার প্রকাণ্ড হল্ ঘরটা অরুণকুমারের লাইব্রেরী।

একটা প্রকাণ্ড টেবিলের ওধারে বসে ছিল অরুণকুমার। সুজিত আর তাপসকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে উঠে দাঁড়াল সে। অভ্যর্থনা জানাল হাসিমুখে। বলল, 'আসুন মামাবাবু, বসুন।'

সুজিত আর তাপস আসন গ্রহণ করলে অরুণকুমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তকাল সুজিতের দিকে।

সুজিতই প্রথম কথা বলল—'প্রথমে আমার বন্ধু তাপস চৌধুরীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই অরুণ। এর নাম হয়ত তুমি পূর্ব্বে শুনে থাকবে।'

নমস্কার বিনিময়ের পর অরুণ বলল,—'তাপসবাবুর নাম আমি পূর্ব্বে বহুবার শুনেছি—এতদিন পরে আলাপ করবার সৌভাগ্য হল!'

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো অরুণকুমার। বলল,—'তারপর তাপসবাবু আপনি এমন দিনে আমাদের বুনো দেশে বেড়াতে এলেন, না ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে?'

তাপসের ঠোঁটজোড়ায় রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। বলল,—'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন অরুণবাবু। বেড়াবার মত অবসর পেলুম কৈ? অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।'

বিস্মিত হয়ে অরুণ জিজ্ঞাসা করল,—'অর্থাৎ আপনি এখানে এসেছেন কোন অজানা রহস্যের অনুসন্ধানে?'

অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিল তাপস,—'আপনার অনুমান সত্য।'

—'খুন, না ডাকাতি?'

—'খুন-ডাকাতি নয়, ছোটখাট একটা চুরির তদন্ত-ভার নিয়ে এখানে এসেছি। অবশ্য চুরিটা সাধারণ হলেও ওর মধ্যে যথেষ্ট বিশষত্ব আছে।'

—'তাই নাকি? অদ্ভুত তো! কিন্তু অমন একটা অনন্যসাধারণ চুরির ঘটনা সম্প্রতি আমি তো শুনি নি! আশপাশে কোথাও নয় নিশ্চয়ই?'

—'আপনি হয়তো শোনেন নি, কিন্তু চুরি হয়েছে আপনার বাড়ীর পাশেই।'

—'পাশে, মানে জঙ্গল-কুঠিতে?'

—'হ্যাঁ। কয়েকদিন পূর্ব্বে সুজিতের বাড়ীতে চুরি হয়েছে।'

তাপস সোজাসুজি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল অরুণের দিকে।

বিস্ময়ে যেন অবাক্ হয়ে গেল অরুণ। বলল,—'কয়েকদিন পূর্ব্বে সন্ধ্যায় সুজিত মামার খড়ের গাদায় কে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল শুনেছি—কিন্তু চুরি হয়েছে এ কথা তো শুনি নি!'

—'চোর নিজেই খড়ের গাদায় আগুন লাগায়। আগুন নেভাবার জন্যে বাড়ির সবাই যখন খুবই ব্যস্ত—সেই অবসরে চোর চুরি করে সরে পড়ে।'

—'অদ্ভুত তো! বুদ্ধিমান চোর সন্দেহ নেই। কিন্তু কি চুরি হয়েছে—টাকা না সোনা-দানা?'

—'ও সব কিছু চুরি করে নি চোর। চুরি গেছে শুধু একটা লাল শঙ্খ।'

– 'লাল শঙ্খ!'—অরুণ আশ্চর্য্য হবার ভান করল।

—অবাক্ হচ্ছেন কেন অরুণবাবু? লাল শঙ্খের কিংবদন্তীর কাহিনী নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন?'

টেবিলের উপর একধারে একটা মাঝারি সাইজের গ্লোব ছিল। অরুণ গ্লোবটি কাছে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগল। তারপর আবার কি মনে করে গ্লোবটা যথাস্থানে সরিয়ে রাখল। বলল,—লাল শঙ্খের কাহিনী আমার শোনা আছে। খুবই চিন্তার কথা তাপসবাবু! শঙ্খটা খোয়া গেল! আমাদের উভয় পরিবারের অনেক কিছু প্রাচীন স্মৃতিজড়িত লাল শঙ্খ। তা— চোরের কোন সন্ধান পেলেন?'

গ্লোবটা আবার কাছে টেনে নিলে অরুণ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার বাংলা দেশের মানচিত্রটার উপর দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

তাপস উত্তর দিল,—'চোরের সন্ধান পেয়েছি।'

গ্লোবটা যথাস্থানে রেখে অরুণ জিজ্ঞাসা করল,—'চোরের সন্ধান পেয়েছেন?'

—'হাঁ পেয়েছি। শিক্ষিত, মাজিতরুচি এক তরুণ শঙ্খটা চুরি করেছে। নাম চিন্তাহরণ রায়।'

—'চিন্তাহরণ?—অদ্ভুত নাম তো!'

—'অবিশ্যি চিন্তাহরণ নামটা যুবকের আসল নাম নয়—ওটা ছদ্মনাম।'

—'ছদ্মনাম? তাহ লে চোরের আসল নামটাও জানতে পেরেছেন নিশ্চয়ই?'

—'হ্যাঁ, জানতে পেরেছি। চোরের আসল নাম অরুণকুমার, বর্ত্তমান হলুদ-কুঠির মালিক।'

—'আপনি কি বলছেন তাপসবাবু!' প্রায় চীৎকার করে উঠল অরুণ।

—'উত্তেজিত হবেন না – বসুন স্থির হয়ে। যা সত্যি আমি তাই বলেছি। শঙ্খটা যে আপনি চুরি করেছেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আমার হাতে আছে। এমন সব প্রমাণ—যার সাহায্যে চুরির দায়ে আপনাকে স্বচ্ছন্দে বছর পাঁচেক জেল খাটান যায়।'

তাপসের কথা শুনে উত্তেজিত অ ণ শান্ত হয়ে পড়ল। চুপ করে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বলল,—'আমি শঙ্খ চুরি করেছি—প্রমাণ যখন পেয়েছেন তখন সেই প্রমাণের সাহায্যে আমাকে জেলে দেবার বন্দোবস্ত করুন গে।'

তাপস মৃদু হাসল, বলল,—'কিন্তু সুজিত আপনাকে পুলিশের হাতে দিতে চায় না।

—'সুজিত মামা কি চান?'

—'সুজিত শঙ্খটা ফেরত চায় শুধু।'

—'শঙ্খটা কি হিসেবে ফেরত চান সুজিত মামা? শঙ্খটার উপর সুজিত মামার যতটুকু দাবী আছে ঠিক ততটুকু দাবী আমারও আছে। শঙ্খের বর্ণিত তথাকথিত গুপ্তধনের মালিক তো আমার

পূর্ব্বপুরুষ মতিলাল। মতিলালকে খুন করে বসন্ত রায় অন্যায় ভাবে রত্নসিন্দুক আপন অধিকারে এনেছিলেন। সে অন্যায়ের প্রতিকার এতদিন হয় নি। শঙ্খটা ঠিক চুরি করি নি আমি, কৌশলে আমি আমার পূর্ব্বপুরুষের হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেছি মাত্র। শঙ্খটা হয়ত আমি এমনি সুজিত মামাকে ডাকে ফেরত পাঠাতাম, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়।' একটু থেমে অরুণ আবার বলল,—'দেখুন তাপসবাবু, শঙ্খের রহস্যময় হেঁয়ালীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমি গুপ্তস্থান অনুসন্ধান করে দেখেছি, কিন্তু রত্নসিন্দুকের সন্ধান পাই নি। শঙ্খের গুপ্তধনের কাহিনী অবিশ্বাস্য, উদ্ভট কল্পনা বলেই আমার ধারণা হয়েছে। কাজেই আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম শঙ্খটা ফেরত পাঠাব সুজিত মামাকে। কিন্তু আপনার মত চতুর, বুদ্ধিমান্ লোক যখন শঙ্খটা সম্পর্কে এতখানি আগ্রহ প্রকাশ করছেন—তখন আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে, হয়ত শঙ্খটার পেছনে কিছু সত্য লুকান আছে। সুতরাং আর একবার ভাল করে শঙ্খের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করব। কাজেই—'

—'কাজেই শঙ্খটা আপনি এখন ফেরত দেবেন না?'

– 'না।' অত্যন্ত স্পষ্টকণ্ঠে অরুণ জবাব দিল।

—'এই আপনার শেষ কথা?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু শঙ্খটা যে আমাকে পেতেই হবে অরুণবাবু!'

—'ক্ষমতা থাকে চেষ্টা করে দেখুন।'

—'বেশ, তাই হবে।'

তাপস উঠে দাঁড়াল। সুজিত নীরবে তাপসকে অনুসরণ করল। (ক্রমশঃ)

রূপকথার যাদুকর দক্ষিণারঞ্জন

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

তখনও ইস্কুলে ভর্ত্তি হই নি। বাড়ীতে বাবার কাছে বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' পড়ি আর দাদার কাছ থেকে, দিদির কাছ থেকে, পাড়ার এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়ি যোগীন সরকারের ছড়া-কবিতার বই, মনোমোহন সেনের মোহনভোগ, সুখলতার রাওয়ের আরো গল্প ইত্যাদি। কিছু কিছু বই নিজেরও আছে। তার মধ্যে 'লঙ্কাকাণ্ড' আর 'আষাঢ়ে স্বপ্ন' যে কতবার পড়েছি তার ঠিক নেই! তা ছাড়া উপেন্দ্র-কিশোর-সুকুমারের 'সন্দেশ'ও তখন বেরুতে সুরু করেছে। ঠিক এমনি দিনে ছোড়দির মুখে শুনলাম দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুমার ঝুলি'র গল্প।

ছোট মফঃস্বল সহরে থাকি। বইএর দোকান নেই বললেই হয়। যা দু'-একটা

আছে তাতে পছন্দ মত বই পাওয়া ভার। তারা বলল, অর্ডার দিলে এনে দিতে পারি। কিন্তু তত্ত দিন ধৈর্য্য ধরব কেমন করে? এমন সময় আমার এক অল্পবয়সী স্কুলে-পড়ুয়া কাকা এসে খবর দিলেন—ওখানকার পাব্লিক্ লাইব্রেরীতে যে গোণা তিনখানা ছোটদের বই আছে তার মধ্যে ঠাকুমার ঝুলি একখানা।

অনেক কাকুতিমিনতি, আবেদন-নিবেদনর পর অনুমতি পাওয়া গেল বইখানা আনবার। তবে কথা রইল, একদিনের বেশী ও বই আটকে রাখতে পারব না। বাড়ীতে বই পড়ার লোক অনেক, লাইব্রেরী মাত্র একটি, আর বইও আসে মাত্র একখানি ক'রে। কাজেই—! না, ছোটদের আব্দার একদিনের বেশী রাখা যাবে না।

রূপকথার যাতুকর ৺দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

তাই সই। দুপুরে বাবার দেওয়া অঙ্কের টাস্ক্ আর হাতের লেখা কোন রকমে শেষ করে খুলে বসলাম 'ঠাকুমার ঝুলি'। ওঃ, সেদিনকার সেই উত্তেজনার কথা কোন দিন ভুলব না। কখন বেলা গড়িয়ে বিকেল হ'ল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হ'ল, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হ'ল—টেরই পেলাম না। মা'র ধমকে কোন রকমে মুখে দু'টো ভাত গুঁজে আবার বই নিয়ে বসলাম।

রাত ক্রমে গভীর হতে লাগল। বাড়ীর সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন, শুধু টেবিলের ওপর টাইম্‌পাস্ ঘড়িটা নিজের মনে টিক টিক্ করে চলেছে; আর আমি উল্টে যাচ্ছি পাতার পর পাতা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছি —সূতোর মত সরু সূতাশঙ্খ সাপ কি করে দেখতে দেখতে বিরাট আকার নিয়ে, বত্রিশ ফণা ছড়িয়ে, বিষ দাঁতে আগুন ছুটিয়ে, লক্ লক্ করে

উঠল, সঙ্গে সঙ্গে 'যক্ষ হও, রক্ষ হও, তরোয়াল তোমাকে ছুঁইবে।'—ডালিমকুমারের তলোয়ার ঝন্ ঝন শব্দে ঝাড়বাতি ভেঙ্গে বত্রিশ ফণায় গিয়ে লগল—সাপ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। ওদিকে বসন্ত চলেছেন গজমোতির সন্ধানে ক্ষীরসাগরে—যেখানে 'ক্ষীরের ঢেউ ঢল্ ঢল্ করে'। সেখানেই আছে দুধের বরণ হাতী—তার মাথায় গজমোতি।...কাল্-অজগর মণি হারিয়ে পাগল হয়ে গেছে – তোলপাড় করছে বন। দুই বন্ধু মণির আলোয় সরোবরের জল দু'ফাঁক করে নেমে চলেছেন পাতালকন্যা মণিমালার দেশে।...“উত্তর পূব পূবের উত্তর মায়া-পাহাড়”—তারই বর্ণনা দিতে দিতে চলেছেন সন্ন্যাসী। ...এদিকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে গা-ময় সূঁচ পা-ময় সূঁচ রাজার কি করুণ অবস্থা! কে এসে তাঁকে রক্ষা করবে? আর সেই অদ্ভুত ছবিগুলি।—'জোড়া রাজপুত্র শন্ শন্ করিয়া চলিয়া গেল।' 'রণমূর্ত্তি সৎমা গালিমন্দ দিয়া খেদাইয়া দিল.' 'বাঁচাও বাঁচাও বন্ধু, জন্মের মত গেলাম!' 'হটর হটর পবনের না,' 'পেঁচোর নৃপ' আর 'জিভ লক্ লক্'। তখন জানতাম না,—যে কলমের এই যাদুশক্তি, ঐ ছবির আঁচড়ও সেই একই কলমের।

এক রাতে বই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মনের কোণে তার স্মৃতি জমাট বেঁধে রয়ে গেল। আজও তা অম্লান হয়ে অছে।

এই ঠাকুমার ঝুলি যাঁর কলম থেকে বেরিয়েছে তিনিই দক্ষিণারঞ্জন। পূরো নাম দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। দক্ষিণারঞ্জনের বাল্যকথা, এই কিছুদিন মাত্র আগে, ধারাবাহিক ভাবে রামধনুতে বেরিয়েছিল। তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। ১২৮৪ সালের ২রা বৈশাখ ঢাকা জেলার কর্ণপাড়া গ্রামে এক জমিদার-বংশে তাঁর জন্ম হয়। এঁদের পূর্ব্বপুরুষ নাকি ছিলেন স্বাধীন রাজা। অল্প বয়সেই দক্ষিণারঞ্জন চলে আসেন ময়মনসিংহে, তারপর মুর্শিদাবাদে। এবং শেষে স্থায়ী ভাবে বসবাস সুরু করেন কলকাতায়। সারা জীবন সাহিত্যের সাধনায়ই তাঁর কেটেছে,—ছোটদের সাহিত্যে। রূপকথা রচনায় তাঁর সমকক্ষ এ পর্যন্ত হয় নি। ঠাকুরমার মুখের ভাষাটুকু শুধু নয়—তার মধুর সুরটুকুও তিনি সাহিত্যের পাতায় ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। শুধু এদেশে নয়, গোটা বিশ্ব-সাহিত্যেও এ রকম বই বেশী নেই বলে আমার ধারণা। তাঁর লেখা সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন “এখনকার কেতাবী ভাষায় ঐ সুরটি বজায় রাখা বড় শক্ত।—আমি হইলে তো এ কাজে সাহসই করিতাম না।”

দক্ষিণারঞ্জন শুধু গল্প বলতেই অদ্বিতীয় ছিলেন না, ছড়া-কবিতার হাতও ছিল তাঁর চমৎকার। আর আঁকতে পারতেন ছবি। তাঁর সমস্ত বইএর ছবি নিজের হাতে না আঁকলে তাঁর তৃপ্তি হ'ত না। এই শিল্পী-মন ও কবি-মন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও পূরোপূরি প্রকাশ পেয়েছিল। এবারে সেই কথা বলি।

প্রায় বছর পঁচিশেক আগের কথা। রামধনুর পরিচালনায় আমায় যথেষ্ট অংশ নিতে হ'লেও এর সম্পাদনা-ভার তখন ছিল আমার ছোড়দা ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ওপর। ঐ সময় হঠাৎ একদিন রামধনু অফিসে একখানা মজার চিঠি এল। চিঠিখানার শিরোনামায় বেগুনী কালি দিয়ে ঠিকানা লেখা। চিঠির ভেতরটা সবুজ কালি দিয়ে লেখা, আর তলায় নাম স্বাক্ষর করা লাল কালিতে। তার পরও একটা পুনশ্চ ছিল,—সেটা নীল কালিতে লেখা। চিঠির একটি লাইন আমার আজও মনে আছে—"রামধনুতে সেবার যে সুরটি ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে আমার হৃদয়রক্তের খানিকটা তাহার সহিত মিশাইয়া দিতে চাই।"—চিঠির লেখক আর কেউ ন'ন,– শিশুসাহিত্য-সম্রাট্ দক্ষিণারঞ্জন।

ছোড়দা বোধ হয় তখন বি. এ পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন (এই সময়টা তাঁর খাওয়াদাওয়া জ্ঞান থাকত না—যাকে বলে বাইরের জগৎ থেকে একদম "কাট্ অফ্"। এত খুঁতখুঁতে ছিলেন তিনি এই ব্যাপারে—পাছে কারও খাতা দেখতে গিয়ে ন্যায়বিচারে একটু গাফিলতি হয়!) কাজেই আমিই চললাম গুটি গুটি এক সেট রামধনু হাতে নিয়ে। ভাবলাম, এত বড় সাহিত্যিক, না জানি কী ভাবে নেবেন আমাকে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম অদ্ভুত মানুষ! মুহূর্তের মধ্যে আপনার করে নিলেন যেন! সঙ্গে সঙ্গে জলযোগ আর সরবতেরও ব্যবস্থা হ'ল। জমিদার-বাড়ী থেকে কি কেউ না খেয়ে খালি মুখে যেতে পারে? যদিও সে জমিদারী তখন আর নেই।

তারপর অযাচিত ভাবে লেখা আসতে লাগল রামধনুর জন্য। বেশীর ভাগই কবিতা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে লেখা। রামধনুর পাতা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল কথাসাহিত্য-সম্রাটের রচনা বুকে নিয়ে। আর সেই সুযোগে সুরু হ'ল তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

গল্প করতে ভারী ভালবাসতেন দক্ষিণারঞ্জন। যখনই যেতাম দেড় ঘণ্টা—ত্ব'ঘণ্টার আগে ছাড়া পেতাম না। কত গল্প হ'ত! তাঁর নিজের কথা—শৈশবের, বাল্যের কলেজ-জীবনের। সাহিত্যের কথা হ'ত, সাহিত্যিকদের কথা হ'ত। মনে পড়ে একবার গল্প করেছিলেন তাঁর স্কুল-জীবনের। তখন থাকতেন ময়মনসিংহের এক সহরে, হোষ্টেলে। বই পড়ার খুব নেশা, কিন্তু তখনকার দিনে তো বই এত বেশী ছিল না—এত সহজ-লভ্যও ছিল না। ভাল বই বলতে ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বই। সে বইগুলো গোগ্রাসে গিলতেন তিনি। সবচেয়ে ভাল লাগত আনন্দমঠ। অথচ ঐ বইটাকেই তখন, রাজনৈতিক কারণে, সরকার ভীষণ ভয়ের চোখে দেখতেন। তোমারা বোধ হয় জান, ওরই মধ্যে আছে বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' গানটি। ওঁদের স্কুলের হেড্ মাষ্টার মশাইও ছিলেন উগ্র রাজভক্ত। রাজা মানে—ইংরেজ রাজা! একদিন কি একটা কারণে

হোষ্টেলের সমস্ত ছাত্রের বাক্স-পেঁটরা খানাতাল্লাস করা হ'ল। যে জিনিষের জন্য খানাতাল্লাসী তা মিলল না, কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের বাক্সে পাওয়া গেল তার চেয়েও 'মারাত্মক' একটি জিনিষ—একখানি আনন্দমঠ। হেড মাষ্টার মশাই আঁৎকে উঠলেন। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনও সহজে রেহাই পেলেন না। বিচার হ'ল এবং হল্ ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে বেত মারা হ'ল। দক্ষিণারঞ্জনের বয়স তখন বছর বারো হবে। গল্প করতে করতে মৃত্থ হেসে বললেন, "আমাদের ছেলেবেলায় ঐ রকমই ছিল দেশের অবস্থা।"

ঠাকুমার ঝুলি সম্বন্ধে স্বভাবতঃই অনেক গল্প হয়েছে। "ঐ সব গল্প সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছে আমাকে। শেষে বই তো লিখে ফেললাম এবং দিলাম পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথকে। বই দেখে রবীন্দ্রনাথ ভারী খুসী। তখনই ডেকে পাঠালেন তাঁর কাছে। সেই থেকে তাঁর সঙ্গে হয় ঘনিষ্ঠতা। অনেক দিন ছিলাম তাঁর সঙ্গে একত্র শান্তিনিকেতনে।" হাসতে হাসতে বলেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন।

তারপর ছবি। "রূপকথার সঙ্গে ছবি যদি তাল রেখে না চলতে পারে তবে রূপকথার অঙ্গহানি হবেই। তাই এ ভার আমি আর কারুর ওপর দিয়ে ভরসা পাই নি—নিজেই এঁকেছি সমস্ত ছবি। ওর জন্য অনেক ভাবতে হয়েছে - অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছে। সব চেয়ে মুশ্‌কিল ছিল—এখনকার মত সে আমলে ছবি ব্লক্ করার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। কাঠের ওপর খোদাই করে ব্লক্ তৈরী করতে হ'ত। এ জন্য রঙ্গিন ছবি করা খুবই কঠিন ছিল। ঠাকুমার ঝুলির প্রথম ছবিটা (নাও নাও, আমায় নাও, ফুল নাও, ধনুক নাও!) তৈরী করতে কত যে বেগ পেতে হয়েছিল—তা আর বলতে! সেই বোধ হয় এ দেশে প্রথম ছাপা রঙ্গিন ছবি।

দক্ষিণারঞ্জন অভিজাত পরিবারের সন্তান। সে ভাবটা তাঁর চালচলনে সর্বদাই প্রকাশ পেত। বাড়ীতে দেখা করতে গেলে প্রায়ই ৫।১০ মিনিট অপেক্ষা করতে হ'ত। প্রথম প্রথম অবাক্ লাগত, বলতে কি, একটু বিরক্তই হ'তাম। কিন্তু কারণ জানবার পর আর কিছু মনে হ'ত না। কারো সঙ্গে দেখা করতে হ'লে জমিদারসুলভ সাজসজ্জা না করে তিনি দেখা করতেন না। তাই বাড়ীতে গেলেও দেখতাম, কোঁচান ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, কাঁধে পাট করা চাদর, হাতে বাঁধান লাঠি—পরিপাটি পোষাক প'রে 'তৈরী হয়ে' তবেই তিনি নেমে আসছেন। ওপরের ঘরে গেলেও দেখতাম—ঠিক ঐ পোষাকে খাটে বসে তিনি অতিথির জন্য অপেক্ষা করছেন। নিজের বাড়ীতে ওভাবে কেউ থাকে না। কিন্তু ওইটিই ছিল ওঁর আভিজাত্য-বোধের নমুনা।

আভিজাত্য-বোধের সঙ্গে সৌজন্য-বোধের কথাও না বললে চলে না। কথাবার্তায়, চালচলনে সেটা ফুটে উঠত। 'কে আছিস, পাখা আন্, পান আন, খাবার আন!'—এ সব

তো ছিলই, কখনও কোন সভায় নিমন্ত্রিত হলে এবং না যেতে পারলে অতি সুন্দর একখানি চিঠি পাঠিয়ে দিতেন। কোনও সভায় তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে অথচ এমন চিঠি আসে নি—এ কখনও ঘটে নি। কেউ প্রশংসা করলে, শ্রদ্ধা জানালে ছোট ছেলের মত খুসীতে উপচে উঠতেন। মনে আছে, একবার, যখন শিশুসাহিত্য-পরিষদ থেকে শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তাঁকে ভুবনেশ্বরী স্বর্ণপদক দেওয়া হয় তখনকার কথা। আমি তখন ছিলাম ঐ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। দক্ষিণারঞ্জনকে গিয়ে যখন কথাটা বললাম তখন শিশুর মত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। তার পর যখন জানালাম, স্বয়ং গভর্ণর নিজে হাতে পদক পরিয়ে দেবেন (সেই সময়টায় দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে) তখন আরও খুসী। বললেন, "এই ঠিক হয়েছে। এই রকমই হওয়া উচিত। গুণীকে সংবর্দ্ধনা জানানো হচ্ছে রাজার কাজ। অভাবে তাঁর প্রতিনিধি।" এই সভায় দীর্ঘ বক্তৃতা লিখে নিয়ে গিয়ে পড়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন। পড়ার পর কাগজটা আমার হাতে দেন। দেখলাম তাতে শুধু বক্তৃতাটা লেখাই নেই, কোথায় কতক্ষণ থামতে হবে, কোথায় জোরে পড়তে হবে, কোথায় গলার স্বর নামাতে হবে—সমস্ত নির্দেশ করা আছে চিহ্ন দিয়ে।

ঠাকুমার ঝুলি ছাড়া আরও অনেক বই লিখে গেছেন দক্ষিণারঞ্জন। তার মধ্যে 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'. 'দাদামশায়ের থলে', 'ঠানদির থলে' এবং 'চারু ও হারু'ও কম জনপ্রিয় নয়। বাকি বইগুলির বেলায় তিনি কিছুটা নতুন ভঙ্গীর অনুসরণ করেছিলেন -- সেজন্যই হয়তো লোকের কাছে আগের তুলনায় সেগুলি তত হৃদয়গ্রাহী হয় নি। কিন্তু কি আসে যায় তাতে? 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো'র লেখক ড্যানিয়েল ডিফো, 'য়্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডের লেখক লুই ক্যারল, 'আঙ্কল টম্‌স্ কেবিনের' লেখিকা মিসেস্ ষ্টৌ—এঁরা তো একখানা করে বই লিখেই জগৎ মাতিয়ে গেছেন! তাঁদের অন্যান্য বইএর কথা খুব কম লোকেই জানে। দক্ষিণারঞ্জনেরও ঠাকুমার ঝুলিই তাঁকে অমর করে রাখবে।

দক্ষিণারঞ্জন আজ নেই। শেষ জীবনে তিনি অনেক শোকতাপ পেয়ে গেছেন—দীর্ঘায়ু হলে যা অবশ্যপ্রাপ্য। কিন্তু রূপকথার রাজ্যে—ছোটদের মনের রাজ্যে তাঁর আসন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

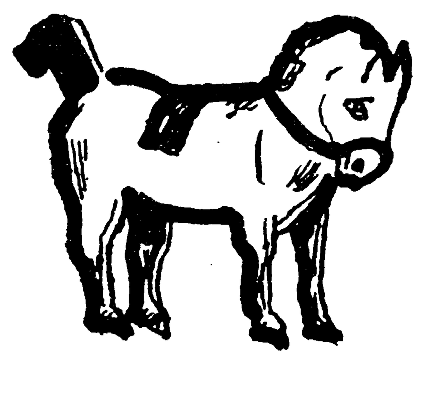

ম্যাজিক শেখ

যাদুকর এ. সি. সরকার

— টেক্কার সার্কাস —

টেক্কার সার্কাস! যাদুকর হয়ে আমি হঠাৎ সার্কাসের কথা কেন লিখতে বসলাম? মনে মনে তোমরা তো তাই ভাবছ? জানি আমি সে কথা। ব্যাপারটা অনেকটা ঠিক সার্কাসেরই মতন কিনা। যাদুকরের হাতে আছে এক প্যাকেট তাস। এই প্যাকেট থেকে তিনি বেছে নিলেন একটি টেক্কা—হরতনের টেক্কা। এই টেক্কা হাতে নিয়ে যাদুকর সুরু করে দিলেন তাঁর বক্তৃতা,— "ভদ্রমণ্ডলী, আমার হাতে এই যে টেক্কাটি আপনারা দেখছেন এটি বিশেষ গুণসম্পন্ন। এ সার্কাসের কসরৎ জানে। আপনারা জানেন যে তাস কখনও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। দাঁড় করিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা পড়ে যায়। কিন্তু আমার হাতের এই টেক্কাটিকে দাঁড় করিয়ে দিলে এ পড়ে যায় না, ব্যালান্স করে দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, একটি জলভর্ত্তি ছোট কাচের গ্লাস যদি এর উপরে বসিয়ে দেওয়া যায় তবে সেটিকেও মাথার উপরে নিয়ে এ ব্যালান্স করে রাখতে পারে।" এই কথা বলে যাদুকর তাঁর হাতের তাসটিকে টেবিলের উপরে দাঁড় করিয়ে দেন। তাসটি কিন্তু পড়ে যায় না মোটেই, সোজাসুজি দাঁড়িয়ে থাকে। এর পর একটা জলভর্ত্তি কাচের গ্লাস নিয়ে যাদুকর সেটিকে বসিয়ে দেন ঐ দাঁড়ানো তাসের মাথায়। অবাক্ হয়ে দেখেন সবাই যে তাসটা একটুও নড়ে না, পড়েও যায় না। বলা বাহুল্য গ্লাসটিও যথারীতি তাসের মাথার উপরে বসে থাকে।

কেমন করে এই অদ্ভুত খেলাটি তোমরাও দেখাতে পারো তাই এবারে বলছি, শোন।

তাসটিকে দেখতে অতি সাধারণ মনে হলেও আসলে কিন্তু তাতেই করা থাকে কারসাজি। একটি তাসের পেছনে আর একটি তাস কৌশলে জুড়ে দিলেই এই খেলা দেখানো সম্ভব হয়। দুটো তাস নেবে একই প্যাকেট থেকে। এখন, প্রথম তাসের (টেক্কার) পেছনের দিকের অর্দ্ধাংশে (লম্বভাবে) আঠা মাখিয়ে নাও। এর পরে অপর তাসটির সামনের দিকের অর্দ্ধাংশে (লম্বভাবে) এমন করে আঠা মাখিয়ে প্রথম

তাসের পেছনে সেটা চেপে বসিয়ে দাও, যেন দ্বিতীয় তাসটির অর্দ্ধাংশ প্রথম তাসটির পেছনের অর্দ্ধাংশের সঙ্গে আটকে যায়। দ্বিতীয় তাসটির খোলা অর্দ্ধাংশ (যে অংশ প্রথম তাসের সঙ্গে লাগানো নয়) আঙ্গুল দিয়ে টেনে খুলে দিলে ইংরেজী T অক্ষরের মতন হবে। এর ফলে সেটা টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে থাকবে—জলভর্ত্তি ছোট গ্লাসও তাই সহজেই বসে থাকতে পারবে এর উপরে। খোলা অংশটি প্রথম তাসের পিঠে চেপে ধরে দু' পিঠ ঘুরিয়ে দেখালে দর্শকেরা দ্বিতীয় তাসের অবস্থিতির কথা বুঝতেই পারবেন না।

পুরানো পাতা

২৫।৩০ বছর আগে রামধনুতে যাঁরা লিখতেন তাঁরা কেমন লিখতেন? তোমাদের নিশ্চয়ই কৌতূহল হয় জানতে। তাই মাঝে মাঝে আমরা ঐ সময়কার রামধনু থেকে দু'-একটি করে লেখা তোমাদের উপহার দেব ঠিক করেছি। এবারে দেওয়া হ'ল পরলোকগত অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘটক লিখিত একটি হাসির গল্প। ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় এঁর খ্যাতির কথা কে না জানে? কিন্তু ছোটদের জন্য এটাই বোধ হয় তাঁর প্রথম ও শেষ গল্প। অথচ কেমন মজার, পড়ে দেখ।

ভৈরব শঙ্করী

৺সতীশচন্দ্র ঘটক

এক চাষা ছিল, তার নাম ভৈরব। তার বৌ-এর নাম ছিল শঙ্করী। কোন্ ছেলেবেলায় দু'জনের বিয়ে হয়েছে—কিন্তু একদিনের তরেও মনের মিল হয়নি। কি ক'রে হবে? এ যেটা বল্‌বে সাদা, ও সেটা বল্‌বে কালো—আবার ও যেটা বল্‌বে মিষ্টি, এ সেটা বল্‌বে তেতো।

গাঁয়ের সব লোকই বল্‌তো, 'বরং আদায় কাঁচকলায় মিশবে তবু ভৈরব শঙ্করীতে নয়। ওরা যেন সাপ আর নেউল, কাক আর ফিঙে। কেবল ঝগড়া আর ঝগড়া! ওদের ঝগড়ায় কান ঝালাপালা হয়ে গেল।'

চেহারাও ছিল দু'জনের উল্টো। ভৈরব ছিল সাড়ে চার হাত লম্বা, কিন্তু

তালপাতার সেপাই। আর শঙ্করী ছিল মাত্র আড়াই হাত লম্বা কিন্তু ঘেরে যেন একটা দুম্বো তাকিয়া।

একদিন ভৈরব বল্‌লে, 'ও শঙ্করী, একটু আগুন জ্বাল্ না, বড্ড শীত পড়েছে

গরমে দেখি আমার ঘাম ছুটছে!

যে!' শঙ্করী হাত নেড়ে, মুখ ভেংচে বল্‌লে, 'তোর মুখে আগুন জ্বাল্‌বো—কোথায়

শীত? গরমে দেখি আমার ঘাম ছুট্‌ছে!' খানিকক্ষণ পরে আবার শঙ্করী বল্‌লে—'কাল হাট থেকে একটা ছাঁচিকুমড়ো আনিস, মিঠ্‌কুমড়োর চেয়ে সে ঢের ভালো।' অম্‌নি ভৈরব তার একমাথা ঝাঁকড়া চুল নেড়ে, গোঁফ ফুলিয়ে বল্‌লে—'আরে দূর দূর, ছাঁচিকুমড়ো কি আবার একটা তরকারি? মিঠ্‌কুমড়ো হচ্চে তরকারির রাজা—অমৃত বল্লেও চলে।'

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। দু'জনে প্রায় বুড়ো হয়ে এলো, তবু মিল আর দু'জনের হলো না। বরং গরমিল এতই বেড়ে উঠলো যে ভৈরব যদি পূব দিকে মাথা ক'রে শোয়, ত' শঙ্করী শোয় পশ্চিম দিকে মাথা ক'রে। শঙ্করী জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে জড় ক'রে রেখেছে—নিজে ফেল্‌বে বলে, কিন্তু ভৈরব যদি তা ফেলে দিয়ে এলো তাহ'লে শঙ্করী তা আবার কুলোয় করে তুলে নিয়ে এসে বলবে, 'লক্ষ্মীছাড়া আর কা'কে বলে? ঘরের জিনিস ফেলতে পারলে বাঁচেন—জানেন না যে দরকারের সময় কুটো গাছটাও কাজে লাগে।' গাঁয়ের লোকেরা ত' হেসে কুটিপাটি। তারা হাসতে হাসতে বলে—'ওরা যদি এক সঙ্গে মরেও, ওদের এক চিতেয় পোড়ানো হবে না। চিতেয় শুয়েও দু'জনে ঝগড়া করবে। হয়ত এ বলবে,—তোর পুড়তে বেশী কাঠ লাগবে—ও বলবে তোর পুড়তে।'

একদিন ভোরবেলা ভৈরব ঘুম থেকে উঠেই শঙ্করীর গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে—'ও শঙ্করী, ওঠ্ না, আর কি দুপুর বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোবি?'

শঙ্করী চোখ রগড়ে হাই তুলে বললে—'আমার ইচ্ছে আমি ঘুমোবো। রাত না পোয়াতেই ঠেলে তুলচেন! কি করবো এখন জেগে?'

বটে, তবে জাগিস নি। ও পাড়ার মুন্সী বাবুরা কলকাতা থেকে যে তেলের কল এনেছে তাতে আমাদের সরষেগুলো বিনে পয়সায় পিষে দেবে বলেছিল। তা বেশ, কাজ নেই পিষিয়ে—তুই কলুবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ঘানিতে ভাঙ্গিয়ে আনিস। পূরো পয়সাও নেবে, খোলও নেবে, অথচ তেলও বেরোবে কম।'

এবার শঙ্করী গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, 'তা আমায় কি করতে হবে তাই বল্ না!'

'কি আর করতে হবে? গরুর গাড়ীতে বস্তা চারেক সরষে তুলে—দু'জনে ঠেলতে ঠেলতে ওপাড়ায় নিয়ে যাবো—হেলে গরু দুটোর অসুখ করেছে কিনা!'

'তা এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে বকর বকর না ক'রে, সরষেগুলো বস্তাবন্দী করলে ত' পারতিস্, গরুর গাড়ী টেনে বের করলে ত' পারতিস—! তোর কি সে সব খেয়াল আছে? তুই যে আসল কুঁড়ে!'

'কুঁড়ে আমি, না তুই? তুই সরষেগুলো কুলোয় করে ঝেড়েছিস্? চালুনীতে করে চেলেছিস? অত খেলে আর অত মোটা হলে কি মানুষ কুঁড়ে না হয়ে যায়?'

ঘণ্টাখানেক ঝগড়াঝাঁটির পর দু'জনে ত গরুর গাড়ী নিয়ে উত্তর পাড়ায় রওনা

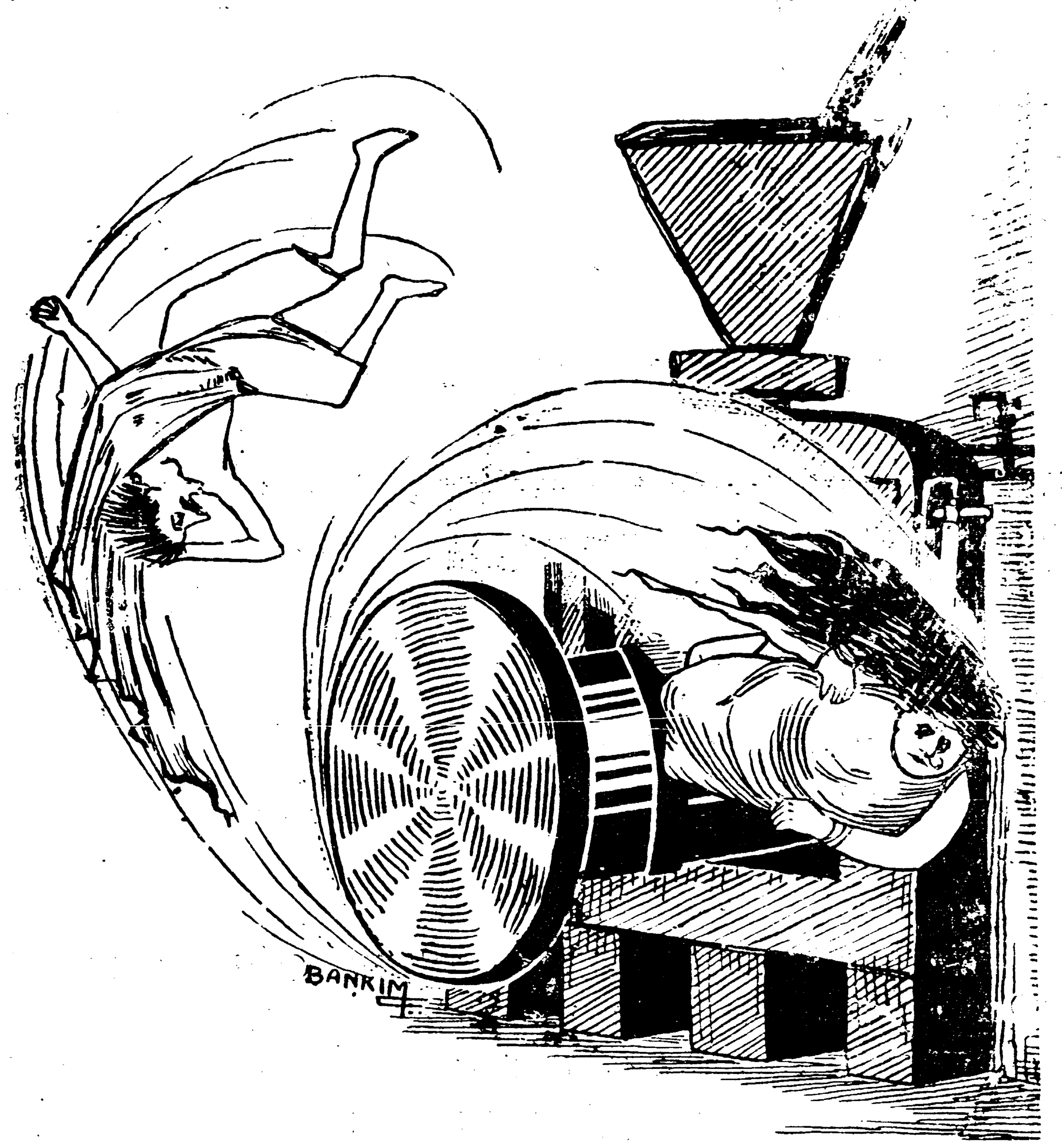

দু'জনে দু'দিকে ছিটকে পড়লো।

হ'ল। ভৈরব জোয়ালে বুক বাধিয়ে টানছিল, শঙ্করী পিছন হতে ঠেলছিল। কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল দু'জনেরই খুব, কেন না পথটা নীচু থেকে উঁচুতে উঠেছে।

শঙ্করী চেঁচিয়ে উঠলো—'তুই ত' মোটেই টানছিস না। আমার ঠেলতে ঠেলতে প্রাণ বেরিয়ে গেল।'

ভৈরব গর্জ্জন করে বললে—'আমিই টানছি না বটে ! একটু ঠেলবার নাম নেই—উল্টে আমার ঘাড়ে দোষ ! আমার মনে হচ্ছে তুই এক একবার পিছন দিকেও টানছিস।'

যাই হোক, এমনি করে সারাটা পথ বেয়ে তু'জনে মুন্সী বাবুদের তেলের কলের সাম্‌নে গিয়ে হাজির। তখন সেখানে কেউই ছিল না। কাদের যেন তেল ভাঙ্গা হচ্ছিল, কল পূরোদমে চল্‌ছিল।

কলের একটা মস্ত বড় চাকা ইঞ্জিনের জোরে বন্ বন করে ঘুরছিল। ভৈরব বললে, 'দেখ্ শঙ্করী, দেখ্—চাকাটা কেমন বাঁ দিক্ থেকে ডান দিকে ঘুরচে !' শঙ্করী চোখ পাকিয়ে বললে 'কি বলছিস তুই ! চাকা দেখি ঘুরচে ডান দিক্ থেকে বাঁ দিকে।'

ভৈরব রাগে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—'তুই ত' আচ্ছা একগুঁয়ে দেখছি ! চোখের সামনে দেখেও মানবি না !'

শঙ্করী হাঁড়িচাঁচা গলায় ব'লে উঠলো—'তুই চোখের মাথা খেয়েছিস্, না হয় মিথ্যে কথা বলছিস্।'

মিথ্যে কথা তু'জনের একজনেও বলছিল না। ব্যাপার হয়েছিল এই যে ভৈরব দেখ্‌ছিল চাকার মাথার দিক্‌টা, শঙ্করী দেখ্‌ছিল তলার দিক্‌টা।

যাই হোক্, রাগের মাথায় ভৈরব আর শঙ্করী তু'জনেই তু'জনকে টানতে টানতে চাকার সামনে নিয়ে গিয়ে বললে—'দেখ্, কোন্ দিকে যাচ্ছে—দেখতে পাচ্ছিস ?'

'এই ত' স্পষ্ট বাঁ দিক্ থেকে ডান দিকে যাচ্ছে' বলেই ভৈরব ধরলে চাকার উপরটা, আর 'স্পষ্ট ডান দিক্ থেকে বাঁ দিকে যাচ্ছে' বলে শঙ্করী ধরলে চাকার তলাটা। ব্যস্, আর যায় কোথায় ? চোখের নিমিষে তু'জনে ঘুরে তু'দিকে ছিট্‌কে পড়লো।

ভৈরব মাথায় হাত দিয়ে বললে—'উঃ !'

শঙ্করী কোমরে হাত দিয়ে বললে—'উঃ !'

ভৈরব কাতরাতে কাতরাতে বললে—'বড্ড লেগেছে রে—বড্ড লেগেছে !'

শঙ্করীও গোঙরাতে গোঙরাতে বললে—'বড্ড লেগেছে।'

জীবনে এই প্রথম তু'জনের কথার মিল হলো। ভৈরব বললে—'গলাটা শুকিয়ে গেছে শঙ্করী, একটু জল আনতে পারিস্ ?' শঙ্করী বলল—'আমারো বড্ড তেষ্টা, একটু জল পেলে খাই।' আবার তু'জনের কথা মিলে গেলো।

একবার কথার মিল হলে তু'বার মিল হয়, তু'বার মিল হলে চারবার মিল হতেও কষ্ট হয় না। কাজেই সেদিন থেকে দেখা গেল—ভৈরব শঙ্করীর ক্রমেই কথার মিল হচ্চে। শেষে এক মাসের মধ্যে তু'জনের মধ্যে এমন মিল আর এমন ভাব হয়ে গেল যে গাঁয়ের লোক দেখে অবাক্।

———

(১৩৩৪ সালের রামধনু থেকে পুনর্মুদ্রিত)

যে গল্প জানা নেই

এটি একটি বারোয়ারী উপন্যাস, গত বছরের বৈশাখ থেকে বেরুচ্ছে। এই উপন্যাসটি লিখছেন রামধনুর গ্রাহক গ্রাহিকারা। একজন খানিকটা লেখার পর আর একজন তা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন ইচ্ছেমত। যে কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা এই উপন্যাস রচনায় যোগ দিতে পারেন। এক সংখ্যা বেরোবার পর দিন দশেকের মধ্যে পরবর্ত্তী সংখ্যার লেখা পাঠাতে হয়।

অল্প সময়ের মধ্যে লিখতে হচ্ছে বলে অনেক গ্রাহক এবারে আর একটু সময় চেয়েছেন। তাই এ সংখ্যায় আমরা আর এটির নতুন অংশ সংযোগ করলাম না, শুধু নতুন গ্রাহক-গ্রাহিকাদের বুঝবার এবং লিখবার সুবিধার জন্য এ পর্য্যন্ত যা বেরিয়েছে তার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে দিলাম মাত্র। লেখা পাঠাবার সময় মনে রাখতে হবে, লেখা যেন বেশী বড় না হয়, আর গল্পের গতি যেন একটা নির্দ্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নং ও দিতে হবে।

* * *

গোপাল পাড়াগাঁ'র ছেলে, বয়স ১১।১২ বছর। বাড়ীতে আছেন বাবা, মা, দিদি উমা আর আছে ছোট ভাই খোকন। বাবা জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করেন। গ্রামে হাই স্কুল না থাকায় গোপাল এল কলকাতায় পড়তে, আর উঠল বালিগঞ্জে বিধুবাবুর বাড়ী। বিধুবাবু সম্পর্কে তার কি রকম মামা,—খুব বড়লোক। বুলু মামার একমাত্র মেয়ে, গোপালের প্রায় সমবয়সী। পাড়াগেঁয়ে বলে সে গোপালকে হীন চক্ষে দেখতে লাগল। মামা লোকটি মন্দ ন'ন, মামীমা বেশ কড়া এবং নিস্পৃহ। বড়লোকের বাড়ীর অনভ্যস্ত চালচলনে বিব্রত বোধ করলেও গোপাল নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। চাকর দিনুরও তার প্রতি একটু সহানুভূতি দেখা গেল। বাড়ীর আর একটি পোষ্য—তার আর এক মামার ছেলে মণি, গোপালের চেয়ে কিছু বড়। বুলু তার পক্ষপাতী এবং গোপালকে নিয়ে তাদের মধ্যে খুব হাসি-তামাসা চলে। বুলুকে বিগড়ে দিচ্ছে দেখে মামীমা মণিকে হোষ্টেলে পাঠিয়ে দিলেন। এতে বুলু গোপালের ওপর আরও ক্ষেপে গেল।

স্কুলে গোপালের এক বন্ধু জুটল—অমিয়, বিখ্যাত সাহিত্যিক অশোক বাবুর ভাই। তাদের বাড়ীতে অশোক বাবুর সঙ্গে গোপালের পরিচয় হ'ল এবং তাঁর ব্যবহারে সে মুগ্ধ হ'ল। গোপাল লুকিয়ে কবিতা লিখত। অমিয়র কাছে সেই কবিতা দেখে অশোক বাবু খুব তারিফ করলেন আর গোপালের

অজান্তে তার ছবি সমেত একটি কবিতা ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন এক মাসিকপত্রে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদক গোপালের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত মন্তব্যও করলেন। পত্রিকাটি দেখে মামা-মামীমা অবাক্ হলেন, খুসীও হলেন বোধ হয়। কিন্তু বুলু অনাবশ্যক তাচ্ছিল্য দেখাল। এতে মামীমা আড়ালে তাকে বকলে বুলু ফের ক্ষেপে গেল গোপালের ওপর।

গরমের ছুটীতে বাড়ী না গিয়ে গোপালকে যেতে হ'ল মামাদের সঙ্গে দার্জিলীংএ। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য গোপালের কবি-মনকে মুগ্ধ করল। এইখানে তার সঙ্গে আলাপ হ'ল সুমিত আর তার দিদি দীপার সঙ্গে—যারা নাকি ওর কবিতা আর ছবি আগেই দেখেছিল এবং তাইতেই চিনে ফেলে আলাপ করল। এর পর সুমিতের জন্মদিনে ওরা গোপালকে নিমন্ত্রণ করল, আর এই উপলক্ষে ছোটদের এক আসরে গোপালকে সভাপতি মনোনীত করল। বুলু ও তার বন্ধুদেরও নেমন্তন্ন হ'ল। বন্ধুরা এল. কিন্তু বুলু এল না। গোপাল এসে দেখল সুমিতরা তার মামার চাইতেও অনেক ধনী। যাই হোক, যথা সময়ে গোপালকে সভাপতির নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে সভা সুরু হ'ল, আর ঠিক সেই সময়ে ঘটল এক কাণ্ড!···

এর পর কি হবে? তা ঠিক করার ভার তোমাদেরই ওপর।

দূর্ব্বার দুঃখ

শ্রীবিজলী সরকার

"তুচ্ছ আমি ক্ষুদ্র অতি—
তৃণ আমি ভাই,
তোমাদের পদতলে
আমার যে ঠাঁই।"

বৃক্ষ কহে—"ক্ষুদ্র বটে,
তুচ্ছ তুমি নও,
দেবতার অর্চ্চনায়
আগে তুমি রও।"

আজব শহর

শ্রীনন্দিতা চক্রবর্ত্তী

(সমিল গদ্য-কবিতা)

আমাদের শহরের মত আজব শহর, মিলবে না দিলেও ভাই লক্ষ মোহর। তোমরা হয়তো অবাক্ হয়ে ভাবছ—কেন? কারণটা বলি,—মন দিয়ে শোন। হেথায় একই সঙ্গে দেখবে দিল্লী ও চেরাপুঞ্জী, তোমরা হয়তো ভাবছ—এ কি আশ্চর্য্য কথা শুনছি! হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, হেথায় দু'দিন হয় ভীষণ গরম, সবাই ঝালাপালা—শুধু মা বলেন, 'আহা হোক্ নরম আচারগুলা—তোরাই তো খাবি! আমরা অবাক্ হয়ে ভাবি—এর পর আর কেন পয়সা দিয়ে দিল্লী যাওয়া? দিল্লীর গরম এখানে বসেই যাবে পাওয়া! (আর সেই সঙ্গে ফাউ—মা'র হাতের আচার খাওয়া।) কিন্তু হায় রে, দু'দিন যেতে না যেতেই সুরু হয় বৃষ্টি, মা বলেন রেগে—"ছি ছি, এ কী অনাসৃষ্টি! চল্‌ল বৃষ্টি—পাঁচদিন, সাতদিন, দশদিন—চার দিক্ ভরে গেল জলে, তবে কি দিল্লী থেকে সটান চেরাপুঞ্জীতেই এলাম চলে? না গো, না, এ আমাদের শিলচর শহর. বলেছি তো এমনটি পাবে না দিলেও লক্ষ মোহর! তোমরা, যারা এক সাথে দেখতে চাও দিল্লী আর চেরাপুঞ্জী, এস এস এ শহরে, তোমাদেরি আশায় বসে দিন গুণছি।

নতুন বই

সম্প্রতি যে সব নতুন বই আমাদের হাতে এসেছে তার কয়েকখানির কথা শোন।

প্রথমেই বলি "প্রেতপুরীর" কথা। এটি একটি ছোটদের উপন্যাস—ভৌতিক কাহিনী নিয়ে লেখা। লিখেছেন ছোটদের খ্যাতনামা লেখক স্বপনবুড়ো। এ ধরণের বই লিখবার হাত তাঁর কি রকম পাকা তা তোমরা অনেকেই জান এবং সেই পাকা হাতেই তিনি নতুন ভঙ্গীতে এই বইটি লিখেছেন। বইখানির ছাপা বাঁধাই, ভাল আর ভাল শিল্পী শ্রীধীরেন বলের আঁকা ছবিগুলি।

"রুশ দেশের রূপকথা" আর একখানি সুন্দর বই। সব দেশেরই নিজস্ব রূপকথা আছে কিন্তু রূপকথা এমনই জিনিষ যে এর মধ্যে কোন জাতিভেদ নেই—পৃথিবীর এক দেশের লোক অন্য দেশের রূপকথা পড়ে সমান আনন্দ পায়। উদীয়মান শিশুসাহিত্যিক শ্রীপ্রভাসরঞ্জন দে রুশ সাহিত্য থেকে ১১টি রূপকথা সংকলন করে এই বইটি বার করেছেন। রুশ শিশুদের মত বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরাও এ গল্প পরম তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করবে। বইটির অঙ্গ-সজ্জাও মনোরম।

এবারে বলি একখানা ছড়ার বইএর কথা—"রামফড়িঙের ছড়া",—লিখেছেন ডাঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখেছেন ছড়াগুলি তিনি তাঁর মেয়ে পম্পাকে ভোলাবার জন্য প্রথমে লিখেছিলেন। এখন পুস্তকাকারে পড়ে অন্য ছেলেমেয়েরাও যদি খুসী হয় তবে এগুলি সার্থক হবে। তাঁর ভাবনার কোন কারণ নেই। পম্পার মত সমঝদার ছেলেমেয়েরা সকলেই এই ছড়াগুলি আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। সুন্দর রঙ্গিন মলাট আর পাতায় পাতায় মজাদার ছবি দিয়ে বইটি আরও লোভনীয় করা হয়েছে।

সবশেষে বলি ৺সুনির্মল বসুর পুনর্মুদ্রিত নাটক "সহুরে মামার" কথা। কবিতার মত ছোটদের হাসির নাটক লিখতেও সুনির্মল কি রকম দক্ষ ছিলেন এই সুখপাঠ্য এবং সু-অভিনয়যোগ্য নাটকখানি তার আর একটি প্রমাণ। অনেক দিন পরে বইখানি পুনর্মুদ্রিত করে প্রকাশক বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

প্রেতপুরী—স্বপন বুড়ো; ১।০ ও রামফড়িঙেয় ছড়া—ডাঃ বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য; ১৷৴। প্রকাশক বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ; ৫, বংকিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। রুশ দেশের রূপকথা—শ্রীপ্রভাসরঞ্জন দে; ১॥০। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট বুক কোং, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সহুরে মামা (৪র্থ মুদ্রণ)—সুনির্মল বসু, ॥০। প্রকাশক—লজা সাহিত্য মন্দির, সি-৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

প্রধানতঃ যে সব সাহিত্যিক বাংলা শিশুসাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে ছোটদের কৌতূহল অত্যন্ত বেশী। এ জন্য কয়েক বছর আগে শিশুসাহিত্যিকদের সম্বন্ধে একটা বর্ণানুক্রমিক তথ্যপঞ্জী বার করবার ব্যবস্থা হয়েছিল রামধনুতে—সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায়। সেই অনুসারে অনেক শিশুসাহিত্যিকদের কাছ থেকে তাঁদের সম্বন্ধে নানা তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছিল। নানা কারণে তখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ করা যায় নি, এখন আবার নতুন করে সেটা সুরু করা হ'ল। সমস্ত লেখকদের সম্বন্ধে তথ্য এখনও হাতে এসে পৌঁছয় নি, তাই বর্ণানুক্রমিক রীতি অনুসরণ না করে যেমন যেমন পাওয়া গেছে সেই ভাবেই আমরা এই তথ্যপঞ্জী পরিবেশন সুরু করলাম। এ থেকে কেউ যদি মনে করেন আমরা কোন লেখকের নাম আগে উল্লেখ করে তাঁকে অন্যদের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিচ্ছি তা হলে একেবারেই ভুল করা হবে। এই তথ্যপঞ্জী সংকলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। রামধনু-সম্পাদক ও আর কয়েকজন খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক তাঁকে এই কাজে সাহায্য করছেন। যে সব লেখকেরা এই কাজে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের কেউ কেউ এখন পরলোকে। গভীর বেদনার সঙ্গে আজ তাঁদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা জানানো প্রয়োজন বোধ করি। তথ্যের পরিবেশনে মাঝে মাঝে ২।১টা ভুল-ত্রুটী এসে পড়া কিছুই বিচিত্র নয়। কেউ সে রকম ভুল ধরতে পারলে আমাদের জানালে, প্রয়োজন মত তা অবশ্যই সংশোধন করা হবে। শিশুসাহিত্যিকরা তাঁদের নিজ নিজ পরিচিতি পাঠিয়ে এই তথ্যপঞ্জীটি সর্বাঙ্গসুন্দর করতে সাহায্য করুন তাঁদের কাজে এই নিবেদন। পরিচিতি রামধনু কার্যালয়ে পাঠালেই চলবে।

*   *   *   *

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ঃ

জন্ম ২রা বৈশাখ, ১২৮৪ সাল। জন্মস্থান উলাইল-কর্ণপাড়া, ঢাকা।

পিতৃকুল এবং মাতৃকুল দু'দিক্ দিয়েই ইনি বড় জমিদার বংশের সন্তান। পিতৃকুল মিত্রবংশ হচ্ছে বাংলার স্বাধীন চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের শেষ উত্তরাধিকারী ; মাতৃকুলও এসেছে সুবিখ্যাত প্রতাপাদিত্যের (যশোর) বংশ থেকে।

ছেলেবেলায় নিজ গ্রামে কাটিয়ে চলে আসেন দিঘপাইতে নিঃসন্তান ধনী পিসীমার বাড়ী। ছাত্রজীবন সুরু হয় প্রথমে গ্রামের পাঠশালায়, তারপর সন্তোষের স্কুলে এবং শেষ হয় বহরমপুরে।

অল্প বয়স থেকেই সাহিত্যের প্রতি অসম্ভব ঝোঁক ছিল এঁর, এবং ক্রমে সেটাই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। শেষে মন যায় রূপকথার দিকে। 'ঠাকুমার ঝুলি' রচনা করে ইনি শিশু-সাহিত্যের 'সম্রাট্' বলে পরিচিত হ'ন। অনেকের মতে এটি বিশ্বসাহিত্যেরও একটি উল্লেখযোগ্য বই। শেষ জীবনে ইনি কলকাতাতেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন।

শিশুসাহিত্যে অনেক বই লিখে গেছেন ইনি। তার মধ্যে ঠাকুমার ঝুলি সবচেয়ে

নামকরা। এটির সুবর্ণজয়ন্তী সংস্করণও বেরিয়েছে। এ ছাড়া ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে, ঠানদির থলে, চারু ও হারু, ফার্ষ্ট বয়, লাষ্ট বয়, উৎপল ও রবি প্রভৃতি আরও অনেক বই আছে তাঁর। এমন কি বিজ্ঞানের বইও। চিত্রশিল্পেও হাত ছিল এবং নিজের বেশীর ভাগ বই ইনি নিজেই চিত্রিত করেছেন। বড়দের জন্যও এক সময় লিখতেন, পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন কিছুদিন।

গত ১৬ই চৈত্র, ১৩৬৩ সালে ৮০ বছর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেছেন।

যামিনীকান্ত সোম ঃ

জন্ম ২৫শে নভেম্বর, ১৮৮২ খৃঃ। জন্মস্থান পিংলা, মেদিনীপুর।

ছেলেবেলায় মেদিনীপুরের স্কুলে পড়াশোনা আরম্ভ করে পরে এলাহাবাদ ও বারাণসীতে কলেজ-জীবন শেষ করেন। ১৯১১ সালে কর্মজীবন সুরু হয় দিল্লীতে। দীর্ঘ ২৯ বছর সেখানে কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে ১৯৪০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে এঁর বয়স ৭৫ বছর, থাকেন হাওড়ায়।

কর্মজীবনের গোড়া থেকেই ইনি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে শিশুসাহিত্যের একজন সুলেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। এখনও সাহিত্যসাধনাই এঁর জীবনের প্রধান আনন্দ। এঁর বিখ্যাত বইএর মধ্যে "ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ" সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রজীবনী। এ ছাড়া ছেলেদের বিদ্যাসাগর, খেলাঘর, নীলপাখী, পৃথিবীর ওপিঠ, পুরাতন কথা, ডন্ কুইক্সট, পূজার মেলা, আলমগীরের পত্রাবলী, আমাদের নেতাজী, পুরানো দিনের পুরানো কথা, এ নহে কাহিনী, ছোট্ট রবি প্রভৃতি এঁর নামকরা বই।

দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় ঃ

জন্ম ২৬শে ফাল্গুন, ১২৯৯ সাল। জন্মস্থান রত্নপুর, বরিশাল।

ছেলেবেলায় শোলোক গ্রামে পড়াশোনা সুরু করেন এবং সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই. এ. ও পরে হাজারীবাগ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে ইনি শিক্ষকতাকে বৃত্তি রূপে গ্রহণ করেন এবং আজীবন শিক্ষাব্রতী রূপেই লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করে গেছেন। চুঁচুড়া দেশবন্ধু হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠার মূলে যাঁরা ছিলেন ইনি তাঁদেরই একজন। তা ছাড়া ইনি চুঁচুড়ার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান চুঁচুড়া শিল্পী-সংঘেরও প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। স্থানীয় অনাথ ও দুঃস্থ ভাণ্ডারের সঙ্গেও ইনি চিরদিন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে যখন পড়েন তখন থেকেই এঁর সাহিত্যজীবন সুরু হয় এবং অচিরেই শিশুসাহিত্যে নিজের আসন তৈরী করে নেন। এঁর নামকরা বই—সেকেন্দারের কথা, চাণক্য, টলষ্টয়ের গল্প, টলষ্টয়ের আরো গল্প, ঋষি টলষ্টয়, শিবাজী মহারাজ, আজব ঘুম, এ যুগের দাসত্ব, মহারাজ নন্দকুমার,, ছেলেদের ভক্তমাল, নিমাই পণ্ডিতের গল্প, ভুলের ফল, সিপাহীযুদ্ধ, বোকার কাণ্ড, রাজতরঙ্গিনীর গল্প, সুন্দরবনে, অজানা দেশের যাত্রী, ঠগী সর্দার, সিরাজের গল্প, মীর কাসেমের গল্প, মুক্তিযুদ্ধে বাঙ্গালী, উপনিষদের গল্প প্রভৃতি।

এই তথ্যপঞ্জী রচনায় ইনি সহযোগিতা করেছিলেন কিন্তু এটি বেরোবার আগেই ইনি মহাপ্রয়াণ করেছেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস্-সি

—একটি নতুন আবিষ্কার—

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শক্ত জিনিষ কি জান ? হীরা। চলতি কথায় আমরা বলি হীরে ! হীরা দিয়ে তুমি যে কোন জিনিষের ওপর আঁচড় কাটতে পার. কিন্তু হীরার ওপর আঁচড় কাটা সহজ নয়। অবশ্য শুধু এই জন্যই হীরার দাম নয়, ওর দাম হচ্ছে ওর আলো ঠিকরে দেবার ক্ষমতার জন্য কতকটা, আর কতকটা ওর দুষ্প্রাপ্যতার জন্য।

কিন্তু আসলে হীরা জিনিষটা কি ? বিজ্ঞানীরা বলেন, হীরা হচ্ছে আসলে কয়লা। এক টুকরো নোংরা কয়লা যা দিয়ে তৈরী, হীরাও আগাগোড়া তাই দিয়ে তৈরী। বিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম কার্বন বা অঙ্গার। মাটীর তলায় দীর্ঘ দিনের প্রচণ্ড চাপে কয়লাই ক্রমে রূপান্তরিত হয় হীরায়। কিন্তু সেটা এত কম ঘটে যে হীরা চিরকালই দুষ্প্রাপ্য ব'লে গণ্য হয়ে আসছে।

কৃত্রিম উপায়ে হীরা তৈরী করা যায় কিনা সে চেষ্টা করতেও বিজ্ঞানীরা ছাড়েন নি। মোয়াজাঁ নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী প্রচণ্ড তাপ আর চাপের সাহায্যে পরীক্ষাগারে নকল হীরা তৈরী করেছেনও। তবে তা আকারে হয়েছে খুবই ছোট আর খরচও পড়েছে তেমনি। কাজেই তাঁর সে আবিষ্কার দিয়ে শুধু বৈজ্ঞানিক কৌতূহলই মিটেছে, আর কিছু হয় নি।

দামী হলেও, অত শক্ত ব'লে অনেক দিন থেকেই হীরা মানুষের নানা কাজে লাগছে (রত্ন হিসাবে ওর ব্যবহার বাদ দিয়েও)। কাচ কাটবার জন্য হীরার ব্যবহার কে না জানে ? কিন্তু এমন অনেক ব্যাপার আছে যেখানে হীরার কাঠিন্যও কাজ উদ্ধার করতে গিয়ে "ফেল্ মেরে" যায়। বিজ্ঞানীরা তাই হীরার চাইতেও শক্ত কিছু পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ করছিলেন অনেক দিন থেকে। সম্প্রতি তাঁরা

তা পেয়ে গেছেন। পেয়ে গেছেন বললে ঠিক বলা হয় না—বলতে হয় তৈরী করেছেন, কেন না এমন জিনিষ প্রকৃতির রাজ্যেও অজ্ঞাত। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'বোর‍্যাজোন'।

যে বিজ্ঞানী এই বোর‍্যাজোন আবিষ্কার করেছেন তাঁর নাম রবার্ট ওয়েন্টফ্, বাড়ী আমেরিকায়।

কি করে করলেন ? করলেন বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায়,—সেই প্রচণ্ড তাপ আর চাপের সাহায্য নিয়ে।

বোরোন নাইট্রাইড্ নামে এক রকম রাসায়নিক মশলা আছে, দেখতে অনেকটা খড়ির গুঁড়োর মত সাদা। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে একে দেখায় ছ'কোণা দানার মত। আর হীরার দানাকে অনুবীক্ষণে দেখায় লুডোর ছকের মত,—চৌকো কিন্তু ছ'-মুখো। ওয়েন্টফ্ ভাবলেন, যদি কোন রকমে ঐ ছ'কোণা দানাকে বদ্‌লে ফেলে হীরার দানার আকৃতিতে আনা যায় তা হলে হয়তো কার্যসিদ্ধি হতে পারে। হ'লও তাই। কিন্তু এর জন্য যে চাপ আর যে তাপ খরচ করতে হ'ল তা শুনলে অবাক্ হবে। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১০ লক্ষ পাউণ্ড চাপ দিয়ে আর সেই সঙ্গে ৩০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ প্রয়োগ করে এই অদ্ভুত কাণ্ড সম্ভব হ'ল। 'য়্যাজো' বলে একটা কথা আছে, যা নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন। আর নাইট্রাইডও তৈরী হয় নাইট্রোজেন থেকে। তাই 'বোরোন্'-এর সঙ্গে 'য়্যাজো' কথাটা যোগ করে ওয়েন্টফ তাঁর নবাবিস্কৃত পদার্থের নাম রেখেছেন বোর‍্যাজোন্।

নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়—যেখানে হীরা হার মেনে গেছে, বোর‍্যাজোন্ সেখানে কাজে লাগবে বলে সকলের বিশ্বাস। বোর‍্যাজোন দিয়ে হীরার গায়েও আঁচড় কাটা যায়। তা ছাড়া হীরাকে খুব গরম করলে (১৮০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট) হীরা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়—অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস হয়ে উড়ে যায়। কিন্তু বোর‍্যাজোন্‌কে সাড়ে তিন হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত গরম করে দেখা গেছে তাতে তার কিছুই হয় নি।

দেখতে কি রকম বোর‍্যাজোন ? কালো, ছাই ছাই, হলদে, লাল—সব রকমই হতে পারে। এমন কি ধব্‌ধবে সাদাও।

তুমি কতটুকু জান ?

তোমার সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য কয়েকটা প্রশ্ন দিচ্ছি, দেখ দেখি ক'টার ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পার। উত্তর শেষের দিকে দেওয়া হ'ল।

১। বলতে পার এগুলি কি ?

ক) গুয়াটেমালা। খ) হানোই। গ) সিয়ান্‌থ্রোপাস্‌ পিকিনেনসিস্‌ ঘ) হিন্দু প্যাট্রিয়ট্‌। ঙ) মেইডেন ওভার। চ) হিলিয়াম্‌। ছ) মন্‌রোভিয়া।

২। কোন্‌টা ঠিক ?

ক) এশিয়াবাসীদের মধ্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—আইজাক রাবি, সি. ভি. রামন্‌, আমেদ খাঁ, হিদেকি উকাওয়া, ইক্‌বাল, চ্যাং কাই শেক।

খ) পথের পাঁচালীর লেখক—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়।

৩। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মূর্ত্তি কোন্‌টি ? খ) সবচেয়ে উঁচু সহর কোন্‌টি ? গ) সবচেয়ে উঁচু গাছ কোন্‌টি ?

৪। কে বলেছিলেন ?—ক) আমার জীবনই আমার বাণী। খ) অসম্ভব কথাটি আছে শুধু মূর্খের অভিধানে। গ) ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দেবে মঠ ? ঘ) বৃটীশ সাম্রাজ্যে 'লাল বাতি জ্বালাবার' জন্য আমি প্রধান মন্ত্রী হই নি।

১৩৬৪ সালের গোড়ায় ভারতে নানান্‌ দিকে নানান্‌ পরিবর্তন সুরু হচ্ছে। এর মাসখানেক আগে হয়েছে পঞ্জিকার সংস্কার। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পাঞ্জকার চলন, একটার সঙ্গে একটার মিল নেই। তাই নতুন পঞ্জিকায় চৈত্র মাস থেকে বছর সুরু করা হয়েছে। নতুন পঞ্জিকায় ১লা চৈত্র হ'ল বাংলা ১৩৬৩ সালের ৭ই চৈত্র, আর সালটা হ'ল শকাব্দ। ১৮৭৯ শকাব্দ।

১লা এপ্রিল থেকে পুরোনো আনা-পয়সা-

পাইএর জায়গায় হ'ল দশমিক মুদ্রা নয়া পয়সা। যদিও আগের গুলোও তিন বছর পাশাপাশি চলবে। কিন্তু সব চেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে শাসনযন্ত্রে। নতুন নির্বাচন হয়ে গেল সারা ভারত যুড়ে। যদিও আগের মত কংগ্রেসই কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিত্ব গঠন করছে তবু মন্ত্রীদের মধ্যে রদ বদল হচ্ছে অনেক। তা ছাড়া নতুন রাজ্য কেরলে কংগ্রেসকে হারিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি শাসন-পরিচালনা ছিনিয়ে নিয়ে এই প্রথম ভারতের একটি অঞ্চলে পুরোপুরি কমিউনিষ্ট সরকার গঠন করেছে। উড়িষ্যায়ও গণতন্ত্র দল কংগ্রেসের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হয়েছে এবং অপরের সঙ্গে জোট বেঁধে তবেই সেখানে কংগ্রেসকে মন্ত্রিত্ব বজায় রাখতে হচ্ছে।

খাস কলকাতায়ও কংগ্রেস দল তেমন সুবিধা করতে পারে নি। তবে গোটা পশ্চিম বাংলা মিলে এবারও তাদেরই প্রাধান্য বেশী।

* * *

কলকাতার হকী লীগ্‌ শেষ হয়ে গেল। প্রথম বিভাগে এবারও মোহনবাগান দল চ্যাম্পিয়ন্‌ হ'ল—একটি খেলাতেও না হেরে। এই নিয়ে তারা পর পর তিনবার এই সম্মান লাভ করল—তিন বারই অপরাজিত থেকে। লীগে রানার্স আপ্‌ হ'ল ইষ্ট বেঙ্গল। তাদেরও কৃতিত্ব কম নয়—তারাও কোন খেলায় হারে নি, কিন্তু কয়েকটি খেলায় ড্র করায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া তাদের ভাগ্যে ঘটল না।

কলকাতায় বাইটন্‌ (বা বেটন) কাপের খেলা এখনও চলছে। তবে মোহনবাগানকে কোয়ার্টার ফাইনালেই বিদায় নিতে হয়েছে মহমেডান স্পোর্টিংএর কাছে হেরে।

বোম্বাইএ জাতীয় হকী প্রতিযোগিতাও শেষ হয়ে গেল সম্প্রতি এবং এবারে এতে চ্যাম্পিয়ন হ'ল রেলওয়েজ্‌ দল,—ফাইনালে বোম্বাইকে ২-১ গোলে হারিয়ে। এবারকার এই প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব ছিল এর কোয়ার্টার ফাইনালের দু'টি খেলা। এই খেলা দু'টি হচ্ছে—বাংলা বনাম রেলওয়েজ ও বোম্বাই বনাম মহীশূর। দু'টি খেলাতেই পর পর চার দিন ড্র হয়ে পঞ্চম দিনে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

* * *

টেবল টেনিস্‌এ বিশ্বপ্রতিযোগিতা হয়ে গেল ষ্টক্‌হল্‌মে। সেখানে এবার জাপানের জয়-জয়কার। তারা পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ সোয়েথ্‌লিং কাপ্‌ এবং মেয়েদের দলগত চ্যাম্পিয়ন্‌শিপ্‌ করবলিন কাপ্‌—দু'টোই দখল করেছে। পুরুষদের সিঙ্গ্‌লস্‌ চ্যাম্পিয়ন্‌ও হয়েছেন জাপানী খেলোয়াড় তোশিয়াকী তানাকা, আর মহিলাদের সিঙ্গলস্‌ চ্যাম্পিয়ন্‌ও হয়েছেন জাপানের মিস্‌ ফুজি ইগুচি।

* * *

ভারতের বিখ্যাত মহিলা টেনিস খেলোয়াড় রিতা ডেভর সম্প্রতি জার্মানীর বিখ্যাত পিয়ানো-বাদক হান্স মুলারকে বিয়ে করেছেন। ইনিও একজন ভাল টেনিস খেলোয়াড়। কাজেই বিয়ের পরেও এঁদের টেনিস-চর্চা বন্ধ হবে ব'লে মনে হয় না। রিতার দেশ হচ্ছে পাঞ্জাব, তবে ইনি থাকতেন কলকাতায়। এখানকার লরেটো কলেজের ছাত্রী ছিলেন তিনি।

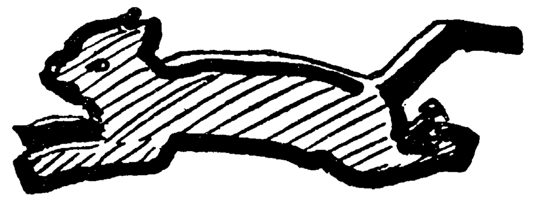

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

নতুন বছরের রামধনু এই সঙ্গে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি, সেই সঙ্গে দিচ্ছি আমাদের অন্তরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছরটি তোমাদের জীবন মধুময় করে তুলুক। তোমাদের পৃথিবী মধুময় হোক, তোমাদের আকাশ মধুময় হোক, তোমাদের বাতাস মধুময় হোক। এ দিনে এ ছাড়া আর কি কামনা করব?

চিঠির থলি এবারে বেশ ভারী বোধ হচ্ছে। রামধনুকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিয়ে তোমরাও অনেকে চিঠি দিয়েছ। সে স্নেহের ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছে রামধনু।

শ্রীনির্মলকান্তি ঘোষ (বালুরঘাট)—তোমার মন-খোলা চিঠি আর সেই সঙ্গে কবিতাটিও পেয়েছি। কবিতাটির মধ্যে অবশ্য ছন্দের ত্রুটি আছে। আরো সাবধান হতে হবে তোমাকে। চিঠি দু'খানাই পড়ে বেশ তৃপ্তি পেলাম। শ্রীদীপ্তি সেনগুপ্তা (গৌহাটী)—তোমাদের দশ ভাইবোনের সাতজন মিলে যে নতুন কাজ সুরু করেছ তাতে সাফল্য লাভ কর এই কামনা করি। বাকি তিনজনও যথা সময়ে যোগ দেবে নিশ্চয়ই? গৌহাটীতে তোমরা যে একটা নতুন কিছু করলে এটা বাহাদুরী বলতে হবে। এখানে অবশ্য টিউটোরিয়াল হোম নিত্য ব্যাঙের ছাতার মতই গজাচ্ছে, আর আমারও ও বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। তবে এদিনে ওর উপযোগিতা অনুভব করি বই কি! ভিকারী মনো (কুচবিহার—তোমাদের ওখানকার কোন সাধারণ পাঠাগারকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব'ল। সকলের জন্য হলে দেখব কতদূর কি করা যায়। শ্রীজয়া রায় (আইজট-নগর)—তোমার ছোট বোনকে 'লেখা' পাঠাতে ব'লো। রামধনুর প্রতি তোমাদের ঔৎসুক্যের কথা শুনে মনে আনন্দ পেলাম। বিদেশী বন্ধু-সংগ্রহ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ২১টি শীগ গিরই পাঠাচ্ছি। তোমার একটি পুরোনো প্রশ্নের জবাব দেই প্লে ব্যাকের কৌশল। ব্যাপারটা কিছু কঠিন নয়। গানের রেকর্ড যে ভাবে তোলা হয় প্রথমে সেই ভাবে গানটির রেকর্ড তুলে নেওয়া হয়। তার পর সেই রেকর্ড বাজিয়ে অভিনেতা কয়েকবার রিহার্স'াল দিয়ে তার সঙ্গে নিজের সুর মেলাবার চেষ্টা করেন এবং শেষে, রপ্ত হ'লে, মৃদুকণ্ঠে সেগুলো বলে যান। রেকর্ডের উচ্চস্বরে তাঁর কণ্ঠ চাপা পড়ে কিন্তু ঠোঁট নড়া দেখে মনে হয় তিনিই বুঝি ঐ গান গাইছেন। এইবার ফিল্‌ম্ তুললে তাঁর মুখ দিয়েই সে গান বেরুচ্ছে মনে হবে। শ্রীঅনিল ঘোষ (বোম্বাই)—তোমার অসাধারণ কৃতিত্বের কথা শুনে আন্তরিক আনন্দিত হলাম। কিন্তু এই কৃতিত্বের জন্য ২০ পাউণ্ড ওজন হারাতে হয়েছে এ কি রকম কথা! "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" বলে একটা কথা আছে বটে কিন্তু সেটা কার্যক্ষেত্রে মোটেই লোভনীয় নয়। যাই হোক, এখন আশা করি সামলে নিয়েছ। 'এলিফ্যান্টা' সুবিধামত

প্রকাশ করবার ইচ্ছা আছে। শ্রীবিজলী সরকার (বজবজ)—তুমি ঠিকই বলেছ। নজরুল যে লিখেছিলেন—"তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন যারে ভালবাসে মাটি।"—কথাটা বোধ হয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শ্রীরণেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ঘৈরালি)-তোমার প্রথম প্রশ্নটি ঠিক বুঝতে পারলাম না, আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে লিখবে। অপর প্রশ্নটির উত্তরে বলব—হ্যাঁ, কিন্তু এখন নয়। বিষয়টা হচ্ছে রসায়ন শাস্ত্র (কেমিষ্ট্রী)। শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত (ভাগলপুর)—তোমার চিঠির সরলতা পরম উপভোগ্য। দেরী হোক, কিন্তু জিনিষটা ভাল হওয়া চাই, এ কি তোমারও মত নয়? শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—দাদা তোমার সমস্ত কবিতা ছিঁড়ে দেয়?—ভয়ানক কথা তো! দাদা মনে ভেবেছে কি? তার বুঝি দাদা নেই। পুস্তকতালিকা ছাপা হলেই পাঠান হবে। কাজী সৈয়দুল ইসলাম (পণ্ডিতপুর)—পৃথিবীতে সুখী কে? বড় গোলমেলে প্রশ্ন। তবে এটুকু বলা যায়—যার অভাব বোধ নেই, সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে নিজেরঅবস্থায় তৃপ্ত থেকে যে নিজেকে সুখী ব'লে মনে করে সেই সুখী তা সে ধনীই হোক আর গরীবই হোক। আমার তো এই মনে হয়। শ্রীগুণধর বর্দ্ধন (ঝাড়বনি)—সাহিত্য ভালবাস লিখেছ, সাহিত্যের ভিতর দিয়েই তো তুমি সারা দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পার ঘরে বসে। কি করে?—কেন, নানান্ রকমের ভাল ভাল বই পড়ে! ওর মত জিনিষ আছে নাকি? পেন্-ফ্রেণ্ড বা লেখনী-বন্ধু চাও তো চেষ্টা করব কিছু সংগ্রহ করে দিতে। আর লেখক বা লেখিকার সঙ্গে তাঁদের লেখার ভিতর দিয়ে যে পরিচয় তাই কি যথেষ্ট নয়? ব্যক্তিগত পরিচয়ের দরকার কি?

আজ আর নয়, প্রীতি ও শুভেচ্ছা আর একবার জানিয়ে আজ চিঠি শেষ করি।—ইতি রাঃ সঃ

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১=বেল, ২=বেদানা, ৩=কমলা, ৪=কুল, ৫=তাল, ৬=লেবু, ৭=কলা, ৮=আলু, ৯=আম, ১০=লিচু, ১১=ডাব, ১২=টেপারি, ১৩=জাম, ১৪=সুপারি, ১৫=পটল, ১৬=খেজুর, ১৭=পিচ, ১৮=আতা, ১৯=ফুটি, ২০=লাউ, ২১=টোমাটো।

একমাত্র সুমিত্রা পালিত (কলিকাতা-১৯) নির্ভুল উত্তর দিতে পেরেছেন। যাঁদের কতকগুলি উত্তর শুদ্ধ হয়েছে তাঁদের নাম—সুজাতা ভট্টাচার্য্য (সাঁত্রাগাছী); সুগত সেনগুপ্ত (কলিকাতা ২৬); নিমলকান্তি ঘোষ (বালুরঘাট); শ্রমণি (চন্দননগর); দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা ১২); উষসী সেন (লখনৌ); পদ্মারাণী চক্রবর্ত্তী (নয়াদিল্লী); নীলাদ্রি রায় (পাটনা)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীনিরুপমা রায়

টুনু ও ডলি দু'জনেরই কাল পরীক্ষা। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল বাড়ীর সমস্ত বিজলী-বাতি খারাপ হয়ে গেছে। এখন কি করা? রাত্তিরে একটু বই না দেখে নিতে পারলে কি করে চলবে? টুনু বল্‌ল, 'আমায় রাত্তির সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত জাগতেই হবে।' ডলিও বল্‌ল তারও অন্ততঃ বারোটা অবধি না জাগলে চলবে না। সেদিন দোকানপাট সব বন্ধ, বাড়ীতে শুধু দু'টি মোমবাতি আছে, তার একটা আর একটার চাইতে এক ইঞ্চি লম্বা। তা-ই দিয়ে দেওয়া হ'ল

তাদেরকে। টুনু সন্ধ্যা ৬টার সময় বড় মোমবাতিটা জ্বালাল। ডলি একটু দেরীতে পড়তে বসে—সে জ্বালাল রাত্রি ৮টার সময় ছোট মোমবাতিটা। রাত সাড়ে ১০টার সময় দেখা গেল দু'টো মোমবাতিই পুড়তে পুড়তে ক্ষয়ে এক মাপের হয়ে গেছে। আর, আশ্চর্য্য, ডলির বাতিটা ঠিক ঠিক ১২টায় পুড়ে শেষ হয়ে গেল; টুনুরটাও ক্ষয়ে শেষ হ'ল ঠিক সাড়ে ১২টায়। বল তো কার মোমবাতি কত ইঞ্চি লম্বা ছিল?

'তুমি কতটুকু জান' প্রশ্নের উত্তর

১। (ক) মধ্য আমেরিকার একটি রাষ্ট্র। (খ) ইন্দোচীনের সহর। (গ) আদিম জাতের মানুষ—পিকিংএ প্রথম পাওয়া যায়। (ঘ) গত শতাব্দীর একখানি খুব নামকরা সংবাদপত্র (কলকাতার)। (ঙ) ক্রিকেটে বল্ করবার সময় যে ওভারে (৬ বার বল্ দেওয়া) একটাও রান্ হয় না। (চ) একটি মৌলিক পদার্থ—যা আর কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয় না। (ছ) আফ্রিকার লাইবেরিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী। ২। (ক) সি. ভি. রামন্ ও হিদেকি উকাওয়া। (খ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩। (ক) স্বাধীনতার মূর্ত্তি (আমেরিকা) খ) ফারি সহর (তিব্বত) (গ) জায়াণ্ট সিকোইয়া গাছ (ক্যালিফোর্ণিয়া)। ৪। (ক) মহাত্মা গান্ধী (খ) নেপোলিয়ন (গ) গোবিন্দচন্দ্র দাস (ঘ) চার্চিল।

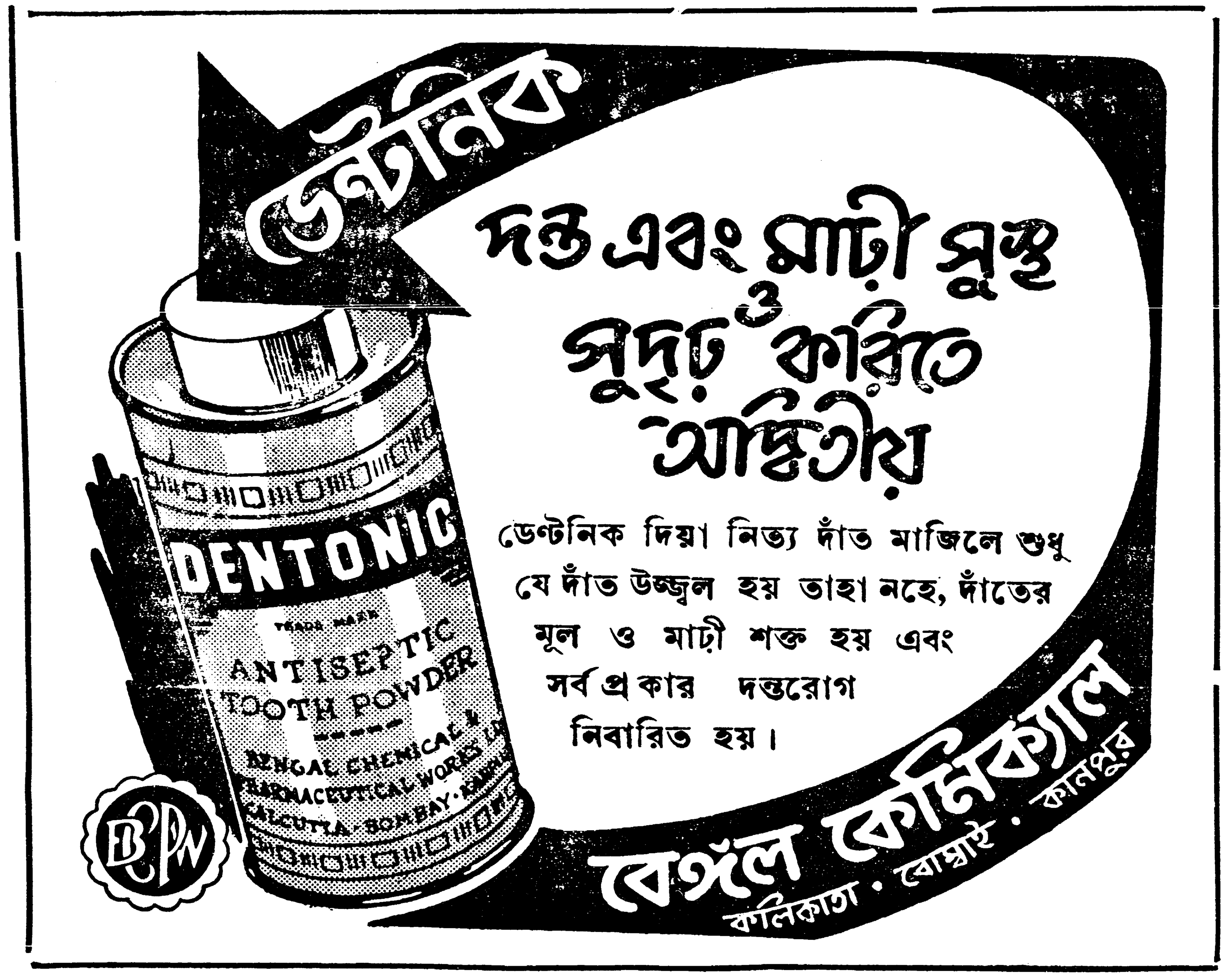

সবার বন্ধু স্বপনবুড়োর বই!

স্বপনবুড়োর শৈশব (জীবনী)
স্বপনবুড়োর ঝুলি…
স্বপনবুড়োর মজার গল্প ··
স্বপনবুড়োর রকমারী গল্প ··
তাল-বেতাল (নাটক)
পালা-পার্ব্বণ-ছড়া-ছন্দ ··
কমলা (নৃত্যনাটিকা)…
স্বপনবুড়োর স্বনির্ব্বাচিত গল্প ··
উড়ন্ত চাকী (উপন্যাস)
প্রেতপুরী (রোমাঞ্চ উপন্যাস)
নরহরি পণ্ডিতের কাহিনী (উপন্যাস)

স্বপনবুড়োর অন্যান্য বই –

শশী শ্যামলের সাঁকো
স্বপনবুড়োর হল্লোড়
বেপরোয়া
বনপলাশীর ক্ষুদে ডাকাত
বাস্তুহারা
স্বপনবুড়োর ছড়া
ধন্যি ছেলে (হাসির বই)
স্বপনবুড়োর হাসির গল্প
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
আত্মহত্যা
স্বপনবুড়োর গল্প-সঞ্চয়ন
সাতসমুদ্দুর তের নদীর পারে
দেশে দেশে মোর ঘর আছে
স্বপনবুড়োর শিশুনাট্য (দুই ভাগ)

নামকরা বইয়ের দোকানেই মিলবে।

পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

মজাদার গল্প বলতে কি বোঝ? সে রকম একটি গল্প লিখে পাঠাতে হবে।

গল্পটি ছোট হবে। সবশুদ্ধ ১০০০ কিংবা বড় জোর ১২০০টি শব্দ থাকতে পারে (অর্থাৎ ছাপলে রামধনুর ৩।৪ পৃষ্ঠা হবে)। গল্প নিজের লেখা হওয়া চাই, আর আগামী ৩২শে শ্রাবণের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

কোন প্রবেশ মূল্য নেই, শুধু প্রতি লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে ভর্ত্তি করে পাঠাতে হবে। ৩ মাস এই কুপন দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকটি কুপনে একটি করে গল্প পাঠাতে পারবে—যে কেউ। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে এবং পছন্দ হলে পুরস্কারপ্রাপ্ত বা যে কোন গল্প (পুরস্কার না পেলেও) রামধনুতে ছাপা হবে।

সব শুদ্ধ তিনটি পুরস্কার আছে।—সবই বই।

কুপন ঃ পু ১·৬৪

রামধনু

নাম——

ঠিকানা——

বয়স ——

লে খা চা ই

অভিনব সচিত্র শিশু-মাসিক। ১লা জ্যৈষ্ঠ ২য় সংখ্যা বাহির হইল। ইহাতে (১৮) আঠারটি পুরস্কারের ঘোষণা আছে। "গ্রাহক" হও ও "লেখা" পাঠাও। বার্ষিক সডাক দুই টাকা ; তিন আনার টিকিট পাঠাইলে "নমুনা" প্রেরিত হয়।

শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল,
সম্পাদক, "লেখা চাই"
লেখা চাই কার্য্যালয়,
পোঃ দেবালয়, (২৪ পরগণা)

একখানি দরকারী বই

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

ঘরে বসে সাবান, কালি, দাঁতের মাজন এবং আরও হরেক রকম রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার সহজ প্রণালী।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ—দাম ১।০

রামধনু কার্য্যালয়,
১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন.প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন. প.। ভি.পি.তে. আরও ৬৯ ন. প বেশী লাগে। নমুনার জন্য ৪০ ন. প.র ডাকটকেট পাঠাতে হয়।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৫। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—ম্যানেজার, রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫ (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

বিজ্ঞাপনের হার (সংশোধিত)

প্রতি বারের জন্য :—

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৫০ টা., অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৮ টা., সিকি পৃষ্ঠা ১৬ টা.। প্রতি কলম ইঞ্চি ৬ টা.
মলাট : ৪র্থ পৃষ্ঠা ১০০ টা.
মলাট : ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা—৮০ টা. অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৪ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২৪ টা.
ছবি বা লেখার সামনের পৃষ্ঠা ৬০ টা., অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৩৬ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২০ টা.

নববর্ষের অনবদ্য উপহার

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার-আশীর্বাদপুত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-ভূমিকা সহ ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত

শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদারের

হাসির তুবড়ি

সরল ও সাবলীল ছন্দে কৌতুকপ্রদ কবিতা ছড়ার মজাদার বই। শৈল চক্রবর্ত্তীর অসংখ্য ছবিতে জমজমাট। ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে, প্রাইজে ও লাইব্রেরীতে উপহার দেবার সেরা হাসির বই। দ্বিবর্ণে ছাপা। দাম—১॥০ টাকা।

সকল দোকানে মিলিবে।

প্রাপ্তিস্থান :—আশুতোষ লাইব্রেরী—
৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স
১৪ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রামধনু-সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি
প্রণীত

ছোটদের বিশ্বকোষ

আনুমানিক ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ

ছেলেমেয়েদের সচিত্র এন্‌সাইক্লোপিডিয়া

১ম খণ্ড যন্ত্রস্থ

প্রাপ্তিস্থান
অভ্যুদয় প্রকাশমন্দির
৬, বংকিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৵০

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	8
Pocket Dictionary	8

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২।০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০৲
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬।।০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

—বঙ্কিম ঘোষ—

সিপাহী বিদ্রোহ—১৲

—কেশব সেন—

কর্ণার্জ্জুন—।।৵০ চন্দ্রগুপ্ত—।।৵০

বিজয়সিংহ—।।৵০

পুরুষ-ভূমিকা-বর্জ্জিত

মেয়েদের নাটক

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের—

মাটির ঘর—।।৵০

SCHOOL FINAL NOTES
by
A. T. DEV
For—1959

Selections from Eng. Prose	3-8-0
Selections from Eng. Poetry	3-0-0
পাঠ-সংকলন	3-8-0
সংস্কৃত-পাঠমালা (Prose)	3 0-0
সংস্কৃত-পাঠমালা (Poetry)	2-0-0
Silas Marner	1-8-0
Robin Hood	1-8-0
A Tale of Two Cties	1-3-0
পথের পাঁচালী	0-12-0
গল্পগুচ্ছ	1-4-0
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা	0-12-0
ভারত-কল্যাণ	0-12-0

অনুবাদ সিরিজ

বেনহুর	১।।০
ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট	১।।০
স্যামসন ও ডালেইলা	১।।০
লাইট হাউস্	১।।০
লাষ্ট অফ্ দি মহিকনস্	১।।০

জীবনী

বধান রায়	১।।০

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

ভূত-পেত্নী

দত্যি-দানা

অসংখ্য চিত্র-সংবলিত দাম—৩৲ টাকা

—পূজাবার্ষিকী—

জয়যাত্রা—৪৲

১৩৬৩ সালের

—আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই করা গল্প—

শোনো শোনো গল্প শোনো—২৲

—দেব সাহিত্য-কুটীর সম্পাদিত—

পুরনো দিনের পুরনো গল্প ৩৲

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

না, খাইয়েছে বেশ, কেমন?

তা আর খাওয়াবে না সবই যে লক্ষ্মী ঘি'য়ে তৈরী

লক্ষ্মী ঘি

উৎসব অনুষ্ঠানে

অপরিহার্য্য

সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ, পবিত্র ও পুষ্টিকর

* * *

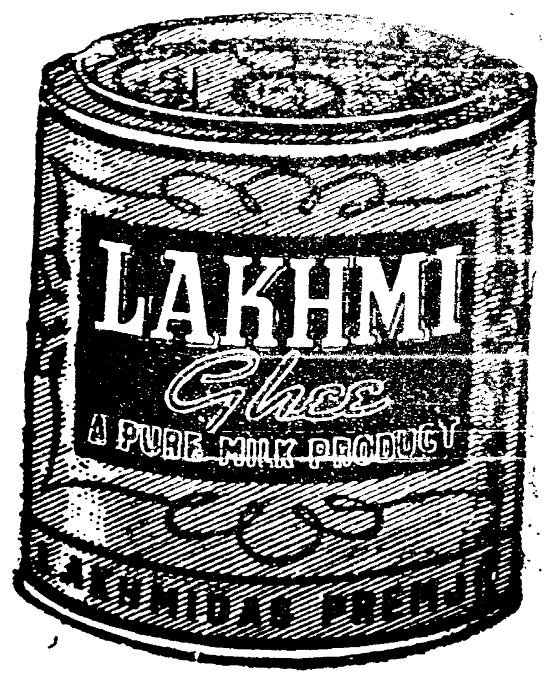

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী ৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন ২২-৭২৪৩

Regd. No. C—

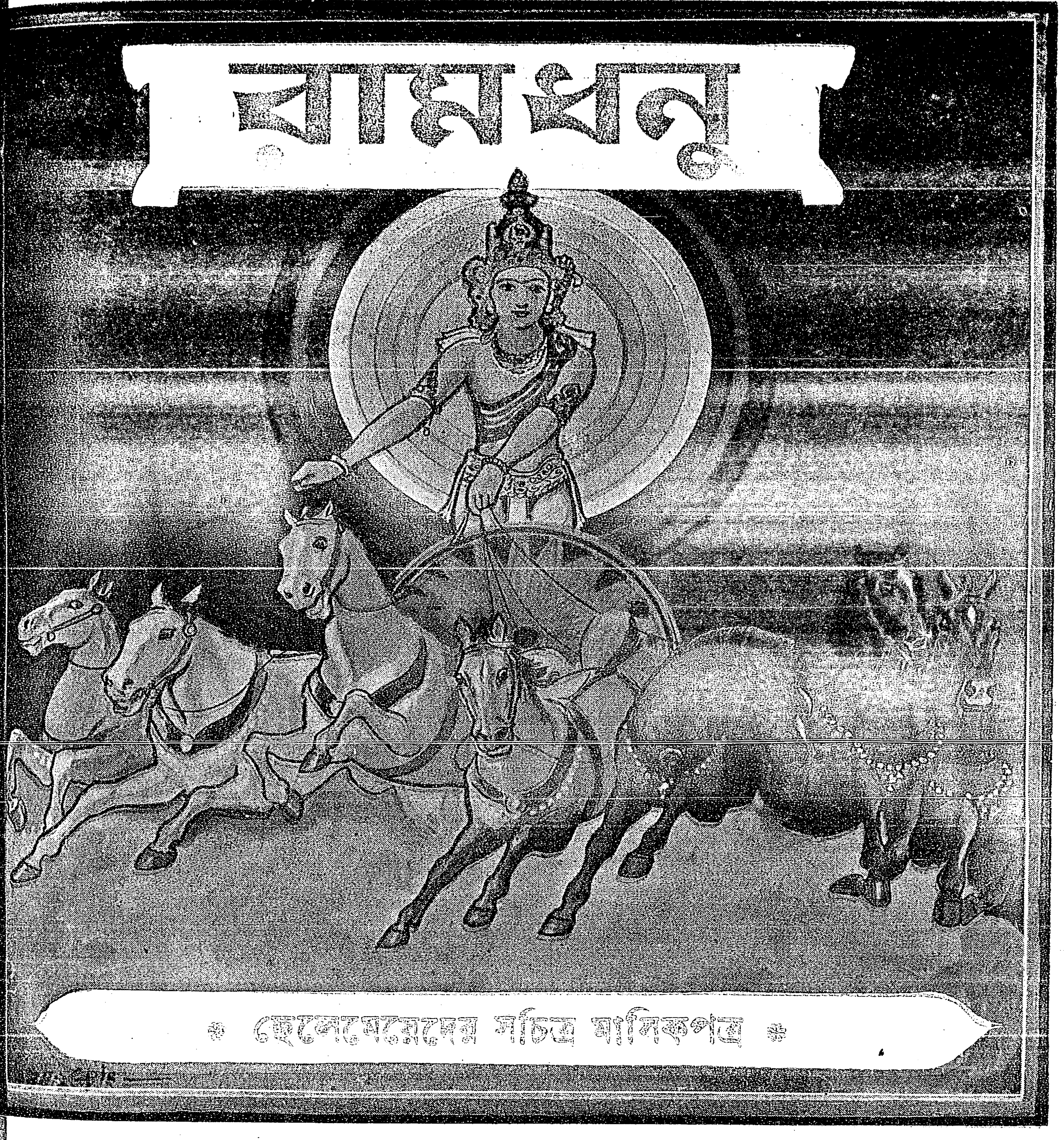

৩০শ বর্ষ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৪

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

বার্ষিক ৪ টাকা
ষাণ্মাসিক টা. ২.২৫
প্রতি সংখ্যা ৩৭ন প.

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

Kirti ADVERTISING AGENCY
REPRESENTATIVE OF
FAMOUS NEWS PAPERS & MAGAZINES
72, HINDUSTHAN PARK • CALCUTTA-29

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন প, প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন. প.। ভি.পি.তে. আরও ৬৯ ন. প বেশী লাগে। নমুনার জন্য ৪০ ন. প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৫। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—ম্যানেজার, রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫ (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

বিজ্ঞাপনের হার (সংশোধিত)

প্রতি বারের জন্য : -

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৫০ টা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৮ টা, সিকি পৃষ্ঠা ১৬ টা.। প্রতি কলম ইঞ্চি ৬ টা.

মলাট : ৪র্থ পৃষ্ঠা ১০০ টা.

মলাট : ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা —৮০ টা. অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৪ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২৪ টা.

রামধনু—

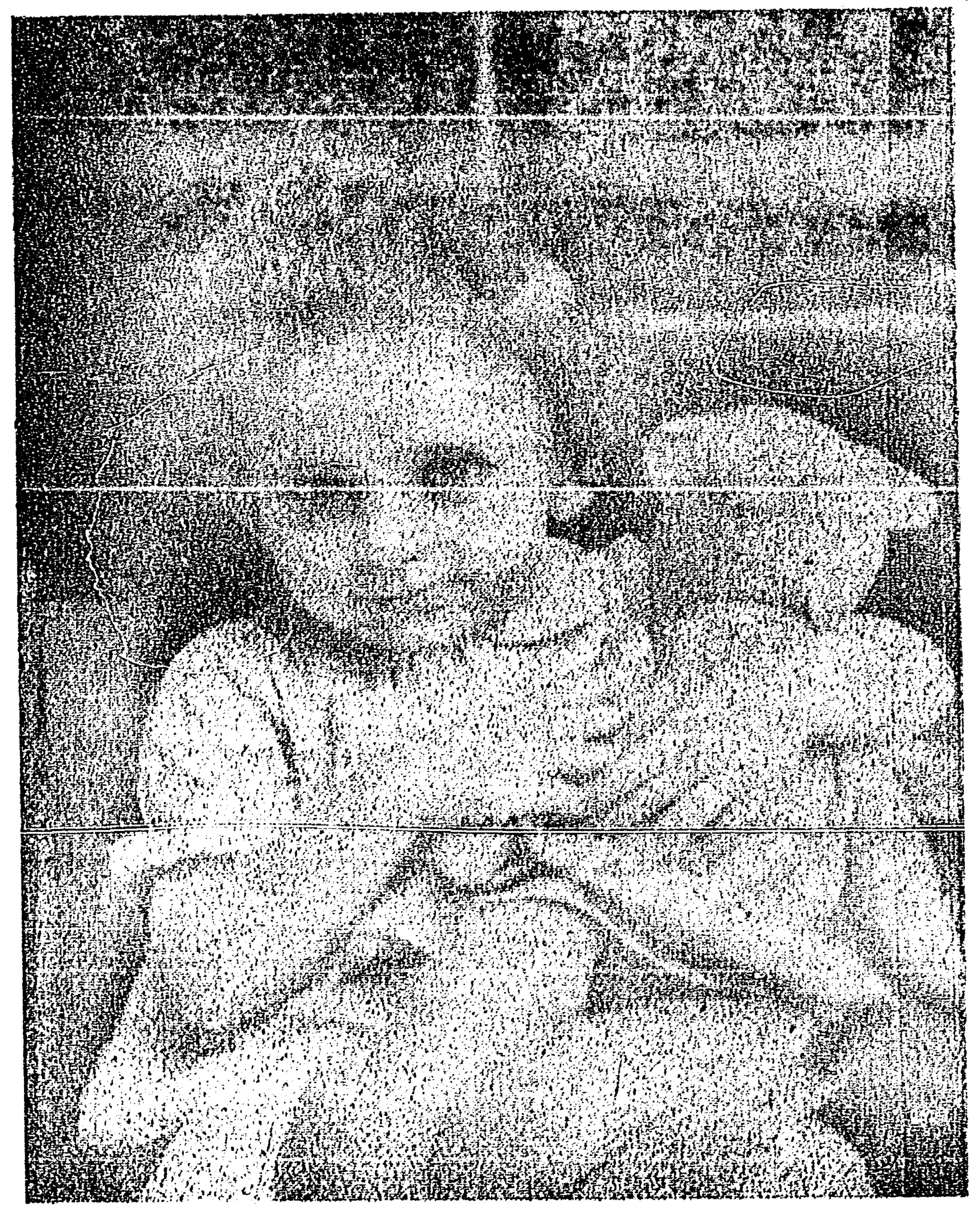

বড্ড ভালবাসি

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪ | ২য় সংখ্যা

সোনামণি-যাদুমণি

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

সোনামণি যাদুমণি
ফুলো গাল তুলতুলে
ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটি
কী যে কথা কী যে মানে
তুলে দুই কচি হাত
আর সব নিঝ্‌ঝুম্‌,
ছটফটে চটপটে
ডায়েরীর পাতা টেনে
আকাশের চাঁদ হায়,
লাল ঝুম্‌ঝুমি পেলে
ও মেয়ে কি যাদু জানে?
মুখপানে চেয়ে তাই

টুকুমণি খুকুমণি,
কালো কোঁকড়ানো চুলে
হেসে খায় লুটোপুটি,
লেখা নেই অভিধানে,
সারা বাড়ী করে মাত,
ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌
অস্থির নটখটে
রাঙাদার 'রাজা' পেলে
ধরতে সে ছুটে যায়—
খুসির ঝিলিক খেলে,
দূরে গেলে কাছে টানে,
আচম্‌কা ভুলে যাই

আয় আয় আয়;
ঢেউ খেলে যায়।
মুখে ফোটে খই;
বিস্মিত হই।
ধেই ধেই নাচে,
পাঁয়জোর বাজে।
কালি ঝুল মেখে,
হিজিবিজি লেখে।
তোলে কলরব;
ভুলে যায় সব।
জাগে হিয়া-মাঝে;
ব্যথাবেদনা যে!

রূপ ও সনাতন

গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের সর্ব্ব-প্রধান কর্ম্মচারী সাকর মল্লিক অমর আর দবির খাস সন্তোষ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসিয়া কি ভাবে রূপ ও সনাতন নাম লইয়া পর পর সংসার ত্যাগ করিলেন সে গল্প তোমাদের আগেই বলিয়াছি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সনাতন মহাপ্রভুর উদ্দেশে চলিয়াছেন। মহাপ্রভু তখন ছিলেন কাশীতে। সনাতন উন্মাদের মত চলিয়াছেন। পথে হাজিপুর গ্রামে আসিয়া রাত্রি হইল। তখন পৌষ মাস, পশ্চিমের দারুণ শীতে তাঁহার শরীর অসাড় হইবার উপক্রম হইল। তিনি ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলেন এবং এক মস্ত বড় খড়ের গাদা সম্মুখে পাইয়া উহার ভিতরে আশ্রয় লইলেন। খড়ের উত্তাপে এইবার তাঁহার শীত নিবারণ হইল, তিনি মনের আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ঐ খড়ের গাদার নিকটেই ছিল একটি মস্ত বড় বাড়ী; সনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকণ্ঠ গৌড়রাজ-সরকারের কাজে আসিয়া ঐ বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। সনাতনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং তখনি গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। সমগ্র গৌড় বঙ্গের সামন্ত রাজারা একদিন যাঁহার দরজায় ধর্ণা দিতেন একটু অনুগ্রহ লাভের জন্য, – সেই রাজচক্রবর্ত্তী সদৃশ মহামন্ত্রীব পরনে মলিন আলখাল্লা! দারুণ শীত, বাহিরে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? কিন্তু সনাতনের সেদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই, শান্ত, স্নিগ্ধ মুখখানি প্রেমে ঢল ঢল, ভাবে গর গর, মাতোয়ারা।

কুটুম্বের অবস্থা দেখিয়া শ্রীকণ্ঠ চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। বহু অনুনয়

করিলেন ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চৈতন্যের প্রবল আকর্ষণ যাহাকে টানিতেছে সে কি আর ঘরে থাকিতে পারে?

বহু চেষ্টায়ও বিফলমনোরথ হইয়া শ্রীকণ্ঠ শেষে একখানি শাল আনিয়া বলিলেন, "বুঝেছি, আপনাকে আর ঘরে রাখা যাবে না। কিন্তু এই দারুণ শীতে আপনার শরীর

দয়া করে এই শালখানি গ্রহণ করুন।

কাঁপছে, এ যে আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে। দয়া করে এই শালখানি গ্রহণ করুন, তবুও আমার কিছু শান্তি হবে।"

মৃদু হাসিয়া সনাতন বলিলেন, "ও সব ত' ছেড়ে এসেছি বন্ধু, আর কেন? তোমার শাল-দোশালা তুমি নিয়ে যাও, আমি বেশ আছি।"

কিছুতেই তিনি ঐ মূল্যবান্ বস্ত্র গ্রহণ করিলেন না। শেষে শ্রীকণ্ঠের কাতর প্রার্থনায় মাত্র তিন টাকা দামের একখানি ভোট কম্বল গ্রহণ করিয়া ভোরবেলা সেই

গ্রাম হইতে চলিয়া গেলেন। কাশীতে চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে ছিলেন মহাপ্রভু। কাশী পৌঁছিয়া সনাতন গেলেন সেখানে, কিন্তু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না, দরজার পাশে বসিয়া রহিলেন। ভক্তের আগমন বুঝিলেন ভগবান্; চন্দ্রশেখরকে ডাকিয়া বলিলেন, "চন্দ্রশেখর, তোমার দরজায় একজন বৈষ্ণব এসে বসে আছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।" চন্দ্রশেখর দরজা খুলিয়া দেখিলেন, কোথায় বৈষ্ণব, দরজার পাশে একজন মুসলমান দরবেশ বসিয়া আছেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "কোথায় প্রভু, দরজায় ত' কোন বৈষ্ণব দেখলাম না!"

মহাপ্রভু আপনাকে স্মরণ করেছেন, আসুন আমার সঙ্গে।

মৃদু হাসিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "কাউকেই দেখলে না?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তা দেখেছি; একজন দরবেশের মত লোক বসে আছেন দরজার পাশে।"

মহাপ্রভু বলিলেন, "উনিই সেই। এখনি গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।"

ছুটিয়া গেলেন চন্দ্রশেখর, দরজা খুলিয়া সনাতনকে বলিলেন, "মহাপ্রভু আপনাকে স্মরণ করেছেন, আসুন আমার সঙ্গে।"

আদেশ হইয়াছে শুনিয়া সনাতনের আনন্দ আর ধরে না চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই

"ভাবে গর গর প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাশ্রু ফেলিলা॥

প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈল সনাতন।
মোরে না ছুঁইও কহে গদগদ বচন॥" চঃ চঃ

গলাগলি দুইজনে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। দেখিয়া চন্দ্রশেখর স্তব্ধ। না জানি ইনি কোন্ মহাপুরুষ, তাই মহাপ্রভু ইঁহাকে বুকে ধরিয়া এমন ভাববিহ্বল হইয়াছেন।

সেই দিনই সনাতন গঙ্গাস্নান করিয়া নিয়ম মত বৈষ্ণব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তপন মিশ্রের বাড়ীতে তাঁহার থাকিবার স্থান হইল। সেইখানে থাকিয়া সনাতন মহাপ্রভুর কথামৃত শোনেন আর আনন্দ-রসে ডুবিয়া যান। এই ভাবে দিন যায়।

হঠাৎ একদিন সনাতনের মনে হইল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে আরামপ্রদ ভোট কম্বল গায়ে দেওয়া মহাপ্রভুর ভাল লাগিতেছে না, কারণ কথাবার্ত্তার ফাঁকে সেই "ভোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বার বার।" তখনি তিনি উঠিয়া গিয়া গঙ্গাতীরে এক বৈষ্ণবকে তাঁহাকে কম্বলখানি দিয়া তাঁহার ছেঁড়া কাঁথাখানি গায়ে দিয়া আসিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভুর আনন্দ আর ধরে না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস॥"—চঃ চঃ

"এ বেশ ভালই হলো। সুচিকিৎসক কখনো রোগের শেষ রাখে না, আজ থেকে তুমি ভব-রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে, শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সম্পূর্ণ আপন করে নিলেন।"

কিছুদিন কাশীতে বাস করার পর মহাপ্রভু সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন, বড় ভাই রূপের সঙ্গে দেখা করিতে। রূপ সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়া প্রয়াগে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহারই আদেশে এখন বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। প্রভুর আদেশে সনাতন বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার যা অবস্থা—

"কভু কান্দে, কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা, কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা, নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণগাথা,
পরিধান ছেঁড়া বহির্ব্বাস।" চঃ চঃ

প্রবলপ্রতাপ বঙ্গেশ্বর হুসেন শাহের দক্ষিণ হস্ত দবীর-খাস অমর আজ কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদ। কাচ এখন কোহিনূরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

দুই ভাইয়ে দেখা হইল, একে অন্যকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রেমাশ্রু ফেলিতে লাগিলেন; তারপর শান্ত হইয়া বসিয়া মহাপ্রভুর কথা বলিতে লাগিলেন। দুই ভাই সেখানে থাকিয়া লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে লাগিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল। সনাতনের মন আবার মহাপ্রভুর

দর্শনের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। ভ্রাতার নিকট বিদায় লইয়া আবার তিনি চলিলেন পুরুষোত্তমের পথে পুরুষোত্তম দর্শনে। পথে পড়িল ঝারিখণ্ডের বন। বনজঙ্গলে অপরিষ্কার ডোবায় স্নান করিয়া গা-ময় দেখা দিল অজস্র চুলকানি আর ফোঁড়া। এই অবস্থায় চলিতে চলিতে সনাতন পুরীতে পৌঁছিয়া হরিদাসের আশ্রমে উঠিলেন।

দোহাই তোমার প্রভু, আমাকে ছুঁয়ো না।

জাতিতে মুসলমান বলিয়া দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি হরিদাস মহাপ্রভুর আশ্রম হইতে একটু দূরে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেন। মহাপ্রভু রোজ ৺জগন্নাথ দর্শনের পর আশ্রমে ফিরিবার পথে হরিদাসকে দেখিয়া যাইতেন। হরিদাসের আশ্রমেই তাঁহার

সহিত সনাতনের দেখা হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই মহাপ্রভু ছুটিয়া গেলেন—দুই হাত পসারিয়া আলিঙ্গন করিতে। ভয়ে অস্থির হইয়া সনাতন বলিলেন, "দোহাই তোমার প্রভু, আমাকে ছুঁয়ো না, সারা গা-ময় আমার ফোঁড়া আর চুলকানিতে ভর্ত্তি। আমি তোমার চরণ স্পর্শ করবার যোগ্য নই।" কিন্তু কে কাহার কথা শোনে? আবেগ ভরে প্রভু আসিয়া সনাতনকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, ফোঁড়া আর চুলকানির ক্লেদ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া গেল। আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন সনাতন—"ছাড় প্রভু, এই অধম পামরের পাপ শরীর ছুঁয়ো না!" মহাপ্রভু শুনিলেন, দেখিলেনও সবই—কিন্তু আলিঙ্গন আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। গদগদ কণ্ঠে প্রভু বলিলেন—

"তোমা স্পর্শ করি আমি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥"— চঃ চঃ

প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল মহাপ্রভুর দুই নেত্র হইতে অবিরল ধারে।

হরিদাসের আশ্রমেই সনাতন বাসা লইলেন। মহাপ্রভু রোজ আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন আর ভগবদ্‌কথা বলেন।

এই ভাবে দিন যায়। আলিঙ্গনকালে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ক্লেদ লাগে, ইহাতে সনাতন মরমে মরিয়া যান। বারণ করিলেও প্রভু শোনেন না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সনাতন মনে মনে স্থির করিলেন যে রথযাত্রার সময় জগন্নাথের রথের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, তাহা হইলে মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ আর কলুষিত হইবে না।

পর দিন মহাপ্রভু আসিয়া সনাতনকে বলিলেন, "সনাতন, এ তোমার কি রকম ব্যবহার!"

"তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।
এ দেহ তোমার নহে—মোর নিজ ধন॥"—চঃ চঃ

"পরের স্থাপ্য ধন নষ্ট করবার ত' তোমার কোন অধিকার নেই! তবে তুমি কোন্ অধিকারে আত্মহত্যা করতে সংকল্প করেছ? শোন সনাতন, তোমার এই শরীর দিয়ে আমি বহু কাজ করব। তোমাকে বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার সম্পূর্ণ করতে হবে, আর করতে হবে ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রেমভক্তির প্রচার। রথযাত্রার পরেই তুমি বৃন্দাবন চলে যাও, আর কাজ আরম্ভ করে দাও।"

মহাপ্রভুর কথায় সনাতনের মত-পরিবর্ত্তন হইল। রথযাত্রার পর তিনি মহাপ্রভুর চরণধূলি মাথায় লইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখে মহাপ্রভুর আদেশ পাইয়া রূপও মহাউৎসাহে কাজে লাগিয়া গেলেন। দুই ভ্রাতার অসামান্য প্রভাবে লুপ্ত তীর্থ সব উদ্ধার হইয়া সমস্ত বৃন্দাবন দেবমন্দিরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্রও লেখা চলিতে লাগিল। রূপসনাতনের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজা-মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দীন-দরিদ্র পর্য্যন্ত তাঁহাদের কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। এই সময় পুরীধামে মহাপ্রভু অপ্রকট হইলেন অর্থাৎ দেহত্যাগ করিলেন। এই খবর শুনিয়া দুই ভ্রাতার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভ্রাতুষ্পুত্র জীবও সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস কবিতেছিলেন। জীব ছিলেন যেমন ত্যাগী, ভক্ত, আবার তেমনি মহাপণ্ডিত। মহাপ্রভুর আদেশে ভূগর্ভ, লোকনাথ প্রভৃতি ভক্ত মহাপুরুষগণও বৃন্দাবনবাস করিতেছিলেন। দুই ভ্রাতা জীবের উপর তাঁহাদের ও সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলের ভার দিয়া পর পর শ্রীকৃষ্ণ-পদে বিলীন হইয়া গেলেন।

মন্দিরে মন্দিরে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

শ্রীরঙ্গম্ যাবার জন্য আমরা বাস্ ধরলাম। ছ' মাইল পথ। কাবেরী নদীর পুল পার হয়ে এসে নামলাম মন্দিরের সামনে।

প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরের চেয়ে দুর্গ বলাই ভালো। পর পর সাতটি পাঁচীল দিয়ে ঘেরা ৪৯৮ বিঘা জমি। সর্বসমেত একুশটি গোপুরম্ অর্থাৎ তোরণ আছে। প্রথম প্রাচীরের চারিপাশে চারটি গোপুরম্। প্রাচীরের মধ্যে মন্দির পরিক্রমণ-পথ, দোকান-পাট, বাজারহাট, বসতবাটি। তারপর আরেকটি পাঁচীল। তার পরে আবার পরিক্রমণ-পথ,

দোকানপাট, বাজারহাট, বসতবাটি। তিনটি পাঁচীল এই ভাবে পার হয়ে চতুর্থ তোরণের পর আসল মন্দির সুরু হ'ল।

এটি যেন একটি দুর্গ। এখানে পাওয়া যায় না, এমন জিনিষ নেই।

প্রাচীরের লম্বা-চওড়ার একটা হিসাব দিলে মন্দির সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাবে ঃ

প্রথম প্রাকার ৩০০০ ফুট লম্বা, চওড়া ২৫০০ ফুট। দ্বিতীয় প্রাকার ২১০০ ফুট লম্বা, চওড়া ১৮০০ ফুট। তৃতীয় প্রাকার ১৬০০ ফুট লম্বা, চওড়া ১২৫০ ফুট। চতুর্থ প্রাকার ১২৩০ ফুট লম্বা, চওড়া ৮৪০ ফুট। পঞ্চম প্রাকার ৭৭০ ফুট লম্বা, চওড়া ৫০০ ফুট। ষষ্ঠ প্রাকার ৪২৫ ফুট লম্বা, চওড়া ২৯০ ফুট। সপ্তম প্রাকার ২৪০ ফুট লম্বা, চওড়া ১৮০ ফুট।

চতুর্থ প্রাকারের গোপুরম্ই সব চেয়ে উঁচু ১৬৪ ফুট। ন' তলা। প্রবেশ-পথ পঁচিশ ফুট উঁচু, বারো ফুট চওড়া। অপূর্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত।

প্রতিটি গোপুরম্ বিরাট

ভিতরে শত স্তম্ভ ও সহস্র স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ। প্রতিটি থামের গায় বড় বড় অশ্বারোহী মূর্তি। এক হাতে খোলা-তলোয়ার, আরেক হাতে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেছে। দেয়ালে দেয়ালে দেবদেবীর অসংখ্য মূর্তি। মূল মন্দিরে আছে নারায়ণ-মূর্তি—রঙ্গনাথ স্বামী। দীপালোকের আবছা অন্ধকারে আমরা প্রথমে কিছু ভাল দেখতে পাই নি, কিন্তু পুরোহিত যখন আমাদের নৈবেদ্যের কর্পূর দিয়ে দেবতার আরতি করলেন, তখন আমরা দেখলাম মন্দিরের মধ্যে একদিক্ থেকে আরেক দিক্ পর্য্যন্ত নারায়ণের শায়িত মূর্তি। অনন্তনাগের উপর তিনি শুয়ে আছেন। মাথার উপর শেষ নাগ তার ফণা ছড়িয়ে দিয়েছে। পায়ের কাছে লক্ষ্মী, ভূদেবী ও শ্রীদেবী; নাভি থেকে উঠেছেন ব্রহ্মা। দশ হাত দীর্ঘ নীল পাথরের তৈরী মূর্তি। মুখে শান্ত, সৌম্য ভাব। এই ধরণের মূর্তি ভারতে আর কোথাও নেই।

এই রঙ্গনাথ স্বামীর মূর্তি বহু প্রাচীন।

ইনি ছিলেম ইক্ষ্বাকু বংশের কুলদেবতা। শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কাবিজয় করে দেশে ফিরলেন তখন মহাধূমধাম করে তাঁর অভিষেক উৎসব হ'ল। অভিষেকের দিনে শ্রীরামচন্দ্র সকলকেই কিছু-না-কিছু দান করলেন। যে যা চায় তাই পায়। বিভীষণ এসে দাঁড়ালেন সামনে। স্বর্ণলঙ্কার রাজা বিভীষণ, তাঁর তো মণিমুক্তার অভাব নেই। শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে আর কি দেবেন? একটু চিন্তা করে শ্রীরামচন্দ্র বললেন—তুমি প্রার্থী, তোমাকে ধনরত্ন কি দেব? তোমার তো কিছুরই অভাব

নেই ! তোমারই মনোমত এক মহা মূল্যবান দ্রব্য আমি তোমাকে দেব। তুমি এই নারায়ণ-মূর্তি নাও, ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম। এই মূর্তি লঙ্কায় স্থাপন করে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করো।

বিভীষণ সানন্দে মূর্তিটি গ্রহণ করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন,—কিন্তু একটা কথা মনে রোখো, পথে মূর্তিটি কোথাও মাটিতে নামিও না।

বিভীষণ পুষ্পকরথে যাত্রা করলেন।

পথে কাবেরী নদী দেখে তাঁর স্নান করার ইচ্ছা হ'ল, তিনি নামলেন। কিন্তু বিগ্রহ তো মাটিতে রাখা চলবে না। এক ব্রাহ্মণ বালককে দেখে তিনি ডাকলেন, বললেন—খোকা, তুমি আমার এই বিগ্রহটি ধরো, আমি কাবেরীতে স্নান করে নিই।

বালক বিগ্রহটি হাতে নিল। বিভীষণ স্নান করতে চলে গেলেন।

ফিরে এসে দেখেন, ছেলেটি বিগ্রহ মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে আছে। বিভীষণ তাড়াতাড়ি বিগ্রহটি তোলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বিগ্রহটিকে তুলতে পারলেন না। বিভীষণের চেষ্টা দেখে বালক হেসে উঠলো।

বিভীষণের বেজায় রাগ হ'ল। এক টুকরো পাথর নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন বালককে। কিন্তু সেই পাথর বালকের গায় লাগবার আগেই বালক বাতাসে মিলিয়ে গেল। বিভীষণ এবার বুঝলেন—এ দেবতার মায়া। সেইখানেই এক মন্দির করে দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি মনের দুঃখে লঙ্কায় ফিরে গেলেন।

সে হ'ল ত্রেতাযুগের কথা।

তারপর একে একে অনেক ভক্ত এই মন্দিরটিকে ধীরে ধীরে বড় করে—সুন্দর করে গড়ে তুলেছেন। এখন এই বিগ্রহের অলঙ্কার যা আছে তারই মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা।

অষ্টম শতকে ভক্ত তিরুমংগই আলোয়ার এই মন্দিরের জন্য অনেক অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর এক একটি শিষ্যের এক এক রকম গুণ ছিল। একজন জানতো ফুঁ দিয়ে চাবি খুলতে। একজন জানতো মানুষের ছায়ার উপর পা দিয়ে তার গতিরোধ করতে। একজন জানতো জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে। এই সব শিষ্যদের কাছ থেকে অলৌকিক উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহ করতেন।

মাঝে মন্দিরের পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। তখন আচার্য্য রামানুজ এই মন্দিরের ভার নেন। তাতে স্বার্থপর পাণ্ডাদের অনেক অসুবিধা হয়।

তাঁরা রামানুজকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ অবধি তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয় নি। আচার্য্য ষাট বছর ধরে এই মন্দির পরিচালনা করেন।

মন্দিরের মধ্যেই একটি পুষ্করিণী আছে, তার নাম চন্দ্র পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পাশেই একটি মণ্ডপে এক স্ত্রীমূর্তি আছে। নিত্য মাখন ও মিশ্রী দিয়ে এই মূর্তির ভোগ হয়।

ইনি কোন এক মুসলমান নবাবের মেয়ে।

নবাব এসেছিলেন মন্দির লুঠ করতে। মন্দিরের রত্ন-অলঙ্কার লুকানো ছিল। নবাব প্রধান পাণ্ডাকে ধরে বললেন—সব বের করে দাও !

প্রধান পাণ্ডা সে কথা শুনলেন না। নবাব তাকে কঠোর সাজা দিলেন। পাণ্ডার কান্না শুনে নবাবের মেয়ে স্থির থাকতে পারলেন না। পাণ্ডাকে ছেড়ে দিলেন ; বললেন,— কিন্তু আপনার দেবতাকে একবার আমি দেখতে চাই।

যবনকন্যার তো হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার নেই। পাণ্ডা বললেন,—আপনাকে তো মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারব না। তবে যদি সত্যি আমার দেবতাকে আপনি দেখতে চান, তাহ'লে আপনার ঘরে বসে তাঁকে ডাকুন, তিনি দেখা দেবেন।

—কতদিনে তিনি দেখা দেবেন ?

—তিন দিনে। আমার দেবতা বড় জাগ্রত। তিন দিনে তিনি দেখা দেবেন।

যবনকন্যা ঘরে এসে একমনে ডাকতে লাগলেন। তৃতীয় রাত্রে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামী সত্যই তাঁকে দেখা দিলেন। নবাব-নন্দিনী রঙ্গনাথ স্বামীর পূজাও করলেন।

এখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য চার মাস থেকে চতুর্মাস্য ব্রত করেছিলেন। মন্দিরের মধ্যে প্রহ্লাদ ও নৃসিংহমূর্তি দেখে তাঁর ভাবাবেশ হয়েছিল।

এখানকার বিখ্যাত শৈব পণ্ডিত ছিলেন বেঙ্কট ভট্ট, চৈতন্যদেব তাঁর সঙ্গে ভক্তিতত্ত্ব নিয়ে নানা আলোচনা করেন। পরে বেঙ্কট ভট্ট বৈষ্ণব হয়ে যান। এখনও তাঁর শিষ্যেরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে পরিচয় দেন।

শ্রীচৈতন্য এখানে নিত্য কাবেরীতে স্নান করতেন ও মন্দিরে কীর্তন করতেন।

শ্রীরঙ্গমের এই মন্দিরটি তৈরী করতে পূরো ষাট বছর লেগেছিল।

শ্রীরঙ্গমের মন্দির থেকে চার মাইল দূরে জম্বুকেশ্বরের মন্দির।

পাঁচটি প্রাকারের মধ্যে ২৪০ বিঘা জমি ব্যেপে প্রকাণ্ড মন্দির।

এখানে শিব জলের মধ্যে বিরাজমান। যেখানে শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত তার

নীচে একটি ঝরণা আছে, সেই ঝরণা দিয়ে কাবেরীর জল নিয়ত উঠছে। পাছে জলে ডুবে যায় সে জন্য লোক আছে, তার কাজ হ'ল জল ছেঁচে ফেলে দেওয়া। দক্ষিণ ভারতে পাঁচটি লিঙ্গ আছে— ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম্। শিবকাঞ্চিতে ক্ষিতি-লিঙ্গ, জম্বুকেশ্বরে অপ্-লিঙ্গ, কালহস্তীতে মরুৎ-লিঙ্গ, চিদাম্বরমে ব্যোম-লিঙ্গ ও তেজ-লিঙ্গ।

এই মন্দিরের মধ্যে সহস্র স্তম্ভের একটি মণ্ডপ আছে, সূর্য্যতীর্থম্ নামে একটি পুষ্করিণীও আছে।

মন্দিরের মধ্যে একটি অতি পুরানো জাম গাছে আছে। এই গাছের নীচেই নাকি শিবলিঙ্গটি পাওয়া গিয়েছিল। গাছটিকে রক্ষা করেই তার সামনে মূল শিব-মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। এই গাছ থেকেই এই লিঙ্গটির নাম জম্বুকেশ্বর।

আবার কেউ কেউ অন্য কথাও বলেন। জম্বুক ঋষির এখানে আশ্রম ছিল বলেই এই দেবতার নাম জম্বুকেশ্বর। জম্বুক প্রতিদিন এই দেবতার পূজা করতেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে জম্বু সাহেবের জঙ্গল ছিল, সেই থেকেই নামটা এসেছে।

এখানে যে পার্বতী-মূর্তিটি আছে তাঁর নাম অখিলেশ্বরী! এখানকার ভক্তদের বিশ্বাস পার্বতী এখনও এখানে তপস্যা করছেন।

মন্দিরের গায় একটি হাতী ও একটি মাকড়সার ছবি খোদাই করা আছে। এই মাকড়সা ও হাতী হ'ল জম্বুকেশ্বরের আদি ভক্ত।

জাম গাছের তলে শিবকে যখন দেখা গেল, তখন মাকড়সা দেখলো শিবের মাথায় কোন আচ্ছাদন নেই। সে জাল বুনে বুনে শিবের মাথায় একটি আচ্ছাদন করে দিল।

হাতী এলো মহাদেবের জলাভিষেক করতে। শুঁড় দিয়ে মহাদেবের মাথায় সে জল দিল। তার চোখে পড়লো মহাদেবের মাথার উপর এক মাকড়সার জাল। সে জালটি ছিঁড়ে দিল।

মাকড়সা আবার জাল বুনে দিল।

হাতী পরদিন এসে আবার জাল ছিঁড়ে দিল।

এই ভাবেই ক'দিন যায়। শেষে মাকড়সা একদিন ভীষণ রেগে হাতীর শুঁড়ের মধ্যে ঢুকে হাতীকে কামড়ালো। বিষের যাতনায় অস্থির হয়ে হাতী মাটিতে শুঁড় আছড়ে মাকড়সাকে বের করলো, তারপর পায়ে চেপে তাকে পিষে মারলো।

কিছুক্ষণ পরে মাকড়সার বিষে হাতীও মারা পড়লো।

শিব তখন ছ'জনকেই আবার বাঁচিয়ে দিলেন। তুই ভক্তকে রেখে দিলেন নিজের কাছে। তুই ভক্তের প্রতিমূর্তি তাই এখন মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা আছে।

মন্দিরটি দক্ষিণের আর সব মন্দিরের মত অপূর্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত।

সেই দিনই তিনটের ট্রেনে আমরা তাঞ্জোর যাত্রা করলাম।

ইতিমধ্যে এক মজার ব্যাপার ঘটলো।

আহারাদির পর হোটেলের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। শিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তী গেছেন পান কিনতে। পান না হলে তাঁর একদণ্ড চলে না।

ফিরে এসে পূর্ণবাবু বললেন—কাজু বাদাম এখানে খুব সস্তা, মাত্র দশ পয়সায় কোয়ার্টার পাউণ্ড, অর্থাৎ আধপো। কিছু কিনলে হয়, পথে খাওয়া যাবে। শ্রীখগেন মিত্র মশাই তখনই চললেন কিনতে। সঙ্গে শিল্পী শ্রীনরেন্দ্র দত্ত। আমরাও সহগামী হলাম।

পূর্ণবাবু, নরেনবাবু, খগেনবাবু প্রত্যেকেই দু' কোয়ার্টার করে কিনে ফেললেন। বললেন—তোমরা কিনবে না?

বললাম—দরকার নেই, আপনারা যা কিনলেন, তা থেকে কিছু কিছু পেলেই চলবে।

দাম দেবার সময় বাধলো গোলযোগ। এঁরা এক একজন পাঁচ আনা করে দিলেন। দোকানদার বললো—মোর মোর, গিভ মোর—আরো দাও।

—কেন?

—কোয়ার্টার পাউণ্ড, প্রাইস, ট' আন্না সিক্স্ পাই।

পূর্ণবাবুও ইংরাজীতে বললেন—তাই ত' দিয়েছি, দশ পয়সা দশ পয়সা, পাঁচ আনা।

— নো নো, কোয়ার্টার পাউণ্ড ট' আন্না সিক্স্ পাই।

আমরা তো থ'।

দোকানী তখন বাকস থেকে ট' আন্না সিক্স্ পাই বের করে আমাদের দেখালো—একটা আধুলী একটা তুয়ানী ও তুটি পয়সা, অর্থাৎ টেন আন্না সিক্স্ পাই।

আমরা ভেবেছিলাম ট' আন্না সিকস পাই, মানে টু-আন্না সিক্স্ পাই।

কিন্তু তখন আর কথা কি, প্রত্যেকে এক টাকা পাঁচ আনা করে দিয়ে এলেন। এক পো কাজু বাদামের দাম এক টাকা পাঁচ আনা। সস্তায় সওদা করার সখ মিটে গেল।

খগেনবাবু বললেন— আর কিছু কিনবো না এখান থেকে। এদের উচ্চারণের এতো দোষ কথাই বুঝি না!

কিন্তু তখন আর কেনার বিশেষ কিছু বাকী নেই। মোটা টাকার সওদা তার আগেই আমাদের হয়ে গেছে মাতুরায়। অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট টাকার সৌখীন মাতুরা শাড়ী সকলেই কিনেছেন। অমন দীপেনও, যে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে কোথাও কিছুই কিনবে না, সেও মাতুরায় বোনের জন্য পনেরো টাকা দিয়ে একখানি শাড়ী কিনে ফেলেছিল।

২৫

ভিট্টল রাও যখন আমাদের সঙ্গে সোজাসুজি ব্যবহার করলেন তখন আমাদেরও ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপেই জানাতে হোল যে তৈমুর লঙের দিল্লী আক্রমণের সময় তখনকার এক বেগম সাহেবা একজন বিশ্বস্ত লোক দিয়ে তাঁদের বহুমূল্য অলঙ্কারাদি তিনটে পাথরের সিন্দুকে বোঝাই করে একটা পুকুরে ডুবিয়ে রাখেন। তারপর সমস্ত রাজপরিবার দিল্লীর প্রাসাদ ছেড়ে দূরে একটা গ্রামে গিয়ে থাকেন। সে পুকুরের বিবরণ আছে বটে পুঁথিতে. কিন্তু আসল জায়গাটার নির্দ্দেশ করা রয়েছে ওই নক্সায়। সেই জন্যই ঠিক জায়গাটা আমরা খুঁজে বার করতে পারি নি।

ভিট্টল রাও বললেন,—আমাদের তুর্ভাগ্য যে আসল পুঁথিখানা হারিয়ে গেল। তাতে হয়তো অনেক কথা জানা যেত।

আমি আর প্রভাস মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। ভিট্টল রাওয়ের এই ধারণা যদি থাকে তবে থাকুক না! আমাদের তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি?

ভিট্টল রাও বললেন,—আমি এই নক্সার উপর নির্ভর করে জায়গাটাকে ঠিক করে নিয়েছি। আপনারা যে কালভার্টকে সে যুগের খালের কালভার্ট মনে করেছিলেন সেটা ঠিক নয়। পুরানো দিনের একটি মাত্র চিহ্ন ঠিক জায়গায় আজও দাঁড়িয়ে আছে, সেটা হচ্ছে ইন্দ্রপ্রস্থ তুর্গ। সুতরাং সেইটাকে কেন্দ্র করে আমাদের যা কিছু অনুসন্ধান করতে হয়েছে।

তিনি নক্সাখানা আমাদের সামনে রাখলেন। তারপর কয়েকখানা কাগজ বার করে তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল আমাদের বোঝাতে লাগলেন। আমরা যে কালভার্টের উপর দাঁড়িয়েছিলাম তার কিছু উত্তরে আর একটা কালভার্ট আছে। সেটা অপেক্ষাকৃত ছোট বলে আমরা তার উপর গুরুত্ব দিই নি। ভিট্টল রাও অঙ্ক কষে দেখিয়ে বললেন, সেইটেই ছিল সে যুগের খাল। সেখান থেকে নক্সা অনুযায়ী দূরত্বে গেলেই পাওয়া যায় যমুনা নদী। এই দীর্ঘকালে সরে গিয়ে আজ সেইখান দিয়ে যমুনার ক্ষীণ স্রোত প্রবহমান।

ভিট্টল রাও বলতে লাগলেন,—ইতিহাস যা বলে তাতে জানা যায় যে দিল্লীর রাজবংশের উপর তৈমুর লঙ কোনও অত্যাচার করেন নি। তাঁদের কেউ দিল্লীতে ছিলেন না, দূরে সরে গিয়েছিলেন, সেটাও কারণ হতে পারে। তা হ'লে অনুমান করা যেতে পারে যে তৈমুর ফিরে যাওয়ার পরেই তাঁরা রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন এবং বেগম সাহেবা নিশ্চয়ই তাঁর অলঙ্কারপত্রের কথা ভুলে যান নি, সেগুলো তুলে আনিয়ে আবার নিজেরা ব্যবহার করেছেন। আর যদি তা না করে থাকেন, তাহ'লে এই দীর্ঘকালে যমুনা সরে গিয়ে যখন ওইখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে তখন সে সব সিন্দুক হয়তো মাটির অতলে চলে গিয়েছে, নয়তো কোথায় ভেসে গিয়েছে। সে বিরাট পুকুর মিলিয়ে গিয়েছে যমুনার গর্ভে। আজ যমুনার যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তখন তো আর যমুনার ঠিক ও রকম অবস্থা ছিল না।

কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত বটে। সত্যই ভিট্টল রাও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি তাতে আর সন্দেহ নেই।

কিন্তু এখন তাহ'লে কি করা যাবে?

ভিট্টল রাও বললেন,—এ অবস্থায় আর অনুসন্ধান চালিয়ে কোনও লাভ আছে কি ?

লাভ নেই সেটা বুঝতে পারছি। তবুও কোনও উত্তর দিলাম না।

ভিট্টল রাও বললেন, এই নক্সা আর মূল পুঁথির বিবরণ যদি ঠিক একই রকম হয়, তাহ'লে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমার অনুসন্ধানের মধ্যে ভুল নেই। এখানকার ন্যাশনাল আর্চিভস (National Archives) থেকে খুব পুরানো ম্যাপও আমি দেখেছি। ঐ জলাশয় বা পুকুর এখন যমুনার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। তাহ'লে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সেই সিন্দুক কি মাটির তলাতেই আছে—না বেগম সাহেবা ফিরে এসে তা তুলে নিয়েছিলেন ? এটা সঠিক জানতে হলে যমুনার তলা খুঁড়তে হয়। সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া 'ট্রেজার-ট্রোভ' আইনের ভয় তো আছেই। একমাত্র উপায়—যদি গভর্ণমেণ্ট থেকে উদ্যোগ করে এবং পয়সা খরচ করে ওখানে খোঁড়ার কাজ সুরু করে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহ'লে ডিরেক্টার অফ আর্কিওলজি—তিনি আমার বিশেষ বন্ধু—একসঙ্গেই আমরা বিলাতে ছিলাম— তাঁকে বলতে পারি।

ভিট্টল রাও থামলেন। সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন,— কিন্তু তার মধ্যেও ভেবে দেখবার একটা কথা আছে। প্রমাণের মধ্যে আমার কাছে এই একখানি ছেঁড়া কাগজের নক্সা। কোন্ পুঁথির পাতা এটা, কে লিখেছিলেন, কেন লিখেছিলেন তার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ এই ছেঁড়া পাতায় নেই। সেটা ছিল সেই পুঁথিতে। কিন্তু সেই পুঁথিই যখন পাওয়া যাচ্ছে না, হারিয়ে বা চুরি হয়ে গিয়েছে—তখন এই একখানা ছেঁড়া কাগজের উপর নির্ভর করে গভর্ণমেণ্ট থেকে যে টাকা খরচ করে ওখানে খোঁড়ার কাজ করতে রাজি হবে তা মনে হয় না। এখন ভেবে দেখুন আপনারা, কি করা যায়।

ভিট্টল রাওয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে সত্যই বড় আনন্দ হোল। তাঁর এবং ইরুলকরের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরলাম।

২৬

প্রভাসকে বললাম,—ভেবে দেখো এখন আর কি করা যেতে পারে। ভিট্টল রাও যা বললেন সেগুলো দামী কথা বলেই মনে হয়।

প্রভাস বললে,—একটি মাত্র কাজ এখন করবার আছে, সেটি হোল দেশে ফিরে যাওয়া। পুঁথিখানা আমরা উদ্ধার করেছি, জিনিষটা আমাদের কাছে থাকবে, এইটেই হোল সব চেয়ে বড় লাভ। ছ'শো বছর আগেকার একটা খাঁটি ইতিহাস, তার দাম

কম নয়। তারপর, বেগম সাহেবার ধনরত্ন যদি মা বসুমতীই গ্রাস করে থাকেন, তাহ'লে ছ'শো বছর পরে আজ সে জন্য আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি কেন ?

সত্য কথাই বটে। কপালে কিছু অর্থদণ্ড ছিল—

প্রভাস বললে,—পূর্ব্বজন্মে বোধ হয় জোহরা বেগমের কাছে কিছু ঋণ করেছিলেন, সেইটে এতদিন পরে শোধ দিলেন।

দিলীপ এই ক'দিন যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। তাকে চাঁদনী চক থেকে একটা ক্রিকেট ব্যাট কিনে উপহার দিলাম। তারপর আবার কোলাহলমুখরিত হাওড়া ষ্টেশনে।

প্রভাসের মেয়ে বললে, - কি ধনরত্ন দিল্লী থেকে নিয়ে এলেন দাদু ?

উত্তর দিলাম, - লাড্ডু।

—শেষ—

অভিমান

শ্রীজ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

চুক্ চুক্ দুধ খায় মেনি বেড়ালে,
আর নেই, আর নেই কাছে দাঁড়ালে।
কেন যে পালিয়ে যায়
খুকু সেই ভাবনায়
সারাদিন ওৎ পেতে থাকে আড়ালে।

এসো নাগো লক্ষ্মীটি, পিঁড়ি পেতে দি,
এখন দুপুর—ঘুমে মা ও ছোড়দি।
চাও যদি দেবো আরো,
অসুখের ভয় করো ?
জান না কি মেজকাকা সেরা বদ্যি !

তবুও তো পুষিমণি খুসী হ'লো না,
কেটে গেল সারাদিন, কই, এলো না।
নেমে এল তাই বুঝি
কালো চোখে সোজাসুজি,
ছলো ছলো জলরাশি—বাধা পেলো না।

হাটতলা

শ্রীপূর্ণেন্দু মল্লিক

আমার গাঁয়ের হাটতলাতে
রবিবারের হাট ব'সেছে,
ব্যস্ত সবাই পথ চলাতে –
ভিন্ গাঁ হ'তে লোক এসেছে।
বদ্যি-বামুন-বাগ্‌দি-হাড়ি—
কেনা এবং বেচার তালে,
দূর যেন এক পাল্লা পাড়ি
দিচ্ছে সবাই ভোর সকালে।

আমার মনে একটা কথাই
জাগছে শুধু ফিরে ফিরে,—
নানান্ মানুষ নানান্ গাঁয়ের
হেথায় এসে মিল্‌ল কি রে !
এ নয় শুধু মিলন-ভূমি,
পুণ্যভূমি যায় তো বলা ;
পথিক, মাথা নোয়াও তুমি,
তীর্থ মোদের এ হাটতলা।

রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী

—দুই—

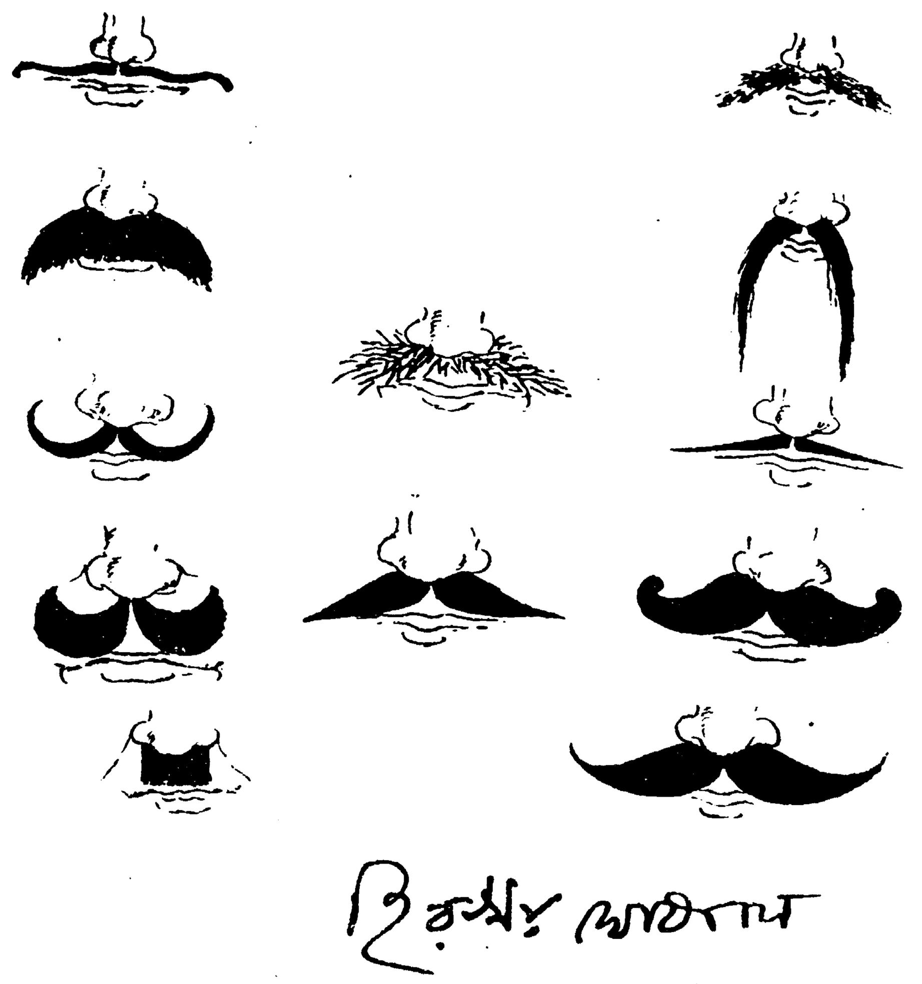

জন্তুটা যে হাতী নয় সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। অথচ ও ধরণের পায়ের ছাপ আর কী জন্তুর হতে পারে? রায় বরুয়া প্রত্যেকটি চিহ্ন বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। হঠাৎ একটা ছাপের মধ্যে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলেন। মস্ত কুনকের মত গর্তটার সামনের দিকে স্পষ্ট দু'-তিনটি নখের দাগ, হিংস্র জন্তুর থাবার নখের মত। কিন্তু অত বড় থাবা সবচেয়ে বড় কোনো কেঁদো বাঘেরও হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কী জন্তু সেটা হতে পারে তা রায় বরুয়া শিকারের অভিজ্ঞতার আঁতেকোণে প্রচুর অনুসন্ধান করেও স্থির করতে পারলেন না। অবশ্য সে যে-ই হোক্ গরু চুরি যে তারই কাজ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই রইলো না। এবং সে যে-ই হোক্, রায় বরুয়া যে তাকে আপন সুহৃৎ 465 (৪৬৫)-এর সাহায্যে ঘায়েল করতে পারবেন সে বিষয়েও বিশ্বাস হারালেন না। এখন ঐ জন্তুর হদিস পাওয়া যায় কী উপায়ে সেটাই হলো সমস্যা।

গভীর পর্যবেক্ষণে রায় বরুয়া স্থির করলেন, জন্তুটার আবাস ব্রহ্মপুত্রের ওপারের পাহাড়ের জঙ্গলে। সুতরাং সন্তরণ-কৌশলে সুনিপুণ। তা না হলে দু' ক্রোশ প্রস্থের নদ পার হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে রায় বরুয়া 465-এর সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করে তাকে কাঁধে করে নিয়ে এসে সবার নিরাপত্তার ব্যবস্থায় ব্যাপৃত হলেন। ঠিক হলো অন্যান্য গরুগুলোকে একেবারে বাড়ীর ভেতর রাখা হবে। তাঁর দুই দরোয়ান এখন থেকে শুধু উর্দী পরে দরোয়ান সেজে বেড়াবে না, তারা আপন

আপন দোনলা ১২ বোর বন্দুকে কার্তুজ ভরে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। নদীর ধারে মোটার-বোট এমন ভাবে তৈরী রাখা হবে যে এক মুহূর্তে আংটায় বাঁধা শিকল খুলে মাঝ-দরিয়ায় পাড়ি দেওয়া যায়।

সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো বটে, কিন্তু জন্তুটার দেখা পাওয়া গেলো না বহুদিন। তার পর একদিন সেই স্বপ্নে-শোনা গর্জন শোনা গেলো মাঝরাতে। সঙ্গে সঙ্গে সেই আলতো আলতো ঝপ্ করে শব্দ। তারপরই ঘোড়ার আস্তাবল থেকে ভীষণ ঝটাপটির আওয়াজ আর চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দ। রায় বরুয়া শুতেন শিকারী-পোষাক পরেই। 465 হাতে নিয়ে ছুটলেন আস্তাবলের দিকে। বাইরে ফুট্ ফুট্ করছে কাক-জ্যোৎস্না। চারিদিকে প্রায় দিনের মত আলো। দূর থেকে দেখতে পেলেন আস্তাবলের কাঠের দেওয়াল ভূমিসাৎ হয়েছে, এবং ভাঙ্গা দেওয়ালের ওপর দিয়ে তাঁর শখের বাদামী রঙের ঘোড়াটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। গলার দড়ী ছিঁড়ে একপাশে ঝুলছে। মনে হলো গুরুতর রূপে আহত। তার পা টলছে। সে ছুটে পালাবার উপক্রম করতেই কী একটা বিশালকায় জন্তু আস্তাবলের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে ঘোড়াটার ঘাড় কামড়ে ধরে থাবার এক ঝাপটে তাকে ধূলিশায়ী করে ফেললে। ঘোড়াটা তবু কয়েকবার চাট মারতে চেষ্টা করলে বটে কিন্তু জন্তুটা তার ঘাড় কামড়ে ধরে তাকে নিয়ে শূন্যে লাফ দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রায় বরুয়া তখনই গুলি করতে পারতেন। কিন্তু জন্তুর আকৃতি দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। আর ঘটনাটা ঘটলো চক্ষের নিমেষে। পাটকিলে রঙের বিরাট জানোয়ার। গায়ে গোটা দুই-তিন কালো ডোরা। গলায়, মাথায় সিংহের মত কেশর। জন্তুটা জলে লাফিয়ে পড়তেই রায় বরুয়াও নদীর ধারে গিয়ে মোটার-বোট খুলে তার অনুসরণ করলেন। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় সেই কেশর-বেষ্টিত প্রকাণ্ড মাথা, অত বড় ঘোড়াটাকে যেন একটা নেংটী ইঁদুরের মত মুখে করে নিয়ে নদী পার হচ্ছে।

রায় বরুয়া একবার ভাবলেন, সার্চ লাইট্ ফেলে মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়বেন। শিকারীর পক্ষে অমন অব্যর্থ চাঁদমারি আকছার মেলে না। কিন্তু ঘায়েল হয়ে জন্তুটা কী করবে তা অনুমান করা শক্ত। বাঘ হলে তার ঘাঁতঘোঁত তাঁর জানা ছিল। তা ছাড়া মাঝ দরিয়ায় মারলে জানোয়ারটা তলিয়ে যাবে। তারপর ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতে কোথায় যে ভেসে যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ফলে তার মাথাশুদ্ধ ছাল-টাকে যে চমৎকার গালচে হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারতো তা আর হবে না।

রায় বরুয়ার গেছে একটা গাই এবং তাঁর অতি প্রিয় ঐ ঘোড়াটা। জন্তুটার কাছ থেকে দুনো গুণোগার আদায় না করে নিয়ে তাকে ছাড়াই চলতে পারে না।

বর্ষাশেষের ব্রহ্মপুত্র তখন একেবারে টইটুম্বুর। বোটটায় জোরালো মোটার থাকা সত্ত্বেও সেটাকে ঠিক রাখা যাচ্ছিল না। অথচ জন্তুটা অনায়াসে এপার থেকে ওপারে সরাসরি সাঁতার দিয়ে চললো! কিছু দূর গিয়ে গিয়ে ঘোড়াটা মুখে নিয়েই একবার পিছন ফিরে তাকালো। ভয়ঙ্কর সে চাহনি। স্বচ্ছ কাচের মত বড় বড় চোখ দুটোয় যেন লাল অগ্নিশিখা। রায় বরুয়ার দিকে কয়েক মুহূর্ত সেই ভীষণ হিংস্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। ঠিক যেমন করে বাঘে আক্রমণ করবার আগে তড়িৎ-প্রেক্ষণে শিকারীর সাহস ও তৎপরতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেয়, এ সেই দৃষ্টি। রায় বরুয়া বন্দুক উঁচিয়ে তৈরী হয়ে রইলেন। শিকারীর এ চরম মুহূর্ত। এক অনুপলের প্রভেদে মৃত্যু বা জীবন রক্ষা হতে পারে। একবার ভাবলেন গুলি করবেন—চোখ দুটোর ঠিক মাঝখানে, তার প্রশস্ত কপাল লক্ষ্য করে। একটা গুলিতে মারা যাবে না, তবে আক্রমণ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। একদিকে রায় বরুয়ার জীবন-সংশয়, অপর দিকে জন্তুটার মাথা আর ছালের লোভ। এ অবস্থায় কি করা উচিত রায় বরুয়া মনে মনে বিচার করছেন, এমন সময় জানোয়ারটা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার সাঁতার কেটে এগিয়ে চললো। বোঝা গেলো লোভ দুই পক্ষেই। আপন জীবনকে বিপন্ন করে সে ঘোড়াটাকে মুখ থেকে ফেলে দিতে রাজী নয়।

জানোয়ারটা এবার সাঁতারের গতি আরো বাড়িয়ে দিলে। অনুসরণকারীর অভিপ্রায় সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। জলের ওপর তার ত্রিকোণাকার গতিপথের ঠিক মাঝখান ধরে রায় বরুয়া মোটার-বোট চালিয়ে চললেন। উদ্দেশ্য, জন্তুটা যদি আক্রমণ করে তাহ'লে তার মুখ ফিরিয়ে আক্রমণ করার উদ্যোগ করতে যেটুকু সময় লাগবে সেইটুকুতেই গুলি চালাবেন তিনি। ক্রমে ওপাশের তীর নিকটতর হয়ে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানোয়ারটা তীরে উঠবে। তীরে উঠে সে কি করবে তা বলা যায় না। হয় ঘোড়াটাকে নিয়ে শূন্যে কয়েকবার লাফ দিয়ে আপন আবাস পাহাড়ী জঙ্গলে উধাও হবে, না হয় ঘোড়াটাকে রেখে সরাসরি আক্রমণ করবে।

রায় বরুয়াকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্থির করতে হলো তাঁর কর্ত্তব্য কী। একবার ভাবলেন, সম্পূর্ণ একাকী ঐ অভূতপূর্ব জন্তুটার অনুসরণ করে সুবিবেচনার কাজ করেন নি। হয়তো তাঁর মোটার-বোট ফিরিয়ে চলে আসা উচিত। কিন্তু শিকারের প্রতি শিকারীর লোভ দুর্দমনীয়। তা ছাড়া রায় বরুয়ার কোষ্ঠীতে কাপুরুষতা নেই। শেষ

পর্যন্ত শিকার করাই স্থির করলেন। কিন্তু ঠিক কোন্ সময়টিতে গুলি ছুড়বেন সে বিষয়ে খুব সতর্ক হওয়া চাই। সামান্য ভুলে তাঁর জীবনান্ত হতে পারে।

দৌড়ঝাঁপ এবং উত্তেজনায় তাঁর অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল। তৃষ্ণায় মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। মাথার ভেতর চিন্তাগুলো যেন জট পাকিয়ে গেছে। একটার সঙ্গে আর একটা, তার সঙ্গে নানা স্মৃতি। কোথায় কবে শিকারে গিয়েছিলেন, কালেজের কোন্ অধ্যাপকের কী মুদ্রাদোষ ছিল, ছেলেবেলায় ঘুড়ী ওড়ানোর কথা, লাট্টু ঘোরানোর কথা, চীনা রোস্তোরাঁয় এক ভোজের কথা, বহুদিন আগে পোষা এক হীরামোহন পাখীর কথা। নানা বিচ্ছিন্ন স্মৃতিতে তাঁর মনকে যেন মায়াজালে আবদ্ধ করেছে। মনস্তত্ত্বে একবার পড়েছিলেন, একটি লোকের ঠিক মৃত্যুর পূর্বে তার জীবনের সমস্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনার স্মৃতি কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ছায়াছবির মত মনে পড়েছিল। তবে কি শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু ঘটবে?

রায় বরুয়া নদী থেকে কয়েক আঁজলা জল তুলে চোখেমুখে ঝাপটা দিলেন। তাঁর মন ক্রমে মেঘমুক্ত আকাশের মত পরিষ্কার হয়ে গেলো। আর সময় নেই। জন্তুটা প্রায় তীরে ওঠবার উপক্রম করছে। জলের ওপর পা ফেলার টানাটানা ছপ্‌ছপ্ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। একটু পরেই ঘোড়াটাকে মাটিতে রেখে সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আক্রমণের জন্য তৈরী হবে। হয়তো লাফ দেবার আগে বাঘের মত তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। কেশরটাও হয়তো ফুলে উঠবে। চোখে জ্বলবে হিংসা-বহ্নি—ক্রূর, অবিচলিত শিখা: তারপর বিদ্যুতের হানা। মুহূর্তের একটি আণবিক বিন্দুতে যেটুকু সময় ততটুকুর মধ্যে গুলি করা চাই।

রায় বরুয়া গুলি করলেন জন্তুটার মাথা লক্ষ্য করে, পর পর দু'বার। ঠাঁই ঠাঁই করে গুলির আওয়াজ নিস্তব্ধ রাত্রি ভেদ করে দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হলো। তার সঙ্গে সঙ্গে উঠলো আকাশ-কাঁপানো বজ্রনাদ। গুরুগম্ভীর মেঘগর্জনের মত আওয়াজ করে জন্তুটা আহত মুমূর্ষু বাঘের মত নিজের একটা থাবা কামড়ে মৃত্যুযন্ত্রণার উপশম করতে চেষ্টা করতে লাগলো। রায় বরুয়া শিকারীদের রীতি অনুসারে আরো গোটা দুই গুলি বসিয়ে তীরে নামলেন।

সেই প্রথম তাঁর চোখে পড়লো জন্তুটার বাস্তবিক আকৃতি। সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় বাঘ দৈর্ঘ্যে হয় নাকি বারো কি তেরো ফুট। এর দৈর্ঘ্য প্রায় আঠারো ফুট। বাঘের মত ধড়, অথচ মাথাটা সিংহের মত। এ জানোয়ার কেউ কখনো দেখেছে বলে মনে হয় না। বাঘ আর সিংহে মেশানো এ সিংভ্র। সিংহের মত শক্তিশালী আর বাঘের মত ক্রূর ও ধূর্ত্ত। প্রাচীন কালের আসিরিয়া বা ব্যাবিলনিয়ায় যে ধরণের সিংহ

পাওয়া যেতো তারই হয়তো একটা ভারতবর্ষে এসে কোনো বাঘিনীর সঙ্গে ঘর-সংসার পেতে দু'-একটা বাচ্চা রেখে গিয়েছিল। এ হয়তো তারই বংশধর। রায় বরুয়া বললেন.—তার কেশর লম্বা, সোজা সোজা কতকটা মিশরের স্ফীংক্স্-এর প্রতিমূর্তির মত। তাঁর ধারণা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পাহাড়গুলোয় খোঁজ করলে এ-ধরণের জানোয়ার দু'-একটা পাওয়া অসম্ভব নয়।

মাথা আর ছালটা নাকি অনেকদিন ছিল ডিব্রুগড়ে রায় বরুয়ার বাড়ীতে। কিন্তু আজ সে বাড়ীও নেই, সিংহের দেহাবশেষও নেই।

সম্প্রতি শীতের সময়ে গিয়েছিলাম ও অঞ্চলে। ব্রহ্মপুত্রের মাঝখানে ধূধূ করছে বালুচর।

সুখময়বাবুর সুখ্যাতি

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

হাতীবাগানের পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখা হ'ল সুখময়বাবুর সঙ্গে। তিনি খপ্ করে আমাকে ধরে ফেলে টানতে টানতে নিয়ে চললেন। যেন তিনি চোর ধরেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম—আহা, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

সুখময়বাবু বললেন—চলো না, একটু মার্কেটিং করে আসি।

তারপর আচমকা আমাকে ছেড়ে দিলেন। আমি তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে এক হিন্দুস্থানী ফলওয়ালার উপর পড়লাম।

হিন্দুস্থানী ফলওয়ালা তখন তার কমলালেবুর ঝুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছিল—লে বাবু জোড়া এক আনা—জোড়া এক আনা।

আমার ধাক্কা খেয়ে হিন্দুস্থানীর মুখে হিন্দী বোল আরো জোরালো হয়ে উঠল। 'ইয়া সীতারাম' বলে জোরে চেঁচিয়ে সেও ঝুড়িশুদ্ধু ছিটকে পড়ল তার পাশের আর এক লেবুওয়ালার উপর।

পাশের লেবুওয়ালা তখন ডবল জোরে চেঁচাচ্ছিল—লে বাবু জোড়া দু' আনা—জোড়া দু' আনা।

ও যেমন ডবল জোরে চেঁচাচ্ছিল—লেবুগুলোও ছিল ডবল সাইজের। সে জন্য দামও ডবল—দু'আনা।

কিন্তু এক আনা দামের লেবুওয়ালার ধাক্কা ও সইতে পারল না। লেবুর ঝুড়িশুদ্ধু ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। এক আনা দামের লেবুর সঙ্গে ওর দু'আনা দামের লেবু মিশে গেল।

ধাক্কার চাইতে এখন লেবু মিশে যাওয়ার দুঃখটাই বেশী।

এক আনা দামের লেবুওয়ালা বলল—হামারা লেবু উস্‌মে ঘুসা গিয়া—

দু' আনা দামের লেবুওয়ালা বলল—হামারা লেবু উস্‌মে ঘুসা গিয়া—

সুরু হয়ে গেল এক আনার সঙ্গে দু' আনার লড়াই। আমি এই সুযোগে সট্‌কে পড়লাম। অর্থাৎ সুখময়বাবুই আবার টান মেরে আমাকে সরিয়ে নিলেন।

এবার সুখময়বাবুর বাজার করার পালা।

রুই মাছ থেকে সুরু করে কাঁচা লঙ্কার দর পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কিন্তু কিনলেন না কিছুই। শুধু বাজারের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ঘুরতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কি সুখময়বাবু, আপনি না মার্কেটিং করবেন বলেছিলেন ?

সুখময়বাবু হেসে বললেন—মার্কেটিং করা কি এতই সহজ ? ভাল করে মার্কেটিং করতে হলে সব কিছুর খোঁজ-খবর রাখতে হয়। জানো, সে জন্যই খবরের কাগজের পাতায় বাজার-দর থাকে, রেডিওতে রোজ বাজার-দরের কথা বলে। যারা কালো-বাজারী করে বড়লোক হয়েছে তারা সবাই রোজ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাজার-দর মুখস্থ করে। এ সব খবর রাখো কি ?

সুখময়বাবু ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় থামলেন। একটি লোক পটল বিক্রী করছে। সুখময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন – কত করে সের ?

দোকানদার বললে – সাত আনা।

সুখময়বাবু পটলের দিকে পিট পিট করে চেয়ে তারপর চোখ দুটোকে ছানাবড়া করে ফেললেন। বললেন – কি ডাকাতে কথা ! শিয়ালদায় ছ' আনা সের, আর এখানেই সাত আনা ? ছয় আনা করে হবে ?

পটলওয়ালা বলল—না বাবু, ছয় আনায় ঐ ছোট পটল হবে। বলে পাশের একটা ঝুড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল।

সুখময়বাবু এ জবাবে মোটেই খুসী হলেন না। তিনি এগিয়ে চললেন। আর আমিও 'মহাজ্ঞানী মহাজন'-এর পথে অনুসরণ করলাম।

কিন্তু তখন কি জানতাম যে মহাজ্ঞানী মহাজনের পথ এত দীর্ঘ ? সে পথের

শেষ নেই! সুখময়বাবু চলতেই লাগলেন। বাজার থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তাটা পেরিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে সুরু করলেন। তারপর সার্কুলার রোডের ট্রাম-রাস্তায় এসে পড়লেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাবেন সুখময়বাবু?

সুখময়বাবু জবাব দিলেন—শিয়ালদা।

ভাবলাম তিনি ট্রামে উঠবেন এবং আমাকেও এবার রেহাই দেবেন। কিন্তু দু'টোর কোনটাই করলেন না। ফুটপাথ ধরে হেঁটে সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলেন এবং আমাকেও পাকড়াও করে নিয়ে চললেন।

বলতে লাগলেন—দেখলে, পটলওয়ালা কি ডাকাত! এখান থেকে শিয়ালদা যেতে কতক্ষণ লাগে? ট্রামে গেলে পাঁচ মিনিট আর বাসে গেলে চার মিনিট। আর হেঁটে গেলে বড় জোর পনের মিনিট।

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম—না, হেঁটে গেলে আধ ঘণ্টার কম লাগবে না।

সুখময়বাবু চোখ চড়কগাছ করে বললেন—কি বললে? আধ ঘণ্টা! তুমি কি কচ্ছপ নাকি হে? না হাতী? নতুন জামাইএর মত গজেন্দ্রগমনে চলবে!

আমি লজ্জা পেলাম, কথা বললাম না। নিঃশব্দে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলাম। পেছনে পড়তে সাহস হয় না। কি জানি, সুখময়বাবু আবার কি বলে বসবেন। তাই তাঁর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে লাগলাম।

সুখময়বাবু শিয়ালদার বৈঠকখানা বাজারে ঢুকলেন। আবার তিনি ঘুরতে লাগলেন এদিক্ থেকে ওদিকে,—বাজারের এক সীমানা থেকে আর এক সীমানা পর্য্যন্ত।

বাজারে ইলিশ মাছ থেকে সুরু করে কুচো চিংড়ি পর্য্যন্ত দর করলেন। পালং শাক থেকে পুদিনা শাক পর্য্যন্ত। ভাবলাম, সুখময়বাবু বুঝি সারা বৈঠকখানা বাজারটাই কিনে ফেলবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আমার ভুল ভাঙল। দেখলাম সুখময়বাবুর লক্ষ্য ঠিক আছে। আবার পটলের বাজারের সামনে গিয়েই তিনি থামলেন। বড় বড় একঝুড়ি পটলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—দেখলে, যেমন সেরা বাজার, তেমনি সেরা জিনিষ!

সুখে আত্মহারা হয়ে সুখময়বাবু কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কত করে হে?

পটলওয়ালার পেটটা উইয়ের ঢিপির কত উঁচু। তাতে হাত বুলাতে বুলাতে সে জবাব দিল—বারো আনা সের বাবু!

—বা-রো-আ-না!! বলে বারো হাত পিছিয়ে এলেন সুখময়বাবু। ছিটকেই হয়তো পড়ে যেতেন, যদি না ছুটে গিয়ে আমি তাঁকে ধরে ফেলতাম।

অনেক কষ্টে তাল সামলিয়ে সুখময়বাবু আবার উঠে এলেন। আর এক পটলওয়ালার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন—কত করে সের?

পটলওয়ালা বলল—আজ্ঞে, সাত আনা।

সুখময়বাবু বললেন—কালকে ছ'আনা দেখলুম, আজই সাত আনা? তোমরা কি দিন দিন ডাকাত হচ্ছ?

পটলওয়ালা দাঁত বের করে হেসে বলল—দাম বেড়ে গেছে বাবু! তা কতটা নেবেন? আড়াই সের না পাঁচ সের?

সুখময়বাবু বললেন—দেড়পো।

—মোটে দেড় পো? দোকানদার যেন হতাশ হয়ে পড়ল। তারপর পালা পাথর হাতে তুলে নিয়ে বলল—আচ্ছা নিন।

সুখময়বাবু পটল বাছতে লাগলেন। সে-ও এক দেখবার মত বাছাই। এক একটা পটলকে দশবার করে টিপে, এধার ওধার ঘুরিয়ে, কখনো চোখের কাছে এনে, আবার কখনো বা একটু উঁচুতে রেখে চলতে লাগল তাঁর পটল পরীক্ষা। সীতার অগ্নি-পরীক্ষাও বোধ হয় এতটা জোরালো ভাবে হয় নি।

পটলওয়ালা হাঁ করে তার পটলের দুরবস্থা দেখতে লাগল।

প্রায় দশ মিনিটে গোটা দশেক পটল বেছে নিয়ে সুখময়বাবু বললেন—না হে, দেড় পো নয়, তিন ছটাকই দাও।

কথা শুনে পটলওয়ালার প্রায় পটল তোলার মতই অবস্থা। বলল—এ রকম আর দুটো খদ্দের এলেই হয়েছিল আর কি! কলকাতা ছেড়ে কাশী যেতে হতো।

কপালের উপর একটু করাঘাত করে দোকানদার তিন ছটাক পটল ওজন করে দিল। ওজনে উঠল পাঁচটি পটল। সুখময়বাবু বললেন—তিন ছটাকে মোটে পাঁচটি পটল? তিন দুগুণে ছয়টিও নয়? তোমরা যে কি ওজন দাও আজকাল! সোনার চেয়েও বাড়া! তারপর পটল ক'টা পকেটে পূরে সুখময়বাবু এগিয়ে চললেন। বলা বাহুল্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে চললাম।

এবার সুখময়বাবু সুরু করলেন পটলের গুণকীর্ত্তন। বললেন—পটল দিয়ে কত রকম রান্না হয় জানো? পটলের ডালনা, পটলের চচ্চড়ী, পটলের দো-পেঁয়াজী, পটলের কোর্ম্মা, আরো কত কিছু। আমি পটল ভাজা খেতে তো খুব ভালবাসি. আর আমার এক দিদি পটল দিয়ে কম হলেও পঞ্চাশ রকম রান্না করতে পারেন। তিনি পটলের দোলমা এত ভাল রাঁধতে পারেন যে তুমি একবার খেয়েছ কি জীবনে ভুলতে পারবে না। চিরকাল তোমার জিভে লেগে থাকবে তার স্বাদ।

—এত ভাল ? আমি লোভীর মত জিজ্ঞেস করলাম। খিদেয় আমার পেট জ্বলছিল। কাজেই অমন উপাদেয় দোলমার নাম শুনেই জিভে জল এল।

সুখময়বাবু বলতে সুরু করলেন—তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না। সেই দোলমা রেঁধে দিদি ষোলটা সোনার মেডেল পেয়েছিলেন। তুমি তাঁর হাতের দোলমা খেলে বুঝতেই পারবে না পটলের দোলমা খাচ্ছ না দোলনায় চড়ে দোল খাচ্ছ !

এমন সময় একটা গলির মুখে এসে সুখময়বাবু থামলেন। বললেন - আচ্ছা, তাহলে এখন আসি। তুমি কোন্ দিকে যাবে ?

আমি বললাম—বাড়ীর দিকে, হাতীবাগান।

সুখময়বাবু বললেন—আমি এ বেলাটা এখানেই থাকবো। সেই দিদির বাড়ী এখান থেকে খুব কাছেই কিনা। পটল যখন কেনাই হ'ল তখন দিদির হাতে দোল্‌মা খাওয়াটা ছাড়ি কেন ? আচ্ছা, আবাব দেখা হবে।

বলে সুখময়বাবু গলির ভিতর ঢুকে পড়লেন।

আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এখান থেকে যেতে হবে হাতীবাগান ! এতটা পথ ! পকেটে যে একটি পয়সাও নেই।

পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—একটি স্যাণ্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে গেছে।

বেচারী স্যাণ্ডেলের দোষ কি ? ওর উপর ধকল্ তো কম যায় নি !

রামধনুর দাদু

শ্রীমঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য্য

রামধনুর ভাইবোনেরা, তোমরা তো ভাই, রামধনুর দাদু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লোকান্তরের কথা এবং তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা শুনেছ। আজ আমি তোমাদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছু গল্প বলব। রামধনুর মত তিনি আমারও নিজের দাদু কিনা ! তিনি যে কি রকম বিদ্বান, সাহিত্যরসিক ও আইনজ্ঞ ছিলেন তোমরা তা শুনেছ। এত সব গুণের অধিকারী হয়েও তিনি যে কেমন আত্মভোলা, উদাসীন ছিলেন তা শুনলে তোমরা অবাক্ হবে। তা ব'লে যেন মনে ক'র না তাঁর রসবোধের অভাব ছিল। কথা অবশ্য কমই বলতেন, কিন্তু রসিকতা, কৌতূহল এবং নানা ব্যাপারে উৎসাহের অন্ত ছিল না তাঁর।

ছেলেবেলায় অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি বাড়ীতে একরকম একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী ছিলাম। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই দাদুর সঙ্গে কাটতো, তাই তাঁর ওপর আব্দারটাও চলতো খুব। দাদুর সব কাজের

সঙ্গী ছিলাম, সেজন্য দাদুর চেনামহলের অনেকেই আমাকে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী বা একান্ত সচিব বলত। যদি কখনও সঙ্গে না থাকতাম তবে তাঁরা বলতেন,—আজ আপনি একা, সেক্রেটারী কোথায় ? ছোটবেলায় রোজ সন্ধ্যে বেলায় দাদুর কাছে নানা বিষয়ের গল্প, রামায়ণ মহাভারতের গল্প, তাঁর ছেলেবেলাকার, কর্মজীবনের গল্প শুনতে আমার খুব ভাল লাগতো, আর তিনিও এ সব গল্প করতে বেশ ভাল বাসতেন। তাঁর আবার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ।

দাদু ছিলেন আমাদের প্রাইভেট টিউটর। সেই হাতে খড়ি থেকে কলেজের পড়া সবই তাঁর কাছে শেখা। পড়াশোনার ব্যাপারে কোন রকম ফাঁকি চলত না তাঁর কাছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ নির্ভুল শিখি ততক্ষণ নিস্তার নেই। কাকার কাছে গল্প শুনেছি যে কাকাদের ছেলেবেলায়ও দাদুই ছিলেন মাষ্টার। আর কী কড়া মাষ্টার ! পরীক্ষায় ফুল্ নম্বর থাকত ১০০, পাশ নম্বরও ১০০। তৃতীয় ভাগ শেষ করে পরীক্ষা দেবার সময় কাকা একবার সাড়ে নিরানব্বই পেয়ে গেলেন। দাদু বললেন, 'ফেল'। শেষে অনেক কান্নাকাটির পর কয়েক দিন বাদে ফের কম্পার্ট্‌মেণ্টাল পরীক্ষা হ'ল। এবারে কাকা পাশ নম্বর ১০০ পেয়ে তবে পাশ করলেন। আমাদের বেলায় অবশ্য তাঁর অত কঠোর ব্যবস্থা ছিল না। বোধ হয় আমরা আর এক ধাপ নীচে বলে স্নেহটা আর একটু গাঢ় হয়ে এসেছিল। তবুও মনে আছে, তখন কলেজে পড়ি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন পনেরো আগে দাদু ডাকলেন।—"দেখি তোর কেমন প্রিপ্যারেশন হ'ল ? নিয়ে আয় বই। ইংরাজী আগে আন্।" শুনে তো বুক কাঁপতে লাগলো, কারণ ফাঁকি দেবার মতলবে কোনও কোনও "পীস্" স্রেফ্ বাদ দিয়ে পড়েছি; সেগুলো থেকে জিজ্ঞাসা করলেই তো গেছি ! বিশেষ করে মিল্‌টনের খুব বড় দুটি পদ্য আমাদের পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত ছিল, আর পণ্ডিত দাদুর সে দু'টোই ছিল খুব প্রিয়। সে দু'টোর ব্যাখ্যা, মানে, প্রশ্নোত্তর—সব কিছুই নিজে লিখে দিয়েছিলেন দাদু। কিন্তু মিল্‌টনের ঐ দাঁতভাঙ্গা শব্দ—প্রতি পদে রকমারি 'র‍্যালিউশন্' অর্থাৎ পুরানো প্রসঙ্গের ছড়াছড়ি,—ও আমার ভাল লাগবে কেন ? কাজেই ও-দু'টো খুব ভাল করে তৈরীও হয় নি। কিন্তু কি করা, ভয়ে ভয়ে বই নিয়ে এলাম। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই—! ২।৪টে এটা-ওটা প্রশ্নের পর ও দু'টোর একটা মুখস্থ বলতে বললেন। মুখস্থ-টুখস্থ আজকাল পরীক্ষায় বড় একটা আসে না, তাই করিও নি। শুনে খুব রেগে গেলেন, বল্লেন, "ফাঁকি দিয়ে লেখাপড়া হয় না। আর মুখস্থ ছাড়া কবিতা শেখা হয় ? যা, মুখস্থ করে আন্।" তখন আমার অবস্থাটা ভাব একবার ! কবিতাটি প্রায় দু'শো লাইনের।

সংস্কৃত ভাষা দাদুর খুব প্রিয় ভাষা ছিল। তাঁর ইচ্ছা ছিল সংস্কৃত নিয়েই আমি পড়ি। যখন হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হ'ল, তখন তিনি বলেছিলেন, "সংস্কৃতই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত ছিল, কারণ প্রাচীনকালে তো ঐ ভাষাই আমাদের সারা ভারতবর্ষে চলত ! আর কত শ্রুতিমধুর ভাষা !" তখন স্কুলে পড়ি নীচু ক্লাসে। দাদুর কাছে সংস্কৃত পড়ছি। একটা প্রশ্ন করলেন, উত্তর সংস্কৃতেই দিতে হবে। আমিও তাই দিলাম। উত্তর শুনে হেসে বল্লেন, "এ যে সেই পণ্ডিতের ছোট জামাইয়ের মত হ'ল রে !" তার মানে জিজ্ঞাসা করাতে একটি গল্প বল্লেন। এক সংস্কৃত পণ্ডিতের তিন জামাইয়ের মধ্যে, বড় দু'জন খুব বিদ্বান্, ছোটটি তেমন নয় এবং সে ঘরজামাই থাকে। পণ্ডিতের বাড়ীতে এক তর্কের আসর বসবে, বড় দু'জামাই আসবে তাতে যোগদান করতে। তাই শুনে ছোট মেয়ে তার স্বামীকে

খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে দিল। কারণ একে সে বড় দু'জামাইয়ের মত বিদ্বান্ নয়, তার ওপর সংস্কৃত তো জানেই না। ছোট জামাই যে ঘরে লুকিয়ে ছিল সে ঘরেই তর্কের আসর বসল। সে খাটের নীচে ব'সে ব'সে সব শুনছে। কিছু পরে সে লক্ষ্য করল যে সব কথার পরেই একটা করে অনুস্বর বা বিসর্গ দিয়েই শেষ হচ্ছে কথা। বা-রে, তা হলে আর তার লুকিয়ে থাকার কি দরকার। সে তখনই বেরিয়ে এসে বলল, "অনুস্বরং দিলেং যদিঃ সংস্কৃতং হং, তবেং কেনং ছোটং জামাই খাটের তলায় রং?" অর্থাৎ অনুস্বর-বিসর্গ দিলেই যদি সংস্কৃত হয়, তবে ছোট জামাই আর কষ্ট করে কেন? সেও তো তা হলে সংস্কৃত জানে। আমার উত্তরও সে রকমই হয়েছিল বোধ হয়, তাই দাদুর এই পরিহাস।

বয়সে দাদু বৃদ্ধ হলেও ছোটদের মতই তাঁর সব কিছুতেই ছিল কৌতূহল। কলকাতায় ষ্টুডেণ্ট্ মুভ্মেণ্ট চলছে, ছাত্রেরা ষ্ট্রাইক, পিকেটিং করছে, ট্রাম-বাস্ পোড়াচ্ছে; পুলিশও তাদের ওপর গুলি, লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ছাড়ছে। তখন একদিন দুপুর বেলায় কি একটা দরকারী কাজে দাদু গিয়েছেন টালীগঞ্জে। সেখান থেকে যাবেন ডালহৌসী স্কোয়ার। ফেরবার সময় দেখেন ট্রাম-বাস্ বন্ধ হয়ে গেছে। অনুসন্ধানে জানলেন, ছাত্রেরা শোভাযাত্রা করে ডালহৌসী স্কোয়ারে গিয়ে মিটিং করবে, পুলিশ দেবে না যেতে, ছাত্ররা যাবেই, তাই এই অবস্থা। সেই শুনে তিনি টালীগঞ্জ থেকে হাঁটতে হাঁটতেই চলে গেলেন ডালহৌসী স্কোয়ারে। এদিকে বাড়ীতে হৈ-হৈ কাণ্ড। রাতও হয়েছে অনেক, কিন্তু দাদুর দেখা নেই। সবাই ভেবে অস্থির। বাড়ী আসতেই সবাই চেপে ধরলাম, "এমন দিনে কোথায় গিয়েছিলে?" হাসতে হাসতে বললেন, "টালীগঞ্জ থেকে ডালহৌসী পর্য্যন্ত ঘুরে দেখে এলাম। গাড়ী বন্ধ, তাই হেঁটেই গেলাম।" শুনে তো সবাই অবাক্। বলা হ'ল, "এ ভাবে কেউ যায়?" তেমনি হেসে দাদু উত্তর দিলেন, "আমি কি ভিড়ের ভেতর গেছি নাকি?"

এর পরও, যখন তাঁর আশী বছর বয়স, তখন তিনি একদিন তাঁর পায়ের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য বালীগঞ্জ থেকে হেঁটে সোনারপুরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে খুব গর্ব করে বললেন আমাদের, "দেখ্ তো, এই আশী বছর বয়সেও কি রকম হাঁটতে পারি! এখনও পায়ে আমার বেশ জোর আছে দেখলাম।" অবশ্য মনে হ'ল তাঁর পায়ের জোরের থেকেও মনের জোরটাই বেশী ছিল, তাই এতটা সম্ভব হয়েছিল।

বালীগঞ্জে দাদুর বেয়াই · আমাদের আর এক দাদামশাই (কাকীমার বাবা) ৺অধ্যাপক নিবারণ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে দাবার আড্ডা বসত। মাইল দেড়েক পথ, কিন্তু সেখানে দাদু হেঁটেই যেতেন রোজ। বলতেন, ট্রামের ভিড়ের চাইতে এতেই আরাম। দাবা খেলার দারুণ নেশা ছিল, আর খুব ভাল খেলতেও পারতেন। দাদু ছাড়া আরও অনেক নাম-করা পণ্ডিত—বেশীর ভাগই বড় বড় প্রফেসর,— সে আড্ডায় যোগদান করতেন। দাদুকে কিন্তু খুব কম লোকেই হারাতে পারতেন। খেলায় সবচেয়ে বেশী প্রতিযোগিতা হ'ত—যেদিন দাদুর ভগ্নীপতির (অবসরপ্রাপ্ত হেড মাষ্টার ৺অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে খেলা হ'ত। দু'জনেই খুব ওস্তাদ খেলোয়াড় ছিলেন। কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারতেন না। কিন্তু এমন ওস্তাদ্ খেলোয়াড় দাদুকেও একদিন আমার মত আনাড়ি খেলোয়াড়ের কাছে পরাস্ত হ'তে হয়েছিল। ব্যাপারটা কি জান? তখন ব্ল্যাক আউটের যুগ।

সন্ধ্যাবেলায় দাদু আর বালীগঞ্জে খেলতে যেতেন না। আমাকে দাবা খেলা শিখিয়েছিলেন এবং আমার সঙ্গেই খেলতেন। রোজ খেলি। প্রথমে আমি দাদুর দানগুলো দেখে দেখেই আমারটা দিতাম। যদি তিনি বড়ে চালতেন, আমিও বড়ে দিতাম, গজ দিতেন তো আমিও তাই। শেড দেওয়া আলোর নীচে খেলছি। দাদুর পক্ষে আলোটা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। দু'দান খেলেছি, পরে যেমন একটু সুযোগ পেয়েছি, দিলাম এক কিস্তি। রাজা সরালেন দাদু। পরের কিস্তিতে কিন্তু আর রাজার পালাবার পথ নেই, রাজা কাৎ। দাদুর ভাষাতেই দাদুকে বল্লাম, "এই কিস্তি মাৎ।" প্রথমে বল্লেন, "কি করে হ'ল?" বল্লাম, "রাজার পালাবার পথ কোথায়?" দেখে হাসতে হাসতে

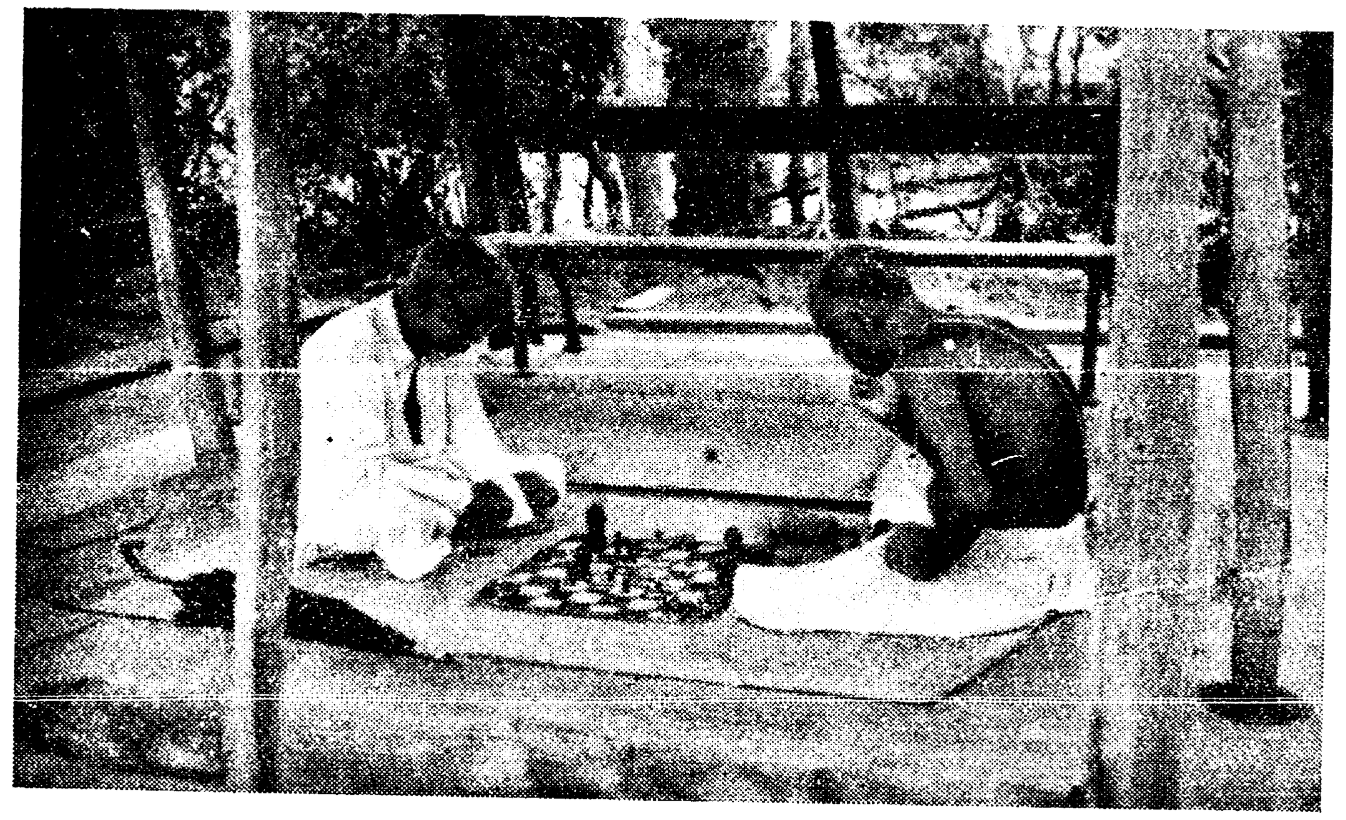

দাবায় মশগুল
দাদু আর তাঁর বেয়াই (৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও ৺অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) একদিন যখন দাবা খেলায় ব্যস্ত, তখন আড়াল থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল এই ফটোটা।

বল্লেন, "ও তাই তো, আগে দেখতে পাই নি। আলোটাও তো ভীষণ মিটমিটে। খুব খেলোয়াড় হয়েছিস তো।" আমার অবশ্য দাদুকে সেই প্রথম এবং শেষ হারানো।

দাদু মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করতেন যে তিনি এককালে যে দর্শনের ছাত্র ছিলেন তা বেশ বোঝা যেত। খুব পুরু কাচের চশমা পরতেন দাদু। চশমা হয়তো চোখেই আছে, খুঁজছেন কোথায় গেল চশমা। ডাকলেন চশমা খুঁজে দেবার জন্য। এসে দেখি চশমা তার জায়গায় সুন্দর ভাবে বসে আছে। বলতেই হেসে বলতেন, 'তাই নাকি, আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।' আর চাবি? সে তো রোজই হারাতো। সমস্ত বাড়ী খোঁজা হ'ত। প্রায়ই দেখা যেত যে জামা গায়ে

আছে তার পকেটেই কিংবা কোমরে গোঁজা আছে। তাই যখনই চাবি হারাতো, ও দুটো জায়গা দেখে তবে অন্য জায়গায় খোঁজা হ'ত। মোজা হয়তো একটি পায়ে দিয়েছেন খেয়াল নেই, আর একটি হাতে নিয়ে খুঁজছেন অন্যটি কোথায় গেল। জুতোর ব্যাপারে একবার খুব মজা হয়েছিল। দু' জোড়া জুতোর একটি একটি নিয়ে পায়ে দিয়ে পার্কে গেছেন। তাও আবার একটা কালো, একটা ব্রাউন। ফেরার পর দেখা গেল দু' জোড়ার দু' পাটি দু' পায়ে। একটি নিজের, অন্যটি আর একজনের। দেখে বল্লাম, "এ কি করেছ, দু' রকম জুতো পরে রাস্তায় গিয়েছিলে। লোকে দেখে তোমাকে কি ভাবলো বল ত' ?" নিজের পায়ের দিকে নজর দিয়ে বললেন, "সত্যি নাকি? কই, হাঁটতে কোন অসুবিধা হয় নি তো। আর পায়ের দিকে কে দেখতে গেছে?" জামা-কাপড়ও কখনও মানান সই পরতে দেখি নি কোন দিন। ধুতি, যত লম্বা বহরই হোক, হাঁটুর ওপরে উঠবেই। কিন্তু একবার এর থেকেও মজার ব্যাপার হয়েছিল, শোন। বালীগঞ্জে তো রোজ যেতেন খেলতে। ঘড়ি ও ছাতা এ দুটোও ছিল নিত্যসঙ্গী। তখন শীতকাল। তবুও যথারীতি ছাতা ও ঘড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। বাড়ী ফেরার পর দেখলেন হাতে ঘড়ি নেই। দামী সোনার ঘড়ি—ঠাকুমা সখ করে কিনে দিয়েছিলেন। খোঁজ খোঁজ সব জায়গায়, কোথায় গেল ঘড়ি? বালীগঞ্জেও খোঁজ নেওয়া হ'ল। ঘড়ি পাওয়া গেল না। শেষে ঠাকুমার পাল্লায় পড়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু ঘড়ির সন্ধান পাওয়া গেল না, এবং পাওয়া যাবে না বলেই ধরে নেওয়া হ'ল। এর পর প্রায় মাস ২।৩ পরে ছাতা নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন। যেই ছাতা খুলেছেন, ঝুপ্ করে কি যেন মাটীতে পড়ল। দেখা গেল যে ঘড়ির জন্য এত কাণ্ড সেই হারানিধি। কখন হাত থেকে খুলে ছাতার শিকের মধ্যে আটকে ছিল, এ ক' মাস চোখেই পড়ে নি।

দাদু সমস্ত বিষয়েই আইন মেনে চলতেন। ট্রামেই তিনি বেশী যাতায়াত করতেন। যদি কখনও ট্রামের ভীড়ের দরুণ টিকেট করতে ভুলে যেতেন এবং নির্দিষ্ট ষ্টপেজে নেমে পড়বার পর মনে পড়ত তা হ'লে ফের চলতেন ট্রামডিপোতে ভাড়ার পয়সা জমা দেবার জন্য। আমাদের দেশের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হয়। দাদু পূজোর খরচের জন্য টাকা পাঠাতেন। একবার পাঠাবার সময় ডাকলেন আমাকে। চিঠি ও টাকা সীল মোহর করে ইনসিওর করা হবে, তার সাক্ষী থাকার জন্য। টাকা হাতে দিয়ে গুণে দেখতে বললেন, যাতে মিথ্যে সাক্ষী না থাকি। যদি কখনও ঐ টাকা খোয়া যায় তবে নাকি সাক্ষী দিতে হবে, তাই। বাড়ীতে কখনও চুরি হলে দাদু কাগজ-কলম নিয়ে হিসেব করতে ব্যস্ত হতেন—কত টাকার জিনিষ চুরি গেল তার হিসেব থানায় জমা দিতে হবে। জিনিষের জন্য খুব বেশী দুঃখিত হতেন ব'লে মনে হ'ত না, হিসেবটা ঠিক মত দেওয়া হলেই তিনি নিশ্চিন্ত। যুদ্ধকালীন ইভ্যাকুয়েশনের সময়ে আমরা কৃষ্ণনগরে ছিলাম। সেখানে প্রায়ই চোরের উপদ্রব হ'ত। একদিন রাত্রে আমাদের বাড়ীর উঠোনে খুব জোরে কিছু একটা পড়ার শব্দ হ'ল। সেই শব্দে উঠে পড়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করল সবাই। আলো জ্বেলে দেখা গেল চোর নয়, এক বস্তা আম উঠোনে পড়ে। হয়তো অন্য কোন বাড়ী থেকে চুরি করে পাঁচীল বেয়ে পালাবার সময় তাড়া খেয়ে ফেলে গেছে। দাদুর হুকুম, কেউ যেন চোরের জিনিষ না ধরে। পরের দিন। প্রায় মাইল খানেক দূরে থানা, দাদু চাকরকে সঙ্গে করে ঐ বস্তা থানায় জমা দিতে চল্লেন। থানা থেকে

বল্ল, "আপনার বাড়ীতে চুরি হয় নি তো, তবে আর কি, ও বস্তা আপনি বাড়ী নিয়ে যান।" দাদু উত্তর দিলেন, "না, আমার বাড়ীতে চোরাই মালের জায়গা হবে না। এটা থানাতেই জমা দেবার নিয়ম, তাই থাকবে।" সেদিন মুখে যাই বলুক, থানার লোকেরা যে খুব খুসী হয়েছিল তা আর বলতে! (কেন তা তো বুঝতেই পারছ!)

দাদুর ধারণা ছিল তিনি খুব সাবধানী লোক। বিশেষ করে টাকা-পয়সা নিয়ে রাস্তায় যাতায়াতের সময়। কিন্তু তাঁর অত সাবধানতা সত্ত্বেও প্রায়ই তাঁর পকেট কাটা যেত। পিক্-পকেট হ'ত প্রায়ই। হয়তো একশ' টাকার নোট নিয়ে বাজারে গেলেন, ভাঙ্গিয়ে দশ টাকার বাজার করলেন, বাকী নব্বই টাকাই গাঁটকাটা নিয়ে গেল। বাড়ী এসে হিসেবের খাতায় লিখতেন—পকেট কাটায় খোয়া গেল ...এত টাকা। মনে হ'ত দাদুর বুঝি কোন রকম দুঃখই নেই তার জন্য। তবে হিসাবটা ঠিক মত লেখা থাকা চাই। ভারি মজা লাগতো সেগুলো পড়তে। রাস্তায় যাতায়াতের সময়ও অন্যমনস্কতার দরুণ কতবার যে দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। একবার তো এক মোটরের ধাক্কাই খেলেন। পড়ে গিয়ে অনেক জায়গা কেটে গেল। বাড়ী ফিরে চুপি চুপি আমাকে ডেকে টিংচার আইওডিন লাগিয়ে দিতে বল্লেন। জিজ্ঞাসা করতে বললেন, "মোটরের ধাক্কায় একটু ছড়ে গেছে।" আবার বল্লেন, "তোর ঠাকুমাকে কিছু বলিস না যেন।" ঠাকুমার কাছে প্রায়ই বকুনি খেতেন কিনা তাই। সময় সময় এত অন্যমনস্ক ভাবে চলতেন যে পাশ দিয়ে পরিচিত লোক গেলেও নজরে পড়ত না তাঁর; অথবা একবার তার দিকে উদাস-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার ফের চলতে সুরু ক'রতেন হয়ত। কোনদিন যে তাকে আগে দেখেছেন বা চেনেন সে ভাবের কোন চিহ্ন থাকত না মুখে।

দাদু কখনও তাঁর নামে বাড়িয়ে কিছু বলা পছন্দ করতেন না। যা সত্য নয় সে বিষয়ে কিছু বল্লে রেগে যেতেন। একদিন এক কোম্পানী থেকে দাদুর নামে একটা চিঠি এলো। তাতে তাঁর নামের আগে পরে রায় বাহাদুর ও M.A., P.R.S. লেখা ছিল। চিঠি দেখে একটু হাসলেন। পরে সেই ফার্ম্‌কে চিঠি লিখে জানালেন, "আমি একজন রায় বাহাদুর নই। আর P.R.S. তো নই-ই, এমন কি M.A ও না।"

মাঝে মাঝে দাদুর কতকগুলো উদ্ভট খেয়াল হ'ত। বাগানের সখ তাঁর বরাবরই ছিল। তাই সহরতলী সোনারপুরে একটা বাগান কিনেছিলেন। বাগানের কি নাম দেওয়া যায় তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে, দাদু বললেন, "কি আর নাম দেওয়া যাবে—নাম থাক 'বুড়োর খেয়াল'।" ফরিদপুরেও তিনি এ রকম একটি বাগানবাড়ী করেছিলেন। নিজের হাতে গাছ লাগাবার খুব সখ ছিল। মাটী খুঁড়বারও। অনেক দিন দেখা গেছে, চড়া দুপুর রোদে মাথায় ভিজে তোয়ালে দিয়ে, খুরপী নিয়ে আমাদের কলকাতার বাড়ীর সামনে যে ছোট্ট একটু বাগান মত আছে, সেখানে মাটী খুঁড়ছেন। ওপর থেকে ঠাকুমা দেখতে পেয়ে বকুনী। মৃত্যুর দু'দিন আগে, আমার এক পিসতুত দিদি (দাদুর কাছেই তিনি মানুষ) এসেছেন দাদুকে দেখতে। দাদু হঠাৎ তাঁর ফরিদপুরের বাগানের গল্প করতে সুরু করলেন। বললেন, "জানিস, লোকে দেখে বলত—ভট্টাচার্য্যের আশ্রম।"

দেশভ্রমণের বাতিক ছিল দাদুর ভীষণ। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের কোন জায়গাই বোধ হয় বাদ

দেন নি ঘুরতে। কাশ্মীর থেকে সুরু করে তক্ষশিলা, আটক, কুরুক্ষেত্র—কোন্‌টা দেখেন নি ? আর প্রত্ন-তত্ত্বের গন্ধ পেলে তো কথাই নেই। তা ছাড়া ছিল ফি বছর চেঞ্জে যাওয়া। সে সুযোগে আমরাও অনেক জায়গায় ঘুরেছি। শেষ বয়সে যখন বাইরে বেরুতে পারতেন না তখন রেডিও ছিল দাদুর নিত্যসঙ্গী। পল্লীগীতি, বাউলগান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন - সবই শুনতেন মন দিয়ে। আর যখন ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ হ'ত, তখন তো নাওয়াখাওয়া ভুলে যেতেন। সর্ব্বক্ষণ রেডিওর পাশে বসে রীলে শুনছেন ! সে কী উৎসাহ ! কে বলবে ৮৭ বছর বয়স ?

দাদুর খুব ইচ্ছে ছিল, আমি রামধনুতে বা অন্য কোন মাসিক পত্রিকাতে গল্প-কবিতা লিখি। কিন্তু লেখা-টেখা আমার তেমন আসে না। তিনি বলতেন, "আমাদের বাড়ীর সকলে পারে, তুই শুধু দল-ছাড়া। আমি, তোর বাবা, কাকা, পিসীমারা, ঠাকুমা, কাকীমা, ভাইরা—এমন কি তোর থেকে কত ছোট রত্না, পম্পা (রত্নাবলী ও সুচেতা) পারে আর তুই কেন পারবি না ?" যদি বলতাম, "আমি পারি না, কি করবো ?" তখনই হাসতে হাসতে ছোট ছেলের মত আবৃত্তি করতেন "পারিব না ও কথাটি বলিও না আর" কবিতাটি।

তাই আজ লিখতে বসে দুঃখ হচ্ছে, দাদু থাকতে তাঁর কথা রাখতে পারি নি। কিন্তু তাঁর কোন্ কথা ছেড়ে কোন্ কথা লিখবো ঠিক করতে পারছি না। তবু দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা, তাঁর কথা নিয়েই আজ প্রথম লিখছি। হয়তো পরপার থেকে দাদু দেখছেন—তাঁর কথা নিয়েই লিখছি। খুসীও হচ্ছেন বোধ হয়।

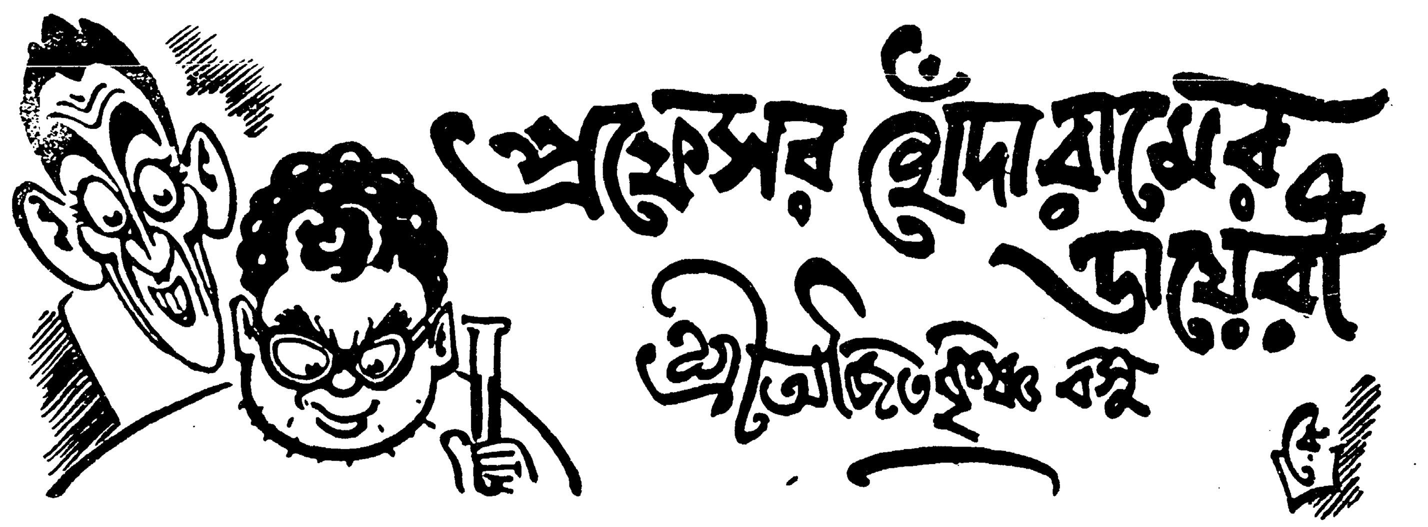

* বিদায়-অভিনন্দন *

অ্যাল্‌বামের পাতায় ফোটো দেখে অনেক দিন পর আজ বাংলার মাষ্টার ভূপতিবাবুর কথা মনে পড়ে গেল। ভেবে দেখ্‌লুম তাঁর কথাটা ডায়েরিতে লিখে রাখা দরকার।

ভূপতিবাবু বাংলা বড় বেশী ভালো জান্‌তেন, আর ভালো বাস্‌তেন। ঐটেই ছিল আমাদের বিপদ, কারণ বাংলা, আমরা যত ভালো বাস্‌তুম তত ভালো জানতুম

না। জান্‌তুম না বললেই ভূপতিবাবুর যত রাগ। বল্‌তেন, মাতৃভাষা ভালো না জানার ক্ষমা নেই। বেছে বেছে শক্ত শক্ত প্রশ্নের জবাব চাইতেন আমাদের কাছে, আর ভালো জবাব দিতে না পার্‌লে কানমলা, রাম-চিমটি, বেঞ্চির ওপর দাঁড়ানো, মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে' থাকা, চড়-চাপড় ইত্যাদি নানা রকমের সাজা সইতে হতো ; তার ওপর পিলে-চম্‌কানো ধমক তো ছিলই।

হাস্‌তে জানতেন না তিনি। ক্লাশে পড়ার সময় কাউকে হাস্‌তে দেখ্‌লে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন। অবশ্য এ কথাটা স্বীকার কর্‌ব যে খেলার মাঠে খেল্‌বার সময় আমরা যত খুসী হাসি আর হল্লা করি না কেন, তাতে তাঁর আপত্তি ছিল না।

ভদ্রলোক এককালে হয়তো কুস্তিটুস্তি লড়্‌তেন। ও বয়সেও দিব্যি জবরদস্ত চেহারাখানা ছিল। আর হুঙ্কার যখন ছাড়্‌তেন তখন মনে হতো জালার ভেতর থেকে আওয়াজ আস্‌ছে।

হেড্‌মাষ্টার মশাই তাঁকে ভয় করতেন কিনা জানি না, কিন্তু সমীহ করতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমাদের ক্লাশে বরাবর প্রথম হতো রমেন, কিন্তু তবু ভূপতিবাবুর হাতের কানমলা তাকেও খেতে হতো মাঝে মাঝে। এতটুকু ভুলও তিনি সইতে বা ক্ষমা কর্‌তে পার্‌তেন না। যেন বাংলা আমাদের মাতৃভাষা ব'লে বাংলায় আমাদের সবাইকে সবজান্তা হতে হবে।

এক কথায় সারা ইস্‌কুলের ছাত্রমহলে তিনি ছিলেন মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকা। পড়া যতই ভালো মত তৈরী থাক, তবুও সারাক্ষণ আমাদের মনে ভয় থাক্‌তো ভূপতিবাবু কোনো না কোনো প্যাঁচ কষে জব্দ করে আমাদের গাঁট্টা লাগাবেন।

একবার অসুখ হয়ে কয়েকদিন তিনি বাড়ীতে শয্যাশায়ী ছিলেন। মিছে কথা বল্‌লে বল্‌তে হয় আমরা দুঃখিত হয়েছিলুম, কিন্তু সত্যি কথাটা এই যে আমরা সবাই প্রার্থনা করেছিলুম আরো বেশ কিছু দিন যেন তিনি বিছানায় পড়ে থাকেন। কিন্তু ভগবান্ আমাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন নি। অল্প দিন পরেই তিনি আবার আস্‌তে সুরু করলেন, এবং এই ক'টা দিন আমরা যে নিশ্চিন্ত আরামে ছিলুম তার শোধ তুল্‌তে লাগ্‌লেন আরো কড়াকড়ি, আরো জ্বালাতন করে।

আমরা কেউ যে তাঁকে সইতে পারি না, পছন্দ করা বা ভালো বাসা তো দূরের কথা, তা তিনি বুঝ্‌তেন। বুঝে হয়তো বেশ মজাও পেতেন। হয়তো আমাদের ভক্তি আর শ্রদ্ধার চাইতে আমাদের ভয় আর ঘৃণাই তাঁর কাছে বেশী লোভনীয় ছিল।

বল্‌তে এখন দুঃখও হয়, লজ্জাও হয়. আমাদের ক্লাশের কোনো কোনো ছেলে এমনও প্রার্থনা কর্‌তো যেন ট্রাম বা বাস্‌ চাপা পড়ে পঙ্গু হয়ে ভূপতিবাবু আর স্কুলে মাষ্টারী করতে না পারেন। উনি একেবারে খতম্‌ হয়ে গেলেও হয়তো আমাদের অনেকেই খুশী হয়ে হরির লুট দিত। কিন্তু তেমন আশা দুরাশা মাত্র। রাস্তায় চলাফেরায় ভূপতিবাবু ছিলেন ভয়ানক রকম হুঁশিয়ার। তা ছাড়া চোখে যেমন তিনি চমৎকার দেখ্‌তেন, কানেও তেম্নি চমৎকার শুন্‌তেন। সুতরাং তিনি যে কোনো নিদারুণ দুর্ঘটনায় ঘায়েল হয়ে আমাদের খুশী করবেন, এমন সম্ভাবনা ছিল না।

এই যখন অবস্থা, তখন একটা আশাতীত সুখবরে আনন্দে আমাদের প্রায় মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হলো। কল্‌কাতার বাইরে নতুন অথচ বেশ বড় ইস্‌কুল হয়েছে একটা, তাতেই চলে যাচ্ছেন ভূপতিবাবু। আমাদের স্কুলে তিনি ছিলেন সাধারণ মাষ্টার, ঐ নতুন স্কুলে গিয়ে হবেন সহকারী হেড্‌মাষ্টার, আর মাইনেও পাবেন বেশী। ঐ পদের জন্যে আরো কয়েকখানা বেশ ভালো দরখাস্ত পড়েছিল, কিন্তু স্কুলের কর্ত্তারা ভূপতিবাবুর অভিজ্ঞতা আর ছাত্র শাসনে দক্ষতার কথা বিবেচনা করে তাঁকেই মনোনীত করেছেন। তিনিও যেতে রাজী হয়েছেন।

আমাদের ভেতর যারা ভগবান্‌কে অবিশ্বাস কর্‌তে সুরু করেছিল, এ খবর পেয়ে তারা এইবার ভয়ানক বিশ্বাসী হয়ে উঠ্‌ল। এতদিনে ভগবান্‌ মুখ তুলে চেয়েছেন। আপদ বিদায় হবে, অনেক রেহাই পাবো। চাঁদা তুলে বেশ ঘটা করে' আমরা হরির লুট দিলুম।

আমাদের স্কুল-ক্লাবের সেক্রেটারী ভূতনাথ তখন বল্‌লে, "উনি আমাদের অনেক জ্বালিয়েছেন সত্যি. কিন্তু তবু ভদ্রতার খাতিরে আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাঁকে বেশ ভালো করেই একটা বিদায়-অভিনন্দন দেওয়া। আর তো উনি আমাদের জ্বালাবেন না।"

চন্দন বল্‌লে, "এ কথাটা ভাই, ভালো বলেছিস্‌। উনি খারাপ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আমরা ভালো ব্যবহার কর্‌ব না কেন? তাতে আমাদের মহত্ত্বই প্রকাশ পাবে।"

যারা যারা ভূপতিবাবুর ওপর অতিরিক্ত চটা ছিল, তারা এতে সায় দিলে না বটে, কিন্তু তাতে বিদায়-অভিনন্দনের ব্যবস্থা আট্‌কাল না। ভূতনাথই উদ্যোগী হয়ে হেড্‌মাষ্টার মশাই এবং অন্য কয়েকজন শিক্ষকের সহযোগে খাসা একখানা প্রোগ্রাম ছকে ফেল্‌ল। ঠিক হলো গ্রীষ্মের ছুটীর জন্যে যে দিন স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিনই দেওয়া হবে ভূপতিবাবুকে বিদায়-অভিনন্দন। ছুটীর পর উনি আর ফিরবেন না, যোগ দেবেন নতুন স্কুলে।

বিদায়-অভিনন্দনের দিন শিক্ষকেরা তাঁদের সহকর্ম্মী ভূপতিব্যবুকে বিদায় দিতে তাঁদের প্রাণে ব্যথা লাগছে এইটে জানিয়ে তাঁর পদোন্নতিতে আনন্দও জানিয়ে দিলেন। আশা জানালেন তিনি কালক্রমে হেড্‌মাষ্টারও হবেন।

তারপর সুরু হলো ছাত্রদের অভিনন্দন। প্রত্যেক ক্লাস থেকে একখানা ক'রে মালা দেওয়া হলো ভূপতিবাবুকে। প্রত্যেক ক্লাসের পক্ষ থেকে একজন করে ছাত্র প্রতিনিধি এসে বিদায়ী প্রণাম ক'রে গেল তাঁকে। বলা বাহুল্য এ সমস্তই ভূতনাথের পরিকল্পনা। সে বলেছিল, "দেখিয়ে দিতে হবে ভূপতিবাবুকে যে উনি আমাদের ওপর যত বেশী অভদ্রতা করেছেন আমরা তাঁর চাইতেও বেশী ভদ্র হতে জানি।"

ছাত্রদের তরফ থেকে একখানা বেশ লম্বা বিদায়-ব্যথার ফর্দ্দ পড়া হ'লো। সেটা লিখেছিল আমাদের সেরা সেরা ছাত্ররা মিলে; তার ওপর খানিকটা কলম চালিয়ে দিয়েছিলেন চন্দনের কাকা নিমাইবাবু। তিনি তখনই অনেক কাগজে গল্প-প্রবন্ধ লিখে বেশ একটু নাম করেছেন। লেখাটা বেশ আবেগ ঢেলে কাঁদ-কাঁদ সুরে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পড়্‌ল ভূতনাথ নিজেই। সে বরাবরই আবৃত্তি আর অভিনয় ভালো করে। তার পড়া শুনে অভিভূত হয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছ্‌তে লাগলেন ভূপতিবাবু। দেখে আমরা অবাক্‌। ভূতনাথের উৎসাহ বেড়ে গেল। সে আরো কাঁদ-কাঁদ হয়ে পড়তে লাগ্‌ল।

তারপর বিভিন্ন ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র মিলে সমবেত কণ্ঠে গাইলে:

"ওগো দেব, তুমি যেতেছ চলিয়া,
গেল কত দিন কাটিয়া হে!
তোমারে বিদায় দিতে আজি হায়
হৃদয় যেতেছে ফাটিয়া হে!……"
ইত্যাদি।

কৃতজ্ঞতায় ভরা মনে সবাই বেশ দরদ দিয়ে গাইছিল। সঙ্গে বেহালা বাজাচ্ছিল সুজিত। চমৎকার করুণ সুরে বেহালা বাজাতো সে।

গানের মাঝখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার। একেবারে হাউ হাউ করে ছোট ছেলের মতো ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লেন ভূপতিবাবু। ফুলে ফুলে তিনি কেঁদে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন কিছুতেই আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারেন না। হেড্‌মাষ্টার মশাই তখন দু'হাত তুলে ইসারায় আমাদের ভূপতি-কাঁদানো গান থামিয়ে দিলেন।

অনেক কষ্টে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে তারপর দু'-চার কথা বল্‌তে উঠে দাঁড়ালেন ভূপতিবাবু। যা বল্‌লেন তা শুনে আমাদের তো চক্ষু চড়কগাছ, মাথায় বজ্রপাত!

তিনি বল্‌লেন, "আমার প্রিয় ছাত্রগণ। এত দিন আমার ধারণা ছিল আমি তোমাদের চক্ষুশূল। আমায় তোমরা কেউ ভালবাস না। আজ বুঝ্‌লুম সে আমার কত ভুল। তোমাদের অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিচয় পেয়ে আজ আমি ধন্য, আজ আমি মুগ্ধ। তোমাদের প্রাণের এই প্রীতির অমর্য্যাদা করে আমি কিছুতেই চলে যেতে পারবো না। বৎসগণ, আমি তোমাদেরি মধ্যে থাক্‌বো।"

আমরা অত্যন্ত শংকিত, উদ্বিগ্ন হয়ে বল্‌লুম, "কিন্তু স্যর, ঐ ইস্‌কুল যে আপনার আশা করে বসে আছে, তার উপায় হবে কি?"

ভূপতিবাবু বল্‌লেন, "ওদের আমি আজই লিখে দেবো অন্য লোক নিতে।"

দিলেনও তাই।

শিক্ষকেরা সবাই খুশী হলেন, কিন্তু আমাদের সারা ছাত্রমহলে গভীর বিষাদের ছায়া নেমে এলো। হায় হায়! তীরের কাছে এসে নৌকো ডুবলো !!! যত নষ্টের গোড়া ঐ ভূতনাথ। সেই তো এই সব বাড়াবাড়ি করে এই সর্ব্বনাশটা করালে। সবার আক্রোশ গিয়ে পড়্‌ল ওর ওপর।

গ্রীষ্মের ছুটীটা আমরা কেউই উপভোগ করতে পারলুম না, ছুটীর পরই আবার ভূপতিবাবুর পাল্লায় পড়্‌তে হবে বলে।

কিন্তু আশ্চর্য্য! ছুটীর পর একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেলেন ভূপতিবাবু। কি মধুর, কি দরদী, কি স্নেহময়! আমাদের সকলের ভালোবাসা জয় করে নিলেন তিনি, যেন কোন্‌ যাদুমন্ত্রে। তিনি আজ আর বেঁচে নেই। অ্যাল্‌বামে তাঁর এই ছবিখানা দেখে তাঁর সেই নতুন মধুর রূপটীর কথা মনে করেই দু' চোখ জলে ভরে উঠছে।

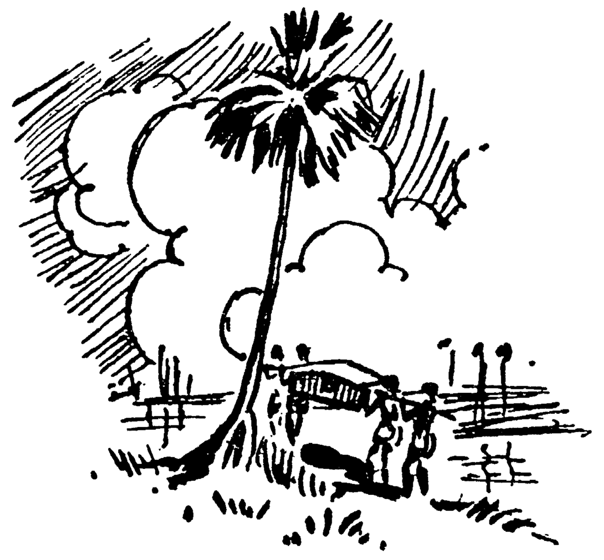

পথিক মেঘের দল

শ্রীআশা দেবী, এম্‌. এ, বি. টি

এরোপ্লেনে আরবে এসে পৌঁছেছি। বাহরিণের এরোড্রোম। একটি বক্তৃতাবাজ বাঙ্গালী ছাত্রের কথাও এর আগে তোমাদের বলেছিলাম, বোধ হয় মনে আছে?

সেই বক্তৃতাবাজ লোকটি যেন সকালের আলোয় একেবারে ফুটো বেলুনের মতই চুপসে গেল। তাকে দেখে মনে হলো ছোটবেলার এক যাত্রা-দলের রাজার পার্ট করা লোকের সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা। সমস্ত রাত ধরে যাত্রা চলেছে। সসাগরা ধরণীর রাজা সেজে তিনি সবাইকে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দান করেছেন, কারুর সাধই অপূর্ণ রাখেন নি। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেছে রাতের রোসনাই। স্তাবকের দল চলে গেছে—রাজকোষ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে আতসবাজির মত। রাজা রাতারাতি হয়ে গেলেন ভিখারী।

এরোপ্লেন নামছে মাটিতে, ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে খেয়ে। নীচের গাছের সারি ক্রমে বড় হচ্ছে—ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে বাড়ীগুলো। এতোক্ষণ ঘন জঙ্গলের একটা সবুজ আস্তরণের বুকে শ্বেতচন্দনের পঙ্কতিলক বলে মনে হচ্ছিল.—এখন স্পষ্ট বাড়ীঘরের আকার পেল যেন। দূরে ধূ-ধূ মরুভূমির বালির আভাস যেন একটা রূপোর থালার মত পড়ে আছে।

আর সেই দাদা—? সর্ব্বাঙ্গে ধোবার অনুগ্রহের ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে আরবের প্রচণ্ড গরমে একটা কম্বল চাপা দিয়ে ঠায় বসে আছে। সবাই নেমে যাচ্ছে একে একে; গরমের মধ্যে কম্বল চাপা দিয়ে ভদ্রলোক গরমে ধারাস্নান করছে যেন!

ঃ এ কি দাদা? আপনার বুঝি খুব শীত লাগছে?

ঃ হুঁ।—ভদ্রলোকের গলা ভরা কান্না।

একটু বাঁকা হাসির রেখা মুখে টেনে অপর ভদ্রলোকটি নেমে গেলেন।

এয়ার-হোষ্টেস্‌ নেমে যাচ্ছেন চা খেতে। বিপন্ন দাদা তাঁর কাছে হাত জোড় করে পথ আগলে দাঁড়াল। ঃ আপনারা মাতৃজাতি, আমাকে বাঁচান। আমার কাপড়ের সুটকেসটা একটু বের করে দিন, নইলে আমি কিছুতেই নামবো না। চোখ দিয়ে তার ঝর ঝর জল পড়ছে।

বিনয়ে বশীভূতা এয়ার-হোষ্টেস বাক্স আনতে ছুটলেন। তারপর থেকে দাদা একেবারে মুখে তালাচাবি বন্ধ করলেন সুইজারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত।

টুন টুন করে ঘণ্টা বাজছে আর তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সমানে চেঁচাচ্ছে লোকটা—আগ্রাকে তাজমহল দেখো—বেবিলোনকে বাগিচা দেখো—সাইপ্রাসকে পিতলের খুব জোরদার পুতুল দেখো—

সাইপ্রাস—নিকোসিয়া। মস্ত বড় একটা গ্লোব যেন ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, আর তার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে একটা বিরাট সোনালী ঈগল। সকালের রোদে ঝলমল করছে তার পাখা, আর মহাকাল তার শুভ্র পা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন গ্লোবটা, যেন লীলা-ভরে খেলা করছেন বিশ্বস্রষ্টা। উড়ো-জাহাজ ঘুরে ঘুরে নামলো একটা বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে। সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেমে আসছে। দূরে কালো পাহাড়ের শ্রেণীকে আরো কালো মনে হচ্ছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই জায়গার স্বভাতঃই একটা আকর্ষণ আছে। কত কথা পড়েছি। পিতলের মূর্ত্তির কথা এখানকার কে না জানে? কিন্তু এরোড্রোমে এমন কড়া পাহারার ব্যবস্থা যে নড়াচড়াই শক্ত। কড়া পাহারার সিংহ-দ্বার পার হয়ে বেরুনোই অসম্ভব, সুতরাং আমরা আটকা রইলাম সেই বিমান-বন্দরেই।

দূরে পাহাড়শ্রেণীর ওপর রোদ ছড়িয়ে পড়লো। অজস্র সোনার মত মুঠো মুঠো ভগবানের অকৃপণ দান। মনে পড়লো সিকিমের একটা আশ্চর্য্য দিনের স্মৃতি। রাতের অন্ধকার ভেদ করে ল্যাণ্ড রোভার ছুটে চলেছে। চালক অতন্দ্র দৃষ্টি রেখে চেয়ে আছেন। রাতের কালো পর্দ্দার ওপর অসংখ্য পাহাড়ের শ্রেণী যেন ঘুমুচ্ছে। বুদ্ধদেবের মন্দির—তার পর্ব্বততরঙ্গমালাবিভূষিত রূপ অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত বলে মনে হচ্ছিল।

স্তব পাঠ হচ্ছে। সারি দিয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। বিরাট একটা কাঠের বাদ্য বাজাচ্ছে বাদকেরা। রামশিঙ্গা জাতীয় একটা বাজনার গুরুগম্ভীর আওয়াজে যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিল—এটা সত্যিই মহানির্ব্বাণ তীর্থ! চির শান্তিকামী মানব-কল্যাণী বোধিসত্ব তাঁর অমৃতদীক্ষার পূত স্পর্শ এখানে মঙ্গল হাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এরোড্রমের ষ্টলে সাইপ্রাসের ইতিবৃত্তবিজড়িত সচিত্র কাহিনী পাওয়া যায়, তাই কিনতে ব্যস্ত আমরা। এমন সময় খাবার ডাক পড়লো। এক রকম কৃমি-আকৃতির খাবার। তরমুজ, রুটি, মাখন, মাংস—সবই খাওয়া হলো। কিন্তু একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করেছি। তখনই সাইপ্রাসের রাজনৈতিক আবর্ত্তন ঘোরাল হয়ে আসছে। চারিদিকেই একটা গরম গরম ভাব। বার বার খাবার জল চেয়েও যখন পাচ্ছিলাম না তখন অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই আমরা রেগে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলো, তারা আর জল দিতে পারবে না। দরকার হয়তো তরমুজ খাও না—এই ভাব। পরিবেশনকারীরা একদল বিমানযাত্রী ছেড়ে অন্য দলের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। মনে আছে আমরা এ নিয়ে নালিশ করেও বেশ গণ্ডগোল করেছিলাম।

মাটিকে যে কত ভালবাসি আমরা তা বার বারই মনে হয়েছে। মায়ের মত যার স্নেহ তার প্রতি অন্তর ভরা অকৃত্রিম আকর্ষণ বার বারই মনকে টানছিল—যখন

আবার মাটি ছেড়ে আকাশে উঠবার ডাক এলো। সবারই মুখে বিষণ্ণ ছায়া। আবার একটা অতিকায় পাখীর মত মুখে সজোরে জয়ধ্বনি তুলে আকাশে উড়লো বিমান। নীচে পড়ে রইলো মাটি—সবুজের সমারোহ, পাহাড় আর মানুষের স্নেহস্পর্শ।

বসে বসেই কথা হচ্ছিল নিজেদের মধ্যে। অত্যন্ত একঘেয়ে যেন এই বিমান-ভ্রমণ। কোন আকর্ষণ নেই, কোন আনন্দ নেই। লোকজনের মুখ-চোখ দেখা যায় না। শুধু একটানা শব্দস্রোত ইথারস্রোত ভেদ করে চলেছে। ট্রেনের বেড়ানো এর চেয়ে ঢের ভাল। ফিরিওয়ালার হাঁক, পান-বিড়ির ডাক, তানসেনের গুণবর্ণনা। যাত্রীদের ওঠা-নামা। মাথার ওপর সশব্দে বাক্সের পতন। যাত্রীর আর্ত্তনাদ। দু'হাত জায়গার জন্যে প্রাণপণে ঝগড়া—মারামারি। এই না হলে বেড়ান? মনে আছে ছোটবেলায় একবার আমরা ও. টি. আর-এর গাড়ীতে কাশী যাচ্ছিলাম। তিন ভাই-বোন মিলে এমন যাওয়া প্রায়ই ঘটে না। হঠাৎ বেড়াবার সুযোগ পেয়ে গাড়ীতে উঠেই দারুণ ক্ষিদে সুরু হয়ে গেলো। মা একটা পানের ডাবরে করে কতগুলো লুচি আর আলু-চচ্চড়ি করে নিয়েছিলেন। আমাদের ক্ষিদের কাছে তা একেবারেই নস্যি। মার হিসাব মত যা তিন দিনের রেশন, আমরা তিন জনে তা তিন ঘণ্টায় শেষ ক'রে মার মুখের দিকে চাইলাম। ততঃ কিম্? হঠাৎ গাড়ী থামতে না থামতেই পেটে প্রচণ্ড খোঁচা! এক ভদ্রলোক একটা হুঁকো নিয়ে উঠছিলেন, আমার পেটে একটা প্রচণ্ড খোঁচা দিতেই পাশের এক নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদে আমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল। পাছে খাবারে কেউ নজর দেয় এই ভয়ে তিনি মাথা ঢেকে খাচ্ছিলেন। ঠেলাঠেলি করে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে এক ভদ্রলোক বোঁচকা মনে করে মহিলার মাথার ওপরেই তাঁর বাক্সটি চাপিয়েছেন। সমস্ত মুখে ডাল মেখে ভদ্রমহিলা সুর করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলেন। যত সবাই তাঁকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছিল ততই তাঁর কান্নার স্বরগ্রাম চড়া পর্দ্দায় উঠছিল। তারপর একটা ছোটখাটো যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হলো।

গল্পটা যখন বেশ জমে উঠছে, হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা যাত্রী সরবে বমি করতে লাগলেন। আর তাঁর এই অবস্থা দেখে যাঁরা বমি করেন নি তাঁরাও প্রমাদ গণতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপর সবাইকে ছাড়িয়ে এক ভদ্রমহিলা ঠেলেঠুলে একেবারে জানলার কাছে এসে বসতে গিয়ে ধুপ্ করে আর একজনের কোলে বস্তার মত বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। সবাই ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

ঃ কি ব্যাপার! কি হলো আবার আপনার?

ভদ্রমহিলা বার দুই কপালে হাত দিয়ে বললেন ঃ থাম থাম, পরে বলছি' বুড়ো মানুষকে এত তাড়া দিয়ো না, হার্টফেল করবো।

একখানি ফটো

সৈয়দ আব্দুল বারি

অশোক ও ঝরণা— দু'টি ভাইবোন।

অশোককে ছোট রেখে অশোকের মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই অশোক ঝরণার স্নেহে বড় হয়ে উঠেছে। ঝরণাকে ছেড়ে একদণ্ডও সে থাকতে পারে না।

কিন্তু চিরদিন তো এক ভাবে যায় না। দেখতে দেখতে ঝরণা বড় হয়ে উঠল এবং একদিন শুভক্ষণ দেখে ঝরণার বাবা ঝরণার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

যেদিন ঝরণা শ্বশুরবাড়ী যায় সেদিন অশোকের সে কি কান্না! কিছুতেই সে থামতে চায় না। ঝরণার আঁচলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে ঝরণাও কেঁদে ফেলে।

কিন্তু বিয়ের পর তো আর বাপের বাড়ী পড়ে থাকা চলে না, শেষ পর্য্যন্ত ঝরণা চলে গেল।

ঝরণা চলে যাওয়া অবধি অশোক সারাদিন মনমরা হয়ে একলা চুপচাপ বসে থাকে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। এমন কি ভাল করে খায়ও না।

কিন্তু হঠাৎ একদিন এক পরিবর্ত্তন দেখা গেল যেদিন পিয়ন এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। খামের উপর অশোকের নাম লেখা। আনন্দে ও উত্তেজনায় অশোকের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। খামটা খুলতেই, অবাক্ কাণ্ড, ভিতরে ঝরণার একখানা ফটো! ঝরণা লিখেছে :

অশোক,

এখানে এসে শুধু তোর কথা মনে পড়ে। তোরও নিশ্চয়ই তাই? সেই ভেবে আমার একখানি ফটো পাঠালাম। তুইও তোর একটা ফটো তুলে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দিস কিন্তু।—ইতি দিদি।

চিঠিখানি পড়ে অশোকের মন আনন্দে ভরে ওঠে। দিদি তাহ'লে তারও একখানা ফটো চেয়েছে! ভারী মজা লাগে তার।

বাবার দেওয়া পয়সা জমিয়ে জমিয়ে অশোকের কয়েকটা টাকা হয়েছে। কোথায় ফটো তোলা হয় তাও সে জানে। একটু দূরে,—তা হোক্, বাসে চড়ে চলে যাবে। ভাবে, বাবাকে বলার দরকার নেই এখন। নিজের জমানো পয়সা দিয়ে ফটো তুলিয়ে এনে দু' ভাইবোনের দু'টো ফটো একসঙ্গে দেখিয়ে বাবাকেও তাক্ লাগিয়ে দেবে সে।

পরদিন অশোকের বাবা খেয়েদেয়ে অফিসে গেলে অশোক তাড়াতাড়ি একটা ভাল জামা গায়ে দিয়ে নিল। জুতোটা পায়ে গলিয়ে, বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথাটা ভাল করে আঁচড়ে একবার দেখে নিল কেমন মানিয়েছে তাকে।

নাঃ, বেশ মানিয়েছে মনে হচ্ছে। ফটো বোধ হয় ভালই উঠবে।

তখনও অফিসের সময়। ট্রামে-বাসে ভীড় খুব বেশী। ঝুলে ঝুলে লোকজন চলেছে। কারো দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর নেই কারো। বার বার চেষ্টা করেও অশোক উঠতে পারল না কোনটাতেই।

এবারে সে মরিয়া হয়ে ঠিক করল, পরের বাস্‌টাতে উঠবেই। ভেতরে যেতে না পারে, কোন রকমে হাতল ধরে পাদানীতেই দাঁড়াবে। আর দাঁড়ালও তাই।

কিন্তু ঐ ভীড়ের চাপে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকাও যে কী অসাধ্য ব্যাপার তা তো তার জানা ছিল না! প্রতি মুহূর্ত্তে অবশ হয়ে আসতে লাগল তার হাত। ওদিকে ভীড়ের চাপ বাড়ছেই—বাড়ছেই—বাড়ছেই।

একটা মুহূর্ত্ত মাত্র। তার পরই তাল সামলাতে না পেরে হাত ফসকিয়ে রাস্তার উপর পড়ে গেল সে।

আর ঠিক পেছনেই ছিল একটা মাল-বোঝাই লরী। তার ফলে যা হবার হ'ল।

দেখতে দেখতে ভীড় জমে উঠলো সেখানে। কার ছেলে? না, কেউ জানে না।

একবার অশোকের ঠোঁটটা একটু নড়ে উঠলো। অতি কষ্টে হাত দিয়ে বুকের কাছে কি যেন খুঁজবার চেষ্টা করছিল সে।

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে অশোকের বুক-পকেট থেকে বার ক'রল একখানা খাম। খামের ভিতরে রয়েছে একখানা ফটো। ফটোখানা রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। কার ফটো কিছুই চেনা যায় না।

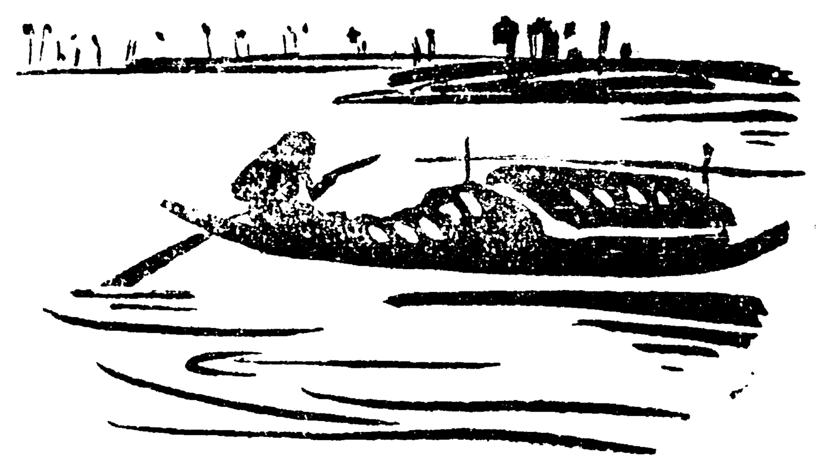

—তের—

মধ্য রাত্রির নিকষকালো অন্ধকারে সুদীর্ঘ কালো ভৌতিক ছায়া ফেলে নিঃশব্দ নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল হলুদ-কুঠি।

বাগানের শেষ প্রান্তের একটা ঘন মাধবী-কুঞ্জের অন্তরালে আত্মগোপন করে এক ছায়ামূর্ত্তি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল প্রাচীন আমলের বিরাট বাড়িটার দিকে।

ছায়ামূর্ত্তির সুদীর্ঘ সবল দেহ কালো পোষাকের আবরণে ঢাকা। চোখ আর মুখের কিছু অংশ ঢাকা পড়েছে মুখসের কালো আবরণে। হাতে কালো দস্তানা।

সুযোগের অপেক্ষায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

অত বড় বাড়িটার কোথাও ক্ষীণতম আলোর শিখা জ্বলছে না। জেগে নেই কেউ। একেবারে নিঃশব্দ—নিঝুম।

ঠিক এই রকম একটা পরিবেশের জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে।

অত্যন্ত সাবধানে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে চলল বাগানের মধ্যে দিয়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছাল গাড়ীবারান্দার তলে।

গাড়ীবারান্দার মোটা মোটা থামগুলোর গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে উপরের ছাদ পর্য্যন্ত উঠে গেছে মাধবীলতার শক্ত লতানে ঝাড়।

মোটা দড়ির মত লতাগুলো নিজের দেহের ভার বহন করতে সক্ষম হবে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিল সে। তারপর লতার সাহায্যে অত্যন্ত সহজে নিঃশব্দে উঠে গেল দোতালার বারান্দায়।

রেলিঙ-ঘেরা প্রশস্ত লম্বা বারান্দা দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ছায়ামূর্ত্তি।

লম্বা বারান্দার দিকের শ্রেণীবদ্ধ দরজা জানালাগুলো সবই বন্ধ আর অন্ধকার। কেমন যেন নিশব্দ—প্রাণহীন। যেন দরজা-জানালাগুলোর ওদিকে ঘরের অভ্যন্তরে জীবন্ত প্রাণের কোন সাড়া নেই।

কোণের দিকের একটা দরজার সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল সে।

হাত দিয়ে স্পর্শ করে দরজার ওপরের অংশটা পরীক্ষা করে দেখল ঠিক আছে। অন্ধকারে ভুল হয় নি তার। ঠিক দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

সকালের দেখা সেই দরজাটা। দরজার ওপরের অংশটা কাঠের কারুকার্য্য করা, আর সেই কারুকার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে বসান রয়েছে রংবেরঙের মোটা ঘষা কাচের বড় বড় টুকরো। নিঃশব্দে কাটল কয়েক মিনিট। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল ছায়ামূর্ত্তি। ঘটনার চক্রে পড়ে তাকে আজ চোরের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে।

'চ্যালেঞ্জ'! মৃদু হাসল ছায়ামূর্ত্তি। 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করেছে সে। পেছুপা হলে চলবে না এখন।

অভীষ্ট জিনিস তার চাই। যেমন করে হোক। যে কোন উপায়ে।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। চুরির ধন চুরি করেই অর্জন করতে হবে।

কম ব্যস্ত হয়ে পড়ল ছায়ামূর্ত্তি।

নিঃশব্দে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে এসে দরজার সামনে রাখল সে। উঠে দাঁড়াল চেয়ারের উপরে। পকেট থেকে বের করল ছোট্ট একট ধারাল যন্ত্র। যন্ত্রের সাহায্যে চৌকো করে কাটল দরজার উপরের এক খণ্ড কাচ।

এবার কাটা কাচের চৌকো গর্ত্তের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ভিতরের ছিট্‌কিনি অত্যন্ত সহজেই খুলে ফেলল।

বন্ধ দরজা খুলে গেল।

সতর্ক দৃষ্টি আর সজাগ কান প্রস্তুত রেখে ছায়ামূর্ত্তি সাবধানে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল।

ঘরটা অরুণকুমারের দোতলার হল ঘর, তথা লাইব্রেরী।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ছায়ামূর্ত্তি। সজাগ কান দুটো ঘরের ভিতরে কোন ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস পতনের শব্দ শোনার জন্যে একাগ্র হয়ে উঠল।

না, ঘরের ভিতরে জীবন্ত মানুষের সাড়াশব্দ শুনতে পেল না সে। অনুভব করল না কোন ঘুমন্ত মানুষের অবস্থিতি।

পর মুহূর্ত্তে তার হাতের টর্চ টা জ্বলে উঠল। অন্ধকার ঘরের বুকে তীব্র টর্চে'র আলোর রেখা ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল ছায়ামূর্ত্তি।

হল ঘরটাই অরুণকুমারের লাইব্রেরী।

দোতালার তিনটি মাত্র ঘর ব্যবহার করে অরুণকুমার। হল ঘরের দক্ষিণ দিকের ঘরটা অরুণের শয়নকক্ষ আর পুবদিকের ঘরটা ওর ল্যাবোরেটারী।

হল ঘরের দুদিকের দুটো দরজা দিয়ে শয়নকক্ষ এবং ল্যাবোরেটারী-ঘরে যাওয় চলে। দরজা দুটো ঠেলে পরীক্ষা করে দেখল ছায়ামূর্তি। দুটো দরজাই বন্ধ রয়েছে।

নিশ্চয়ই অরুণকুমার এখন গভীর ঘুমে অচেতন। সজাগ সতর্ক পাহারা রাখার হয়ত প্রয়োজন মনে করে নি। তা ছাড়া ছায়ামূর্ত্তি যে এত তাড়াতাড়ি তার অভীষ্ট জিনিস পুনরুদ্ধায় করতে আসবে এ কথা হয়ত চিন্তা করে নি সে।

ছায়ামূর্ত্তির অভীষ্ট বস্তুটি যে হল ঘরের কোন এক গোপন স্থানে লুকান আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্ততঃ ছায়ামূর্তির সুচিন্তিত দৃঢ় ধারণা তাই।

কিন্তু কোথায় লুকান আছে সে বস্তুটি? কোথায়?

অন্ধকার ঘরের ভিতরে শুভ্র আলোর তীব্র রেখা অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল।

পরীক্ষকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে চলল একের পর এক সন্দেহজনক স্থানগুলো। বইয়ে ঠাসা দেয়াল জোড়া শেল্‌ফ্‌গুলোর আনাচে কানাচে.…টেবিল, চেয়ার, আলমারি আর ঘরের প্রতিটি কোণে কোণে, ঘরের অতি তুচ্ছতম স্থানেও অনুসন্ধান করতে লাগল আলোর রেখা।

প্রতিটি মূল্যবান্ মুহূর্ত্ত কেটে চলল।

ছায়ামূর্তির বীরামহীন অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে যেন ক্লান্তি নেই।

অবশেষে আলোর রেখা এসে পড়ল দেয়ালে গাঁথা ষ্টীল আলমারীর উপরে। আলমারীটার উপরে স্থির দৃষ্টিপাত করল সে। কাছে এসে ভাল করে পরীক্ষা করতে বোঝা গেল ওটা আলমারি নয়, দেয়ালে গাঁথা প্রকাণ্ড একটা লোহার সিন্দুক।

মধ্যরাত্রির অবাঞ্ছিত অতিথি লৌহসিন্দুকের দিকে অতি সাধারণভাবে একবার মাত্র তাকাল শুধু। অভিজ্ঞজনোচিত ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল ছায়ামূর্তির ঠোঁট জোড়ায়।

…অসম্ভব। লোহার সিন্দুকের মধ্যে নেই লাল শঙ্খ। চতুর অরুণকুমার লৌহসিন্দুকের মধ্যে শঙ্খটা নিশ্চয়ই রাখে নি। অরুণকুমার অতটা বোকা নয়।

কিন্তু কোথায় লুকিয়ে রেখেছে শঙ্খটা? কোথায়?

জ্বলন্ত টর্চ্চের আলোয় আবার সুরু হ'ল ক্লান্তিহীন অনুসন্ধান।

কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে শঙ্খটা?

ছায়ামূর্তির চোখেমুখে ফুটে উঠেছে গভীর উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার চিহ্ন।

শঙ্খটা যে কোন উপায়ে খুঁজে বের করতে হবে তাকে। শঙ্খটা তার চাই। কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে শঙ্খটা? কোথায়?

কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে শঙ্খটা? সাধারণতঃ মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়—লৌহসিন্দুকে, আলমারির গোপন কোণে। অরুণকুমারের মত ধূর্ত লোক ওসব জায়গায় শঙ্খটা নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখে নি।

তবে কোথায়? ঘরের প্রকাণ্ড টেবিলের মোটা মোটা পায়াগুলোর দিকে নজর পড়ল ছায়ামূর্ত্তির। পায়াগুলোর কোন গোপন লুকান গর্তে লুকান নেই তো শঙ্খটা? দেয়ালের কোন গোপন গর্ত্তেও লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

ছায়ামূর্ত্তি একের পর এক সন্দেহজনক স্থানগুলো পরীক্ষা করে চলল - তাড়াতাড়ি কিন্তু যত্ন-সহকারে, অত্যন্ত সতর্ক হয়ে।

এতক্ষণ পরে টেবিলের উপর রাখা প্রকাণ্ড গ্লোবটার দিকে নজর পড়ল তার। গ্লোবের ভিতরের শূন্য অংশে লুকিয়ে রাখা হয় নি তো শঙ্খটা?

টেবিলের ধারে এগিয়ে এল সে।

গ্লোবটা তুলে নিল হাতে। পরীক্ষা করতে লাগল গভীর মনোযোগ দিয়ে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল গ্লোবটা। মৃদু অস্পষ্ট কোন শব্দ শোনা যায় কিনা, সতর্ক কানে শোনবার চেষ্টা করল ছায়ামূর্ত্তি।

পরীক্ষা চলল অনেকক্ষণ ধরে। অবশেষে গ্লোবটা যথাস্থানে রেখে উঠে দাঁড়াল সে।

ইতিমধ্যে একঘণ্টা সময় কেটে গেছে। রাত এগিয়ে গেছে অনেকখানি।

শঙ্খটা খুঁজে না পাওয়ার হতাশা নেই ছায়ামূর্ত্তির মনে…নেই ক্লান্তি।

আবার কর্ম্মমুখর হয়ে উঠল ছায়ামূর্ত্তি।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট হাতুড়ী বের করে দেয়ালের সন্দেহজনক স্থানগুলোতে মৃদু মৃদু আঘাত করতে লাগল। শব্দ শুনতে লাগল সতর্ক সজাগ কান দিয়ে।

গভীর মনোযোগ দিয়ে দেয়াল পরীক্ষা করছিল ছায়ামূর্ত্তি। সহসা মৃদু পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে।

মানুষের পায়ের শব্দ।

কে? কে হতে পারে? অরুণকুমার নিশ্চয়ই। তার নিশীথ-অভিযান টের পেয়েছে অরুণকুমার।

ধীরে ধীরে পিছু ফিরে দাঁড়াল ছায়ামূর্ত্তি।

দেখল অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে অরুণকুমার স্থির শান্তদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে।

নিজের হাতে টর্চ্চের আলোয় ছায়ামূর্ত্তি দেখল অরুণকুমারকে।

দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে আছে অরুণকুমার। হাতের দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরা রয়েছে উদ্যত রিভলভার;

ছায়ামূর্ত্তি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল অরুণকুমারের মুখের উপরে।

ভয় বা আতঙ্কের চিহ্ন নেই অরুণকুমারের চোখেমুখে। দৃঢ় কঠিন মুখ।

আরও খানিকটা কাছে এগিয়ে এল অরুণকুমার। বিস্ময়ে তার চোখের উপরে ভ্রূজোড়া বিস্ফারিত হয়েছে শুধু।

রিভলভারের লক্ষ্য স্থির রেখে বাঁহাতের জ্বলন্ত টর্চ্চের আলোয় ছায়ামূর্ত্তির আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে অরুণকুমার জিজ্ঞাসা করল,—'কে তুমি?'

কোন জবাব দিল না ছায়ামূর্ত্তি। কেমন যেন ভগ্নোৎসাহের মত দেখাল তার মুখের চেহারা।

(ক্রমশঃ)

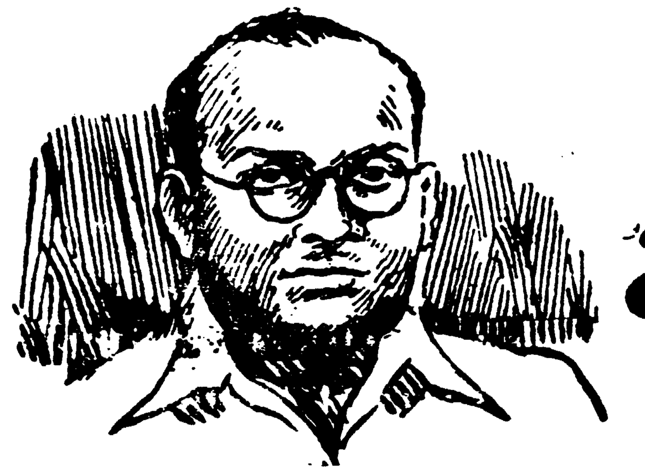

ম্যাজিক শেখ

যাদুরাজ এস, ডি, মুখার্জ্জী

—তারের হ্যাঙ্গার উড়িয়ে দেওয়া—

জামাকাপড় টাঙ্গাবার জন্য তারের তৈরী এক রকম হ্যাঙ্গার বাজারে দেখতে পাওয়া যায়, তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। আজ আমি ঐ রকম একটা হ্যাঙ্গারকে কি রকম ভাবে অদৃশ্য করে দেওয়া যায় তাই শেখাব। আমার এই খেলার জন্য কিন্তু আসল তারের হ্যাঙ্গার ব্যবহার করা চলবে না। এই খেলা দেখাবার জন্য যে কোনও রেডিও সারাবার দোকান থেকে খানিকটা তারের মত দেখতে সল্‌ডার (Solder)—যাকে বাংলায় রাংঝাল বলা হয়,—তাই জোগাড় করে নাও। এইবার একটা আসল হ্যাঙ্গার সামনে রেখে ও তাই দেখে দেখে ওটাকে বেঁকিয়ে ও পাক খাইয়ে খাইয়ে একটা নকল হ্যাঙ্গার তৈরী করে নাও। এই রাং খুব নরম বলে সহজেই বেঁকাতে পারবে, এবং চেহারায় ও রংএ ঠিক সাধারণ তারের হ্যাঙ্গারের মত হওয়ায় সহজে কেউ বুঝতে পারবে না এটা নকল না আসল।

এখন ঐ হ্যাঙ্গারটায় আগে থেকেই একটা হাল্কা জামা টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। খেলা দেখাবার সময় জামাটা সরিয়ে ওটাকে বার করে এনে দূর থেকে সকলকে দেখাও। তারপর সেই নকল হ্যাঙ্গারটা নিয়ে খবরের কাগজে মুড়ে দুই হাতে দুই কোণ ধরে তালগোল পাকাতে থাক। অত বড় হ্যাঙ্গারটা কাগজের ভেতর দেখতে দেখতে তালগোল পাকিয়ে ছোট্ট একটা বলের মত হয়ে যাবে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, ওটা বুঝি কাগজেরই তাল, ভেতরে হ্যাঙ্গার নেই। বাস্তবিকই, অত বড় হ্যাঙ্গারটা গেলই বা কোথায়?—অবাক্ হয়ে ভাববে সবাই। এইবার হাসতে হাসতে সেই তালগোল পাকানো কাগজটা ছুঁড়ে দাও ষ্টেজের কোণে দাঁড়ানো তোমার সহকারীর দিকে। সহকারী সেটা কুড়িয়ে নিয়ে যেই চলে যাবার ভান করবেন, অমনি তুমি তাঁর পিঠ থেকে আর একটা হ্যাঙ্গার (আসল) টেনে নিয়ে বলবে, "আরে, যাচ্ছ কোথায়? এটা দিয়ে যাও।"

এর পর এই হ্যাঙ্গারটা দর্শকদের হাতে পরীক্ষার জন্য দিতে কোন বাধা নেই।

বলা বাহুল্য তোমার সহকারী পূর্ব্ব থেকেই আসল হ্যাঙ্গারটা পিঠে ঝুলিয়ে এক কোণে দর্শকদের দিকে মুখ করে (অর্থাৎ উল্টো দিকে পিঠ রেখে) তাকিয়ে থাকবেন। তুমি কাগজের তালটা সমেত নকল হ্যাঙ্গার ছোঁড়বা মাত্র তিনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে চাইবেন, আর অমনি তুমি তাঁর পিঠ থেকে আসল হ্যাঙ্গারটা নামিয়ে নেবে। সহকারী কিন্তু তখনই কাগজের পোঁটলা নিয়ে চম্পট্ দেবেন।

যে গল্প জানা নেই

শ্রীরণেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

—এগারো—

গোপালের কাছে ব্যাপারটা একেবারেই কল্পনাতীত।

বিকেল শেষ হয়ে গোধূলি সমাসন্ন। পশ্চিমাকাশে অস্ত গিয়েছে দিনের শেষে ক্লান্ত রবি। তবুও সে তার শেষ আলোটুকু ছড়িয়ে দিয়েছে ম্লান আকাশে। বইছে মিষ্টি শিরূশিরে পাহাড়ী হাওয়া,—কাশিয়াং কিংবা ঘুমের মাথায় মাথায় তারা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। শিশুসভায় কিশোর সভাপতির মুখের ওপর তারই হয়তো একটু পরশ আসছে ভেসে।

—'গোপাল, চলে এসো।'

গোপাল চমকে দেখে, সামনে মামাবাবু দাঁড়িয়ে। গলার স্বরে কিছুটা গাম্ভীর্য্যের ছায়া। পাশে দাঁড়িয়ে ভারি মুখে বুলু।

কিন্তু গোপাল জবাব দেবার আগেই সুমিত এসে জবাব দিল—'মামাবাবু, গোপাল একটু পরে যাচ্ছে। আমাদের সভায় যে গোপাল আজ সভাপতি!'

—'থাক, সভাপতিত্বে আর দরকার নেই। তুমি তার যোগ্য নও। চলে এসো।'

মামার কথায় আরও একটু গাম্ভীর্য্য। গোপাল একটি কথা না বলে নিঃশব্দে ভয়বিহ্বল সংশয়-বিস্ফারিত নেত্রে মামা আর বুলুকে অনুসরণ করে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল।

– 'আমার ঠিক সন্দেহ হয় ওরই কাজ। বোধ হয় সুমিতকে জন্মদিনে উপহার দিয়েছে।' বুলু উৎসাহ ভরে বলে উঠল।

—'সত্যি করে বলো। বুলুর যে নতুন বইএর সেট্ এসেছে কালকের ডাকে সেগুলি তুমি নিয়েছ?' মামাবাবু গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন গোপালকে।

গোপাল বিস্ময়ে হতবাক্। ভয়বিহ্বল মুখখানা তুলে তখনও সে তাকিয়ে আছে মামাবাবুর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে।

—'তুমি নাও নি! তাহ'ল কোথায় গেল বইগুলো? অতগুলো দামী দামী বই। সেই দুপুর থেকে খোঁজা হচ্ছে।'

গোপাল এবার নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল—'আমি দেখি নি মামাবাবু!'

—'নিশ্চয়ই দেখেছ!'—খেঁকিয়ে উঠল বুলু ভেজা ভেজা স্বরে।—'নইলে—নইলে—'

মামা বুলুর দিকে তাকিয়ে তাকে থামতে বললেন। গোপালকে বললেন—'কিন্তু যে কাগজ দিয়ে বইগুলো প্যাক্ করা ছিল তা যে তোমারই বিছানার তলে পাওয়া গেছে!'

গোপাল মাথা নীচু করে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী ঘুরছে যেন!

—'যাক, আমি তোমার বাবার কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি, এ বিষয়ে তিনি যা করবেন, তাই হবে।'

—'না না, বাবাকে লিখবেন না!—আমি জানি না—সত্যি জানি না কিছুই!'—অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল গোপাল।

—'হুঁ।' মামাবাবু আর অপেক্ষা করলেন না। মনে হ'ল ঝোঁকের মাথায় এখানে এসে পড়ে তিনি একটু কুণ্ঠিত বোধ করছেন। দূরে দাঁড়িয়ে বুলুও একটু মুচ্কি হেসে তাঁকে অনুসরণ করল।

আসর ভেঙ্গে গেল। এক ঘর ছেলেমেয়ের মধ্যে লাঞ্ছিত, অপমানিত গোপাল কশাহত কুকুরের মত ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। দীপা হতভম্ব। সুমিতও তাই।

সেদিনের ডাকেই চিঠি চলে গেল গোপালের বাবার কাছে সেই ছায়া-ঘেরা গ্রামে। (ক্রমশ.)

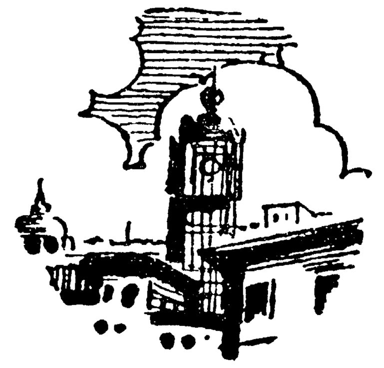

সাগর-পারের বন্ধুর প্রতি

শ্রীসুচেতা ভট্টাচার্য্য

এখানে এখন পূরব আকাশে
অরুণ ছড়ায় আলো,
ওখানে—জানি না, হয়তো বা হবে
রাতের আব্ছা কালো!
নিঝুম শহর ঘুমায়ে পড়েছে
কালো পৃথিবীর বুকে,
শিশুর মতন মায়ের কোলেতে
আঁকড়িয়ে আছে সুখে।
হেথা রাঙা রোদ কেঁপে কেঁপে উঠে
ছড়ায় সকল দিকে,
সবে ভোর হ'ল, পাখীরা জানায়
স্বাগত এ দিনটিকে।

এখানে এখন অলস দুপুর—
শুধু ঝিলমিলে রোদ,
আগুনের গোলা মাটীরে ফাটিয়ে
নিতে চায় প্রতিশোধ।
ওখানে এখন কেমন জানি না—
কি সময় বলা দায়,
এখানে দুপুর, রাখাল বাজায়
বেণু বসি' বটছায়।

এখানে এখন পশ্চিমাকাশে
সূর্য্য পড়েছে ঢ'লে,
রজনীগন্ধা মুখ তুলে চায়,
পাখী যায় ঘরে চ'লে।
শুকতারা ওঠে সাঁঝের গগনে—
ঝিকিমিকি আলো-খেলা,
বিকেল নেমেছে এখানে এখন—
হাসি ও খুশীর মেলা।
ওখানে হয়তো ভোর হয়ে এলো
তবুও ঘুমায় সবে,
পাখীরা জেগেছে, হয়তো মুখর
তাদেরই সে কলরবে।

এখানে এখন নিঝুম রাত্রি
কালো চাদরেতে ঢাকা,
ওখানে হয়তো সকাল হয়েছে
সোনা-রাঙা রোদ মাখা।
আলোতে আলোতে ছেয়ে গেছে দেশ,
সবাই পুলক মনে—
বসে সাগরের বেলাভূমি 'পরে,
নয়তো সবুজ বনে।
গভীর নেশায় আমরা কখন
ঘুমিয়ে পড়েছি জানি,
ভীষণ রাত্রি দৈত্যের মত
ঘিরেছে ভুবনখানি।

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

ভীমাপদ ঘোষ

জন্ম ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ খৃঃ। জন্মস্থান কাশজোড়া, মেদিনীপুর।

ছাত্রজীবন সুরু হয় পাবনা জেলা স্কুলে। তারপর রাজসাহী কলেজ, বহরমপুর কলেজ, সিটি কলেজ ও শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বিভাগ থেকে এম্. এ পাশ করে তা শেষ করেন।

কর্মজীবন সুরু হয় শিক্ষাব্রতী রূপে এবং একে একে কান্দী রাজ হাই স্কুল, বালিগঞ্জ সত্যভামা স্কুল, শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুল ও সবশেষে বালিগঞ্জ জগবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন।

শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিশুসাহিত্য-সেবাও সুরু করেন। ছোটদের নানা সাময়িক পত্রে নিয়মিত লেখা ছাড়াও এশিয়ার ছেলেমেয়ে, কাজের কথা, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মণিমেলা প্রভৃতি ছোটদের অনেক বই লিখেছেন। তা ছাড়া স্কুলপাঠ্য বই তো আছেই।

এই তথ্যপঞ্জী রচনায় এঁরও সহযোগিতা আমরা পেয়েছিলাম। অল্প কিছুদিন হ'ল ইনি পরলোক গমন করেছেন।

কৃষ্ণদয়াল বসু

আদি নিবাস মাণিকগঞ্জ (ঢাকা)। জন্মস্থান—মাতুলালয় ময়মনসিংহে। ৬ মাস বয়স থেকে রংপুর জেলায় উলিপুরে মানুষ হ'ন।

১৯১৫ সালে উলিপুর থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। তারপর ময়মনসিংহ কলেজ থেকে আই. এ ও কলকাতার রিপন কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করেন। ভাল ছাত্র বলে সুনাম ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সরকারী বৃত্তি পেয়েছিলেন।

এঁরও কর্মজীবন সুরু হয় শিক্ষাব্রতী রূপে। তিরিশ বছরের ওপর পূর্ববঙ্গে ও কলকাতায় শিক্ষকতা করেছেন। তার মধ্যে ভবানীপুর মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশনেই ২১ বছরের ওপর।

কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্যের দিকে ঝোঁক ছিল এবং স্কুলে পড়ুয়া অবস্থাতেই ভারতবর্ষে এঁর প্রথম কবিতা 'জাহ্নবী' প্রকাশিত হয়। এর পর ধীরে ধীরে প্রবাসী, মানসী ও মর্ম বাণী, বিচিত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন নামকরা পত্রিকায় লিখতে সুরু করেন। ছোটদের কবিতা প্রথম বেরোয় 'খোকাখুকু'তে। তারপর ক্রমে অন্যান্য শিশুসাময়িক পত্রে।

এঁর লেখা ছোটদের বইএর মধ্যে রুণুঝুনু, পড়ার পরেও ভাবতে হয়, কথা নিয়ে খেলা, ডেভিড লিভিংষ্টোন, এণ্ডারসনের গল্প প্রভৃতি নামকরা। এ ছাড়া অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য বইও লিখেছেন। তার মধ্যে বর্ণশ্রী নূতনত্বের দিক্ দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস্-সি

—এক মিনিটের গল্প আর ছবি—

চারদিকে চার-পাঁচতলা উঁচু সারি সারি আসন সাজান, মাঝখানে বিরাট ঘেরা উঠোন,—এরই নাম ষ্টেডিয়াম্। আজকাল বড় বড় সহরে অনেক লোক যাতে এক

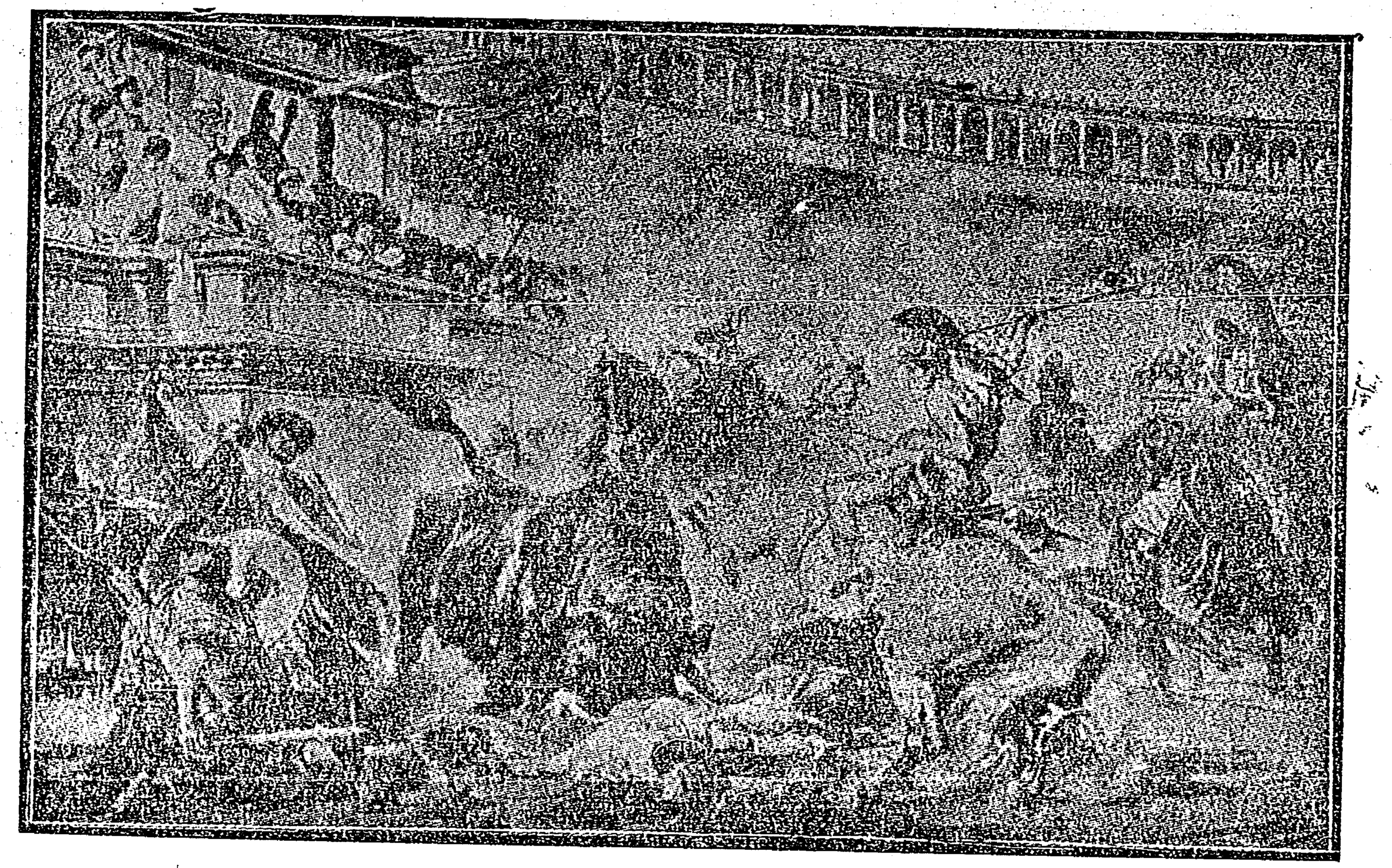

প্রাচীন রোমের সার্কাস

সাথে বসে খেলা দেখতে পারে সেজন্য এই রকম ষ্টেডিয়াম্ তৈরী করা হয়। ওপরের ছবিতে দেখ, দু' হাজার বছর আগেকার এই রকম এক ষ্টেডিয়াম্।

কি খেলা হচ্ছে এখানে বলতে পার? সার্কাস। কিন্তু একালকার মত নয় মোটেই এই সার্কাস। ছবিতে যে জন্তুগুলো দেখছ—বাইসন, হাতী, সিংহ—এদের কোনটাই পোষা নয়—সব সত্ত-ধরা বুনো জানোয়ার। আর তাদের সঙ্গে ঢাল, তরোয়াল আর বল্লম নিয়ে যারা লড়াই করছে তারা হচ্ছে ক্রীতদাস। সার্কাসের নামে সত্যি সত্যি ঐ বুনো জন্তদের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে হতভাগ্য ক্রীতদাসদের, আর তার ফলে প্রাণ দিতে হচ্ছে অনেককেই। হাজার হাজার দর্শক ওপর থেকে গভীর উৎসাহে দেখছে মানুষ আর জন্তুর এই মরণ-মহোৎসব।

একশ' পাঁচ ফুট উঁচু পিতলের মূর্তি

কোথায় হয়েছিল এই সার্কাস? সেকালকার রোমে। প্রাচীন রোমে এই রকম খেলা খুবই জনপ্রিয় ছিল।

* * *

প্রাচীন পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য কোন্‌গুলিকে বলা হ'ত জান তো? এদের মধ্যে ছিল ব্যাবিলনের শূন্যোত্থান, মিশরের পিরামিড, অলিম্পিয়ার জুপিটার-মূর্তি, এফিসিয়াসের ডায়না দেবীর মন্দির, হেলিকারনেসাসের ম্যাসোলিয়াম্ সমাধি-মন্দির, ফেরোসের আলোকস্তম্ভ আর রোড্‌স্-এর পিতলের মূর্তি। পাশে যে ছবিটি দেখছ এটি হচ্ছে সেই পিতলের মূর্তির ছবি।

ঐ মূর্তির ইতিহাস জান? একবার ডিমিট্রিয়স্ নামে এক পরাক্রান্ত গ্রীক রাজা রোড্‌স্ দ্বীপ আক্রমণ করেন। রাজার ছিল দিগ্বজয়ী বলে খুব নাম, কিন্তু রোড্‌স্‌বাসীরা বীরবিক্রমে তাঁকে এমনই বাধা দেয় যে শেষ পর্যন্ত রাজা ডিমিট্রিয়স্ আর পালাবার পথ পান না। অস্ত্রশস্ত্র সব ফেলে তিনি কোন রকমে পালিয়ে বাঁচলেন।

তখন রোড্‌স্ দ্বীপের লোকেরা ঠিক করল, তারা এই বিজয়গৌরবের একটা স্মৃতিচিহ্ন তৈরী করে রাখবে। শত্রু পালাবার সময় যে সব অস্ত্রশস্ত্র ফেলে গিয়েছিল তাই দিয়ে তারা একটা বিরাট পিতলের মূর্তি তৈরী করল। মূর্তিটি হ'ল হিলিয়সের। হিলিয়স্ হচ্ছে প্রাচীন রোম্যান্‌দের অগ্নিদেব।

মূর্তি তৈরী হ'ল। বিরাট সেই মূর্তি—১০৫ ফুট উঁচু। এবারে সমস্যা, কোথায় রাখা হবে ওকে? শেষে ঠিক হ'ল—রোড্‌স্ বন্দরে ঢুকবার মুখেই ওটিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, আর বন্দরে যত জাহাজ ঢুকবে বেরুবে সব ওর ঐ পায়ের ফাঁক দিয়ে যাতায়াত করবে।

তাই করা হ'ল। হিলিয়সের মূর্তি বন্দরের প্রবেশপথে দু'দিকে দুই পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

মধ্যযুগের 'লোহকুমারী'

কিন্তু পিতলের মূর্তি, পাথরের পিরামিডের মত তা চিরস্থায়ী হতে পারে নি। কয়েক শ' বছর পরেই মূর্তির একটি পা ভেঙ্গে যায়, মূর্তিটিও জলে পড়ে যায়। কিন্তু তার গৌরব-কথা আজও লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

* * *

অপরাধীকে শাস্তি দেবার জন্য এ যুগে দৈহিক যন্ত্রণার আয়োজন অনেকটা কমেছে। এখন খুনীকে প্রাণদণ্ড দেবার সময়ও যেন অনেকটা সদয় ব্যবহার করা হয়। কোন কোন জায়গায় তাকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে সুইচ্ টিপে দেওয়া হয়। কি হ'ল বুঝবার আগেই প্রাণ বেরিয়ে যায় তার। অবশ্য গলায় ফাঁসী দিয়ে বা একসঙ্গে একাধিক বন্দুকের গুলিতে প্রাণদণ্ড দেবারও রেওয়াজ আছে অনেক জায়গায়। সেকালের প্রাণদণ্ড কিন্তু আরও ভয়ানক ছিল। জ্যান্ত কুকুর দিয়ে খাওয়ানো, শূলে বিঁধিয়ে মারা, ক্রুশে পেরেক দিয়ে লটকে দেওয়া, হাতীর পায়ে পিষে মারা, বিষধর সাপ দিয়ে কামড়ানো, আরও কত কি! প্রাণদণ্ড না দিয়েও দৈহিক

যন্ত্রণা দেওয়ার নানা রকম ব্যবস্থা ছিল, আর এর জন্য নানা রকম কৌশল—যন্ত্রপাতিও তৈরী করা হ'ত সেকালে। মধ্যযুগে ইয়োরোপে প্রচলিত এই রকম একটি আসুরিক কল ছিল 'লৌহকুমারী'।

লৌহকুমারী! নামটা শুনতে কেমন অদ্ভুত! আসলে বাইরে থেকে দেখতে যন্ত্রটিকে একটি লোহা দিয়ে তৈরী গাউন পরা কুমারী মেয়ের মত লাগত, তাই ঐ নাম। যন্ত্রটি আসলে একটা লোহার খোল। দরজার মত করে খোলা যেত সেটা। আর দরজা খুললেই ধরা পড়ত তার ভেতরের আসল রূপ।

দরজার ভিতর দিকে বর্শার ফলার মত অসংখ্য লোহার কাঁটা লাগানো থাকত। অপরাধীকে এই যন্ত্রের মধ্যে পুরে দরজা বন্ধ করে দিলেই ঐ লোহার ধারাল কাঁটাগুলো সজোরে বন্দীর দেহ পিষে ধরত। ফলে কি হ'ত তা কল্পনা না করাই ভাল।

—প্রতিধ্বনি—

গ্রীক্ পুরাণের গল্পে প্রতিধ্বনি হচ্ছে একটি সুন্দরী মেয়ে—বনের পরী। বড্ড বেশী কথা বলত সে। তবে তার আর একটা গুণ ছিল, সে ভারী সুন্দর গল্পও বলতে পারত। এজন্য দেবরাজ জুপিটার (জিউস্) তাকে বেশ খাতির করতেন। এতে জুপিটারের রাণী জুনোর হ'ল ভারী রাগ। শেষে প্রতিধ্বনিকে.—ওদের ভাষায় তার নাম 'একো',—জব্দ করার জন্য জুনো তার অমন সুন্দর কণ্ঠস্বর কেড়ে নিলেন। কেবল কেউ কোন কথা বললে সে শুধু তার শেষটুকু উচ্চারণ করতে পারবে—এইটুকু দয়া দেখান হ'ল তার ওপর।

এর পর প্রতিধ্বনি আর লজ্জায় লোকসমাজে আসত না। বনের নিরালায় লুকিয়ে থাকত সে। তবে কেউ কোন কথা বললে তার শেষ কথাটা উচ্চারণ না করে উপায় ছিল না তার।

এই সময় হঠাৎ নার্সিসাস্ নামে একটি সুন্দর যুবককে দেখে তার খুব ভাল লাগে এবং এগিয়ে গিয়ে সে হাবভাবে তার মনোভাব জানাবার চেষ্টা করে—কারণ তার তো ইচ্ছামত কথা বলার শক্তি ছিল না! নার্সিসাস্ কিন্তু তার সঙ্গে মোটেই ভাল ব্যবহার করল না। তার উপেক্ষায় প্রতিধ্বনি মনে এমন ব্যথা পেল যে সেই থেকে না খেয়ে মন-মরা হয়ে শুকিয়ে যেতে লাগল সে, এবং অবশেষে তার দেহ একেবারে মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। অথচ কারো কথার শেষে তার শেষ কথাটি উচ্চারণ করার যে অভ্যাস ছিল তার,—সেটি কিন্তু রয়েই গেল। সেই থেকে প্রতিধ্বনির কোন শরীর নেই,—আছে শুধু ঐ স্বরটুকু।

এই হচ্ছে ও দেশের পুরাণের গল্প। কিন্তু বিজ্ঞান যে তা বলে না তা তোমরা নিশ্চয়ই বোঝ। বিজ্ঞানের মতে, প্রতিধ্বনি হচ্ছে ঠিকরে-ফিরে-আসা শব্দ। ব্যাপারটা

কি রকম জান? আয়নার গায়ে আলো ফেলে দেখেছ কখনও? আয়নায় আলো পড়লে সে আলো ঠিকরে আবার তোমার দিকেই ফিরে আসবে। একে সাধুভাষায় বলে 'প্রতিফলন'। আলোর মত শব্দও প্রতিফলিত হয়। শব্দের সৃষ্টি কি করে হয় বোধ হয় অনেকেই জান। কথা বললে বা অন্য কোন রকমে শব্দ তুললে বাতাসে একটা ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউ আমাদের কানে এসে লাগলে আমরা সে শব্দ শুনতে পাই। চারদিক্ বন্ধ একটা বড় ঘর কিংবা গম্বুজের ভিতর দাঁড়িয়ে শব্দ করলে সে শব্দ দেয়ালে বাধা পেয়ে ঠিকরে আবার আমাদের কানে ফিরে আসে; তাকেই আমরা বলি প্রতিধ্বনি। শুধু বড় ঘর বা গম্বুজের বেলাই যে এ কাণ্ড হয় এমন নয়। শব্দকে ঠিকরে ফিরিয়ে দিতে পারে এমন যে কোন বড় বাধা থেকেই প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ধর, বড় বড় পাহাড়ে ঘেরা কোন জায়গা, বড় বড় গাছে ঘেরা কোন বন ইত্যাদি।

সাধারণতঃ আমরা যে সব প্রতিধ্বনি শুনি তাতে শব্দের শেষ অংশটুকুই কেবল শোনা যায়। কিন্তু প্রতিধ্বনি যে দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে এমন অনেক উদাহরণও আছে পৃথিবীতে। এমন কি, একটা ১৪ লাইনের কবিতা আউড়ে গেলে সে কবিতা প্রতিধ্বনির ভিতর দিয়ে আবার তোমার কানে ফিরিয়ে দিতে পারে এমন জায়গাও নাকি আছে।

কোথায় সে জায়গা? ইটালি দেশে,—রোমের কাছাকাছি সেই জায়গা। আসলে জায়গাটি একটি গোরস্থান।

ভয়ের কথাই বটে! গোরস্থানে, হয়ত নিশুতি রাতে কেউ কোথাও নেই, তুমি একটি কবিতা আওড়ালে বা গর গর করে আপন মনে একটু বক্তৃতা অভ্যাস করলে। আধ মিনিট চলে গেল, কিছু হ'ল না। তার পর আরও দশ সেকেণ্ড পরে শুনতে পেলে তোমারই কথা কে যেন আবার আউড়ে চলেছে তোমারই অনুকরণ করে! তুমি যদি তেমন সাহসী লোক না হও তা হলে হয়তো ভয়েই মূর্চ্ছা যাবে!

কিন্তু আসল কারণটি জানলে হাসি আর বিস্ময় ছাড়া আর কিছু আসে না মনে। ঐ জায়গাটি থেকে মাইল চারেক দূরে এমন একটা পাহাড়ী বাধা আছে যেখানে কোন শব্দ পৌছলে আবার তা ঠিকরে ফিরে আসে। শব্দের গতি কত জান তো? সেকেণ্ডে প্রায় সাড়ে তিন শ' গজ। তা হলে চার মাইল গিয়ে ফের ফিরে আসতে—অর্থাৎ এই আট মাইল যাতায়াতে তার লাগে প্রায় চল্লিশ সেকেণ্ড। কাজেই সে প্রতিধ্বনি সুরু হয় চল্লিশ সেকেণ্ড পর থেকে, এবং সে শব্দ একটার পর একটা ক্রমাগত ভেসে আসতে থাকায় তোমার আউড়ে-যাওয়া কবিতা বা বক্তৃতাটাই সে ফের উচ্চারণ করছে বলে মনে হবে। বিশ্বাস না হয়, হিসাব করে দেখ না? আর, যদি ইটালিতে গিয়ে পরখ করে আসতে চাও, সে তো আরও ভাল!

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

নতুন বছরের রামধনু তোমাদের ভাল লেগেছে জেনে আমাদেরও ভাল লাগল খুব। কেউ কেউ চিঠিতে উচ্ছ্বাসও দেখিয়েছ দেখছি! অবশ্য সে রকম কিছু হয়েছে বলে আমরা মনে করি না—বরঞ্চ আরও অনেক কিছু করবার আছে মনে হয়। তবু তোমাদের স্নেহের অভ্যর্থনা নিশ্চয়ই আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

যে ক'টি নতুন বিভাগ এ বছর থেকে সুরু হবে বলে এর আগে জানিয়েছিলাম তার ২।১টি এখনও সুরু করা যায় নি, অদূরভবিষ্যতে তা আরম্ভ হবে। শ্রীঅপূর্বমণি দত্তের মুকুন্দ ভট্ট'র পুঁথি এবারে শেষ হ'য়ে গেল। এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে তোমরা যে প্রগাঢ় কৌতূহল এবং আগ্রহ দেখিয়েছ তা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখব। বইখানি যে ছোটদের উপযোগী একখানি সত্যিকার ভাল উপন্যাস সে সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে আমরাও একমত। তাই ঐ লেখকেরই আর একখানি অনুরূপ কৌতূহলোদ্দীপক উপন্যাস আবার তোমাদের উপহার দেব ঠিক করেছি। অপূর্ব বাবুও রাজী হয়েছেন, তোমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন কখনও? শীগ্‌গিরই এই নতুন বইটি ধারাবাহিক ভাবে রামধনুতে বেরোতে সুরু করবে।

কলকাতার চিল্‌ড্রেন্‌স্ লিট্‌ল্ থিয়েটার বা শিশু-রংমহলের নাম তোমাদের সকলের কাছেই এখন অল্পবিস্তর জানা। এই রংমহলের বার্ষিক উৎসবে যে সব বিশেষ বিশেষ নাটিকা ও ব্যালে অনুষ্ঠিত হয় তার বেশীর ভাগই আগে রামধনুতে তোমরা পড়বার সুযোগ পাও। ঝগড়াটে পড়ুয়া, মিঠুয়া, কনকবংশী—এগুলোর কথা বলছি। শিশুরংমহলের আগামী উৎসবে যে গল্পটি অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে অভিনীত হবে সেটি হচ্ছে একটি মালয়ালী গল্প—এর মূল গল্পটির লেখক হচ্ছেন শ্রীচতুরঙ্গ মেনন। বাংলায় এই গল্পটি নতুন ছাঁচে ঢেলে লিখছেন শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়। শীগ্‌গিরই রামধনুর পাতায় এ গল্পটি তোমাদের পরিবেশন করা হবে। শিশুরংমহলের আর একটি খবর তোমাদের জানাচ্ছি। এই রংমহলের জন্য যে নাট্যকারসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সম্প্রতি তার মধ্যে একটা ছোটদের শাখাও খুলবার আয়োজন হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের স্বরচিত ছড়া, কবিতা, নাটিকা, গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদি আবৃত্তি করে কিংবা পড়ে শোনাবার যাতে সুযোগ পায় তারই জন্য এই বিভাগটির সৃষ্টি। মাসে দু'দিন করে এই অনুষ্ঠান হবে ব'লে ঠিক হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে উৎসাহী এবং কলকাতায় থাক তারা ৪, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৯—শিশুরংমহলের কার্যালয়ে এ সম্পর্কে যোগাযোগ করতে পার।

এবারে তোমাদের চিঠির জবাব দেই।

শ্রীগোপালচন্দ্র মল্লিক ঠাকুর (বিষ্ণুপুর)—তোমার চিঠিখানি পড়ে খুব আগ্রহের সঙ্গেই তোমার কবিতা খুলে বসেছিলাম। প্রতি ডাকেই আমাদের কাছে বৈশিষ্ট্যহীন মামুলী কবিতা আসে অনেক, আশা করছিলাম এবারে বোধ হয় স্বতন্ত্র কিছু একটা পাব। কিন্তু তা তো পেলাম না। কবিতা বিচার করতে গেলে কোথায় তার খুঁত সব সময় তা খুঁটিয়ে বলা চলে না; মনের ওপর সে কি ছাপ রাখল, কানে কি ঝংকার তুলল এইটুকুই আমরা খুঁজি। এই পরীক্ষায় পাশ হলেই কবিতাকে মোটামুটি বলা চলে রসোত্তীর্ণ। তুমি লিখেছ, তোমার কোন্ বন্ধু নাকি বলেছেন গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা নিকৃষ্ট হলেও পত্রিকায় ছাপানো হয়। কথাটা ঠিক তা নয়। যা নিকৃষ্ট তা চিরকালই নিকৃষ্ট, তার স্থান হবে কি করে? তবে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য যে বিশেষ কয়েকটি পাতা আলাদা রেখে দেওয়া হয় রামধনুতে তার সুযোগ তাঁরা নিশ্চয় পাবেন। আর তা থাকবে তাঁদের উৎকৃষ্ট রচনার জন্য,—নিকৃষ্ট রচনার জন্য নিশ্চয়ই নয়। শ্রীদ্বিজমণি সিংহ (রামনগর)—তোমার নাম-বিভ্রাটের কথা শুনলাম। আগে জানালে আগেই সংশোধন করা যেত। বাংলা চিঠিতে যদি তুমি বাংলাতেই নাম সই করতে তা হলে হয়তো 'দ্বিজমণি' 'দুর্গামণি' হয়ে তোমাকে এমন বিব্রত করত না। শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘোষ (চুবকা)—তোমাদের গ্রামের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা পড়ে ক্ষুব্ধ হলাম। সুদিন আবার নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। মনে হয় তখন হয়তো আবার রামধনুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি দিতে কোনই আপত্তি নেই, পেলে খুসীই হব; তবে রামধনুর পাতা ব্যবহার করতে হলে একটু-আধটু নিয়মকানুন তো মেনে চলতেই হবে। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতচর্চা করছ, সে তো ভাল কথা। কলকাতায় এলে একদিন শুনিয়ে যেও তোমার গান, কেমন? শ্রীঅনিল ঘোষ (বোম্বাই)—বিলম্বে এলেও তোমার সহানুভূতিপূর্ণ চিঠিখানি আমাদের কাছে মূল্যবান্ বৈ কি! শ্রীগুণধর বর্ধন (ঝাড়বনি)—বারোয়ারী উপন্যাসের লেখা এবারে না বেরোলেও পরে বেরোতে পারে তো? কাজেই প্রতি বারেই চেষ্টা করতে দোষ কি? তোমার সুন্দর চিঠিখানিতে তোমার সুন্দর মনের পরিচয় পেলাম। শ্রীজয়া চট্টোপাধ্যায় (মরিয়ানী)—তোমাদের ওখানে এমনিতেই ডাক যেতে একটু দেরী হয় মনে হচ্ছে। তবে যে মাসের কাগজ সে মাসে নিশ্চয়ই পাবে। আমরা আর একটু তাড়াতাড়ি কাগজ বার করার ব্যবস্থা করছি শীগ্‌গিরই। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ উঠি।—ইতি রাঃ সঃ

খেলাধূলা

শ্রীঅনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য

—কলকাতায় ফুটবল মরশুম—

হকি শেষ হ'তে না হ'তেই সুরু হ'ল ফুটবল লীগ্। ফুটবলই কলকাতার সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা—ফলে ফুটবল-রসিকদের ভিড়ে মাঠ যে এখন থেকেই, এই প্রচণ্ড গরমেও, ভেঙ্গে পড়বে এ আর বিচিত্র কি! কিন্তু সে-ই পুরোনো অভিযোগ—ষ্টেডিয়াম্ কই? দশ বছর হয়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে, খেলাধূলার প্রতি লোকের (এবং সরকারেরও হয়তো) আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে

কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ সহরে আজও একটা ষ্টেডিয়াম তৈরী করা সম্ভব হ'ল না—এ লজ্জার কথা কা'কে বলব? আমরা জানি, শুধু খবর-কাগজ পড়ে আর রেডিও শুনে কল্পনা করে করেই কত হাজার হাজার ক্রীড়ারসিককে আজ তুষ্ট থাকতে হচ্ছে কলকাতায়। মাঠে গিয়ে চাক্ষুষ খেলা দেখার আনন্দ পাবার কোন উপায় নেই—যদি তোমার হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপব্যয় করার মত বাজে সময়, মনে অপরিসীম ধৈর্য্য আর গায়ে পালোয়ানসুলভ জোর না থাকে।

১৪টি দল নিয়ে এবারে প্রথম বিভাগ লীগ্ তালিকা তৈরী হয়েছে। এদের মধ্যে আছে গত বারের চ্যাম্পিয়ন (লীগ্ এবং শীল্ড দুইএরই) মোহনবাগান, গত বারের লীগ্ রানার্স আপ্ ইষ্ট বেঙ্গল, রাজস্থান, মহমেডান স্পোর্টিং, এরিয়ান্স, উয়াড়ী, রেলওয়ে স্পোর্টস্, বি. এন্. আর, খিদিরপুর, জর্জ টেলিগ্রাফ, পুলিশ, বালীপ্রতিভা, স্পোর্টিং ইউনিয়ন আর হাওড়া ইউনিয়ন।

মোহনবাগানের সে দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ এবারে আর নেই। এরই মধ্যে তারা পর পর কয়েকটি ম্যাচে হেরে ও ড্র রেখে গুটি পাঁচেক পয়েন্ট হারিয়েছে। ইষ্ট বেঙ্গলও তথৈবচ। এখন তালিকার মাথায় রয়েছে রাজস্থান, তার পর মহমেডান স্পোর্টিং। এ দু'টি দলই এবার বেশ ভাল খেলছে। রাজস্থান তো এখনও অপরাজিত। কিন্তু ওপরের চারটে টিম্ই নানা জায়গা থেকে খেলোয়াড় যোগাড় করে এনে খেলছে। সে দিক্ দিয়ে বাহাদুরী দিতে হয় উয়াড়ী দলকে। স্থানীয় তরুণ খেলোয়াড় নিয়েও কেমন শক্তিশালী দল গড়ে তোলা যায় তা এদের দেখলে বোঝা যায়। ইতিমধ্যেই এরা মহামেডান স্পোর্টিং এবং ইষ্ট বেঙ্গলকে হারিয়েছে, মোহনবাগানের কাছ থেকেও এক পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে। (অবশ্য শেষে দুর্বল খিদিরপুরের কাছে হেরেছে।) এরিয়ান্স্ও এখন পর্যন্ত তেমন সুবিধা করতে পারে নি। কিন্তু খেলার তো এই সবে সুরু। শেষটায়, বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে কত কি ঘটতে পারে! কাজেই এখন থেকেই কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না—শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

টুনুর মোমবাতিটা ছিল ৯ ইঞ্চি, ডলির মোমবাতিটা ছিল ৮ ইঞ্চি।

উত্তরদাতাদের নাম: নির্মলকান্তি ঘোষ (বালুরঘাট); রণেন্দ্র ও রবীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ঘৈরালী); সুমিত্রা পালিত (কলিকাতা-১৯); অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর); শ্রীকোল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ (দেউলী); খড়দহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ (উদং); কমলা নিয়োগী (নতুন দিল্লী); শৈবাল দত্ত (মেদিনীপুর); সুপ্রিয়া সোম (বনারস); নূরজাহান বেগম (ঢাকা), সরযূপ্রসাদ (পাটনা); নিমাই, নিতাই, বলাই (কলিকাতা-৬); হাসু ও গোরা (কলিকাতা-২৯)।

নূতন ধাঁধা

একটা থলির মধ্যে ২০টা রঙ্গিন রুমাল ভরা আছে। তার মধ্যে ১০টা লাল, ৭টা সবুজ আর ৩টে নীল। যদি এক রংএর অন্ততঃ ৩টে রুমাল তোমার দরকার হয় তবে কম পক্ষে ক'টি রুমাল তোমাকে থলে থেকে টেনে বের করতে হবে?

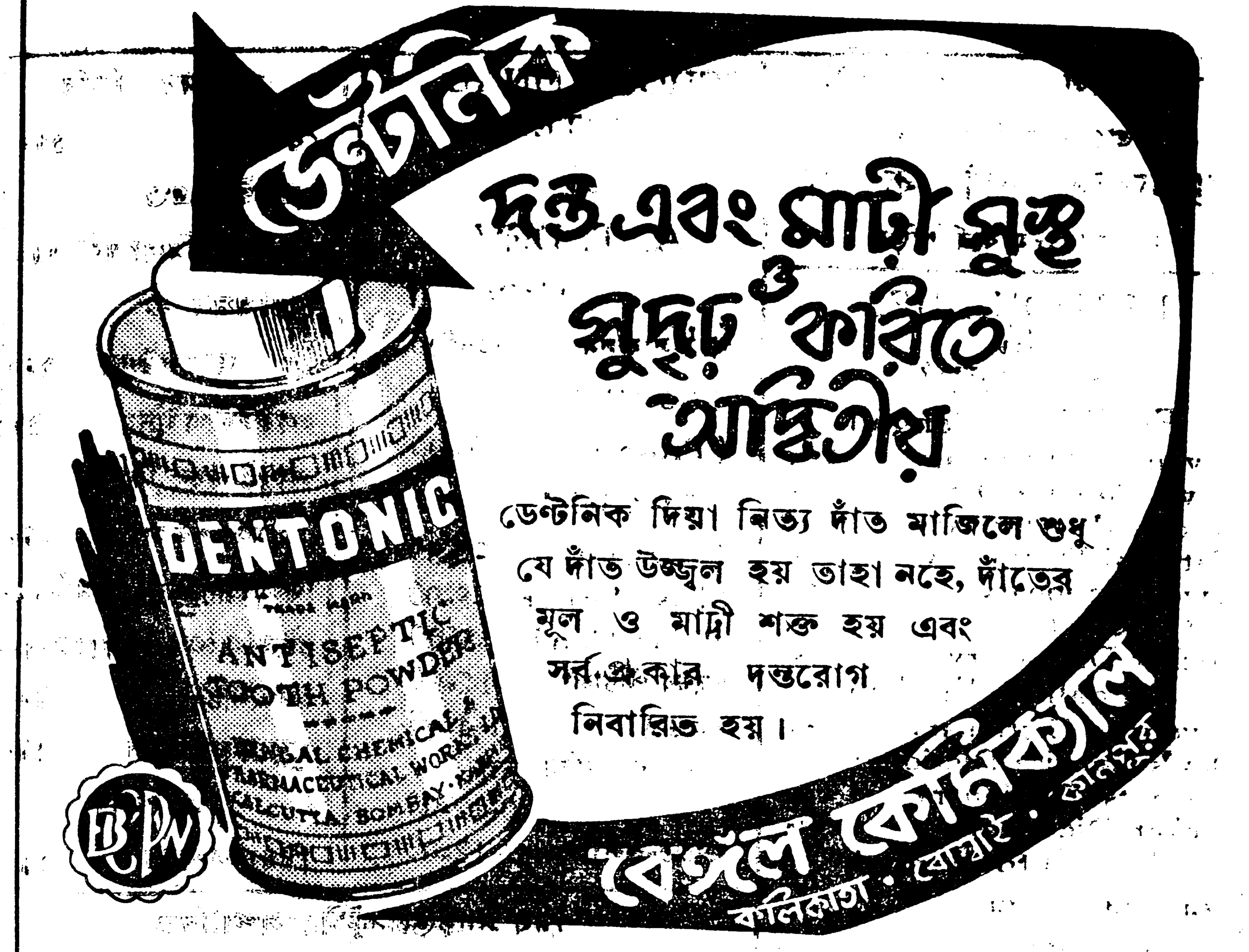

পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

মজাদার গল্প বলতে কি বোঝ? সে রকম একটি গল্প লিখে পাঠাতে হবে।

গল্পটি ছোট হবে। সবশুদ্ধ ১০০০ কিংবা বড় জোর ১২০০টি শব্দ থাকতে পারে (অর্থাৎ ছাপলে রামধনুর ৩।৪ পৃষ্ঠা হবে। গল্প নিজের লেখা হওয়া চাই, আর আগামী ৩২শে শ্রাবণের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

কোন প্রবেশ মূল্য নেই, শুধু প্রতি লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে ভর্তি করে পাঠাতে হবে। ৩ মাস এই কুপন দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকটি কুপনে একটি করে গল্প পাঠাতে পারবে—যে কেউ। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে এবং পছন্দ হলে পুরস্কারপ্রাপ্ত বা যে কোন গল্প (পুরস্কার না পেলেও) রামধনুতে ছাপা হবে।

সবশুদ্ধ তিনটি পুরস্কার আছে,—সবই বই।

কুপন: পু ২-৬৪

রামধনু

নাম——

ঠিকানা——

বয়স——

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৵০

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২॥০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

—বঙ্কিম ঘোষ—

সিপাহী বিদ্রোহ—১৲

—কেশব সেন—

কর্ণার্জ্জুন—॥৵০ চন্দ্রগুপ্ত—॥৵০

বুড়ি বালামের তীরে—১৲

পুরুষ-ভূমিকা-বর্জ্জিত মেয়েদের নাটক

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের—

মাটির ঘর—।৵০

SCHOOL FINAL NOTES
by
A. T. DEV
For—1959

পাঠ-সংকলন	3-8-0
সংস্কৃত-পাঠমালা (Prose)	3-0-0
সংস্কৃত-পাঠমালা (Poetry)	2-0-0
Silas Marner	1-8-0
Robin Hood	1-8-0
পথের পাঁচালী	0-12-0
গল্পগুচ্ছ	1-4-0
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা	0-12-0
ভারত-কল্যাণ	0-12-0

অনুবাদ সিরিজ

বেনহুর	১।০
ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট	১।০
স্যামসন ও ডালেইলা	১।০
লাইট হাউস্	১॥০
লাষ্ট অফ্ দি মহিকনস্	১।০
থ্রি মাসকেটিয়ার্স	১।০
ইনভিজিবল ম্যান	১॥০
ফ্রাঙ্কেনষ্টিন	১॥০
কুয়োভাদিস্	১॥০
জীবনী বিধান রায়	১॥০

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

ভূত-পেত্নী দত্যি-দানা

অসংখ্য চিত্র-সংবলিত দাম—৩৲ টাকা

ঠাকুরমার ঝুলি—ছবিতে পরিপূর্ণ দাম—৩৲

—পূজাবার্ষিকী—

জয়যাত্রা—৪৲

১৩৬৩ সালের

—আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই করা গল্প—

শোনো শোনো গল্প শোনো-২৲

—দেব সাহিত্য-কুটীর সম্পাদিত—

পুরনো দিনের পুরনো গল্প ৩৲

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

লে খা চা ই

অভিনব সচিত্র শিশু-মাসিক। ১লা জ্যৈষ্ঠ ২য় সংখ্যা বাহির হইল। ইহাতে (১৮) আঠারটি পুরস্কারের ঘোষণা আছে। "গ্রাহক" হও ও "লেখা" পাঠাও। বার্ষিক সডাক দুই টাকা; তিন আনার টিকিট পাঠাইলে "নমুনা" প্রেরিত হয়।

শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল,
সম্পাদক, "লেখা চাই"
লেখা চাই কার্য্যালয়,
পোঃ দেবালয়, (২৪ পরগণা)

একখানি দরকারী বই

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

ঘরে বসে সাবান, কালি, দাঁতের মাজন এবং আরও হরেক রকম রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার সহজ প্রণালী।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ—দাম ১॥০

রামধনু কার্য্যালয়,
১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

Regd. No. C—1641

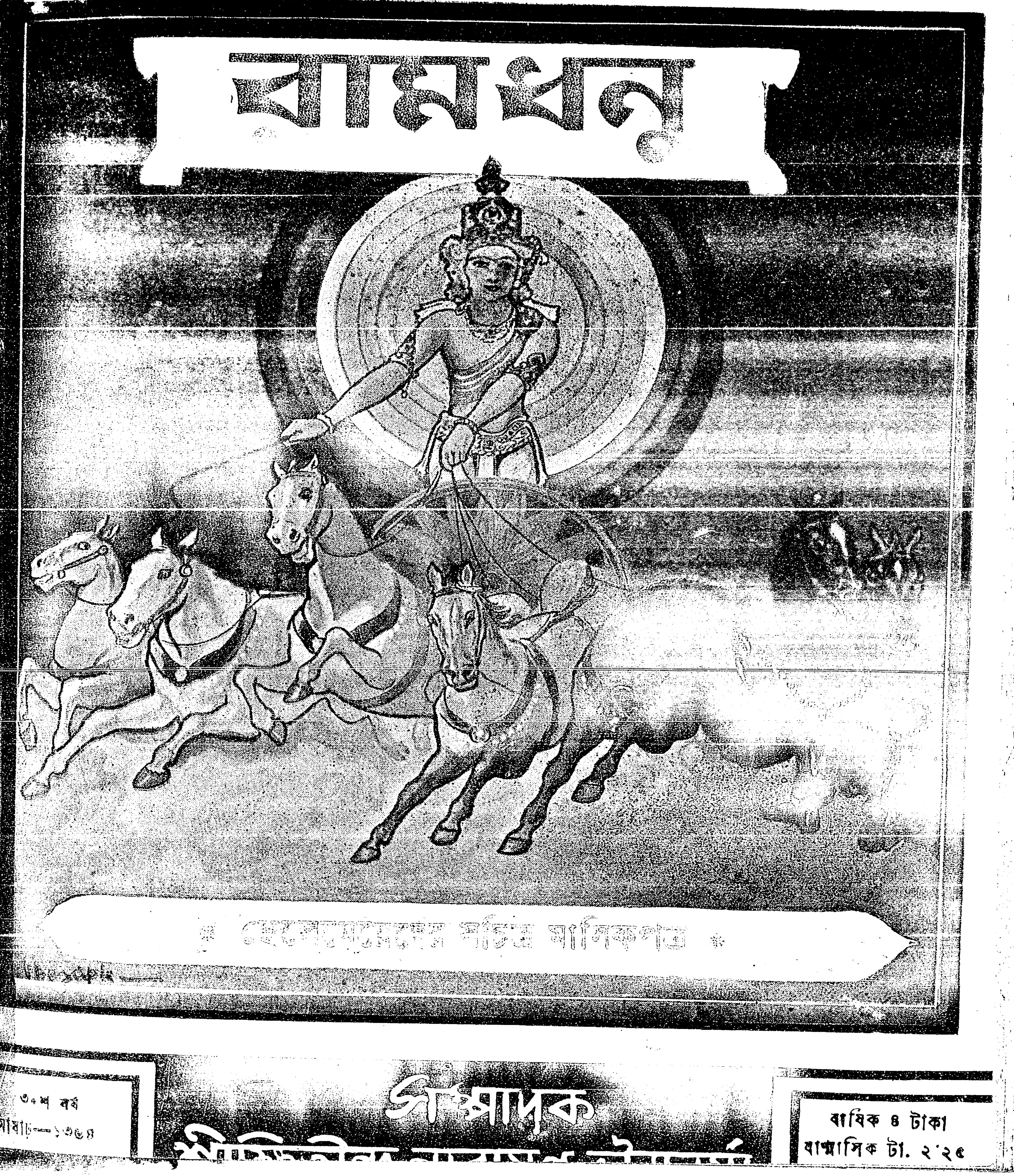

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন-৩৫-২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২॥০, /৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

ছোটদের ভাল ভাল বই ঃঃ নামকরা বই

নবীগোপাল চক্রবর্ত্তীর –

কাঠ ও কাঠের কাজ	১॥০
বাঁশ, বেত, পাতা ও সোলার কাজ	১৲
তন্তুশিল্পের কাজ	১৲

আলোক চক্রবর্ত্তীর—

মনসামংগল	১৲
চৈতন্যমংগল	১৲
কুমারসম্ভব	১৲

শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তীর—

রঘুবংশ	১৲
রাণী রাসমণি	১৲
জাগ্রত মেদিনী	১৲

ছোটদের অভিনব মাসিক পত্রিকা

চয়নিকা

১৮ বছরে পড়ল ঃ বার্ষিক মূল্য মাত্র ৩৲

যে কোন মাসে টাকা পাঠালেও বৈশাখ থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক হতে হয়। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা মাত্র ।০ আনা। অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গ ও সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত।

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

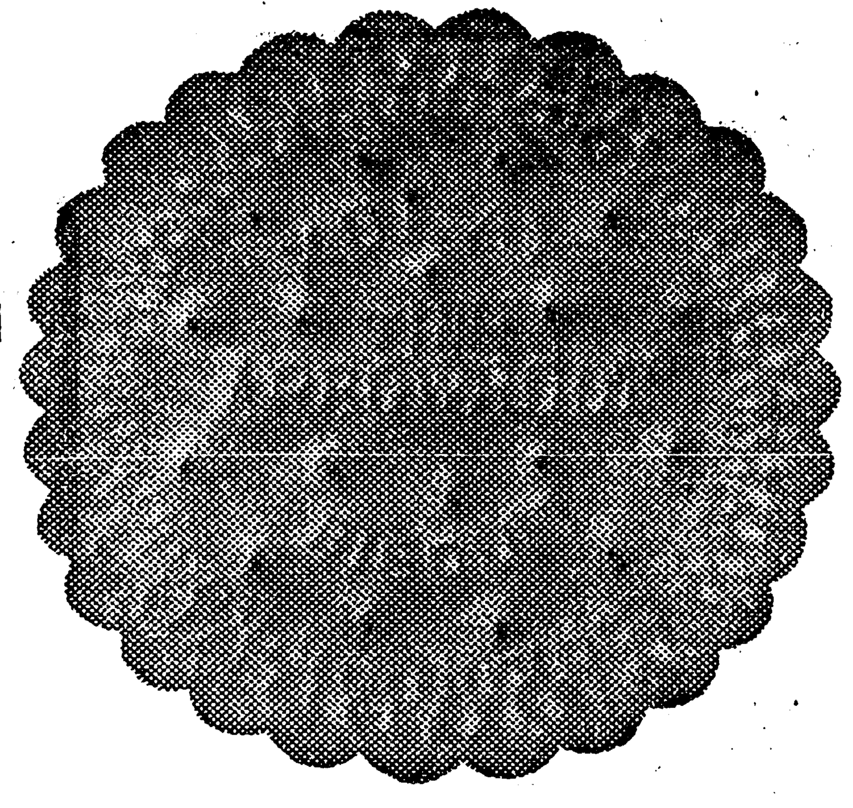

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুণে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

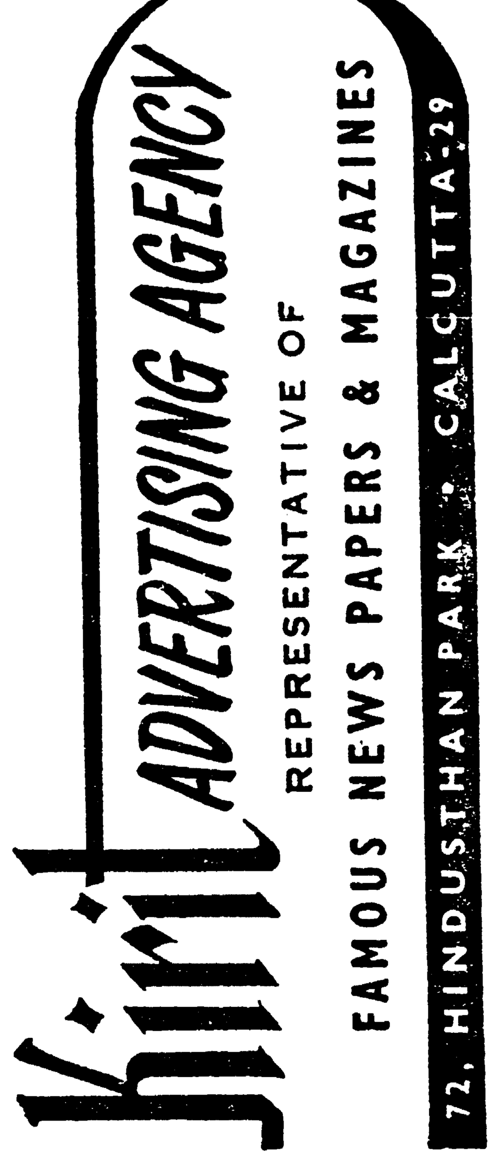

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন.প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন. প.। ভি.পি.তে. আরও ৬৯ ন. প বেশী লাগে। নমুনার জন্য ৪০ ন প.র ডাকটকেট পাঠাতে হয়।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৫। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—ম্যানেজার, রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫ (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

বিজ্ঞাপনের হার (সংশোধিত)

প্রতি বারের জন্য :—

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৫০ টা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৮ টা., সিকি পৃষ্ঠা ১৬ টা.। প্রতি কলম ইঞ্চি ৬ টা.

মলাট : ৪র্থ পৃষ্ঠা ১০০ টা.

মলাট : ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা—৮০ টা. অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৪ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২৪ টা.

ছবি বা লেখার সামনের পৃষ্ঠা ৬০ টা., অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৩৬ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২০ টা.

ধ্বংসের কবলে

শিল্পী—শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১৭৪ পৃষ্ঠা দেখ

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৬৪ { ৩য় সংখ্যা

লাল গাঁ ঃ আষাঢ়ী রূপকথা

শ্রীঅরুণিমা সেনগুপ্তা

শাল-মহুয়ার বনে সারা বেলা—সারাদিন
আলো-ঝিলিমিলি খেলা শেষ হ'ল এইবার,
নূপুরের তালে তালে রিমিঝিমি রিন্‌ঝিন্
নাচ সুরু হ'ল বুঝি আষাঢ়ীয়া জলসার।
সে নাচের হিল্লোলে
মহুয়ার মন দোলে,
ঢেলে দেয় সুবাসের মিটিমিটি উপহার ;
সমারোহ সুরু আজ আষাঢ়ীয়া জলসার।

ছন্দের গন্ধের সে খবর ভেসে যায়,
খুসী-এলোমেলো ওই চঞ্চল হাওয়াটার
মুখে মুখে,—রাঙা পথে, কুটীরের আঙিনায়,—
'ওই এল, শোন না কি ঝিরিঝিরি গান তার?'
অবিরাম বরিষণ
ডালে লাগে শিহরণ,
পাতা-কাঁপা বকুলের—জলঝিরি ঝঙ্কার,
মেতে ওঠে নাচ-গান আষাঢ়ীয়া জলসার।

রূপ্‌সীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে উচ্ছ্বাস ছলোছল,
নদী-পথ-বন মিশে পারাবার—নিঃসীম,
লাল মাটি, বনপথ আবেশেতে ঢলোঢল,
রূপো-জলে তানপুরা বেজে চলে রিম্‌ঝিম্‌।
সে তানের ছোঁয়া লেগে
আকাশের কালো মেঘে
সুর ওঠে,—ধিনিঘিনি-বোল বাজে তবলার,
পাখোয়াজ বেজে চলে আষাঢ়ীয়া জলসার।

ধানক্ষেত দুলে ওঠে, পথ-চাওয়া হ'ল শেষ,
কত কথা বলাবলি,—চোখ-ভোলা সবুজের,
আলপথে রিনিরিনি সে সুরের লাগে রেশ,
রঙে রসে ঝিম্‌ঝিম্‌ নেশা জাগে অবুঝের।
মাঠজোড়া ধানে ধানে,
বাতাসের কানে কানে
আরও দূরে মিলে যায় ভাটিয়ালী গান তার,—
অবিরাম গান চলে আষাঢ়ীয়া জলসার।

অঙ্গনে লাউলতা কেঁপে ওঠে শন্‌ শন্‌;
ঘোমটা সে খসে যায়,—উস্কুখুস্কু কালো চুল
নেচে ওঠে,—গুন্‌ গুন্‌ গান গায় ভীরু মন,
কৃষাণীর কালো চোখ উল্লাসে চুলবুল।
ডানা নেড়ে মিছিমিছি,
শালিখের কিচিমিচি,
তারও প্রাণ বুঝি আজ গায় মেঘ-মল্লার!
উত্তাল সঙ্গীত আষাঢ়ীয়া জলসার।

———

রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী

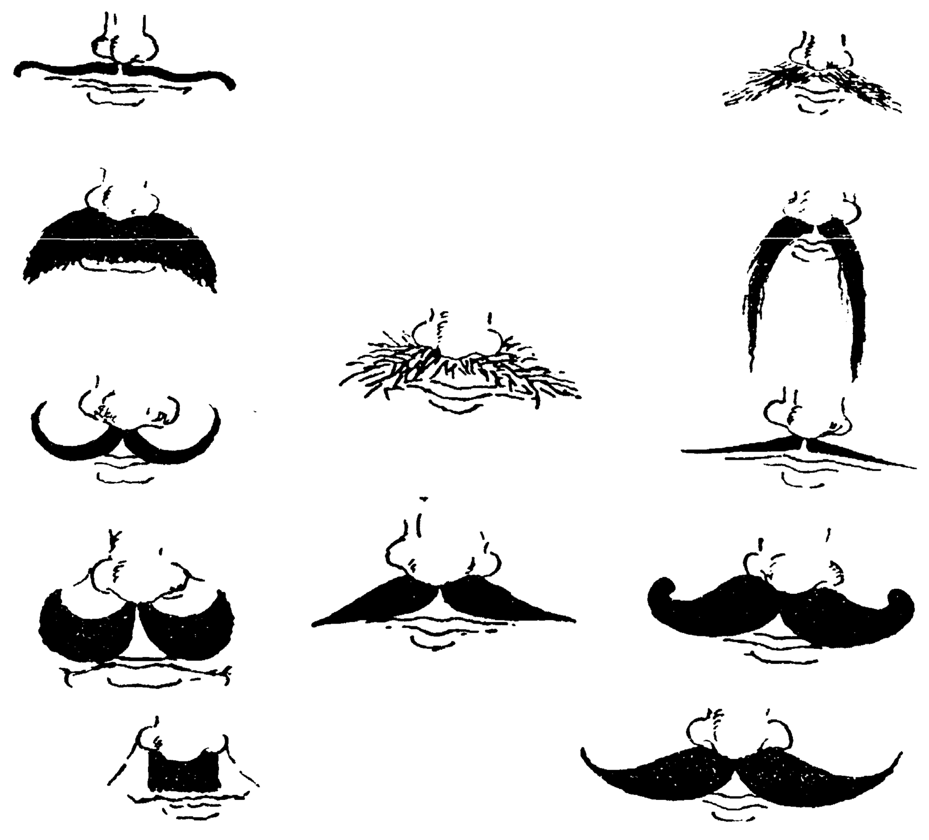

হিরণ্ময় ঘোষাল

'ন' ইঞ্চি লম্বা সিগার উঁচিয়ে খড়-ঠাসা প্রকাণ্ড একটা বাঘ লক্ষ্য করে রায় বরুয়া বললেন, "ঐ যে জন্তুটিকে দেখছেন, পোষা বেড়ালটির মত..থাবা গেড়ে বসে আছে, ওর হাতে আমার একদিন প্রাণ যেতে যেতে রয়ে গেছে। জীবনে অনেক বাঘকে ঘায়েল করেছি, এমন বাঘের পাল্লায় পড়ি নি কখনো। কী করে রক্ষা পেলাম শুনুন, বলি।"

রায় বরুয়া গল্প সুরু করলেন। ব্রহ্মপুত্রের ওপার থেকে তখন বাসে করে পাসীঘাট পর্যন্ত যাওয়া যেতো। আবর পাহাড়ের ও অঞ্চলটায় আবর বা আদীদের অনেকগুলো গ্রাম থাকা সত্বেও ধারে-কাছের বনেজঙ্গলে প্রচুর শিকার পাওয়া যেতো। এখনো পাওয়া যায়। তবে আদীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বন্য পশুরা যেন একটু সমীহ করে চলে। সভ্যতা আর বন্যতায়

বিরোধ চিরদিনের। এখন পাসীঘাটের চেহারা দেখলে কল্পনাও করা যায় না যে মাত্র কয়েক বছর আগে ডাকবাংলার আঙ্গিনায় বুনো জানোয়ারের অবাধ যাতায়াত ছিল।

পাসীঘাটের কাছাকাছি রায় বরুয়ার কিছু ব্যবসা ছিল। তারই তত্ত্বাবধান করতে যান তিনি। শিকারটা আনুষঙ্গিক। নিজের কোনো বাড়ী না থাকায় উঠে ছিলেন ডাকবাংলায়। সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত 465 নেই। আছে একটা ·22; বন্দুক না নিয়ে আসামে শহরের বাইরে যাওয়া ভদ্রোচিত নয়, সেই জন্যে।

রায় বরুয়ারা সাধারণতঃ বৈষ্ণব। উনি কিন্তু ঘোর শাক্ত। মাংস না হলে ওঁর একটি দিন খাওয়া চলে না। আদীরা খায় শূকর আর কদাচিৎ কখনো মিথন। মিথন কতকটা বাইসনের মত; কিন্তু নিরীহ, কতকটা গরুর মত। পোষা জানোয়ার, যদিও থাকে বেশীর ভাগই জঙ্গলে। প্রয়োজন হলে, কোনো উৎসব উপলক্ষে, গৃহস্বামী মার্কামারা আপন মিথন ধরে নিয়ে এসে তাকে ফাঁসি দেওয়ার মত করে ঝুলিয়ে মেরে ভোজ দেয়। রায় বরুয়া মিথন-মাংস স্পর্শ করেন না। শূকর তো নয়ই, এক বন্য বরাহ ছাড়া। পাওয়া যায় এক মুর্গী;—পোষা, ভেতো, পান্‌সে, জোলো, একেবারে বেলে-মাছের মত। মুর্গীর নাম করলে রায় বরুয়া তুড়ী দিয়ে বলেন, "শ্রীহরি, ও আলুর মত নিরামিষ, যদিও ঈষৎ আমিষগন্ধী।" জঙ্গলী মুর্গী অবশ্য চলনসই, কিন্তু জঙ্গলে গেলেই যে পাওয়া যাবে তার স্থিরতা নেই।

আদীরা কেউ কেউ ছাগল পোষে, বলে "সবেন্"। কিন্তু কোনো উৎসব বিনা তারা "সবেন্" মারতে রাজী নয়। রায় বরুয়া একটা আস্ত পাঁঠা কিনতেও প্রস্তুত। আধখানা তো তাঁর নিজেরই বরাদ্দ, কিন্তু "সবেন্" বিক্রী করতে চায় না কেউ।

অবশেষে রায় বরুয়া বিরক্ত হয়ে বললেন, "দুত্তোর, জঙ্গলে গিয়ে আমি নিজেই নিজের খাওয়ার বন্দোবস্ত করে নেবো।"

ওদিকে সম্বর পাওয়া যেতো, সম্বর না পেলে নিদেন পক্ষে একটা সজারু কিংবা বন্য কুক্কুট। সম্বর অবশ্য সন্ধ্যের আগে পাওয়া যাবে না। বেলা পড়ো পড়ো হয়ে আসতেই বেরিয়ে পড়লেন। বিকেলের দিকে জঙ্গলী মুর্গীরা খাওয়া শেষ করে বাসায় ফেরে। যদি দু'-একটা পাওয়া যায় তাহ'লে তিনি তৎক্ষণাৎ ডাকবাংলায় ফিরবেন। সম্বরও সন্ধ্যের দিকে জল খেতে নদীতে আসে। ছোটখাটো একটা মারতে পারলেও দিন দুইয়ের মত নিশ্চিন্ত।

রায় বরুয়া তাঁর নেপালী চাকর বুদ্ধিমান্‌কে বলে গেছেন, সন্ধ্যের পরই ফিরবেন। তিনি ফিরলে তবে শিকারের অনুসারে খাবার তৈরী হবে। হয় ঝোল কিংবা রোষ্ট।

সঙ্গে স্যাণ্ড্‌উইচ, কাফী কিছুই নেন নি। উদ্দেশ্য, ক্ষিদেটাকে বেশ শানিয়ে নিয়ে এলে সন্ধ্যের খাওয়াটা জমবে ভালো।

পিঠে ঝোলানো শিকারীর ব্যাগ, তাতে জোরালো টর্চ্। হাতে ·22। ওঁর বিশ্বাস ওতেই কাজ চলে যাবে। তিনি তো আর হাতী বা বাঘ শিকারে যাচ্ছেন না! সিয়াং নদীর ধারে জন্তুদের জল খেতে আসার একটা পথ চোখে পড়লেই তিনি সেইখানে ওৎ পেতে অপেক্ষা করবেন।

শহরের বেশী দূরে যেতে হলো না। মাইল খানেকের মধ্যেই দেখতে পেলেন আগাছা মাড়িয়ে মাড়িয়ে কারা যেন গভীর জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা পথ তৈরী করে একেবারে নদীর পাড়ের একটা ভাঙ্গন পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। ভাঙ্গনটাও কতকটা ঘাটের মত ঢালু হয়ে নেমে এসে জল পর্যন্ত পৌঁছেছে। ওটা যে কোনো আবর গ্রামের ঘাটে আসার পথ নয় তা দেখলেই বোঝা যায়। তা ছাড়া ভিজে বালির ওপর যে সব ছোট-বড় গর্ত্ত এবং আঁচড়—সেগুলো যে জন্তুদের পায়ের দাগ সে বিষয়ে রায় বরুয়ার মনে কোন সন্দেহই রইলো না। তবে জন্তুগুলো যে কী তা ঠিক ধারণা করতে পারলেন না। সম্বরের ক্ষুরের দাগ একটু গভীর হয়, তাই সেগুলো ভিজে বালির ওপর দু'-একদিনের মধ্যেই মিলিয়ে যায় না। বহুক্ষণ পরীক্ষা করে রায় বরুয়া স্থির করলেন, দাগগুলো সম্বরের ক্ষুরের।

অন্য দাগগুলো হাতী এবং বাঘের যে হতেও পারে সে কথা ওঁর মনে দু'-একবার উঠলো বটে, কিন্তু উনি সে সম্ভাবনা মন থেকে বিদায় করে দিয়ে সুবিধা মত একটা বসবার জায়গা খুঁজতে লাগলেন। একেবারে অন্ধকার হয়ে যেতে এখনো ঘণ্টাখানেক দেরী। পড়ন্ত আলো থাকতে থাকতে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। তখন কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি, চাঁদ ওঠে বটে এক ফালি, তা সে অনেক রাত্রে। তাঁকে এমন জায়গায় থাকতে হবে যেখান থেকে নদী বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে, অথচ খুব দূর নয় এবং হাওয়া বয় বিপরীত দিকে, যাতে বন্য জন্তু তাঁর গন্ধ না পায়। "মানুষের গন্ধ পাঁউ" যে শুধু রাক্ষসই বলতে পারতো তা নয়, বুনো জানোয়ার বহুদূর থেকে জানতে পারে, ধারে-কাছে মানুষ আছে কিনা।

রাত্রে আশ্রয় খোঁজার আর একটা বিপদ্ আছে। ওদিক্‌কার জঙ্গলগুলোয় কখনো কখনো অজগরও দেখতে পাওয়া যায়। বিশাল বিশাল অজগর, গাছের ডালে 'গোলাবী রেউড়ীর' মত জড়িয়ে বেশ খানিকটা ধড় আর মাথাটা ঝুলিয়ে রাখে। কাছ দিয়ে কোনো জন্তু গেলে ঐ ভারী দেহটা রবারের মত নিক্ষেপণশীল হয়ে ওঠে,

এবং মাথাটা দেহের ক্ষিপ্র দোলানীতে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে শিকার লক্ষ্য করে। শিকারকে ঘায়েল করতে হলে ওদের বিষের প্রয়োজন হয় না, ছোবলই যথেষ্ট। তারপর দেহটা গাছ থেকে নেমে এসে শিকারকে মোটা কাছির মত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। দেহের কুণ্ডলীর চাপেই শিকার আধমরা হয়ে পড়ে। তখন অজগর শুরু করে গলাধঃকরণের কাজ। মাথার দিক্ থেকে গিলতে গিলতে পূরো জানোয়ারটাকে উদরসাৎ করে ফেলে ধীরমন্থর গতিতে, তারিয়ে তারিয়ে। অন্ধকার জঙ্গলে রায় বরুয়ার একমাত্র ভয় অজগরকে।

কিছুক্ষণ খুঁজতে খুঁজতে রায় বরুয়া একটা মাকাই গাছের কাছে এসে পড়লেন। আসামের জঙ্গলে মহীরুহ বলতে এই মাকাই আর নাহার। নাহার হয় খুব লম্বা, অশ্বত্থের চেয়েও উঁচু, তবে গুঁড়ি খুব মোটা হলেও ডালপালা ঝাঁকানো নয়। মাকাই প্রকাণ্ড গাছ। গুঁড়ির কাছে স্বভাবতঃ ত্রিকোণাকার ঘরের মত একটা ফাঁক হয়ে যায়। সেখানে বেশ কয়েকজন আনায়াসে বসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কখনো কখনো বন্য জন্তরা সেই ঘরে বসবাস করে। প্রকৃতির তৈরী এই নির্জন কুঠুরীগুলো রায় বরুয়াকে ভীষণ আকর্ষণ করে। এই ধরণের কুঠুরীতে ডেক-চেয়ারে শুয়ে একখানা ভালো বই আর পাইপ নিয়ে তিনি বহু নিস্তব্ধ অপরাহ্ন অতিবাহিত করেছেন।

মাকাইয়ের কুঠুরীটা পেয়ে রায় বরুয়া নানা দিক্ বিবেচনা করে দেখলেন সম্বরের পাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য এমন ঘাঁটিটি যেন তাঁর জন্যই তৈরী হয়ে ছিল। ভেতরে ঢুকে দিব্যি আরামে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়া যায়। করলেনও তাই। মাটির ওপর বর্ষাতি বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

তখন বেশ গা-ঢাকা হয়ে এসেছে। বনে গোধূলির এই প্রশান্ত ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্তগুলি ভারী মনোরম। গাছের মাথায় সোনালী রোদ্দুর ক্রমে ম্লান হয়ে আসে। বনতলের ছায়া খুব আস্তে-আসা ঘুমের মত ঘোর হয়ে ওঠে। তারপর বৃক্ষ-লতা-গুল্ম একাকার করে দিয়ে নামে গভীর অন্ধকার চরম বিস্মৃতির মত। সে অন্ধকার যেমন ভয়াল তেমনই কুহকী। মানুষের মনকে যেন যাদুমন্ত্রে অবশ, নিষ্ক্রিয় করে ফেলে।

ঠিক এই সময়টিতে শুরু হয় বনের দৈনন্দিন জীবন। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক ছাপিয়ে ওঠে বন্য জন্তর আওয়াজ। শুরু হয়ে হিংসার অবাধ নৃশংসতা। চলে ধূর্ত্ততার মার-প্যাঁচ। জঙ্গলের আইনকানুনে বিচার বলে যদি কিছু থাকে তো তা শক্তিমানের স্বপক্ষে। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় সতর্কতা।

রায় বরুয়া মাকাইয়ের গুঁড়ির কুঠুরীতে শুয়ে শুনতে লাগলেন নিহতের আর্ত্তনাদ। কোন্ গাছের আগায় পাখীর বাসা আক্রমণ করেছে সাপ। কোথায় একটা বন-মোরগের

টুঁটি কামড়ে ধরেছে বন-বেড়াল। প্রকৃতির এই অনর্থক হত্যাকাণ্ডে রায় বরুয়ার মনে কী এক অজ্ঞাত বিষাদ দেখা দিলো। একবার ভাবলেন, এই বন-জোড়া হত্যাকাণ্ডে যোগ না দিয়ে তিনি ঘরে ফিরে যাবেন। কিন্তু একবার কোনো সংকল্প করলে তা সম্পন্ন না করে পেছপাও হওয়া তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

তাঁর ভারী একা মনে হতে লাগলো। নিজেকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে তিনি টর্চ জ্বালিয়ে কুঠুরীটার চারিদিকে আলো ফেলে দেখতে লাগলেন, এই নির্জন বনভূমিতে মনোরঞ্জনের জন্যে কিছু পাওয়া যায় কিনা।

একটা কোণে আলো পড়তেই চোখে পড়লো স্তূপাকার হাড়। তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না—তিনি বাঘের গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছেন। একবার ভাবলেন, গৃহস্বামী যদি শিকার সেরে ফিরে আসে আরামও স্বচ্ছন্দে তার আহার সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যে, তাহ'লে কুঠুরীটার ভেতর থেকে অনায়াসে তাঁকে ঘায়েল করা যেতে পারে। কিন্তু বাঘ একবার কুঠুরীতে ঢুকে পড়তে পারলে আর তাকে রেহাই দেবে না। এবং অত কাছ থেকে গুলি করা একেবারে অসম্ভব। তা ছাড়া সঙ্গে আনা ·22 কতদূর কার্য্যকর হবে বলা শক্ত। তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ী ফেরা শ্রেয়ঃ মনে করে তিনি কুঠুরীটির বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ঠিক এই সময়ে কোথায় যেন আগাছা মাড়ানোর শব্দ পাওয়া গেলো।

খস্ খস্ আওয়াজ আর কখনো কখনো ছোট ছোট গাছ এবং ডালপালা ভাঙ্গার পট্‌পট্ শব্দ। ভাবলেন, হয়তো দুষমণ হাতী। দুষমণের সামনে পড়লে রক্ষা নেই। কোনো বড় গাছে উঠে পড়লে নিষ্কৃতি পেতে পারেন। কিন্তু রায় বরুয়া কখনো গাছে চড়া অভ্যাস করেন নি। মাকাই গাছের কুঠুরীতে ফিরে গিয়ে সেইখান থেকে গুলি করলে হাতীকে ঘায়েল করা যেতে পারে। আক্রমণ করলে ছোট কুঠুরীর ভেতর ঢোকা হাতীর পক্ষে সম্ভব নয়, এবং এক কোণে সরে দাঁড়ালে শুঁড় দিয়েও তাঁকে ধরতে পারবে না। আর হাতীটা যতই ক্ষেপে যাক্, অত বড় গাছটাকে ধাক্কা দিয়ে ধরাশায়ী করা তার সাধ্য নয়।

রায় বরুয়া এই রকম সাত-পাঁচ বিবেচনা করছেন, এমন সময় শব্দটা খুব কাছে এসে পড়লে। মরীয়া হয়ে শব্দ লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেললেন, উদ্দেশ্য হাতীটার আকার আন্দাজ করে নিয়ে তাড়াতাড়ি কুঠুরীর ভেতর ঢুকে তৈরী হওয়া।

নড়ন্ত আগাছাগুলোর ওপর আলো পড়তেই রায় বরুয়া কাঠ হয়ে গেলেন। ঠিক তাঁর চোখোচোখি দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড বাঘ, একটা বাচ্চা সম্বর মুখে নিয়ে। সেও টর্চের আলো দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার লাল হিংস্র চোখে পলক পড়ে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৌটিল্য

লক্ষ লক্ষ বছর আগে যখন পৃথিবীতে মানুষের,—মানুষ কেন কোন জীবেরই সৃষ্টি হয় নি তখন পৃথিবীর চেহারা কেমন ছিল? পণ্ডিতদের মতে পৃথিবীতে জীবজন্তু দেখা দেবার আগে প্রথম এসেছিল গাছপালা। কিন্তু সে গাছপালারও, চেহারায়, এখনকার গাছপালার সঙ্গে সামান্যই মিল ছিল। কী রকম ছিল সেগুলি দেখতে? পণ্ডিতেরা পৃথিবীর নানা জায়গায় তাদের পাথুরে কঙ্কাল বা 'ফসিল' খুঁজে বার করেছেন। যেখানে পুরো গাছ পাওয়া যায় নি সেখানে অনেক জায়গায় পাথরের গায়ে তাদের ডালাপালা বা পাতার ছাপ পাওয়া গেছে। এই সব চিহ্ন থেকে সেই সব গাছ দেখতে কি রকম ছিল তার অনেকখানি আভাস পাওয়া গেছে। আমাদের পরিচিত কয়লাও যে আদিম যুগের বনজঙ্গলের পরিবর্তিত রূপ তা হয়তো জান। এক বৈজ্ঞানিক শিল্পী এই সব তথ্য থেকে সেকালকার বনজঙ্গলের একটা কাল্পনিক ছবিও এঁকেছেন। ছবিতে দেখ, কি সুন্দর ছিল এই বন! আর, মনে রেখ, এরা যখন শোভা বর্ধন করত পৃথিবীর, তখন সেখানে উৎপাত করার জন্য হিংস্র-অহিংস্র কোন প্রাণীরই আবির্ভাব হয় নি।

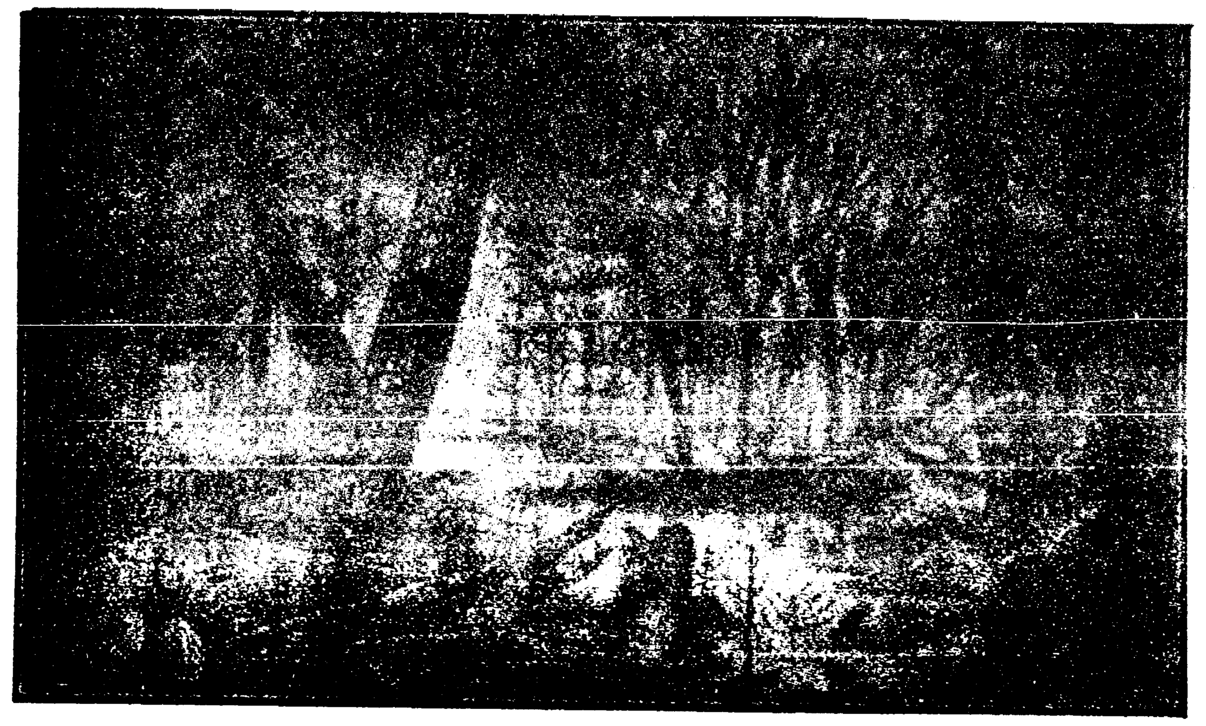
পৃথিবীর আদিম বনজঙ্গল

ডারউইন সাহেব যখন ক্রমবিকাশের তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন তখন, স্বভাবতঃই, চারদিকে খুব হৈ-চৈ পড়ে যায়। ডারউইনের মতে পৃথিবীতে এই যে এত রকম জীবজন্তু এদের অনেকগুলিই এসেছে এক পূর্ব্বপুরুষ থেকে। যেমন ধর, প্রথমে ছিল মাছ। মাছ বদলাতে বদলাতে কতক হল সরীসৃপ—অর্থাৎ কুমীর, টিকটিকি ইত্যাদির জাতভাই, আর কতক হ'ল পাখী। আবার তাদেরই বংশধরেরা ক্রমে বদলাতে বদলাতে স্তন্যপায়ী জীবে পরিণত হ'ল। স্তন্যপায়ী জীবেদের মধ্যে আবার উন্নত ধরণের জীব হচ্ছে বানর—তার পর বনমানুষ এবং সব চেয়ে উন্নত মানুষ। তাই মানুষের সঙ্গে বানরের এত সাদৃশ্য; তার চেয়েও সাদৃশ্য বনমানুষের সঙ্গে। ডারউইনের মতানুযায়ী জীবের এই ক্রমবিকাশ অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে বদলানোকে সাধু ভাষায় 'বিবর্তনবাদ'ও বলা হয়। বিবর্তন বা পরিবর্তনের ফলেই ব্যাপারটা হচ্ছে কিনা! ছবিতে দেখ, এক বৈজ্ঞানিক মডেলের সাহায্যে মাছ থেকে মানুষে এবং পরে সভ্য মানুষে এই বিবর্তন কি করে হ'ল কী সুন্দর ভাবে তা দেখিয়েছেন!

মাছ থেকে মানুষ—কি করে হ'ল

* * *

মানুষ যে অন্য প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই আদ্যিকাল থেকেই সে তার নানা প্রমাণ দিয়েছে। প্রাণিজগতে মানুষই প্রথম এবং, আজ পর্যন্ত একমাত্র তারাই, আগুনের ব্যবহার জানে। আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরী, শরীররক্ষার জন্য চাষবাস করে ফসল ফলানো—এ সবও মানুষ প্রায় সেই আদ্যিকাল থেকেই শিখেছে—যা আজও অন্য কোন প্রাণী পারে নি। শুধু জীবন ধারণের প্রয়োজন মেটানোই নয়, মানুষ তার মনের খোরাকও

মেটাবার চেষ্টা করে আসছে সেই আদ্যিকাল থেকে। প্রাচীন পাহাড়ের গুহায় আদিমানবের আঁকা ছবি দেখে আজও তা অনুমান করা যায়। ঐ সব ছবি, কাঁচা হাতে গুহার দেয়ালের গায়ে আঁকা হলেও, তার মধ্যে সেকালকার জীবজন্তুরা সব কেমন ছিল, কি ভাবে মানুষ তাদের শিকার করত—এ সবের চমৎকার পরিচয় পাওয়া গেছে।

আদ্যিকালের গুহামানবের আঁকা ছবি

*   *   *

এবারে একটি অদ্ভুত জানোয়ারের ছবি দেখ। দেখতে সেকালের জীবের মত হলেও এটি কিন্তু একালের জানোয়ার—যদিও এ ধরণের জানোয়ার একালে আর কোথাও দেখা গেছে বলে জানা যায় নি।

নাম-না-জানা অতিকায় জলজীব

বছর পঁচিশেক আগে ফ্রান্সের এক সমুদ্রতীরে এই জন্তুটির মৃতদেহ ভেসে আসে।

দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক্ হয়ে যান। প্রায় ২৫ ফুট লম্বা জীবটি, কিন্তু অদ্ভুত এর আকৃতি। অদ্ভুত এর গলা, অদ্ভুত এর ডানা, অদ্ভুত এর লেজ। যেন অনেক জাতের প্রাণীর শরীর একত্র মিশিয়ে ভগবান্ এই অদ্ভুত জীবটিকে গড়েছিলেন।

বিজ্ঞানীরা একে কোন্ শ্রেণীর জীবের মধ্যে ফেলবেন ভেবে পান নি। তাঁদের ধারণা, এটি এমন কোন আদ্যিকালের জলজীবের বংশধর যাদের বংশের সকলেই বহুদিন যাবৎ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু এই শেষ একটি টিকে ছিল। মৃত্যু এসে তাকেও এক বিরাট বিস্ময়ের মত আমাদের সামনে ফেলে দিয়ে গেছে।

গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

—কাবুলীওয়ালা—

আমার ভাইপো হ্যাপার কথা মনে আছে তোদের?—গড়গড়া গাঙ্গুলী মশায় আরম্ভ করলেন।—সেই যে কাত্তিকের কত রূপ, গণেশর মত পেটুক, অসুরের মত যোয়ান, সিংহের মত বিক্রম যার? আর সব কিছুই ছিল, একমাত্র লেখাপড়ায় ছিল লবডং। আহা, সে হ্যাপার শোচনীয় পরিণামের কথা শুনলে পাষাণের হৃদয়ও গলে যায়।

কি হয়েছে তার গাঙ্গুলী মশাই?—সাগ্রহে আমরা প্রশ্ন করলাম।

আর কি হয়েছে! যা হাবার তা হয়ে গিয়েছে। তবে কেন তা হ'ল সে কথাটাই বলি।—ব'লে দ্রুত কয়েকটা টান দিলেন তিনি গড়গড়াতে। অতঃপর নাক-মুখ দিয়ে যুগপৎ ধূম উদ্গীরণ করে কাহিনী শুরু করলেন:

এতকাল বলি নি নানাবিধ গোপনীয় কারণেই। আজ আর হ্যাপার কথা বলতে বাধা নেই। নির্ভয়েই বলা যায় এখন। কেন না সে আজ দু'মাস হলো রাঁচীর পাগলা-গারদে বাস করছে। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে সে।

উঃ, সেদিনকার ঘটনাগুলো মনে পড়লে আজো সমস্ত শরীরে ভয়ের শিহরণ হয়। ঈশ্বর সহায় ছিলেন, না হলে হ্যাপা সেদিন হয়ত বাঙালী জাতির মুখে চিরদিনের জন্য কলঙ্কের চূণকালি মাখিয়ে ছাড়ত।

প্রচণ্ড ক্রোধ নিয়ে সে সেবার মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বেলেঘাটায় বোঝাপড়া করতে ছুটেছিল। সমস্ত শরীরে তার ক্রোধ দাউ দাউ করে জ্বলছিল। রক্তের উত্তাপ একটা আজগুবি ডিগ্রীতে উঠে টগবগ করে ফুটছিল—স্বভাবতঃই রক্তচক্ষু আরো লাল করে। হাতুড়ি-পেটানো শরীরের সমস্ত মাংসপেশীগুলিকে অসম্ভব রকম শক্ত করে, এস্পার-ওস্পার মনোভাব মনে পুষে,

অহিংসার অবতার মহাত্মা গান্ধীর সকাশে সে হিংসাক্ষুব্ধ মন নিয়ে যাচ্ছিল, শেয়ালদার পাশ দিয়ে বেলেঘাটা হয়ে। কিন্তু—

এই 'কিন্তু' কে বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথম থেকে কিঞ্চিৎ কাহিনী বিবৃত করতে হয়।

ন্যাপার ছেলেবেলার কথা তো তোরা জানিসই। মেরে ধরে কিছুতেই আর তাকে প্রথম ভাগের ওপরে দ্বিতীয় ভাগে ওঠানো গেল না। ভালবাসতো শুধু মাছ ধরতে। ওর 'মটো' ছিল—'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে, মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে'। এই করেই পরকালটা খেলে। কালক্রমে জমিদারী গেল—মানে লেখাপোনার অভাবে পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খেল। আর ন্যাপা পরিপূর্ণ বকাটে হ'য়ে গ্রাম ত্যাগ করে এক সময় কলকাতা এসে আস্তানা নিলে। তারপর সঙ্গদোষে একেবারে বয়ে গেল। নানা রকম বদ্ অভ্যেস হ'ল। তার মধ্যে প্রধান হ'ল সিনেমা দেখা,—বিশেষ করে হিন্দী ছবি। এদিকে চাকরীবাকরী কিছুই হ'ল না—রোজগার নেই কিছু—অথচ আহারবিহার, আমোদ-স্ফূর্ত্তি, সিনেমা-বায়স্কোপ সমানেই চলতে লাগলো। পঞ্জিকা মতে আয় যদি হয় দুই, ব্যয় বাহান্ন, কাজে কাজেই স্থিতি মাইনাস পঞ্চাশ। ফলে ধারে নামতে হ'ল। বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত কারুর কাছেই হাত পাততে বাকি রাখলো না। অবশেষে যখন সবাই তিতিবিরক্ত হয়ে ওকে দেখলেই উলটো ফুটপাথ ধরতে লাগলো তখন নিল অগতির গতি কাবুলীওয়ালার শরণ।

কাবুলীরা চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। আর বাড়ী এসে লাঠি হাতে তাগাদা করে সুদ আদায় করে প্রত্যহ। এজন্য ওদের বলে আফগান ব্যাঙ্ক।

অন্য পাঁচজনের কাছে টাকা নিয়ে না দিলেও চলে, কিন্তু এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। সুতরাং জাল জোচ্চুরী, চুরি-বাটপাড়িতেও নামতে লাগলো ন্যাপা। আমাদের গাঙ্গুলী-বংশের কুলসন্তান! ওর নাম পর্যন্ত আমরা মুখে আনি না, নেহাৎ তোদের কাছে গল্প বলছি বলেই বাধ্য হয়ে উচ্চারণ করতে হচ্ছে আজ।

যাই হোক, কোন রকমে দিন কেটে যাচ্ছিল ন্যাপার।

সত্যি বলতে কি, ন্যাপা এ দুনিয়ায় কাউকেই কেয়ার করতো না, পুরোপুরি একটি গুণ্ডা হয়ে উঠেছিল সে। অনায়াসে রাস্তার মোড়ে সোডার বোতল চালাতে পারতো। যে কোন লোককে বে-টপকা ছোরা দেখিয়ে কাজ হাসিল করতো অকুতোভয়ে, প্রয়োজন বোধে পুলিশের ভ্যানের ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়তেও ওর জুড়ি ছিল না কেউ। কিন্তু এত বড় জঙ্গী ছেলেরও ঐ একটি মূর্ত্তি দেখলেই, মানে ঐ সালোয়ার-জোব্বা-পরিহিত কালো রঙের পাগড়ির নীচে বাবরি ও সুকর্ত্তিত দাড়ি-গোঁফ-শোভিত দৈত্যপানা মুখ স-লাঠি কাবুলীওয়ালার রূপ দেখা মাত্রই, কেন যে তল-পেটে বিদ্‌ঘুটে রকমের মোচড় দিয়ে পা কাঁপতে ও বুক দুরু দুরু করতে শুরু করতো সে এক পরম বিস্ময়। দর্শন মাত্রেই পালাবার ইচ্ছে হ'ত প্রবল। এবং যা ভাবা তাই কাজ। কাবুলী-ওয়ালারা ন্যাপার দেখা কদাচিৎ পেত। কিন্তু এ ভাবে জীবন কাটানোও তো মহাঝঞ্ঝাটের ব্যাপার! মাঝে মাঝে রাগের মাথায় ইচ্ছে হ'ত দশ ইঞ্চি ছোরা আমূল বসিয়ে দিতে কাবুলীওয়ালার বিরাট ভুঁড়িতে;—তাহলেই শত্রু নিপাত হয়ে যায়। কিন্তু ঘরে বসেই, মানে ওদের কাছ থেকে বহুদূরে

থেকেই, এ কল্পনা সম্ভব ছিল। কাছে এলেই হৃৎকম্প শুরু হ'ত আর পালাই পালাই ভাব। জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছিল ন্যাপার।

বাঁচালো তাকে দাঙ্গা। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর সবার পক্ষে যেটা সর্ব্বনাশ—ন্যাপার পক্ষে তা এলো পৌষ মাস রূপে। তৎক্ষণাৎ ন্যাপা আর তার সঙ্গীদল সে হুজুগে মেতে গেল। প্রথমেই তাড়ালে কাবুলীওয়ালাদের। তাদের গায়ে হাত তোলবার সাহস অবশ্য কারুরই হয় নি। দূরে হল্লা শুনে তারাই মানে মানে স্থান ত্যাগ করে দূরে সরে গেছে। আর কোন্ ব্যাটাকে ভয়? ন্যাপারা যত্রতত্র যা-তা করে বেড়াতে লাগলো।

কিন্তু কে জানতো যে এ সুখও দু'দিনের। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। বজ্রাহতের মত ওরা একদিন শুনতে পেল যে দাঙ্গা থেমে গিয়ে নাকি মিটমাট হচ্ছে। শান্তি কমিটি বসেছে, এবং মহাত্মা গান্ধী নাকি কলকাতায় এসে নিজে সবাইকে বুঝিয়ে ফের 'মিল্‌মিশ্ ভাই ভাই' করে দিচ্ছেন।

স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়লো ন্যাপা।

অদূরভবিষ্যৎটা চোখের সামনে বায়োস্কোপের ছবির মত ভেসে গেল। 'মিল্‌মিশ্'! ফের দুই সম্প্রদায় একসঙ্গে আগেকার মত বাস করবে? আর—আর, পুনরায় বোধ করি ঐ ব্যাটা কাবুলীওয়ালারা এসে তাগাদা শুরু করবে! জীবন ফের হয়ে উঠবে দুর্ব্বিষহ! স্ফূর্ত্তি করে বেড়াবার উপায় থাকবে না—মাথার ওপরে লাঠি নিয়ে মহাজন থাকবে অষ্ট প্রহর! সমস্ত শরীরে আবার এতদিন বাদে কাঁপুনি এলো ন্যাপার। পেট গোলাচ্ছে, পা কাঁপছে, পালাবার ইচ্ছে হ'ল।

কিন্তু পালাবেই বা কোথায়?

তারপর যতই ভাবতে লাগলো—ততই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠতে লাগলো। মনে মনে দেশনেতা—শান্তি-কমিটি—সবাইকে গালাগালি দিলে। তাতেও ক্রোধ কমলো না। এর একটা বিহিত চাই। শেষ অবধি ঠিক করলো, মহাত্মা গান্ধীর কাছে নিজে গিয়ে, কেন তিনি নিজেদের স্বজাতিকে এ ভাবে খামোখা বিপদে ফেলছেন তার কারণ স্পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞেস করবে। এককালে ন্যাপা মহাত্মা গান্ধীর ভীষণ ভক্ত ছিল। এক সময়ে চরকা নিয়ে কিছু সময় সুতোও কেটেছে। আজ সে ন্যাপাই মহা বিরক্ত হয়ে উঠলো।

ঠিক করলো, এক্ষুনি—এই মুহূর্ত্তে বেলেঘাটা যাবে—সামনা সামনি মহাত্মা গান্ধীকে জিজ্ঞেস করবে: কি প্রয়োজন ছিল খামোখা বিপদ ঘটিয়ে—মিছিমিছি মিলন ঘটিয়ে? এস্পার ওস্পার কথা হবে মহাত্মার সঙ্গে।

উঃ, ভাবলে আজ আমাদের বুক কেঁপে ওঠে। যদি ন্যাপা গিয়ে সত্যিই রাগের মাথায় মহাত্মাকে কিছু একটা অনপনেয় অপমানের কথা বলে বসতো তাহ'লে সমস্ত জাতি প্রায়শ্চিত্ত করলেও তো তার ক্ষমা থাকতো না!

কিন্তু ঈশ্বর সহায়।

ন্যাপা এগোচ্ছে ভীমগতিতে, দুর্জ্জয় সাহসে, বজ্রমুষ্টি সহকারে। মনেতে দুই সম্প্রদায়েরই প্রতি আকণ্ঠ ঘৃণা নিয়ে। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে ভাব রক্তচক্ষুতে।

শেয়ালদা কোর্টকে ডাইনে রেখে কিছু দূর গিয়ে ফের ডানদিকে বাঁক নিলে। নিজ মনেই ন্যাপা বিড়বিড় করে কি সব শক্ত শপথ উচ্চারণ করতে করতে এগোচ্ছে। তারপর বাঁয়ে বেঁকে যেমনি সে বেলেঘাটা পুলে উঠতে যাবে এমন সময়—

—এ কি! না না, এ তো সত্যি নয়! রক্তরাঙা চোখ ছ'টোকে ছ'হাতে রগড়ে নিলে ন্যাপা। হ্যাঁ, তলপেটে মোচড় দিচ্ছে, পা কাঁপছে—বুকের মধ্যে গুড় গুড় করে উঠছে। ও ব্যাটারাই তো। সেই সালোয়ার-জোব্বা, চাপকান-পাগড়ি, বাবরি-দাড়ি-গোঁফ-লাঠি-মেশানো চেহারায় সেই কাবুলীত্রয় এগিয়ে আসছে। প্রায় একশ' গজের মধ্যে তারা এসে গেছে। ন্যাপার পূর্ব্বের সে সাহস, সেই বীরভাব, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বোঝাপড়ার উৎসাহ সব মিলিয়ে গিয়ে তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ে এল 'পালাই' 'পালাই" রব। প্রথমটা সে অজগরসম্মোহিত হরিণশাবকের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু কাবুলীওয়ালাদের ব্যাঘ্রস্বর—"আরে ন্যাপা বাবু,—সুদ লাও" ধ্বনি কানে প্রবেশ করা মাত্র, পেছন ফিরে সে যে গতিতে বেলেঘাটা রোড টু সার্কুলার রোড দৌড়ে এল, ষ্টপ্ওয়াচ্ থাকলে দেখা যেত তা বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গকারী দৌড়বাজ ব্যানিষ্টারের রেকর্ডকেও ভঙ্গ করেছে।

কিন্তু ন্যাপার বিধি বাম।

প্রচণ্ড শক্তিতে দৌড়ে এসে টাল সামলাতে পারলো না। পড়ে গেল উত্তরদিকে-যাওয়া এক চলন্ত বাসের তলায়। চারদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেল। এ সংবাদ খবরের কাগজ মারফৎ অনেকেই জানে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হ'ল না ন্যাপার। বাঁ পা-টা সম্পূর্ণ গেল, আর মাথার আঘাত গুরুতর।

ছ'মাস হাসপাতালে থেকে বাঁ পাটিকে হারিয়ে আর মাথাটিকে আধপাগলা করে সে পাড়ায় ফিরে এলো।

সেই থেকে আধপাগলা অবস্থায়ই কাটলো এ ক'বছর।

আজ ছ'মাস হলো অকস্মাৎ বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাওয়ায় তাকে রাঁচীর পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বলে গড়গড়া গাঙ্গুলী মশায় বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস অন্তে পরিপূর্ণ নিভে-যাওয়া গড়গড়াটিতে নিস্ফল টান দিতে লাগলেন।

বাবরের গল্প

শ্রীজয়দেব রায়, এম্. এ

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের কথা ইতিহাসে পড়েছ তোমরা। কিন্তু তাঁর সব কথা ভাল করে অনেকেরই হয়তো জানা নেই।

মাত্র বারো বছর বয়সে বাবর তাঁর পিতৃরাজ্য ফারগণার মসনদ লাভ করেন। ঐ অল্প বয়স থেকেই তিনি রাজকার্যে বেশ বিচক্ষণতা দেখিয়েছিলেন; তখন থেকেই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুরলঙের রাজধানী সমরখন্দ জয় করবার। সেই সমরখন্দ তিনি জয় করলেনও, প্রথম যৌবনেই, কিন্তু রাখতে পারলেন না। সেই সঙ্গে পিতৃরাজ্য ফারগণাও হারালেন।

তারপর তিনি একদল অনুচরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন অন্যত্র রাজ্য গড়বার জন্য। অদৃষ্ট-বিপর্যয়ে রাজ্যহারা হয়ে যখন বাবর দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন একবার তিনি এক বৃদ্ধার কুটীরে অতিথি হন। বৃদ্ধা বাবরের পরিচয় পেয়ে বল্লেন—"তুমি একটা সামান্য রাজ্য হারিয়ে পাগলের মত ঘুরছ! আমার দিদিমার কাছে শুনেছি, তাঁর দাদামশায় তৈমুরলঙের সঙ্গে দিল্লী জয় করতে গিয়েছিলেন। মাত্র দশ দিন লেগেছিল তাঁর ও দেশ জয় করতে। জয় করা রাজ্য ফেলে তিনি এক হাজার উটের পিঠে সোনাদানা চাপিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তুমিও যাও না, দিল্লী দখল কর। সে তো বলতে গেলে তোমারই পূর্বপুরুষের রাজ্য!"

বৃদ্ধার এই উপদেশ বাবর একদিনের জন্যও ভোলেন নি। সহায়সম্বলহীন, নিঃস্ব একজন মোগল যুবকের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা ভাবলে হয়তো হাসিই পাবে।

বাবরের অনুচর-সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল। তারা বাবরকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসত। বাসবেই বা না কেন? তিনিও তো তাদের জন্য কম করতেন না! একবার সঙ্গীদের নিয়ে তিনি খোরাশান গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে হ'ল। পথ পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে। ঐ অঞ্চলে তখন অবিরত বরফ জমছিল, তার ভিতর দিয়ে ঘোড়া চড়েও চলা কঠিন। ঘোড়ার পা-দান পর্যন্ত বরফে ডুবে যাচ্ছিল— দিনে দুই-এক মাইলের বেশি এগোনো যায় না। রাত্রিকালে বিশ্রামের স্থান নেই। অনুচরেরা বরফ খুঁড়ে একটি গুহা আবিষ্কার করল। তারা বাবরকে সেই গুহায় আশ্রয় নিতে অনুরোধ করল। সকল অনুচরের সেখানে ঠাঁই হবে না দেখে বাবর কিছুতেই গুহায় আশ্রয় নিলেন না, সারারাত্রি পথের বরফের স্তূপের উপরে কাটালেন সঙ্গীদের সঙ্গে।

অনুচরের সংখ্যা কিছু বাড়লে বাবর গৃহবিবাদের সুযোগ পেয়ে কাবুলের মসনদ অধিকার করে ফেললেন। দিল্লীজয়ের সেটা হচ্ছে প্রথম ধাপ। কিন্তু বাধাও কম ছিল না। হাসান মির্জা নামে তাঁর এক পিতৃব্যপুত্রও ছিল তাঁর একজন অনুচর। এই হাসান মির্জা বাবরকে সরিয়ে কাবুলের মসনদ দখল করবার চেষ্টায় ছিল। বাবর একবার হাজারা পর্বতের দিকে একটা বিদ্রোহ দমন করতে যান। সেই সুযোগে তাঁর পিতার বিমাতা শাহ বেগম মির্জাকে তাঁর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করতে প্ররোচিত করলেন।

শাহ বেগম চিরকালই বাবরকে মনে মনে হিংসা করতেন, তাঁর অনিষ্ট করবারও চেষ্টা করতেন। বাবর তা জেনেও কখনও তাঁকে অসম্মান করেন নি।

বাবরের শত্রুরা প্রায় সকলেই সুযোগ পেয়ে মির্জার সঙ্গে যোগদান করল। বাবর খবর পেয়ে তখনই ফিরে এলেন। বহু কষ্টে, বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে দুর্গম, দুরারোহ পর্বত অতিক্রম ক'রে যে পথ তিনি পার হ'য়েছিলেন, কাজ অসমাপ্ত রেখে সে পথেই আবার তাঁকে ফিরে আসতে হ'ল রাজধানীতে।

বাবর যে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন, শত্রুরা তা স্বপ্নেও ভাবে নি। বিদ্রোহী দল গত্যন্তর না দেখে আত্মসমর্পণ করল। সকলেই ভেবেছিল, শাহ বেগম আর হাসান মির্জার কি দশাই না হবে!

কিন্তু আশ্চর্য! বাবর রাজপ্রাসাদে ঢুকে সোজা শাহ বেগমের ঘরে গিয়ে তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন, বললেন—"দিদিমা, পথে বড়ই কষ্ট পেয়েছি। এখন তোমার কোলে শুয়ে একটু বিশ্রাম করি। তোমার অন্য নাতির পর যত টানই থাকুক, আমাকে তুমি ভালোবাস্‌বে না, এ কি ক'রে হয়?"

শাহ বেগমের আর লজ্জায় মুখ দেখাবার উপায় রইল না। বাবর মির্জাকেও ডেকে এনে তাকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, "ভাই, তুমি এতকাল আমার সঙ্গে থেকে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছ, এখন একটু আরাম করবার দিন এসেছে। আমার সঙ্গে থেকেই এখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কর। আর যদি তা তোমার ভাল না লাগে, ইচ্ছে মত যেখানে খুসী গিয়ে থাকতে পার। আমি তোমায় কোন বাধা দিতে চাই না।"

এর পর বাবরের ভারত আক্রমণের কথা। তোমাদের পাঠ্য ইতিহাসের বইয়েই হয়তো তোমরা তা পড়েছ। এখানে আর তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বাবর উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র ও কয়েক হাজার অশ্বারোহী সেনা নিয়ে পাঠান সম্রাট্ ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ক'রে দিল্লীর মসনদ দখল করলেন। ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হলেও যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। যখন তাঁর শরীররক্ষী সেনারা পর্যন্ত

তাঁকে ত্যাগ ক'রে পালালেন, তাঁর ঘোড়াটি পর্যন্ত মরে গেল, তখনও একা তরবারি হস্তে যুদ্ধ করতে করতে ইব্রাহিম প্রাণত্যাগ করলেন।

বাবর ইব্রাহিমের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং তাঁর জ্ঞানশূন্য মস্তকটিকে নিজ অঙ্কে রেখে বললেন—"হে বীর, তুমি আমার ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণ কর।"

বাবর সেনাপতিদের আদেশ দিলেন—"যেখানে পাঠান সুলতান শায়িত হয়েছেন সেখানেই বিশেষ সমারোহের সঙ্গে তাঁকে সমাধি দাও।"

রাণা সংগ্রাম সিংহ বিপুল রাজপুতবাহিনী নিয়ে বাবরকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু বাবরের রণকৌশলে তাঁর অল্পসংখ্যক সৈন্যের কাছে পরাস্ত হলেন।

এর পর রাজ্যশাসন। তৈমুরের মত শুধু লুঠপাট করতে আসেন নি বাবর এ দেশে। প্রজার মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট চিন্তা ছিল তাঁর। ছদ্মবেশে তিনি প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে দেখে বেড়াতেন।

একবার এক রাজপুত যুবক তাঁকে হত্যা করবার সুযোগ খুঁজছিল। একদিন ঐ যুবক রাজপথে দাঁড়িয়ে আছে। বাবর এখান দিয়ে যাবেন—খবর পেয়েছে সে; এইবার তার সুযোগ। এমন সময় সে দেখল রাজপথে একটি পাগ্‌লা হাতী ছুটে চলেছে। সকলেই যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে।

একটি মেথরের ছেলে পথে পড়ে কাঁদছিল। কেউই তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করল না; সকলেই শুধু 'গেল, গেল, মর্‌ল, মর্‌ল' ব'লে চীৎকার করছে। একে তো ঐ পাগ্‌লা হাতীর সামনে যাওয়াই বিপজ্জনক, তাতে আবার ছেলেটা হ'ল মেথরের, কে তাকে বাঁচোবে?

এমন সময় এক দীর্ঘকায় সৈনিক ভীড় ঠেলে ছুটে গিয়ে হাতীর প্রায় পায়ের তলা থেকে ছেলেটিকে টেনে কোলে ক'রে তুলে আনল। রাজপুত যুবক সৈনিককে চিনে স্তম্ভিত হলে গেল। সৈনিক আর কেউ নয়—স্বয়ং বাবর। এই দৃশ্য দেখে সে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেল যে তখনই সেই সৈনিকের পায়ের কাছে তার ছোরাখানি রেখে বলল—"শাহানশাহ, আমি আপনার একজন বিদ্রোহী প্রজা, আপনার প্রাণবধের জন্য এই পথে ঘুরছিলাম। কিন্তু আপনার মহত্বে মুগ্ধ হয়ে আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আপনার ইচ্ছামত আমার দণ্ডবিধান করুন।"

বাবর যুবককে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—"যুবক, তোমার অকপট হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমিও মুগ্ধ হলাম। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আজ থেকে তুমি আমার শরীররক্ষী হ'লে।"

বাবর বেশী দিন রাজত্ব করতে পারেন নি। বাবরের মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনের একবার সাংঘাতিক পীড়া হ'ল। চিকিৎসকেরা জীবনের আশা ত্যাগ করলেন। হুমায়ুনের জীবনদীপ আস্তে আস্তে নিভে আসতে লাগল।

এমন সময় একজন দরবেশ এসে বললেন—বাবর যদি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় দ্রব্য খোদার নামে উৎসর্গ করতে পারেন তা হ'লে রোগ সারতে পারে।

বাবর বললেন—"আমার নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় বস্তু তো আমার আর কিছু নেই,—তাই আমি উৎসর্গ করব।"

বাবর স্নান ক'রে এসে হুমায়ুনের শয্যাপার্শ্বে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন—''হে আল্লা, যদি এক জীবনের বদলে অন্য জীবন উৎসর্গ করা সম্ভব হয়, তবে হুমায়ুনের জীবনের বদলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করছি।"

এই ব'লে তিনি হুমায়ুনের শয্যাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন—"তোর ব্যাধি আমি নিজের দেহে নিলাম।"

আশ্চর্যের বিষয়, সেদিন থেকে হুমায়ুন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হলেন, কিন্তু বাবরের মৃত্যু এল ঘনিয়ে।

মন্দিরে মন্দিরে

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ঠিক সন্ধ্যাবেলা আমরা তাঞ্জোরে এসে পৌছলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের দল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। খগেনবাবু ও দ্বিপেন বললো,— আমরা তাঞ্জোর যাবো না, মাদ্রাজ চললাম। কলকাতায় দেখা হবে।

তাঞ্জোরে এলাম আমরা চারজন।

ষ্টেশনে লেফ্‌ট্ লাগেজে মালপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লাম মন্দির দেখতে।

তাঞ্জোর বেশ বড় সহর।

ত্রিচিনোপল্লীর মত এই সহরটিরও একটি জন্মকথা আছে।

অনেক—অনেক দিন আগে এখানে জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেখানে এক রাক্ষস থাকতো, তার নাম তানজন। যা পেত তাই সে ধরে খেত। জন্তু-জানোয়ার, মানুষ কিছুই বাদ যেত না। দেখতে দেখতে বনভূমি প্রায় প্রাণিশূন্য হয়ে গেল। কিন্তু বনের জীবজন্তু ফুরিয়ে গেলেও ক্ষুধা তো আর ফুরায় নি, রাক্ষস একদিন বনের মাঝে খুঁজতে খুঁজতে এক ধ্যানমগ্ন ঋষিকে দেখতে পেল। তখনই ঋষির ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল।

ঋষি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন।

ভক্তের ডাক ভগবানের কাছে গিয়ে পৌছালো। বিষ্ণু তখনই এসে দেখা দিলেন। বিষ্ণুকে দেখেই তো রাক্ষস দিশাহারা হয়ে পড়লো ঋষিকে ছেড়ে সে বিষ্ণুর চরণ জড়িয়ে ধরলো। বললো—আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু!

বিষ্ণু তাকে ক্ষমা করলেন। বললেন, কি বর চাও বল?

বিষ্ণুর স্পর্শ পেয়েই রাক্ষসের মন তখন বদলে গেছে, বললো—প্রভু, এ স্থান তো আমার জন্য 'প্রাণিশূন্য' হয়ে গেছে। আপনি আশীর্বাদ করুন, এখানে যেন আবার মানুষের বসতি হয় আর সেই জনপদ যেন আমারই নামে খ্যাত হয়।

বিষ্ণুর আশীর্বাদে সেখানে আবার মানুষের বসতি হোল। ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো নগর। সেই নগরের নাম হোল তানজন—লোকমুখে তাঞ্জোর।

দু'খানি ঝট্‌কা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মন্দিরের দিকে।

প্রশস্ত পথ, সারি সারি দোকান আর বড় বড় বাড়ী পার হয়ে ঝট্‌কা এসে পড়লো দুর্গের সামনে। পরিখার পুল পার হয়েই মন্দির। দুর্গটির মাম শিবগঙ্গা।

বৃহদীশ্বর মন্দিরে ঢুকলেই একটি বিশেষত্ব চোখে পড়ে। দক্ষিণের আর যে সব মন্দির আছে, তাদের গোপুরম্‌ই আসল মন্দিরের চূড়া থেকে অনেক বেশী উঁচু। কিন্তু এখানে আসল মন্দিরটির চূড়াই গোপুরম্‌কে ছাড়িয়ে উঠেছে। মন্দিরের চূড়াটি ২১৬ ফুট উঁচু। মন্দির চোল রাজারা তৈরী করেছিলেন বারো শো বছর আগে।

প্রথম গোপুরম্ পার হয়েই একটী প্রাঙ্গণ, তারপর দ্বিতীয় গোপুরম্। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে মন্দির। মন্দিরের সামনেই প্রকাণ্ড কালো পাথরের বৃষ। বৃষটি বসে আছে,

উচ্চতায় বারো ফুট। শুনলাম এত বড় বৃষ নাকি আর কোথাও নেই, রামেশ্বর ছাড়া। এই বৃষ নিয়ে একটি গল্প আছে। একটি জীবন্ত পাথর কেটে-ছেঁটে এই বৃষটি তৈরী হয়েছিল। জীবন্ত পাথর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। শেষে যখন এত বড় হয়ে যায় যে শিবলিঙ্গকেও উচ্চতায় ছাড়িয়ে যাবার উপক্রম হোল, তখন এক ভক্ত পূজারী এসে বৃষের মাথায় এক চড় বসিয়ে দিলেন, বললেন—কি, হচ্ছে কি? তুই শেষে শিবকেও ছাড়িয়ে যাবি?

ব্যস্, বৃষের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেল।

সামনেই মন্দিরমধ্যে শিবলিঙ্গ—বৃহদীশ্বর। তা বৃহৎ-ঈশ্বর নামটি সার্থক। লিঙ্গটি তেরো ফুট উঁচু। মন্দিরমধ্যে চারিপাশে মঞ্চ গাঁথা আছে, তার উপর উঠে প্রদক্ষিণ ও আরতি করতে হয়।

এই মন্দিরের মাথায় একটি গোলাকার গ্রেনাইট পাথর বসান আছে। এটির ওজন হচ্ছে ৮০ টন অর্থাৎ ২২৪০ মণ। এই পাথরখানি ২৫ই বর্গফুট। এর গায় অপূর্ব কারুকার্য্য খচিত। পাথরখানি লাগানো আছে মন্দিরের ছাদে যে 'বিমান' আছে তারই গায়, ছাদের ৩৩ ফুট উঁচুতে। অত উঁচুতে ওই ওজনের একখানি পাথর তোলা সহজ ব্যাপার নয়। এখন না হয় 'ক্রেন্' আছে, তখন তো তা ছিল না! সেইজন্য চার মাইল দূর সারাপুল্লম্ গাঁ থেকে একটি ঢালু রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল মন্দিরের মাথা অবধি। সেই রাস্তা দিয়ে পাথরখানি গড়িয়ে আনা হয়েছিল।

এই মন্দিরটি তৈরী করতে লেগেছিল বারো বছর। এক ওলন্দাজ সাহেব মন্দির তৈরীর সময় দেখাশুনা করতেন, মন্দিরের গায় তাঁর মূর্তি খোদাই করা আছে। শুনলাম মন্দিরটি এমন ভাবে তৈরী যে দিনের মধ্যে কোন সময়েই মন্দিরের চূড়ার ছায়া মাটিতে পড়ে না।

বারান্দায় ১০৮ শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।

এখানকার কারুকার্য্যে বিখ্যাত মন্দির হোল সুব্রহ্মণ্যস্বামী অর্থাৎ কাতিকের মন্দির। এর কারুকার্য্য অতি সুন্দর। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা প্রতিটি মূতি যেন জীবন্ত, মনে হয় এই মাত্র খোদাই শেষ হয়েছে। অথচ মন্দিরটি প্রাচীন।

এখানকার পার্বতী-মূর্তির নাম পেরিয়া নায়া জিয়ামল।

সাধারণ ভাবে মন্দির দেখতে আমাদের দু' ঘণ্টা লাগলো। তারপর আমরা ফিরলাম ষ্টেশনে।

হোটেলে খেতে বসে কথা উঠল—চিদাম্বরম্ যাব কিনা। একভাবে ঘুরতে

ঘুরতে সকলের দেহে-মনে জেগেছিল পথের ক্লান্তি, সকলেই বললো—এবার থাক্, পরে যদি কখনও আসা যায়, তখন হবে।

রাত দশটায় মাদ্রাজের ট্রেনে উঠে পড়লাম।

পর দিন সকালে মাদ্রাজে গাড়ী বদল করতে গিয়ে দেখি খগেনবাবুও আমাদের সহযাত্রী। আমাদের আগে বেরুলেও তিনি আমাদের আগে এসে পৌঁছাতে পারেন নি। আর আগে পৌঁছালেও, এই গাড়ীই তাঁদের ধরতে হোল।

ট্রেন চলতে সুরু করলো। সবাই চুপচাপ। যা দেখে এলাম তা সারা জীবনের সঞ্চয়। সেই স্নিগ্ধ স্মৃতি মনের মাঝে তোলাপাড়া হচ্ছে। কন্যাকুমারীর সমুদ্র-উপকূল, রামেশ্বরের বালিয়াড়ী-ঘেরা নারিকেলকুঞ্জ মনকে হাতছানি দিচ্ছে। জনতার মাঝে দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততায় ফিরে যাবার আকর্ষণ নেই আর। তবু ফিরতে হবেই।

দু'দিন পরে কলকাতায় ফিরলাম।

জানা-চেনা সবাই জিজ্ঞাসা করলো—কেমন দেখলেন?

জবাব দিতে পারি না, কি যে দেখে এলাম তা তো ঠিক মুখের কথায় বুঝিয়ে দেবার মত নয়, কথা দিয়ে তাকে তো প্রকাশ করা যায় না! দেখে এলাম অসাধারণ নিষ্ঠা আর ঐকান্তিক ভক্তি, তিলে-তিলে পাথরের গায় নির্মাল্য রচনা করে গেছে—যিনি যুগাতীত ও কালাতীত তাঁরই উদ্দেশে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রতিভা ও ধর্মপ্রাণতা এসে মিলেছে এক জায়গায়। সংসারের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে উপেক্ষা করে চিরন্তন সৌন্দর্য্যকে নিবেদন করে গেছে পরমপুরুষের নামে। মানুষের গড়া সেই শিল্প-নৈবেদ্যকে মহীয়ান্ করে তুলেছে তাল-নারিকেলকুঞ্জে ঘেরা পাহাড়ের কোলে দিগন্তবিস্তারী নীলাম্বুর বুকে উষা থেকে গোধূলি পর্য্যন্ত রঙের খেলা, ধূসর বালিয়াড়ীর বুকে দক্ষিণী বাতাসের উচ্ছ্বাস। সহরের জনারণ্যে সে সুর জাগে না, অনুভূতির পটে শুধু তার ছায়া ধরে রাখা যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে, কোন এক সময় মনে হয়, রামেশ্বরের সাগরতটে বালিয়াড়ীর উপর দাঁড়িয়ে আছি। কুমারিকার কলোচ্ছ্বাস কখন-কখন কানে এসে বাজে যেন! চমকে উঠি, মনে হয় কি যেন হারিয়ে গেছে, কি যেন ফেলে এসেছি দক্ষিণের সেই মন্দিরপথে। যে-আমি গিয়েছিলাম সে-আমি আর আসে নি।

"আজি কত কাল পরে
যাত্রা তব হল অবসান। হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ-লিখন,
আমারে আড়াল ক'রে আমারে করিবে অন্বেষণ;

স্বদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে, সখা! আমার প্রাঙ্গণদ্বারে
যে-পথ করিলে শুরু সে-পথের এখানেই শেষ।" (মহুয়া—১৪০ পৃঃ)

—শেষ—

তিন চোর

(পুরাতন লেখা)

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

পশ্চিমের এক সহরে তিন চোর থাকতো। রোজ তারা সহরের বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতো, আর চলন্ত পথিকদের ধরে তাদের যথা-সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিয়ে চম্পট দিত। দরকার পড়লে মারধর আর ঠেঙানিও যে দিত না, তা নয়। এই ভাবে তাদের দিন যায়।

একদিন এই তিনজন চোরের ভেতর মহা ঝগড়া বেধে গেল—তিন জনের মধ্যে কে বড়? প্রত্যেকে বলে, সেই-ই বড় অপর দু'জনের চেয়ে। ঝগড়া কিছুতেই থামে না, শেষটায় মারামারি হওয়ার উপক্রম। এদের ভেতর যে চোরটা বয়সে ছোট সে ছিল ভারী তয়ের। সে বলে উঠলো,—দেখ, এ ভাবে ঝগড়াঝাঁটি করলে নিজেদের ক্ষতি। আমি বরং এক উপায় বলি শোন। গায়ের জোর তো এতদিন ধরে ঢের দেখা গেল, - তাতে আমাদের তিনজনের ভেতর কেউ কম যায় না। তার চেয়ে আমি বলি, আমাদের ভেতর বুদ্ধির জোর সব চেয়ে যে বেশী দেখাতে পারবে সেই হবে বড়। কেমন, এতে রাজি তো? এই পরামর্শটা অপর দু'জনেরও মন্দ লাগলো না। তারাও এতে সায় দিলে। তখন এই ঠিক হয়ে গেল, যে, তিনজনের ভেতর যে বেশী রকমের বুদ্ধির চালাকি দেখাতে পারবে তাকেই অপর দু'জন বড় বলে মেনে নেবে।

তা যেন হোল। এখন বুদ্ধির বাহাদুরিটা দেখানো যায় কি করে, এই হোল এক ভাবনা। তিনজন এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে মাঠ ভেঙে এগিয়েই চলেছে। যেতে যেতে এক মজার ব্যাপার তাদের নজরে পড়লো। দেখলে যে এক জাঠ্ চাষা

একটা গাধার পিঠে চড়ে সহরের দিকে চলেছে। গাধার পেছনে বড় একটা রামছাগল। ছাগলটার গলায় লম্বা একগাছি দড়ি বেঁধে, গাধাটার পিঠে জিনের সঙ্গে আট্‌কে রাখা হয়েছে, আর ছাগলের গলায় একটা ঘণ্টা ঝুল্‌ছে। গাধাটা ঠুক্ ঠুক্ এগুচ্ছে, আর দড়ির টানে রামছাগলটাও ঢন্ ঢন্ ক'রে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তার পেছু পেছু চলেছে। গাধার পিঠের উপর জাঠ্ চাষা গ্যাঁট্ হয়ে বসে রয়েছে—মাথায় তার ইয়া এক পাগ্‌ড়ি। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

এই মজার ব্যাপার দেখে চোর তিনজন তো খুব এক চোট্ হেসে নিলে। তারপর একজন চট্ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেই বললে,—হয়েছে, এইবার আমার বুদ্ধি দেখাবার সুযোগ এসেছে। আমি করবো কি জানলে? আমি ওর ওই ছাগলটাকে পেছন দিক থেকে নিয়ে সরে পড়বো। এ রকম বেমালুম সরে পড়বো যে লোকটা তার বাস্পও টের পাবে না। বুঝলে এবার তো? কেমন, তা হলেই তোমরা দু'জন আমায় বড় বলে স্বীকার করবে তো?

দ্বিতীয় চোর এই কথা শুনে তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে বললে,—হ্যাঁ, ভারি তো কথা! পেছন থেকে চুপি চুপি ছাগল নিয়ে সরে পড়া, ও এমন আর কি! আমি ওর চেয়েও বেশী চালাকি দেখাবো। যে গাধার পিঠে লোকটা চড়ে বসে আছে, আমি ওই গাধাটাকে নিয়েই চম্পট দেব। সব চেয়ে তারিফ্ হবে এই, যে, ও-লোকটা নিজের ইচ্ছাতেই গাধাটাকে আমায় দিয়ে দেবে। কেমন, তা যদি পারি, তখন কি হবে? আমি তা হলে বড তো?

তৃতীয় চোর এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল, আর গাধাটার টানে রামছাগলটা দাড়ি নাড়তে নাড়তে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে কেমন চলেছে, তাই দেখছিল আর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

অপর দু'জন চোর তাকে এইভাবে হাসতে দেখে বললে,—কি হে সাঙাৎ, কেবল যে হেসেই সারা হলে? তা তোমার ওই হাসিই সার! আমরা বুদ্ধি করে ওর ছাগলটাও নেব, আর গাধাটাও নেব—তোমার ভাগ্যে রইলো তা হলে শূন্যি! কেমন, এবার হার মানলে তো?

এই শুনে তৃতীয় চোর বললে,—হার মানবো কি হে? তোমরাই বরং আমার কাছে হার মানবে। কারণ, আমি যা চালাকিটা খাটাবো, তা তোমাদের দু'জনের উপরেই টেক্কা দেবে। আমি কি করবো জানলে? আমি ওর মাথার পাগ্‌ড়িটা নেব, গায়ের আঙরাখাটা নেব, আর নেব ওর পায়ের ওই জবর নাগরা জুতো জোড়াটা, এমন কি—

তার চেয়ে বলো না যে ওর পরবার মোটা কাপড়খানা পর্যন্ত নেব !— দ্বিতীয় চোর মহা চটে গিয়ে এই কথা বলে উঠলো।

আরে তা তো নেবই হে! তুমি অত চট্‌ছো কেন ? ওর পরবার কাপড়খানাও আমি এমন করে নেব যে ও টেরই পাবে না। আচ্ছা, তা হলে আর দেরি করে লাভ কি ? লেগে যাও দেখি যে যার কাজে! আমার কাজ কিন্তু সবার শেষে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঢের দেখা গেছে হে, ঢের দেখা গেছে! তোমার কেবল ওই বাক্‌-চাল্যিই সার!—এই বলতে বলতে প্রথম চোর এগিয়ে পড়লো। সে জাঠ্‌ চাষার পেছনে চুপি চুপি গিয়ে রামছাগলের গলা থেকে ঘণ্টাটা খুলে নিয়ে সেটাকে আচ্ছা করে গাধার লেজের সঙ্গে বেঁধে দিলে। তারপর যে দড়ির সঙ্গে ছাগলটা বাঁধা ছিল সেটাও ছাগলের গলা থেকে খুলে নিয়ে গাধাটার লেজে জড়িয়ে দিয়ে ছাগলটাকে নিয়ে দে চম্পট্‌। গাধার লেজে বাঁধা হয়ে ঘণ্টাটা আগের মতোই ঢং ঢং ঢং ক'রে বাজতে বাজতে চললো; কাজেই জাঠ্‌ চাষা এ সবের কিছুই টের পেলে না। ভোম্বলদাসের মতো বসেই রইলো।

গাধাটা ঠুক্‌ ঠুক্‌ ঠুক্‌ ক'রে মাঠ ভেঙে চলেইছে। যেতে যেতে হোল কি, যেই একটা আল্‌ ডিঙোতে যাবে, অমনি হোঁচট্‌ লেগে হুমড়ি খেয়ে গেল পড়ে। চাষাও অমনি তার পিঠ থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর সে গাধাটাকে তার বোকামির দরুণ গাল পাড়তে পাড়তে, ঝেড়েঝুড়ে উঠে আবার গাধার পিঠে চড়তে যাবে, এমন সময় পেছন দিকে নজর পড়ায়, তার তখন হুঁস্‌ হোল, তাই তো, ছাগলটা গেল কোথায় ? সে অবাক্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে গাধার লেজে বাঁধা সেই ঘণ্টার দিকে চেয়ে রইলো, আর মাঝে মাঝে এদিক্‌ ওদিক্‌ তাকাতে লাগলো। এই ভাবে সে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দ্বিতীয় চোর সেখানে এসে হাজির। এসেই সে তাকে 'রাম' 'রাম' জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কি হে চৌধুরী, এখানে এমন চুপটি করে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি? চাষা বললে, সে তার ছাগলটাকে দেখতে পাচ্ছে না। ছাগলটা এই গাধার পেছনে বাঁধা ছিল।

এই কথা শুনেই চোরটা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো,—আরে, তাই নাকি হে! এক্ষুণি একটা লোককে মস্ত একটা রামছাগল নিয়ে যেতে দেখে এলুম বটে! নিশ্চয় সেটা তোমারই ছাগল। ওই গাঁয়ের পূবদিকে মোড়ের মাথায় হে! এখনো যদি দৌড়ে যাও তো ধরতে পারবে।

চাষাটা তখন মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে বললে যে তার এই গাধাটা ভারি অকেজো। একে নিয়ে যেতে যেতে যদি সে পালিয়ে যায় ?

চোরটা এই কথা শুনে বললে,—আরে, তার আর ভাবনা কি হে! আমিই না হয় তোমার গাধাটাকে আগলে রইলুম! সত্যিই তো, গাধাটাকে নিয়ে যেতে যেতে সে ততক্ষণে পগার পার হবে। যাও—যাও, তুমি দৌড়ে যাও শীগ্‌গির।

চাষা তখন আর দ্বিরুক্তি না করে চোরের হাতে গাধাটাকে দিয়ে ছুটলো সেই গ্রামের দিকে। সেও চোখের আড়াল হয়েছে, আর চোরও গাধার লেজ থেকে ঘণ্টাটা খুলে ফেলে দিয়ে তার পিঠের উপর চড়ে বসলো, আর তারপর লাগিয়ে দিলো সপাসপ্‌ চাবুক।

ওদিকে চোরের সন্ধান না পেয়ে চাষা ফিরে এসে দেখলে তার গাধাটিও নেই, কেবল ঘণ্টাটি পড়ে আছে সেখানে। বেচারীর তখন যা দুঃখটা হোল! কি আর করবে ? আস্তে আস্তে ফিরে চললো বাড়ীর দিকে।

খানিক দূর গিয়ে একটা গাছতলায় বসলো জিরুবার জন্যে। সেখানে বসে সে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছে, এমন সময় দেখলে যে নিকটেই একটা কূয়োর ধারে বসে একটা লোক হাপুস্‌ নয়নে কাঁদছে। লোকটাকে কাঁদতে দেখে চাষার মনে দয়া হোল। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সে কাঁদছে কেন। লোকটা জবাব দিলে যে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। তার টাকার থলিটা এই কূয়োর মধ্যে পড়ে গেছে। এই কথা বলে লোকটা 'হাউ মাউ' করে আরো বেশী কেঁদে উঠলো। এই দেখে চাষার ভারি দুঃখ হোল। বললে,- কেঁদে কি আর করবে বলো ? আমার অবস্থাও ভাই, অনেকটা তোমারই মতো। আমারও আজ মহা ক্ষতি হয়ে গেছে। আমি আমার গাধাটা আর বড় রামছাগলটা বেচতে নিয়ে যাচ্ছিলুম, তা চোরে সে দু'টোকেই নিয়ে পালিয়েছে।

লোকটা এই কথা শুনে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে,—তোমার জিনিষ চোরে নিয়ে পালিয়েছে, কাজেই তার আশা ছেড়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু আমার টাকার থলি এই কূয়োর মধ্যে পড়ে রয়েছে—আমার চোখের সামনে। এর আশা আমি ছাড়তে পারছি কই ? আমি যে কূয়োতে নামতে জানি না, নইলে এতক্ষণে কোন্‌ কালে থলিটা তুলে আনতুম। তুমি যদি ভাই, পারো তো দেখো না! তোমায় কি আর বলবো ভাই! যদি তুলে আনতে পারো, তা হলে অর্দ্ধেক তোমার। পারবে কি ভাই ?

চাষা এই কথা শুনে চট্‌ ক'রে তার মাথার পাগড়িটা খুলে সেখানে রেখে দিলো। তারপর গায়ের আঙরাখাটার বাঁধন খুলতে খুলতে বললে,—তাই তো হে দোস্ত! এই সহজ কথাটা এতক্ষণ আমার মনেই আসে নি! কূয়োয় নামতে ? তা আমি খুব পারি। এই দেখ না, এক্ষুণি তোমার টাকার থলি তুলে আনছি। কিন্তু ঐ যা বললে দোস্ত, অর্দ্ধেক আমায় দেবে তো তা হলে ? লোকটা বললে,— নিশ্চয়ই দেবো, নিশ্চয়।

চাষা তখন মহা ফূর্তি ক'রে কূয়োর মধ্যে নামতে গেল। নামবার আগে সে তার পরনের কাপড়খানিও খুলে রেখে গেল। কোমরে আঁটা থাকলো খালি একটা লেঙট্।

চাষাও কূয়োর মধ্যে নেমে পড়লো, আর সে লোকটাও চাষার পাগ্ড়ি, আঙরাখা, নাগরা জুতো, মায় পরনের কাপড়খানা পর্যন্ত নিয়ে দে লম্বা।

এ লোকটা আর কেউ নয়, এ সেই তৃতীয় চোর। এই রকম বুদ্ধির সেরা চালাকি দেখিয়ে মালশুদ্ধ যখন সে তার তু'জন সঙ্গীর কাছে ফিরে গেল, তারা তো তাই দেখে অবাক্। তখন, কাজে কাজেই, একেই বড় বলে মেনে নিতে হোল।

আর চাষা? তার অবস্থা বুঝতেই পারছো। কূয়োয় নেমে তার কাদা ঘাঁটাই সার!

আফ্রিকার জু-জু

শ্রীঅমলেন্দু সেন

আমাদের দেশে নানা রকম তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাকের কথা শোনা যায়, আফ্রিকাতেও সে রকম তন্ত্রমন্ত্রের চল আছে। বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকায় এ সব তন্ত্রমন্ত্রের ওস্তাদ গুণিন অনেক আছে। সাহেবরা প্রায়ই এগুলিকে মানতে চায় না, বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেয়। তবে, যারা অনেকদিন ও-দেশে থেকেছে এবং এ রকম তুকতাকের ব্যাপার অনেক দেখেছে, তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে এর সবটাই বুজরুকি নয়—মন্ত্রের একটা শক্তিও কাজ করে অনেক ক্ষেত্রে। এই সব তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপারকে ও-দেশে বলে 'জু-জু'। আমাদের জুজু আর ওদের জুজু এক নয়।

অবশ্য গোঁয়ারগোবিন্দ সাহেবের সংখ্যাই বেশী। আমি যা জানি না বা বুঝি না, সেটা একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ব্যাপার—এই হচ্ছে তাদের মনের ভাব। কার্ল ফন মার্কেল ছিল সেই রকমের একজন। কালো-চামড়া যাদের, তাদের সে মানুষ বলেই গণ্য করতো না। একদিন সে মিছিমিছি একজন কাফ্রী পুরোহিতকে অপমান করে। তার পর, সাদা-চামড়ার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সে তাদের দেবস্থানে গিয়ে তাদের কাঠের ঠাকুরের গায়ে থুতু দেয়। পুরোহিত তার প্রতিবাদ করে, মন্ত্র পড়ে তাকে 'জু-জু'-র শাপ দেয়। মার্কেল তখন তাকে এক ঘুষিতে ধরাশায়ী করে দিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ী চলে যায়। গিয়ে পেট ভরে খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম লাগায়।

পরদিন ভোরবেলা মার্কেলের চাকর দেখে কি, মার্কেল বিছানায় মরে পড়ে আছে। মুখে তার ভয়ানক যন্ত্রণার ছাপ। ডাক্তার এলেন, কিন্তু মৃত্যুর কোনও কারণ বুঝতে পারলেন না। বিষের চিহ্ন নেই, রোগের লক্ষণ নেই, আঘাতের দাগ নেই—সুস্থ সবল মানুষটা তবে মরলো কিসে?

তার পর, চাকরের মুখে ডাক্তার সেই 'জু-জু'র শাপের কথা শুনলেন। তিনি

গোঁয়ারগোবিন্দ সাহেবের ··এক ঘুষিতে—

অনেকদিন যাবৎ আফ্রিকায় আছেন, কাফ্রী পুরোহিতদের মন্ত্রের শক্তি তিনি অনেকবার দেখেছেন। তিনি বুঝলেন যে, যে কারণে মার্কেলের মরণ হয়েছে, তার কথা তাঁর ডাক্তারী শাস্ত্রে পাওয়া যাবে না।

এই তো, রিটসন বলে একজন সাহেব এই রকম জুজুওয়ালাদের ক্ষেপিয়ে কি বিপদেই না পড়েছিল! সে অবশ্য মার্কেলের মতো অতটা করে নি। সে একদিন একটা দেবস্থানে ঢুকতে চেয়েছিল, যেখানে ঢুকতে মানা। তবু সে খানিকটা ঢুকে পড়েছিল। তখন সেখানকার পুরোহিত তাকে বেরিয়ে যেতে বলে। এতে তার মেজাজ গেল চড়ে। কি, এত্ত বড় আস্পর্ধা! সাদার ওপর হুকুম চালাবে কালা জংলী! সেই

'অপরাধে' সে সেই পুরোহিতকে কয়েকটা ঘুষি-লাথি মেরে বসল। সাদা মানুষের মান এই ভাবে বজায় রেখে সে খুশীমনে বাড়ী ফিরে এল।

বাড়ীতে ছিল তার বউ, আর সাত বছরের একটি ছেলে। কোথাও কিচ্ছু না, সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সেই ছেলেটি বিকটভাবে হাত-পা খিঁচতে লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বর আর বিকার। ভয়ে তো তার বাপ-মার প্রাণ উড়ে গেল। তু'জন সাহেব ডাক্তার তখনই এলো বটে, কিন্তু তারা এ রোগের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না। দেখতে দেখতে ছেলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে এলো। আর বুঝি বাঁচবে না! তার বাপ-মা তো পাগলের মতো হয়ে গেল—তাদের চোখের মণি ঐ একমাত্র সন্তানের ভাবনায়।

হঠাৎ রিটসনের মনে হলো সেই জুজু পুরোহিতের কথা। সর্ব্বনাশ! তারাই তাকে এই বিপদে ফেলে নি তো! সে অবশ্য জুজু মানতো না, কিন্তু এত বড় বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে তো আর সে কথা বললে চলবে না! সে তখনই এক দৌড়ে গিয়ে পড়লো সেই পুরোহিতেদের কাছে। সাদা-চামড়ার মানসম্ভ্রমের কথা ভুলে সে আকুল হয়ে কেবলই বলতে লাগলো,—দোহাই তোমাদের! যা করতে বলো করবো, আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও।

তার অবস্থা দেখে শেষে দয়া হলো পুরোহিতদের। তারা সাহেবকে বললো, যাও, আগে ছেলের মাকে নিয়ে এসো। তার পর দেবতাকে বলে দেখি আমাদের শাপ তিনি যদি ফিরিয়ে নেন।

রিটসন এসে সে কথা বলতেই তো তার বউ পড়ি-কি-মরি করে ছুটলো পুরোহিতদের কাছে। পুরোহিতেরা তখন আগুন জ্বেলে মন্ত্র পড়তে লাগলো, চারিদিকে বেজে উঠলো পূজোর ঢাকঢোল।

খানিক বাদে প্রধান পুরোহিত রিটসনের স্ত্রীর হাতে এক টুকরো কাপড় দিয়ে বললো,—এটি তোমার বুকে রাখ। ছেঁড়া, নোংরা এক টুকরো ন্যাকড়া।

এরপর আবার খানিকক্ষণ ধরে মন্ত্র পড়া চললো। সব শেষ হলে প্রধান পুরোহিত বললে,—আর ভয় নেই। যাও, ঐ কাপড়টুকু নিয়ে গিয়ে ছেলের মাথায় ছোঁয়াও, তবেই ছেলে ভালো হয়ে যাবে।

হলোও ঠিক তাই। ঠিক যেন রূপকথার কাণ্ড! সেই ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে এসে ছেলের মাথায় ছোঁয়াতেই তার হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল, ফ্যাকাসে মুখে ফুটে উঠলো গোলাপী রক্তের আভা। দেখতে দেখতে সে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো। ডাক্তারেরা দেখে বললেন,

আশ্চর্য্য ব্যাপার, এমন একটা মরণ-রোগের কোনও চিহ্নমাত্র তার শরীরে নেই। সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছে।

এলিস বলে আর একজন সাহেব স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখে সে কথা লিখে রেখে গিয়েছেন। তিনি প্রায় তাঁর সারা জীবনটাই কাটিয়েছেন পশ্চিম-আফ্রিকার গোল্ড কোষ্ট অঞ্চলে। এ রকম আরও অনেক ব্যাপার তিনি দেখেছেন। সাহেবদের বিজ্ঞান দিয়ে এ সবের কোনও অর্থ বের করা যায় না, অথচ অবিশ্বাস্য হলেও এ সব ঘটনা সত্য।

যেমন, রেডম্যান সাহেবের মৃত্যুর ব্যাপারটা। রেডম্যান বলে এক পাদ্রী গোল্ড কোষ্ট অঞ্চলে কাজ করতে নতুন এসেছিল। সে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করতো। কাফ্রীদের ধর্ম্মের নিন্দা করে সে তাদের বলতো, সবাই এ সব ঠাকুর-দেবতা ছেড়ে যীশুর পূজা করো, খ্রীষ্টান হও।

এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পড়লো এলিস যেখানে থাকতেন, সেই গ্রামে। সেখানে বক্তৃতা দেবার পর তার একদিন জ্বর হোলো। সেই জ্বর গায়ে সে রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় কাছেই কোথায় ঢাকঢোল বেজে উঠেছে, আর তার ঘুম গিয়েছে চটে। একেই আনকোরা বিলিতী মেজাজ, তার ওপর আবার শরীরটাও ভাল নেই;—সে বেরিয়ে এলো। এসে দেখে যে খানিক দূরে একটা কাফ্রীদল জমায়েত হয়েছে পূজোর জন্যে। তার এত শেখানো সব বৃথা হয়েছে, অসভ্যগুলো তাদের একটা জংলী দেবতার মূর্ত্তিকে নিয়ে উৎসবে মেতেছে।

সে ছুটে সেখানে চলে গেল। গিয়ে হাত তুলে চেঁচাতে লাগলো,—থাম্, ব্যাটারা, থাম্! এ সব ঠাকুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি যে দেবতার কথা বলছি তার পূজো কর্! কিন্তু কে শুনছে তার কথা? তারা যে যার কাজ করতে লাগলো, কেউ ভ্রূক্ষেপও করলো না তার চেঁচামেচিতে।

তখন এক ভয়ানক কাণ্ড করে বসলো হতভাগ্য রেডম্যান। রাগে ফুলতে ফুলতে শেষে আর থাকতে না পেরে সে হঠাৎ তাদের সেই প্রতিমাকে তু'হাতে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল একেবারে আগুনের মধ্যে।

হায় হায় বলে চেঁচিয়ে উঠলো কাফ্রীরা। প্রধান পুরোহিত ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুন থেকে সেই কাঠের ঠাকুরকে তুলে নিয়ে এলো। ততক্ষণে প্রতিমা বেশ খানিকটা পুড়ে গিয়েছে। আর কয়েকজন মিলে ধরতে এলো রেডম্যানকে।

এখন, কাজটা করে ফেলেই রেডম্যানের হুঁস হয়েছে যে এর ফল ভাল হবে না। তাই সে আগেই চম্পট দিয়েছে সেখান থেকে। ওদিকে কাফ্রীদের উন্মত্ত দলও তার পিছনে ছুটেছে। রেডম্যানকে ধরে ধরে। উপায় না দেখে সে তাড়াতাড়ি এলিসের

বাড়ীতে ঢুকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষ্যাপা কাফ্রীর দল এসে বাড়ী ঘিরে ফেললো। ঘোর বিপদ্ !

সৌভাগ্যক্রমে এলিসের কয়েকজন দরোয়ান ছিল, আর বন্দুকও ছিল কয়েকটা। তাই দেখে কাফ্রীরা থামলো। তারপর এলিস তাদের অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করলেন। তারা কিন্তু মোটেই শান্ত হয় নি তখনও।

এদিকে রেডম্যান বিছানা নিতে না নিতেই তার পেটে একটা অসহ্য যন্ত্রণা দেখা দিল। অন্য কেউ হলে মনে করতো যে জ্বরের ওপর অত উত্তেজনার ফলে এ রকম হয়েছে। কিন্তু এলিসের মনে পড়ে গেল ব্রিটসনের ছেলের কথা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে এটা ঠিক সেই জুজুওয়ালাদের কাজ।

তিনি অমনি চলে গেলেন সেই পুরোহিতের কাছে। তারা তখন মন্ত্র পড়ে কি যেন করছিল। তাদের কাছে রেডম্যানের কথা বলতেই তারা বললে, এ জুজু আমরাই প্রয়োগ করেছি। দেবতাকে অপমান! সাহেবের মৃত্যু না হলে দেবতার ক্রোধের শান্তি হবে না।

এলিস কত অনুনয়-বিনয় করলেন, লোভ দেখালেন—কিন্তু পুরোহিতেরা অটল। তাদের ঐ এক কথা : সাহেবের মৃত্যু চাই, নইলে দেবতার অপমান!

কিছুতেই কিছু হবার নয় দেখে দুঃখিত হয়ে ফিরে এলেন এলিস। এসে দেখেন যে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে রেডম্যান। হাত-পা, মুখ বেঁকে গিয়েছে, নীল হয়ে গিয়েছে সারা অঙ্গ, চোখ আর জিভ যেন বেরিয়ে আসছে তার! এত কষ্ট চোখে দেখা যায় না। সাহেব ডাক্তার নিরুপায় হয়ে বসে আছেন—এ রোগ তাঁর জানা নেই, এর ওষুধ, তাঁর জানা নেই।

হঠাৎ এক বুক-ফাটানো আর্ত্তনাদ করে সব শেষ হয়ে গেল রেডম্যানের। সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে কাফ্রীদের ঢাকঢোল একসঙ্গে বেজে উঠলো—জুজুর প্রভাবে তারা জেনে গিয়েছে যে দেবতা তৃপ্ত হয়েছেন, সাদা মানুষ তার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে তার জীবন দিয়ে।

কি করে এটা সম্ভব হলো? কি করে বলবো সে কথা? আমরা কি সব কথা জানি, না বুঝতে পারি?

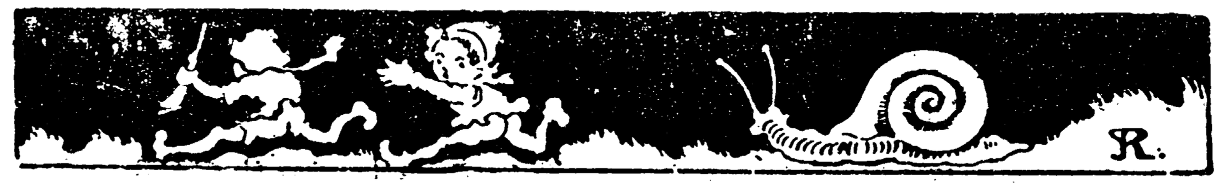

নববরষায়

বেগম জেবু আহমদ

গ্রীষ্মের দুপুর। খররৌদ্রের প্রচণ্ড তাপে সারা পৃথিবী ঝল্‌সে যাচ্ছে। গাছের পাতা পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করেছে। মাঠের বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, সবুজ ঘাসের চিহ্নটুকুও নেই। বনের পশু-পাখী কাতর হয়ে পড়েছে।

ছেলের দল : ওগো তপ্ত ধূসর মাঠ,
কোথায় তোমার সবুজ শোভা অরূপ ঠমক ঠাট?
আহা, রুক্ষ কঠিন মাঠ!

মাঠ : রুক্ষ দিনের দুঃখজ্বালার ভয়ে শূন্য করে আমার বক্ষতল,
মাটির বুকে মুখ লুকালো তাই সবুজ কোমল ঘাস-শিশুদের দল।

ছেলের দল : ওগো শীর্ণকায়া নদী, কোন্ বেদনায় কাঁদছো নিরবধি?
কোথায় তোমার ঢেউ-শিশুদের দল? বুকে তোমার হাসে না খল খল!

নদী : ওই চেয়ে দেখ্ ঢালছে আগুন রবি, ঝলসে গেল ধরার শ্যামল ছবি।
ওই চেয়ে দেখ্ সবুজ পাতার বন, ঝলসে উঠে, কাঁদছে অনুক্ষণ।

কাক : কা, কা, কা—! কা, কা, কা—!
তৃষ্ণাতে যে ছাতি ফাটে, সইতে পারি না।

পাখীর ঝাঁক : রবির আলোর প্রখর তাপে আমরা জ্বলেছি,
কণ্ঠবীণার কাকলী-স্বর তাই তো ভুলেছি।

বন : শ্যামল আঁচল রোদের তাপে ধূসর হয়েছে,
সবুজ বরণ মুকুটখানি ঝলসে রয়েছে।

নদী : কুলুকুলু কলধ্বনি তাই তো ভুলেছি,
পায়ের নূপুর ঝুমুর ঝুমুর খুলে ফেলেছি।
ঝরণা আমার চপল মেয়ে, তাই তো নাচে না,
নুড়ির সে সুর ঝুমুর ঝুমুর, তাই তো বাজে না।
ক্ষীণ ধারাটি নিয়েই কেবল বয়ে চলেছি।

চাতক : দে রে ফটিক জল! দে রে ফটিক জল!
পিপাসাতে বুক যে ফাটে, উপায় কিবা বল?

ছেলের দল : বেজায় বোকা পাখী,
ওই তো নদী যাচ্ছে বয়ে পড়ছে চোখে নাকি?

চাতক : সাত-সমুদ্দুর তের নদীর জল, নীল-পাহাড়ের ঝরণা-ধারার ঢল
শতধারে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে; চাতক-পাখীর তৃষ্ণা তো না মেটে !
হোক্ তা মধুর, হোক্ তা শীতল, লোভ তো আমার নাই,
আকাশ পানে তাকিয়ে কেবল ফটিক-জলই চাই ।

ছেলের দল আকাশ পানে তাকিয়ে দেখল—অতি দূরে আকাশের কোল ঘেঁষে একটুখানি মেঘের কালো ছায়া ভেসে যাচ্ছে ।

ছেলের দল : আকাশকোণে মেঘের ছায়া যায় রে দূরে ভেসে,
হয়তো যাবে চলে আবার কোন্-সে সুদূর দেশে !

চাতক : দেখে নয়ন জুড়িয়ে গেলো কালো মেঘের ছায়া,
আহা ! বিছিয়ে যদি দিতো হেথা সজল কাজল মায়া,
ঝরঝরিয়ে পড়তো ঝরে ফটিক-জলের ঝারি,
তপ্ত এ-প্রাণ জুড়িয়ে যেতো পিয়ে শীতল বারি ।

ছেলের দল : এসো তবে আমরা গাহি বাদলধারার গান,
ফটিক-জলের সুধার ধারা করবে চাতক পান ।

দাঁড়াও হেথায় একটুখানি ও ভাই কালো মেঘ,
ঝড়ের হাওয়ায় বাড়িয়ো নাকো বেগ ।
রুক্ষ কঠিন ধূসর মাঠের শেষে
দাঁড়াও কেবল একটুখানি হেসে ।
চেয়ে দেখ সবুজ পাতার বন
রবির তাপে ঝল্‌সে তোমায় ডাকছে অনুক্ষণ ।
চেয়ে দেখ নদীর ধারা ক্ষীণ,
মধুর সুরে বাজে না তো পাখীর কণ্ঠবীণ্ !
নাচ ভুলে তাই ঝরণা অভিমানে
নূপুরখানি খুলেছে আন্‌মনে ।
ফটিক-জলের তরে যে ওই চাতক কেঁদে সারা !
ঝরঝরিয়ে ঝরাও জলের ধারা ।

মেঘ : মিষ্টি মধুর গানে
অমন করে কে আমারে টানে ?

ছেলের দল : আমরা হেথা চপল শিশুর দল,
ও কালো মেঘ ! ডাকছি তোমায়—দাও না ঢেলে জল ।

মেঘ : হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে যাবো দূরের দেশে,
এমন করে ডাকলে পিছু যায় কি চলা ভাই !
বলো বলো—কী তোমাদের চাই ?

ছেলের দল : দাঁড়াও তবে, দাঁড়াও মাঠের শেষে,
দাঁড়াও ক্ষণেক সবুজ বনের দেশে ।
দাঁড়াও এসে শীর্ণ নদীর বাঁকে,
দাও—সাড়া দাও চাতক পাখীর ডাকে ।
তৃষ্ণাতে ঐ চেঁচিয়ে মরে কাক,
উঠ্‌ছে কেঁদে বুনো পাখীর ঝাঁক ।
ডাক্‌ছি তোমায় আমরা ছেলের দল,
ও কালো মেঘ ! দাঁড়াও খানিক, দাও নামিয়ে ঢল ।

মেঘ : দূরের স্বপন থাকুক মনে, কাছের টানেই দিলেম ধরা,
জলের ধারা ছড়িয়ে দিয়ে করবো শীতল তপ্ত ধরা ।

দেখতে দেখতে কালো মেঘের রাশি আকাশ ছেয়ে ফেললো । গুরু গুরু গর্জনে পৃথিবী কেঁপে উঠল, বাতাস হয়ে এল ভারী ।

ছেলের দল : মেঘ এলো রে ঘনঘটায় ছেয়ে, দলে দলে আকাশ-সিঁড়ি বেয়ে ।
গুরু গুরু উঠলো ডেকে দেয়া, মনের সুখে ফুটবে কদম-কেয়া ।
সাজবে সুখে সবুজ পাতার বন, উচ্ছ্বসিয়া উঠবে অনুক্ষণ ।
দুকূল প্লাবি' হরষ-আকুল প্রাণে শীর্ণ নদী—বিপুল কায়া বইবে কলতানে ।
হাসবে আবার ঝরণা অভিমানী, ঝুনুর ঝুমুর বাজিয়ে যাবে নুড়ির নূপুরখানি ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে । মেঘমেদুর আকাশ ভেঙে ঝুর ঝুর করে ঝরছে । বাদল-ভেজা আবহাওয়া ছেলেদের গীতে মুখর হয়ে উঠলো ।

ম্যাজিক শেখ

যাদুকর এ. সি. সরকার

— ভূতুড়ে কলা—

ভূতে বিশ্বাস করো ?—করো না তো !—আমিও বিশ্বাস করি না । তবুও মাঝে মাঝে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড আমি ঘটিয়ে থাকি যা দেখে সবাই বলে ভূতুড়ে কাণ্ড । তোমরা যদি একবার দেখ তাহলে তোমরাও এই সব কীর্ত্তি-কলাপকে ভূতুড়ে কাণ্ড না বলে

পারবে না। প্রসঙ্গ ক্রমে 'ভূতুড়ে কলা' খেলাটার কথাই বলা যাক। টেবিলের উপরে রয়েছে এক ছড়া কলা—পুরুষ্টু মর্ত্তমান কলা। এই কলার ছড়া থেকে আমি একটা কলা তুলে নিলাম,—কানের কাছে এই কলাটাকে অল্পক্ষণ ধরে রেখে, মুখে বললাম—'দুই'। দর্শকদের মধ্যে একজনের হাতে এই কলাটি তুলে দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে দেখতে বললাম। খোসা ছাড়াতে দেখা গেল যে কলাটা দুই ভাগে বিভক্ত রয়েছে। এর পরে তুলে নিলাম আর একটি কলা। কানের কাছে এই কলাটিকে ধ'রে, মুখে বললাম—'চার'। খোসা ছাড়াতে দেখা গেল যে ঐ কলাটি চার টুকরো হয়ে আছে খোসার মধ্যে। কাণ্ড-কারখানা দেখে তো অবাক্ সবাই। কেমন করে এমন অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা সম্ভব হ'ল—ভেবেই সারা হলেন তাঁরা।

বিলাতে থাকাকালে তো এই খেলাটি হরদম দেখাতাম খাওয়ার টেবিলে। বিলাতে পাওয়া যায় চালানী কলা। ওখানে তো আর কলা জন্মায় না!—তাই। আমাদের দেশের সিঙ্গাপুরী কলার সমগোত্রীয় এক রকমের কলাই শুধু দেখা যায় ওদেশে। মর্ত্তমান, হিমসাগর, চাঁপা, কাঁঠালী·· এত রকমের কলা নেই ওখানে। এই জন্যেই ওদেশে খাওয়ার টেবিলে এ খেলা দেখানোতে কোনই অসুবিধা হ'ত না। আগে থেকেই সঙ্গে করে এক ছড় কৌশল-করা কলা নিয়ে যেতাম আমি, আর কায়দা বুঝে খাবার টেবিলে রাখা কলার ছড়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিতাম এই কৌশল-করা ছড়া।

কোন্ কৌশল আমি করে রাখতাম কলাগুলোতে, এই কথাই তো জানতে চাও এখন? শোন বলছি। একটা সরু অথচ লম্বা ছুঁচ নিয়ে প্রথমে কলার দেহে এমন ভাবে বসিয়ে দিতে হয় যেন এর অন্য প্রান্তটি কলার দেহ থেকে বেরিয়ে না যেতে পারে। এই অবস্থাতে এই ছুঁচটিকে একটু ডাইনে বাঁয়ে নাড়াচাড়া দিলে খোসার ভেতরে থাকা অবস্থাতেই কলা কেটে দু'খানা হয়ে যায়। কলাতে যতগুলো টুকরো করা দরকার ততবার এইভাবে ছুঁচ বসিয়ে নিলেই হ'ল। কোন্ কলাতে কত টুকরো করা আছে সেটা ঠিক ভাবে জেনে এবং চিনে রাখতে হবে, নইলেই কিন্তু সর্ব্বনাশ! খুব সরু ছুঁচ ফোটানোর ফলে কলার খোসার গায়ের সূক্ষ্ম গর্ত্ত কারও নজরে পড়ে না। *

*ম্যাজিক সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকেরা লেখকের সঙ্গে এ. সি সরকার, ম্যাজিসিয়ান্, পোষ্ট বক্স-১৬২ ৪, কলিকাতা-২৯ এই ঠিকানায় পত্রালাপ করতে পার।

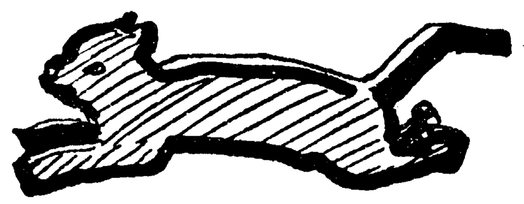

শ্রীজীব গোস্বামী

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীজীব ছিলেন রূপ ও সনাতনের সহোদর অনুপমের পুত্র। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার চেহারা ছিল অতি সুন্দর আর লাবণ্যযুক্ত। পিতৃব্যরা চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন। কি ভাবে তাঁহারা মহাপ্রভুর কৃপা পাইলেন আর রাজার ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া,—মায়ের কাছে এই সব কথা শুনিয়া শ্রীজীব ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িতেন, দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত অবিরল ধারে। দিনরাত তিনি মহাপ্রভুর চিন্তা করিতেন আর ভাবে অধীর হইয়া উঠিতেন।

ক্রমে শ্রীজীব ষোল বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই সময় একদিন তিনি তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাস নিতে হয় কেমন করে?" ছেলের কথায় মায়ের চোখ দু'টি জলে ভরিয়া গেল। শুধু স্বামীর ভ্রাতারা নহেন, তাঁহার স্বামীও মৃত্যুর কিছুকাল আগে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সব কথা মনে পড়িয়া তাঁহার বড়ই কষ্ট হইল। তিনি চোখের জলে ভাসিয়া সন্ন্যাস নেওয়ার কাহিনী ছেলেকে বুঝাইয়া বলিলেন।

পর দিন শ্রীজীব সন্ন্যাসী সাজিয়া আসিয়া মাকে বলিলেন, "আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল ত'?"

সুন্দর বালককে গেরুয়া কাপড়ে চমৎকার মানাইয়াছিল। মা মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন ছেলের দিকে, তারপর হাসিয়া বলিলেন, "এমন সুন্দর চাঁচর কেশ মাথায় রেখে কি কেউ সন্ন্যাসী হয় রে বাপ!"

বালক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, কাল দেখে নিও।"

পরদিন শ্রীজীব মস্তক মুণ্ডন করিয়া আবার সন্ন্যাসী-বেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন মায়ের সামনে। ছেলের হাবভাব দেখিয়া মায়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল এক অনিশ্চিত অমঙ্গলের আশঙ্কায়। শ্রীজীব মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমাকে বিদায় দাও মা, সংসার-সুখ ভোগের জন্য আমার জন্ম হয় নি। আমি চলে যাব বৃন্দাবনে পিতৃব্যদের কাছে।" এই কথা শুনিয়া মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীজীব তখন মায়ের শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। তার পর একদিন বাড়ী ছাড়িয়া উপস্থিত হইলেন নবদ্বীপে। সেখানে শ্রীবাসের বাড়ীতে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। নিত্যানন্দের আদেশে শ্রীজীব বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে তিনি প্রথমে কাশীধামে উপস্থিত হইয়া বিখ্যাত পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুদিন উপনিষদ শিক্ষা করিলেন। কয়েক বৎসর শিক্ষা লাভের পর শ্রীজীব বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া পিতৃব্যদের প্রণাম করিলেন। রূপ-সনাতনও ভ্রাতষ্পুত্রকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিলেন। দিনরাত চলিল ভক্তিশাস্ত্র পাঠ আর আলোচনা। অপূর্ব্ব প্রতিভা ছিল শ্রীজীবের, দেখিতে দেখিতে তিনি ভক্তিশাস্ত্রেও পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তখন রূপ গোস্বামী শ্রীজীবকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। ক্রমে শ্রীজীবের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি ও ভক্তিশাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।

পুঁথিখানি দেখিতে দিলেন।

এই ভাবে দিন যায়। একদিন বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের প্রধান প্রবর্তক বিদ্যাভিমানী বল্লভাচার্য্য বৃন্দাবনে আসিলেন। আসিয়াই তিনি শ্রীপাদ রূপের সঙ্গে দেখা করিলেন। শ্রীরূপ তখন "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" রচনা করিতেছিলেন এবং শিষ্য শ্রীজীব তাঁহার পাশে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলেন। শ্রীরূপ মহাসম্মানের সহিত আচার্য্যকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পুঁথিখানি দেখিতে দিলেন। আচার্য্য পুঁথিখানি পড়িয়া প্রথম দিকের কয়েকটি শ্লোক বদলাইতে বলিলেন। শ্রীরূপ ছিলেন বিনয়ের অবতার, দীনতার প্রতিমূর্ত্তি। তিনি তখনই পুঁথিখানি সংশোধনের জন্য আচার্য্যের হাতে দিয়া যমুনা-স্নানে চলিয়া গেলেন।

শ্রীজীবের ইহা মোটেই সহ্য হইল না। তিনি তখনই আচার্য্যের সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ তর্কের পর আচার্য্য সম্পূর্ণ পরাস্ত হইলেন। তাঁহার আর পুঁথি সংশোধন করা হইল না, ক্ষুণ্ণমনে রূপের কুটীর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। স্নান করিয়া রূপ আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, পথে আচার্য্যের সঙ্গে দেখা হইল। রূপকে দেখিয়াই আচার্য্য বলিলেন, "গোস্বামীপাদ-আশ্রমে যে ছেলেটি দেখলাম সেটি কে?"

রূপ বলিলেন, "ওটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আর শিষ্য। আপনার মত মহাপণ্ডিত আমার পুঁথিখানি সংশোধন করে দিলেন এ আমার পরম সৌভাগ্য।"

আচার্য্য বলিলেন, "সংশোধন আর করতে হয় নি শ্রীপাদ, আপনার লেখাই ঠিক, আমিই ভুল করেছিলাম। আর দেখলাম আপনার ঐ শিষ্যটিকে। অলৌকিক প্রতিভা! আমি ভাবতাম আমার মত প্রতিভা এ দেশে আর দু'জনের নেই, কিন্তু আমাকেও আজ তার কাছে হার মানতে হয়েছে। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যই হয়েছে বটে!" শ্রীজীবের অশেষ প্রশংসা করিয়া আচার্য্য চলিয়া গেলেন।

আচার্য্যের কথায় শ্রীরূপ মোটেই সন্তুষ্ট হইলেন না, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গুরুদেবের মুখের ভাব দেখিয়াই শ্রীজীব ভয় পাইয়া গেলেন—আজ না জানি ভাগ্যে কি আছে। হইলও তাহাই। শ্রীরূপ আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই কঠোর কণ্ঠে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রবীণ পণ্ডিত বল্লভাচার্য্যের সঙ্গে তর্ক করেছিলি কেন, মানীর মান রক্ষা করতে জানিস না?" শ্রীজীব চুপ, মুখে কথা সরিতেছে না। শিষ্য চুপ করিয়া আছে দেখিয়া গুরু আরও রাগিয়া গেলেন এবং ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"নমন্তি ফলিনো বৃক্ষাঃ, নমন্তি গুণিনো জনাঃ। এই কি তোর বৈরাগ্য আর বৈষ্ণবোচিত দীনতার নমুনা? এত বড় সম্মানিত পণ্ডিত, তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে এতটুকুও বাধল না! যা, বেরো আশ্রম থেকে, তোর মুখ দেখতে চাই না।"

মরমে মরিয়া গেলেন শ্রীজীব, কিন্তু গুরুবাক্য হেলা করিবার উপায় নাই। তাঁহাকে

তখনই আশ্রম ত্যাগ করিতে হইল। চোখের জলে ভাসিয়া শ্রীজীব এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং একটি গাছের নীচে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গ্রামের লোকে যদি কিছু ফলমূল দিত, কয়েকদিন পর পর তাহাই খাইয়া কোন মতে প্রাণধারণ করিয়া রহিলেন।

গুরু কিন্তু আর কোন খোঁজ লইলেন না শিষ্য কোথায় গেল। এই ভাবে দিন যায়। একদিন সনাতন গোস্বামী যাইতেছিলেন সেই বনপথ দিয়া। তিনি লোকজনের কাছে খবর পাইলেন যে একজন তরুণ সাধু এই বনের ভিতর তপস্যা করিতেছেন। তিনি তখনই সেখানে গিয়া দেখিলেন এ যে তাঁহার পরম আদরের শ্রীজীব! কঠোর সাধনায় তাঁহার শরীর কাহিল হইয়া গিয়াছে, চোখে অনবরত অশ্রুধারা। সনাতনকে দেখিয়াই শ্রীজীব তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সনাতন তাঁহাকে শান্ত করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

আশ্রমে ফিরিয়া সনাতন রূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত' দাদা, বৈষ্ণবের ক্রিয়া কি?" অবাক্ হইয়া গেলেন রূপ। সনাতন গোস্বামীর মত পুরুষ এ কি প্রশ্ন করিতেছেন! তিনি বলিলেন, "হঠাৎ এ রকম প্রশ্নের অর্থ কি বুঝলাম না।" তবুও সনাতন বলিলেন, "যা বলেছি তার আগে উত্তর দাও।" তাঁহার মুখে মৃদু হাসি। রূপ বলিলেন, "জীবে দয়া আর—" বাধা দিয়া সনাতন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে তা হচ্ছে না কেন?" এইবার রূপ বুঝিলেন যে সনাতন কি চান। তিনিও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে তখন তাকে ডেকে নিয়ে এস।" গুরুর আশ্রমে আবার শিষ্যের স্থান হইল। গুরুপদসেবার সৌভাগ্য ফিরিয়া পাইয়া শ্রীজীব কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

রূপ-সনাতন যে সব বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীজীবের দানও বড় কম ছিল না। ক্রমে রূপ-সনাতনের তিরোধান হইল, লোকনাথ, গোপালভট্ট ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। ৺পুরীধামে মহাপ্রভুরও তিরোধান হইল। তখন বৈষ্ণব গোষ্ঠীর ভার পড়িল শ্রীজীবের উপর। সমস্ত বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাকেই মণ্ডল-স্বামীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ভারতের দিকে দিকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে আসিলেন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম, আর উড়িষ্যা হইতে আসিলেন শ্যামানন্দ। তরুণ তেজে উদ্দীপ্ত তিনটি তরুণ জ্যোতিষ্ক আসিয়া দেখা দিলেন বৃন্দাবনের আকাশে। শ্রীজীবের হৃদয় আশান্বিত হইয়া উঠিল।

মণ্ডলেশ্বর শ্রীজীব তাঁহাদের যথাযোগ্য আশ্রয় দিলেন। শ্যামানন্দের ভার লইলেন নিজে এবং বৃদ্ধ তাপস গোপালভট্টের চরণে শ্রীনিবাসকে অর্পণ করিলেন।

তপস্বী রাজকুমার নরোত্তম লোকনাথ গোস্বামীর কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেলেন। শ্রীজীবের আগ্রহে ও চেষ্টায় এই তিন তাপসের শিক্ষা বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। শিক্ষা শেষ হইলে শ্রীজীবের নির্দ্দেশে তিন তাপস যে যাঁহার দেশে ফিরিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। চারিদিকে রব উঠিল অদ্বৈত, চৈতন্য আর নিত্যানন্দ আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন—

"নিত্যানন্দ ছিলা যেই নরোত্তম হৈলা সেই,
শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যারে কয়, শ্যামানন্দ তেঁহো হয়,
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ ॥
সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব।
সর্ব্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তিভাব ॥"

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর এই যে ঘটনা ঘটিয়াছিল উহার মূলে ছিলেন মণ্ডলেশ্বর শ্রীজীব। সমস্ত বৃন্দাবনটিই ছিল যেন তাঁহার নিজের বাড়ী; সেই বাড়ীর মঙ্গল ও সৌষ্ঠবের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। কোন পণ্ডিত নিজ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য দিগ্বিজয়ে আসিলে শ্রীজীব তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করিয়া বৃন্দাবনের খ্যাতিরক্ষা করিতেন। কেহ ধর্ম্ম-পিপাসু বা শিক্ষার্থী হইয়া আসিলে তিনি তাহাকে নানা শাস্ত্র পড়াইয়া কৃতার্থ করিতেন। কোন ভক্ত ব্রজবাসী হইতে চাহিলে তিনি তাহাকে আশ্রয় দিয়া গোস্বামীপাদগণের সঙ্গসেবা করিবার সুযোগ করিয়া দিতেন। যিনি তাঁহাকে মনেপ্রাণে গুরুরূপে পাইতে চাহিতেন তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতেন।

সমস্ত শাস্ত্রে তিনি ছিলেন পরম পণ্ডিত;—যাহা যিনি পড়িতে চাহিতেন বা অন্যত্র পড়িতে পারিতেন না, তাহা শ্রীজীব পড়াইতেন। তিনি ছিলেন বৃন্দাবনের মুখপাত্র। যাহার যাহা প্রয়োজন শ্রীজীব তাহাকেই তাহা দান করিবার জন্য একনিষ্ঠ অক্লান্ত ভাণ্ডারীর মত সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। শ্রীবৃন্দাবন-বিগ্রহের চক্ষু বলিতে শ্রীজীব, কার্য্যকুশল বাহু বলিতে শ্রীজীব, মস্তিষ্ক বলিতে শ্রীজীব, সর্ব্বভাবপরিপূর্ণ হৃদয় বলিতে শ্রীজীব। এক কথায় বৃন্দাবন তখন শ্রীজীবময় হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময় একদিন কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী মীরা বাঈ আসিলেন বৃন্দাবনে এবং শ্রীজীবের কথা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন। কিন্তু জীব গোস্বামী তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে রাজী হইলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করা আমার নিষিদ্ধ।"

মীরা বাঈ বলিয়া পাঠাইলেন যে বৃন্দাবনে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আবার দ্বিতীয় পুরুষ আছে ইহা তাঁহার জানা ছিল না। আজ তাহা জানিলেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীজীব ত' অবাক্। কে এই মহিলা দেখিতে হইবে ত'! আস্তে ব্যস্তে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন ভজন-কুটীর হইতে; দেখিলেন, সামনে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিমতী ভক্তি—কৃষ্ণপ্রেমে ঢল ঢল শ্বেতশুভ্র পুষ্প-নির্ম্মাল্য। মহাসমাদরে গোস্বামী মীরা বাঈকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনেকক্ষণ দু'জনের মধ্যে চলিল কৃষ্ণপ্রেমপ্রসঙ্গ, তারপর মীরা চলিয়া গেলেন।

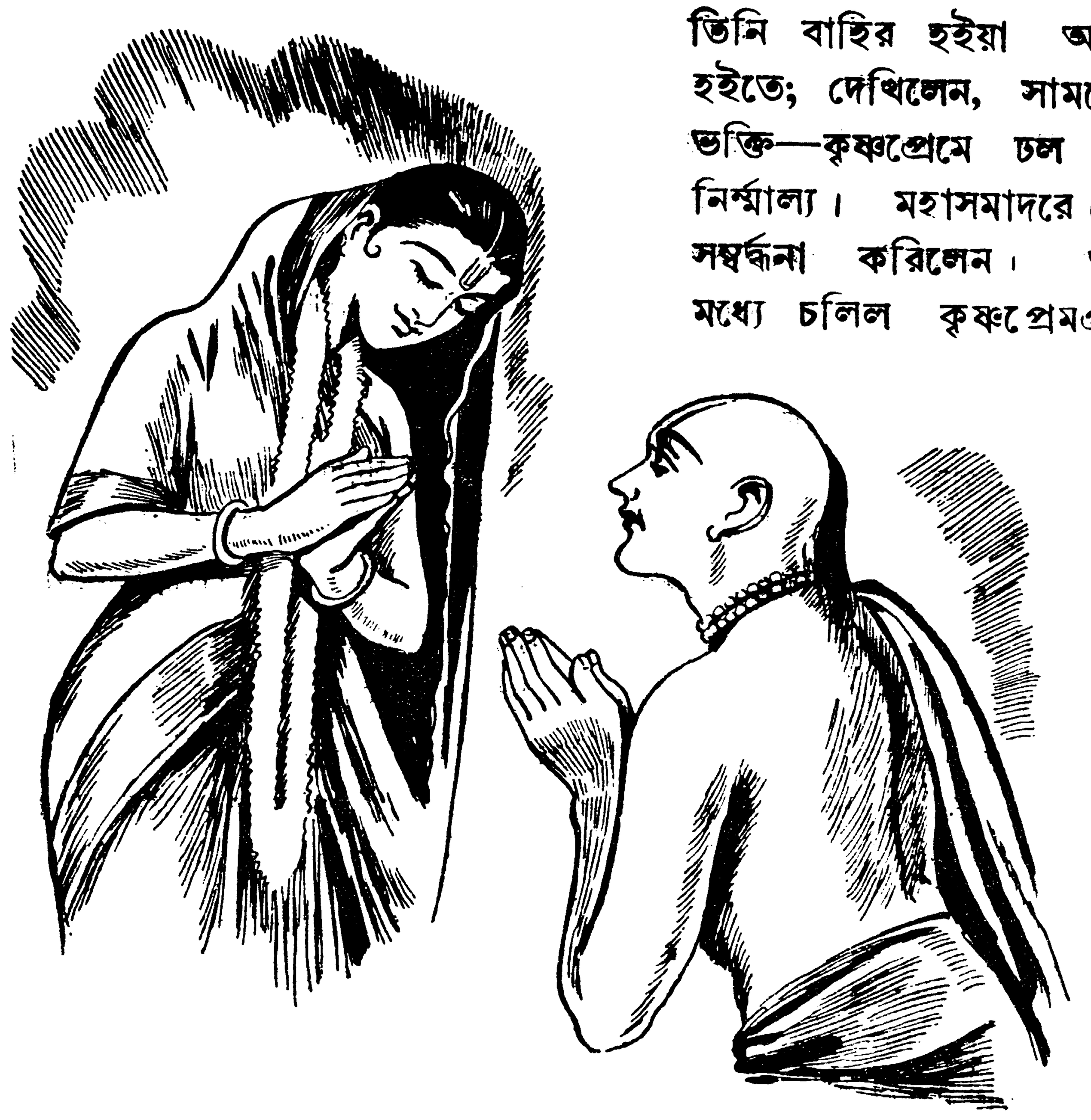

দেখিলেন, সামনে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিমতী ভক্তি।

কিছুকাল পর আসিল রাস-পূর্ণিমা, জীব গোস্বামীর আহ্বানে বৃন্দাবনে বৈষ্ণব গোস্বামীদের একটি সম্মেলন বসিল। সেই সম্মেলনে শ্রীজীব বাজাইলেন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের উদ্বোধন শঙ্খ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল রূপসনাতনাদি গোস্বামীগণের রচিত সমস্ত পুস্তক বঙ্গদেশে পাঠাইতে হইবে, আর তাহা লইয়া যাইবেন শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। শ্যামানন্দের বাড়ী উড়িষ্যায় আর শ্রীনিবাস ও নরোত্তম বাঙ্গলার লোক, তাই স্থির হইল ইঁহারা নিজ নিজ দেশে গিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচার করিবেন।

প্রস্তাব শুনিয়া তিনজনেরই মনে বড় কষ্ট হইল, কারণ তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে বাকী জীবন বৃন্দাবনেই থাকিয়া সাধনভজনে কাটাইয়া দিবেন, কিন্তু তাহা আর

হইল না। 'মহাপ্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক' এই স্থির করিয়া তিনজনে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীজীবের আয়োজনে সকলের সম্মুখে সেই অমূল্য পুস্তকগুলি শক্ত কাঠের বাক্সে পূরিয়া উহা মোমজামায় মুড়িয়া দেওয়া হইল; তারপর তাহা একটি বড় কাঠের সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখা হইল।

তখনকার দিনে ত' আর রেল-ষ্টীমার ছিল না, তাই সিন্দুকটি গরুর গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া তিনজন শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রক্ষী হইয়া চলিল দশজন অস্ত্রধারী ব্রজবাসী। বিপুল হরিধ্বনির মধ্যে পুস্তকের গাড়ী চলিল বৃন্দাবনের মধ্য দিয়া। গোস্বামীরা গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের সীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন, তারপর শ্রীজীব তিনজনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সকলের সঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন।

তারপর বৃন্দাবনে 'একে একে নিবিল দেউটি'। রূপ সনাতনাদি ত' আগেই গিয়াছেন, — তারপর গেলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ভূগর্ভ, লোকনাথ, রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও গোপাল ভট্ট। সকলের শেষকৃত্য শ্রীজীবকেই করিতে হইল। তারপর ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের এক পুণ্যতিথিতে শ্রীজীবও কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নিত্যধামে চলিয়া গেলেন।

শ্রী মনিলাল অধিকারী

—চৌদ্দ—

চাপা গর্জ্জন করে উঠল অরুণকুমার। জিজ্ঞাসা করল,—'কথা বল। জবাব দাও— কে তুমি?' মুখোসের অন্তরাল থেকে উদ্যত রিভলভারের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ছায়ামূর্ত্তি,

—'আপনার রিভলভারের মুখ একটু অন্য দিকে ঘুরিয়ে ধরুন। আমার বড় ভয় করছে—সত্যি বলছি আমার ভীষণ ভয় করছে। আমি অত্যন্ত নার্ভাস লোক।'

মৃদু মৃদু হাসতে লাগল অরুণকুমার। বলল,—'তুমি নার্ভাস লোক কিনা জানি নে, কিন্তু তুমি যে অত্যন্ত চতুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যা হোক, তুমি এখানে কি করছিলে? কিসের সন্ধান করছিলে বল?'

—'কোন কিছুরই সন্ধান করছিলাম না—ঘুরেফিরে দেখছিলাম শুধু। আর মনে মনে ভাবছিলাম আমি ভুল করে এখানে এসে পড়েছি।'

—'ভুল করে?'

—'হ্যাঁ—তাই।' রহস্যময় কণ্ঠে ছায়ামূর্ত্তি বলল,—'জঙ্গলকুঠিতে প্রবেশ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল. এখন দেখছি ভুল করে হলুদ-কুঠিতে প্রবেশ করেছি। দুটো বাড়ি একই রকম দেখতে—অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারি নি।'

—'গভীর রাতে জঙ্গল-কুঠিতে কি উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে চাইছিলে—সেটা নিশ্চয়ই বলতে তোমার আপত্তি নেই।'

—'যথেষ্ট আপত্তি আছে। আপনি শুধু দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।'

—'অসম্ভব। তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি নে।'

—'কি করতে চান তাহ'লে?'

—'পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাই তোমাকে। কিন্তু তার আগে তোমার আসল পরিচয়টা জেনে নিতে চাই। কে তুমি? আমার কেমন যেন ধারণা হচ্ছে যে তুমি স্বয়ং তাপস চৌধুরী।'

—'অসম্ভব।'

—'সম্ভব নয় কেন?'

—'শুনেছি তাপস চৌধুরী একজন শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা, কিন্তু আমার মত নিশাচর নয়।'

—'কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে তাপস চৌধুরীকে নিশাচরের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। তুমি তাপস চৌধুরীই হও বা তার নিয়োজিত কোন গুপ্তচর হও—আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। মুখের ওপর থেকে তোমায় মুখোসটা সরিয়ে ফেলতে হবে। তোমার মুখের আসল চেহারাটা আমি দেখতে চাই।'

—'কিন্তু আমি মুখোস খুলব কি করে? আমার হাত দুটো যে মাথার ওপর তোলা।'

মৃদু হাসল অরুণকুমার। বলল,—'একটা সমস্যা বটে। আমারও হাত দুটো জোড়া। একটাতে টর্চ. আর এক হাতে রিভলবার। এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে তরওয়াল। একেবারে নিধিরাম সর্দ্দার—এখন লড়াই করি কোন্ হাত দিয়ে? প্রয়োজন তৃতীয় ব্যক্তির। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি বলতে একমাত্র ভৃত্য মধুকে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এখান থেকে হাঁকডাক করে মধুর ঘুম ভাঙান সম্ভব নয়। অতএব আমাকেই খুলতে হবে মুখোস। টর্চটা মাটিতে নামিয়ে রাখব। এর মধ্যে চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না যেন। মনে রেখো, চালাকি করতে গেলে আমার হাতের রিভলভার অগ্নি উদ্‌গীরণ করতে মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিধা করবে না।'

মনে মনে খুসী হয়ে উঠল ছায়ামূর্ত্তি! ঠিক এমনি একটা সুযোগের অপেক্ষাই করছিল সে। অত্যন্ত সজাগ আর সতর্ক হয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল সে।

টর্চটা মাটিতে রাখতে গিয়ে অরুণকুমার বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্যে ছায়ামূর্ত্তির উপর থেকে তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের সুযোগ গ্রহণ করল ছায়ামূর্তি। ঘটনাটা ঘটে গেল ভোজবাজীর মত। মুহূর্ত্তের মধ্যে ছায়ামূর্তি প্রচণ্ড বেগে একটা ঘুষি মারল অরুণকুমারের ডান হাতের ওপর। আকস্মিক আঘাতে অরুণকুমারের ডান হাতে ধরা রিভলভারটা ছিটকে গিয়ে পড়ল বেশ খানিকটা দূরে। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অরুণকুমারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ছায়ামূর্তি।

অরুণকুমারকে পরাজিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না ছায়ামূর্তিকে।

ছায়ামূর্তির প্রচণ্ড শক্তির কাছে সহজেই পরাজিত হ'ল অরুণকুমার।

পর মুহূর্ত্তে বলিষ্ঠ হাতের ধাক্কায় ছায়ামূর্তি অরুণকুমারকে ঠেলে নিয়ে চলল শয়নকক্ষের দোরের সামনে। তারপর দোরের সামনের লম্বা ঝুলন্ত পর্দ্দাটা এক টানে খুলে নিল। আর সেই পর্দ্দার সাহায্যে অরুণকুমারকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

তার পর বন্দী অরুণকুমারকে শয়নকক্ষের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল ছায়ামূর্ত্তি।

নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে গেল বড় টেবিলটার দিকে।

টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সাগ্রহে গ্লোবটা কাছে টেনে নিল। তারপর ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগল গ্লোবটা। ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় মেরুদণ্ডের কাছাকাছি যোড়ের মুখে হাত পড়ল তার।

যোড়ের মুখটা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগল সে টর্চ্চের তীব্র আলোয়। মনে সঞ্চারিত হ'ল ক্ষীণ আশার আলো।

যোড়ের মুখটা খোলবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু নানান্ ভাবে চাপ দিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও যোড়ের মুখ খুলল না।

আবার ধীরে ধীরে সে ঘোরাতে লাগল গ্লোবটা।

সহসা থমকে থেমে গেল ছায়ামূর্ত্তি। সংযত করল মনের সমস্ত চিন্তা। তার সতর্ক কানে অতি মৃদু একটা শব্দ ধরা পড়েছে। শব্দ এত মৃদু যে সাধারণ কানে সেই শব্দ ধরা পড়া অসম্ভব। কিন্তু তার অত্যন্ত সজাগ কানে ধরা পড়েছে সেই মৃদু শব্দ।

আবার সে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগল গ্লোবটা। তার হাত কাঁপতে লাগল আবিষ্কারের উত্তেজনায়। শব্দটা হয়ত কিছুই নয়, আবার হয়ত অনেক কিছু হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে—গ্লোবটা মেরুদণ্ডের ওপর ঘুরতে গিয়ে অমন একটা শব্দ হয়েছে। কিন্তু মৃদু শব্দের অত সহজ একটা মীমাংসা মেনে নিতে রাজি হ'ল না সে। সম্পূর্ণ একটা নতুন চিন্তা ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছে তার মাথায়।

আগের থেকে আরো ধীরে বার বার ঘোরাতে লাগল গ্লোবটা। বার কয়েক ঘোরাতেই আবার কানে ধরা পড়ল সেই রহস্যময় মৃদু শব্দ।

ছায়ামূর্ত্তি বুঝতে পারল কয়েকবার ঘোরার পর গ্লোবটা মেরুদণ্ডের কোন একটা বিশেষ স্থানে এসে পড়লে ঐ মৃদু শব্দটা হয়।

কান দু'টো অত্যন্ত সজাগ রেখে সে আবার অতি ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগল গ্লোবটা। এবার গ্লোবটা ঘোরাতে লাগল উল্টো দিকে। গ্লোবের বিশেষ একটা অংশ মেরুদণ্ডের কাছে আসতেই পূর্ব্বের মত মৃদু শব্দ শোনা গেল।

জয়ের আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠল ছায়ামূর্ত্তি।

পরীক্ষা চলল আবার। সোজা আর উল্টো দিকে ঘুরিয়ে সে পাঁচটি বিন্দু আবিষ্কার করল.. সেই বিন্দু ক'টি যখনই ঘুরতে ঘুরতে মেরুদণ্ডের উপর এসে পড়ে তখনই গ্লোবের অভ্যন্তর থেকে শোনা যায় সেই রহস্যময় মৃদু শব্দ।

গ্লোবটার যোড়ের মুখে সিন্দুকের মত 'কম্বিনেশন্ লক্' লাগান আছে। সোজা আর উল্টো দিকে গ্লোবটা কয়েক বার ঠিক মত ঘোরাতে পারলে—যোড়ের মুখের লক্ খুলে যাবে। ঠিক ক'বার ঘুরোতে হবে সেটা জানে অরুণকুমার। এই লকের ধাঁধা খুঁজে বের করতে হবে ছায়ামূর্ত্তিকে।

প্রায় পনের মিনিটের চেষ্টায় গ্লোবের যোড়ের মুখ খুলতে পারল সে। ঠিক যোড়ের মুখ থেকে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল গ্লোবটা। খোলের ভিতরে দেখা গেল গ্লোবের সমান সমান একটা তুলোর বল্।

তুলোর বল টেনে বার করল ছায়ামূর্ত্তি। তুলোর ভাঁজ খুলতেই বেরিয়ে পড়ল লাল শঙ্খ।

রাত তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

শঙ্খটা পকেটে পুরে ছায়ামূর্ত্তি যে পথে হল্‌ঘরে প্রবেশ করেছিল আবার সেই পথে বেরিয়ে গেল।

* * *

প্রায় দশ মিনিট পরে ছায়ামূর্ত্তিকে দেখা গেল জঙ্গল-কুঠির দোতালার আলোকিত হল ঘরে, আর মলয়কে দেখা গেল ছায়ামূর্ত্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে।

এক টানে মুখের উপর থেকে মুখোসটা খুলে নিতেই দেখা গেল ছায়ামূর্ত্তি স্বয়ং তাপস চৌধুরী।

মলয় জিজ্ঞাসা করল,—'সফল হয়েছিস তাপস?'

—'হ্যাঁ।'

তাপস সমস্ত ঘটনা খুলে বলল মলয়কে।

মলয় জিজ্ঞাসা করল,—'তোর ছদ্মবেশ অরুণকুমার চিনতে পারে নি তো?'

—'চিনতে পারে নি—কিন্তু সন্দেহ করেছে। অবশ্য আগামী কাল সকালেই অরুণকুমার টের পেয়ে যাবে, ছায়ামূর্ত্তি হচ্ছে তাপস চৌধুরী।' (ক্রমশঃ)

একজন নতুন ধরণের শিল্পী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ছবি আঁকতে ভালবাস। আঁকতে পার না পার, ছবি পছন্দ কর সকলেই।

ছবিকে ভাল কথায় বলে শিল্প, তা হলে যাঁরা তার চর্চা করেন তাঁরা হলেন শিল্পী। আর, সত্যিকার যিনি শিল্পী, তাঁর শিল্পকে বলা উচিত সৃষ্টি।

এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। অনেক সময় আমরা এমন সব ছবি দেখতে পাই যার তূলির টান আর রংএর খেলা দেখলে সাধারণ লোকের তাক্ লেগে যায়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে হয়তো দেখা যাবে তার মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব জিনিষ তেমন কিছুই নেই—গতানুগতিক পদ্ধতির শুধু অনুকরণ করে আঁকা সে সব ছবি। সাধারণ লোকে তা না বুঝলেও যাঁরা সত্যিকার শিল্পরসিক তাঁদের চোখে তা ধরা পড়বেই।

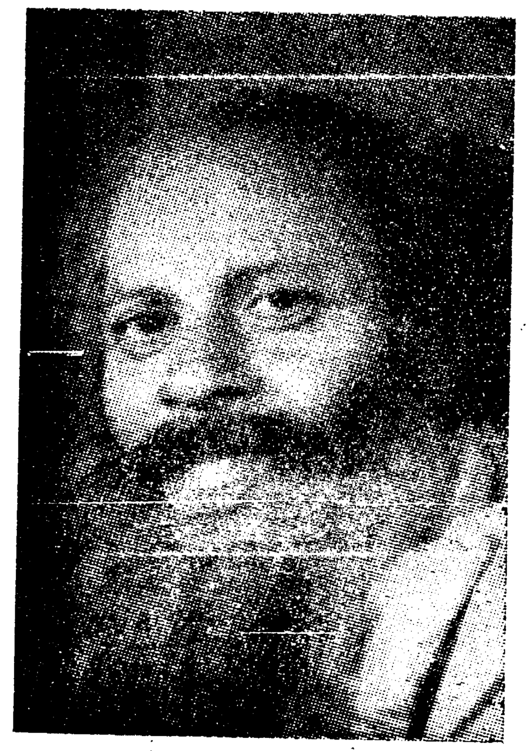

শিল্পী শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বছর কয়েক আগে ছোটদের আঁকা ছবির একটা প্রদর্শনী হয়েছিল কলকাতায়। ছোটদের আঁকা হ'লেও তার কয়েকখানা ছবিতে বেশ পাকা হাতের টান ছিল। দেখে অনেকেই বললেন, "বাঃ বাঃ, কী চমৎকার এঁকেছে দেখ! এই ছবিগুলোই পুরস্কার পাবে নিশ্চয়।" তার পর এলেন বিচারকের দল। তাঁরা সবলেই নামকরা শিল্পী। দেখা গেল, ঐ ছবিগুলির কোনটিকেই তাঁরা পাত্তা দিলেন না এবং, আশ্চর্য, প্রত্যেকেই অপরের মতের অপেক্ষা না রেখে এক বাক্যে একটি মাত্র ছবিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে 'রায়' দিলেন। সেটি একটি ছোট্ট মেয়ের আঁকা। সাধারণ খাতার কাগজে লাল-নীল পেন্সিলে আঁকা সেই ছবিটি আমার চোখে এখনও যেন ভাসছে। ছবিটির নাম ছিল "রাক্ষুসী"।

কেন সেটা প্রথম পুরস্কার পেল? শিল্পীরা বললেন, ঐ সব পাকা হাতের ছবিগুলো গতানুগতিক ছবির 'কপি' বা অনুকরণ মাত্র। কিন্তু ঐ 'রাক্ষুসী' ছবিটির

মধ্যে এমন একটা জিনিষ আছে যা শিল্পীর নিজের সৃষ্টি—সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিষ তার, এবং এটাই হচ্ছে সত্যিকার প্রতিভার পরিচয়।

অবাধ গতি

বাস্তবিক আমরা, সাধারণ লোকেরা, সব সময় প্রকৃত শিল্পের মর্ম বুঝতে পারি না। যে ছবি হয়তো আমাদের চোখে বেশ ভালো লাগল—জীবন্ত বা বাস্তব বলে মনে

হ'ল, শিল্পরসিকরা তা দেখে হয়তো বলবেন—"এর মধ্যে বাহাদুরী কোথায়? এ তো ফটোগ্রাফ!" তাঁরা চান ছবির মধ্যে এমন একটা কিছু থাকবে যা শুধু বাইরের চেক্‌নাই নয়,—তার ভিতর দিয়ে ছবির ভিতরকার গূঢ় রহস্যের সন্ধান মিলবে। অবশ্য ছবি যদি জীবন্ত হয় তা হলেই যে সেটা দোষের হ'ল তা নিশ্চয়ই নয়। বরং উল্টো। তা না হ'লে র‍্যাফেল, টিশিয়ান, মাইকেল এঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি প্রভৃতি ইটালীয় শিল্পীরা শত শত বছর ধরে কি করে বিশ্বের কলা-রসিকদের শ্রদ্ধা অর্জন করে গেলেন? তবে তাঁদের সেই জীবন্ত ছবির মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য ছিল তাও তো ভুললে চলবে না!

রূপকথার রাণী

আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পীরা কিন্তু প্রায় কোন দিনই ঐ পদ্ধতির অনুসরণ করেন নি। বিভিন্ন যুগে এক একটা বিভিন্ন পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু প্রায় সর্বত্রই চেষ্টা হয়েছে ভিতর-কার ভাবটাই ফোটাবার। অজন্তার বিশ্ববিখ্যাত ছবিগুলি দেখলে এ কথা বার বারই মনে হবে। মাঝখানে, হয়তো বা বিদেশী শিল্পের প্রভাবে পড়েই, ভারতীয় শিল্পের এ ভাবটা যেন হারিয়ে যেতে বসেছিল। শিল্পগুরু অবনীন্দ্র-নাথ বহু পরিশ্রমে এটিকে আবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন। তাঁর এবং তাঁর

মানুষের পশুসত্তা

কয়েকজন সুযোগ্য শিষ্যের হাতে ভারতীয় চিত্রকলা পুনর্জন্ম লাভ করে পৃথিবীর কলা-রসিকদের মুগ্ধ করে দেয়।

কিন্তু এখানেও অনুকরণের অভাব হয় নি। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর কৃতী শিষ্যদের দেখাদেখি আরও বহু শিল্পী তাঁদের অনুকরণ করতে সুরু করেন। কিন্তু সেই সৃজনী-প্রতিভা তাঁদের অনেকেরই না থাকায় সত্যিকার রসের পিপাসা মেটাতে পারেন নি তাঁরা। বিশেষজ্ঞেরা তাই বলতে সুরু করছেন—বাঙ্গালীর শিল্পপ্রতিভা যেন কেমন স্তিমিত হয়ে এসেছে। পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে, কিন্তু নতুন সৃষ্টির বড়ই অভাব। মাত্র সামান্য কয়েকজন শিল্পীর মধ্যে এই নিজস্ব সৃষ্টি-ভঙ্গিমার দেখা মেলে।

এমনিধারা একজন শিল্পীর গল্প আজ তোমাদের বলব।—শিল্পী শ্রীগোপেশ চক্রবর্তীর কথা।

লম্বা লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়ি, খালি গায়ে একখানি চাদর জড়ানো, পায়ে জুতো নেই, মাথা ভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখে সরল প্রসন্ন হাসি শ্রীগোপেশ চক্রবর্তীকে কলকাতার পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতে দেখলে কারো মনেই হবে না ওঁর মধ্যে এমন একটা শিল্পীপ্রাণ লুকিয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি সেকালকার মুনিঋষিদের কেউ একজন (দুর্বাসা মুনি ন'ন তাই ব'লে) হেঁটে চলেছেন। যাঁরা কার্ল্ মার্ক্সের ভক্ত তাঁরা নাকি ওঁর চেহারায় কার্ল্ মার্ক্সের সাদৃশ্য দেখে অবাক্ হয়ে যান। বিশেষতঃ দাড়িটা একটু মুড়ে নিয়ে, চুলটা আর একটু ফাঁপিয়ে দিলে তো কথাই নেই! (উনি নিজেই হাসতে হাসতে তা করে দেখিয়েছেন আমাদের।)

সাধারণ মানুষের মত প্রচারের ধার বড় একটা ধারেন না কোন দিন। তাই হয়তো ওঁর নাম সাধারণ লোকের কাছে ততটা পরিচিত নয়। কিন্তু যাঁরা সত্যিকার শিল্পরসিক তাঁরা ওঁকে চেনেন—ওঁর প্রতিভাও স্বীকার করেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অর্দ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (ও. সি. গাঙ্গুলি), ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ,—ওদিকে মহাত্মা গান্ধী থেকে সুরু করে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সকলেই ওঁর ছবি দেখে তারিফ করেছেন। কেউ কেউ উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন। এঁদের মধ্যে বিদেশী শিল্পরসিকও আছেন অনেক।

শ্রীহট্ট জেলায় সুরমা নদীর উপত্যকার কাছে পাহাড়ের নীচে একটি গ্রাম মদনপুর। সেইখানে জন্ম হয়েছিল গোপেশচন্দ্রের।—সে আজ সাতান্ন বছর আগেকার কথা। পাঁচ বছর বয়স থেকেই ছবি আঁকার দিকে অসম্ভব একটা ঝোঁক দেখা যায় তাঁর। কলম, পেন্সিল আর রং পেলেই, আর কথাটি নেই, অমনি ছবি আঁকতে বসে গেলেন।

ক্সিসের ছবি ? রং-বেরংএর প্রজাপতি, ফড়িং থেকে স্বুরু করে দৈত্য-দানা পর্যন্ত,—কিসের নয় ? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পপ্রীতি বাড়তে লাগল। প্রবেশিকা পর্যন্ত স্কুলে পড়ে তিনি কলকাতায় চলে এলেন আর ভর্তি হলেন সরকারী আর্ট্ স্কুলে। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে অল্পদিন পরেই তা ছেড়ে দিতে হ'ল। কিন্তু ছবির নেশা তাঁকে ছাড়ল না। লোকচক্ষুর আড়ালে নির্জনে চলতে লাগল তাঁর সাধনা। তাঁর শিল্পের মধ্যেও তাই আমরা দেখতে পাই গতানুগতিক বাঁধাধরা নিয়ম-কানুনের কোন বালাই নেই তাতে। তাঁর সৃষ্টির মূলে রয়েছে তাঁর সহজাত প্রতিভা,—যা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে পৃথিবীকে চিনতে হয়েছে তাঁকে। আর্ট্ স্কুল থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর বয়স বছর ষোল। থাকবার জায়গা নেই, শোবার জায়গা নেই, পকেটে পয়সা নেই খাবার কিনবার। এই সময় কত দিন তিনি সারা রাত ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বেঞ্চে শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন ঠিক নেই। এক পয়সার এক মুঠো ছোলা আর বিনা পয়সার রাস্তার কলের জল—এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন খাবার। গোপেশ বাবু বলেন, ধর্মগ্রন্থের দিকে তাঁর আবাল্য একটা মোহ ছিল। তা ছাড়া ভালো লাগত সাধুসন্তদের গান। নিঃসম্বল, নিঃসহায় অবস্থায় এদেরই সাহায্যে নিজের মনোবল অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিলেন তিনি,—ঐ বয়সেই। বিশেষতঃ রামকৃষ্ণকথামৃত বইখানির প্রভাব তিনি জীবনে ভুলতে পারবেন না। ধর্মের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ আজও তেমনি রয়েছে—বরঞ্চ আরও বেড়েছে।

তার পর কালের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনে কিছুটা পরিবর্তন এল। পোর্ট্রেট, পোষ্টার প্রভৃতি এঁকে তাঁর আর্থিক অবস্থাও একটু অনুকূল হ'ল। সুন্দর পোষ্টার আঁকতেন তিনি, পোর্ট্রেটগুলোর মধ্যেও ফুটে উঠত একটা সজীব ভাব। কিন্তু অভাববোধ কম থাকায় যতটুকু দরকার তার বেশী সময় তিনি ওতে দিতে রাজী ছিলেন না। যাই হোক, এর পর সংসারী হলেন তিনি। কিন্তু ঈশ্বরের হয়তো সে ইচ্ছা ছিল না। তিনিই ভেঙ্গে দিলেন তাঁর সংসার। আবার সুরু হ'ল তাঁর পরিক্রমা। এই সেদিনও তিনি পূর্বভারত-পরিক্রমা শেষ করে কলকাতায় ফিরেছেন। যাবার সময় বিছানার কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের আঁকা শ'খানেক ছবি। ওখানে সেই সব ছবি নানান্ জায়গায় প্রদর্শনীতে দেখিয়ে রসজ্ঞদের মুগ্ধ করেছেন তিনি। শীগ্গিরই কলকাতায়ও তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হচ্ছে। যারা কলকাতায় থাক, সুযোগ পেলে দেখে এস।

শিল্পীরা অনেক সময় একটু খামখেয়ালী হ'ন। সাধারণ লোকে তা দেখে মনে

করে বুঝি লোকটির "মাথার স্ক্রু" কোথাও আল্গা আছে। হয়তো আছে। সেই জন্যই তো তিনি শিল্পী—সাধারণের মধ্যে থেকেও আলাদা! গোপেশচন্দ্রের খেয়ালী চালচলন, খেয়ালী হাবভাবের কথা তো আগেই বলেছি। আর একটা উদাহরণ দেই। একদিন তিনি এসে গল্প সুরু করেছেন। গল্প করতে করতে বেশ বেলা হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি স্নান-টান সেরেই বেরিয়েছেন?' 'স্নান!' হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন তিনি,—'স্নান আমি গত ন' বছর করি না। হাসছেন? হাসুন। কিন্তু আমার ওতে কোনই অসুবিধা হয় না—যদি নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি।' আমি তো শুনে থ।

তার পর কয়েকদিন পরে একদিন সকালে খুব বৃষ্টি হয়েছে,—যাকে বলে ধারাবর্ষণ। বিকেলে গোপেশ বাবুর সঙ্গে দেখা। বললেন,—'আজ কত দিন পরে আবার স্নান করলাম! গঙ্গায় নয়, কলের জলেও নয়, বৃষ্টির জলে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম কাকের মত।' শোন কথা! মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, আর একজন বয়স্ক লোক তার তলায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন চোখ বুঁজে। কল্পনা কর দেখি দৃশ্যটা!

শিলংএ গিয়েও এই রকম এক জলপ্রপাত দেখে তাঁর স্নান করবার সাধ হ'ল। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই প্রপাতের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। এক বছরের স্নান এক দিনেই তুলে নিলেন হয়তো!

গোপেশচন্দ্রের আঁকা কয়েকখানা ছবির নমুনা এখানে দেওয়া হ'ল। এ মাসের মুখপত্রের ছবিখানাও তাঁরই আঁকা। আসল ছবিগুলো নানা রং দিয়ে আঁকা. কাজেই এই প্রতিলিপি দেখে তার স্বরূপ হয়তো বোঝা যাবে না; কিন্তু কি পদ্ধতিতে তিনি ছবি আঁকেন তার একটু আভাস পাওয়া যাবে। ছবিগুলির একটু পরিচয় দিয়ে দিলে বোধ হয় আরও সুবিধা হবে বুঝতে।

অবাধ গতি ছবিটায় বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে আক্রমণ করা হয়েছে। চালকের ত্রুটীতে ঘোড়া আর বাগ মানছে না। লাগাম, চাবুক তো খসে পড়েছেই, চালকও পড়ো পড়ো। ঘোড়া, যা নাকি বর্তমান শিক্ষার প্রতীক্,—চলেছে অবাধ গতিতে।

রূপকথার রাণী চন্দ্র-তারকার দেশ থেকে নেমে আসছেন শিশুদের রহস্যলোকে। সঙ্গে সহচরী, বাহন ব্যাঙ্গমা। সঙ্গে দৈত্যও আছে, কিন্তু রূপকথারই উপযোগী সে দৈত্য। এই ছবিখানি নাকি অবনীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল।

মানুষের মধ্যে দু'টো ভাব বা সত্তা আছে। দেবভাব আর পশুভাব। মানুষের ভিতরকার এই পশুভাবটা কি বীভৎস তা দেখানো হয়েছে 'মানুষের পশুসত্তা' ছবিটায়।

মাথায় মোষের মত শিং, চোখে পশুসুলভ ক্রুর দৃষ্টি, স্ফীত নাসারন্ধ্র, আর চোখে অদ্ভুত এক হাসি।

আর মুখপত্রের ছবি 'ধ্বংসের কবলে'। এটিও রূপক। ছবির হরিণ হচ্ছে সংস্কৃতি, একটি কিম্ভূতকিমাকার জীব তাকে গ্রাস করে ফেলছে। এই জীবটি হচ্ছে বর্তমান অর্থনীতির প্রতীক্। নানা হিংস্র প্রাণীর সংমিশ্রণে তৈরী হয়েছে এই জীবটি— অজগর, ড্রাগন, বাঘ, ঈগল, কুমীর, বুনো মোষ—সব মিলিয়ে। অজগরের গায়ের ডোরাটা ভাল করে লক্ষ্য কর।—"বর্ত্তমান অর্থনীতি" কথাটি কেমন কৌশলে লেখা আছে ওর মধ্যে ! *

* এই লেখার সঙ্গে প্রকাশিত শিল্পীর আঁকা ছবিগুলি প্রবাসী পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী

জন্ম—১৩০৩ সাল। জন্মস্থান—নীলফামারী (রংপুর)। পৈত্রিক নিবাস—ফরিদপুর।

ছাত্রজীবন সুরু হয় ফরিদপুর জেলার কনেশ্বরে। সেখান থেকেই প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজসাহী কলেজে আই. এ পড়েন এবং শেষে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী রূপে বি এ পাশ করেন।

কর্মজীবনে ইনি আজীবন শিক্ষাব্রতী। বরাহনগর ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বংলা ভাষার প্রধান শিক্ষক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

১৫ বছর বয়স থেকেই সাহিত্যজীবন সুরু হয় এবং তা অব্যাহত রূপে চলতে থাকে শিশু-সাহিত্যের সেবায়। নানা শিশুসাময়িক পত্রে নিয়মিত লেখা ছাড়াও ছোটদের জন্য অসংখ্য বই লিখেছেন ইনি। তার মধ্যে শ্রীমন্ত, কালকেতু, চাঁদ সদাগর, বাংলার বীর, মেবার-কাহিনী, শিখের কথা, রাজা সীতারাম, সুন্দরবনের শিকারী, গরিলা শিকারী, বাংলার শহীদ, স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারত, যখের কুঠি ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

সুধীরচন্দ্র সরকার

জন্ম— আগষ্ট, ১৮৯৪ খৃঃ। জন্মস্থান— বহরমপুর।

১৯১৫ সনে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেডের পরিচালক রূপে কর্মজীবন সুরু করেন। বর্তমানেও ইনি ঐ প্রতিষ্ঠানের

ডিরেক্টর। ১৩২৭ সালে ছোটদের মাসিক মৌচাক প্রকাশ করেন এবং এই, ৩৮ বছর একাদিক্রমে ঐ পত্রিকার সম্পাদনা করে আসছেন। ১৯৫১ সালে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের পাটনা অধিবেশনে শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। শিশুসাহিত্য-পরিষদেরও ইনি সভাপতি ছিলেন কিছুদিন। বর্ত্তমানেও ঐ পরিষদের সহ-সভাপতি ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য আছেন।

সাহিত্যজীবন সুরু হয় ভারতী, ভারতবর্ষ, যমুনা ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশের ভিতর দিয়ে। 'জাহ্নবী'র সম্পাদকমণ্ডলীতেও ছিলেন। একবার পূজাবার্ষিকী 'শিশু-গল্পিকা'ও সম্পাদনা করেন।

এঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান, পশ্চিম বঙ্গের কথা প্রভৃতি বইএর নাম করা যেতে পারে। তা ছাড়া বয়স্কদের জন্যও এঁর রচিত বা সম্পাদিত ইংরেজী বাংলা কয়েকখানি বই আছে।

চিঠিপত্র

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

চিঠি লিখতে বসে ভাবছি কী লিখব ! গরমে প্রাণ আইঢাই করছে। আষাঢ় মাস এসে গেল, কোথায় বিকেল বেলাই হঠাৎ অন্ধকার হয়ে আসবে, অকস্মাৎ সুরু হবে মুষলধারে ধারাবর্ষণ। ঈজি-চেয়ারটিতে শুয়ে হাতে একখানি রবীন্দ্রনাথ বা কালিদাসের কাব্যগ্রন্থ নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাব আমি এই পৃথিবীর মানুষ। তা না, ক্রমাগত ঢক্ ঢক্ করে জল খাচ্ছি, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হাতে ব্যথা ধরে যাচ্ছে। হাওয়া নেই একদম, যদি বা কখনও একটু বয়— যেন আগুনের নিঃশ্বাস সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তার ওপর বাড়ী বাড়ী ইনফ্লুয়েঞ্জা। এ নাকি সিঙ্গাপুরী ইনফ্লুয়েঞ্জা ! (সিঙ্গাপুরী কলার কথাই তো এত দিন জানতাম।) কি করে এল কে জানে ! সহর, গ্রাম উজাড় হয়ে যাবার যোগাড়। কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন— এ নাকি এটম্ বোমা নিয়ে পরীক্ষার ফল। প্রশান্ত মহাসাগরে ফেলা হয়েছে—তাই আগে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এশিয়ায়। এর পর অষ্ট্রেলিয়া, ইয়োরোপ, আমেরিকাও বাদ যাবে না। হয়তো কবির বাণী ফলবে সেদিন —"সাধনার শব জাগি' সাধকের মুণ্ড ঘন ঘন করে দাবী ভৈরব মন্ত্রে।" এ অবস্থায় কি লিখি বল তো ? তার চেয়ে চিঠিগুলিরই জবাব দেওয়া যাক্ বসে বসে।

শ্রীকৃষ্ণা সুর (কলকাতা-৪)—তোমার পাঠানো ফটো পেয়েছি। কিন্তু ওর অনেকগুলিই ব্লকে ভালো আসবে না। যাই হোক, ওর থেকেই বেছে ব্লক্ করতে দিলাম, আমার কাছেও নিজের তোলা কিছু ছবি আছে। ব্লক্ হয়ে গেলে ফটো অবশ্যই ফেরত পাবে। লেখাটিও শীগ্গিরই বার করব। শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী (কৃষ্ণনগর)—রামধনুর যোগ্য হলে কেন ছাপব না ? কিন্তু নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্টের প্রশ্ন তো আসবেই ! গল্প তো শুধু লেখককে খুসী করার জন্য নয়—পাঠককে খুসী করতে হবে আগে। শ্রীগোপালচন্দ্র মল্লিক ঠাকুর (বিষ্ণুপুর)—তুমি বড় গোলমেলে প্রশ্ন করেছ। ১৭ বছর বয়সের পক্ষে, তুমি যা বর্ণনা দিয়েছ, তাতে তো বুড়িয়ে যাবার কথাই মনে আসে। অন্ততঃ পরিপক্ক হওয়া তো বটেই ! প্রতিবিধান ? রবীন্দ্রনাথের বই ভাল করে পড়ে দেখতে পার। বরঞ্চ সেই কবিতাটা দিয়ে সুরু কোরো—"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা !" আশী বছর বয়সেও কি করে মনের দিক্ দিয়ে কাঁচা থাকা যায় তা উনিই দেখিয়ে গেছেন। শ্রীসর্ব্বেশ্বর সাহু (খাগরাগেরিয়া)— লেখা সব সময়েই

নকল রেখে পাঠাতে হয়। ধাঁধা পাঠালে উত্তরও সঙ্গে দিতে হয় বৈকি! মজার পাতা বা ছবি ফেরৎ পেতে হলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকেট থাকা দরকার। শ্রীঅসিতকুমার রায় (খড়গপুর)—খবর তো দেখছি সর্বত্রই এক! এখানকার অবস্থাও তোমাদের ওখানকার মত। বৃষ্টি নামলে হয়তো কিছু বদলাবে, কিন্তু কবে নামবে কে জানে? শ্রীআনন্দগোপাল বিশ্বাস (দহকুলা)—তোমাদের তো দেখছি সাহিত্যিকের গ্রাম! কিন্তু ওরই ওপর কি বিধাতার যত রাগ? বন্যা, দুর্ভিক্ষ, পর পর ওরই জন্য? তোমাদের "কল্যাণ সঙ্ঘ" নিশ্চয়ই এ দিনে কল্যাণহস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে এসেছে। ওখানে যাবার তো ইচ্ছে হয়ই, কিন্তু সময় পাব কি? শ্রীসুচিত্রা বোস (যাদবপুর)–কৌটিল্যকে তোমরা ছদ্মবেশ না খুলিয়ে ছাড়বে না দেখছি! তোমার অনুমান হয়তো ঠিক, কিন্তু কথাটা গোপনীয়, হাটে ভাঙবার মত নয়। তুমি তো অনে-ক জায়গায় ঘুরে এসেছ দেখছি! ওখানকার কথা লিখো। পৃথিবীর কেন্দ্র যা গরম, ওখানে কি আর কোন জিনিষ শক্ত থাকতে পারে? তরল হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ওপরের চাপ তাকে এমন পিষে রেখেছে যে তার অবস্থা না-তরল, না-শক্ত। শ্রীগুণধর বর্ধন (ঝাড়বনি)—তোমার আপত্তি সত্বেও এবারেও নতুন বানানই ব্যবহার করা হ'ল তোমার পদবীতে। বাংলা বানান বিভিন্ন যুগে বদলানো হচ্ছে। যেমন ধর, পুরোনো বাংলায় "পাইয়া"কে "পাঞা" লেখা হ'ত, এখন আর হয় না। এ বানানটাও বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বানান সংস্কারকে অনুসরণ করে লেখা। যদিও সকলে ওটা এখনও সুরু করে নি (আমরাও না). তবু এবার ধীরে ধীরে সইয়ে সইয়ে করব ভাবছি। কারণ ওতে অনেক সুবিধে, ছাপার দিক্ থেকে তো বটেই! তা ছাড়া তোমার বেলায় তো কথাই নেই, একেবারে খাঁটি ব্যাকরণসম্মত ও বানান। সংস্কৃতে দ্বিত্ব বিকল্পে ব্যবহার করা যায়। ধর্ম্ম, ধর্ম, সর্ব্ব, সর্ব – দু' রকমই শুদ্ধ। তেমনিধারা বর্দ্ধন ও বর্ধন দুইই লেখা চলে। তবে বাংলায় দ্বিত্বটাই এতদিন বেশী চলছিল। শ্রীশোভা রায় (দিল্লী)—মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার (চৈত্র, ১৩৬৩) ফলাফল আগামী বারে বার করার চেষ্টা করব। অনেকগুলি বইএর নাম তো, পরীক্ষা করতে সময় লাগছে খুবই।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। —ইতি রাঃ সঃ

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

যে গল্প জানা নেই

শ্রীগুণধর বর্দ্ধন

—বারো—

অবশ দেহটা কোন রকমে টানতে টানতে গোপাল বাড়ী ফিরে এল। যন্ত্রচালিতের মত বিছানায় এলিয়ে দিল দেহটা, কিন্তু সারা রাত চোখে ঘুম এল না তার। কেবলই মনে হয় কেন এমন হ'ল? বিনা দোষে এত বড় দণ্ড! মনে পড়ল কথাটা শুনে দীপাদি আর সুমিতের মুখ কেমন বদলে গিয়েছিল। তারা তো ওকে চোর বলেই জেনে নিয়েছে। কী করে তাদের সামনে মুখ দেখাবে গোপাল? তার সম্বন্ধে ওদের কত বড় ধারণা—সব ভেঙ্গে গেছে যে! চোখ ফেটে জল এল গোপালের।

খাওয়া-দাওয়ায় আর মন নেই গোপালের। যত্ন করে খেতে ডাকেও না কেউ। মামাবাবু

ও মামীমা ওর সঙ্গে আর কথাই কন্ না। বুলুও যেন ওকে দেখলেই ঘৃণায় মুখটা কুঞ্চিত করে চলে যায়। সব সময় চোখে চোখে রাখে গোপালকে, যেন সে একটা দাগী চোর। তবে কি এ ব্যাপারে বুলুর কোন হাত নেই? কিন্তু না, গোপাল যেন আর এ বাড়ীতে একটা মুহূর্ত্তও কাটাতে পারছে না। যে ক'দিন এখানে ওঁরা থাকবেন সে ক'টা দিন ওকে কষ্টে-সৃষ্টে কাটাতেই হবে কিন্তু বাড়ী থেকে আর বেরোবে না সে। দীপাদি, সুমিত ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যদি।

অবশেষে ওরা ফিরে এলো কলকাতায়। কলকাতায় ফিরেই গোপাল অমিয়দের বাড়ী যাবার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠলো। কিন্তু মামীমাকে না ব'লে বাইরে যাওয়া চলে না, অথচ মামীমার সঙ্গে কথা বলতে ওর কেমন যেন লজ্জা হয়।

মাথাটা যতদূর সম্ভব নীচু ক'রে গোপাল ওর মামীমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। মামীমা এগিয়ে এসে অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললেন, "কিছু বলবে?" গোপাল মাথাটা আরও একটু নীচু করে কোন রকমে বললো, "একবার বাইরে—"

কথা শেষ হ'ল না। মামীমা আগের চেয়ে একটু জোর গলায় বললেন, "হ্যাঁ, যেতে পারো। আমাকে কোন কিছু তোমায় বলতে হবে না।"

ওঁর কথা বলবার ভঙ্গী দেখে গোপাল বুঝতে পারলো, তিনি যেন একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তবে ওর ওপর কিংবা অন্য কারো ওপর তা বোঝা গেল না।

গোপাল যখন ফিরে এল তখন অনেক বেলা হ'য়েছে। অন্যমনস্ক ভাবে বাড়ীতে ঢুকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চমকে উঠলো সে। ওর বাবা এসেছেন, নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে যাবার জন্যে। বাইরে থেকেই ও শুনতে পেলো মামাবাবুর কণ্ঠস্বর।—"আমার মনে হয় আপনি ওকে আজই নিয়ে গেলে ভাল হয়। যার যেমন অবস্থা তার সে ভাবেই মানুষ হওয়া উচিত। নইলে যে এই রকমটাই হতে পারে তা আমি আগে ভেবে দেখি নি।"

গোপালকে ঢুকতে দেখেই, ওর বাবা বলে উঠলেন, "গোপাল, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তুমি তৈরী হয়ে নাও।"

রিক্শা এল। মালপত্র তুলে দিয়ে ওরা রিক্শায় উঠবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা অস্ফুট শব্দ শোনা গেল—"গোপাল! একটু দাঁড়াও।"

গোপাল পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলো কখন মামীমা এসে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ দু'টি তাঁর, মনে হ'ল, বেশ ছল ছল করছে।

(ক্রমশঃ)

তোমরা তরুণ দল

শ্রীঅরুণকুমার ভট্টাচার্য্য

অন্ন-বস্ত্র-গৃহহীন যারা—
নাও ভার সবাকার;
ক্ষুধিত মানবে দাও আশ্বাস,
বাঁচিবার অধিকার।
মুখে নাই ভাষা, মনে নাই আশা,
জীবনে হতাশ যারা
তোমার বাণীতে—তোমার পরশে
প্রেরণা লভুক তারা।

মুখে যার মধু, মনে ভরা বিষ,
হীন চোখে দেখে দীনে—
খুলে দাও তার কপট মুখোস,
নিক্ তারে সবে চিনে।
টেনে তুলে ধর দুর্বল জনে,
বুকে দাও তার বল;
ভাবী ভারতের আশার প্রদীপ
তোমরা তরুণ দল।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

৭টি রুমাল

উত্তরদাতাদের নাম : দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-১২) ; কৃষ্ণা সুর (কলিকাতা-৪) ; শৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী (কৃষ্ণনগর) ; অমিতাভ ও অশোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর) : সুচিত্রা ও সঙ্ঘমিত্রা বসু (কলিকাতা-৩২) : আদিত্যনাথ শর্ম্মা (শিলং) ; কমলা মিত্র চৌধুরী (নয়া দিল্লী) ; শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায় (কাশী) ; রেবা, সেবা ও পৃথা (আগরা) : কল্পনা বসু (কলিকাতা-২৯) ; আফজল খাঁ ও আয়েষা (খুলনা) ; নমিতা, শমিতা ও রুদ্রেন্দ্র দাশগুপ্ত (এলাহাবাদ), নিমাই, রবি, মণ্টু ও চিত্ত (মেদিনীপুর) ; শিপ্রা রায় (নাগপুর) ; কেতকী সান্যাল ((বেম্বাই) ।

নূতন ধাঁধা

টিকুল, শিকুল আর সুমিত তিন ভাইবোন। এখন টিকুলের যা বয়স শিকুলের যখন সেই বয়স হবে তখন সুমিতের বয়স হবে শিকুলের এখনকার বয়সের চেয়ে তিন বছর বেশী। তখন টিকুলেরও বয়স হবে সুমিতের এখনকার বয়সের দ্বিগুণ। আর, তখন যদি তিন জনের বয়স একত্র যোগ করা হয়, তা হ'লে হবে ষাট বছর। তা হ'লে এখন ওদের কার বয়স কত ?

লে খা চা ই

অভিনব, সচিত্র কিশোর-মাসিক; বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ; বার্ষিক সডাক ২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১।০, নমুনা ৵০ ; যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায় ; ভি, পি, হয় না। তিনটি রচনা-প্রতিযোগিতায় মোট আঠারটি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে ; পুরস্কার-প্রাপ্ত ১৮টি "লেখা"ই ৺শারদীয়া সংখ্যায় ছাপা হইবে ; অন্ততঃ ষাণ্মাসিক 'গ্রাহক' না হইলে রচনা গ্রাহ্য হইবে না। ক-বিভাগে, বিষয় "স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কবিতা", আয়তন "লেখা চাই"এর এক পৃষ্ঠা, প্রতিযোগীর বয়স ১৮ বছরের কম। খ বিভাগে, বিষয় "দেশ"-প্রেমিকের আত্ম-বিসর্জ্জন-সম্পর্কীয় ছোট গল্প", তিন পৃষ্ঠা, বয়স ১৮এর নীচে। গ-বিভাগে বিষয় "শ্রীঅরবিন্দের সাধনা" -শীর্ষক প্রবন্ধ, ২ হইতে ৪ পৃষ্ঠা, বয়সের কোন গণ্ডী নাই। "টাকা" ও "লেখা" পৌঁছিবার শেষ তারিখ আগামী ১৪ই ভাদ্র। ঠিকানা :—শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, বি-টি, সম্পাদক "লেখা চাই", লেখা চাই কার্য্যালয়, পোঃ দেবালয়, জিলা ২৪ পরগণা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি এ

পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

মজাদার গল্প বলতে কি বোঝ ? সে রকম একটি গল্প লিখে পাঠাতে হবে।

গল্পটি ছোট হবে। সবশুদ্ধ ১০০০ কিংবা বড় জোর ১২০০টি শব্দ থাকতে পারে (অর্থাৎ ছাপলে রামধনুর ৩।৪ পৃষ্ঠা হবে। গল্প নিজের লেখা হওয়া চাই, আর আগামী ৩২শে শ্রাবণের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।

কোন প্রবেশ মূল্য নেই, শুধু প্রতি লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে ভর্ত্তি করে পাঠাতে হবে। ৩ মাস এই কুপন দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকটি কুপনে একটি করে গল্প পাঠাতে পারবে—যে কেউ। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে এবং পছন্দ হলে পুরস্কারপ্রাপ্ত বা যে কোন গল্প (পুরস্কার না পেলেও) রামধনুতে ছাপা হবে।

সবশুদ্ধ তিনটি পুরস্কার আছে,—সবই বই।

কুপন : পু ৩-৬৪

রামধনু

নাম——

ঠিকানা——

বয়স ——

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৶৹

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২॥০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

—বঙ্কিম ঘোষ—

সিপাহী বিদ্রোহ—১৲

—কেশব সেন—

কর্ণার্জ্জুন—॥৶৹ চন্দ্রগুপ্ত—॥৶৹

বুড়ি বালামের তীরে—১৲

পুরুষ-ভূমিকা-বর্জিত

মেয়েদের নাটক

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যের—

মাটির ঘর—।৶৹

SCHOOL FINAL NOTES
by
A. T. DEV

For—1959

পাঠ-সংকলন	3-8-0
সংস্কৃত-পাঠমালা (Prose)	3-0-0
সংস্কৃত-পাঠমালা (Poetry)	2-0-0
Silas Marner	1-8-0
Robin Hood	1-8-0
পথের পাঁচালী	0-12-0
গল্পগুচ্ছ	1-4-0
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা	0-12-0
ভারত-কল্যাণ	0-12-0

অনুবাদ সিরিজ

বেনহুর	১॥০
ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট	১॥০
স্যামসন ও ডালেইলা	১॥০
লাইট হাউস্	১॥০
লাষ্ট অফ্ দি মহিকনস্	১॥০
থ্রি মাসকেটিয়ার্স	১॥০
ইনভিজিবল ম্যান	১॥০
ফ্রাঙ্কেনষ্টিন	১॥০
কুয়োভাদিস্	১॥০

জীবনী

বিধান রায়	১॥০

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

ভূত-পেত্নী দত্যি-দানা

অসংখ্য চিত্র-সংবলিত দাম—৩৲ টাকা

ঠাকুরমার ঝুলি—ছবিতে পরিপূর্ণ দাম—৩৲

=পূজাবার্ষিকী=

জয়যাত্রা—৪৲

১৩৬৩ সালের

=আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই করা গল্প=

শোনো শোনো গল্প শোনো-২৲

=দেব সাহিত্য-কুটীর সম্পাদিত=

পুরনো দিনের পুরনো গল্প ৩৲

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

না, খাইয়েছে বেশ,
কেমন ?

তা আর খাওয়াবে না
সবই যে লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী

*

লক্ষ্মী ঘি

উৎসব অনুষ্ঠানে
অপরিহার্য্য
সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ, পবিত্র ও পুষ্টিকর

* * *

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী ৮ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন ২২-৭২৪৩

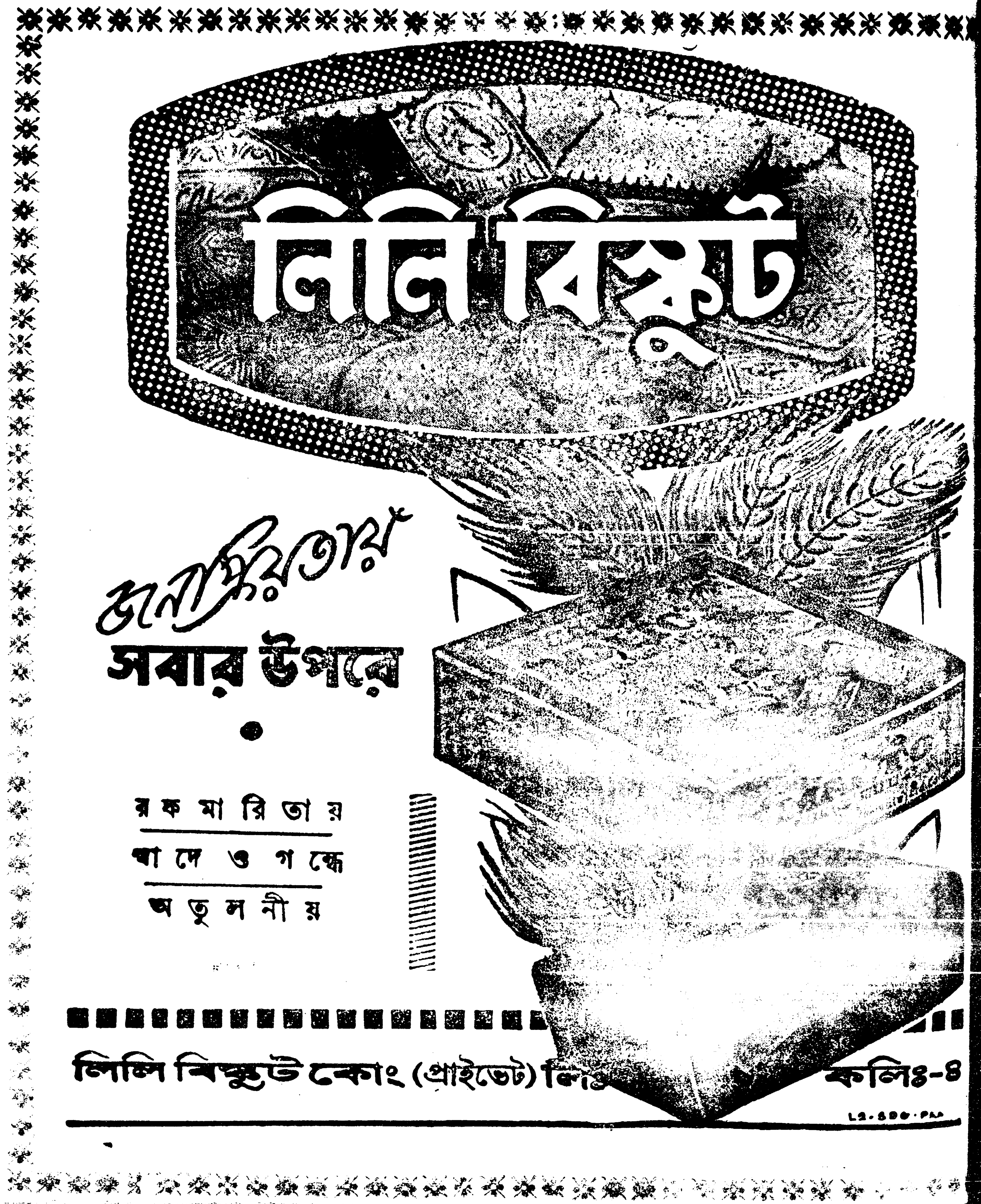
লিলি বিস্কুট
জনপ্রিয়তায়
সবার উপরে
রকমারিতায়
স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়
লিলি বিস্কুট কোং (প্রাইভেট) লি
কলিঃ-৪

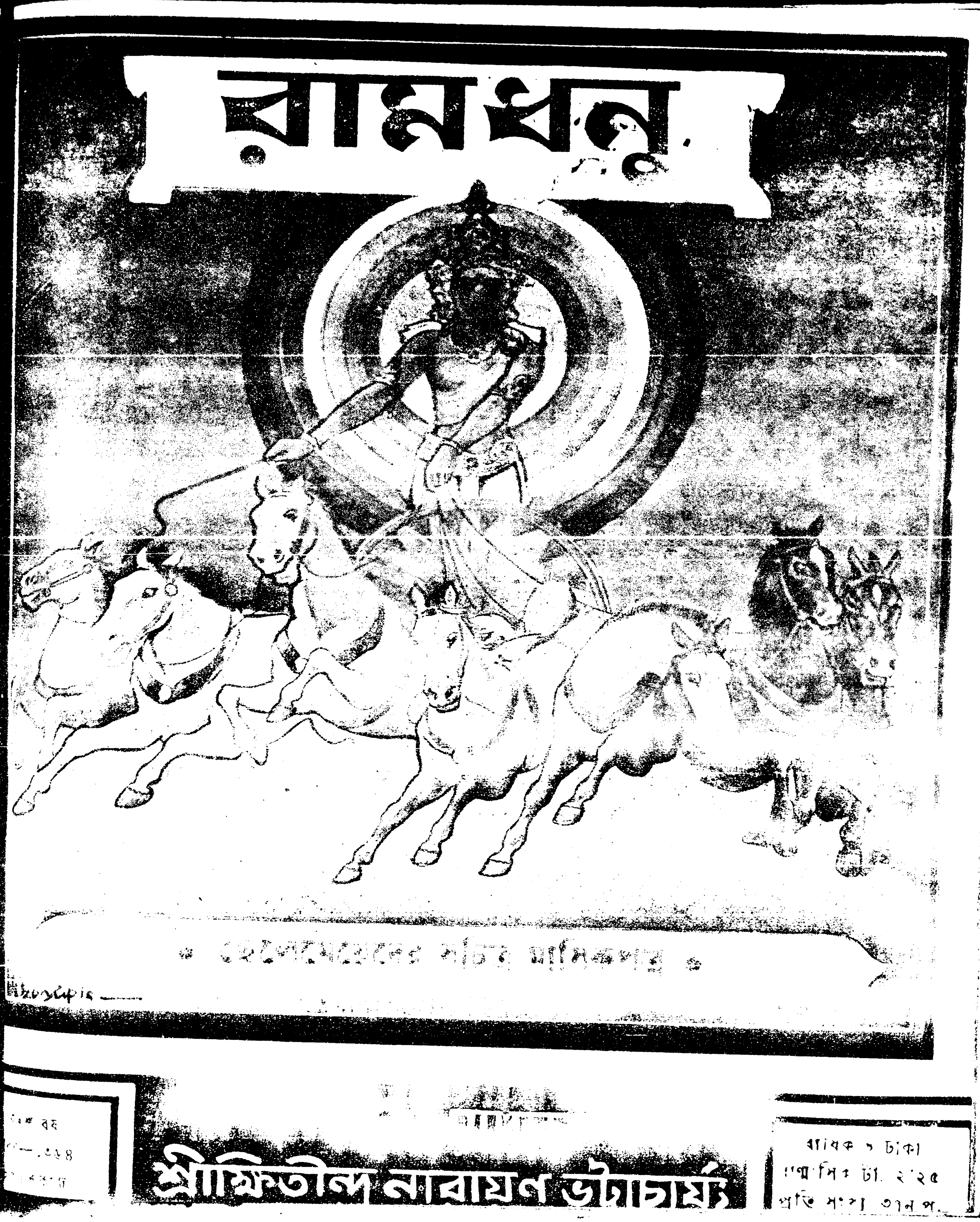
রামধনু
ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র
শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন-৩৫-২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২॥০, /৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ- শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

ছোটদের ভাল ভাল বই ঃঃ নামকরা বই

নবীগোপাল চক্রবর্ত্তীর -

কাঠ ও কাঠের কাজ	১॥
বাঁশ, বেত, পাতা ও সোলার কাজ	১৲
তন্তুশিল্পের কাজ	১৲

আলোক চক্রবর্ত্তীর –

মনসামংগল	১৲
চৈতন্যমংগল	১৲
কুমারসম্ভব	১৲

শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তীর—

রঘুবংশ	১৲
রাণী রাসমণি	১৲
জাগ্রত মেদিনী	১৲

ছোটদের অভিনব মাসিক পত্রিকা

চয়নিকা

১৮ বছরে পড়ল : বার্ষিক মূল্য মাত্র ৩৲

যে কোন মাসে টাকা পাঠালেও বৈশাখ থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক হতে হয়। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা মাত্র ।০ আনা। অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গ ও সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত।

ভারতী বুক ষ্টল

৬. রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

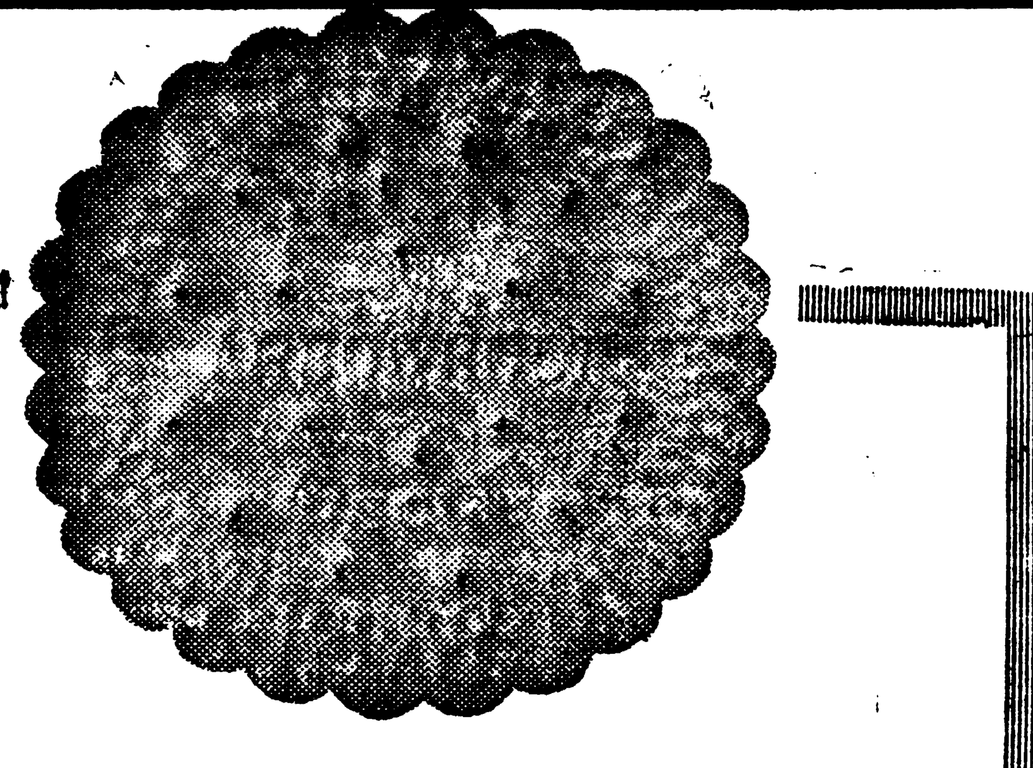

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুনে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে **ভারতের নিজস্ব** চরম উৎকর্ষ

Kini ADVERTISING AGENCY
REPRESENTATIVE OF
FAMOUS NEWS PAPERS & MAGAZINES
72, HINDUSTHAN PARK, CALCUTTA-29

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন.প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন. প.। ভি.পি.তে আরও ৬৯ ন. প বেশী লাগে। নমুনার জন্য ৪০ ন. প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৫। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—ম্যানেজার, রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫ (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

বিজ্ঞাপনের হার (সংশোধিত)

প্রতি বারের জন্য :—

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৫০ টা, অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৮ টা., সিকি পৃষ্ঠা ১৬ টা.। প্রতি কলম ইঞ্চি ৬ টা.

মলাট : ৪র্থ পৃষ্ঠা ১০০ টা.

মলাট : ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা —৮০ টা. অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৪ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২৪ টা.

ছবি বা লেখার সামনের পৃষ্ঠা ৬০ টা., অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৩৬ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২০ টা.

রামধনু—

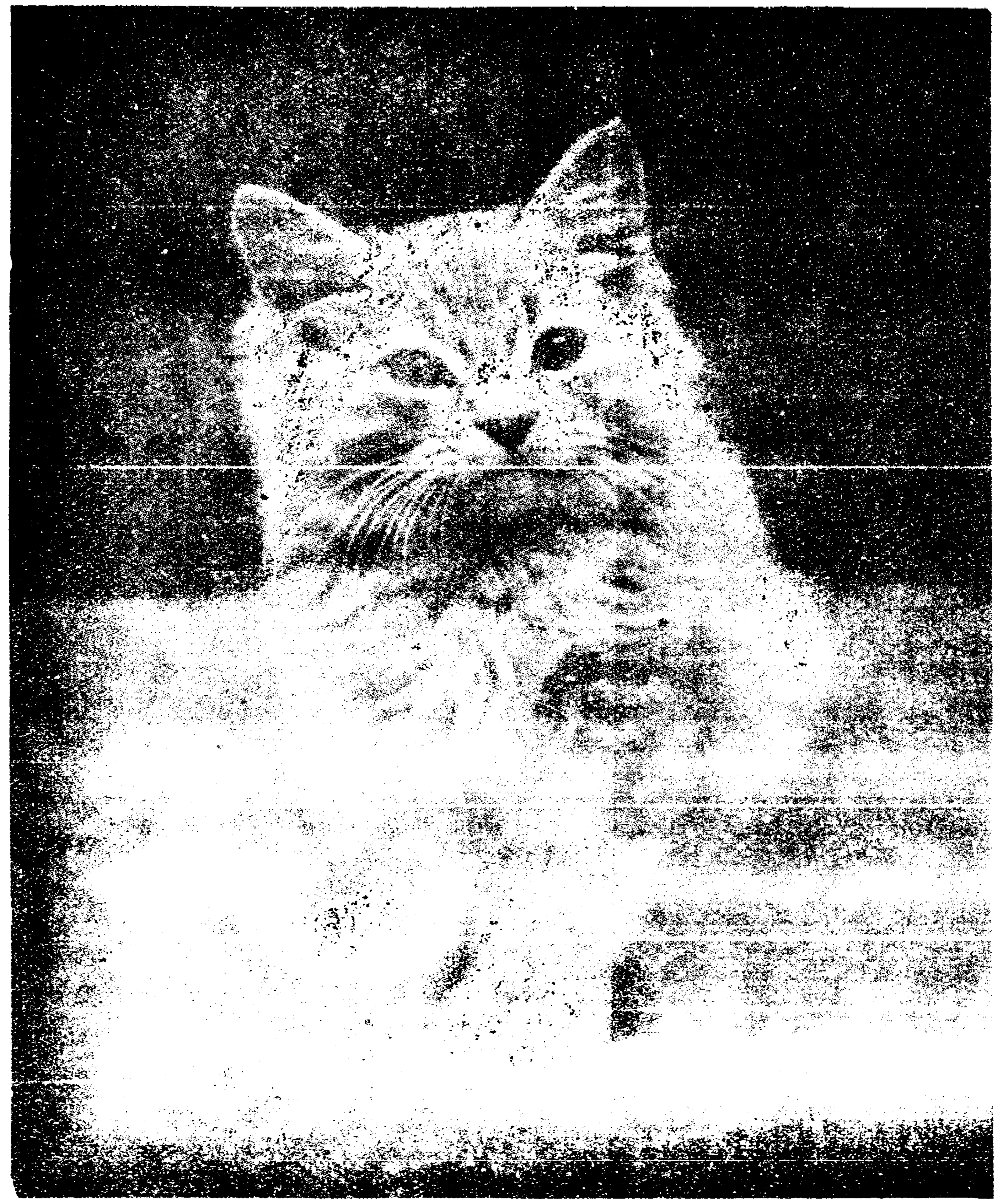

পুষি

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৬৪ { ৪র্থ সংখ্যা

মৌসুমী

শ্রীদীপালি সেনগুপ্তা, এম্.এ

ওই ধীর নীলিমায়
ওরা ভেসে ভেসে যায়
বয়ে কত দূর পথ এই মাটির মায়ায় !

দূর সাগরের কোল
যেথা ঢেউ-উতরোল
আসে সেথা হ'তে দলে দলে মেঘের পথিক ;
ওরা থামে না হেথায়,
বুঝি ডাকে ইসারায়
দূর উত্তর-সীমা— হিমে আলো ঝিক্‌মিক্।

ওই পথ চেয়ে রয়
বনে বনে কিশলয়,
ডাকে কচি ধান মাঠে মাঠে হাতের সাড়ায় ;
কত উষর কানন,
কত তৃষা-ভরা বন,
কত আশা-ভরা মন ওরা পিছে ফেলে যায়।
চলে চঞ্চল মৌসুমী হাওয়ার মায়ায় !

ছেয়ে গিরিপর্বত
নীল অঞ্জন-পথ
রচে, শুভ্র শোভায় ছায় তুষার-শিখর ;
শিরে স্নেহের আশীষ
ভ'রে আনে দশদিশ,—
নব জীবন-সাড়ায় সারা আকাশ মুখর।

ওই নীল—ঘন নীল
মাঝে আলো ঝিল্‌মিল্‌,
হ'ল সব স্বপ্নিল কার আসার আশায় ;
জলে জলে একাকার
ঝরো ঝরো বারিধার
ঝরে,— উচ্ছল জলতানে ভুবন ভাসায়।

তাপ- ক্লান্ত ধরায়
স্নেহ- পরশ ঝরায়
ছুঁয়ে ধূসর জীবন শ্যাম-তূলির মায়ায় ;
ওই ধীর নীলিমায়
ওরা ভেসে চলে যায়
ভ'রে শ্যামল মাটির কোল কোমল ছায়ায় !

রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী

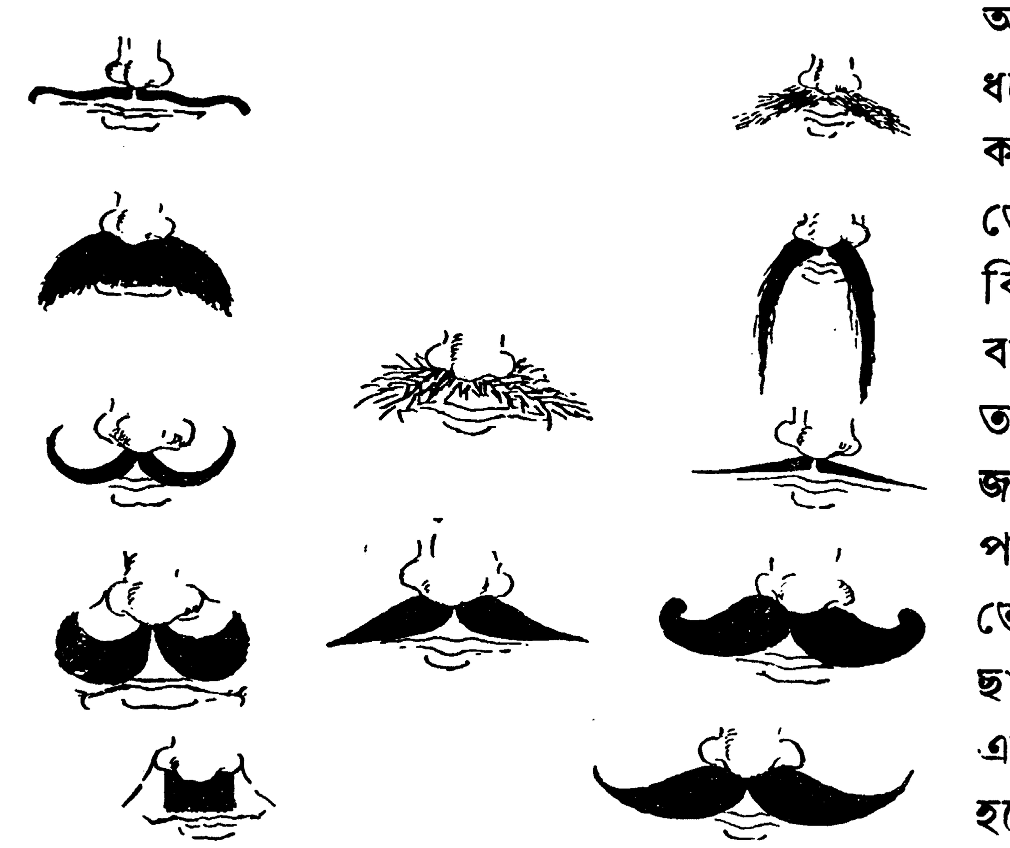

হিরণ্ময় ঘোষাল

রায় বরুয়ার বুঝতে বাকী রইলো না যে কুঠুরীটা ঐ বাঘেরই আস্তানা। টর্চ্‌টা ঠিক একভাবে ধরে রেখে তিনি এক পা এক পা করে পেছনে হেঁটে কুঠুরীর ভেতর ঢুকে পড়তে পারতেন। কিন্তু তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বাঘটাও যদি সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ে তা হলেই সর্বনাশ। বরং খোলা জায়গায় গুলি করবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, কুঠুরীর ভেতরে বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এবং সেই হাতাহাতিতে কে জয়ী হবে বলাই বাহুল্য।

কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে টর্চের দিকে তাকিয়ে থেকে বাঘটা মুখের সম্বরটাকে মাটিতে রেখে দিলে। রায় বরুয়ার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। চক্ষের নিমেষে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে নিশ্চয়। ঐ নিমেষের মধ্যে বন্দুক তুলে গুলি করা সম্ভব নয়। যদি মৃত্যুই তাঁর ঘটে তো শাক্তদের প্রথামত বিনা যুদ্ধে জীবন সমর্পণ করা তাঁর নীতি-বিরুদ্ধ। অতি সন্তর্পণে বন্দুকটা তুলতে গিয়ে রায় বরুয়া কি ভেবে থেমে গেলেন। বাঘটা নরখাদক না হতেও পারে। যে কারণেই হোক্‌, সে সম্বরটা মাটিতে রেখে আবার টর্চের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

রায় বরুয়া বেশ বুঝতে পারলেন, বাঘটা আলোর মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছে। ওর গ্রাস থেকে জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়, টর্চ্‌টা ঠিক একই ভাবে ওর চোখের ওপর নিবদ্ধ রেখে এক পা এক পা ক'রে পেছু হেঁটে বাড়ীর দিকে রওনা হওয়া।

প্রায় এক মাইল পথ পেছু হেঁটে চলা বাতুলতা মাত্র। তবুও তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রায় বরুয়া এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে প্রবৃত্ত হলেন। নদীর কিনারা ধরে

চললে পেছন দিকে হাঁটা হয়তো একেবারে অসম্ভব হবে না। অবশ্য খুব পা টিপে চলতে হবে, অতি সাবধানে। হোঁচট খেয়ে বা গর্ত্তে পা ঢুকে পড়ে গেলে বাঘের চমক ভেঙ্গে যাবে এবং সে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করবে। রায় বরুয়ার আশা হলো, খানিক দূর সরে গেলে বাঘটা আলোর সঙ্গে সঙ্গে নাও আসতে পারে।

রায় বরুয়া অতি সন্তর্পণে পেছু হাঁটতে শুরু করলেন। কয়েক পা চলার পর তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, তাঁর চলার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে, মন্ত্রমুগ্ধের মত। আগের মতই আলোর দিকে তার নিষ্পলক দৃষ্টি।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। তিনিও চলেছেন, বাঘও চলেছে। রায় বরুয়া অবশ্য ইতিমধ্যে বন্দুকটা টর্চের সঙ্গে লাগোয়া করে নিয়েছেন। আলোতে বাঘের প্রায় সর্বাঙ্গ, বিশেষ করে মাথাটা, পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। এবং, টর্চের আগার কাছেই, বন্দুকের নল। ও লাফ দেবার উদ্যোগ করলেই বন্দুকের ঘোড়াটি টিপে দেওয়া।

রায় বরুয়ার মনে প্রথমে যে ভয় দেখা দিয়েছিল তা তিনি জোর করে দূর করে দিয়েছেন। জন্তুকে ভয় করলে তাকে আক্রমণে প্রণোদিত করা হয় তা তিনি আপন দীর্ঘ শিকারের অভিজ্ঞতায় জানতেন। কুকুরকেও ভয় করলে সে যে কামড়ায়, তা কে না জানে? আশ্চর্য এই যে, মানুষ যে ভয় পেয়েছে সে কথা জন্তুরা এক অদ্ভুত উপায়ে বুঝে ফেলে। এবং তারা মানুষকে ভয় করে ব'লেই ভীত মানুষকে দুর্বলচিত্ত অবস্থায় পেলেই কতকটা আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করে। রায় বরুয়া খুব সতর্ক রইলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে আর বিন্দুমাত্র ভয় নেই।

প্রকাণ্ড বাঘ, দৈর্ঘ্যে প্রায় হাত সাত-আট। হাম্‌দো, ভোঁতা মুখে হিংস্র ধূর্ততা। কিসের আকর্ষণে পালিত জন্তুর মত অনুসরণ করছে, ঠিক বোঝা যায় না। আলোর আকর্ষণে নাও হতে পারে। হয়তো সে রায় বরুয়াকে মানুষ বলে চিনতে পেরেছে। হয়তো সে মার্কা-মারা, ডাকসাইটে নরখাদক, মানুষ-শিকারের অবসর পেয়ে সম্বরটা ফেলে দিয়ে তাঁর পেছু নিয়েছে। শুধু জোরালো আলো দেখে হকচকিয়ে গেছে। আলোর ভয়টা কেটে গেলেই আক্রমণ করবে। তার অনুসরণের উদ্দেশ্য যাই হোক্, রায় বরুয়াকে যত শীঘ্র সম্ভব ডাকবাংলায় ফিরতে হবে।

পথের যেন শেষ নেই। সিয়াং নদীর ঘোলা জল অন্ধকারে দেখা যায় না, শুধু কাছেই তার ছল ছল শব্দে বোঝা যায় রায় বরুয়া নদী থেকে দূরে সরে যান নি। মাঝে মাঝে পথ দেখে নেবার জন্যে টর্চ্‌টাকে সামনে ফেলার উপায় নেই। টর্চ্‌ সরিয়ে নিলে বাঘও সঙ্গে সঙ্গে সরে আসবে। ফলে সামনে এগোবার সম্ভাবনা থাকবে না।

কিছুক্ষণ চলার পর দূরে দূরে দু'-একটা মিটি মিটি আলো দেখতে পাওয়া গেলো। রায় বরুয়া বুঝতে পারলেন, এবার জঙ্গল ছাড়িয়ে লোকালয়ে এসে পড়েছেন। ধারে-কাছেই বোধ হয় আদীদের বসতি। একবার ভাবলেন সে দিকেই চলতে সুরু করবেন। কিন্তু রাত্রে দূরের আলো থেকে দূরত্ব অনুমান করা সহজ নয়। হয়তো পাসীঘাট বসতিগুলোর চেয়ে কাছে। তা ছাড়া আলোগুলো আলেয়াও হ'তে পারে। ওদিক্‌টায় জলাজমির অভাব নেই। আলো লক্ষ্য করে চললে হয়তো রাত কাবার হয়ে যাবে, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কোথায় গিয়ে পৌঁছবেন তারও স্থিরতা নেই। একবার জলায় গিয়ে পড়লে নিষ্কৃতি পাওয়া সুদূরপরাহত।

একবার ভাবলেন, বন্দুকের ঘোড়াটা টিপে দিলেই সব চুকে যায়। কিন্তু এক গুলিতে বাঘকে ঘায়েল করতে না পারলে তাঁর মরণ নিশ্চয়। আহত বাঘ শয়তানের দোসর। রায় বরুয়া মরিয়া হয়ে পেছু হেঁটে চললেন, যথা সম্ভব পা চালিয়ে।

কিছু দূর গিয়ে পায়ের তলায় রাস্তার খোয়া লাগায় রায় বরুয়া বুঝতে পারলেন তিনি শহরে এসে পড়েছেন। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাকবাংলায় পৌঁছে যাবেন। এই সময়টায় তাড়াতাড়ি ভেবে ঠিক করে নিতে হবে ডাকবাংলায় পৌঁছে কী ভাবে আত্মরক্ষা করবেন। সহিষ্ণুতা হারিয়ে হঠাৎ দৌড়তে আরম্ভ করলে বাঘ এক লাফে তাঁর কাছে এসে পড়বে।

বড় রাস্তা ছাড়িয়ে একটা ছোট পথ অন্য দিকে চলে গেছে। এই পথটাই ডাকবাংলার ফটক দিয়ে ভেতরে চলে গেছে। ফটকটা কখনো কখনো বন্ধ থাকে। তাহ'লেই সর্বনাশ! রায় বরুয়া সেই পথ ধরে চলতে চলতে পাঁচীলের কাছে এসে পড়লেন। ফটকটা বন্ধ কিনা কে জানে! রায় বরুয়ার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগলো। না, ফটকটা বন্ধ নেই। দু' পা গেলেই বারান্দা। বাগান থেকে বারান্দা পর্যন্ত কয়েকটা ধাপ, এক লাফে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু লাফ দেওয়া মোটেই চলতে পারে না। খুব সাবধানে এক ধাপ এক ধাপ করে উঠতে হবে, টর্চ্‌টাকে ঠিক এক রকম ভাবে ধরে রেখে। কয়েক মুহূর্তেই তাঁর জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে।

অতি সন্তর্পণে একবার পেছনে চেয়ে দেখে নিলেন, তাঁর ঘরের দরজা খোলা কিনা। বুদ্ধিমান্ যদি বুদ্ধি খাটিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে থাকে তাহ'লে তাঁকে আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে যেতে হবে। না, ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে মিট মিট করে লণ্ঠন জ্বলছে। এইবার আত্মরক্ষার শেষ প্রচেষ্টা।

আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে উঠে বারান্দার ওপর জ্বলন্ত টর্চ্‌টাকে রেখে রায় বরুয়া এক লাফে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই বাঘটা ঝাঁপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে গর্জন। সমস্ত ডাকবাংলাটা থর থর করে কেঁপে উঠলো।

বারান্দায় উঠে বাঘটা বারে বারে গর্জন করে টর্চ্‌টার চারিপাশে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। হয়তো ভেবেছিলো ওটা কোনো অদ্ভুত জন্তুর চোখ। চোখ ছাড়া আর কিছু নেই—দেখে সে যেন আশ্বস্ত হয়ে থাবা দিয়ে বেড়ালের মত সেটাকে নিয়ে খেলা করা সুরু করে দিলো। ওদিকে সে স্পষ্ট মানুষের গন্ধ পাচ্ছে, অথচ মানুষ নেই। সে একবার দরজার কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর আবার আলোর কাছে ফিরে গিয়ে খেলায় মেতে গেলো। থাবা দিয়ে টর্চ্‌টাকে সারা বারান্দায় টেনে নিয়ে বেড়াতে লাগলো। রায় বরুয়া জানলার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন তাকে টর্চের আলোর ঠিক মাঝখানে পাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণ পরেই বাঘটা জ্বলন্ত টর্চের একেবারে মুখোমুখি থাবা গেড়ে বসলো; জানলা থেকে ঠিক তার বুকের কাছটায় লক্ষ্য পাওয়া গেলো। আর এক মুহূর্ত দেরী করা চলে না। এইবার, এইবার………

রায় বরুয়া বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন। তারপর কী হলো বোঝা গেলো না। জানলার শার্শীগুলো ঝন্ ঝন করে ভেঙ্গে পড়লো বুদ্ধিমান্ রান্নাঘর থেকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক পাড়ছে। তবে কি বাঘটা অত দূর ছুটে গিয়ে তাকেই আক্রমণ করেছে? বাইরে বেরোবার আগেই ভাঙ্গা জানলা দিয়ে একবার দেখে নিলেন দরজা খোলা চলবে কিনা।

টর্চের আলোয় সটান হয়ে পড়ে আছে প্রকাণ্ড হলদে ডোরা-কাটা একটা স্তূপ। তখনও নড়ছে, এবং আপন স্বভাবের সমস্ত হিংসা দিয়ে সে নিজের থাবা কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করছে। রায় বরুয়া আরো গোটা কয়েক গুলি বসিয়ে বাঘটাকে একেবারে স্থির, নিশ্চল করে ফেললেন।

ওদিকের দরজা দিয়ে লণ্ঠন নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বুদ্ধিমান্। থর থর করে কাঁপছে। মুখে তার কথা সরে না।

বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য শুধালো: "সাব, আহিলে কী খানা পাকানু পৰ্ছ?"

ট্রেন ছুটে যায় সাগর-জলে

শ্রীমাধব পাল

কবি যোগীন্দ্র সরকার লিখে গেছেন—"ছাগলছানা লাফিয়ে চলে, জাহাজ ভাসে সাগর-জলে।" সাগর-জলে ভাসবার জন্যই তো জাহাজ তৈরী হয়, আর ডাঙ্গায় ছুটবার জন্য তৈরী হয় ট্রেন বা রেলগাড়ী। কিন্তু সময় বিশেষে এই ট্রেনও যে জলের উপর দিয়ে ছুটে চলে তা শুনেছ কি? আমাদের অ-বাবুর সেই অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার। সেই গল্প শোন।

বাল্‌টিক উপসাগরের উত্তরে নেদারল্যাণ্ডস,—তার মধ্যে ডেনমার্ক রাজ্য। তার রাজধানী কোপেনহ্যাগেন। আর দক্ষিণে জার্মানী। জার্মানীর বিখ্যাত জংশন ও শিল্প-

হাম্‌বুর্গ সহরের একটি দৃশ্য

সহর হামবুর্গ। সেখান থেকে দুটি রেল লাইন গিয়েছে বাল্‌টিক উপসাগরের দিকে। একটি সমুদ্রপারের বন্দর রষ্টফ পর্য্যন্ত, অপরটি একেবারে সমুদ্রের ধারে কিয়েল ষ্টেশন পর্য্যন্ত।

হাম্‌বুর্গ থেকে ট্রেনে সরাসরি ডেনমার্ক যেতে হ'লে এই কিয়েল ষ্টেশন হয়েই যেতে হয়—ট্রেনে চেপেই, সটান বাল্‌টিক সাগরের উপর দিয়ে। অ-বাবু একবার তাই গিয়েছিলেন। কি ক'রে? তাঁর কথাতেই তবে বলি:

"হাম্‌বুর্গ থেকে তো ডেনমার্কগামী ট্রেনে চাপলাম। ট্রেন গিয়ে থামল সমুদ্রের ধারে কিয়েলে। গিয়ে দেখি ষ্টেশন-সংলগ্ন সমুদ্রে নোঙ্গর করা আছে মস্ত বড় লম্বা ফ্ল্যাট-বসানো এক জাহাজ। সেই লম্বা ফ্ল্যাটের উপরেও রেল লাইনের মত লোহার পাত বসানো আছে।

"আমাদের ট্রেন সেখানে পৌঁছতেই জাহাজের সেই পাতের সঙ্গে আরও দুটি

লোহার পাত যুড়ে দিয়ে মাটীর উপরের রেল লাইনের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। তার পর আমাদের ট্রেনটি সমস্ত কামরা সহ আস্তে আস্তে উঠে এল সেই ফ্ল্যাটযুক্ত জাহাজের উপর। একটু পরেই জাহাজ ছেড়ে দিল। আমরা ট্রেনে বসেই চলতে লাগলাম বাল্‌টিক সাগরের বুকের উপর দিয়ে। আসলে অবশ্য ট্রেনটা চলছিল না, চলছিল জাহাজটাই। কিন্তু ট্রেনের কামরায় বসে থাকার দরুণ মনে হতে লাগল বুঝি ট্রেনটাই ছুটে চলেছে ভস্‌ ভস্‌ করে সমুদ্রের উপর দিয়ে। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

"ট্রেনের জানালা দিয়ে দূরে তাকালাম। যে দিকে তাকাই শুধু নীল জলরাশি। বড় বড় ঢেউ উঠছে আর নামছে। দূরে কিয়েল সহর ক্রমে ঝাপসা হ'তে হ'তে মিলিয়ে গেল। দু'-চারটে সামুদ্রিক ঈগল চক্রাকারে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। শেষে তারাও আর নাগাল পেল না ট্রেনের। এখন শুধু জল আর জল আর জল!

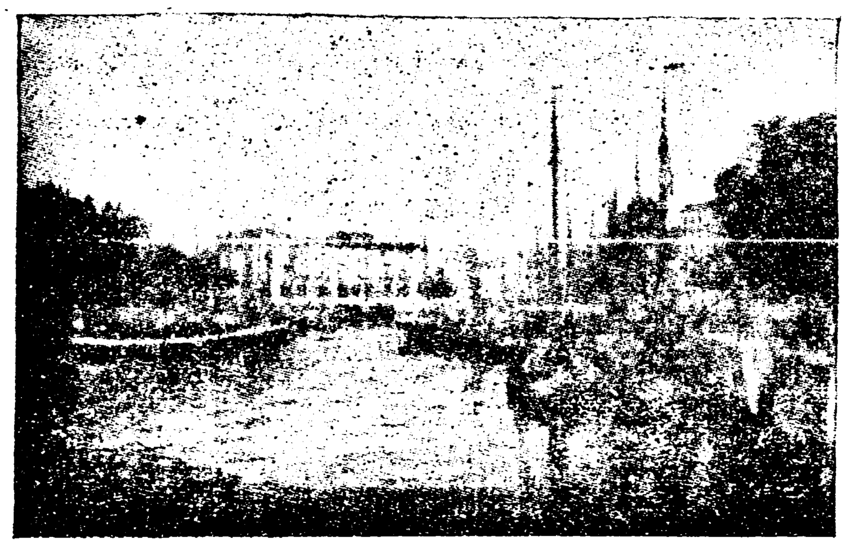

নেদারল্যাণ্ডস-এর সমুদ্রের নিকটবর্তী একটি দৃশ্য

"অবশ্য, নীচু হয়ে ট্রেনের চাকার দিকে তাকালেই ভুল ভেঙ্গে যেত। কারণ সে চাকা তখনও বসানো আছে জাহাজের ফ্ল্যাটে লাগানো রেলের উপর। কিন্তু অত নীচু হয়ে আর কে দেখছে বল? সমস্ত যাত্রীরই দৃষ্টি দূরে— সাগরের দিকে।

"তারপর কোপেনহ্যাগেন বন্দরে পৌঁছে আবার রেলের পাত বসানো হ'ল— জাহাজের বুকের রেল লাইন ও মাটীর উপরে কোপেনহ্যাগেন রেলওয়ে লাইনের সাথে যুড়ে। এবারে ট্রেনের এঞ্জিনই দম নিল, আস্তে আস্তে নেমে এল জাহাজ ছেড়ে মাটীর উপরে সেই লোহার পাত বেয়ে। তার পর ফের ছুটে চলল ডেনমার্কের মাটীর উপর দিয়ে।"

অ-বাবুর এই অভিজ্ঞতার কথা শুনে তোমাদেরও ঐ ভাবে ট্রেনে চেপে সাগরে বেড়াবার ইচ্ছে হচ্ছে নিশ্চয়ই? তোমাদের মধ্যে যারা সেতুবন্ধ রামেশ্বর গেছ তাদেরও, ঠিক এ রকম না হলেও, এই ধরণের খানিকটা অভিজ্ঞতা হয়তো হয়েছে। সেখানেও সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রায় মাইল দুই ট্রেন চলে। সাগরের বুকে সারি সারি থাম বসানো, তার উপর দু'টো লোহার রেল লাইন পাতা। ব্যস্‌, আর সব জল। যখন ট্রেন চলে, মনে হয় বুঝি সাগরের বুকের উপর দিয়েই ছুটে চলেছে। তবে বাল্‌টিক সাগরের ব্যাপারটা বোধ হয় আরও মজার। নয় কি?

মৎস্য-পুরাণ

(চীন দেশের গল্প)

শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এক গাঁয়ে লি আর সিং নামে দুই বন্ধু ছিল। দু'জনে ভীষণ ভাব। একই বাড়ীতে একসঙ্গে দুই ভাইয়ের মত থাকত তারা। সরকারী চাকুরে হিসেবে সারা জীবন-ভোর বহু দুর্নাম আর অর্থ সঞ্চয় করে শেষে লোকজনের উপদ্রব এড়াবার জন্যে নিরিবিলি এক গাঁয়ে এসে বাসা বাঁধল তারা। গাঁয়ের এক প্রান্তে বিরাট এক বাড়ী নিয়ে বেশ আরামেই থাকে। যখন একঘেয়ে লাগে তখন আশেপাশের বড়লোক প্রতিবেশীদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়, সকলে মিলে নৌকো করে ঘুরে বেড়ায় নদীতে।

সেবারে বড় গরম পড়ল। গাঁয়ের বাসিন্দাদের ন্যাড়া মাথাগুলো রোদের তাপে গরম হয়ে উঠছে। বন্ধু লিরও মাথা গরম হয়ে উঠল। গা বমি বমি করে, মাথা তুলতে পারে না। শেষে বদ্যি এল। নাড়ী টিপে মুণ্ডুটাকে কয়েকবার ডান দিকে কয়েকবার বাঁ দিকে নেড়ে গম্ভীর ভাবে বলল, "হুঁ! হরিণের শিং গুঁড়ো করে সাপের রক্ত দিয়ে বেশ ভাল ভাবে বেঁটে খাওয়াতে হবে।" তার পরে লির খাস ভৃত্য ওয়াংকে বললে, "কখনও যেন বাবুকে একা ফেলে কোথাও যেও না। যে কোনও মুহূর্তে বাবু পাগল হয়ে যেতে পারে।"

ডাক্তারের কথাবার্তা মোটেও পছন্দ করল না লি। দারুণ রাগে সে দু'চোখ বুজে শুয়ে রইল। সেই ফাঁকে ভৃত্যও ভাবল একটু আড্ডা দিয়ে আসা যাক।

মিনিট দশেক বাদে লি হঠাৎ অস্থির হয়ে চীৎকার করতে লাগল, "উঃ, শরীর জ্বলে গেল আমার! জল, জল! আমাকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়ে দাও। ওয়াং! এই ব্যাটা ওয়াং!"

কোথায় ওয়াং! শেষে মরীয়া হয়ে লি নিজেই উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। বিড় বিড় করে বলতে লাগল, "ওঃ, দুনিয়াটাই এমনি স্বার্থপর! চাকরটা বোধ হয় চণ্ডু পান করছে। আর বন্ধু সিং নিজের কামরায় সুখে নিদ্রা দিচ্ছে। নাঃ,, জগৎটাই এমনি!" বলতে বলতে কোন রকমে লি বাসার পেছনে ছোট খালের পাড়ে এসে হাজির হ'ল। জল দেখে তার আনন্দ আর ধরে না। তাড়াতাড়ি খালের মধ্যে নেমে পড়ে হাত-মুখ-মাথা ভিজাতে লাগল। দূর্‌, জলটা যদি গভীর হ'ত তবে ভাল করে সাঁতার দিয়ে স্নান করা যেত। এক কাজ করা যাক্‌, বাড়ীর বড় পুকুরের জলে গিয়ে

ঝাঁপ দিয়ে পড়া যাক্। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সাঁতার দিতে দিতে নিজের মনেই বলে উঠল লি, "আঃ, কী আরাম! সারা জীবন যদি এই রকম জলের মধ্যে থাকতে পারি তো আর কিছুই চাই না।"

এই কথা শুনে তার পায়ের কাছ থেকে কে যেন হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, "বটে! তা হলে আর কিছু চাও না, না?"

এক লাফে দূরে সরে গেল লি। পায়ের দিকে ভাল করে নজর দিয়ে দেখে একটা বিশ্রী কালো মাছ তার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে হাসছে। দেখে লি ভয়ানক চটে গেল। বলল, "তবে রে! তুই আমাকে হঠাৎ এ রকম বিশ্রী ভাবে চমকে দিলি? জানিস্ চীনা বিনয়-শাস্ত্রে এ ধরণের অসভ্যতার কী ভীষণ নিন্দে করেছে?"

মাছটা আরো জোরে হেসে উঠে বলল, "তোমাদের শাস্ত্রের আমি তো ভারী তোয়াক্কা করি!"

লি বললে, "তা অমন বিশ্রী ভাবে হাসবার কী হ'ল?"

মাছটা বললে, "তা হাসব না তোমাদের মত বিদঘুটে জীব—যারা নিজেদের মানুষ বল—মনে কর দুনিয়ায় তোমাদের মত বুদ্ধিমান্ কোথাও আর মেলে না—দুনিয়ার সব কিছুই তোমাদের জানা হয়ে গেছে! অথচ কেমন করে সব জানা হয় তা-ই তোমরা জান না।"

"না না, তুমি বোধ হয় জাপানীদের কথা বলছ। আমরা, চীনারা, ভাল ভাবে না বুঝে-সুঝে কোনো কাজে হাত দিই না।"

"শোনে কথা! তাই যদি হবে তবে সারাজীবন তোমার জলের মধ্যে থাকবার ইচ্ছেটা হ'ল কেমন করে? জলের খবর কী জান তুমি? সাঁতার দেবার মত আয়োজন-পত্তর আছে তোমার শরীরে? সারাজীবন জলে থাকতে পারবে তুমি?"

"কেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না আমি সাঁতার কাটছি? মাথার মধ্যে গোল গোল চোখ দুটো তোমার আছে কি জন্যে?"

"তা দেখতে পাচ্ছি বটে!" মাছটা আবার ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে হাসতে লাগল।—"একটা মোষের মত জল তোলপাড় করছ বটে!"

শুনে লি এমন রেগে গেল যে কথাই বেরুল না। এ রকম অভব্য কথা কেউ বলতে পারে তা সে ভাবে নি কোনো দিন। মাছটা কিন্তু নির্বিকার ভাবে বলে চলল, "তা ছাড়া, ধর, তোমাদের নিঃশ্বাস নেবার ব্যবস্থা। ও একেবারেই অচল। জলের নীচে তোমার যে-অবস্থা হবে, আমার বোধ হয় গাছের উপরেও তেমনটা হবে না।

তার পরে, জলের মধ্যে থাকতে হলে কী খাবে তুমি? নাকি খাবার জন্যে বার বার ডাঙ্গায় ছুটবে? নাঃ, জল-জগতের উপযুক্ত কোনো কিছুই তোমার নেই। তোমার ঐ পোশাক, তা কি জলের নীচেও চলবে মনে কর? ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়ে মারা যাবেযে! জান তো, মাছের বিশেষত্ব আঁশে; তোমার আঁশ আছে? তোমাদের চামড়া আছে বটে, কিন্তু কেবল নখগুলি ছাড়া আর কোথাও কোনো ঢাকনা নেই। তবেই বোঝ, তোমার আজগুবি মতলব শুনে হাসব না কেন?"

তাই তো! মানুষ হবার যে এত অসুবিধা তা তো লি কোনো দিন ভেবে দেখে নি! এখন এই সব যুক্তি শুনে মানুষের অক্ষমতা সে হাড়ে হাড়ে টের পেল। শুধাল, "মাছ হয়ে তুমি কি খুব সুখে আছ? একবারও মানুষ হবার ইচ্ছা মনে আসে না?"

শুনে রাগের চোটে জলের মধ্যে গোটা কতক ডিগবাজি খেয়ে মৎস্যপুঙ্গব বললে, "আমি? মানুষ হব! এমন অসম্মানের কথা মনে আনতে পারলে? জান আমি কে? আমি হলাম গিয়ে স্বয়ং মৎস্যরাজের একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র।"

লি বিনীত ভাবে বললে, "তা দেখুন, কুমার বাহাদুর! আপনি যদি আমার হয়ে মহারাজের কাছে ওকালতি করেন তবে আমি চিরকাল আপনার কেনা হয়ে থাকব। আপনি কি মনে করেন তিনি কোনো রকমে আমাকে মাছ বানিয়ে তাঁর প্রজা-দলে নিতে রাজী হবেন?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! মহারাজের ইচ্ছে হলে সবই সম্ভব। জানো না, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ড্রাগনের বংশধর? তাঁর মৃত্যু নেই। জাপানের সম্রাটের মত আমাদের মহারাজ অমর। এসো আমার সঙ্গে।" ব'লে মৎস্যকুমার তিড়িক তিড়িক করে জলের মধ্যে এগিয়ে চলল। লি বহু কসরৎ করে কোন মতে চলল তার পিছনে পিছনে। সে ভেবেছিল সে খুব ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু মাছের সঙ্গে পাল্লায় না পেরে শেষটায় বিনীত ভাবে বললে, "একটু আস্তে চলুন, কুমার বাহাদুর! আপনি কি ভুলে গেলেন যে আমি এখনও মানুষই আছি?"

পুকুরের আর এক প্রান্তে এসে লি দেখে বিরাট এক রুই মাছ আয়েসে গা ভাসিয়ে নিজের মনে কানকো নাড়ছে। তার চারিদিক্ ঘিরে কর্মচারী-মাছেরা বিনীত ভাবে অপেক্ষা করছে মহারাজের যে-কোন হুমুক তামিল করবে বলে। একজন সভাসদ্ মহারাজের কাছে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের আগমন-বার্তা নিবেদন করলে। রাজা তাঁর ভাইপোর দিকে মুখ ফিরিয়ে শুধালেন "তোমার সঙ্গে ওটা আবার কে হে? আজকাল দেখছি অদ্ভুত সব আজেবাজে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও তুমি।"

"না মহারাজ! এ বেচারা একটা মানুষ। আপনার কাছে কিছু প্রার্থনা আছে।"

"মানুষের প্রার্থনা মাছের কাছে! বল কি হে? সে তো শুধু কর্তন ও রন্ধনের প্রার্থনা।"

শুনে লি সসম্ভ্রমে তিনবার 'কাও তাও' করে রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে তার প্রার্থনা জানালে। মাথা নীচু করতে করতে তার মুখে কাদা লেগে গেল।

রাজা কিছুক্ষণ নিজের মনে ভেবে দেখলেন। লোকটা বোধ হয় গুপ্তচর নয়। শেষে বললেন, "বেশ বাপু, বেশ, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর। এখন তোমার অভিবাদনটা একটু থামাও। ঘুলিয়ে যে একেবারে কাদা করে ফেললে! এতে যে হাঙ্গরের বাসা অবধি চূণকাম হয়ে যাবে।"

শুনে লি ভারী লজ্জা পেল। রাজা কাৎলাকে ডেকে বললেন, "এর জন্যে মাপ সই মাছের চামড়া নিয়ে আসুন ত'?"

কাৎলা মশাই 'যে আজ্ঞে' বলে কাৎ হয়ে এক দৌড় দিলেন। আঁশটে চামড়া এল, লির মাথা থেকে পা পর্যন্ত মুড়ে দেওয়া হ'ল। হাত দুটো কুঁকড়ে হয়ে গেল কানকো, পা দুটো জোড়া লেগে হয়ে গেল ল্যাজা। পরম পরিতোষের সঙ্গে লি ভাবলে, 'যাক্, আমার হাত-পা ছুঁড়বার দিনের অবসান হ'ল। এই ভেবে লেজ আর কানকো দুলিয়ে তার নূতন জীবনটাকে পরখ করে দেখতে লেগে গেল।

রাজা বললেন, "আস্তে হে, আস্তে। অত তাড়াহুড়ো কোরো না। আগে গুটি কতক উপদেশ শুনে নাও।

"আমাদের মৎস্যঋষির বাণী। তিনি বলেছেন, ক্ষুধার্ত মাছ বিপদে পড়ে। তাই সব সময়ে দুটো কথা মনে রাখতে হবে। যে-সব পোকা জলের ওপর থেকে ঝুলে আছে দেখবে, যতই লোভ হোক—যতই খিদে থাক, কখনো তা ছোঁবে না; কারণ সহজ খাবারের পিছনে থাকে কঠিন বঁড়শী। আর যখন কোনো জালের ছায়া দেখবে তখনি খাবার-দাবার সব ফেলে চোঁ-চাঁ সাঁতার লাগাবে। বুঝেছ?"

এই বলে মহারাজ তাকে ভাঁড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে পেট পূরে শামুকের শুক্তো আর কেঁচোর চাটনি খাবার পর মহারাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে লি বিদায় নিল। প্রথমটায় লেজ আর কানকো ঠিক মত কায়দা করে চালাতে তার অসুবিধা হচ্ছিল। লেজের এক ঝাপটায় হুশ করে এতদূর চলে যায় যেটা সাঁতরে যেতে আগে তার অনেকক্ষণ লাগত। কানকো যদি একটু বেশী নাড়া যায় তবে ডিগবাজী খেতে হয়। লি ভাবলে, তার এই আনাড়িপনা দেখে মাছেরা বলবে কি! এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে বেশ সন্তর্পণে সে মৎস্যগতি আয়ত্ত করতে লাগল।

এমনি করে কতক্ষণ কেটেছে কে জানে! এক সময়ে তার খেয়াল হ'ল আগের খাবার কখন হজম হয়ে গিয়ে এখন ফের বেশ খিদে পেয়ে গেছে। তাই ত', খাবার কোথায় মেলে সেটা ত' জেনে নেওয়া হয় নি কুমার বাহাদুরের কাছে! এদিক্-সেদিক্ ঘুরে কাদা ঘেঁটে, নুড়ি উলটে সে খাবার খুঁজতে লাগল। শ্যাওলার মধ্যে ডুব মারল, জলের উপরে ভাসল, কিন্তু খাবার পেল না কোথাও।

খিদের চোটে যখন লি প্রায় সন্তরণশক্তিরহিত, তখন হঠাৎ উপরের দিকে চোখ পড়তেই দেখে, আহা, কী সুন্দর একটা কেঁচো ভাসছে। যেমন রং তেমনি পুরুষ্টু। হাঁ করে সেদিকে এগোতে গিয়েই মহারাজের উপদেশ-বাণী মনে পড়ে গেল,—যতই লোভনীয় হোক, যে পোকা ঝুলছে তা কখনোই খেতে নেই। খাবে কি খাবে না ভাবতে ভাবতে সে পোকাটার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। নাঃ, খিদের সময়ে কি অত-শত বিচার করা যায়? এমনও ত' হতে পারে ওটা বঁড়শীর টোপ নয়, শুধুই একটা কেঁচো। তা ছাড়া সব সময়েই যে টোপে মাছ পড়ে না সেটা মানুষ থাকাকালে জানতে ত' তার আর বাকি নেই!

সুতরাং আর দ্বিধা নয়। পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ! কোঁৎ করে গিলে ফেলল কেঁচোটা। আঃ, কী নরম, কী স্বাদ! কিন্তু—উস্! এটা কী? কাঁটার মত লাগে যে! এই যা! এটাই বুঝি বঁড়শী রে! বিরাট একটা ঝট্‌কা মেরে ভাবলে পালাই। কিন্তু কি একটা যেন তার টাগরায় আটকে আছে, ছাড়ানো যাচ্ছে না। যতই সে নীচের দিকে গোঁত্তা মারে ততই উঠে যায় উপরের দিকে। যত টানাটানি করে, কাঁটাটা তত শক্ত হয়ে আটকে যায়।

শেষে জোরে এক টানের সঙ্গে লি এসে হাজির এক নৌকোর পাটাতনে। "কী বিরাট একটা মাছ রে!"—চেনা গলার এক চীৎকার কানে এল তার। তাকিয়ে দেখে বুড়ো চাং,—যে কিনা তার জন্যে রোজ মাছ এনে দেয়। এখন তাকেই মাছ ভেবে তুলে সে দিব্যি খুশী হয়ে উঠেছে। বুড়ো চাংকে তার পরিচয় জানিয়ে দিলেই ত' সে এখুনি ছাড়া পেয়ে যাবে। তার পরে—রাম বল!—জীবনে সে আর বঁড়শী ছোঁবে না।

"চাং ভায়া!"—লি বললে, "ও চাং ভায়া! দেখতে পাচ্ছ না, মাছ ভেবে কা'কে ধরেছ তুমি? আমি লি, তোমারই মুরুব্বি লি! তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার এই ভুলের জন্যে তোমাকে এবারকার মত মাপ করব, কারণ তুমি কেমন করে জানবে যে আমিই লি? এখন শাগ্‌গির ছেড়ে দাও।"

কিন্তু চাং নির্বিকার। টান মেরে মুখ থেকে বঁড়শীটা খুলে নিল, তার পরে

ছুঁড়ে ফেলল অন্য মাছের গাদার মধ্যে। এদিকে যে লির ঠোঁট কেটে গেল তা'তে ভ্রূক্ষেপ নেই। লি চিঁ-চিঁ করে বললে, "ও কী হচ্ছে চাং? শুনতে পাচ্ছ না? আমার যে দম আটকে আসছে!"

কা কস্য পরিবেদনা! চাং ধীরে-সুস্থে ডাঙ্গায় এসে উঠল, একে একে সব মাছগুলিকে গাদা করে নিল একটা চুবড়ির মধ্যে, তার পরে রওনা দিল। চুবড়ির মধ্যে সে কী কষ্ট! মোটে কয়েক ফোঁটা জল, তায় এর ঘাড়ে ও! কোনো মতে শ্বাস-প্রশ্বাস বজায় রেখে বেঁচে রইল লি।

খানিক পরে—ও মা!—তার নিজের বাড়ীতেই এনে হাজির করেছে তাকে! ঐ ত' তার বন্ধু সিং দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে চীৎকার করে বলে উঠল লি, "সিং, ও ভাই সিং! বাঁচাও আমাকে। এই ব্যাটা কচ্ছপের বাচ্চা চাং আমাকে খুন করতে নিয়ে এসেছে। ঐ মাছগুলোর সঙ্গে আমাকেও ধরে নিয়ে এসেছে। বুঝতেই পারছে না যে আমি লি। ওকে বল আমাকে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে আসুক। জলের মধ্যে কী সুন্দর ঠাণ্ডা! তাই আমি সেখানেই থাকব বলে স্থির করেছি।"

কিন্তু সিংও নির্বিকার! তার কথা যেন শুনতেই পায় নি! চাং সিংকে দেখে তখন বলছে, "হুজুর, আজকের মাছগুলো দেখুন। এ রকম বড় মাছ আমি আর কখনো পাই নি।" এই বলে লেজ ধরে লি-কে উঠিয়ে, বললে আবার, "আপনি আর লি সাহেব এটা রাখুন। লি সাহেব বড় খুসী হবেন।"

এই কথা শুনে লি লাফালাফি করে উঠল, বলল, "ব্যাটার আস্পদ্দা দেখ! আমার মাংস আমাকেই খাওয়াতে চায়! সিং, তুমি কি দেখছ না কত বড় ভুল হয়েছে? এদিকে আমি যে মারা গেলুম! আমাকে ছেড়ে দাও, শুধু বাঁচিয়ে দাও আমাকে। আমার সব টাকা আমি তোমাকে দেব।"

"আরে আরে! মাছটা কি কথা বলছে?" ঝুঁকে পড়ল সিং। চাং বললে, "ষাট বচ্ছর বয়স হ'ল আমার হুজুর! পাখীর কথা শুনেছি, কোনো কোনো জন্তুতেও নাকি কথা বলে, কিন্তু মাছ কথা বলে তা ত' কখনো শুনি নি, হুজুর!"

আর কথা না বাড়িয়ে বুড়ো চাং তাকে ধরে সোজা রান্নাঘরে হাজির। এক ঝটকায় তার হাত ছাড়িয়ে লি গিয়ে পড়ল তার বহুকালের পুরানো বিশ্বাসী রাঁধুনীর পায়ে। চীৎকার করে বলতে লাগল, "আমাকে বাঁচাও, রক্ষা কর আমাকে। আমি মনিব হয়ে তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে এস। তোমার আজীবন মোটা পেন্‌শনের বন্দোবস্ত করে দেব আমি। চাং বুড়োটার ভীমরতি হয়েছে, আমাকে চিনতেই পারছে না। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।"

রাঁধুনীও বললে, "আরে! মাছটা কি কথা বলছে না কি? দূর ছাই! মাছে আবার কথা বলে নাকি? সেকেলে বুড়ী ছাড়া কে আর এ কথা বিশ্বাস করবে?" এই বলে লি-র লেজ ধরে আছড়ে ফেলল টেবিলের উপরে, বললে, "এত বড় মাছটা কাটতেও সময় লাগবে, দেরি হয়ে যাবে রান্নার। এস বাছাধন!" বলে একটা বাঁটি নিয়ে এল।

"আরে! খুন করবে নাকি? মনিবকে খুন!" গর্জন করে উঠল লি।

"তোমার কথা বলা বার করছি আমি।" বলে রাঁধুনী লিকে ধরে বাঁটির উপরে এনে দিলে এক চাপ।

আর্তনাদ করে জেগে উঠল লি। উঠে বসল। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে ঘামে। যাক্, সবটাই তাহ'লে স্বপ্ন! আসলে সে মাছ হয়ে যায় নি। বরং, সে দেখল, তার অসুখটা একেবারে সেরে গেছে। আর মাথা ঘোরা নেই, গা বমি বমি নেই। তাহ'লে রাত্তিরের খাবারটা সে খেতে পারবে। স্বপ্নের সেই বিরাট মাছটার কথা মনে পড়ল—জিভে জল এসে গেল তার। ভুলেই গেল, সে-মাছ রান্না হলে তাকে আর খেতে হ'ত না।

পলটুর পলায়ন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

রসময়বাবু হতাশা-ভরা স্বরে বললেন, "পণ্টু আবার পালিয়েচে! নাঃ, একে নিয়ে আর পারা গেল না।"

ঠিক তখনি পণ্টু ঘরে ঢুকলো, বগলে বই-শ্লেট।

রসময়বাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, "হতচ্ছাড়া ছেলে! কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

"মাণকের সঙ্গে কনসাল্‌ট্ করে পড়তে।"

"কি! কি বললি? কনসাল্‌ট্ করে পড়তে?" রসময়বাবু হাসবেন কি রাগবেন বুঝতে পারলেন না।

পলটু পড়ে ক্লাস টুতে। মাণকে তার সহপাঠী। দু'জনে সত্যিই কনসাল্‌ট্ করে পড়ছিল। কোন্ বানানটা কঠিন, কোন্ বানানটা সহজ, কোন্ বানানটা স্যার ধরবেন না, এ নিয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে সত্যিই কনসাল্‌ট্ করে মাত্র চারটি বানান মুখস্থ করেছিল।

রসময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কনসাল্‌ট্ মানে জানিস্?"

"হুঁ। বলাবলি করা।"

"কনসাল্‌ট্‌ করে পড়তে হয় কার কাছে শিখেচিস্‌?"

"দাদা-দিদি যে ওদের বন্ধুদের সঙ্গে কনসাল্‌ট্‌ করে পড়ে?"

রসময়বাবু কি যে বলবেন প্রথমটা ঠিক করতে পারলেন না। শেষে বললেন, "তোমার পড়া সহজ। যখন ওদের মতো মোটা মোটা বই পড়বে তখন কনসাল্‌ট্‌ করো। এখন একা একা পড়বে।"

"সন্ধ্যেবেলা একা পড়তে আমার ভয় করে।"

"কিসের ভয়?"

"চোরের।"

"চোরের? চোর তোমার কি করবে?"

"তা জানি নে।"

"তবে?"

"সকলে যে চোরের ভয় করে।"

"সে চুরি করবে বলে।"

"চুরি না করলে ভয় নেই?"

"না।"

"তাহ'লে পিসীমা সেদিন রাত্রে চেঁচিয়ে উঠেছিল কেন? চোর তো কিছুই চুরি করে নি!"

"অন্ধকারে অচেনা কাউকে দেখলে ভয় করে বৈকি!"

"তবে আমার ভয় করবে না কেন?"

"ও ঘরে অন্ধকার কোথায়?"

"ঐ যে জানলার বাইরে।"

জানলার বাইরে দেখা যাচ্ছিল পাশের বাড়ির বেলগাছটিকে।

রসময়বাবু বললেন, "জানলা বন্ধ করে দেবে।"

"যদি জানলা ভেঙে ঢোকে?"

"আঃ, পলটু! কথা বাড়িও না। যাও—না, দাঁড়াও,—কি পড়েছো?"

"স্যার যেগুলো ধরবেন।"

"কোন্‌গুলো স্যার ধরবেন কি করে জানলে?"

"স্যার কঠিন বানান ধরেন।"

"কোন্‌ বানানগুলো কঠিন?"

এমন সময়ে মা ডাকলেন। পলটু উত্তর দিল, "যাই" এবং যেতেও উদ্যত হলো।

রসময়বাবু বললেন, "দাঁড়াও, আগে আমার কথার উত্তর দাও!"

"কিন্তু মা যে ডাকচে! সে দিন মায়ের ডাক শুনে যাই নি বলে দাদা গাঁট্টা লাগিয়েছিল।

জায়গাটা সুপুরীর মতো ফুলে উঠেছিল। দাদা বলেছিল, ফের যদি মায়ের অবাধ্য হও তো উইকেট পেটা করবো।"

রসময়বাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, "আচ্ছা, শুনে শীগ্‌গির এস।"

"মা যদি মাসীর বাড়ী পাঠায়?"

রসময়বাবু আবার ধমক দিলেন, "ফের জ্যাঠামো হচ্চে?"

পলটু ম্লান মুখে চলে গেল। সে বুঝতে পারলো না কি অন্যায় করেচে এবং জ্যাঠামো কথাটার মানে কি। সে শুনেচে, তার এক জ্যাঠা আছেন বটে কিন্তু তিনি থাকেন ধুবড়ীতে? তাঁকে সে কোন দিন দেখে নি, কথা শোনা তো দূরের কথা। তিনি কি তার মতো কথা বলেন। নিশ্চয়ই বলেন, না বললে বাবা ধমক দেবেন কেন? জ্যাঠাকেও বাবার ধমক খেতে হয়।

পলটু মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মা বললেন, "কি করছিলে? সকালে না পড়ে কোথায় গিয়েছিলে?"

পলটু বললে, "বাবার কাছে পড়ার কথা বলছিলাম।"

দিদি বললে, "না মা, ও মাণকেদের বাড়ি গিয়েছিল।"

মা বললেন, "তবে যে বললে পড়ার কথা বলছিলে?"

"বলছিলাম কি না বাবার কাছে জিজ্ঞেস করবে চল। চল—চল" — বলতে বলতে পলটু দিদির হাত ধরে সজোরে টানতে লাগলো। তার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো।

রাগ রাগকে জাগায়। দিদিরও রাগ হলো; বললে, "বেশ, চল্‌। যদি প্রমাণ না করতে পারিস তো গালে ঠাস্‌ ঠাস করে চড় বসিয়ে দেব।"

অতঃপর দুজনে বৈঠকখানায় এসে দেখে বাবা নেই, হরিয়া ঝাঁট দিচ্চে। ভৃত্যটি নূতন।

পলটু তাকে জিজ্ঞেস করলে, "এই! বাবু কোথায়?"

হরিয়া বললে, "কোন্‌ বাবু?"

"বড়বাবু।"

"বড়বাবু নেই।"

দিদি জিজ্ঞেস করলে, "তুই কতক্ষণ আগে বড়বাবুকে দেখেচিল্‌?"

"দেখি নি।" বলে হরিয়া ঘরের কোণ ঝাঁট দিতে লাগলো।

দিদি পলটুকে বললে, "এবার কি হবে? বাবা এখানে ছিলই না—"

"কী! আমি মিছে কথা বলচি" বলতে বলতে পলটু রাগে, দুঃখে কেঁদে ফেলল। এবং এক হ্যাঁচকা টানে দিদির হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। দিদি বিজয়গর্বে ফিরে চললো মায়ের কাছে।

ঘটনাটি এই। তারপর পলটুকে আর দেখা গেল না এবং বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। সে যেখানে যেতে পারে ও যেখানে যেতে পারে না সব জায়গাই দেখা হলো, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। ছ-সাত বছরের একটা ছেলে যে অভিমানবশে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে এ কথা কেউ ভাবতেই পারে না। সে বড় জোর খাটের তলায়, চিলেকোঠায়,

আলমিরার পাশে, দরজার পাল্লার আড়ালে বা ঐ ধরণের কোন গুপ্ত স্থানে দাঁড়িয়ে, শুয়ে বা বসে কাঁদতে পারে, ঘুমিয়ে পড়াও অসম্ভব নয়। তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়।

পলটু নিরুদ্দেশ হওয়ার ফলে তার দিদি নিজকে ভাবতে লাগলো দোষী। সে ঠাকুর-দেবতাকে ডাকতে লাগলো, পলটুকে ফিরে পাবার জন্যে মানৎ করলে। এবং তার এক একবার ইচ্ছা হতে লাগলো রাস্তায় রাস্তায় তাকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু এই বিশাল নগরের লোকারণ্যে সেই একরত্তি মানুষটিকে কোথায় দেখতে পাবে? এখানে তার মতো গায়ে নীল রঙের হাতকাটা শার্ট, পরনে চাঁপা রঙের হাফ-প্যাণ্ট, পায়ে স্লিপার, ফুটফুটে, চটপটে ছেলে আরও কত আছে! তবুও—তবুও তার যা বৈশিষ্ট্য আছে তা আর কারো নেই। সবারই বৈশিষ্ট্য থাকে। তাই দেখেই মানুষ মানুষকে চেনে। তার দিদি রাস্তার ধারে জানালাটিতে ব্যাকুল চোখে দাঁড়িয়ে রইলো। আর তাদের মা-বাবার কথা বিশেষ করে নাই বা বললাম। পাঠকেরা সকলেই তাঁদের অবস্থা বুঝতে পারচে।

বেলা তখন বারোটা—হাঁ, বারোটাই—কারণ চটকলের ভোঁ শোনা গেল। শ্রমিকদের খাবার সময় হলো। পলটুদের বাড়িতে যাঁরা আফিসের বাবু তাঁরা আফিসে চলে গেছেন, যাঁদের ঘরে থাকবার কথা তাঁরা তখনও খান নি। কারণ কারোই খাবারে রুচি নেই। রসময়বাবু দিন কয়েকের ছুটি নিয়েচেন। পলটুরও সেদিন ইস্কুলের ছুটি। রসময়বাবু ভাবচেন থানায় খবর দেবেন কিনা। নিজেরা তো অনেক খুঁজলেন, এবার পুলিশেও খুঁজুক।

পলটুর দিদি আর থাকতে পারলো না, মন খুলে কাঁদবার জন্যে ছাদে উঠে গেল। চিলে-কোঠার ঘুলঘুলি দিয়ে মাণকেদের বাড়ির দোতালার দক্ষিণের ছোট ঘরখানির ভেতরটা পর্যন্ত দেখা যায়। ঐ ঘরে পলটু, মাণকে ও তাদের সাথীদের কেউ কেউ খেলা করে। পলটুর দিদি কুঠুরিটার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গিয়েই দেখে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। এমন তো কখনও হয় না! সে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। পলটু যে ঐ কুঠুরিটাতেই পালিয়েছে সে বিষয়ে তার একটুও সন্দেহ রইলো না। সে বলতে লাগলো—"পলটু, শীগগির দরজা খোল্। বাড়িশুদ্ধ সকলে তোর জন্যে কলকাতার শহর তোলপাড় করচে আর তুই কিনা—" বলে দরজায় ধুম্ ধুম্ করে কয়েকটা ধাক্কা দিল। তবুও দরজা খুললো না। একটা কথা মনে করে পলটুর দিদির বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো। ও যদি তাই করে থাকে!

সে সিঁড়ি দিয়ে চীৎকার করতে করতে নামতে লাগলো—"তোমরা শীগ্গির এস। পলটু চিলেকোঠার কুঠুরিতে কি কাণ্ড করেচে!"

"কি কাণ্ড করেচে রে?" বলতে বলতে পলটুর মা-বাবা এবং বাড়িশুদ্ধ সকলে ভৃত্য হরিয়া সমেত ছাদে উঠে এলেন। আবার কুঠুরিটার দরজাতে কয়েকটা জোর ঘা পড়লো। প্রতি আঘাতে দর্শকদের বুক কাঁপতে লাগলো এবং শেষে দরজাটার ছিটকিনি গেল ভেঙে, পাল্লা গেল খুলে। দেখা গেল জনশূন্য কুঠুরি, কেবল ভাঙা ও পুরোনো কাঠকুটোগুলো এক কোণে যেন মরমে মরে জড়সড় হয়ে পড়ে আছে।

তখন সকলেরই মুখে এক কথা —"ঘরে কেউ নেই অথচ দরজা বন্ধ হলো কি করে?"

রাত-বিরেত হলে ভূত কল্পনা করা যেতে পারতো। তবুও রসময়বাবু বললেন, "কাঠগুলো একধারে সরিয়ে রাখ্ হরিয়া! ওগুলোর তলায় যদি—" তিনি আর বলতে পারলেন না।

কিন্তু হরিয়ার তাতে উৎসাহ দেখা গেল না। রসময়বাবুর কেমন সন্দেহ হলো, একটু ধমকের স্বরে বললেন, "সরিয়ে রাখ্।"

হরিয়া অগত্যা কাঠকুটো সরিয়ে রাখতে রাখতে বেরিয়ে পড়লো, পলটুর দেহ নয়,—এক বাণ্ডিল বিড়ি, এক প্যাকেট সিগারেট ও একটি দেশলাইয়ের বাক্স। পলটুর বাবা বুঝলেন, জিনিষগুলির মালিক শ্রীহরিয়া এবং ঐ কুঠুরিটি হয়েচে তার "স্মোকিং রুম্"। কিন্তু দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ হলো কি করে?

"কি করে বন্ধ করেছিলি?"

"বাইরে থেকে শিকল ধরে খুব জোরে টেনেছিলাম।"

"আর কাঠের ছিটকিনিটা পড়ে গেচে, নাঃ! পুলিশেই খবর দিতে হবে।" বলে পলটুর বাবা নীচে নেমে এলেন এবং একটু পরেই চীৎকার করে উঠলেন, "পলটু ফিরে এসেচে— এই যে—!"

সকলে দুড় দুড় নেমে গেলেন পলটুর শুকনো, উস্কোখুস্কো চেহারা কল্পনা করতে করতে। কিন্তু গিয়ে দেখেন পলটু দিব্যি সপ্রতিভ ও উজ্জ্বল। সঙ্গে মামাতো ভাই সন্তুদা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একখানি নতুন মোটর সাইকেল।

সন্তুদা পলটুর বাবাকে তখন বলছিল, "ও বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এল আমার সাইকেলের একেবারে সামনে। আর একটু হলেই অ্যাকসিডেণ্ট হোত। ভাগ্যে তখন স্পীড ছিল কম। যাচ্ছিলাম মানকুণ্ডু। ও বায়না ধরলো—ক্যারিয়ারে চড়াও সন্তুদা! ছুটতে লাগলো পিছু পিছু। নিলুম চড়িয়ে। চললুম মানকুণ্ডু। একবারও মনে হলো না আপনাদের জানানো দরকার। মনে করেছিলুম দশটার মধ্যে ফিরবো। কিন্তু দেরি হয়ে গেল।"

"আর আমরা ওকে শহর তোলপাড় করে খুঁজচি— কত সম্ভব-অসম্ভব কথা ভাবচি। এর জন্যে দায়ী ও।" বলে রসময়বাবু কটমট করে পলটুর দিকে তাকালেন।

সন্তু বললে, দোষ আমারই পিসেমশাই! আমার কেয়ারফুল হওয়া উচিত ছিল।"

পলটুর মা বললেন, "নাও—ঢের হয়েচে। এবার খাবে চল।"

সন্তু বললে, "ও পুকুরে নেয়েচে। মাংস-ভাত খেয়েচে পিসীমা!"

"ও! গিলেকুটেও আসা হয়েচে? ধন্যি ছেলে!"

মানুষ ক্ষণেকে কাঁদে ক্ষণেকে হাসে। যা হোক, তার সব ভালো যার শেষ ভালো। অতঃপর পলটু সেদিনের ইন্সাল্টের পর আর কখনও কন্সাল্ট করে পড়তে যায় নি এবং তার দিদিও, পলটু আবার যদি নিরুদ্দেশ হয় এই ভয়ে, মানৎটাও তুলে রেখেচে বলে শুনেচি।

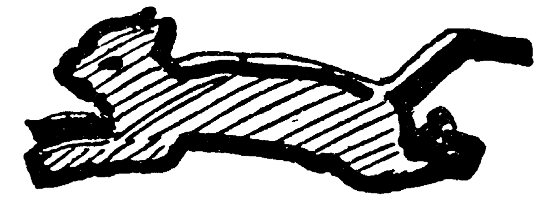

রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশে

শ্রীমঞ্জুশ্রী বসু (মিত্র)

সিনেমা কোম্পানীগুলোর কৃপায় ছেলেবেলায় মনে করতাম আমেরিকার আদিবাসী অর্থাৎ রেড ইণ্ডিয়ানরা বুঝি সবাই নরখাদক অশিক্ষিত জাত, কিন্তু এখানে এসে সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। মনে হচ্ছে, সিনেমাওয়ালারা পয়সা তোলার জন্য কী না করে!

সেদিন এখানকার আদিবাসীদের ঘরদোর দেখে এলাম। বেশ ভালো লাগলো। অনেক নতুন কথাও জানতে পারলাম। 'এন্থ্‌পলজী' (নৃতত্ত্ব) ক্লাসে মাস তিনেক ওদের সম্বন্ধে একটু পড়াশোনাও করেছিলাম। এখানে, ওদের দেশের গল্প বলবার আগে, ওদের ইতিহাস সম্বন্ধে একটু যদি বলে নিই তবে বোধ হয় তোমাদের ভালই লাগবে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে রেড ইণ্ডিয়ানদের সংস্কৃতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বহু—বহুদিন আগে ওরা এশিয়ার উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়ে একদিন আমেরিকায় এসে পড়ে এবং ক্রমশঃ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এদের মধ্যে বহু দল - বহু গোষ্ঠী ছিল। গোড়ার দিকে অবশ্য সকলেই ছিল যাযাবর—থাকবার নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না কারো,—ঘুরে ঘুরে বেড়াত আর পশু শিকার করে দিন গুজরাণ করত। তার পর কোন কোন গোষ্ঠী চাষবাস সুরু করল, কেউ বা মাছ ধর, মাটীর বাসন তৈরী, কাপড় বোনা ইত্যাদি কাজে মন দিল। কোন কোন গোষ্ঠী ছিল ভীষণ লড়াইবাজ, আবার ঠিক উল্টো ধরণের শান্তিপ্রিয় দলেরও অভাব ছিল না। এরা সমস্ত দেশ যুড়ে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে একের সঙ্গে অপরের কোন যোগাযোগই ছিল না। তা ছাড়া দেশটাও তো কম বিরাট নয়! ফলে এক অঞ্চলের লোকেরা যখন ধাতু-টাতু আবিষ্কার ক'রে, আর তা নানা কাজে লাগিয়ে, দস্তুরমত প্রতি-

পত্তিশালী—শক্তিশালী জাত হয়ে উঠল, তখন অন্য অঞ্চলে হয়তো সে খবরই গিয়ে পৌঁছল না।

যারা শক্তিশালী হ'ল তারা দেখতে দেখতে বিরাট রাজ্যও স্থাপন করলো। চার পাশের লোকেরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করল এবং তার প্রমাণ স্বরূপ থরে থরে উপহার এনে দিতে লাগল।

মেক্সিকোতে এই রকম এক বিরাট রাজ্যের রাজধানী বসিয়েছিল আজটেক্

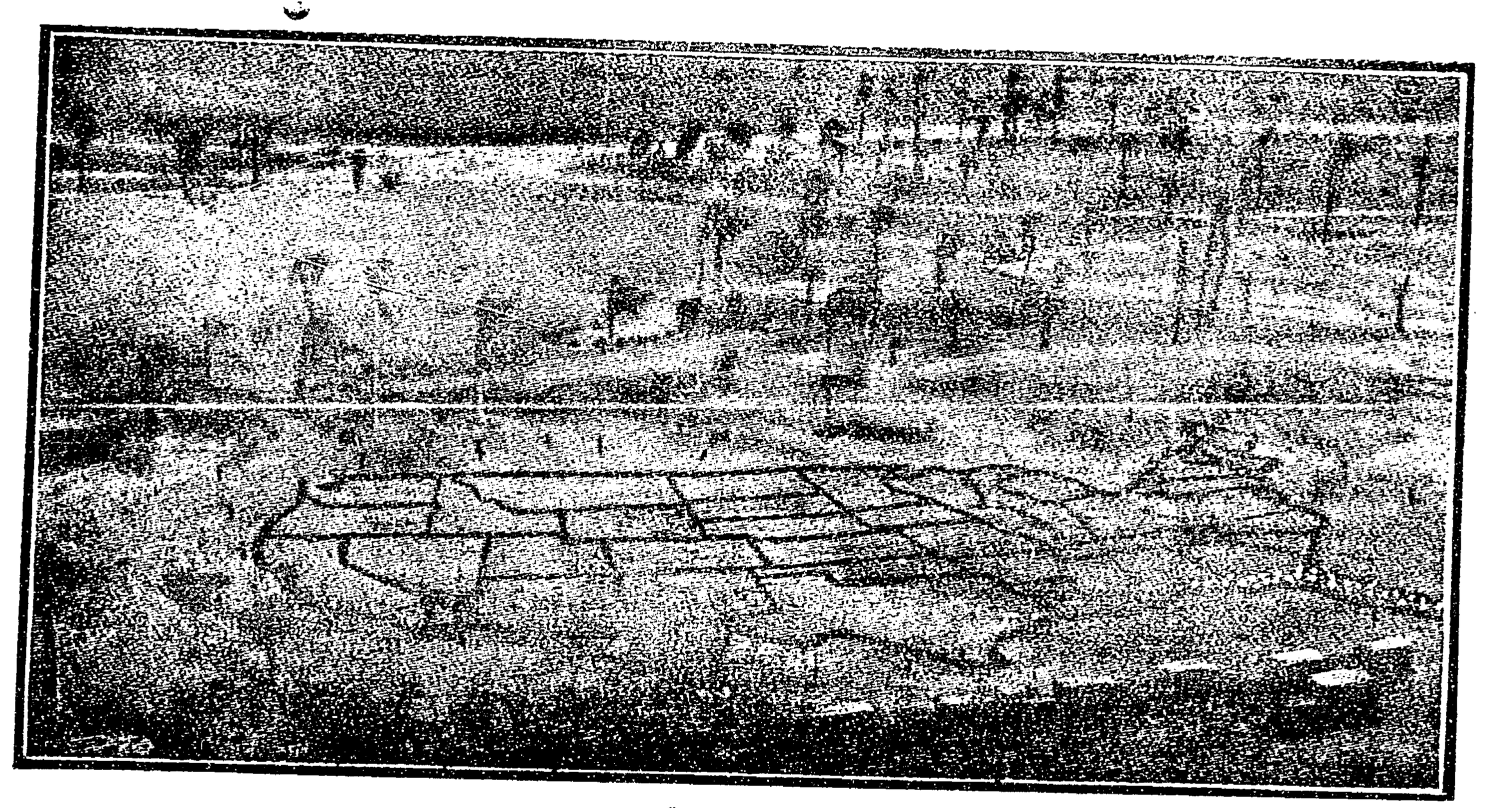

রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশ। রেড ইণ্ডিয়ানরাই প্রথম আমেরিকায় এসে বসবাস সুরু করে।

জাত,—যার নাম এখন মেক্সিকো সিটি। এই প্রাচীন মেক্সিকো যে কত সমৃদ্ধিশালী ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এদের অজস্র সোনার কাজ, গহনা, সৌখীন জামাকাপড়, সোনার থেকেও দামী "জেড্" পাথর ইত্যাদি দেখলে। তা ছাড়া এদের তৈরী বিরাট বিরাট পাথরের পিরামিড, আশ্চর্য সব খোদাইএর কাজ, ফ্রেস্‌কো-পেইন্টিং, প্ল্যাষ্টারের কাজ আজও এদের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এ সব যখন হচ্ছিল তখন আমাদের ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগ চলছে। লোহার ব্যবহার সুরু হয়েছে এদেশে। ওরা কিন্তু তখনও প্রস্তর যুগে রয়েছে। তবু, সেই পাথরের যন্ত্রের সাহায্যেই, অমন বিরাট বিরাট পাথরের মূর্তি আর তার অপরূপ পালিশ কি করে ওরা করত ভাবলে অবাক্ লাগে।

মেক্সিকোতে যেমন ছিল 'আজটেক'রা, তেমনি দক্ষিণ আমেরিকায় ছিল 'ইন্‌কা'রা। এদের সাম্রাজ্যও ছিল অমনি বিরাট। এ ছাড়া 'মায়া' সভ্যতার কথাও নিশ্চয়ই

শুনেছ। সেটা গড়ে উঠেছিল গুয়াটেমালা অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার আশেপাশে। গ্রীক ও ভারতীয় স্থাপত্যের সঙ্গে ওর মিল দেখে কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা—সেই দূর যুগেও ওই সব সুদূর দেশের মধ্যে সভ্যতার আদানপ্রদান ছিল। কিন্তু বেশীর ভাগ পণ্ডিতই এ ব্যাপার অসম্ভব ব'লে মনে করেন।

যাই হোক, এরা যে সব দিক্ দিয়েই খুব উন্নত হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। এমন কি জ্যোতিবিদ্যা, গণিত প্রভৃতিতেও। ভারতবর্ষেই দশমিক প্রথম আবিষ্কার হয়,—শূন্যের কি অর্থ (যা নাকি অঙ্কশাস্ত্রের গোড়ার কথা এবং যা না হ'লে অঙ্কশাস্ত্র ব'লে কিছু থাকতই না) তাঁরাই প্রথম বার করেন বলে আমরা জানি। অথচ আশ্চর্যের কথা এই, যে, পৃথিবীর আর এক কোণে সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ওরাও তাই আবিষ্কার করেছিল।

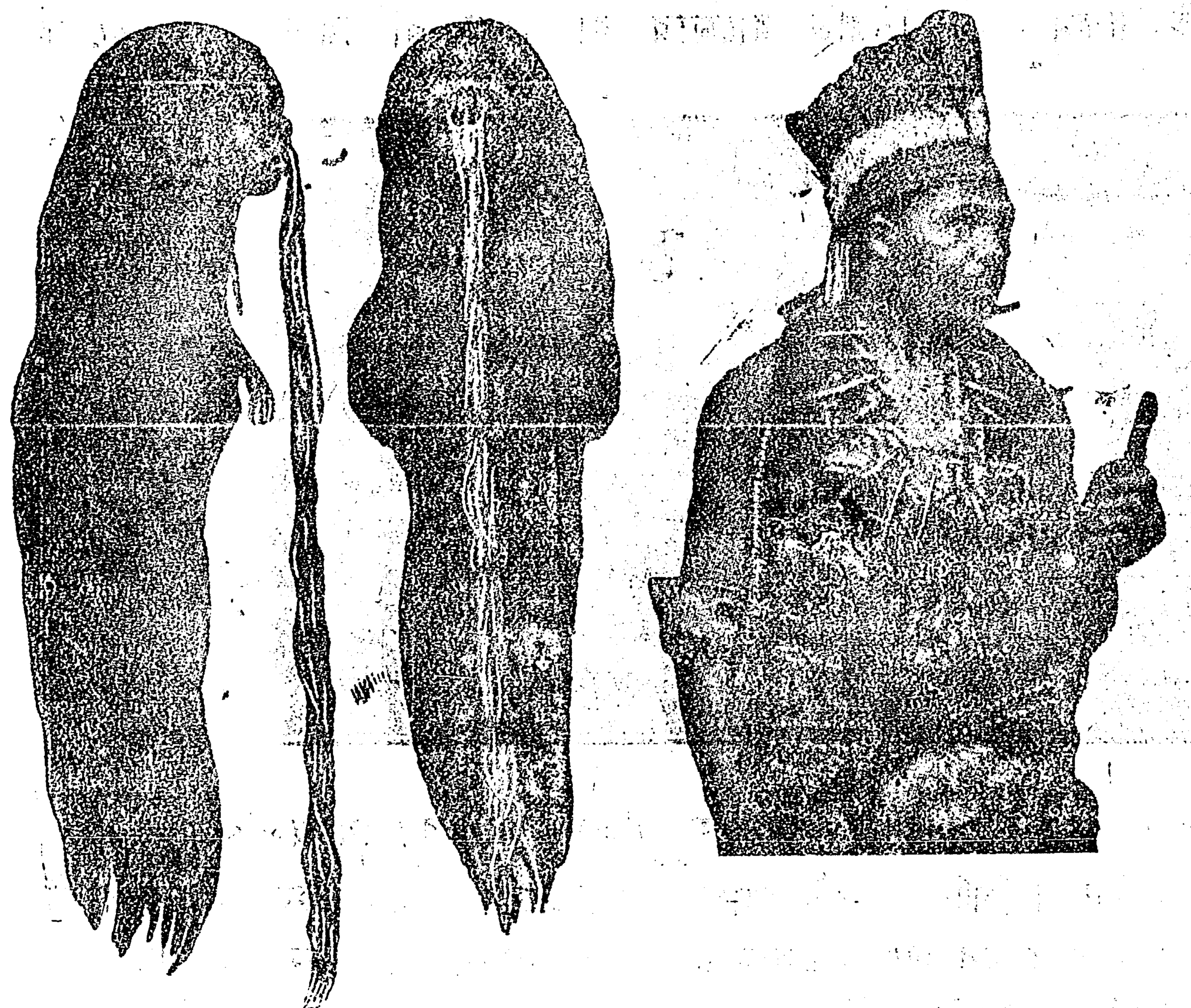

একজন নরমুণ্ড-শিকারী রেড ইণ্ডিয়ান। যুদ্ধে জিতে, শত্রুর মাথা কেটে এনে, অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে রাখে এরা—ওটা একটা মস্ত বীরত্বের চিহ্ন। অবশ্য এদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে।

দু' রকম পঞ্জিকার চল ছিল ওদের,—আমাদের মত চান্দ্র মাসও প্রচলিত ছিল। ওদের হাতে-আঁকা ছবির বইও পাওয়া গেছে। ফলে ঐ সব ছবির মধ্যে দিয়ে আঁকা নানা ঐতিহাসিক ঘটনার কথাও জানা গেছে।

কিন্তু এ সব উন্নতি যে সমস্ত অঞ্চলেই হয়েছিল তা ভাবলে ভুল হবে। কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা একেবারে গণ্ডীবদ্ধ অবস্থায় থাকত—অন্য জাতের সম্বন্ধে কোন খোঁজই রাখত না তারা। এমনি গণ্ডীবদ্ধ জাতের কারো কারো মধ্যে নিয়ম ছিল—যুদ্ধে

শত্রুকে মেরে, তার মাথাটা কেটে নিয়ে এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় (কি সে প্রক্রিয়া তা জানা যায় নি) ট্যান্ ক'রে, চামড়া, চুল, দাঁত ইত্যাদি সমেত একটা ফ্রেমে আটকে রাখত। এটা একটা খুব গৌরবের এবং বীরত্বের চিহ্ন বলে মনে করা হ'ত। ঠিক যেমন অনেক শিকারী বাঘ মেরে তার চামড়াটা মাথা সমেত ট্যান্ করে ঘরে সাজিয়ে রাখে 'ট্রফি' হিসেবে।

নরমাংস খাওয়া সম্বন্ধেও এই রকম বলা যায়। সাধারণ নরখাদক বলতে যা বোঝায় তা বড় একটা বলা চলত না ওদের। তবে কোন কোন জাত বিশেষ বিশেষ উৎসবে শত্রুপক্ষের বন্দীদের দেবতার কাছে উৎসর্গ করে তার মাংস খেত, যেমন আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ এমনিতে পাঁঠার মাংস (যার নাম দিয়েছে তারা বৃথা মাংস) খায় না, কিন্তু মা-কালীর কাছে বলি দেওয়া হ'লে সে মাংস আগ্রহের সঙ্গে খায়,—বলে 'মহাপ্রসাদ', তেমনি আর কি! আমরা যেমন ওদের ঐ ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারি না—তেমনি আমাদের এই ব্যাপারটাও অন্য অনেক দেশের লোক বুঝতে চাইবে না।

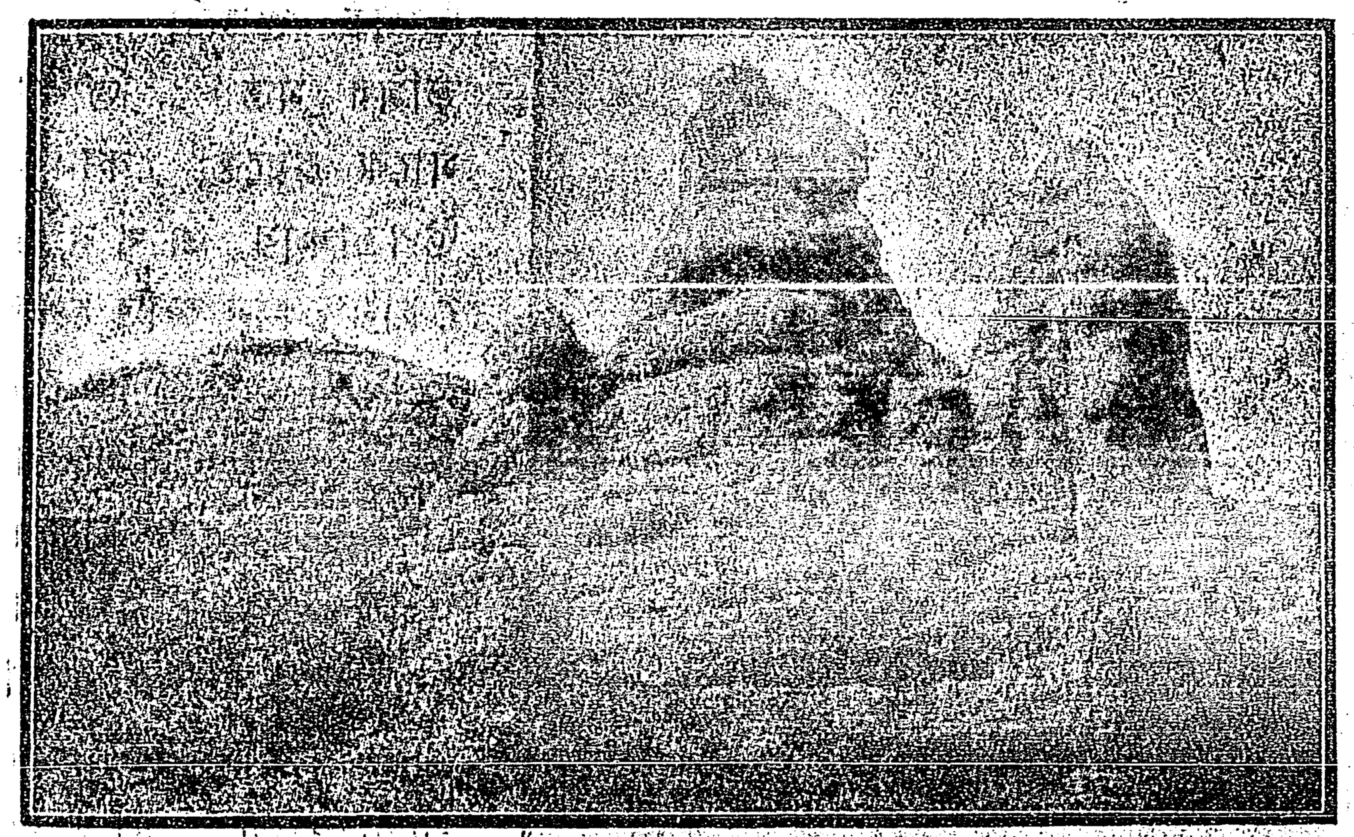

উড়ে-আসা বালির ঘষায় ক্ষয়ে-যাওয়া মন্দিরাকৃতি পাহাড়

যাই হোক, এর পর এল সাদা মানুষের দল—প্রথমে স্প্যানিয়ার্ডরা। ওরা অবাক্ হয়ে গেল এই নতুন মানুষদের দেখে। স্প্যানিয়ার্ডরা এসেছিল রাজ্য বিস্তার করতে, উপনিবেশ গড়তে আর, তার চেয়েও বেশী, লুটপাট করতে। বিরাট বিরাট শহরের কত সোনা যে তারা নিয়ে গেছে স্পেনে তার ঠিক নেই। সাদা জাতের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধকৌশল উন্নততর হওয়ায় ক্রমে একে একে অনেকেই তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। দেখতে দেখতে স্পেনের প্রভাব ওদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গেল। আজও পুরানো স্পেনের অনুকরণে তৈরী চুল্লী, চিমনী ইত্যাদি প্রচুর দেখা যায় ওখানে যা নাকি স্প্যানিশরা নিজেরাই ভুলে গেছে। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে বিয়েটিয়ে হয়ে ওরা ধীরে

ধীরে মিশে যেতে লাগল স্প্যানিশদের সঙ্গে। তারপর ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও লোকেরা এসে জুটল। শেষে স্পেনের রাজার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রজাতন্ত্র গঠন করা হ'ল মেক্সিকোতে। সেই থেকে মেক্সিকো রিপাব্‌লিক্‌।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু রেড ইণ্ডিয়ানদের অত বড় বড় শহর গড়ে ওঠে নি। তবু, যা আছে তাও, নেহাৎ হেলাফেলার নয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যত রেড ইণ্ডিয়ান আছে তাদের বাসভূমি,—ধর, হাজার মাইল লম্বা-চওড়া,– তাকে বলা হয় 'ইণ্ডিয়ান রিজার্ভেশন' অর্থাৎ ইণ্ডিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চল। এখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় কোন অধিকারই নেই—ওরাই সব। ছোট ছোট গ্রাম বেশীর ভাগই শুকনো মরু-ভূমির মত। তারই মাঝে হয়তো কোনও উপত্যকায় এখনও কোন কোন জাত সেই পুরানো পদ্ধতিতে চাষ করে চলেছে। ভেড়া চরানোও তাদের একটা জীবিকা। চক্‌চকে সাটিনের ঘাঘরা আর ভেলভেটের পূরো-হাতা ব্লাউজ পরা মেয়েরা লম্বা লম্বা কালো বিনুনি ঝুলিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। দেখতে বেশ লাগে। পায়ে চামড়ার মুকাসিন—যা নাকি আমাদের দেশেও আজকাল খুব ফ্যাশন হয়েছে—ছেলেদের মধ্যে। হয়তো এই ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকেই ওটা নেওয়া। আজকাল অবশ্য এখানেও সাদা চামড়ার কিছু কিছু প্রভাব দেখা যায়—পোষাকে, চাষবাসে যন্ত্রপাতির ব্যবহারে।

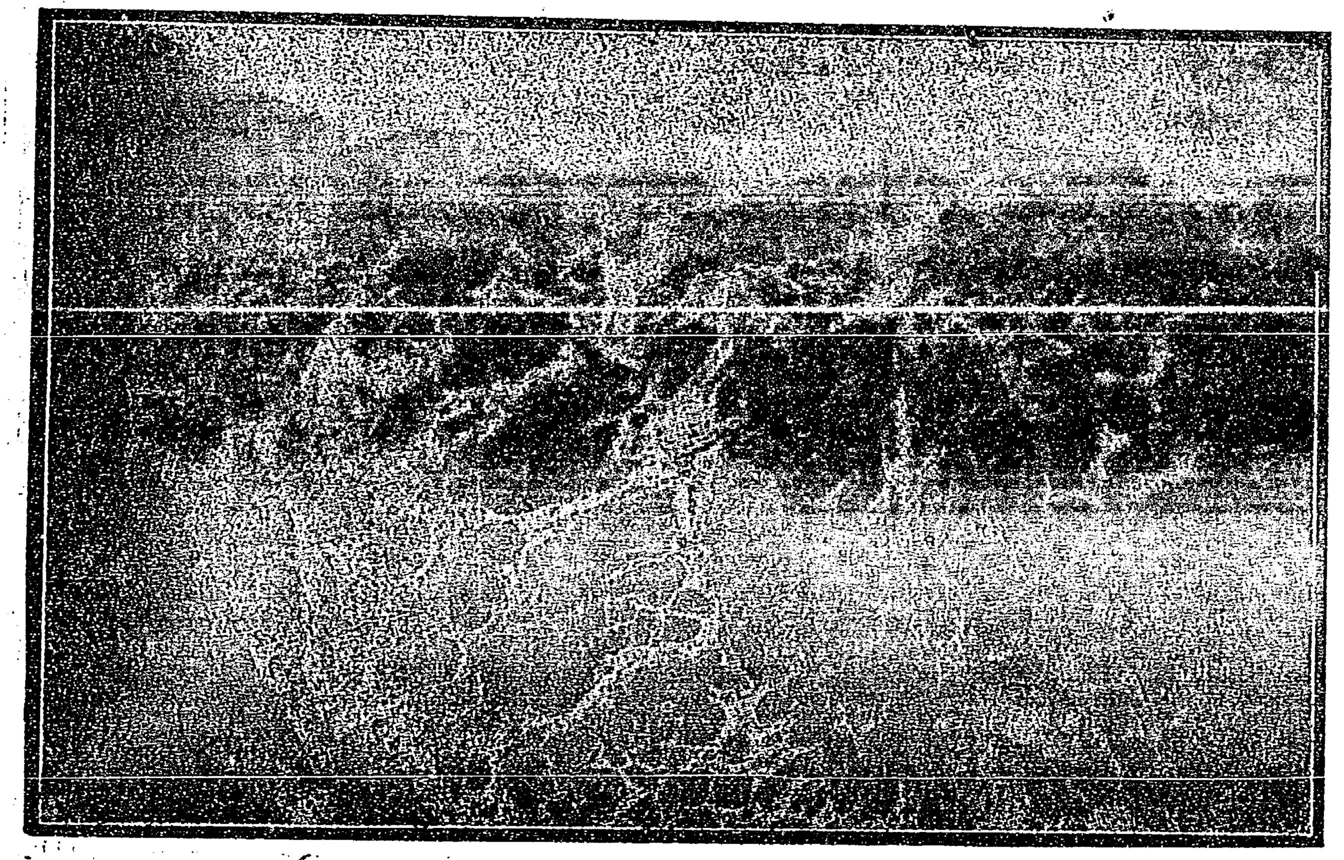

জল পড়ে পড়ে পাহাড়ের গা ঝোঁপরা করে তাকে এই চেহারায় এনে ফেলেছে।

এ রকম 'রিজার্ভেশন' যুক্তরাষ্ট্রে আরও আছে। এক অঞ্চলের লোকেদের থেকে অন্য অঞ্চলের লোকেদের চালচলন পোষাক, ভাষা, ধর্ম সবই আলাদা।

এদের প্রধান খাদ্য ভুট্টা,—আমাদের যেমন চাল। ভুট্টা এদের কাছে এত প্রয়োজনীয় যে সমস্ত পূজার নৈবেদ্য হলো ভুট্টার ছাতু। ভুট্টা দিয়ে এরা রুটি বানায়, পাঁপড়

বানায়, আরও কত কি করে। তা ছাড়া প্রচুর বীনও খায়। তোমরা বোধ হয় জান না—টম্যাটো, আলু, তামাক, ভুট্টা, বীন—এ সমস্তই রেড ইণ্ডিয়ানদের কাজ থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ নিয়েছে।

পুরানো শিল্পের কাজ এরা এখন অনেকটা ভুলে গেছে। অবশ্য কোন কোন জায়গায় উৎসাহী মুরুব্বিদের চেষ্টায় এই শিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও হচ্ছে; তবে আগের মত জিনিষ বেরোচ্ছে না। আমি এর কিছু কিছু সংগ্রহ করেছি। মাটীর কাজ করা একটা ভাঁড় কিনেছি। উইলো গাছের শিকড় দিয়ে তৈরী একটা ছোট ট্রে-ও কিনেছি। একটা জাত, দেখলাম, খুব চমৎকার কার্পেট বোনে। আর এক জাতের মধ্যে "স্যাণ্ড পেইন্টিং" অর্থাৎ 'বালির ছবি' নামে এক রকম শিল্পের চলন আছে। মেঝেতে বালি বিছিয়ে তার ওপর নানা রকম শুকনো রং ছড়িয়ে সুন্দর সুন্দর আলপনা দেয়। আমাদের দেশেও কোন কোন জায়গায় এ রকম আলপনা দেখেছি।

গ্যালাপে ওদের উৎসব উপলক্ষে নানা রকম নাচ দেখলাম। যুদ্ধের নাচ।—যুদ্ধে যাবার এবং যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবার। ঈগল নাচ,—অর্থাৎ ভুট্টা পোঁতার পর বৃষ্টি আনার জন্য ঈগল সেজে নাচ। হরিণ সেজে নাচ। সব নাচের সঙ্গেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যোগ স্পষ্ট।

রিজার্ভেশন-এর মধ্যে 'ক্যানিয়ন দ্য চেলি' বলে একটা ক্যানিয়ন্‌এ গিয়েছিলাম। বিরাট, প্রায় হাজার ফুট নীচু গর্ত। মাঝখানে নদী ছিলো, কত হাজার হাজার বছর আগে কে জানে? সেখানে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল লাল টুকটুকে। তার গায়ে জলের ক্ষয়ের দাগ। সেই গর্তের মধ্যে সামান্য একটু সবুজ রং। গোটা কয়েক ফুট্‌কি (লাল-নীল) নজরে পড়লো ওপর থেকে। পায়ে-হাঁটা বিশ্রী পথ দিয়ে নীচে নেমে দেখি কয়েক ঘর ইণ্ডিয়ান্‌ রয়েছে ক্ষেত-খামার নিয়ে। অনেক দিন আগে প্রথম যে ইণ্ডিয়ানরা ওখানে আসে তাদেরও ঘর-বাড়ী রয়েছে। ইটের তৈরী, কাঠের কড়িকাঠ-ওয়ালা দোতলা বাড়ী। এখনকার লোকে কুঁড়ে ঘরে থাকে অবশ্য। ঐ রকম খাড়া পাহাড়ের গর্তে কি করে যে প্রথমে ওরা নেমেছিলো তা-ই আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি। সে যুগের কিছু ভাঙা মাটির বাসনের টুক্‌রো কুড়িয়ে পেলাম। সরকার ওই সেকালের বাড়ীটা খুব যত্নে রেখেছে। ট্যুরিষ্টরা প্রায়ই যায় দেখতে।

পথে "ব্ল্যাক্‌ ক্যানিয়ন্‌" নামে আর একটা ক্যানিয়ন্‌ দেখলাম, ২০০০ ফুট গভীর। জল এখনও রয়েছে নীচে। বহু হাজার হাজার বছর ধরে জল হিমবাহ থেকে ব'য়ে যাচ্ছে আর পাথর ক্ষয় করে চলেছে। কত হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ বছর পরে আজ তাই ওখানে অত গভীর গর্ত। প্রায় ২০০০ গজ চওড়া নীচেটা, আর বেশ কিছু

মাইল লম্বা। এ ছাড়া রিজার্ভেশন-এর ভিতর মরুভূমির মধ্যে পাহাড়ের কত অদ্ভুত অদ্ভুত আকৃতি দেখা গেল তার ঠিক নেই। লাল রংয়ের পাথর। লাল টুকটুকে বালি। মাঝে মাঝে কাঁটা-ঝোপ। হাওয়ায় উড়ে-আসা বালি বয়ে গিয়ে বিরাট বিরাট পাহাড়ের অংশকে অদ্ভুত ভাবে ক্ষয় করেছে কোনোটা দেখলে মনে হয় কেউ যেন তর্জ্জনী উঁচু ক'রে রয়েছে। কোনোটার বা ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গিয়ে যেন চত্বরে পৌঁছেছে ; কোনোটার বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্য আসে বাইরে থেকে।

বিহারের গ্রামের রাস্তা যেমন, তেমনি রাস্তায় গাড়ী চল্‌লো। ভালো রাস্তা নেই। আমেরিকায়ও যে এমন কাণ্ড হ'তে পারে তা কখনো কল্পনা করি নি। এক হাত ক'রে গর্ত। ছ'জন লোক আমরা। সঙ্গে পেট্রোলের উনুন, পেট্রোম্যাক্স, প্রচুর খাবার, হাওয়া-ভরা গদি আর বিছানা—কিছুরই অভাব নেই। আইস্ বক্সে করে চীজ্, চকোলেট, মাংস, দুধ—সবই চললো। আমি ডিমের ডেভিল আর পুড়পুড়ি করে নিয়েছিলাম। ওরা বেশ পছন্দ করলে। রাত্রে রাস্তার পাশের ক্যাম্প গ্রাউণ্ডে আলো জ্বেলে রান্না করে খাওয়া, শোওয়া ইত্যাদি। একদিন রাত্রে বৃষ্টি পড়ায় তাঁবু খাটানো হোলো। খুব হাল্কা তাঁবু। আমেরিকার লোকদের পয়সা আর অবসর আছে, সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়বার একটা দুর্দান্ত বাসনাও আছে এবং আজকাল সেটা খুব বেড়ে গেছে। ক্যাম্পিং করা অর্থাৎ তাঁবু খাটিয়ে থাকা খুবই সাধারণ ব্যাপার এখানে। যাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলাম তাঁদের ওটা ভীষণ শখ। যত রকম তাঁবুর উপকরণ হ'তে পারে,—মায় শাবল, কুড়ুল,—সব সঙ্গে ছিল। বিরাট এক ট্যাংক জলও ছিল। এবারের বেড়ানোয় তাই কষ্ট বিশেষ হয় নি। অবশ্য সাংঘাতিক গরম ছিল।

একটা কথা প্রায়ই মনে আসছিল। এখানে এত দেখছি কিন্তু নিজেদের দেশে কি আছে না আছে প্রায় কিছুই জানি না। যাবারও সুযোগ জোটে নি, তা ছাড়া আমাদের দেশে তো আর এদের এখানকার মত প্রোপ্যাগাণ্ডা নেই। বেড়াবার-লোভ-জাগানো, ট্যুরিষ্টদের-আকর্ষণ-জন্মানো কোন ব্যবস্থাই নেই বলা যেতে পারে। কাজেই লোকে জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেব ভেবে পাই না। ভাবছি, দেশে ফিরে আগে বেশ খানিকটা বেড়িয়ে নিতে হবে। বিদেশের এত দেখছি আর নিজের দেশকে ভালো করে চিনব না?

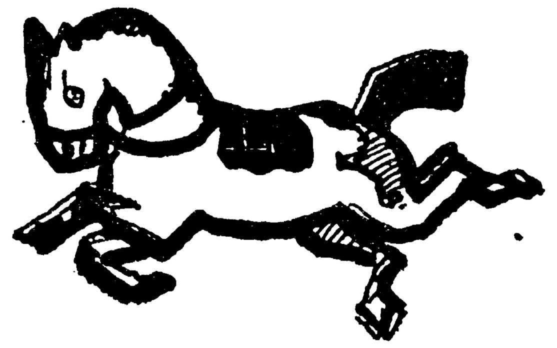

সন্ধ্যা ঘনায় কোথায় কেমন ?

শ্রীনবগোপাল সিংহ

বিজলী যেখানে মানুষের হাত ধরা—
অষ্টপ্রহর কাজের বিরাম নাই,
দিনে আর রাতে প্রভেদ সেখানে কোথা,
অমা, পূর্ণিমা তফাৎ খুঁজে না পাই!

আলোর রাজ্যে তোমরা করিছ বাস,
তবু তোমাদের সন্ধ্যা সকাল আছে ;
হাতে ও গলায়, পকেটে, প্রাচীরে, পথে
সময়ের চাকা বাঁধা তোমাদেরই কাছে।

তারই ইঙ্গিতে তোমরা জানিতে পার
কখন সন্ধ্যা, কখন সকাল হ'লো,
কিন্তু তাদের আছে যে একটা রূপ
তোমরা কি কেউ দেখেছ, সত্যি বল ?

দিনের আলোর রেখা না মিলিয়ে যেতে
অলিতে গলিতে জ্ব'লে যায় গ্যাস-বাতি,
প্রাসাদে, হর্ম্ম্যে বিজলীর সমারোহ
প্রচারে নিত্য—"ঘনায়ে এসেছে রাতি।"

প্রাচীরে প্রাচীরে আলোর বিজ্ঞাপন—
ট্রামে আর বাসে ফোটে আলোকের আঁখি,
সহরের বুকে সন্ধ্যার আসা-যাওয়া
চলে চিরদিন প্রকৃতিরে দিয়ে ফাঁকি।

পল্লীসন্ধ্যা—সে যে অপরূপ কত,
শিল্পীর সে যে কি নিপুণ অঙ্কন!
ক্ষণিক তবুও, কত সমারোহ তার,—
কত বিচিত্র রঙের আলিম্পন।

অস্ত রবির সোনালি উত্তরীয়
উড়ে উড়ে ফেরে গাছ হ'তে গিরিচূড়ে ;
ডুবে যায় রবি, ওঠে সহকারী চাঁদ,—
রূপালী জ্যোৎস্না ছড়ায় বিশ্ব জুড়ে।

কুলায় কুঞ্জে ফেরে দিবসের পাখী—
কণ্ঠে তাদের পূরবীতে বাঁধা বেণু,
গোধূলিমুখর গোধূলি লগনে ফেরে
প্রান্তর হ'তে তৃপ্ত-উদর ধেনু।

হেথা চোখ বোজে কমল, সূর্য্যমুখী,
রজনীগন্ধা, কহ্লার ওঠে জেগে ;
হেথা প্রকৃতির নিয়ম র'য়েছে বাঁধা,
প্রগতির যুগে যায়নি তা আজও ভেঙ্গে।

তুলসীর মূলে সুরু হয় দীপ জ্বালা—
শঙ্খের রবে মুখর গৃহাঙ্গন,
মোদের সন্ধ্যা কেহ কি দেখিতে চাও ?
এসো তবে হেথা, জানাই আমন্ত্রণ।

—রং বদলানো বল্—

আজকে তোমাদের যে খেলাটা শেখাব তার নাম বলা যায় 'রং-বদলানো বলের খেলা' ; ইংরেজীতে—"কালার চেঞ্জিং বল্"। ছেলেবেলায় এটা আমার খুব প্রিয় খেলা ছিল। একটা লাল রংএর পিংপং বল্ দর্শকদের দেখিয়ে, সেটা একটা লাল রংএর সিল্কের রুমাল দিয়ে মুড়ে, একটা খালি কাচের গ্লাসের মধ্যে রুমাল সহ রেখে একজন দর্শককে

যাদুকর শঙ্কর দাস ও বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর যাদুসম্রাট্ পি. সি. সরকার

তা ধরতে দিই এবং আমি পিস্তল দিয়ে ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে লাল রংএর বল্‌টী

হলদে রংএর বলে রূপান্তরিত হয়। বল্, গ্লাস ও রুমাল দর্শকদের পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়। এতে সকলেই খুব অবাক্ হন।

এখন, খেলার কৌশলটী তোমাদের কাছে প্রকাশ করছি। এই খেলাটার জন্য একটা লাল রংএর সিল্কের রুমাল, একটা কাচের গ্লাস, দুটো পিংপং বল ও একটা পিস্তলের প্রয়োজন হয়। পিস্তল মানে খেলার পিস্তল বা ক্যাপ্ বন্দুক,—আওয়াজ হয় শুধু, গুলিটুলির বালাই নেই। একটা পিংপং বল্ হলদে রং করে নাও এবং অপর বল্‌টা ব্লেড্ দিয়ে মাঝামাঝি চিরে, আধখানা করে, ঐ আধ টুকরোর একটি লাল রং করে নাও। খেলা দেখাবার সময় লাল আধখানা বল্‌টা হলদে বলের গায়ে আটকে দাও এবং লাল দিক্‌টা দর্শকদের দেখাও। রুমালের মধ্যে বল্‌টা রাখবার সময় ডান হাতের তালুর মধ্যে ঐ লাল খোলটা খুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেল এবং শুধু হলদে বল্‌টা রুমালে জড়িয়ে গ্লাসের মধ্যে রেখে দাও। টেবিল হ'তে পিস্তল নেবার সময় ঐ লাল খোলটা কোন জিনিষের আড়ালে রেখে দিতে হবে। এইটুকুই তোমাদের একটু সাবধানে করতে হবে। বাকী অংশ খুবই সহজ, না বললেও তোমরা বুঝতে পারছ। ফায়ার করার পর দর্শকদের বল্, রুমাল ও গ্লাস পরীক্ষার জন্য দিতে পার।

যাদুকর শঙ্কর দাস ও অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত যাদুকর কেন্ লিট্‌ল উড্

খেলাটা খুবই সহজ, সুন্দর ও তৈরী করতে খরচও বিশেষ নেই। আজই তৈরী করে বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতে পার। যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে কোন কিছু জানতে ইচ্ছা হ'লে আমায় রিপ্লাই কার্ডে বা তোমার ঠিকানা লেখা খাম (উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ) সঙ্গে দিয়ে "যাদুকর শঙ্কর দাস, কলিকাতা-১০" এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পার। আমি সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

শ্রী মণিলাল অধিকারী

—পনের—

রাতের অভিযানের পর আরও এক সপ্তাহ কেটে গেছে।

বন্ধ ঘরের নিভৃতে এ ক'দিন তাপস শুধু লাল শঙ্খটাকে পরীক্ষা করেছে নানান ভাবে। কিন্তু শঙ্খ-রহস্যের মূল রহস্য এখনও উদ্‌ঘাটন করতে পারে নি।

অবশ্য তাপস এটুকু বুঝতে পেরেছে—আসল রহস্য লুকিয়ে আছে শঙ্খের উপর উৎকীর্ণ চিত্রগুলির মধ্যে।

পরীক্ষা করে তাপস আরও জানতে পেরেছে শঙ্খটার আসল রঙ লাল নয়। অতি সাধারণ একটা বড় সাইজের শ্বেতশুভ্র শঙ্খের উপর নিখুঁত লাল রঙ করা।

শঙ্খের উপর এত সুন্দর আর এত নিখুঁত ভাবে লাল রঙ লাগান হয়েছে যে শঙ্খের আসল রঙটা কি—বোঝা রীতিমত দুঃসাধ্য।

তাপসেরও প্রথমে ধারণা হয়েছিল, শঙ্খটার রঙ বুঝি সত্যিই লাল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শঙ্খটা পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়ল—ওটার রঙ লাল নয়, সাদা।

অনেকগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তাপসের মনে। প্রত্যেকটি প্রশ্ন গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখেছে তাপস। কিন্তু কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও খুঁজে পায় নি।

গুপ্তধনের কিংবদন্তীর কাহিনী যে সত্য, এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই তার মনে।

সকল প্রশ্নের উপর একটা প্রশ্ন বড় করে জাগছে। বসন্ত রায় সাদা শঙ্খের উপর লাল রঙ করলেন কেন?

এর একটি মাত্র উত্তর হতে পারে—শঙ্খের উপর উৎকীর্ণ চিত্রগুলো সুন্দর দেখাবে বলে। লালের উপর কালো রঙ খোলে ভাল।

কিন্তু শুধু কি তাই?

আবার এমনও তো হতে পারে—লাল রঙের নীচে শুভ্র শঙ্খের উপর বসন্ত রায় খোদাই করে রেখে গেছেন রত্নসিন্দুকের গুপ্ত ঠিকানা। আর লাল রঙ দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন সেই গোপন তথ্য।

কিন্তু বসন্ত রায়ের চিঠি বলে অন্য কথা—শঙ্খে উৎকীর্ণ চিত্রগুলির নীরব ভাষা বোঝবার চেষ্টা কর, রত্নসিন্দুকের সন্ধান পাবে।

শঙ্খের উপর চিত্রগুলির প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করে দেখেছে তাপস। কিন্তু শঙ্খের উপর উৎকীর্ণ চিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র হাতুড়ি ও ছেনির সাহায্যে খোদাই কর্মরত শিল্পীর চিত্রটি ছাড়া অন্য চিত্রগুলি কোন কিছুই ব্যক্ত করে না।

খোদাই কর্মরত শিল্পীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে বসন্ত রায় কি বলতে চান?

একখণ্ড পাথরের উপর ছেনি ও হাতুড়ির ঘায়ে শিল্পী তার মানসপ্রতিমাকে স্বপ্নরাজ্য থেকে বাস্তবের আলোয় টেনে আনে। দেয় রূপ, দেয় আকৃতি। রেখায় রেখায় বুলিয়ে দেয় প্রাণের পরশ। স্বপ্ন সত্য হয়ে ওঠে।

তবে কি—তবে কি বসন্ত রায় বলতে চান, ছেনি ও হাতুড়ির ঘা দিয়ে দেখ, তোমার স্বপ্ন সফল হবে—সত্য হবে, পাবে রত্নসিন্দুকের সন্ধান, সার্থক হবে সব পরিশ্রম?

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল তাপস।

কতক্ষণ কেটে গেছে তাপসের খেয়াল নেই। সুজিতের হাঁক-ডাকে সে যেন ফিরে এল চিন্তাজগৎ থেকে বাস্তব জগতে।

—'ঘুমুচ্ছিলি?'—জিজ্ঞাসা করল সুজিত।

—'ঘুম? কই, না তো।'

—'চোখ বুজে বসে বসে কি হচ্ছিল তবে?'

—'ধ্যান করছিলুম।' হাসল তাপস।

—'কিসের?'

—'রত্নসিন্দুকের।'

—'দেখ তাপস, রত্নসিন্দুকের গোপন রহস্য গোপনই থাক আপাততঃ। চা আর টা দেওয়া হয়েছে টেবিলে। আগে চা খেয়ে নিই গে চল। সকালে পেটে চা না পড়লে আমার আবার মেজাজের ঠিক থাকে না।'

—'উত্তম প্রস্তাব। আমারও চায়ের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

তাপস উঠে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন চিন্তা করে নিয়ে বলল,—'চা-পর্বটা এখানেই সেরে নিলে আমার একটু সুবিধা হ'ত। মলয়কে ডাক না এখানে। আর চাকরকে বল এখানেই চা দিতে।'

তাপস আবার বসে পড়ল চেয়ারে।

উত্তর না দিয়ে সুজিত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অল্পক্ষণ পরে মলয়কে নিয়ে ফিরে এল আবার।

ওদের পিছু পিছু এল সুজিতের ভৃত্য. ট্রেতে করে চা আর আহার্য্য-বস্তু নিয়ে।

তিনজন চা পান করতে লাগল নীরবে।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল তাপস। জিজ্ঞাসা করল,—'এ ক'দিনের মধ্যে অরুণকুমার এসেছিল তোর কাছে?'

—'না তো।' উত্তর দিল সুজিত।

তাপস আবার চিন্তিত মনে চা-পানে মনোযোগ দিল।

অল্পক্ষণ পরে তাপস বলল, -'দেখ সুজিত, শঙ্খটার আসল রঙ লাল নয়। একটা সাদা শঙ্খের উপর নিখুঁত করে লাল রঙ দিয়েছেন বসন্ত রায়। আমার ধারণা হয়েছে, বসন্ত রায় ঐ লাল রঙের নীচে সাদা শঙ্খের উপর রত্নসিন্দুক সম্পর্কে নিশ্চয় কোন গোপন তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। লাল রঙের নীচে কি আছে আমি দেখতে চাই। তোর আপত্তি নেই তো কিছু?'

—'কিছুমাত্র না।'

—'ভাল করে ভেবে দেখ। শঙ্খের ওপর থেকে লাল রঙ জায়গায় জায়গায় তুলে দিলে তোর পূর্ব্বপুরুষ বসন্ত রায়ের অপূর্ব্ব শিল্পসৃষ্টি লাল শঙ্খের সৌন্দর্য্যহানি ঘটবে। পারিবারিক পুরানো স্মৃতিচিহ্ন। আর একবার ভাল করে ভেবে দেখ সুজিত!'

—'তুই যদি প্রয়োজন মনে করিস, তাহ'লে আমার কোন আপত্তি নেই।'

চিন্তিত মনে তাপস বলল, 'রত্নসিন্দুকের সন্ধান করতে হ'লে এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

—'উপায় যদি না থাকে তাহ'লে তাই হোক।' বলল সুজিত।

—'শুভস্য শীঘ্রম্। শুভ কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়।' তাপস বলল,—'মলয়, এখুনি কাজ আরম্ভ করতে চাই আমি। তুই এক কাজ কর, সম পরিমাণ সোডা আর চূণ জলে মিশিয়ে একটা প্লেটে করে আন; আর একটা সরু তুলি আর একখণ্ড পরিষ্কার কাপড়ও সঙ্গে আনবি। আর সুজিত, তুই একটা কাজ কর। তোর দরওয়ানগুলোকে সদরে কড়া পাহারা দিতে আদেশ দিয়ে আয়—কেউ যেন ওপরে এসে এ সময় আমাদের বিরক্ত না করে। আর অরুণকুমার যদি আসে তাকে যেন ওপরে উঠতে দেওয়া না হয়। চাকরদের বলবি, তারাও যেন এখন ওপরে না ওঠে। প্রয়োজন হ'লে তুই-ই তাদের ডেকে পাঠাবি।'

মলয় আর সুজিত তাপসের আদেশ পালন করতে ছুটল, আর তাপস শঙ্খটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

অল্পক্ষণ পরে মলয় আর সুজিত ফিরে এল।

হাতের জিনিসগুলো টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে মলয় জিজ্ঞাসা করল,—'আর কিছু করতে হবে?'

—'আপাততঃ না।'

কাজ সুরু করে দিল তাপস, আর বসে বসে মলয় আর সুজিত তাকিয়ে রইল তাপসের কর্ম্মরত হাত দু'টোর দিকে।

তাপস অত্যন্ত সাবধানে শঙ্খের উপর কয়েক স্থানে চূণ আর সোডা মেশান তরল পদার্থ

তুলির সাহায্যে লাগিয়ে দিল। তার পর অত্যন্ত সতর্ক হয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে তুলতে লাগল শঙ্খের উপরের লাল রঙ। যে স্থানগুলোতে চূণ আর সোডা মেশান তরল পদার্থ লাগান হয়েছিল, সেই স্থানগুলোতে লাল রঙ উঠে গিয়ে শঙ্খের আসল সাদা রঙ বেরিয়ে পড়ল।

শঙ্খের সেই সাদা স্থানগুলো অত্যন্ত সতর্ক হয়ে পরীক্ষা করতে লাগল তাপস।

বর্ডারে যে চৌকো ছক্ কাটা ঘরে শিল্পীর চিত্র উৎকীর্ণ ছিল তারই একধারের রঙ তুলে ফেলেছিল তাপস। অবশেষে তাপসের স্থিরদৃষ্টি এসে দাঁড়াল সেখানে। একাগ্র হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি।

—'মলয়, আমার বড় লেন্সটা আন এখুনি।'

মলয় তাড়াতাড়ি লেন্সটা এনে তাপসের হাতে দিল।

লেন্সটা চোখের সামনে ধরে শঙ্খের উপর ঝুঁকে পড়ল তাপস। অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ধরে চলল পরীক্ষা।

অবশেষে লেন্সের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাপস তাকাল মলয়ের দিকে। বলল, 'এদিকে আয় মলয়! লেন্সের ভিতর দিয়ে দেখ একবার এখানটায়।'

শঙ্খের ছক্-কাটা বর্ডারে, যেখানে শিল্পীর চিত্র উৎকীর্ণ আছে, সেখানের লালরঙ-তুলে-দেওয়া সাদা স্পটের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখিয়ে দিল তাপস।

লেন্সের ভিতর দিয়ে শঙ্খের নিদিষ্ট স্থানে দৃষ্টিপাত করল মলয়। কয়েক মিনিট কাটল নীরবে।

মলয়ের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তাপস।

মলয় লেন্সের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাকাল তাপসের দিকে।

—'সাদা স্পটের মধ্যে কিছু লক্ষ্য করেছিস?' জিজ্ঞাসা করল তাপস।

মলয় উত্তর দিল, 'সাদা স্পটের উপর খুব সরু একটা ফাটের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। আর দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছি, ফাটটা সরল রেখায় তৈরী, আঁকাবাঁকা নেই কোথাও।'

মৃদু মৃদু হাসতে লাগল তাপস। তার পর শঙ্খটা কাছে টেনে নিয়ে তুলির সাহায্যে ছকের ভিতরের পুরো রঙটাই তুলে ফেলল।

তার পর লেন্সটা তুলে নিয়ে উৎসুক ভাবে দৃষ্টিপাত করল শঙ্খটার উপরে।

কিছুক্ষণ পরে লেন্সটা মলয়ের হাতে দিয়ে সে বলল, 'এবার দেখ মলয়!'

লেন্সটা নিয়ে মলয় ঝুঁকে পড়ল শঙ্খের উপরে।

খানিক পরে লেন্স থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে মলয় অবাক্ হয়ে তাকাল তাপসের দিকে।

—'কি রে, কি হোলো?' জিজ্ঞাসা করল তাপস।

—'ফাটলটা আর সরল রেখা নেই—একটা চৌকো দাগে পরিণত হয়েছে।'—বিস্মিত কণ্ঠে মলয় বলল।

(ক্রমশঃ)

ভট্ট রঘুনাথ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়াছেন। তাঁহার আগমনে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাকে মহা-সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। পদ্মা নদীর তীরে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-পল্লীতে তাঁহার বাসস্থান দেওয়া হইল। সেখানে থাকিয়া তিনি সকলের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করেন আর আনন্দে পদ্মার জলে স্নান করেন—যেমন করিতেন নবদ্বীপে গঙ্গার জলে।

লোকজন আসে অবিরাম। মুগ্ধ হইয়া যায় তাঁহার কাঁচা সোনার বরণ রূপ দেখিয়া আর অমৃতময়ী কথা শুনিয়া। এইভাবে দিন যায়। একদিন মহাপ্রভু বসিয়া আছেন তাঁহার ঘরে, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণের চোখ দু'টি বহিয়া দর দর ধারে গড়াইয়া পড়িতেছে প্রেমাশ্রু, হাত দু'খানি কৃতাঞ্জলিবদ্ধ।

যোড় হাতে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভু, আমার নাম তপন মিশ্র। অতি সাধারণ গৃহস্থ আমি। যতদূর সম্ভব ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীর আরাধনা ক..ছি, কিন্তু মনে আমার কিছুতেই সুখ হচ্ছে না। কিসের যেন একটা অভাব মনে হয় দিনরাত। এইভাবে বড় কষ্টে আমার দিন কাটছিল। কাল রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম একজন দেবতা এসে বলছেন,

'মিশ্র, তুমি নিমাই পণ্ডিতের শরণ নাও, তাহ'লেই পথের সন্ধান পাবে। নিমাইকে সাধারণ পণ্ডিত বলে মনে কোরো না। ইনি নারায়ণের অবতার, জীব উদ্ধারের জন্য ধরাধামে এসেছেন। তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য কর তোমার মানবজন্ম।' প্রভু! তাই আমি এসেছি আপনার কাছে। এই অধমকে চরণে স্থান দিয়ে কৃতার্থ করুন। সার্থক হোক আপনার পতিতপাবন নাম।"

ব্রাহ্মণের দীনতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে বলিলেন—

"শুন মিশ্র! কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য ॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥"— চৈঃ ভাঃ

প্রভুর উপদেশ পাইয়া তপন মিশ্র কৃতার্থ হইলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভু, কৃপা করে এই সেবককে সঙ্গে নিন, তাহ'লে তার জন্ম সার্থক হয়।"

মৃদু হাসিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "মিশ্র! আমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই। তুমি যত শীঘ্র পার কাশী চলে যাও, সেখানে আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে।"

প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন তপন মিশ্র। তার কিছুকাল পরে মহাপ্রভুও তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন নবদ্বীপে।

এই তপন মিশ্রেরই একমাত্র পুত্র শ্রীরঘুনাথ ভট্ট। মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন তাঁহার পিতার দেখা হয় তখন তিনি শিশু। মহাপ্রভুর আদেশে তপন মিশ্র স্ত্রী-পুত্র সহ কাশী চলিয়া গেলেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া ভক্তদের আনন্দ আর ধরে না। রোজ আসিয়া তাঁহারা কীর্ত্তন করেন তপন মিশ্রের সাথে।

এইভাবে দিন যায়। ক্রমে রঘুনাথ বড় হইয়া উঠিলেন আর পিতার কাছে বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সবচেয়ে তাঁহার ভাল লাগে ঐ হরিনাম কীর্ত্তন। সকলের সঙ্গে তিনিও বসিয়া যান কীর্ত্তনে। বালকের সুমধুর কণ্ঠে হরিনাম শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হ'ন আর আশীর্ব্বাদ করেন, "তোমার শ্রীকৃষ্ণপদে ভক্তি হোক।" ছেলের অনুরাগ দেখিয়া মিশ্রও খুব খুসী, মহা উৎসাহে তিনি তাহাকে শাস্ত্র শিক্ষা দেন আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা বলেন।

একদিন কথা শুনিতে শুনিতে রঘুনাথ পিতাকে বলিলেন, "বাবা, মহাপ্রভু এখন কোথায় আছেন? আমি কি তাঁর চরণ দর্শন পাব না?"

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে মিশ্র বলিলেন, "পাবে না কেন বাবা, তিনি যে আমাদের ইষ্ট দেবতা, আমাদের দর্শন না দিয়ে কি থাকতে পারেন? তাঁর আদেশেই না আমি দেশ ছেড়ে এখানে এসেছি? তিনি বলেছেন যে এখানেই এসে আমাদের দর্শন দেবেন। এখন তিনি দেশেই আছেন,—তাঁর প্রেমপরিপূর্ণ নামের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সারা দেশ। অপেক্ষা করে থাক বাপ, সময় হলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

রঘুনাথের মন আনন্দে ভরিয়া উঠে পিতার কথায়। এক মনে তিনি চিন্তা করেন মহাপ্রভুর কথা; আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেন মহাপ্রভুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। এইভাবে দিন যায়। সোনার গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস নিয়া চলিয়া গেলেন পুরীধামে। সেখানে কিছুদিন বাস করিয়া তিনি স্থির করিলেন একবার বঙ্গদেশ ঘুরিয়া বৃন্দাবন যাইবেন।

কাশীতে থাকিয়া তপন মিশ্র শুনিতে পাইলেন যে মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে কাশীতে আসিতেছেন। আনন্দে নাচিয়া উঠিল মিশ্রের হৃদয়; পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ, এতদিনে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে চললো। পতিত-পাবন মহাপ্রভু আসছেন কাশীতে। আমি জানতাম তিনি আসবেন নিশ্চয়ই। আমাকে যে তিনি কথা দিয়েছেন এই কাশীতেই আবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে!"

এদিকে মহাপ্রভু কাশীতে আসিয়া ভক্ত চন্দ্রশেখরের গৃহে উঠিলেন এবং তপন মিশ্রকে আসিবার জন্য সংবাদ দিলেন। তপন মিশ্র আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। চন্দ্রশেখর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, তাই তপন মিশ্রের ঘরে তাঁহার আহারের ব্যবস্থা হইল। এদিকে রঘুনাথ অধীর আগ্রহে ঘর-বাহির করিতেছেন মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিবার জন্য। হঠাৎ দেখিলেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক তপ্তকাঞ্চনবর্ণ উজ্জ্বল দেবমূর্ত্তি। সেই দেবমূর্ত্তির শ্রীমুখ হইতে যেন বিশ্বের করুণাধারা ছড়াইয়া পড়িতেছে। পিছনে পিছনে তপন মিশ্র; তিনি বলিলেন, "বাবা রঘুনাথ, প্রণাম কর। ইনিই আমাদের আরাধ্য দেবতা ভগবান্ শ্রীচৈতন্য দেব।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত রঘুনাথ লুটাইয়া পড়িলেন প্রভুর চরণতলে। মহাপ্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার শ্রীকৃষ্ণপদে ভক্তি হোক।" মিশ্র আর মিশ্র-গৃহিণী পরম ভক্তির সহিত মহাপ্রভুর সেবা করিলেন। তাঁহার প্রসাদ পাইয়া মিশ্র পরিবার কৃতার্থ হইয়া গেলেন। নিত্য প্রভুর প্রসাদ ও দর্শন পাইয়া রঘুনাথও আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, যদি এইভাবে জীবন কাটিয়া যায় তবে স্বর্গ-সুখও এর কাছে তুচ্ছ।

তারপর রূপের ভাই সনাতন আসিয়া মহাপ্রভুর শরণ লইলেন। সেইখানেই তাঁহার বৈষ্ণব সন্ন্যাস-দীক্ষা হইল। রঘুনাথ দেখিলেন ও শুনিলেন সবই। সমস্ত গৌড় বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর দৈন্য আর ভক্তিপ্রেম দেখিয়া তাঁহার মনে প্রবল বৈরাগ্য ভাব জাগিয়া উঠিল। কিন্তু মহাপ্রভু কিছু বলেন না দেখিয়া আর পিতামাতার মনে কষ্ট হইবে ভাবিয়া বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

যথা সময়ে সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়া মহাপ্রভু চলিয়া গেলেন পুরীধামে। কিন্তু রঘুনাথের হৃদয়পটে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া রহিল প্রভুর স্বর্ণকান্তি গৌরমূর্ত্তি। দিবানিশি তিনি সেই শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান করিয়া কাটাইতে লাগিলেন।

ক্রমে রঘুনাথ হইয়া উঠিলেন পরিপূর্ণ যুবক। দিনরাত প্রভুর চিন্তা আর নাম কীর্ত্তন—এই নিয়াই তাঁহার দিন কাটে। কিছু দিন পর তাঁহার মন-প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য। পিতামাতার অনুমতি লইয়া তিনি পুরী যাত্রা করিলেন। সঙ্গে একজন সেবক চলিল তাঁহার জিনিষপত্র লইয়া। পথে রামদাস বিশ্বাসের সহিত দেখা হইল। রামদাস জাতিতে কায়স্থ আর সর্ব্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন রামভক্ত। সর্ব্বদা রাম নাম করিতেন। রামদাসও জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছেন। রঘুনাথকে দেখিয়াই তাঁহার পরম শ্রদ্ধা হইল। তিনি পরম আগ্রহে ভট্টের জিনিষপত্রের থলিটি সেবকের হাত হইতে তুলিয়া লইলেন নিজের মাথায়, ভট্ট রঘুনাথের কোন বারণই মানিলেন না। তারপর পথে বিশ্রামের সময় নিজ হাতে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ইহাতে রঘুনাথ সঙ্কোচ বোধ করিয়া বলিলেন, "এ তুমি কি করছ বিশ্বাস! তুমি এত বড় বিদ্বান্ আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তোমার এ রকম ব্যবহারে আমার বড়ই সঙ্কোচ বোধ হয়। এমনিই তুমি সঙ্গে চল, এ সব আবার কেন?" অনুনয় করিয়া রামদাস বলিলেন, "প্রভু, আমি অতি অধম, আপনার সেবক হবার যোগ্য নই। তবুও কৃপা করে একটু সেবা করতে দিন।

"সঙ্কোচ না কর তুমি আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥—চৈঃ চঃ

দয়া করে আমাকে এ সুখ থেকে বঞ্চিত করবেন না প্রভু!"

রঘুনাথ আর আপত্তি করিলেন না। দুইজনে এইভাবে আনন্দ করিতে করিতে পুরীতে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং মহাপ্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—

"ভাল হইল আইলে, দেখ কমললোচন।
আজি আমার ইঁহা করিবে প্রসাদ ভোজন ॥"

তারপর ভক্ত সেবক গোবিন্দকে বলিয়া তাঁহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। একে একে স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণের সঙ্গে রঘুনাথের পরিচয় হইল। মহা আনন্দে কাটিতে লাগিল তাঁহার দিনগুলি। মাঝে মাঝে মহাপ্রভুকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন তাঁহার বাসায় আর নিজে রান্না করিয়া ভোজন করান।

"রঘুনাথ ভট্ট অতি পাকে সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥"
— চৈঃ চঃ

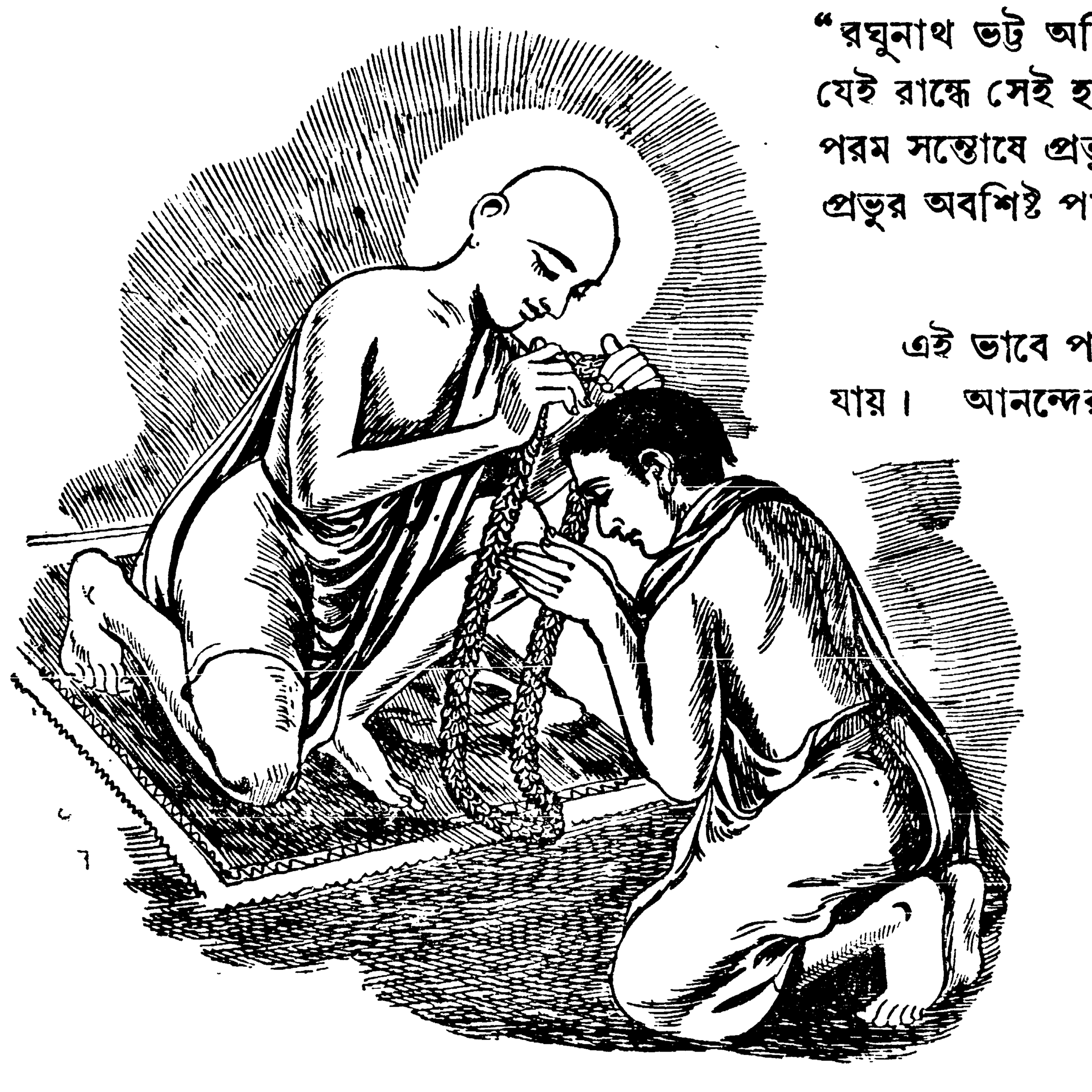
"…কণ্ঠমালা দিল তার গলে।"

এই ভাবে পরম আনন্দে ভট্টের দিন যায়। আনন্দের আবেগে তিনি ভুলিয়া যান পিতামাতার কথা। এদিকে রামদাস প্রভুর দর্শন পাইলেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ কৃপা পাইলেন না, কারণ মনে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার ছিল বিদ্যার অহঙ্কার। অহঙ্কার থাকিলে শ্রীভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। তিনি ভবিষ্যতের আশায় রাজার পট্টনায়কের ছেলেদের গৃহশিক্ষকের কাজ লইয়া পুরীতেই রহিয়া গেলেন।

সম্পূর্ণ আট মাস পুরীতে বাস করার পর মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলিলেন, "রঘুনাথ, বহুকাল হ'ল ঘরছাড়া হয়ে আছ, এখন তুমি কাশীতে ফিরে যাও। বিবাহ কোরো না কোন মতেই। সমস্ত কাজকর্ম্মের সাথে সর্ব্বদা কৃষ্ণ স্মরণ কোরো। আর—

"বৃদ্ধ পিতামাতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব স্থানে ভাগবত করহ অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে॥
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥"— চৈঃ চঃ

এমন স্বর্গীয় সুষমা—অমৃতের সাগর ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু প্রভুর আদেশ, যাইতেই হইবে। স্বরূপাদি ভক্তদের কাছে বিদায় লইয়া রঘুনাথ পুরী ছাড়িয়া চলিলেন কাশীতে পিতামাতার কাছে। দীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া রঘুনাথ পিতামাতার সেবা করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের কাশীপ্রাপ্তি হইল। রঘুনাথ তখন মুক্ত বিহঙ্গের মত। তিনি ছুটিয়া চলিলেন নীলাচলে পুরুষোত্তম দর্শনে। এবারও পূর্ণ আট মাস তাঁহার কাটিল মহাপ্রভুর সঙ্গে। তারপর একদিন প্রভু বলিলেন—

"আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবন।
তাঁহা যাই রহ যাঁহা রূপ সনাতন॥
ভাগবত পড় সদা লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥"— চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়া তিনি জগন্নাথের প্রসাদী তুলসীর মালা আনিয়া রঘুনাথের গলায় পরাইয়া দিলেন। প্রভুর আদেশে রঘুনাথ বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে পাইয়া রূপ-সনাতনের আনন্দ আর ধরে না। তাঁহারা রঘুনাথকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। সেইখানে থাকিয়া ভট্ট সাধন-ভজন করেন আর ভাগবত শ্রবণ করেন। ভাগবত শুনিতে শুনিতে তিনি বিবশ হইয়া পড়েন।

"অশ্রু বাস্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র কণ্ঠরোধ অশ্রু না পারে পড়িতে॥"—চৈঃ চঃ

বিকশিত কদম্ব কুসুমের মত কাঁটা দিয়া উঠে তাঁহার দেহ, ভাবে—প্রেমে তন্ময় হইয়া যান রঘুনাথ। সারা পশ্চিম ভারতে ছড়াইয়া পড়ে রঘুনাথের অপূর্ব্ব ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা। ছোট বড় বহু লোক আসিয়া তাঁহার কৃপা লাভে ধন্য হইয়া যায়। জয়পুর-রাজ মানসিংহ রঘুনাথকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। রূপ, সনাতন ও তাঁহার আদেশে মানসিংহ বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির ও রত্নখচিত সোনার বাঁশী এবং মকরকুণ্ডলাদি তৈয়ারী করিয়া দেন। এইভাবে দিন যায়। হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সংবাদ

আসিল মহাপ্রভু পুরীধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন। প্রভুর বিরহে রঘুনাথের প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। এই মরজগতে আর তাঁহার থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কয়েকদিন এইভাবে অস্বস্তি ভোগ করিয়া শেষে রঘুনাথ মনকে প্রবোধ দিলেন যে প্রভুর আদেশ পালন করিতেই হইবে, অস্থির হইলে চলিবে না। মনকে প্রবোধ দিয়া রঘুনাথ আবার সাধন-ভজনে ডুবিয়া গেলেন।

ভট্ট রঘুনাথ দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার ভাগবত পাঠ শুনিয়া পাষাণ-হৃদয় লোকের প্রাণও গলিয়া যাইত, মহাপাষণ্ডও অধীর হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিত। যখন তাঁহার শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন মহাপ্রভুর শেষ আশীর্ব্বাদ সেই তুলসীর মালা শিরে ধারণ করিয়া রঘুনাথ অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন।

নতুন বই

প্রথমেই একটি একেবারে নতুন ধরণের বইএর কথা বলি—'সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম সোপান'। লিখেছেন শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, যারা প্রথম গান শিখতে সুরু করেছে, তাদের জন্য লেখা এই বই। গান শেখানো ব্যাপারটা খুব সহজ নয়, বইএর সাহায্যে শেখানো তো আরও কঠিন! কিন্তু আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন লেখক এই বইএ। সঙ্গীত শিক্ষার গোড়াকার কথাগুলি যে এত সহজ ভাবে, এত সহজ ভাষায়—একেবারে গল্প শোনাবার মত লোভনীয় করে শোখানো যায় এ বই দেখার আগে তা আমরা হয়তো বিশ্বাস করতে পারতাম না। নীলরতন বাবু একদিকে সুকণ্ঠ গায়ক, অন্য দিকে কৃতী সাহিত্যিক। এই দুই গুণের সম্মেলন ঘটিয়েই হয়তো তিনি এই অসাধ্যসাধন করেছেন। যাঁরা গান সম্বন্ধে আগ্রহশীল অথচ গানের অ-আ-ক-খও জানেন না তাঁরাও এ বইখানি পড়ে অনেক কিছু জানবেন, উপকৃত হবেন প্রচুর। আর প্রথম শিক্ষার্থীদের তো কথাই নেই! যাঁরা বইখানির কথা জানেন না আশা করি তাঁরা অন্ততঃ বইটা একবার নেড়েচেড়ে দেখবেন।

অক্লান্ত লেখক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর 'বিদেশী রূপকথা' উপহার দিয়েছেন বাংলার ছেলে-মেয়েদের। ডেনমার্কের শিশুসাহিত্যিক হ্যান্স্ ক্রিশ্চিয়ান্ এণ্ডারসেন শুধু নিজেদের সাহিত্যে ন'ন, বিশ্বসাহিত্যের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁর রূপকথাগুলির তুলনা নেই। কিছু কিছু তোমরাও পড়েছ। পড়াই স্বভাবিক। কারণ এ পর্যন্ত, যত দূর জানা গেছে, পৃথিবীর ৬০টি ভাষায় তাঁর গল্প অনূদিত হয়েচে। বাংলাতেও কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু তাঁর এতগুলো গল্পের একত্র সংকলন এর আগে তেমন চোখে পড়ে নি। ধীরেন বাবু সেই অপূর্ব গল্পগুলি থেকে ২২টি গল্প বাছাই করে তাঁর নিজস্ব মনোরম ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন তোমাদের পাতে—সুন্দর রঙিন মলাট আর অজস্র রেখাচিত্রে সাজিয়ে। ভাল না লেগে উপায় কি?

সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম সোপান—শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতপ্রভাকর প্রণীত। হসন্তিকা প্রকাশিকা, ৩৭বি, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। দাম ১ টাকা। বিদেশী রূপকথা—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর সংকলিত। কিশোর ভারতী, ৯ ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম ২ টাকা।

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

জন্ম—১৯শে মাঘ, ১৩০৬। জন্মস্থান—পোতাজিয়া (পাবনা)। আদি নিবাস—চিমলিয়া, নদীয়া (বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলা—পূর্ব পাকিস্তান)।

কৃতী ছাত্র। ১৯২২ সালে এম্.এ পরীক্ষায় (বাংলা ভাষায়) প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবনে শিক্ষাব্রতী রূপে খ্যাতিলাভ করেছেন।

সাহিত্যচর্চা সুরু হয় কলেজে পড়বার সময় থেকেই। ছোটদের প্রায় সমস্ত সাময়িকপত্রে এক সময়ে ইনি নিয়মিত লিখতেন। শিশুসাথী (মাসিক ও বার্ষিক), খোকাখুকু, রামধনু, মাসপয়লা, জলছবি ভাইবোন, শুকতারা প্রভৃতিতে এঁর অনেক কবিতা, গল্প ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বড়দের বিভিন্ন সাময়িক পত্রও বাদ যায় নি। ছোটদের জন্য মণিমুক্তা, শয়তানের সুমতি, কালিদাস, হীরাজহরৎ, দাদুর দরদ, মৈথিলী এবং আরও অনেক বই লিখেছেন ইনি।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

জন্ম - ৩০শে শ্রাবণ, ১৩০৪। জন্মস্থান শিলাইদহ, জেলা নদীয়া (বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলা—পূর্ব পাকিস্তান)।

কুষ্টিয়া ইংরেজী স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজ থেকে আই. এ পাশ করার পর অর্থাভাবে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কুষ্টিয়া ইংরেজী স্কুলে এক বছর শিক্ষকতা করার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জমিদারীতে ১৮ বছর চাকরী করেন। তার পর ৫ বছর বিশ্বভারতীতে নিযুক্ত থেকে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই নানা রকম পল্লীসংগঠন ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন

ইনি। তার পর দীপিকা, শিশুসাথী, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতিতে লিখতে সুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার ফলে কবির জীবনালেখ্য নিয়ে একাধিক গ্রন্থ লেখার সুযোগ হয়েছে এঁর। ফলে, সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ, পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কবিতীর্থের পাঁচালী. সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ প্রভৃতি বইগুলি বাংলা শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নানা স্থানে রবীন্দ্র-জীবন-আলেখ্য নামে প্রাচীরচিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করে ইনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেও সাধারণ বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করেছেন।

ইন্দিরা দেবী

জন্ম—১১ই মার্চ, ১৯১৮। জন্মস্থান—কলকাতা।

বৌবাজার মিশনারী স্কুল ও কলকাতার সেন্ট পল্‌স্ কলেজে ছাত্রী-জীবন অতিবাহিত হয়।

কর্মজীবন সুরু হয় কলকাতা বেতারকেন্দ্রে, ইনিই সেখানকার প্রথম বাঙ্গালী মহিলা ঘোষিকা। তা ছাড়া বেতারে ছোটদের 'শিশুমহল' বিভাগ পরিচালনার ভারও আছে এঁরই ওপর।

এঁর প্রতিষ্ঠিত 'নন্দন' ছোটদের একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। কিছুদিন ইনি শিশু-সাহিত্য-পরিষদেরও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যা ছিলেন।

পিতার আগ্রহে ১৪ বছর বয়স থেকে প্রথম লেখা সুরু করেন এবং তাঁরই প্ররোচনায় সাহিত্য-জীবন সুরু হয়।

এঁর রচিত বিভিন্ন বইএর কয়েকখানি :—আজগুবি, মরনিং স্কুল, তুমি নারী মহীয়সী, সব সেরা সঞ্চয়, ঘুমিয়ে ছিল রাজকুমারী, বাদশা বেগম, ইন্দিরাদি'র গল্পের ঝুলি. পুতুল পুতুল ইত্যাদি। এ ছাড়া 'সাত সমুদ্দুর' নামক পূজাবার্ষিকীর ইনি সম্পাদিকা। কিছুদিন বসুমতীর ছোটদের আসরও (ডাকঘর) পরিচালনা করেছেন।

মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

(চৈত্র, ১৩৬৩)

গ্রাহকদের ভোটে বাংলা শিশুসাহিত্যের সবচেয়ে সেরা ১০০ খানা বইএর নাম এই রকম দাঁড়িয়েছে (গ্রন্থকারদের নাম আগে আগে দেওয়া হ'ল):—

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের—ঠাকুমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদামশায়ের থলে, সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল, হযবরল, ঝালাপালা. পাগলা দাসু, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর টুনটুনির বই, ছেলেদের রামায়ণ, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসিখুসি, হাসিরাশি, বনে-জঙ্গলে, মনোমোহন সেনের খোকার দপ্তর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজকাহিনী, বুড়ো আংলা, নালক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশু, শিশু ভোলানাথ, ডাকঘর,

সে, ছড়া, ছেলেবেলা, মুকুট, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আরব্যোপন্যাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের সীতার বনবাস, কুলদারঞ্জন রায়ের রবিন হুড, ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি, পুরাণের গল্প, অজ্ঞাত জগৎ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শিশুকবিতা, সীতা ও শান্তা দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথা, সীতা দেবীর আজব দেশ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের জাপানী ফানুস, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যকের ধন, মেঘদূতের মর্ত্ত্যে আগমন. মানুষ পিশাচ, ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের লালকুঠি, সুখলতা রাওয়ের গল্প আর গল্প, সুনির্মল বসুর ছন্দের টুং টাং, কাণাকড়ির খাতা, হুলস্থূল, আবৃত্তি-গান-অভিনয়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছেলেবেলার গল্প, শিবরাম চক্রবর্ত্তীর বাড়ী থেকে পালিয়ে, কলকাতার হালচাল, মণ্টুর মাষ্টার, সুবিনয় রায়ের বল তো, জীবজগতের আজব কথা, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর কীটপতঙ্গ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সোনার হরিণ, পদ্মরাগ, ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি, নূতন পুরাণ, চায়ের ধোঁয়া, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরণিক, ছোটদের অল্ কোয়ায়েট, অন্নদাশঙ্কর রায়ের রাঙ্গা ধানের খই, অখিল নিয়োগীর বেপরোয়া, স্বপনবুড়োর শৈশব, লীলা মজুমদারের দিনে দুপুরে, বদ্যিনাথের বড়ি, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের আকাশের গল্প, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, ধূমকেতু, জন্মদিনের উপহার, ইলিয়াড্, প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাতালে পাঁচ বছর, ভয়ঙ্কর, শয়তানের দ্বীপ, ড্রাগনের নিঃশ্বাস, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঁদের পাহাড়, ধীরেন্দ্রলাল ধরের গল্প হলেও সত্যি, অসি বাজে ঝন্ ঝন্, রমেশচন্দ্র দাসের সাগরিকা, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের মহাভারতের গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রলাল রায়ের নতুন কিছু, অভিশপ্ত, সত্যচরণ চক্রবর্ত্তীর দাগোবার্ট, জগদানন্দ রায়ের গ্রহনক্ষত্র, ছুটীর বই. ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর আকাশগঙ্গা, নীহাররঞ্জন গুপ্তের কালো ভ্রমর, বুদ্ধদেব বসুর ভূতের মতো অদ্ভুত, দস্যুর দলে ভোমরা, সুকুমার দে সরকারের দুই খুনী, ময়ূরকণ্ঠি বন, খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভোম্বল সর্দার, আফ্রিকার জঙ্গলে, চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রং চং, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আমার দেশ, নূতন যুগের নূতন মানুষ, বীরেন দাশের নতুন পাঠশালা, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের হিমালয় অভিযান, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব, জসীমউদ্দীনের হাসু, মৌমাছির কাজ-খেয়াল-খেলা ভুবনমোহন সেনের সুন্দর বনে সাত বছর, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার চম্‌চম্, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উঁচুনীচু।

এই তালিকা অনুযায়ী পুরস্কার গেলেন—

১ম পুরস্কার—শ্রীমাধুরী সান্যাল, ২য় পুরস্কার—শ্রীগৌতম সেন, ৩য় পুরস্কার-শ্রীসব্যসাচী দত্ত, ৪র্থ পুরস্কার—কুমারী নূরজাহান বেগম ও ৫ম পুরস্কার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক।

যে গল্প জানা নেই

শ্রীকৃষ্ণা সুর

—তেরো—

গোপাল ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো মামীমার কাছে। হঠাৎ তার মনে পড়লো মামীমাকে তো প্রণাম করা হয় নি! লজ্জাহত, কুণ্ঠিত, ত্রস্ত হাত দু'টি মামীমার পায়ে ঠেকিয়ে কপালে ঠেকানোর আগেই মামীমা দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন গোপালকে। গোপাল অনুভব করলো মামীমার চোখের জল অঝোরে গোপালের সারা দেহে স্নেহবর্ষণের ধারা ঢেলে দিচ্ছে। গোপালের চোখের জলও কখন তার অজানতে এসে পড়েছে তার গালে—গোপাল তা টের পায় নি মোটেই।

রিক্সাওলার ঘণ্টিতে গোপাল যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো। আর্দ্রস্বরে বললো—"মামীমা, আমায় কিছু বলবেন?"

মামীমা চোখের জল মুছে ঘাড় বাঁকিয়ে জানালেন, "হ্যাঁ।" তার পর ধীরপাদক্ষেপে ঢুকে গেলেন ঘরের ভেতর।

গোপাল পিছন ফিরে তার বাবার দিকে একবার তাকিয়ে মামীমাকে অনুসরণ করলো। মামীমা ঘরে ঢুকে অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার পর বললেন, "বুলুর বই তুমি নাও নি আমি জানি।"

লজ্জা-অপমানের একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা যেন খচ্ করে উঠলো গোপালের মনে। কাঁটাটা ফুটে ছিল অনেক আগেই। মামীমা বলে চললেন, "আমি জানি গোপাল, এ কাজ তোমার দ্বারা কখনও হতে পারে না। তোমার মামাবাবু বুলুর কথা শুনেই এমন সব কাণ্ড করে বসেছেন। এমনিতে ঠাণ্ডা, কিন্তু রাগলে ওঁর আর জ্ঞান থাকে না। দার্জিলিংএ বুলুদের এক বন্ধু জুটেছিল সুখেন। সে-ই মাঝে মাঝে এসে নাড়াচাড়া করত বুলুর বই। তারই এই কাণ্ড আমি আন্দাজ করছিলাম। এখন প্রমাণও পেয়েছি। ওরাও কাল কলকাতায় ফিরে এসেছে। সুখেনের ছোট ভাই টুকুন সেই বইয়েরই একখানা হাতে করে ঘণ্টাখানেক আগে আমাদের বাড়ী এসেছিল। সুখেন কিন্তু আসে নি। যাক্, এখন যখন তোমার বাবা এসে পড়েছেন, তুমি যাও। মার কাছেও তো এবার ছুটীতে যাও নি, তাঁরও মন নিশ্চয়ই উতলা হয়ে আছে। তোমার মামাবাবু এ সব কথা এখনও জানেন না। জানলে আবার নতুন করে কি কাণ্ড বাধাবেন কে জানে!"

এমন সময় গোপালের বাবা ডাকলেন, 'গোপাল!" গোপাল মামীমার দিকে তাকিয়ে দেখল, তিনি দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, তাঁর চোখ তখনও তেমনি ভেজা। গোপাল মাথা নীচু করে বেরিয়ে এল। মনে হ'ল, বুকের কাঁটাটা যেন একটু আল্‌গা হয়ে এসেছে।

* * *

ট্রেন চলেছে হু-হু করে, আর মাঝে মাঝে 'কু-কু' করে বিকট চীৎকার করে উঠছে। যেন মিছিমিছি ধরা পড়ার ভয়ে নিরপরাধ কেউ ছুটে পালাচ্ছে আর মাঝে মাঝে চীৎকার করে বলে উঠছে, "আমি চুরি করি নি গো, আমি চুরি করি নি!"

ট্রেন যত এগিয়ে চলতে থাকে গোপালের কাছে বড় হয়ে আসে ছায়া-ঘেরা গ্রামটির মাঠের বিস্তার আর ছোট হয়ে যায় জনাকীর্ণ কলকাতার 'মামার বাড়ী'। (ক্রমশঃ)

মহুয়া-বনের খেলা

শ্রীরত্নাবলী ভট্টাচার্য্য

মহুয়ার বনে সারাদিন ধরে
কিসের খেলা?
নীলাকাশে ভাসে একফালি সাদা
মেঘের ভেলা।
সুদূর আকাশে রং খেলা চলে,
মেঘের শিশুরা নামে দলে দলে,
রিম্‌ঝিম্ রবে ঝর্ণারা ছোটে
সারাটি বেলা।

সবুজ বনানী আন্‌মনে চেয়ে
পথের পানে,
পাগল বাতাস দোলা দিয়ে যায়
সবুজ ধানে।
মউলের ফুল পাতার আড়ালে
একটু ঝুঁকিয়া মুখটি বাড়ালে,
দুষ্টু ভ্রমর গুণ্ গুণ্ করে
ফুলের কানে।

চলে—খেলা চলে সারাদিন ধরে
মহুয়া-বনে,
দেখে দেখে শুধু কল্পনা জাগে
আমার মনে।
ঝাউএর সারিতে নিভৃত দুপুরে
সুর বেজে ওঠে কাহার নূপুরে,
পলাশের চোখে স্বপনের জাল
কে আজি বোনে!

এল বাদল

শ্রীসুগত সেনগুপ্ত

সকাল থেকে ঝিরিঝিরি ঝরছে বাদলধারা,
পাতার ফাঁকে চড়াইগুলি ভিজেই হ'ল সারা।
চুপ করেছে কাকগুলি আজ,
থেকে থেকে মেঘের আওয়াজ ;
মাতাল হাওয়া মাঠের বুকে
ছুটছে পাগলপারা।

খেয়াঘাটে বন্ধ হ'ল নৌকো পারাপার,
গাছের তলে রাখাল বেণু
বাজায় না তো আর !

নদীতে আজ ডেকেছে বান—
বারে বারে উঠছে তুফান,
ঘর থেকে আজ একটি বারও
বাহির হওয়া ভার।

ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাদলধারা ঝরছে একই সুরে,
দল বেঁধে মেঘ দামাল ছেলে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
তালগাছটা দোলায় মাথা,
ঝির্‌ঝিরিয়ে কাঁপছে পাতা,
মেঘে ঢাকা আকাশটা মোর
মন টেনে নেয় দূরে।

টেলিফোনেও এল ছবি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

"হ্যালো, হ্যালো !'

"কে, সুবীর ? এত দেরী করছিস কেন ? কোনও বিপদ্-আপদ্ হয় নি তো ?"

"না—না, এখানে এসে একটু আটকে গেছি। ফিরতে দেরী হবে। আমার খাবারটা ঢেকে রাখতে ব'ল।"

দশ মাইল দূর থেকে সুবীর তার মাকে জানিয়ে দিল টেলিফোনে। নিজের কানে ছেলের কণ্ঠস্বর শুনে মা-ও নিশ্চিন্ত হলেন।

এমন ব্যাপারও সে সম্ভব টেলিফোন আবিষ্কার হবার আগে কেউ তা বিশ্বাস করতে পারত না। কিন্তু এখন কত স্বাভাবিক বলে মনে হয় !

কিন্তু টেলিফোনে শুধু গলার স্বরই শোনা যায়। সামনা সামনি বসে, মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সুখ নেই তার মধ্যে। যার সঙ্গে কথা বলছ তার চেহারাটা তোমায় কল্পনা করে নিতে হবে।

কিন্তু কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি বক্তা ও শ্রোতা পরস্পরের চেহারাও দেখতে পেত তা হলে কেমন মজা হ'ত ! যেমন হয় টেলিভিশনে। রেডিও শোনার মত শুনতেও পাচ্ছ, সেই সঙ্গে দৃশ্যটাও দেখতে পাচ্ছ পর্দার গায়ে বায়স্কোপের ছবির মত !

টেলিভিশন অবশ্য অনেক দিন আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ওর চল হয় নি। কিছুদিন আগে কলকাতায় কোন এক প্রদর্শনীতে জিনিষটা ২।১ বার দেখানো হয়েছিল—ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। সাগর-পারের ওদিকে কিন্তু ওটি বেশ সহজ ব্যাপার হয়ে গেছে। সেখানকার লোকেরা খেলাধূলা দেখে টেলিভিশনে, নেতাদের বক্তৃতাও শোনে টেলিভিশনে যখন তখন। এই সেদিনও জওহরলালজী ওখানে টেলিভিশনে বক্তৃতা দিয়ে এলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা আরও এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা চেষ্টা করছিলেন টেলিফোনেও কথা বলার সময়ে বক্তা ও শ্রোতাকে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া যায় কিনা ছবির মারফৎ। সে চেষ্টা এখন সফল হয়েছে তাঁদের। এই নতুন জাতের টেলিফোনের নাম-করণও হয়ে গেছে—পিক্‌চার-ফোন। সেদিন নিউইয়র্ক সহরে একঘর লোকের মধ্যে আবিষ্কারকেরা তাঁদের যন্ত্র চালিয়ে দেখিয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন।

সাধারণ টেলিফোন যন্ত্রের সঙ্গে আর একটি ছোট যন্ত্র যুড়ে তৈরী হয়েছে এই পিকচার-ফোন যন্ত্র। আকারে ছোটখাট একটা রেডিও সেটের চাইতে বড় নয়। টেলিফোনে কথা বলার সময় সুইচ্ টিপে দিলেই যন্ত্রের গায়ের ছোট্ট একটি পর্দায় ফুটে ওঠে অপর দিক্‌কার আলাপরত ব্যক্তির ছবি। অবশ্য খুবই ছোট ছবি—আকারে হয়তো একটি পোষ্ট কার্ডের অর্দ্ধেকও হবে না। কিন্তু বেশ স্পষ্ট। ফটোর মত সাদা কালোয় মেশান। রঙ্গিন, স্বাভাবিক রংএর ছবি এখনও সম্ভব হয় নি—তবে কে জানে, পরে হয়তো তাও হবে। ছবির আকারও হয়তো বাড়ানো যাবে।

আর একদিক্ থেকে টেলিভিশনের সঙ্গে একটু তফাৎ আছে পিক্‌চার-ফোনের। টেলিভিশনের ছবি অনেকটা বায়স্কোপের মতই চোখে লাগে। কিন্তু পিক্‌চার-ফোনের ছবিকে এখনও অত দ্রুত চালানো সম্ভব হয় নি। ফলে ছবির গায়ে পরিবর্তন সেকেণ্ডে দু'বারের বেশী হয় না। এতে ছবির হাত-পা নাড়াও ঠিক এখনকার বায়স্কোপের ছবির মত অতটা সজীব লাগে না—প্রথম যুগের বায়স্কোপের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে বলা যায়। তবে ইচ্ছে মত সুইচ্ বন্ধ করে ছবিকে অদৃশ্য করা চলে—টেলিফোন সচল রেখেও।

কি করে এই যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব হ'ল তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে। ব্যাপারটি স্বভাবতঃই একটু জটিল, ভাল রকম বিজ্ঞানে জ্ঞান না থাকলে বোঝা কষ্টকর। তা ছাড়া ওর বিষয় সব খবর এখনও সাধারণে প্রকাশ করা হয় নি।

চিঠিপত্র

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

অবশেষে সত্যিই বর্ষা এল। বহুপ্রতীক্ষিত বর্ষা। রাত প্রায় বারোটা। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। আমার ঘরের পাশেই একটা ছোট্ট ছাদ। তাতে কতকগুলি টব বসিয়ে ছোটখাট একটি বাগান তৈরী করবার চেষ্টা করছেন আমার স্ত্রী। হয়তো ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানেরই একটা সূক্ষ্ম সংস্করণ করবার বাসনা তাঁর মনে। কিন্তু এতদিন কি তা হবার যো ছিল? শুকনো মাটী ক্ষণে ক্ষণে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল, কাঁহাতক জল টেনে টেনে তাকে সরস রাখা যায়? ফলে "টবাশ্রয়ী" গাছগুলো শুকিয়ে, ঝরে যা অবস্থা হয়ে এসেছিল তা আর কহতব্য নয়। কিন্তু মাত্র ক' দিনেই তার রূপ বদলে গেছে একেবারে। পাতাগুলি আবার লক্‌লকে হয়ে উঠেছে—সবুজে সবুজে ছেয়ে গেছে সারা শূন্যোদ্যান। শুধু কি তাই? ঘরে বসেই দেখছি কয়েকটি রজনীগন্ধা জিরাফের মত মাথা বার করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওদিকে গোটা কয়েক মল্লিকা,—হাসিতে-খুসিতে ভরপুর হয়ে গন্ধ বিলোচ্ছে অকাতরে। তার পাশে আছে আর একদল ফুল। তাদের শুধু রংএরই বাহার, গন্ধ নেই। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার দেখছি ছাদের আলসের দিকে তাকিয়ে। একটা মাধবীলতা কাঁঠাল গাছের গা বেয়ে একতলা থেকে কখন উঠে এসেছে তেতলার ছাদে, আর ফুলে ফুলময় হয়ে রয়েছে। হাজার হাজার ফুল—থোকা থোকা ফুল!—কোনটা সাদা, কোনটা গোলাপী, আবার কোনটা লাল—একই গাছে! এই কলকাতা সহরে এ এক অপরূপ অভিজ্ঞতা।

হঠাৎ জ্যোৎস্না আড়াল করে সারা আকাশ কালো হয়ে উঠল মেঘে মেঘে। এখনই হয়তো বৃষ্টি নামবে হুড় হুড় করে। তখন কি আর কলম নিয়ে বসবার ধৈর্য থাকবে? স্রেফ আলোটি নিভিয়ে শুয়ে পড়া, আর কবির ভাষায় "শুয়ে শুয়ে সুখস্বপ্ন রচনা করা।"—"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন—রিমিঝিমি শবদে বরিষে।"

কাজেই, তাড়াতাড়ি চিঠিটা শেষ করে ফেলি, বৃষ্টি আসার আগেই।

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ (বোম্বাই)—বোধ হয় তুমি শ্রীঘোষই হবে, ঠিকানা দেখে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু বাংলা চিঠিতে বিজাতীয় ভাষায় যে পেল্লাই সইটি করেছ তা একেবারেই দুর্বোধ্য। তুমি ফটো নিয়ে মেতেছ এবং পর পর কয়েকটি ফটো-প্রতিযোগিতায় ১ম ও ২য় পুরস্কার পেয়েছ এ অতি উত্তম খবর। শ্রীতাপস চক্রবর্তী (মাধিপুরা)—বারোয়ারী উপন্যাসের লেখা আরও তাড়াতাড়ি পাঠাও নি কেন? কাগজ কি বরাবরই দেরীতে বেরোক এই তোমরা চাও? শ্রীজয়া চাটার্জি (মরিয়ানী)—ইংরেজীতে চাটার্জি হলেও বাংলায় কিন্তু তোমার চট্টোপাধ্যায় হওয়া উচিত ছিল। অন্ততঃ পক্ষে চাটুয্যে। লাল শঙ্খের অরুণকুমার যদি তোমার মত অত চালাক হ'ত তা হলে ছায়ামূর্তি হয়তো ধরা পড়ত কিন্তু গল্পটি ঐখানেই মারা পড়ত, মাঠের মধ্যে এবং বেঘোরে। তোমাদের বাগানের আনারসের লোভ দেখিয়ে যে নিমন্ত্রণ করেছ তার মধ্যেই ওর মিষ্টি রসের গন্ধ পাচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণা সুর (কলিকাতা-৭)—বারোয়ারী উপন্যাসে একবার যোগ দিয়ে সফল হলেও পরে আবার যোগ দিতে কোন বাধা নেই। অসফল হ'লে তো নেই-ই। শ্রীগুণধর বর্ধন (ঝাড়বনি)—বাব্বাঃ, কী চিঠিই তুমি লিখতে পার! পেন্-ফ্রেণ্ডদের

গছিয়ে না দিতে পারলে আর নিস্তার নেই দেখছি! তোমার চিঠি পড়তে কিন্তু বেশ লাগে! কাজেই, জবাব যদি নাও পাও, তবু লিখে যেও। হোক না একতরফা, ক্ষতি কি? তোমার প্রিয় লেখকদের আবার রামধনুতে লিখতে বলেছি। শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্তী (জগলগড়ী)—তোমার প্রস্তাবিত বিষয়গুলি নিয়ে মাঝে মাঝে লেখা দেওয়া হবে বৈকি! তোমাদের ওখানে এবারে চৈত্র মাসে যে সব আমগাছে বোল ধরে নি, এখন সেখানে বোল ধরতে সুরু করেছে? খবরের কাগজেও পড়েছিলাম বটে। তাজ্জব ব্যাপার বলতে হবে! শ্রীশান্তনু মৈত্র (মেদিনীপুর)—চিঠিতে গ্রাহক নম্বর দাও নি কেন? ধাঁধাটি তোমার নিজের তৈরী কিনা জানিও। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—অঙ্কে যে তুমি এখনও পাকা হতে পার নি তার পরিচয় পাচ্ছি—তোমার দেওয়া ধাঁধার উত্তরে। অন্য পত্রিকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করা আমাদের পক্ষে ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হবে না কি? তবে ঐ পত্রিকার পরিচালক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হ'লে তোমার চিঠির কথা তাঁকে বলব। শ্রীঅসিতকুমার রায় (খড়গপুর)—মামার গানের খবর পেয়ে তুমি ব্যাঞ্জো ধরেছ? বলতে ইচ্ছে করছে 'তোফা!' 'নরানাং মাতুলক্রম' শাস্ত্রবাক্য তোমরাই তা হ'লে প্রমাণ করবে? মামাভাগ্নে একত্র হয়ে বরঞ্চ একদিন শুনিয়ে যেও কলকাতায় এসে।

কিন্তু,—ঐ বৃষ্টি এসে গেল! অতএব, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে, আজ এখানেই ইতি।

—ইতি রাঃ সঃ

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

টিকুলের বর্তমান বয়স ১৯, শিকুলের ১৪ ও সুমিতের ১২ বছর।

উত্তরদাতাদের নাম: কৃষ্ণা সুর (কলিকাতা-৪); নেপাল, বাবুল, কিংশুক, দেবজ্যোতি, ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় (পুরী); গোপাল, পরেশ, বিশ্বনাথ, জাহানারা (মুন্সীডাঙ্গা বোর্ড স্কুল—হাওড়া); অপু, মাল্যশ্রী, বাচ্চু, রেখা (জামসেদপুর); সোডবুমীবাসা (মাধিপুরা); শ্রীকোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ (দেউলা); খড়দহ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ (উদং); বলাইচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (রূপাসগোড়ী); অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর); অমিতাভ, চিন্ময় ও মুকুলিকা ঘোষ (কলিকাতা-২৫); শম্ভুনাথ মণ্ডল ও বেড়াচাঁপা দেউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (দেবালয়); দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-১২); প্রশান্তকুমার পাঠক (কোতুলপুর); সুমিত্রা পালিত (কলিকাতা-১৯); মুরারিমোহন মণ্ডল (কুমুড়সা)।

নূতন ধাঁধা

লালা হরকিষেণ শেঠের কাছে রামচরণ এল চাকরীর খোঁজে। বললে সে খুব ভাল গাড়ী চালাতে পারে—যে কোন গাড়ী।

"যে কোনও গাড়ী? আচ্ছা, ধর যদি তোমাকে একটা টম্‌টম, একটা সাইকেল-রিক্স, একটা স্কুটার-রিক্স আর একটা মোটর-গাড়ী এনে দিই তা হলে জান্‌কী দেবীর মন্দিরে যেতে তোমার কতক্ষণ লাগবে?"—জিজ্ঞাসা করলেন শেঠজী।

রামচরণ বললে, ঐ মন্দির কত দূরে সে জানে না, তবে এটুকু বলতে পারে যে টম্‌টমে সেখানে যেতে তার যত সময় লাগবে সাইকেল-রিক্সয় লাগবে তার অর্দ্ধেক, স্কুটার-রিক্সয় লাগবে তারও অর্দ্ধেক, আর মোটর-গাড়ীতে আবার লাগবে তারও অর্দ্ধেক সময়।

শেঠজী তাকে পরখ করবার জন্য ঐ চার রকম গাড়ীই আনিয়ে দিলেন আর রামচরণও ঠিক ঠিক তার কথা মত সময়েই জান্‌কী দেবীর মন্দির পর্য্যন্ত সেগুলি চালিয়ে দেখিয়ে দিল। হিসেব করে দেখা গেল এই চার বার যেতে গড়ে সে ঘণ্টায় ১৬ মাইল বেগে গাড়ী চালিয়েছে।

তা হ'লে রামচরণ টম্‌টম্ হাঁকাবার সময় ঘণ্টায় কত মাইল বেগে সে গাড়ী চালিয়েছিল?

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৶৹

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২৷৹

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬৷৹
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১।	জয়যাত্রা	— ৪৲
২।	দেবালয়	— ৪৲
৩।	ইন্দ্রধনু	— ৪৲
৪।	বসুধারা	— ৪৲
৫।	পরশমণি	— ৪৲
৬।	ছোটদের চয়নিকা	— ৩৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১১ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸৹

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৷৷৹

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷৹

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷৹

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷৹

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৷৶৹

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানি বই]

শিশু উপন্যাস

[প্রায় ৩০০ শত খানি বই বাহির হইয়াছে]

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা, ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

লেখা চাই

অভিনব, সচিত্র কিশোর-মাসিক; বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ; বার্ষিক সডাক ২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১।০, নমুনা ৶০; যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়; ভি, পি, হয় না। তিনটি রচনা-প্রতিযোগিতায় মোট আঠারটি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে; পুরস্কার-প্রাপ্ত ১৮টি "লেখা"ই ৺শারদীয়া সংখ্যায় ছাপা হইবে; অন্ততঃ ষাণ্মাসিক 'গ্রাহক' না হইলে রচনা গ্রাহ্য হইবে না। ক-বিভাগে, বিষয় "স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কবিতা", আয়তন "লেখা চাই"এর এক পৃষ্ঠা, প্রতিযোগীর বয়স ১৮ বছরের কম। খ-বিভাগে, বিষয় "দেশ"-প্রেমিকের আত্ম-বিসর্জ্জন-সম্পর্কীয় ছোট গল্প", তিন পৃষ্ঠা, বয়স ১৮এর নীচে। গ-বিভাগে, বিষয় "শ্রীঅরবিন্দের সাধনা" -শীর্ষক প্রবন্ধ, ২ হইতে ৪ পৃষ্ঠা, বয়সের কোন গণ্ডী নাই। "টাকা" ও "লেখা" পৌঁছিবার শেষ তারিখ আগামী ১৪ই ভাদ্র। ঠিকানা :—শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, বি-টি, সম্পাদক "লেখা চাই", লেখা চাই কার্য্যালয়, পোঃ দেবালয়, জিলা ২৪ পরগণা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ! আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে

অতুলনীয়

লক্ষ্মী ঘি

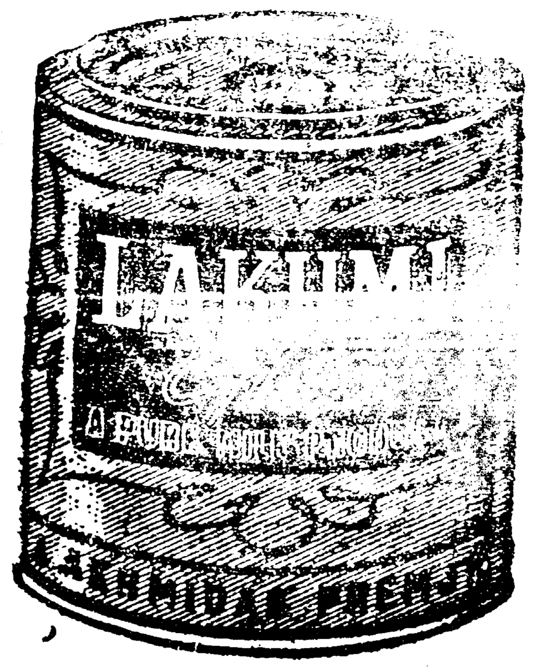

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্ব্বত্র
সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন-২২-৭২৪৩

ছোটদের গ্রন্থাগারে রাখবার মত বই

শ্রীঅমলেন্দু সেনের
- রায় পাহাড়ীর নিশাচর — ৸০
- অনুসন্ধানী — ১॥০
- দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্স্ — ॥৶০
  (কুপারের বিখ্যাত উপন্যাস)

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
- দি অলিভার টুইষ্ট — ॥৶০
  (ডিকেন্সের অমর উপন্যাস)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
- বিজ্ঞানের জয়যাত্রা — ১৲
  (বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের গল্প)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
- ধূমকেতু — ৸০
  (বিজ্ঞানের ভিত্তিতে রহস্য-উপন্যাস)

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
রহস্যময় ডিটেকটিভ উপন্যাস
- পদ্মরাগ — ১।০
- ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি — ১।০
  মজাদার হাসির গল্প
- চায়ের ধোঁয়া — ৸০
- এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে — ১৲
  (শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর সহযোগে)

একখানি দরকারী বই

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

ঘরে বসে সাবান, কালি, দাঁতের মাজন এবং আরও হরেক রকম রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার সহজ প্রণালী।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ—দাম ১।০

রামধনু কার্য্যালয়,
১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ! আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

রামধনু

[illegible] নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

বার্ষিক ৪ টাকা
ষাণ্মাসিক টা. ২.২৫
প্রতি সংখ্যা ৩৭০ প.

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন – ৩৫-২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

৴২৷৷০, ৴৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ – শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

ছোটদের ভাল ভাল বই ঃঃ নামকরা বই

নবীগোপাল চক্রবর্ত্তীর -

কাঠ ও কাঠের কাজ	১৷৷
বাঁশ, বেত, পাতা ও সোলার কাজ	১৲
তন্তুশিল্পের কাজ	১৲

আলোক চক্রবর্ত্তীর –

মনসামংগল	১৲
চৈতন্যমংগল	১৲
কুমারসম্ভব	১৲

শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তীর—

রঘুবংশ	১৲
রাণী রাসমণি	১৲
জাগ্রত মোদনী	১৲

ছোটদের অভিনব মাসিক পত্রিকা

চয়নিকা

১৮ বছরে পড়ল ঃ বার্ষিক মূল্য মাত্র ৩৲

যে কোন মাসে টাকা পাঠালেও বৈশাখ থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক হতে হয়। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা মাত্র ।০ আনা। অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গ ও সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত।

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

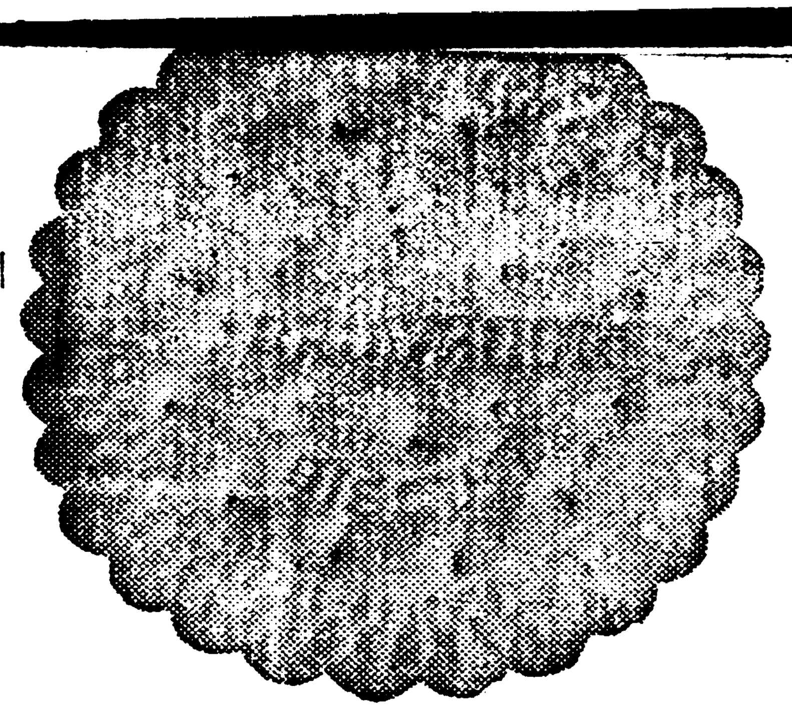

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে ; গুণে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে **ভারতের নিজস্ব** চরম উৎকর্ষ

আনন্দে এবং নির্বিঘ্নে

ব্যবহার করুন

ইণ্ডিয়া সাইকেল

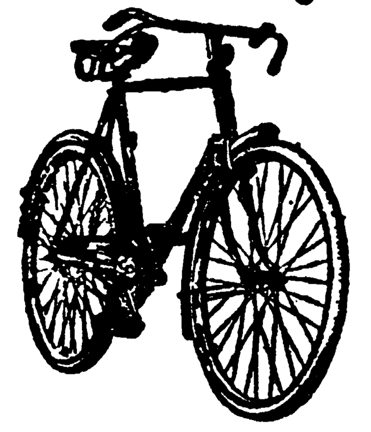

সুপার ডি-লুক্স

সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে
নিখুঁত ভাবে
প্রস্তুত

রোডষ্টার

সর্বকর্মোপযোগী ও
সর্বজন প্রশংসিত
আদর্শ সাইকেল

ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ কলিকাতা-১

Kirti ADVERTISING AGENCY

REPRESENTATIVE OF
FAMOUS NEWS PAPERS & MAGAZINES

72, HINDUSTHAN PARK • CALCUTTA-29

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে

অতুলনীয়

লক্ষ্মী ঘি

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্বত্র
সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন-২২-৭২৪৩

ভারত স্বাধীন হবার পর

ওপরে বাঁ-দিকে প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ায় স্বাক্ষর করছেন। ডানদিকে রাজস্থানের একজন গ্রামবাসী—সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করছেন। নীচে বাঁ-দিকে—বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডাঃ ভাবা ভারতে তৈরী পরমাণবিক চুল্লীর মডেল দেখাচ্ছেন। ডান দিকে—হীরাকুঁদ বাঁধের একটি দৃশ্য—প্রধান অংশ তৈরী হবার পর।

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৬৪ { ৫ম সংখ্যা

শেষ বর্ষণ

শ্রীদীপালি সেনগুপ্তা, এম্. এ

প্রখর রোদে স্তব্ধ ভুবন, ঝিমিয়ে আছে নদীর চর,
ঝল্‌সে-ওঠা আকাশ-কোণে জমছে রে ঐ মেঘের স্তর ;
হঠাৎ হাওয়ার মিষ্টি ছোঁয়া বুলিয়ে দিল সবার পর
বৃষ্টিধারা সুনির্ঝর।
মেঘ ভেঙ্গে ঐ পড়লো ঝরে—কী সুন্দর !

ঝর্‌ঝরিয়ে আসছে দূরে শুনছি নদীর গানের সুর,
দেখছি চেয়ে খুসীর নাচন কোমল-কচি ঢেউ-শিশুর ;
ধানের ক্ষেতে পরশ তাদের তুলছে হাসির কলস্বর
দিক্ হতে ঐ দিগন্তর।
গানভরা প্রাণ ছুটছে হাওয়ায়—কী সুন্দর !

বৃষ্টি থামে ; হঠাৎ নামে ছিন্ন করে মেঘের বাঁধ
একটু আলোর উজল ধারা, ফেলছে ধরায় সোনার ফাঁদ ;
সোনার ঢেউয়ে ভর্‌লো নদী—ঝল্‌কে ওঠে নীলাম্বর
অশ্রুঝরা মুখের 'পর।
মেঘ-ভাঙ্গা ঐ আলোর হাসি—কী সুন্দর !

হাজার কুচি শুভ্র তুষার ভরলো বুঝি শিউলীতল,
শির্‌শিরিয়ে বইছে বাতাস, ফুলের বাসে বন উতল ;
সর্‌লো দূরে কী মন্তরে সজল-কালো মেঘের স্তর,
স্নিগ্ধ আলোয় সুমন্থর।
শুভ্র মেঘের ভাস্‌লো ভেলা—কী সুন্দর !

ভয়ে কি না হয় !

শ্রীশামুক

ঘটনাটি পুরোপুরি সত্যি। কিন্তু স্থান, নাম সমস্ত লুকিয়ে স্রেফ্ চিহ্ন দিয়ে লিখতে হচ্ছে। তোমাদের নিয়ে গল্প লিখলে আমায় ঘিরে তিড়িংমিড়িং নাচবে—সে জানি। কিন্তু বড়দের নামে লিখলে আমার মাথার ওপর চাঁটির চড়াং সুরু হয়ে যাবে বিশেষ যদি বোকামির বর্ণনা থাকে।

উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ সহর উ। ক ও তার স্ত্রী কী ধনী পাড়ায় ছোট বাংলোতে থাকে। ক শান্ত নিরীহ মানুষ,—কী যা বলে তাই করে, যা বলে না তা কখনো করে না। কী-র হাতের রান্নার ভয়ানক নাম। এমনি গুজব যে যেদিন ও রাঁধে সেদিন বাড়ির আনাচে কানাচে অনেকে আড়ালে ঘুরে বেড়ায়—গন্ধে নাকি অর্দ্ধেক পেট ভরে যায় !

একদিন রাত্রে নেমন্তন্ন খেতে এল স্বামী-স্ত্রী খ ও খী, লড়াই-ফেরৎ কাপ্তেন ঢ আর কুমারী ই। খ ও খী-র খিটিমিটি সর্বদা, এক মিনিট নিজেদের মধ্যে তর্ক না করে থাকতে পারে না। ঢ-এর লম্বা ঢোলকের মত আঁট-সাট চেহারা—সবেতেই ব্যস্ত, সবেতেই নিজের মত চাপিয়ে দেয়, অন্যের কথা মনে থাকে না। ই ছিপছিপে সুন্দরী

মেয়ে। সকলে জোর করছে ঢ-কে বিয়ে করতে। এমনি অবস্থা যে রাজী না হয়ে বুঝি আর উপায় নেই।

কী নিজে হাতে শুধু মাংসটা রেঁধেছে শুনেই খ ও খী তর্ক সুরু করে কী-র রান্না কোর্মা বেশী ভাল না কালিয়া।

ঢ ই-কে উদ্দেশ করে বলে,—আজ সকালে বেড়াবার পথে দেখি আবদুলের দোকানের সামনে খুব ঝগড়া। ও নাকি একটা সাপে-কামড়ানো মরা পাঁঠা কেটেকুটে অন্য মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে বেচছিল !

শিউরে উঠে কী জিজ্ঞেস করে,—রাঁধলে কি সাপের বিষ যায় না ?

ঢ বলে,—মনে হয়তো না।

ই বলে,—নিশ্চয়ই যায়।

খ ও খী কোন্ কোন্ সাপের বিষ কত মারাত্মক—বিতর্ক চালায়।

মনের ভেতর খচ্ খচ্ করে। ক বাবুর্চিকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে সে বলে যে আবদুলের দোকান থেকেই এনেছে—তখন কোন ভীড় ছিল না।

ভারি অস্বস্তি। জিভ থাকতে কী-র রান্না মাংস ফেলে দেওয়া যায় না, আবার খাবার পরই যদি—!

ঢ উরুত চাপড়ে উঠে দাঁড়ায়,—হুররে ! একটা রাস্তা বার করেছি। কুকুর-টুকুরকে চাখিয়ে দেখা যাক।

ঢ হৈ হৈ করে সকলকে টেনে বার করে বাগানে। বাবুর্চি রাঁধা মাংস আনলে আর, ডাকতেই,—রাস্তার কুকুর কালুয়া লেজ নাড়তে নাড়তে এসে হাজির।

ক ফিস্‌ফিস্ করে বলে,—কী, কাজটা ভাল হচ্ছে না। রাস্তার কুকুর হলেও জীব ত' !

কী বলে,—চুপ কর, উপায় নেই।

ক নাক থেকে চশমাটা খুলে মুছে আবার পরে নেয়।

কালুয়ার যখন কিছু হ'ল না তখন খেতে আপত্তি কি ? সে যা খাওয়া হ'ল মনে রাখার মত। খাওয়ার পর বসবার ঘরে এলিয়ে খেলিয়ে বসে পান-সিগারেট চলেছে। তৃপ্তিতে মুখগুলো তমতম করছে। খ ও খী বাদানুবাদ আরম্ভ করে খাওয়ার ঠিক কতক্ষণ পরে ঘুমোনো উচিত। ঢ ই-কে উদ্দেশ করে বলতে থাকে, একবার পাহাড়ের চূড়োয় উঠে কি ভাবে শত্রুর মেসিন গান সে দখল করেছিল।

মালির ছেলে বিটুয়া দৌড়ে এসে বলে,—মাইজী, উই কুত্তা মর গিয়া !

ঢ দু' হাত মুঠো করে লাফিয়ে তেড়ে যায়,—হোয়াট ! গেট-আউট।

বিটুয়া বাচ্চা হরিণের মত দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অত হাসি, অত খুসি উড়ে গেল সবটুকু। একেবারে থুম হয়ে সকলে নিজের নিজের কথা ভাবে—বিষ! কি হবে এবারে?

ঢ লম্বা লম্বা কয়েকবার পায়চারি করে বলে,—হাসপাতালে চললাম, পাম্প করে পেট থেকে যদি তাড়াতাড়ি সব বার করা যায় তবেই বাঁচবার আশা।

সিগারেটের ছোপ-লাগা আঙুল নিজের চোখের সামনে ধরে বলে,—ইস্, এর মধ্যেই নীল হতে সুরু হয়েছে!

ঢ চলে যাবার সঙ্গেই খী দৌড়ে বাথরুমে গেল। এ ঘরের মানুষেরা চমকে চমকে শোনে নানা বিকট আওয়াজ। খ কানে আঙুল দিয়ে বসে ঘামতে থাকে।

খ, খী বাড়ি গেল নিতান্ত মুমূর্ষু অবস্থায়। ক ও কী-র দশাও সুবিধার নয়। কী উপরি উপরি নিয়ে আসে পারম্যাঙ্গানেট-জল, তেঁতুল গোলা, ভাস্কর লবণ,—পেট কামড়ানোর যত ওষুধ ও শেষে মহাকালীর পায়ের ফুল ধোয়া। নিজে খায় আর ক-কে দেয়। ক-এর পেট ঢাকের মত ঢপ্ ঢপ্ করছিল, তবু নির্বিবাদে সমস্ত গলায় ঢেলে দিল।

বাবুর্চি কি কাজে ওদিকে যাচ্ছিল, ক ডেকে কুঁতিয়ে জিজ্ঞেস করে,—কুকুরটা কি খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে?

—না, চাকার তলায় পড়েছে আর মরেছে।

—গাড়ি চাপা পড়ে মরেছে?

—হ্যাঁ, মোটার এসে হঠাৎ চাপা দিয়েছে।

—ডাক বিটুয়াকে। পাজী শয়তান, কেন বলিস নি এ কথা?

—কখন বলবো? ঐ জমাদার সাহের ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে এলেন যে!

কী পাগলের মত হাসে। বিষ তাহ'লে নয়, মনের ভয়—আর মরতে হবে না। ক বোকার মত চেয়ে ছিল, কী বললে, তুমি হাসছো না কেন?—তাই সেও হাসতে আরম্ভ করে দিল। অন্যদের খবর দিতে হয়। হয়তো এতক্ষণ মর মর হয়েছে বা সত্যি মরে গেছে!

ত্ব'জনে গিয়ে দেখে খ ও খী পাশাপাশি বসে ক্লান্ত ভাবে তর্ক করছে কার আগে মরে যাওয়া উচিত।

চারজনে ই-র বাড়ি গেল। ই মার ফটো সামনে রেখে কবিতার বই পড়ছিল, আর মাঝে মাঝে আয়নাতে নিজের মুখ দেখছিল। শুনে বলে, আমিও তাই ভাবছি। কোন গোলমাল হয়েছে, এতক্ষণে তো শেষ হ'ল না!

পাঁচজন হাসপাতালে গেল। ঢ-এর অবস্থা সাংঘাতিক। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে—এই যায় ত্রে এই যায়। চেঁচিয়ে, কাগজে বড় অক্ষরে লিখে, আকারে ইংগিতে যখন বোঝানো গেল যে বিষ নয় তখন থেকে অবস্থা শোধরাতে লাগল।

এই ঘটনাতে একটা ভাল হ'ল শেষ পর্যন্ত। কাপ্তেন ঢ নিজের চেষ্টায় উ ছেড়ে অন্য দূর জায়গায় বদ্‌লি হয়ে গেল। বেঁচে গেল ই।

রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী

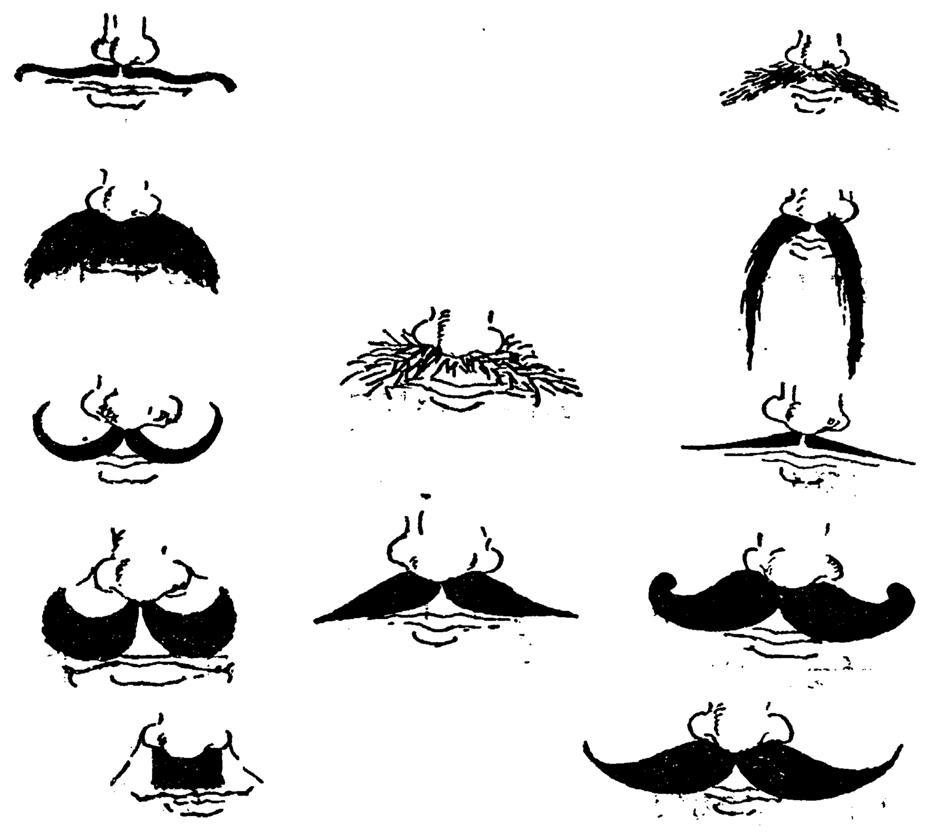

হিরণ্ময় ঘোষাল

"সদিয়া বলে এখন আর কিছু নেই, যদিও নতুন সদিয়া নাম দিয়ে একটা শহর গড়ে তোলবার চেষ্টা চলেছে। আগেকার সদিয়ার মত সুন্দর শহর আসামে তেজপুর ছাড়া আর ছিল না। বাংলা-ধরণের ছোট ছোট বাড়ী। চারিপাশে ফল আর ফুলের বাগান। পথের ত্ব' ধারে সারি সারি কাঞ্চনফুলের গাছ।..."

বলতে বলতে রায় বরুয়া যেন পেছনের একটা পর্দা সরিয়ে একটা আধো-অন্ধকার অলিন্দ দিয়ে খানিকটা দূরে চলে গেলেন। স্মৃতির অলিন্দ অতীতের দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

না, সদিয়া বলে এখন আর কিছুই নেই। ভূমিকম্পের পর ব্রহ্মপুত্রের তিন উপনদী কুণ্ডিল, দিবাং ও লোহিত এবং স্বয়ং ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রলয়ে সদিয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন। এই তো সেদিন, মাত্র কয়েক বছর হলো, রায় বরুয়া সন্ধ্যার দিকে নদীর ধারে পায়চারী করবার পথটায় হাওয়া খেতে বেরুতেন। সেখানে পরশুরাম কুণ্ডের তীর্থযাত্রীদের মধ্যে কত পরিচিতের সঙ্গে দেখা হতো।

সদিয়াতে ওঁদের ছোটখাটো একটি সৌখীন বাগান-বাড়ী ছিল। বসত-বাটি

নয়, ন' মাসে ছ' মাসে হয়তো একবার আসতেন দেশী-বিদেশী নানা শিকারী বন্ধুদের নিয়ে। সদিয়া থেকে দেনিং পর্যন্ত বাঁধানো পথ দিয়ে গাড়ী করে যাওয়া যেতো। এখনো যায়। পথে গোটা ছুই নদী পার হতে হয়। পায়া নদী ওসারে খাটো বটে কিন্তু তেজে ব্রহ্মপুত্রের সাক্ষাৎ নাতনী। বর্ষায় কাঠের পুলটা কোনো রকমে টিকে থাকে মাত্র। দিগারু নদীর আয়তন যেমন প্রশস্ত, স্রোতও তেমনি প্রখর। খুব গভীর নয়, হাতীর পিঠে পার হওয়া যায়। শীতে দিগারু যখন একপাশ দিয়ে ধীরে ধীরে পা টিপে চলে, তখন তার ওপর বাঁধা হয় পুল প্রতি বছর, এবং বালুচরের ওপর দিয়ে অনায়াসে মোটরগাড়ী যাতায়াত করতে পারে।

গত যুদ্ধের সময়ে দেনিঙে ইংরেজ ও মার্কিনীরা একটা সামরিক ঘাঁটি বানিয়েছিল। সুতরাং দেনিং পর্যন্ত পথটা মোটরের উপযোগী পাকা রাস্তা। তাবে রাস্তাটা পাকা হওয়ার জন্যে চারিপাশের জঙ্গলে কোন পরিবর্ত্তন হয় নি।

দিগারু নদী থেকে ক্রোশ দুয়েক দূরে মানচিত্রের ওপর ছোট্ট একটি ছিটের মত ক্ষুদ্র জনপদ। নাম তেজু। লোহিতের করদ নদী তেজুর নামে তার নাম। এখন তেজুকে একটা ছোটখাটো শহর বলা চলে। তখন পাকা রাস্তার ধারে কয়েক ঘর লোক বাস করতো। কিছু পার্বত্য জাতি, যাদের তখন মিশ্‌মী বলা হতো। এখন মিশ্‌মী নামের প্রচলন থাকলেও তাদের মধ্যে তিন খণ্ড উপজাতির খোঁজ পাওয়া গেছে। ইদু, দিগারু (তারাওঁ) আর মিজু। দু'-একঘর অসমীয়া, কয়েক ঘর নেপালী।

যুদ্ধের সময়ে ওদিক্‌টায় অসামরিকদের সাধারণতঃ অবাধগতি ছিল না, এবং ও অঞ্চলে রায় বরুয়ার যাবার প্রয়োজনও বিশেষ ছিল না। দৃশ্য এমন কিছু মনোরম নয়। দূরে মিশ্‌মী পাহাড় আর বসতির গা ঘেঁষে বহে-যাওয়া তেজু নদী। শিকারও যা পাওয়া যেতো তা মামুলী, অর্থাৎ হাতী, বাঘ, ভাল্লুক। তা শিকার করতে তেজু পর্যন্ত যাওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিলো না। সদিয়ার একটু বাইরে গেলেই যে সব জায়গায় চাষ-আবাদ করা হতো সেইখানে ও-সব জন্তুর অভাব ছিল না।

পাওয়া যেতো না যে জন্তু তারই খবর পেয়ে রায় বরুয়া একদিন তাঁর বিশ্বস্ত সুহৃৎ 465 ও অনুগত নেপালী ভৃত্য বুদ্ধিমান্‌কে নিয়ে মোটরে করে তেজু যাত্রা করলেন।

জন্তুটা হচ্ছে কালো চিতা, যার শিকারে রায় বরুয়া হিমালয়ের বহু দুর্গম অঞ্চলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত করে বিফল হয়েছেন। কালো চিতা যেমন দুর্দ্ধর্ষ তেমনি নিষ্ঠুর এবং তেমনি ধূর্ত। অতি গোপনে লোকালয়ে প্রবেশ করে সে চক্ষের নিমেষে তার ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সমাধান করে নিঃশব্দে উধাও হয়ে যায়। বাঘ সাধারণতঃ মানুষ

মারে না। কালো চিতা পালিত পশু ছারখার করে। খামখা ঘরে ঢুকে মানুষ মেরে সমগ্র গ্রামকে তছনছ করে যায়। তার গতি যেমন ক্ষিপ্ত তেমনি গতিবিধি তার অনবধার্য। কী ভাবে আসে, কী ভাবে যায়, কোথায় তার সাক্ষাৎ মেলে তা নিরুপণ করা শিবেরও অসাধ্য। যেন হাওয়ায় মূর্তি গ্রহণ করে হাওয়ায় মিশে যায়। সাক্ষাৎ কালো যমদূত!

রায় বরুয়া সদিয়ায় এক মার্কিনী অফিসারের মুখে শোনেন, তেজুতে কালো চিতার উপদ্রবে বসতির লোকরা এত সন্ত্রস্ত হয়ে হয়ে পড়েছে যে দিনের বেলাতেও কেউ ঘর ছেড়ে বেরুতে চায় না। কয়েকজন মার্কিনী সৈনিক দু'দিন ধরে আশেপাশের বনে অন্বেষণ করে চিতার সন্ধান পায় নি। তারা কেবল চিতাকে "দি ব্ল্যাক্ ডেভিল্" এই অপমানসূচক নাম দিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।

রায় বরুয়া যখন তেজুতে পৌঁছলেন তখন প্রায় গা-ঢাকা হয়ে এসেছে। সমস্ত বসতিতে যেন মড়ক উপস্থিত হয়েছে। পথে জনমানব নেই। ঘরে ঘরে আগল দেওয়া। মিশ্‌মীরা সাধারণতঃ অতিথিবৎসল হয়ে থাকে। কিন্তু মোটরের আওয়াজে তো নয়ই, এমন কি ডাকাডাকিতেও কেউ দোর খুলতে রাজী নয়। ভয়, দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কালা শয়তান হাওয়ায় মিশে ঢুকে পড়বে। তখন শীতকাল, ওদিক্‌টায় ঠাণ্ডাও পড়ে বেশ। রাত্রে না হয় শিকার করলেন, কিন্তু শেষে রাত্রেই হোক্, দিনেই হোক্, বিশ্রাম তো করতেই হবে! কালা শয়তানকে খতম করতে কতদিন লাগবে তা বলা যায় না। মোটরে টহল দেওয়া খুব সুখপ্রদ বটে কিন্তু মোটরে শোয়ার মত ঝকমারি দুনিয়ায় নেই। তা ছাড়া বুদ্ধিমান্ ওজর জানালে। সে রাঁধবে কোথায়? সা'বকে সে চিঁড়ে-গুড় আর কলা খেতে দিতে পারে না। তার জান্ থাকতে নয়। ওসব জায়গায় আবার দুধ পাওয়া যায় না। উপজাতিরা সাধারণত: দুধকে হারাম জ্ঞান করে। বুদ্ধিমান্ কত রকমের মশলা নিয়ে এসেছে। এনেছে বাদাম, পেস্তা, কিশ্‌মিশ্‌, বাসমতী চাল। তার একটা ডাকবাংলা চাই-ই চাই।

কিন্তু ডাকবাংলা তো "তথাস্তু" বলে নিমেষে সৃষ্টি করা যায় না! কাজেই রায় বরুয়া মোটরটাকে পেছু হাটিয়ে তেজু নদীর ধারে নিয়ে রাখলেন। উদ্দেশ্য ঐ জায়গাটাকে ওঁর শিকারের সদর মহকুমা বানানো। বুদ্ধিমান্ প্রভুর যথেচ্ছ ব্যবহারে ব্যথিত গ্রেট্ ডেনের মত কয়েকবার আড়চোখে তাকিয়ে থম্ হয়ে মোটরে বসে রইলো। ভাবটা, ওঁর দুর্বুদ্ধি হয়েছে, যা করেন করুন, আমি কোথাকার কুকুর?

এমনি সময়ে নদীর ধারের একটি উপজাতির কুটীর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে পরিষ্কার অসমীয়তে তার আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলো। সে তারাওঁ,

নাম তাংকি তায়েং। সাব "হয়" কিংবা "ন হয়" বলবার পূর্বেই বুদ্ধিমান মালপত্র কুটীরে তুলে ফেলেছে। জায়গাটা খুব তার পছন্দ নয়। নেপালী হিসেবে সে সুঁগর্-মাংস অতি আনন্দের সঙ্গেই ভক্ষণ করবে, কিন্তু দেবাদিদেব পশুপতিনাথ না করুন, যেন ওরা কতকটা গো-জাতীয় মিথন-মাংসের ব্যবস্থা করবে। যাই হোক্, এ মন্দের ভালো। আগুনের ধারে হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া যাবে, এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে ঐ আগুনেই চমৎকার এক হাঁড়ি পোলাও বানানো যেতে পারে।

রায় বরুয়া তাংকি তায়েঙের ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলেন সে পরিবার শোকার্ত। ঘরের মাঝখানে আগুন জ্বলছে. তারই কাছে বসে আছেন একজন স্ত্রীলোক। পরিচয় করিয়ে না দিলেও বুঝতে পারলেন, উনি শ্রীমতী তায়েং। স্ত্রীলোকটির চুল আলু-থালু। কানের বড় বড় রূপোর পাশা, রূপোর চন্দ্রহার সব খুলে মাটিতে রেখে দিয়েছেন। দু' হাতে মুখ ঢেকে ঠায় বসে আছেন। বাহ্যজ্ঞান নেই বললেই হয়। অতিথির আগমনে তাঁর কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেলো না। সন্তানহীনা মাতা যে রকম নির্জীব পাথর হয়ে যায় এ তাই।

তাংকি তায়েং চোখের ইশারায় রায় বরুয়াকে যা বললো তার অর্থও তাই। তারপর একটু দূরে নিজে হাতে যত্ন করে একটা চাটাই পেতে দিয়ে শোনালো এক মর্মন্তুদ কাহিনী।

দিন পাঁচেক আগে তারা তাদের একমাত্র সন্তান দশ বছরের মেয়েকে হারিয়েছে। তেজু নদীর ধারেই তাদের কুটীর। নদীর ওপারে গভীর জঙ্গল। সেখানে সব রকম জন্তুই পাওয়া যায়। কিন্তু এত দিন কোনো জন্তুই নদী পার হয়ে আসে নি। বর্ষায় অবশ্য তেজুর একেবারে ঘোরতর রণমূর্তি। তখন তাকে পার হওয়া অসাধ্য। অহর্নিশি তার ভয়ঙ্কর গর্জন, এবং তার স্রোতে বিশাল বিশাল ঝড়ে-ওপড়ানো শিমুল, মাকাই, হলক্ তৃণের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায় ঘণ্টায় বিশ ক্রোশ গতিতে। শীত না পড়া পর্যন্ত স্রোতের খরতা এত প্রবল যে এক পারে নামলে দশ ক্রোশ ভেসে গিয়েও অপর পারে পৌঁছনো শক্ত। শীতে অবশ্য জল অনেক কমে যায় এবং সাঁতরে পার হওয়া অসম্ভব নয়। তবে জন্তুদেরও বোধ হয় স্মৃতিশক্তি আছে। বর্ষার তেজুর উত্তাল, উন্মত্ত রূপ স্মরণ করে তারা জলে পা দিতে সাহস করে না। তাংকি তায়েং পরিবার নদীর এ দিক্টায় নির্ভয়েই বরাবর বাস করে আসছে।

উপজাতিদের কুটীরের গঠনবিধিতে ভারী সুবন্দোবস্ত। সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়ে বাড়ী তৈরী করে বলে ওরা প্রথমে খোঁটা পুঁতে তার ওপর বেশ খানিকটা উঁচুতে বানায় বাঁশের মেঝে। তার চারি পাশে তোলে বাঁখারীর দেওয়াল তার ওপরে বাঁশ ও

বাঁখারীর চাল তৈরী ক'রে বুনো তাল বা অন্য গাছের পাতা দিয়ে করে চালের ছাউনি। জমি থেকে খানিকটা উঁচুতে ঘর বানানোর নানা উদ্দেশ্য আছে। এক তো পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে-আসা জলের তোড়ে ঘর ভেসে যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বন্য জন্তুদের পক্ষে ঐ ধরণের ঘরে হানা দেওয়া কঠিন, এবং সাপ-খোপেরও বিশেষ ভয় থাকে না। তৃতীয়তঃ, ও ধরণের ঘর বর্ষায় স্যাঁৎস্যাঁৎ করে না এবং অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর। চতুর্থতঃ, বাড়ীর তলায় ওরা রাখে গৃহপালিত পশু,—সাধারণতঃ শূকর।

সে দিন রাত্রে শূকরের খোঁয়াড়ে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য শোনা গেলো। রাত বেশী হয় নি, ন'টা কি দশটা। তাংকি তায়েং পরিবার সন্ধ্যার খাওয়া সেরে তখন শুয়ে পড়েছে। শব্দ শুনে ছোট্ট মেয়েটি তার মা-বাবাকে বলে গিয়েছিলো সে তক্ষুনি ফিরে আসবে। শূকরগুলো কখনো কখনো পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে। একটা বাঁশ দিয়ে দু'-একটাকে ঠেলা দিলে তারা থেমে যায়। তাই তাংকি আর তার স্ত্রীর মনে হয়েছিলো, ব্যাপার কিছুই গুরুতর নয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেলো মেয়েটির করুণ চীৎকার,- মাত্র একবার "নামা-া-া!" খুব বিপদে না পড়লে সে কখনো 'মা' বলে চীৎকার করে না।

তাংকি টর্চ্ নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো। সঙ্গে গেলেন তার স্ত্রী। বাঁশের দাওয়া থেকে খাঁজ-কাটা একটা গাছের গুঁড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতেই চোখে পড়লো প্রকাণ্ড কালো চিতা।

তাংকির স্ত্রী মেয়েকে রক্ষা করবার জন্য দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই দিকে ছুটতে যাচ্ছিলেন। তাংকি তাঁকে ধরে ফেলে জোর করে দাওয়ায় তুলে দিয়ে বন্দুক নিয়ে এলো। চিতা ভয়ঙ্কর জানোয়ার। এক শিকার ছেড়ে সে উন্মাদের মত আর এককে আক্রমণ করে। প্রাণ বধ করা যেন একটা মস্ত খেলা। যতই হত্যা করে ততই বাড়ে তার উৎসাহ। তাংকি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বন্দুকের নলের সঙ্গে টর্চ লাগোয়া করে কয়েকবার গুলী ছুড়লো। প্রতিবারেই দেখতে পেলে টর্চের আলোর বিস্তৃত পরিধি অতিক্রম করে লাফ দিয়ে চলে গেলো মিশকালো যমের দোসর সেই কালা শয়তান। আলো ফেলে লক্ষ্য করে গুলী করে বারংবার। কিন্তু জানোয়ারটা যেন যাদুমন্ত্রে গুলী এড়িয়ে লাফ দেয় বিপরীত দিকে। কিছুক্ষণ পরে তাংকি দেখতে পেলে জন্তুটা নদীর দিকে উধাও হয়ে গেলো।

এইবার টর্চ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মরিয়া হয়ে বাড়ীর নীচে, চারিপাশে, মাঠে, নদীর ধারে মেয়েকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলো। চীৎকার আর বন্দুকের আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীরা বেরিয়ে এসেছিলো ঝক্‌ঝকে ধারালো দাও নিয়ে। সবাই মিলে

তন্ন তন্ন করে খুঁজে মেয়েটির কোনো চিহ্নই আবিষ্কার করতে পারলো না। শুধু তার মায়ের প্রাণে জেগে রইলো তার করুণ আর্তনাদ—নামা!

সেই থেকে প্রত্যহ, হয় রাতে না হয় দিনে, হানা দিয়েছে কালা শয়তান। কিন্তু কেউ তাকে ঘায়েল করতে পারে নি। গ্রামের প্রায় সব ক'টা ছাগল মেরে নিয়ে গেছে সে। পথ-চলতি একজন মানুষও নিয়েছে। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে বহুবার রাতে ও দিনে গায়ের জোরে দোর ভেঙ্গে নানা কুটীরে ঢোকবার চেষ্টা করেছে। কালা শয়তানের সাহস এত বেড়ে গেছে যে সে এখন সমস্ত তেজু গ্রামখানাকে আপন পিতৃপুরুষদত্ত শিকারভূমি জ্ঞান করতে শুরু করেছে। তার দৌরাত্ম্যে ক্ষেতখামারে কাজ বন্ধ, পথ জনশূন্য।

কালা শয়তানের অত্যাচারে তাংকি তায়েঙের কর্তব্য দুই। এক আপন সন্তান হত্যার প্রতিশোধ। দুই সে ঐ গ্রামের গাঁওবুড়া, সুতরাং গ্রামবাসীর নিরাপত্তার জন্য সে দায়ী। গত ক'দিন সে হন্যে হয়ে ঘুরেছে বনে বনে কালা শয়তানকে খতম করবার উদ্দেশ্যে; কোনো হদিস পায় নি। অথচ সে যখন বনে তখনই শয়তান এসে তার অত্যাচার শুরু করেছে। আগেকার কালে ভিন গাঁয়ের কোনো নামজাদা বীর তেজুর কারো কেশ স্পর্শ করতে পারতো না। তার পরের দিনই দাম্ভিকের ছিন্নমুণ্ড বাড়ীর সামনে বাঁশের খুঁটার ওপর বিরাজ করে আশপাশের সবাইকে বিজ্ঞপ্তি দিতো, এদিকে আসা নিরাপদ নয়। আর এই সামান্য একটা জানোয়ার!

চাটাইয়ের একপাশে বসে তাংকি যখন কথাগুলো উচ্চারণ করলো তখন রায় বরুয়া আগুনের লালচে আভায় দেখতে পেলেন যেন তার চোখ ছলছল করছে। তার মনের গভীরে বিক্ষোভ, কেন সে নিরস্ত্র অবস্থাতেই তার মেয়ের প্রাণরক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। সে জানতো, তাতে কোনো ফলই হতো না, তবু সে বীরের মত আত্মবিসর্জন দিতে পারতো। সে দুঃখ তার প্রাণান্ত হওয়া পর্যন্ত যাবে না সত্য, কিন্তু কালা শয়তানকে খতম করতে পারলে অন্ততঃ তার অনুতাপের কিছু উপশম হ'তো।

রায় বরুয়া যখন বললেন তিনি কালা শয়তানকে শেষ করতেই তেজুতে এসেছেন তখন তাংকি তাঁকে আলিঙ্গন করে বললো সে কাজে সে হবে ওঁর দোসর। শত্রু নিধনের সংকল্পে দু'জনের হাত একত্রে মিলিত হলো।

ওঁরা পরামর্শ করে স্থির করলেন, সেই রাত্রেই যদি কালা শয়তান তেজুতে না আসে তো তার অন্বেষণে বেরুবেন এক সঙ্গে। তাংকির মুখ অত শোকেও উৎফুল্ল হয় উঠলো। সে তাড়াতাড়ি তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে জানালো, অতিথিসৎকার করতে হবে। চাই ভোজ। তাদেব সন্তান হত্যার প্রতিশোধের দিন এসেছে। তাংকির স্ত্রী

মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যাগতদের জন্য ভোজের আয়োজন করতে লাগলেন। মেঝের মাঝখানের আগুনটায় কিছু কাঠ দিয়ে তাকে নিমেষের মধ্যেই চাগিয়ে তুললেন। সমস্ত ঘরখানায় আগুনের আলো ছড়িয়ে পড়ে তার কোণে কোণে জমে থাকা শোকের থমথমে অন্ধকার ফুৎকারে বিদূরিত করলো।

রায় বরুয়া দেখলেন সুন্দর ঘর,— পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি। আসবাব বলতে প্রায় কিছুই নেই। মেঝের ওপর চাটাই পাতা। ঘরের দুই প্রান্তে তোষকের ওপর হাতে বোনা গালচে। আগুনের জায়গার ওপরে একটা ছোটো মাচা, শিকের মত করে চাল থেকে ঝোলানো। তার ওপর হাঁড়িকুঁড়ি। একপাশে ঝুলছে বড় একখানা সম্বরের রাং। ধোঁয়া আর আগুনের উত্তাপে ক্রমে শুকিয়ে সুপক্ক উপাদেয় সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরেই গৃহস্বামিনী রায় বরুয়াকে ভোজনে আহ্বান করলেন, এবং ঘরে "অ্যি" অর্থাৎ ধান্যমদ নেই বলে বারংবার দুঃখ প্রকাশ করলেন। শ্রীমতী তায়েঙের এই নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করে রায় বরুয়া অনুমান করলেন, ওঁর ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে তিনি কালা শয়তানকে সংহার করবেন নিশ্চয়।

মাতৃহৃদয়ে সন্তান হত্যার প্রতিশোধের বহ্নি জ্বালামুখীর মত চিরতরে প্রজ্বলিত থাকবে। কালা শয়তান নিহত হলেও সে বহ্নির লেলিহান জিহ্বা সমগ্র কালো চিতা জাতির ধ্বংসের প্রতীক্ষায় সর্বদা উন্মুখ হয়ে রইবে। রায় বরুয়াকে সে আগুন স্পর্শ করে তাঁর সংকল্পে উদ্দীপিত করলো।

রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন কালা শয়তানের অদ্ভুত বাঘ আর বেড়ালের ডাকের মাঝামাঝি হিংস্র শব্দ শোনা গেল না - তখন রায় বরুয়া তাংকিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রায় বরুয়ার সাথী তাঁর পুরোনো বিশ্বস্ত 465। তাংকি সঙ্গে নিলে তার দোনালা 12 বোর। তার কোমরে ঝোলানো দাও, অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝক করছে।

শীতের তেজু নদীর একপাশ দিয়ে ঝির ঝির করে জল বয়ে চলেছে। জায়গায় জায়গায় অবশ্য বেশ গভীর। পাহাড়ে নদীর গভীরতা সব সময়ে অনুমান করা যায় না। নিরাপত্তার জন্য তাংকি আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে যেখানে কয়েকটা বড় বড় পাথর জলের ওপর জেগে রয়েছে সেখান দিয়েই পার হওয়া স্থির করলো। পাথরের চাঁইগুলো কে যেন এপার থেকে ওপার পর্যন্ত সেতুবন্ধের মত সাজিয়ে দিয়েছে। পাথরগুলোর কাছে এসে রায় বরুয়া থমকে দাঁড়ালেন।

(ক্রমশঃ)

নালন্দা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

নালন্দা। রাজগৃহ ষ্টেশন থেকে আট মাইল উত্তরে ছোট একটি ষ্টেশন। যাবার পথেই পড়ে।

ছোট ষ্টেশন, ছোট একখানি ঘর। চারিপাশে আট-দশখানি চালাঘর, তিন-চারখানি ভূজাওলার দোকান। তার পিছনে ত্বদিকে মাঠ আর ক্ষেত। সোজা প্রশস্ত একটি পিচ্ঢালা পথ চলে গেছে মাঠের উপর দিয়ে। পথের ত্বপাশে সারি সারি গাছ পথের উপর ছায়া বিস্তার করেছে। সেই গাছের ছায়া দিয়ে হ্ঁাটতে হ্ঁাটতে দূরে রাজগীরের পাহাড় দেখা যায়, দিক্সীমায় মেঘের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

মাইল খানেক যাবার পর ছোট একখানি গ্রাম পাওয়া যায়। গ্রামখানি ছোট কিন্তু তার নাম বড়গাঁও। কয়েক ঘর গয়লা আর চাষী সেখানে ঘর বেঁধেছে। পাঁচু বললো—চলুন, ওদের কাছ থেকে কিছু ত্বধ কিনে নিই, সারাদিন তো আর এখানে আহার জুটবে না!

আমরা আগেই জেনেছিলাম এখানে কোন হোটেল নেই, মুড়ি ছাড়া খাবারও কোন ব্যবস্থা নেই।

আমরা গ্রামে ঢুকলাম।

এক গয়লা চার-পাঁচটি গরু নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে আমরা ত্বধ কিনবো বলতে সে তো মহা খুসি, বললো—আট আনা করে সের দিতে হবে বাবু!

সেই দামেই রাজগীরে ত্বধ কিনেছি, এখানেই বা সে দাম দিতে আপত্তি করবো কেন? গয়লা আমাদের ডেকে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। পরিচ্ছন্ন নিকানো-চুকানো

মেটে উঠান পার হয়ে একখানি চালাঘরের সামনে বসে গয়লা-বৌ এক হাঁড়ি ত্বধ জ্বাল দিচ্ছিল। গয়লা তার কাছ থেকে গরম ত্বধ নিয়ে এলো এক লোটা। আমরা সেই খানেই খাব শুনে তো তার কৌতুক বোধ হলো; ত্বটি পিতলের গেলাস এনে দিলে আমাদের ত্বজনের হাতে। ত্বধে ক্ষীরের আস্বাদ পেলাম। বুঝলাম, পাহাড়ী অঞ্চলের খাঁটি ত্বধের স্বাদ কলকাতার খাঁটি ত্বধের সঙ্গে এতটুকু মেলে না।

কথায় কথায় গয়লার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আমাদেরকে এগিয়ে দিয়ে গেল অনেকখানি, বললো—'বাবু, 'পুরানো রাজ' দেখতে যাচ্ছিস, সারাদিন তো কেটে যাবে। খাবার কিছু আনিস নি? যখন ফিরবি আমার ঘরে 'চিঁড়া-গুড়' খেয়ে যাস্!'

বুঝলাম, অশিক্ষিত চাষীর সরল উদারতা এখনও এ দেশ থেকে মুছে যায় নি।

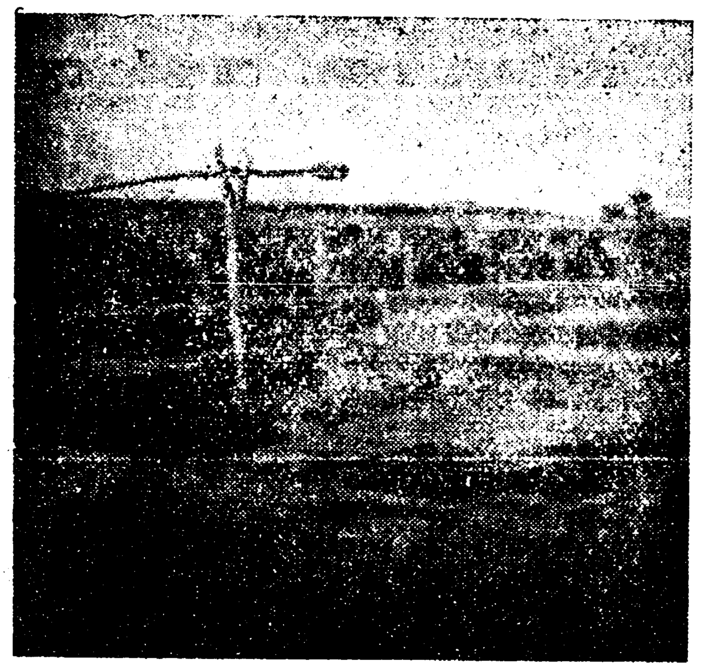

নালন্দার সজ্ঘরামের একাংশ
(ফটো—শ্রীগৌতম বড়ুয়া)

এসে পড়লাম নালন্দার সামনে। দূর থেকে মাটির ঢিবি পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠেছে দেখছিলাম। কাছে এসে দেখলাম সেই ঢিবিটাই হচ্ছে নালন্দার স্তূপ, তার চারিপাশ ঘিরে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ।

দ্বারে মাথা-পিছু ত্ব-আনার টিকিট লাগলো। সরু একটি গলিপথ দিয়ে এসে ঢুকলাম প্রকাণ্ড এক চত্বরে। একদিকে সারি সারি ছাত্রাবাস, আর একদিকে চৈত্যমন্দির। দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তে বিরাট স্তূপ। স্তূপের পাশে অধ্যাপনা করার কয়েকটি বড় বড় চত্বর।

প্রথমেই আমরা ছাত্রাবাসগুলি দেখলাম। এক একটি উঠানকে কেন্দ্র করে চারিপাশে ছোট ছোট ঘর। এক একখানি ঘরে এক একজন ছাত্র একক থাকতে পারে। ঘরের দেয়ালে ত্বটি করে কুলুঙ্গী করা আছে। একটি কুলুঙ্গীতে দীপ জ্বলতো। দীপের কালি এখনও কুলুঙ্গীর মাথায় লেগে আছে। আর এক কুলুঙ্গীতে সম্ভবতঃ ছাত্রেরা বই রাখতো। উঠানের মাঝে অধ্যাপনা করার মত যথেষ্ট স্থান আছে। প্রতিটি ছাত্রাবাসের উঠানে ক্লাস বসতো কিনা আজ আর তা জানা যায় না। একটি গৃহে প্রাচীন একটা ইঁদারা দেখলাম। তার জল এখনও সুপেয়। একটি দোতলা ছাত্রাবাসে দোতলার উপর

একটি কূয়া আছে। ভিতের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে কূয়াটি নেমে গেছে। দোতলার বাসিন্দাদের জলের জন্য একতলায় না নামতে হয়, তারই সুবন্দোবস্ত। পয়ঃপ্রণালীও আছে পথের নীচে দিয়ে। ছাত্রাবাসের এক পাশ দিয়ে বড় বড় পাথর-পাতা পথ, তার নীচে দিয়ে চলে গেছে পয়ঃপ্রণালীর পাকা গাঁথুনি।

ছাত্রাবাসগুলি সবই পূর্বদিকে। প্রায় সিকি মাইল ব্যেপে আছে। সঙ্ঘারামগুলি দেখে, আমরা এবার পশ্চিম দিকে ফিরলাম। পশ্চিমে বড় বড় তিনটি চৈত্য। চৈত্যগুলির ছাদ নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভিতরে ঢুকলে দেয়ালের গায় বিরাট বালিমাটির তৈরী বুদ্ধমূর্তি চোখে পড়ে। মূর্তিগুলি জীর্ণ হয়ে গেছে, ভেঙেও গেছে কোথাও কোথাও। এই মূর্তিগুলিকে রক্ষা করার জন্য চৈত্যের উপরে অস্থায়ী একটি করে টিনের ছাদ দেওয়া হয়েছে।

নালন্দার মন্দির-ভিতে একটি ভাস্কর্য
(ফটো—শ্রীগোতম বড়ুয়া)

এবার চলে এলাম একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে—সঙ্ঘারামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। এটি প্রায় ষাট ফুট উঁচু একটি স্তূপ। এটিই নালন্দার স্তূপ নামে প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতেরা বলেন ছয়টি মন্দিরের উপর এই মন্দিরটি তৈরী। এক একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন করে আর একটি মন্দির তৈরী হয়েছে। তাতে প্রথম মন্দিরের চেয়ে দ্বিতীয় মন্দিরের উচ্চতা বেড়েছে, পরিধিও বেড়েছে। তারই ফলে শেষ মন্দিরটি এই উচ্চ স্তূপের আকার ধারণ করেছে। এক সময় এই স্তূপটির চারিপাশ বেষ্টন করে একটি সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত পাঁচীল ছিল। পাঁচীলের চারকোণে ছিল চারটি বুরুজ। তুটি বুরুজ এখনও আছে। পাঁচীলেরও খানিকটা দেখা যায়। স্তূপের উপরে ওঠার জন্য প্রশস্ত সিঁড়ি আছে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলে প্রদক্ষিণ করার পথ, ও সবার উপরে ছাদ। এই ছাদের উপর উঠলে বহুদূর অবধি চোখে পড়ে,—চোখে পড়ে চারিপাশের অসংখ্য সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ। একদিন ওই সঙ্ঘারামগুলি দশ হাজার শিক্ষার্থীতে পূর্ণ ছিল, দেড় হাজার ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত এখানে অধ্যাপনা করার জন্য সমবেত হয়েছিলেন। উত্তর ভারতে এত বড় বিদ্যানগরী আর ছিল না। এখন চারিপাশে শুধু ধান-জমি, আলুর ক্ষেত আর মুক্ত প্রান্তর। 'কৃতান্ত কালেন কথাবশেষাঃ।' মহাকাল শুধু স্মৃতিটুকু রেখে গেছে।

"কোথা হাট কোথা ঘাট,
কোথা ঘর, কোথা বাট,
মুখর দিনের কলকথা,
অনন্তের বাণী আনে
সর্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা।"

এই স্তূপের দক্ষিণ পাশ দিয়ে বরাবর পথ ছিল। সেই পথ গিয়ে মিশেছিল রাজগৃহের বেণুবনে। সেই বেণুবনের পথ দিয়ে আসতেন ভগবান তথাগত বুদ্ধ, এখানকার বর্ধিষ্ণু জনপদের এক প্রান্তে পাবারিকা আম্রবনে তিনি থাকতেন। উপদেশ দিতেন সমবেত জনগণকে। এই পথ দিয়ে আসার সময়ই একদিন পথিমধ্যে বুদ্ধ বিশ্রাম করছেন গাছতলায়, কাছেই ছিল কাশ্যপ মুনির আশ্রম। তিনি এসে ধর্ম আলোচনা সুরু করলেন কিছুক্ষণ আলোচনা করে তিনি কি বুঝতে পারলেন কে জানে. বুদ্ধকে প্রণাম করে বললেন—আমি আপনার শিষ্য হলাম।

কাশ্যপের অনেক শিষ্য ছিল, তাঁরাও গুরুর পন্থা গ্রহণ করলেন। ইনিই হলেন মহাকাশ্যপ। বয়সের দিক্ থেকে ইনি ছিলেন বুদ্ধের চেয়ে বর্ষীয়ান্। বুদ্ধের পরেও তিনি জীবিত ছিলেন। রাজগীরে ব্রহ্মকুণ্ডের নীচে পাহাড়ের কোলে নদীর তীরে মহাকাশ্যপের সমাধির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।

এই নালন্দাতেই জন্মেছিলেন সারীপুত্ত ও মোগ্‌গল্যায়ন।

পাবারিকা আম্রকানন ছিল নালন্দার গৌরব। এই ছায়াশীতল আম-বাগানটিতে থাকতে গৌতম বুদ্ধ বড় ভালবাসতেন। যখনই তিনি নালন্দায় আসতেন। তখনই তিনি এই বাগানে থাকতেন শিষ্যদের সঙ্গে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর উপদেশ, তাঁর ধর্মালোচনা এখানকার লোকদের কাছে তাঁকে শ্রদ্ধেয় করেছিল। ধনী ও গরীব, সকলেই তাঁকে ভালবাসত। আম-বাগানটি বুদ্ধের ভালো লেগেছে দেখে এখানকার পাঁচ শো বণিক্ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে এই আম-বাগানটি কিনে নিয়ে বুদ্ধকে দান করেন।

তখনকার দিনে এখানে পাঁচশো ধনী বণিক্ ছিলেন, এ কথা ভাবলে এখানকার সে দিনের সমৃদ্ধি কিছুটা আন্দাজ করা যায়। আজ কয়েক ঘর চাষী, কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম ছাড়া এর চতুঃসীমার মধ্যে আর কিছুই নেই। আজ কোথায় সেই আম-বাগান! শুধু উন্মুক্ত প্রান্তর রাজগৃহের পাহাড়ের কোল অবধি ধূ ধূ করছে।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর বুদ্ধের রাজশিষ্যেরা এখানে সঙ্ঘারাম তৈরী করে

দেন। শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য ও বজ্র নামে পাঁচজন রাজা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের থাকার জন্য এখানে পাঁচটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করেন।

রাজা শক্রাদিত্য সম্পর্কে একটি গল্প আছে। তিনি নালন্দায় একটি সঙ্ঘারাম গড়ে তোলার জন্য মিস্ত্রী লাগালেন। কিন্তু কাজ সুরু করতে গিয়েই মিস্ত্রীরা বাধা পেল। একটি প্রকাণ্ড গোখরো সাপ বেরিয়ে পড়লো এক গর্ত থেকে। কিন্তু সাপটি কাউকে কামড়াবার আগেই তারা সাপটিকে মেরে ফেললো।

রাজার কাছে সংবাদ গেল। রাজা চমকে উঠলেন। নির্মাণ-কার্যের সুরুতেই তো তাহ'লে বাধা পড়লো! ডাকলেন গণৎকারকে, জিজ্ঞাসা করলেন—এর ফল কি বলুন তো?

গণক গণনা করে বললেন—এর ফল শুভ নয়। আপনি যে সঙ্ঘারাম তৈরী করাবেন কালে তা এক মহাবিদ্যাপীঠে পরিণত হবে সত্যই, প্রারম্ভের এই সর্পদর্শন সেই শুভ সূচনার ইঙ্গিত করেছে। কিন্তু সর্পের রক্তপাতে অশুভেরও লক্ষণ আছে। পরিণামে এই মহাবিদ্যালয়ে রক্তের নদী বয়ে যাবে, এবং এই বিদ্যালয় ধ্বংস হবে।

—এই পরিণামকে অতিক্রম করা যায় না? – রাজা প্রশ্ন করলেন।

—ভবিষ্যৎ অনিবার্য, অমোঘ। তাকে প্রতিরোধ কবার শক্তি কারো নেই।

রাজা মর্মাহত হলেন। কিন্তু যে কাজে তিনি হাত দিয়েছেন সে কাজ তো তিনি থামাতে পারেন না! বললেন কাজ চলুক। আমার কাজ আমি করে যাই, ভবিষ্যতে যা হয় হবে।

ধীরে ধীরে সঙ্ঘারাম গড়ে উঠলো। একক একখানি বাড়ী। একটি ছোট ধর্ম আলোচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কেন্দ্র। কালে আরো আরো অনেক রাজা অনেকগুলি সঙ্ঘারাম এর সঙ্গে যুক্ত করলেন,—বিরাট এক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলো।

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন যেমন অতীতের সাক্ষ্য হয়ে প্রান্তরের মধ্যে মৃতের কঙ্কালের মত পড়ে আছে, তখন তেমন ছিল না। তখন চারিপাশে ছিল ফল-ফুলে ভরা বাগান। এক দিকে পাবারিক আম্র-কাননের শ্যামল আস্তরণ বিছিয়ে ছিল দিগন্তের সীমানা অবধি। কয়েকটি পুকুরও ছিল এই সঙ্ঘারামগুলিকে ঘিরে। পুকুরগুলিতে পদ্মফুল ফুটে থাকতো। এই সব পুকুরের নীলপদ্ম তখনকার দিনে এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল।

এই সঙ্ঘারামের কেন্দ্রে একটি জলঘড়ি ছিল. সে ঘড়িটি নির্ভুল সময় দিত। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য ছিল একটি মানমন্দির। সেই মানমন্দির এতই উঁচু ছিল যে তার উপর উঠলে মনে হতো, হাত বাড়িয়ে যেন আকাশ ছোঁয়া যায়।

তার এই সঙ্ঘারামকে ঘিরে ছিল বহুদূরবিস্তৃত এক জনপদ, বিরাট এক নগর। আজ আর তার চিহ্নমাত্র নেই।

নালন্দা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলবার রইল। এর পরের বারে তা শোনাব।

দৃষ্টির বাইরে

শ্রীরেণুকা দেবী

অরুণরা যখন এ পাড়ায় এসেছিল তখন তার বয়স ছিল মাত্র দুই। বড় রাস্তার থেকে বার-হওয়া এই গলিটার দু' পাশে বাড়ী; অরুণদের বাড়ীটা সতের নম্বরের, আর বাইশ নম্বরের বাড়ীর ছেলে হচ্ছে দিলু। সেই দিলু আর অরু যখন ছ' বছরের তখন তারা দু'জনে একই স্কুলের একই ক্লাসে ভর্তি হ'ল। সেই থেকেই আর সকলের চেয়ে ওদের দু'জনের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী ভাব।

এ কথা ঠিক যে অরুণদের বাড়ীর লোকেরা যেন কেমন! পাড়ার কোন লোকের সঙ্গে যেমন ঝগড়াও নেই, আবার খুব ভাব, মেলামেশাও নেই তেমনি। যদিও অরুণের বাবা সত্যেন বাবু অতি ভদ্র, অমায়িক ব্যক্তি,—পথে, বাসে, বাজারে বা অন্য কোথাও দেখা হোক কারও সঙ্গে – 'ভালো?' বলে হেসে একটু মাথা কাৎ করে কুশলটুকু জেনে নেবেন। কিন্তু ওইটুকুই, আর কিচ্ছু নয়। পাড়ার আরো কয়েকজন – দিলুর বাবা প্রকাশ বাবু, কমলের বাবা সন্তোষ বাবু, ওদিকের পরাশর বাবু, এঁদের মত—সত্যেন বাবুর ধরণ-ধারণ নাকি সাধারণ নয়। সেবার যখন অরুর কাকা দীপেন ফার্ষ্ট ডিভিশানে আই. এস-সি পাশ করলো, অবশ্য ভালো ছেলে বলে তার নামও আছে,– তখন খবর পেয়ে খুসী হলেন সকলেই। নির্ম্মল বাবু নিজে থেকেই সত্যেন বাবুকে বল্লেন—কোথায় দিচ্ছেন দীপুকে? ডাক্তারী পড়ান, ভালো লাইন। প্রকাশ বাবু বল্লেন—লাইনের কথা উঠলে এনজিনীয়ারিংই ভালো। অনেক সুযোগ, ভালো চাকরী। সত্যেন বাবু হেসে বল্লেন, দেখি, দীপু কি বলে, তার কি মত।

ওর আবার মত কি?—বলে ওঠেন প্রকাশ বাবু।– টাকা খরচ করবেন আপনি।

তেমনি অমায়িক হেসে জবাব দিয়েছিলেন সত্যেন বাবু,—তবুও তো, ওর নিজের ঝোঁক কোন্ দিকে জানা দরকার। জোর করে কি লাইনে দেওয়া চলে? যতদূর জানি ও বি. এস-সি পড়তে চাইবে,– কেমিষ্ট্রীতে ওর আগ্রহ।

মুখে মুখে অবজ্ঞার হাসি হেসে চলে গেলেন সবাই। যেতে যেতে মন্তব্য করলেন নির্ম্মল বাবু—ওতে খালি মার্চেণ্ট আফিসের কেরাণীগিরি ছাড়া আর কিছুই নেই, কত ডাল-ভাতের ছড়াছড়ি যাচ্ছে!

সত্যেন বাবু জানেন তাঁর ভাইয়ের একান্ত কাম্য কেমিষ্ট্রিতে পণ্ডিত হয়ে রিসার্চ করা। ডক্টরেটের থিসিস্ দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে বড় বৈজ্ঞানিক হবার স্বপ্ন দেখে সে। পয়সা তিনিই খরচ করবেন ঠিক. কিন্তু তাই বলে একটি ছেলের জীবনের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে পারেন না তিনি।

সেবার অরুণ নয় বছরে পড়লো। ক্লাস ফাইভে উঠেছে সে। সত্যেন বাবু অফিস থেকে এসে অরুকে ডেকে, তার হাতে দিলেন চকচকে একটা আধুলী আর ছোট একটা খাতা। বল্লেন—অরু. আজ থেকে তুমি বড়দের দলে। কাকা আর পিসিমণির মত এই আধুলীটা তোমার হাত-খরচ হ'ল। তোমার দরকারী জিনিষ সব পাবে। এটা শুধু তোমার যা ইচ্ছে খরচ করার জন্যে। চীনেবাদাম. আইসক্রীম, বল. লাট্টু,—যা তোমার ইচ্ছে কিনবে এর থেকে। তবে একটা কথা, এই খাতাটাতে শুধু তারিখ দিয়ে কবে কত খরচ করছো সেইটুকু লিখে রাখবে।

অরু তো অবাক্। আর খুব খুসী। বার বার দেখলো আধুলীটা, তারপর চলে গেল ওর পিসিমণির কাছে। বললে. তুমি যে আমাকে একটা থলি দেবে বলেছিলে—দাও। এই দেখ আমারও হাতখরচ—এই আট আনাটা। আধুলীটা দেখে হেসে সুজাতা কালো আর লাল সুতোয় বোনা একটাছোট থলি করে দিল অরুকে। একটা আধুলী, কত সামান্য জিনিষ! কিন্তু অরুর মনটা উড়ে গিয়েছে। সেটা কেবল আধুলীটার জন্যে নয়. আধুলীটার ওপর তার অবাধ অধিকারের জন্য। এটা তার। সম্পূর্ণ তার নিজের। যা ইচ্ছে সে করতে পারে এটা দিয়ে। তখনই বালক-মনে কত ছেলে-মানুষী ধারণা এলো। কত কি ভাবলো। তারপর ঠিক করলো, না. এটা সে খরচ করবে না কিছুতেই. এটা সে জমিয়ে রাখবে। বাবা তো প্রত্যেক মাসেই একটা করে আধুলী দেবেন! আচ্ছা, কতগুলো আধুলী হলে এই থলিটা ভরবে?

নতুন-পাওয়া ঐশ্বর্য নিয়ে অরুণ ছুটে যায় দিলুর কাছে। তাকে না দেখানো পর্যন্ত যেন শান্তি নেই তার। থলি আর আধুলী দেখে দিলুও খুব খুসী হ'ল। দিলুরা বড়লোক। ধনী বলে খ্যাতি আছে পাড়ায়। কি এক কোম্পানীতে চাকরী করেন দিলুর বাবা। কোম্পানীর হয়ে বিলেত. আমেরিকা ঘুরে এসেছেন তিনি। ওদের বসবার ঘরটা কি সাজানো! প্রকাণ্ড ঘরটার একদিকে বড় বড় দুটী বুককেস! একটীতে ইংরেজী ও আর একটিতে বাংলা বই। সব ঝক্‌ঝক্ করছে। ময়লা হবার ভয়ে কাউকে ছুঁতে দেওয়া হয় না। তা ছাড়া আছে নানান্ আসবাব ও সৌখীন জিনিষ। দিলুর বাবা নিজেও খুব সৌখীন। বিকেল বেলা বেড়াতে যাওয়ার আগে তিনি নিজে ঘরটীর তদারক করে যান। যখন তখন মন্তব্য করেন—এ "ক্রেন" দুটো একটু সরানো দেখছি কেন? আর ও কি, প্লাস্‌টিকের আঙ্গুরলতাটা অত দূর গেল কি করে? এ সব কি বাজে জিনিষ? ক্রোমিয়ামের ঐ ক্রেন জোড়া খাস লণ্ডন থেকে আনা. আর এই গ্রেপ্‌ বাওয়ারটা নিউইয়র্কের। ও কি! বাম্বিজ এলিফ্যাণ্ট দু'টোর কানে এত ধূলো ঢুকলো কি করে? তক্ষুনি হাঁক্ দেন চাকরকে।

ছোট ভাই পরাগ বলে,—বড়দা, তুমি এতটুকু এদিক্ ওদিক্ বোঝ কি করে?

একটু হাল্‌কা হাসেন প্রকাশ বাবু। যার মানে, এর নাম হচ্ছে দৃষ্টি। একটু পরেই তাঁর সেই দৃষ্টি পড়ে কোণের আলমারীটায়। হাঁ হয়ে যান তিনি। দু'টি বইয়ের মধ্যে অনেকখানি স্থানও যে হাঁ হয়ে আছে!—নতুন কেনা. সাজানো থাক এমন ফাঁক কেন?

মেজ ভাই প্রতুল বলে—বঙ্গদর্শন ক' খানা ও বাড়ীর সত্যেন বাবু নিয়ে গেছেন কিনা—

যাও, যাও, যে ক'খানা পড়া হয়েছে চেয়ে নিয়ে এস এখুনি।

দাদার কথা শুনে ভাইরা অবাক্। কেনার পর থেকে তো কোন দিন পড়তে দেখে নি তাঁকে! আর ও সব বই তিনি পড়েনও না। তাঁর পড়ার জন্য আছে সিনেমা-পত্রিকাগুলো।

তবু বলে প্রতুল,—পড়া হলে উনি আপনি দিয়ে যাবেন। আর ওঁর কাছে নষ্ট হবে না. ভারী যত্ন পরের বইএ।

না—না. সে কথা নয়। কিন্তু কি বিশ্রী লাগছে বল তো? কি রকম ন্যাড়া ন্যাড়া—! এখন যদি ধর. বেড়াতেই আসেন কেউ, দেখে কি ভাববেন বল তো? সাজানো-গোছানো জিনিষের রূপই আলাদা। টেষ্ট অর্থাৎ সুরুচি হচ্ছে বড় কথা, আর সেই দিকে দৃষ্টি রাখা হচ্ছে একটা আর্ট—

এমনি সময়ে, দিলু এসে দাঁড়ায়,—বলে, আমাকেও একটা আধুলী দিতে হবে বাবা!

আধুলী! আধুলী দিয়ে কি হবে?

দিলুর মুখে ব্যাপার শুনে হেসে ওঠেন তিন ভাই।

—আধুলী? হা হা হা! একটা আধুলী দিয়ে আবার হিসেবের খাতা! লোকটা সত্যি পাগল নাকি রে? আবার শুনি নাকি এম. এ পাশ! ছিট আছে ঠিক। আচ্ছা, তুমিও পাবে। এই নাও।—বলে, আধুলী নয়, একখানা কড়কড়ে পাঁচ টাকার নোট দিলুর হাতে দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যান প্রকাশ বাবু।

যে আধুলীটা খরচ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল অরু, তাই নিয়ে ভারী মজার কাজ করলো সে. তার পরের দিনই। যেই না 'সাড়ে ছ' আনাওলা' এল. থলি সমেত সম্পত্তি হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো অরু। তারপর টপ্‌ করে নেমে এল, আর সাড়ে ছ' আনা দিয়ে একটা বল কিনে ফেল্ল। তার পরের বাকী ছ'টা পয়সা মাত্র একদিন ছিল থলিতে। বিকেল বেলা চীনেবাদামওলা আসতেই খরচ হয়ে গেল সেই ছ' পয়সা।

বাবা অফিস থেকে এসে যখন জিজ্ঞাসা করলেন,—অরু, হিসেবে লিখেছো তো? অরু একটু ভয় পেলো, এত তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলাতে বকেন যদি! কিন্তু সত্যেন বাবু সে সব কিচ্ছু জানতে চাইলেন না।

অরুর প্রথম পাওয়া আধুলীটা খরচ করতে মাত্র দু' দিন লেগেছিল. দিলুর পাঁচ টাকা কিন্তু পাঁচ মিনিটেই শেষ। দোকানে গিয়ে বল্, লাট্টু, মার্ব্বেল, লাটাই, চকলেট, পিপারমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে টাকা শেষ করে ফেল্ল সে। তাকে তো হিসেব লিখে রাখতে বলেন নি বাবা! খুব খুসী সে। বাবা টাকা দিয়েছেন শুনে, এত জিনিষ দেখেও, মা কিছু বল্লেন না।

দ্বিতীয় মাসেও অরু ঘুড়ী. লাটাই, সুতো কিনে ফেল্‌ল। এবারেও শেষ হতে মাত্র পাঁচ-ছ'দিন লেগেছিল। দিলু কিন্তু কিছুই পেল না। চাইতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে এল। যাও—প্রত্যেক মাসে হাতখরচ! দেখো দিলু, যখন যা দরকার চাইবে। এইটুকু ছেলের হাতখরচা—আমি তো পাগল নই! ছেলের সামনেই বল্লেন দিলুর বাবা।

এর পর থেকে অরু যখন মনে মনে হিসাব করতো, বন্ধুদের নাম ধরে, কাল যদি সকলকে মশলা-মুড়ী খাওয়ায় তা'হলে কত খরচ হবে, তখন দিলু আপন মনে প্রতিজ্ঞা করছিল,—চাইবো না, কক্ষনো কিচ্ছু চাইবো না আমি।

এমনি করে সাত-আট মাসের শেষে দেখা গেল অরুর আধুলীটির অংশ কোন কোন মাসে কুড়ি-বাইশ তারিখ পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে। বছরের শেষে দেখা গেল কি করে একটা চক্‌চকে দু' পয়সা একটা ছোট প্লাস্‌টিকের কৌটোর মধ্যে রয়ে গিয়েছে,—যেটা কখনও সে খরচ করবে না ভেবে রেখেছিল। বছর শেষে আধুলীর মাপটা দ্বিগুণ হয়ে গেল। অর্থাৎ পুরো একটা টাকাই পেতে লাগলো অরু। এর পর অরুর কাছে সব সময়ই দু'-একটা পয়সা থাকে। তবে হিসেব লিখতে হয় প্রত্যেক খরচের। অরুর বাবা কেবল হিসেবটা দেখেন, ব্যস্‌, আর কিছু না।

হিসেবটা এই রকম :—

জমা : ১লা জানুয়ারী—১৲ টাকা।

খরচ : ২রা জানুয়ারী—একটা বল্—।৵১০, লজঞ্জুস ৫১০

৫ই জানুয়ারী—মশলা-মুড়ী—আমি আর দিলু—৫১০+৫১০। অন্ধ ভিখারী—৫ ইত্যাদি।

আর পাতার শেষে : এ মাসে সব খরচ। জমা = ০ শূন্য।

তবুও, বছর শেষে, দেখা গেল প্লাস্‌টিকের কৌটোয় চৌদ্দ আনা পয়সা জমেছে।

পয়সা দিলুও পায়, যদিও প্রতি মাসে হিসেব করে কিছু পায় না। তবে হঠাৎ একসঙ্গে পাঁচ—দুই—এক করে যা পায় তা অরুর চেয়ে অনেক বেশী হয়। তবুও কিছুই জমা করতে চায় না সে. বরং চায় যত শীঘ্র হোক সেটা খরচ ক'রে, যে করে হোক আবার কিছু হাতে পেতে। কোন মতে হাতে টাকা আসাটাই তার একমাত্র ইচ্ছা। সেই জন্যে দেখা যায় একটা বারো আনার খাতা আট আনায় বিক্রি করছে দিলু। কিন্তু ছেলের যা প্রয়োজন তা দিতে বাধা নেই প্রকাশ বাবুর। অবশ্য অপ্রয়োজনীয় কিছু তিনি দিতে নারাজ, আর খোঁজ নেওয়া বা হিসেব নেওয়াও লজ্জাকর মনে করেন তিনি। তাই আজকাল যখন-তখন বই হারিয়ে যায় দিলুর আর তা কিনেও দেওয়া হয় ফের। নিজের মেজাজ ভাল থাকলে আর ছেলে আবদার করলে দু'-পাঁচ টাকা এমনিও দেন। সে দিকে দৃষ্টি ছোট করেন না তিনি। সামান্য জিনিষেও তাঁর লক্ষ্য আছে বলে যা লক্ষ্যের বাইরে তা তাঁর ধারণারও বাইরে।

ক্রমে ক্লাস নাইনের ঘর পার হয়ে এল অরু আর দিলু। এখনও তাদের তেমনি ভাব। এতদিনে অরুর প্রাপ্য এক টাকাও আবার দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। এবারও মাসের প্রথম দিনের বিকেলে অরু পেয়েছে একখানা গোলাপী রংএর নোট দু'-টাকার। আজকাল সত্যেন বাবু হিসেবের খাতা দেখেন মাসের শেষে। তবে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন—আজ বারো তারিখ, তোমার ক্যাশের খবর কি অরু? কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

ক্লাস টেনে পড়ছে ছেলে, তাকে মাঝে মাঝে চাইলেই দু'-এক টাকা দেন দিলুর মা, বাবা। তা বলে ছেলেকে দু'টো-একটা টাকা দিয়ে .তার খবরদারি করে নজর ছোট করেন না তাঁরা। তাই নিজে সিনেমা দেখে বন্ধুদেরও সিনেমা দেখাতে পারে দিলু। তাই খরচের দরকারও বেড়েই চলে

তার। এখন সে বন্ধুদের মুরুব্বি,—সকলেই তার কাছে অনুরোধ করে। দিলুও যথাসাধ্য তা রাখে।

সে বার, ক্যাশের খোঁজ করতেই, অরু মাথাটা নীচু করে ফেল্ল। সত্যেন বাবু সত্য ঘটনাটা জানতে চাইলেন। গোটা একটা টাকাই ধার দিয়ে ফেলেছে, না দিয়ে পারে নি। বন্ধু প্রণব একটা দরকারী বই কিনবে বলে নিয়েছে। ওর হাতে তখন টাকা ছিল না তাই। তবে পরে অরু জেনেছে, প্রণব সে বই কেনে নি। সিনেমায় খরচ করেছে ওর টাকা। ও নাকি অমনি করে! চার আনা. আট আনা অনেকের কাছে ধার নেয়। দিলুরও কয়েকটা টাকা আর কয়েকখানি বই নিয়ে আর দেয় নি। তাই ভয় হচ্ছে ওর।

সবটা শুনে সত্যেন বাবু বললেন, এই লোকসানের মধ্যে একটা লাভ হ'ল অরু তোমার।

অবাক্ হয়ে যায় অরু।

হ্যাঁ, লাভই বলব। আর ঠকবে না, এক টাকার উপর দিয়েই শিক্ষাটা হ'ল।

টেষ্টের রেজাল্ট বার হয়েছে। দ্বিতীয় হয়েছে অরু। দিলুও পাশ করেছে—তবে সাধারণ ভাবে। সহপাঠীরা সব ধরেছে খাওয়াতে হবে। কয়েকজনকে একটা কফি হাউসে নিয়ে গিয়ে কফি, টোষ্ট আর ওমলেট খাওয়াল অরু বাড়ী ফেরার পথে হিসেব করলো—এখনও হাতে যা আছে তাতে একটা টেষ্ট পেপার কেনা যাবে। বাবাকে বলবে, ওটা সে কিনেছে তার নিজের জমা টাকা থেকে। বাবা নিশ্চয়ই খুব খুসী হবেন।

দিলুও অসুখী করে নি বন্ধুদের। আর, অরুর মত কয়েকজন বাছা বাছা বন্ধুকে নয়, যে ক'জন দলে ছিল সকলকেই সিনেমা দেখিয়ে, কফি ও কাটলেট খাইয়েছে সে। তবে এর জন্যে তার খোয়া গেল বাবার দেওয়া দামী পেলিক্যান্ কলমটা। তা হোক, চাইলে সে আবার পাবে। হারিয়ে যাওয়াটা এমন কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা নয়। মনে মনে হিসাব করে দিলু,—টেষ্ট পেপারটা কাউকে দিয়ে ফেরত না পাওয়া, পরীক্ষার জন্যে খাতাপত্রের দরুণ—টা দ্বিগুণ করা, জিয়োমেট্রির বক্সটা চুরি যাওয়া—ইত্যাদিতে কত পাওয়া যাবে। হিসাব তো দিলুও শিখছে!

পথিক মেঘের দল

শ্রীআশা দেবী, এম্, এ, বি টি

সুইজারল্যাণ্ড।

আমাদের সম্মেলন এখানেই হবার কথা। কাজেই আমরা প্রথম এখানেই এসে পৌছুলাম। জেনেভা এরোড্রোম থেকে আমরা বাসে করে লোজান যাত্রা করলাম কারণ অধিবেশন ওখানেই বসবে।

সাতই জুলাই, ১৯৫৫ সাল।

বিরাট এক প্রাঙ্গণে দেশ বিদেশের মায়েরা সব মিলিত হয়েছেন। মোট ছেষট্টিটি দেশের মায়েরা একসঙ্গে জড়ো হয়েছেন সত্যের নামে, শান্তির নামে, তাঁদের স্বামী, পুত্র, সংসারের নিরাপত্তার নামে। আমরা শান্তি চাই বিশ্বের, আর এই দানবিক জগতে স্বার্থগন্ধী লোকের পরস্পর হানাহানি, মারামারির মধ্যে আমরা অন্তরের শান্তি হারিয়ে ফেলব না। আমরা সবাই হাত তুলে সমবেত ভাবে প্রার্থনা জানাবো শান্তিকামী মানুষের দরজায়ঃ আমরা সুখে শান্তিতে থাকবো—বাঁচবো, বড় হবো। হৃতসুখ, নষ্টনীড়—গতশান্তি নিয়ে কি করে বাঁচবো ? তাই এই লোজান সহরে কাতারে কাতারে বিশ্বের সব দরবার থেকে মায়েরা এসে মিলিত হয়েছেন।

এত বড় সম্মেলন আমি আর কখনও দেখি নি। গেটের কাছে এসেই দেখলাম সবার বিচিত্র পোষাক, বিচিত্রতর কথাবার্ত্তার গুঞ্জরণ। যে যার মাতৃভাষায় কথা বলছে। আমাদের সবার যথা সময়ে ডাক পড়লো। আমরা ট্রাম-বাসের ফ্রি টিকেট, খাবার টিকেট আর ব্যাজ রুমাল পেলাম। সে রুমালে ছিল শান্তির প্রতীক ; তাই দেখে আমরা চিনতাম কে ডেলিগেট, কে নয়। পথে যদি কখনও কোন মুস্কিলে পড়েছি

বা কোথাও পথ চিনতে ভুল হয়েছে,—আমরা লক্ষ্য করেছি সেই ব্যাজ আর রুমাল। রুমালওলা আর ব্যাজওলা মায়েদের দেখলেই অসঙ্কোচে এগিয়ে গিয়েছি, যেন তাঁরা আমাদের কত দিনের বন্ধু !

জেনেভা সহরের বিখ্যাত প্যালেস্ অব্ নেশন্স্

আমাদের হোটেলের নাম ছিল "সাতুহুসী"—জেনেভা হ্রদের সামনেই হোটেলটা। অত্যন্ত সুন্দর আর সুসজ্জিত। সকাল সাতটায় আমরা প্রাতরাশ খেয়ে স্নান করে একেবারে তৈরী হয়ে অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে রওনা হলাম।

: আপনি কোথা থেকে আসছেন ?—সবারই প্রশ্ন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে।

: ভারতবর্ষ।

: আপনি—?

: জাপান।—মা-টি উত্তর করলেন একটু হেসে।

: ওঃ!—তাঁর দিকে একবার চোখ মেলে চাইলাম আমি। একটি রোগা চেহারার মানুষ। মুখে ঘন বিষাদের আলোছায়া এসে পড়েছে : পরে আলাপ হবে, এখন চলি, একটু তাড়াতাড়ি আছে। অধিবেশন এখুনি আরম্ভ হয়ে যাবে।

আমারও চমক ভাঙলো। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে চললাম ঘরের দিকে।

সামনে ঢুকতে কোট রাখবার ঘর। সেখানে কোট রেখে সামনে এগিয়ে চললাম। বাঁয়ে সব দেশের মায়েরা তাদের নিজের দেশের জিনিষ দিয়ে প্রদর্শনী খুলে বসে কিছু কিছু জিনিষপত্র বেচা-কেনা করছে। ডানদিকে ঘড়ি নিয়ে বসেছে দোকান দিয়ে ঘড়ির দেশ সুইজারল্যাণ্ডের লোক। সামনে ফটো তোলা হচ্ছে অধিবেশনে যাঁরা বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁদের। বিরাট হলের সামনে মঞ্চ, তার সামনে একটি পাথরে অথবা মাটিতে গড়া মা আর ছেলের মূর্ত্তি। যেমন বিরাট তেমনি অপূর্ব্ব। পরে শুনেছিলাম এটি একটি মহিলা শিল্পীর হাতে গড়া উপহার।

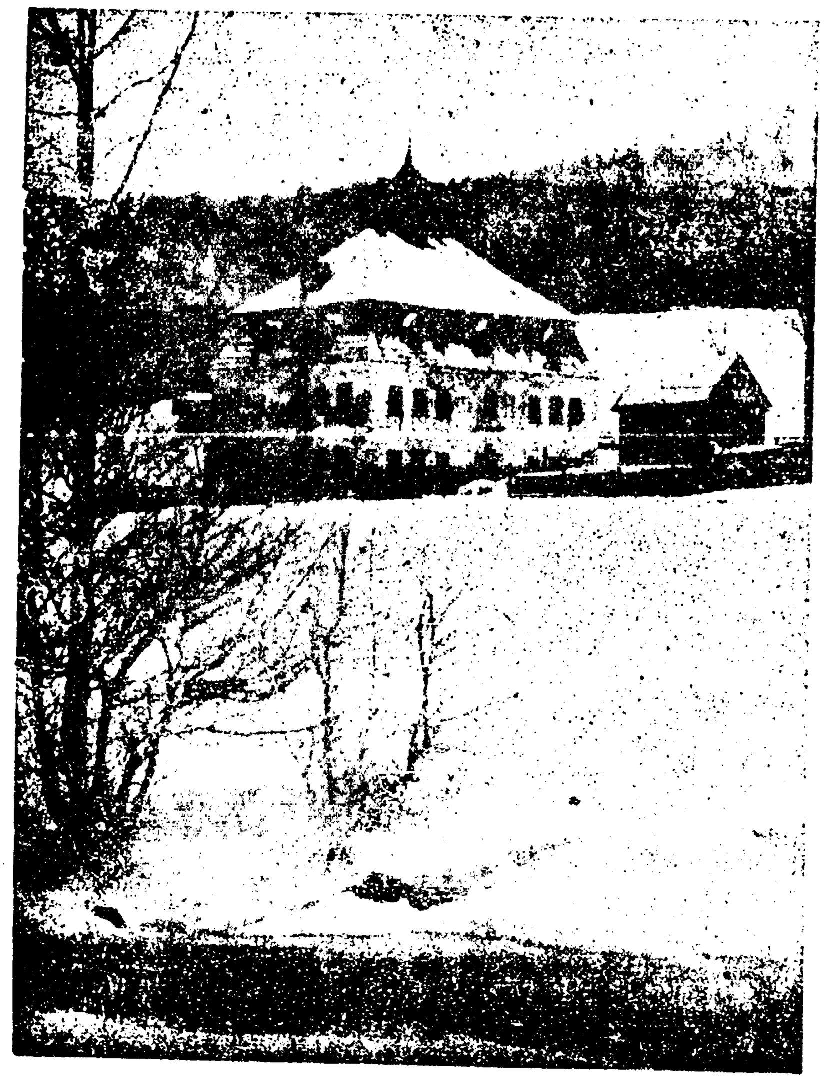

শীতে—যখন বরফে ঢেকে যায় সারা সুইজারল্যাণ্ড

সেই মূর্ত্তির সামনে মঞ্চের ওপর বিভিন্ন দেশের সভাপতিরা বসেছেন। আর নীচে সারি দিয়ে ভাগ করা সব দেশের নাম লেখা লেখা বসবার নির্দ্দিষ্ট জায়গা। আমরা সেখানে হেডফোন মাথায় দিয়ে বসলাম। এমন সুন্দর ব্যবস্থা যে যখন কোন দেশের প্রতিনিধি বক্তৃতা দেবেন তখনই সেটার ইংরিজীতে বা সেই সেই দেশের মাতৃভাষায় অনুবাদ হয়ে যাবে। যেমন, যদি কেউ চীনা ভাষায় বক্তৃতা দেন তবে বেতার মারফৎ রাশিয়ার লোকে রুশীয়, চীনের লোকে চীনা, ভারতীয়েরা ইংরাজী,—এমনি প্রত্যেকে যাতে নিজের পরিচিত ভাষায় শুনতে পান, সেই ব্যবস্থা হয়েছিল। বক্তৃতা যে যার দেশের মাতৃভাষাতেই দিয়েছিলেন, কিন্তু বক্তৃতার বক্তব্য আগেই লিখে এঁদের অফিসে দিতে হয়েছিল। কাজেই এ ব্যবস্থা করবার সুযোগ এঁদের হয়েছিল এবং সবাই-ই সুন্দর ভাবে বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

শ্রীযুক্তা কটন প্রথম বক্তৃতা দিয়ে অধিবেশনের কাজ সুরু করলেন। হাজার হাজার লোকে লোকারণ্য সভাকক্ষ যেন মুহূর্ত্তে শান্ত হয়ে গেল। তিনি বলে চললেন—শান্তির জন্যে, সংসারের নিরাপত্তার জন্যে—স্বামীপুত্রের কল্যাণের জন্যে আমরা এখানে

মিলিত হয়েছি। আমরা মা, ঘরের শান্তি বজায় রাখবার জন্যে সব চাইতে বড় দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা সবাই মিলে একত্রিত হয়েছি এই শপথ গ্রহণ করবার জন্যে যে আমরা কোন ক্রমেই ঘরের শান্তি—স্বামীপুত্রের কল্যাণকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেবো না। মাতৃকণ্ঠের সেই শপথ-বাণী যেন কেঁপে কেঁপে দিকে দিকে বয়ে চলতে লাগলো।

আফ্রিকার কাফ্রি মা এসেছেন পিঠে ছেলে বেঁধে নিয়ে। সুদূর ব্রেজিলের থেকেও মা এসেছেন। আরও এসেছেন দেশ বিদেশের মায়েরা তাঁদের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা-বাণী বহন করে। কালো মার কোলের কালো ছেলে সাদা মার কোলে কোলে ফিরছে, সাদা মার কোলে একবারও বেমানান লাগছে না। স্নেহের কাছে সাদা-কালোর দূরত্ব নেই কোথাও। সব মা-ই নিজের দেশে ছেলে রেখে এসেছেন, এই শিশুর মধ্যে যেন তাঁরা নিজেদের ছেলের নৈকট্য অনুভব করতে চেষ্টা করছেন।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রহরী—আল্পস্ পর্বত

ভোর সাতটা থেকে সুরু হয় অ'ধবেশন, আর শেষ হয় রাত বারোটায় সময়। খাবারদাবারের সমস্ত বন্দোবস্তই ওইখানে। শুধু খাওয়ার সময় কিছুক্ষণের জন্যে অধিবেশনের বিরতি। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা। ভারতীয় পোষাক সবাইকে খুব বেশী রকম আকৃষ্ট করেছিল। সবাই শাড়ীর বর্ণ বৈচিত্র্য আর পরবার ধরণ দেখে ঘন ঘন ছবি তুলেছে যে যেখানে পেরেছে। এ দেশে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই হয়তো অনুভব করেছেন সে শাড়ীপরা মেয়েদের ছবি তুলতে এঁরা খুবই ভালবাসেন। কাজেই মনে হয়েছে আমরা যেন একটা কেউ-কেটা লোক। দেশে হয়তো আমাদের দর কানাকড়িও না, এঁদের কাছে একেবারে অসাধারণ।

রাতে ঝক্‌ঝকে জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে ফিরেছি জেনেভা লেকের পাশ দিয়ে হোটেলে। চার-পুরু কাঁচের জানলা বন্ধ করে দিয়েছি, তবু দূরে দেখা যাচ্ছে জেনেভা লেকের চক্‌চকে জল। আংলেতে হোটেলের সামনে ফুটপাথে যন্ত্রসঙ্গীতের আসর বসেছে। একতান বাদন

কানে ভেসে ভেসে আসছে। সহরে যেন এই সময়টায় ভারি সুন্দর অবকাশের শ্রান্ত ছায়া নেমে আসে। যাঁরা খেতে আসেন তাঁরা গান শোনেন—বাজনা শোনেন। দলে দলে লেকের ধারে বেড়ান। জানালা খোলার উপায় নেই, তীব্র শীতের কনকনে হাওয়া কানে মুখে এসে আছড়ে পড়ছে। বিছানায় শুয়ে কানে সেই গানই ভেসে আসছে। কতক্ষণ জানি না, সেই গান শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘন অন্ধকারের মধ্যে সব তলিয়ে গেছে সুষুপ্তির নিবিড়তায়। ভোরের আলো মুঠো মুঠো হয়ে মুখে স্নেহের পরশজ্যোতিঃ ছড়িয়ে দিয়েছে, ঘুম গেছে ভেঙ্গে। তখনও সারা সহর ঘুমিয়ে, কেবল আমরা কয়েকজন জেগে আছি বাঙ্গালী মায়ের দল। আমাদের বেশ ভোরে ওঠা অভ্যাস। কিন্তু এরা যেমন রাত করে শোয়, সকালেও অত তাড়াতাড়ি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। কাজেই আমরা গেট খুলে লেকের ধারে বেরিয়ে পড়লাম—বেড়াতে।

খোকনমণি

সৈয়দ আব্দুল বারি

দুষ্টু খোকন সোনামণি
নামটী তাহার 'লাকি',
নেইকো ধরায় এমন কিছুই
জানতে তাহার বাকী।

দেখলে দোয়াত কলম নিয়ে
লিখতে খোকন বসে,
উল্‌টে দোয়াত কালি মেখে
ভূতটী সাজে শেষে।

তেলের শিশি দেখলে পরে
মুখটী খুলে তার
সবটুকু তেল ঢালবে সে ঠিক
মাথায় আপনার।

দেখলে কাগজ হাতে নিয়ে
পড়তে লাগে তায়,—
ভঙ্গিমাটী দেখেই তাহার
আপ্‌সে হাসি পায়।

মেকানিক্‌সে খোকামণির
সবচে' পাকা হাত,
ধারে কাছে যা পাবে তাই
ভাঙ্গবে সে নির্ঘাত।

দুষ্টুমিতে তাহার মত
নেইকো জুড়ি আর,
তবু খোকন সবার ভাল—
এমনি অবিচার!

সেই বনের গল্প

শ্রীসুকুমার দে সরকার

মেঘরাজার বড় রাগ সূয্যিঠাকুরের ওপর। তাই ঈশান কোণে গোঁফ চুমরে হুমকি দিয়ে ওঠে মেঘরাজ। আর দলে দলে ক্ষ্যাপা বুনো মোষের মত ছুটে আসতে থাকে মেঘরাজের সৈন্যদল। পায়ে পায়ে তাদের ধেয়ে আসে উনপঞ্চাশ পবন. চোখে চোখে চমকে যায় বিদ্যুৎ, আর আকাশ থেকে আকাশে বেজে ওঠে মেঘরাজের ডমরু।

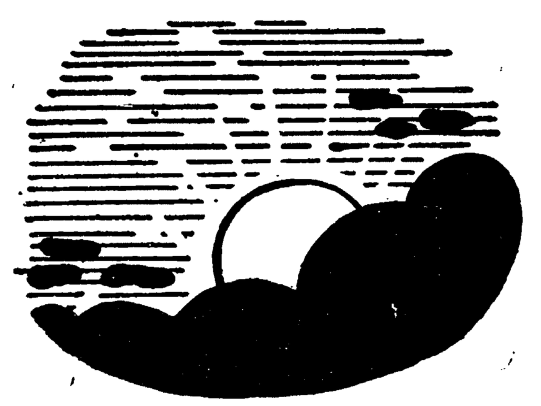

সূয্যিঠাকুরের মুখ কালো হয়ে যায় ঈশান কোণে, কিন্তু নৈঋ´তে আবার দুষ্টু ছেলের মত হেসে ওঠে—টু। আর উনপঞ্চাশ পবনে ভর করে মেঘেরা ছুটতে থাকে ঈশান থেকে নৈঋ´তে, বায়ুকোণ থেকে অগ্নিকোণে। হাওয়ার দাপটে ফুলে ওঠে বনমালা। শাল, শিরীষ, টুন, মহুয়া আর বাওবাব। দোলে হংসলতা, আর হাঁসেরা সার বেঁধে দুলে দুলে জলার জলে ডুব দেয়। নাক বাঁকা বকফুল মুঠো মুঠো সাদা আবীরের মত কালো মেঘের গায়ে ফেটে ছড়িয়ে পড়ে। আর রূপোলী বকেরা কালা-পেড়ে মেঘের কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ময়ূরপঙ্খী পাখা চালায় সাঁই সাঁই।

ময়ুর খুলে দেয় তার মরকত মণি পেখম আর মেঘের পানে চেয়ে নেচে ওঠে কেকা-নাচ। সে কী নাচ! সৈন্যসামন্ত নিয়ে বনের মাথায় থমকে দাঁড়ায় মেঘরাজ, তারপর গোঁফ চুমরে আকাশ থেকে আকাশে ফেটে যায় অট্টহাসিতে। ক্ষ্যাপা মেঘের দল জল হয়ে যায়। বনের মাথায় ঝুমঝুম ঝুমুর পরা বর্ষা নেমে আসে নেচে নেচে। ঝুমকো লতা বেয়ে, ঝুমকো জবার লাল চোখে চিক্‌চিকিয়ে, বট-শিরীষের বিশাল বুকে ভর ক'রে বনভূমে।

বৃষ্টি থেমে গেলে সাবধানে শিরীষ গাছের কোটর থেকে মুখ বার করে একটা কাঠবেড়ালী। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুক জুড়িয়ে যায়। খুর খুর ক'রে কাঠবেড়ালী কোটর থেকে সবুজ মখমল ঘাসে নেমে আসে। ঝড়বাদলে কত ফলপাকুড়, বীজ পড়েছে, কুড়িয়ে আনতে হবে। আর টুক টুক করে এ-গাছের কোটর থেকে, ও-গাছের গুঁড়ি থেকে

লোমওয়ালা লেজগুলো উঁচু ক'রে আকাশে চামর দুলিয়ে বেরিয়ে আসে কাঠবেড়ালীর দল। কাঠবেড়ালীরা কাজের লোক, সঞ্চয়ী। দু'পায়ে ফলপাকুড়, বীজ গড়িয়ে গড়িয়ে তারা নিয়ে চলে কোটরের পানে দল বেঁধে সার করে। তাদের এ বনে যেন লেগে গেছে

'পাঁচসালী যোজ্না'। অকেজো লোকের জায়গা কোথায় তাদের ভেতর? কোথায় তাদের সময় একবার বর্ষা-ধোয়া ধোঁয়াটে নীল আকাশের পানে চেয়ে দেখবার, যেখানে দিক্ চক্রবাল থেকে সাতরঙা রামধনু উঠে দূরের পাখা মেলা পাহাড়ের পানে মিলিয়ে গেছে?

একটা হরিণের দল শুধু সবুজ মখমল ঘাসের ডগাগুলো চিবিয়ে কাজ সারতে সারতে একবার থমকে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখে সেদিক্ পানে, আবার কাজ সারতে থাকে।

ভোঁ-ও-ও! মৌমাছিরা ঘুরে যায় মৌ নিয়ে নিয়ে। আবার আসে, আবার যায়। তাদের দল-বাঁধা কাজের চাপে মৌটুসী পাখীরা উড়ে যায়। ফুলের ভেতর কি বসার যো আছে মৌমাছিদের জ্বালায়? আর টুন গাছের ডালে গড়ে ওঠে মৌচাক। মৌমাছিরা মহা কাজের লোক। কত পরিকল্পনা তাদের! চাক গড়া, মৌ জমানো, সমাজের উন্নতি, কত কী! সময় কোথায় তাদের রামধনুর পানে তাকাবার? আর রামধনু তখন ভেঙ্গে ভেঙ্গে সাতরঙা প্রজাপতি হয়ে বনে বনে ছড়িয়ে পড়ে—মহুয়া ফুলে, ঝুমকো, যূঁই বক ফুলে ফুলে।

কর্কশ একটা কেকারব করে এক জোড়া ময়ূর মাঠে নামল। আকাশে পেখম খুলে দিয়ে নাচতে লাগল ময়ূরটা। সূয্যিঠাকুরের পড়ন্ত লাল আভায় পেখমে পেখমে মরকত মণি ঝলসাতে লাগল। দূর পাহাড়ের মাথায় মেঘরাজ গোঁফ চুমরে উঁকি দিল একবার। আর নেচে উঠল প্রজাপতিরা রঙে বেরঙে,—ঝুমকো, যূঁই ফুলে। কাঠবেড়ালীদের কাজ ভেঙ্গে গেল। মৌমাছিরা প্রজাপতির ঝাঁকে দিশেহারা। ব্যস্ত কাকেরা লুকিয়ে-রাখা খাবার খুঁজে পেল না। পিঁপড়েরা

কিন্তু ঠিক জানে তার সুড়ুক। কুচকাওয়াজ করে তারা বয়ে নিয়ে গেল মৌমাছির পায়ে ঝরা মৌ, ভুলো কাকেদের ভোলা খাবার আর কাঠবেড়ালীদের আধ-খাওয়া ফলপাকুড়।

আরও কাজের লোক পিঁপড়েরা। ময়ূরের নাচ আর প্রজাপতির পাখনায় ভোলার লোক তারা নয়।

"ওঃ, ভারী ত' প্যাখম!" বলে উঠল ক'জন কাঠবেড়ালী গিন্নী।—"লাগে আমাদের চামর দোলানো ঝুমরো লেজের কাছে? আর নাচ?..."

কাঠবেড়ালী গিন্নীরা আকাশে লেজের চামর দুলিয়ে নেচে উঠতে যাচ্ছিল, ধমকে উঠল কর্ত্তারা—"কাজের সময় নাচ কি? আমরা ময়ূর না প্রজাপতি?"

বনের মাথায় মাথায় ভেসে গেল লঙ্গুর বানরদের দলবাঁধা ডাক - উকু-উ—উক্কু-উ উকু-উকু-উক্কু!

গম্ভীর সন্ধ্যার পানে তাকিয়ে আরও গম্ভীর গলায় বুড়ো প্যাঁচা বলে উঠল, "তিনে কত্তি তিন হাজার..."

কাঠবেড়ালীরা শুধোল, "কিসের হিসেব হচ্ছে গো?"

বুড়ো প্যাঁচা কানে কলম গুঁজে বলল, "পড়ে ছিল তিনটে বীজ, হোল তিরিশটা গাছ, তিনশো ফুল, আর তিন হাজার ফল। মৌমাছি নিল মৌ, লঙ্গুরেরা খেল ফল আর কাঠবেড়ালীরা নিল বীজ।"

কাঠবেড়ালীরা বলল, "কাজের লোক কাঠবেড়ালীরা।"

মৌমাছিরা বলল, "কাজের দল মৌমাছিরা।"

"ক্যা ক্যা?"— বলল কাকেরা।—"কাকেদের মত কাজ-ভোলা কে?"

পিঁপড়েরা বলল, "কুচ কাওয়াজ! কুচ কাওয়াজ!"

লঙ্গুরেরা এ বন থেকে পাঠিয়ে দিল কাজের খবর—উকু—উ-উক্কু-উ।

ময়ূর শুধু নেচেই খালাস, আর প্রজাপতি পাখায় পাখায় ফুর ফুর।

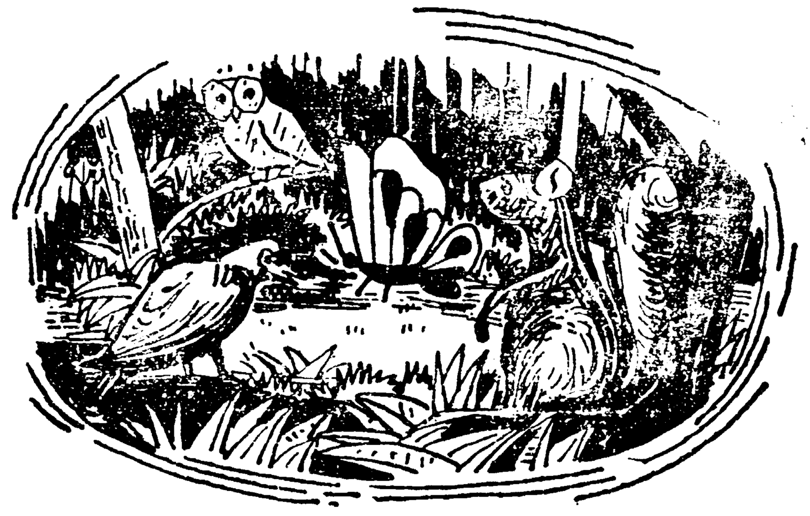

বন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোল ময়ূরদের আর প্রজাপতিদের। রীতিমত সভা করে। এত কাজের লোকের ভেতর ওরাই শুধু নাচিয়ে কুঁদিয়ে ফুরফুর, বেপরোয়া অসঞ্চয়ী। এত সমাজ উন্নয়ন, ভাগ বাঁটোয়ারার ভেতর ওরা বে-হিসেবী নাচিয়ে, রঙীন রঙের হাল্কা বুদ্বুদ।

কাঠবেড়ালীরা বলল, "অকেজো লোকের দাম নেই কোন। ওরা ফল, বীজ কুড়িয়ে জমিয়ে রাখে না।"

মৌমাছিরা বলল, "ওরা চাক বাঁধে না।"

পিঁপড়েরা বলল, "ওরা কুচকাওয়াজ করে না।"

কাকেরা বলল, "ওরা খাবার খুঁজে এনে লুকিয়ে হারিয়ে ফেলতে জানে না।"

লঙ্গুরেরা বলল, "ওরা কাজের খবর বনে বনে ছড়িয়ে দিতে জানে না।"

আর হরিণেরা বলল, "ওরা শুধু নাচে আর হাওয়ায় হাওয়ায় ফুরফুরে রঙের রঙীন ফানুস ছিটিয়ে দেয়।"

তাই নির্ব্বাসন হোল ময়ূরের আর প্রজাপতির। আর কাজের লোকদের কাজ চলল পুরোদমে। সার্থক হয়ে উঠতে লাগল যোজ্‌না। তবু কোথায় যেন কাজের তালে তাল কেটে যেতে লাগল, কোথায় যেন রঙের জালে রঙ গেল হারিয়ে। মেঘরাজ সৈন্যসামন্ত নিয়ে হুমকী দিয়ে হাসতে গিয়ে হারিয়ে ফেলল হাসি। ময়ূর আর নাচে না। এক ফোঁটা চোখের জল শুধু ঝরে গেল বনের মাথায়। উনপঞ্চাশ পবনে ভর করে মেঘেরা উড়ে গেল। মহুয়া ফুলের রেণু ঝরে গেল। আর ঝুমকো, শিরীষ ফুল রঙীন প্রজাপতি না দেখে পরাগ ছড়ালই না আর। নাক বাঁকা বকফুল খসে গেল। রামধনু নেই আর আকাশে।

তার পরে একদিন দেখা গেল বনে আর ফুল নেই, শুধু ঝুলে আছে মস্ত একটা ঘণ্টার মত পোড়া লাল ঝুমকো ফুল। সেই প্রকাণ্ড বীভৎস ফুল দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল মৌমাছিরা। সবুজ মখমলের মত ঘাস শুকিয়ে গেল। শুধু যেখানে মেঘেদের এক ফোঁটা চোখের জল পড়েছিল সেইখানে একটা প্রকাণ্ড লম্বা ঘাসের শীষ আকাশের মহাশূন্যে মাথা তুলে দিয়ে বেতের মত লক লক করে উঠল। হরিণেরা ঘাস খেতে এসে সেই প্রকাণ্ড লম্বা চাবুকের মত ঘাসের শীষ দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে বাঁচল।

গাছে ফল হোল না। শুধু একটা প্রকাণ্ড জালার মত ফল হয়েছিল। লঙ্গুরেরা সে ফল দেখেই পগার পার। আর কাঠবেড়ালীরা সে ফলের বীজ নিয়ে যাবে কি, তার গায়ে লেগে সব উল্টে চীৎপটাং!

শুকনো বাকল-ওঠা শিরীষ গাছের কোটরে বসে ভর সন্ধ্যেবেলা বুড়ো প্যাঁচা হিসেবে ঢ্যাঁড়া দিল—"তিনে কত্তি এক · ···"

শুধোল মৌমাছিরা, শুধোল কাঠবেড়ালীরা—"কি হিসেব হচ্ছে শুনি?"

কানে কলমটা গুঁজে বুড়ো প্যাঁচা বলল—"পড়েছিল তিন হাজার বীজ। হোল একটা ফুল, একটা ঘাস আর একটা ফল। এই ঢ্যাঁড়া।"

বুড়ো প্যাঁচার হিসেব শুনে কাজের লোকদের কাজ গুলিয়ে গেল।

কাঠবেড়ালী বলল, "আমরা নাচব?"

কাক বলল, "আমরা ফুরফুরিয়ে উড়ে যাব?"

পিঁপড়ে বলল, "আমরা কুজকাওয়াজ ভুলে যাব?"

মৌমাছি বলল, "গান গাইব আমরা?"

কিন্তু ময়ূর না হলে নাচ শেখাবে কে? প্রজাপতি না হলে কে উড়িয়ে দেবে রঙে রঙের রঙীন ফানুস? মেঘরাজের ক্ষ্যাপা সৈন্যসামন্তদের ভুলিয়ে জল করে দেবে কে? রামধনু ভেঙ্গে সাতরঙা প্রজাপতি ছিটিয়ে কে দেবে?

গম্ভীর গলায় হিসেবী প্যাঁচা বলল, "একজোড়া ডিম।"

"ডিম? কোথায়? কার?"

দেখা গেল সেই সবুজ ঘাসের শীষের নীচে এক জোড়া ময়ূরের ডিম, আর ঝুমকো ফুলের কোরকে রেশমী জালে ঢাকা একজোড়া শুঁয়ো-পোকা।

তারপর সেই ডিম থেকে আবার জন্ম নিল বনে ময়ূর। আর শুঁয়ো-পোকা দুটো একদিন গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেল। মরকত পেখম ছড়িয়ে নেচে উঠল ময়ূরেরা আবার একদিন। আর উনপঞ্চাশ পবনে ঈশান থেকে নৈর্ঋত, বায়ু থেকে অগ্নিকোণে ছড়িয়ে গেল মেঘরাজের গোঁফ-চোমরান অট্টহাসি। মেঘেরা জল হয়ে গেল। ঝুমুর পরে বনের মাথায় এল বর্ষা। ঝুমকো লতায় দুলে উঠল ঝুমকো ফুল। তারার মত যূঁই ফুলে ভরে উঠল আকাশ। আর রামধনু ছড়িয়ে গেল দিক্‌ চক্রবাল থেকে দূর পাহাড়ের পাখায়। আর প্রজাপতিরা রামধনু রঙ মেখে ফুরফুরিয়ে ছিটিয়ে গেল।

বুড়ো প্যাঁচার কানে কলম গোঁজার অবসর নেই—"তিনে কত্তি লাখে লাখ ···· "

ব্যাংএর ছড়া

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

য়্যাং ককাকক্ ব্যাং ককাকক্
য়্যাং ব্যাঙা ব্যাঙ্ ব্যাং,
ব্যাংককেতে পৌঁছে দেখি
ঘুরছে যে ট্যাং ট্যাং
চারদিকেতেই ব্যাং!

(তাদের) সরু সরু ঠ্যাং,
(তারা) ছোড়ে ট্যারা ল্যাং,
(আর) সেই ঠ্যাংএতে লাফিয়ে চলে
ল্যাং ড্যাঙা ড্যাং ড্যাং।
য়্যাং ব্যাঙাব্যাঙ ব্যাং॥

শ্রী মনিলাল অধিকারী

—ষোল—

বিস্মিত মলয়ের দিকে তাকিয়ে তাপস মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। তারপর রহস্যময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল,—'শঙ্খের উপর চৌকো দাগটার কোন অর্থ বুঝতে পারলি?'

—'কিছুমাত্র না।'

—'আবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ—কিছু বুঝতে পারিস্ কিনা।'

লেন্সটা নিয়ে মলয় আবার ঝুঁকে পড়ল শঙ্খের উপরে।

উৎসুক দৃষ্টিতে তাপস মলয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ সময় গেল নীরবে। তাপস লক্ষ্য করল মলয়ের পরীক্ষারত গম্ভীর মুখ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছে।

অবশেষে লেন্সটা টেবিলের উপর রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল মলয়। মুখ দিয়ে বেরুল শুধু একটি শব্দ,—'অদ্ভুত!'

তাপস জিজ্ঞাসা করল,—'কি?'

—'বসন্ত রায় লোকটি সত্যিই অদ্ভুত, আর অদ্ভুত আশ্চর্য্য তার শিল্পসৃষ্টি। সত্যি কথা বলতে কি—অপূর্ব্ব!'

—'হেঁয়ালী রেখে সোজা কথায় বল—কি দেখলি?'

—'শঙ্খের উপর চৌকো দাগটা শুধু দাগ নয়। চৌকো ক্ষুদ্র একটা টালির মত অংশ কেটে আশ্চর্য্য রকম নিখুঁত করে বসান হয়েছে শঙ্খের উপরে। টালিটা এত নিখুঁত করে বসান হয়েছে যে আমি প্রথমে লেন্সের সাহায্যে পরীক্ষা করেও বুঝতে পারি নি—ওটা

চৌকো দাগ ছাড়া আর কিছু। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা করতে গিয়ে রঙের তফাৎ ধরা পড়ল আমার চোখে—আর তাতেই সমস্ত রহস্য জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আসলে ঐ চৌকো টালিটা লাল শঙ্খের অংশ নয়, অন্য কোন একটা শঙ্খ থেকে কেটে এনে লাল শঙ্খের উপর নিখুঁত করে বসান হয়েছে। কেমন, পরীক্ষায় পাশ করলাম তো?'

মলয়ের ঠোঁট জোড়ায় ফুটে উঠল সফলতার হাসি।

খুশি হয়ে তাপস বলল,—'নিশ্চয়।'

সুজিত জিজ্ঞাসা করল,—'শঙ্খের উপর চৌকো টালিটা জুড়ে দেওয়ার অর্থ কি?'

তাপস বলল,—'অর্থ কিছু একটা আছে বই কি। বিনা প্রয়োজনে অত কষ্ট করে, অত সাবধানে বসন্ত রায় ছোট্ট টালিটা শঙ্খের উপর যোড়েন নি নিশ্চয়।'

সুজিত জিজ্ঞাসা করল,—'কারণটা কি সেটাই তো জানতে চাইছি।'

—'মূল কারণটা কি তা ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে ওটার একটা আনুমানিক কারণ বলতে পারি। অবশ্য অনুমান যে সব সময় সত্য হবে—এর কোন অর্থ নেই।

—'তোর আনুমানিক কারণটাই বল্, শুনি।'

—'আমার মনে হয়, বসন্ত রায় টালিটার উল্টো পিঠে রত্নসিন্দুকের সংকেতলিপি খোদাই করে রেখে গেছেন। বসন্ত রায় অত্যন্ত চতুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

—'তোর অনুমান সত্য কিনা, শঙ্খ থেকে টালিটা খুলে ফেললেই তো বোঝা যাবে।'

—'তা অবশ্য বোঝা যাবে। কিন্তু কি উপায়ে শঙ্খ থেকে টালিটা খোলা যায় সেইটাই তো এতক্ষণ ধরে চিন্তা করছি।'

—'অত চিন্তার কি আছে এতে? হাতুড়ির কয়েকটা ঘা দিলেই তো শঙ্খটা ভেঙ্গে যাবে। আর তা হলে অতি সহজে শঙ্খ থেকে টালিটা বের করে নেওয়া যাবে।'

সুজিতের সহজ কথাটা শুনে তাপস আর মলয় এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

বিস্মিত সুজিত জিজ্ঞাসা করল,—'হাসলি যে তোরা?'

মলয় আরও জোরে হেসে উঠল।

তাপস বলল,—'তোর বুদ্ধির বহর দেখে হেসে ফেললুম।'

—'কেন?—কেন?'

—'বুঝলি নে বোকা! ধরে নে আমার অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। তা হ'লে শঙ্খটা যদি হাতুড়ির ঘায়ে ভেঙ্গে ফেলি তো গুপ্তধনের রহস্য চিরদিনের জন্য গুপ্তই রয়ে যাবে।'

—'তা বটে!' সুজিত একেবারে নীরব হয়ে গেল।

তাপস বলল,—'চতুর বসন্ত রায়ের চাতুর্য্যের জট অত সহজে খোলা যাবে না সুজিত! অত্যন্ত সাবধানে একটি একটি করে গ্রন্থি খুলতে হবে। ঠিক যেমন করে মালাকর পদ্মকোরকের দলগুলিকে একটি একটি করে মেলে দেয়। তবে তোর হতাশ হবার কোন কারণ নেই। আমার ধারণা বসন্ত রায়ের রত্নসিন্দুক তুই নিশ্চয়ই পাবি। আজই হোক আর কালই হোক, পাবি নিশ্চয়ই। শঙ্খের উপর যেমন নিখুঁত ভাবে চৌকো টালিটা বসিয়ে গেছেন বসন্ত রায় আবার তেমনি নিখুঁত

ভাবে টালিটা শঙ্খের উপর থেকে খুলে নেবার কৌশল উৎকীর্ণ করে রেখে গেছেন শঙ্খের উপরের খোদিত চিত্রগুলির মধ্যে। আর আমি সেই রহস্যময় সংকেতের সন্ধান পেয়েছি।'

বোবা বিস্ময়ে সুজিত শুধু তাকিয়ে রইল তাপসের দিকে।'

মলয়ের চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে তাপস মৃদু হাসল। বলল,—'শঙ্খটা হাতে আসার পর পরীক্ষা করে জানতে পারলাম, শঙ্খটার আসল রঙ লাল নয়—ওটার উপরে লাল রঙ দেওয়া হয়েছে। তখন সহজেই অনুমান করে নিলাম ঐ লাল রঙের নীচে গুপ্ত রত্নসিন্দুকের ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন শিল্পী বসন্ত রায়। সন্দেহজনক স্থানগুলো থেকে শঙ্খের উপরের লাল রঙ তুলে দিতেই আবিষ্কৃত হ'ল চৌকো টালি। তখন আমার ধারণা হ'ল, শঙ্খের থেকে টালিটা খুলে নেবার একটা কোন বিশেষ কৌশল আছে, আর বসন্ত রায় সেই কৌশলের সঙ্কেত উৎকীণ করে রেখে গেছেন শঙ্খের উপরের চিত্রগুলির মধ্যে। তারপর শঙ্খের উপরের চিত্রগুলি পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই আমার নজরে পড়ল খোদাইরত শিল্পীর চিত্রটির উপরে। বর্ডারের দু' ধারে মাঝামাঝি জায়গায় কর্মরত শিল্পীর দু'টি চিত্র অঙ্কিত আছে। চিত্র দু'টির বিষয়বস্তু এক। শিল্পী একটা চৌকো পাথরের উপর ছেনি আর হাতুড়ির সাহায্যে খোদাই করে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করছে তার কল্পনার মূর্ত্তিকে। চিত্র দু'টির বিষয়বস্তু যদিও এক, কিন্তু তবুও কর্মরত শিল্পীর হস্তচালনার কৌশল দেখান হয়েছে দুটি চিত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ডানদিকের চিত্রে দেখান হয়েছে শিল্পী চৌকো পাথরের ডানধারের কোণে ছেনি সোজা রেখে হাতুড়ির আঘাত হানছে, আর বাঁ দিকের চিত্রে দেখান হয়েছে শিল্পী চৌকো পাথরের ডানদিকের কোণে ছেনির মুখ রেখে আর ছেনির মাথাটা নীচের দিকে হেলিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নীচের দিক থেকে হাতুড়ির আঘাত করছে। আমার অনুমান, শিল্পীর হস্তচালনার কৌশল নিপুণ ভাবে শঙ্খের উপর যোড়া' দেওয়া টালিটার ডানদিকের কোণে প্রয়োগ করলে টালিটা সহজেই খুলে আসবে। খোদাই কম রত শিল্পীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে বসন্ত রায় বোধ হয় এই কথাই বলতে চেয়েছেন।'

মলয় বলল, 'তাই যদি হয় তো এখনি একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক না। শুভ কাজে বিলম্ব করে লাভ কি?'

'আমারও তাই ইচ্ছে।'—চিন্তিত মনে তাপস বলল—'একটা ছোট্ট লোহার ষ্টিক্ আর একটা ছোট্ট হাতুড়ি নিয়ে আয়। এখুনি পরীক্ষা করে দেখতে চাই—আমার অনুমান সত্য কিনা।'

তাপসের আদেশ পালন করল মলয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোহার ষ্টিক্ আর ছোট্ট একটা হাতুড়ি নিয়ে এল।

হাতুড়ি আর লোহার ষ্টিক্টা হাতে নিয়ে তাপস মলয়কে বলল—'টেবিলের উপরে শঙ্খটা চেপে ধরে থাক। সাবধানে ধরে থাকবি। আমি যখন টালির কোণে হাতুড়ির ঘা দেব তখন যেন শঙ্খটা নড়ে-চড়ে না।'

তাপস প্রস্তুত হয়ে নিল। তারপরে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে টালির নীচের অংশে ডানদিকের কোণে ষ্টিকের মুখ রেখে, শঙ্খে উৎকীর্ণ শিল্পীর হস্তচালনার কৌশল অনুকরণ করে দু'বার হাতুড়ির ঘা দিল।

টালির উপর হাতুড়ির দ্বিতীয় আঘাত পড়তেই উপর দিকের যোড়ের মুখটা উঁচু হয়ে উঠল।

পরীক্ষার ফল কি দাঁড়ায় দেখবার জন্যে মলয় আর সুজিত টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল।

যোড়ের মুখ থেকে টালিটা উপর দিকে ঠেলে উঠতে দেখে সুজিত বিস্ময়ে একেবারে মূক হয়ে গেল। কোন কথাই বলতে পারল না সে. শুধু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শঙ্খটার দিকে।

বিস্ময় আর আনন্দে উত্তেজিত মলয় অস্ফুটস্বরে বলে উঠল—'অদ্ভুত!—সত্যি অদ্ভুত!'

তাপসও যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু উত্তেজনার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না তার চোখে-মুখে। নীরবে সে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল তাপসের রেখাকুঞ্চিত প্রশস্ত ললাটে।

আবার কর্মব্যস্ত হয়ে উঠল তাপস।

অত্যন্ত সতর্ক হয়ে সাবধানে ছুরির ফলার সাহায্যে শঙ্খের উপর থেকে টালিটা খুলে নিল। টালিটা খুলে নিতেই তাপসের নজরে পড়ল একটা ছোট্ট তামার মাদুলি যোড়া আছে টালিটার উল্টো পিঠে।

ছুরির সাহায্যে টালির থেকে মাদুলিটা খুলে নিয়ে তাপস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। মাদুলিটার একধারের মুখ মোম দিয়ে আঁটা।

সূচের মত সরু একটা যন্ত্রের সাহায্যে তাপস মাদুলির মুখের মোম আস্তে আস্তে খুলে ফেলল। মাদুলির ভিতরে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ রয়েছে দেখা গেল। একটা চিমটের সাহায্যে তাপস মাদুলির ভিতর থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করে ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল।

কাগজের উপর স্পষ্ট অক্ষরে কয়েক ছত্র লেখা রয়েছে:

" ....

অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এতদূর পৌঁছিয়াছ। সফলতা লাভ করিবেক—সন্দেহ নাই। রত্নসিন্দুকের কাহিনী কল্পনা নহে—সত্য। যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি তোমাকে এতদূর টানিয়া আনিয়াছে সেই বুদ্ধিই তোমাকে গুপ্তধনের সন্ধান দিবেক।

আশীর্ব্বাদ রহিল।

—বসন্ত রায়"

(ক্রমশঃ)

গোপাল ভট্ট

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পথে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব শ্রীরঙ্গম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। কাবেরী নদীর মধ্যে একটি ছোট দ্বীপ, সেই দ্বীপের মধ্যে শ্রীরঙ্গনাথের বিশাল মন্দির মেঘলোক ভেদ করিয়া উঠিয়াছে নীল আকাশের উপর।

মহাপ্রভু

‘কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি-প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হইল সর্ব্বলোক-মন॥ চঃ চঃ

নাটমন্দিরের এক পাশে দাঁড়াইয়া বেঙ্কটভট্ট দেখিতেছিলেন প্রভুর অপূর্ব্ব ভাবাবেশ আর মনোমুগ্ধকর নৃত্য। দেখিয়া বেঙ্কটভট্ট মুগ্ধ হইয়া গেলেন। চোখের জলে ভাসিয়া বেঙ্কট ভট্ট লুটাইয়া পডিলেন মহাপ্রভুর চরণতলে।—“প্রভু, কৃপা করে এ অধমের কুটীরে পদধূলি দাও, আমি ধন্য হয়ে যাই।”

মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ভট্টের কাতরতায় মহাপ্রভু সেখানে চার মাস থাকিয়া কৃষ্ণকথা আর কৃষ্ণনামে চারিদিক্ মাতাইয়া তুলিলেন। এই ব্রাহ্মণ পরিবার ছিলেন শ্রীসম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণব। বেঙ্কটভট্টের ছোট ভাই অসাধারণ

মেধাবী আর তেজস্বী, অল্প বয়সেই তিনি শঙ্করাচার্য্যের মত প্রতিভাশালী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ভক্তিপথ তাঁহার মোটেই ভাল লাগিত না। বেদান্তে যে নিরাকার ব্রহ্মের কথা আছে তাহার উপাসনাই তিনি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, “পুরুষ মানুষ হয়ে মেয়েদের মত কান্না আর উন্মাদের মত নাচা-কুঁদা, এ সব কি? যত্ত সব পাগলের কাণ্ড।”

অল্পকাল মধ্যেই তিনি বেদান্ত দর্শনে পরম পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বড় বড় পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার কাছে মাথা নত করিলেন। পরম জ্ঞানী সাধক বলিয়া চারিদিকে তাঁহার নাম রটিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা বেঙ্কট ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। গৃহদেবতা ৺লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা, পূজা নিয়াই তাঁহার দিন কাটিত। এই বেঙ্কটভট্টের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট।

মহাপ্রভু যখন তাঁহাদের বাড়ীতে অতিথি হইলেন তখন গোপালের বয়স মাত্র দশ বৎসর। প্রভুর স্বর্ণকান্তি ভাবঘন মূর্ত্তি দেখিয়া গোপালের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল ইনিই তাঁহার ইষ্টদেব—আপন হইতেও আপন জন। অশ্রুপূর্ণ চোখে গোপাল দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন প্রভুর মনোমুগ্ধকর রূপ, শুনিতে লাগিলেন তাঁহার শ্রীমুখের অমৃতময়ী হরিনাম। কাছে যাইতে চান কিন্তু যাইতে সাহস হয় না। বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা বলিতেছিলেন, হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল গোপালের উপর। হাতের ইসারায় তিনি ডাকিলেন তাঁহাকে। কৃতার্থ হইয়া গেলেন গোপাল। ভাবাবেগে আসিয়া তিনি লুটাইয়া পড়িলেন প্রভুর শ্রীচরণে। পরম স্নেহে মহাপ্রভু গোপালকে কোলে তুলিয়া লইলেন। প্রভুর প্রেমস্পর্শে গোপালের শরীর কাঁপিয়া উঠিল, গায়ের লোম কাঁটা দিয়া উঠিল কদম্বকুসুমের মত। অশ্রুসিক্ত নয়নে মহাপ্রভু গোপালের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, “বৎস, তোমার শ্রীকৃষ্ণপদে ভক্তি হোক, ভেসে যাও কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যায় ধন্য হয়ে যাক সর্ব্বলোক।”

ভাব-রাজের অপূর্ব্ব প্রেমের স্পর্শ পাইয়া গঠিত হইয়া গেল গোপালের ভবিষ্যৎ জীবন। দিনরাত তিনি প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন আর তাঁহার চরণসেবা করেন। কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের মধ্য দিয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল তিনি তাহা বুঝিতেই পারিলেন না।

রোজ সকালে মহাপ্রভু বেঙ্কটভট্টকে লইয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে যাইতেন এবং সেখানে বহুক্ষণ আনন্দে কাটাইয়া বাড়ী ফিরিতেন। একদিন মন্দিরে গিয়া প্রভু দেখিলেন এক ব্রাহ্মণ নাটমন্দিরে বসিয়া গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতেছেন। পাঠ করিতে করিতে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার শরীরে অশ্রু,

কম্প, স্বেদ, পুলক প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে ক্ষণে ক্ষণে। ইহা দেখিয়া —

'মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ॥'— চঃ চঃ

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন. "প্রভু, আমি মূর্খ, সংস্কৃত ভাষা ভাল করে পড়তে পারি না। পড়বার সময় যায়গায় যায়গায় অশুদ্ধ উচ্চারণ হয়। শুনে পণ্ডিতেরা হাসেন, বিদ্রূপ করেন। এ সবই আমি বুঝি. কিন্তু তবু পাঠ ছাডতে পারি না। কারণ আমার গুরু আদেশ করেছেন যে আমাকে রোজ গীতা পাঠ করতে হবে। গীতার সমস্ত অধ্যায়ের মধ্যে এই অষ্টাদশ অধ্যায়টি আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। কারণ এই সময় আমি স্পষ্ট দেখতে পাই—

'অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে হাতে শ্যামল সুন্দর ॥
অর্জ্জুনে কহিতে আছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ॥"— চঃ চঃ

"যতক্ষণ পড়ি ততক্ষণই ঐ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে আর আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। এই জন্যই গীতা পাঠ আমার ছাড়তে ইচ্ছা করে না।"

আনন্দে অধীর হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমিই যথার্থ গীতা পাঠের অধিকারী গীতার সার অর্থ তুমিই বুঝেছ। ইচ্ছামত তুমি গীতা পাঠ করে যাও, শুদ্ধ-অশুদ্ধের দিকে দৃষ্টি দিও না।"

ভক্তি গদগদচিত্তে ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে পড়িয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

'তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ হেন তুমি মোর মনে লয় ॥
কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তে তার মন হইয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥' চঃ চঃ

মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া বলিলেন, "চুপ এ কথা আর কাউকে ব'লো না, আপন মনে কাজ করে যাও ; শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে শীঘ্রই কৃপা করবেন।"

মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হইয়া গেলেন এবং সেই দিন হইতে মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে চার মাস কাটিয়া গেল। ভক্ত পরিবারকে কাঁদাইয়া মহাপ্রভু চলিয়া গেলেন রঙ্গক্ষেত্র ছাড়িয়া। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "বেঙ্কটভট্ট, তোমার

ছেলে গোপালকে আমার বড় ভাল লেগেছে। কালে ও একজন পরম ভক্ত হবে। ওকে ভাল করে পডিয়ে শুনিয়ে মানুষ ক'রো, আর বিবাহ দিও না।"

মহাপ্রভু চলিয়া গেলেন। ভট্ট-গৃহের আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। প্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়া বেঙ্কট লক্ষ্মীনারায়ণের সেবায় আত্মসমর্পণ করিলেন ; গোপালের শিক্ষাও চলিতে লাগিল তার সঙ্গে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোপাল হইয়া উঠিলেন পরম পণ্ডিত, আর পরম ভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। এদিকে হইয়াছিল কি, বেঙ্কটের সেই বৈদান্তিক ভ্রাতা তাঁহাদের এই ভাব ও প্রেমোন্মাদ দেখিয়া ভিতরে ভিতরে ভারী বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র গোপালকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে তাহাকে নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। কিন্তু বেঙ্কটভট্টের জন্য তাহাতে বিষম বাধা পড়িল। পিতার দেখাদেখি পুত্রও ভক্তিপথের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল প্রবল ভাবে। বিরক্ত হইয়া তিনি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন কাশীধামে। সেখানে গিয়া তিনি যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার নাম হইল প্রকাশানন্দ।

কিছুদিনের মধ্যেই কাশীধামে প্রকাশানন্দের প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল। তিনি দ্বিতীয় শঙ্কর রূপে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বহু দণ্ডী ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কাশীধাম হইতে প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর শ্রীরঙ্গম্ গমন ও ভট্ট-পরিবারের অবস্থা শুনিলেন। ভাবুক সন্ন্যাসী সমস্ত পরিবারকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রও বাদ পড়ে নাই। গোপাল এখন হরিনাম করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া পড়ে,— হাসে, কাঁদে, নৃত্য করে। কখনও বা মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে গড়াগড়ি যায়। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া প্রকাশানন্দ চারিদিকে মহাপ্রভুর কুৎসা করিতে লাগিলেন।—"কোথা থেকে এই যাদুকর এসে সন্ন্যাস ধর্ম্মটাকে রসাতলে দিতে বসেছে ! কোথায় ধ্যান, ধারণা, বেদান্ত আলোচনা—এই সব করবে, তা নয় কেবল—

'ভাবুক সব সঙ্গে লইয়া করে সংকীর্ত্তন।
সন্ন্যাসী হইয়া করে নর্ত্তন গায়ন ॥' —চ: চঃ

এই লোক দেশটাকে উচ্ছন্ন না দিয়ে ছাড়বে না দেখছি !"

এইভাবে কুৎসা রটনা করিয়াও কিন্তু কোন ফল হইল না। শেষে প্রকাশানন্দেরও দিন আসিল। সেই অদ্ভুত যাদুকরের প্রভাবে পড়িয়া তাঁহাকেও ভক্তিপথ গ্রহণ করিতে হইল। যাঁহাকে একদিন পাগল ভাবুক বলিয়া গালমন্দ দিয়াছিলেন তাঁহারই চরণে পড়িয়া তিনি কাতরকণ্ঠে ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। প্রেমের ঠাকুর অমনি প্রকাশানন্দকে আলিঙ্গন দিয়া কৃতার্থ করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে বেঙ্কট ও তাঁহার স্ত্রী দেহত্যাগ করিলেন। বন্ধনমুক্ত হইয়া গোপাল চলিলেন বৃন্দাবনে। তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল যে বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে একবার নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করেন, কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশ ছিল সোজা বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহাকে রূপ-সনাতনের সহকারী হইতে হইবে। কাজেই মনপ্রাণ নীলাচলে প্রেরণ করিয়া শুধু দেহ মাত্র লইয়া গোপাল বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। রূপ ও সনাতন গোপালকে পাইয়া মহা সমাদরে গ্রহণ করিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হইল এই তিন মহাপুরুষের মিলনে। এই তিনজন একমত না হইলে তখন কোন বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রকাশ বা প্রচার হইতে পারিত না।

কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করার পর নীলাচল হইতে মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ আসিল। মহাপ্রভু আশীর্ব্বাদ স্বরূপ তাঁহার নিজের আসন এবং ডোর-কৌপীন ও বহির্ব্বাস পাঠাইয়া দিলেন গোপালের জন্য। ইষ্টদেবের আশীর্ব্বাদ পাইয়া গোপাল আনন্দে অধীর হইরা উঠিলেন। ঘন ঘন তাঁহার সমাধি হইতে লাগিল, প্রেমাশ্রুতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল দুই চক্ষু। ভাগ্যবান্ গোপাল ভট্ট এইরূপে প্রভুর কৃপা পাইয়া বৈষ্ণব-গুরুকুলের প্রধানদের একজন হইয়া বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজাপদ্ধতি ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুশাসন প্রস্তুতে তিনি মনে-প্রাণে লাগিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রমে আশ্রয় লইলেন। জীব গোস্বামী তাঁহাকে লইয়া গেলেন গোপাল ভট্টের কাছে। গোপাল ভট্ট শ্রীনিবাসকে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিলেন। বৃন্দাবনের সকলেরই দৃঢ় ধারণা ছিল যে মহাপ্রভু যখন তাঁহার নিজের আসন, কৌপীন ও বহির্ব্বাস গোপালকে দিয়া গিয়াছেন তখন বৃন্দাবনে তিনিই মহাপ্রভুর প্রতিনিধি। তাই পশ্চিম দেশের ভক্তগণ বৃন্দাবনে আসিলেই জীব গোস্বামী তাঁহাদিগকে গোপাল ভট্টের কাছে পাঠাইয়া দিতেন দীক্ষার জন্য।

একবার তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া গোপাল ভট্ট উত্তর ভারতের গণ্ডকী নদীর তীরে বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে পড়িল একটি সুন্দর শালগ্রাম শিলা। পরম আদরে ভট্ট শালগ্রামটি তুলিয়া লইয়া গেলেন। গল্প আছে, তাঁহার প্রাণের সাধ পূর্ণ করিবার জন্য ঐ শালগ্রাম একদিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপালের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। গোপাল সেই বিগ্রহের নাম দিলেন—শ্রীশ্রীরাধারমণ। পরম ভক্তিভরে তিনি তাঁহার সেবা-পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল, গোপাল ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তারপর ৮৫ বৎসর বয়সে এক আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীতে গোপাল ভট্ট বৃন্দাবন অন্ধকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণপদে বিলীন হইয়া গেলেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম. এস্-সি

—বিজ্ঞানের একটি স্মরণীয় বছর—

১লা জুলাই, ১৯৫৭

তারিখটির গুরুত্ব হয়তো সাধারণ লোকের কাছে কিছুই নয়, কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এই দিনটি নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেন? তোমাদের মধ্যে যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড় (অবশ্য যারা শুধু বেছে বেছে খেলাধূলার পাতা কিংবা সিনেমার পাতাটুকু পড় তাদের কথা বলছি না), তারা হয়তো দেখে থাকবে এই তারিখটি থেকে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশের বিজ্ঞানীরা মিলে একটি বিশেষ ধরণের বছর পালন করবেন ঠিক করেছেন। বছর বললাম বটে, কিন্তু এই বছরের পরিমাণ ১২ মাস নয়—১৮ মাস। এই বিশেষ বছরটির ইংরেজী নাম দেওয়া হয়েছে "ইন্টারন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল্ ইয়ার" যাকে বাংলায় বলা যায় "আন্তর্জাতিক ভূ-প্রাকৃতিক বছর"।

কি করা হবে এই বছরে? এই সময়টা ধরে গোটা পৃথিবী যুড়ে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করবেন পৃথিবীর এ-যাবৎ-অজানা নানা ধরণের গোপন রহস্য। সুমেরু আর কুমেরু, উঁচু পাহাড়ের চূড়া আর গভীর সমুদ্রের তলা—কিছুই খুঁজতে বাকি রাখা হবে না। শুধু তাই নয়, মহাশূন্যেরও বহু-বহু গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা হবে এই আঠারো মাস ধরে। পৃথিবীর ৫৬টি দেশের ৫০০০ বিজ্ঞানী এ কাজে পরস্পরের সহযোগিতা করবেন ব'লে ঠিক করেছেন। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরাও আছেন এর মধ্যে।

কাজেই, বুঝতে পারছ, সাধারণ লোকে এ নিয়ে মাথা না ঘামালেও, বিজ্ঞানী-মহলে এই সময়টায় কত বড় সাড়া পড়ে যাবার কথা। আর পড়েছেও তাই।

অনেক দিন,—সে আজ প্রায় ৭৫ বছর আগে বিজ্ঞানীরা একবার এই রকম একটা বিশেষ ধরণের বৈজ্ঞানিক বছর পালন করেছিলেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য

ছিল মেরু সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করা। তাই ওর নাম দেওয়া হয় মেরু-বছর। তার পর ঠিক হ'ল, প্রতি একশ' বছরে দু'বার, অর্থাৎ ৫০ বছর পর পর এই রকম একটি করে বিশেষ বৈজ্ঞানিক বছর পালন করা হবে। সেই অনুযায়ী ৫০ বছর পরে, ১৯৩২ সালে দ্বিতীয় মেরু-বছর পালন করলেন বিজ্ঞানীরা। নামে 'বছর' হ'লেও ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত চল্‌ল সেই মেরু-বছর। ঠিক হ'ল, আবার ৫০ বছর পরে ১৯৮২ সালে আর একটি মেরু-বছর পালন করা হবে।—তৃতীয় মেরু-বছর।

কিন্তু ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের এত দ্রুত উন্নতি হ'তে লাগল যে তার জন্য ক্রমাগতই নানা রকম তথ্য দরকার হ'তে লাগল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাকে দিল আরও অনেকখানি এগিয়ে। তখন একদল বিজ্ঞানী বললেন, ৫০ বছর পর পর নয়—এবার থেকে একশ' বছরে চার বার, অর্থাৎ ২৫ বছর পর পর এই রকম মেরু-বছর পালন করতে হবে। তার মানে, ১৯৮২ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ১৯৫৭ সালেই এটি করতে হবে। এর পর নানা দেশের বিজ্ঞানীরা মিলে একটা আন্তর্জাতিক বৈঠক বসালেন। সেখানেও এই মতে সায় দিলেন সবাই। উপরন্তু, ঠিক হ'ল, শুধু মেরু-অঞ্চল নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এই রকম পরীক্ষা চালাতে হবে।

১৯৫৭ সালটাকেই বা কেন বেছে নেওয়া হ'ল সে প্রশ্ন তোমাদের মনে আসতে পারে। তোমরা, যারা গ্রহনক্ষত্রের গল্প—বিশেষ করে সূর্য ঠাকুরের গল্প একটু-আধটু পড়েছ, তারা হয়তো এও পড়েছ যে এগারো বছর পর পর সূর্যের বুকে একটা বিশেষ ধরণের আলোড়ন হয় যার ফলে সূর্যের গায়ে একসঙ্গে দেখা দেয় অনেক কলঙ্ক বা "সান্‌-স্পট্‌"। এই আলোড়নের সময় সূর্যের গা থেকে বহু বিদ্যুৎ-কণা ছিটকে বেরিয়ে পড়ে এবং তার কিছু কিছু মহাকাশের বুক চিরে বিপুল বেগে ছুটতে ছুটতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। চুম্বক লোহা যে ভাবে তার দুই মেরুতে লোহা বা লোহার গুঁড়ো টেনে নেয়, আমাদের পৃথিবীও তখন তেমনি তার দুই মেরুতে সেগুলি টেনে নেয়। পণ্ডিতদের মতে পৃথিবীটাও একটা বিরাট্‌ চুম্বক কিনা! সেই বিদ্যুৎ-কণা মেরুর রাজ্যের হাল্কা বাতাসে পড়ে অদ্ভুত রঙ্গিন এক রকম আলোর সৃষ্টি করে। তারই নাম অরোরার আলো বা 'অরোরা বোরিয়ালিস্‌'। ১৯৫৭ সালটা হচ্ছে সেই 'এগারো বছরকার ঘুরপাকের বছর'। কাজেই মেরু-অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করার এটি যে একটি অত্যন্ত সুসময় তাতে সন্দেহ কি?

১৯৫৭ সালের জুলাই থেকে এই ভূ-প্রাকৃতিক বছর সুরু হ'লেও এর জন্য তোড়জোড় চলছিল অনেক দিন থেকেই। মার্কিন বিজ্ঞানীরা তো বছর তিনেক আগে থেকেই দক্ষিণ মেরুতে একটা জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওখানকার সমুদ্রের হালচাল—

বিশেষ করে বরফ জমা দেখে-শুনে আসবার জন্য। শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে ভূ-প্রাকৃতিক বছরে বৈজ্ঞানিক তথ্য তল্লাস চালাবার জন্য নানা রকম সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং লোকজনও পাঠানো হচ্ছিল ইতিমধ্যে। এই ভাবে, আসল কাজ সুরু হবার আগেই তাঁরা ও-অঞ্চলে সাতটি পরীক্ষা-কেন্দ্র বসিয়ে নিয়েছেন। শুধু আমেরিকান বিজ্ঞানীরাই ন'ন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও ঐ রকম পরীক্ষার ঘাঁটি বসিয়েছেন ঐ অঞ্চলে। সব শুদ্ধ ৫৬টি ঘাঁটি। এদের মধ্যে আছেন সোভিয়েট রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জাপান এবং আরও কয়েকটি দেশের বিজ্ঞানীরা। বলা বাহুল্য, ঐ সব দেশের সরকারই এর বেশীর ভাগ খরচপত্র যোগাচ্ছেন।

আগেই বলেছি, এই স্মরণীয় বছরে মেরু-অঞ্চল সম্বন্ধে যেমন পরীক্ষা চলবে—তেমনি পরীক্ষা চলবে ডাঙ্গায়, পাহাড়ে, আকাশে আর সমুদ্রে। এ জন্য আধুনিকতম যন্ত্রপাতি—র‍্যাডার, আপনা-থেকে-কাজ-করে এ রকম ঘুরন্ত ক্যামেরা, নানা রকম বেতার-যন্ত্র, এমন কি পরমাণবিক যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমেরিকা এবং রাশিয়া থেকেও এ বছরই তাদের বহু-বিজ্ঞাপিত কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়বার ব্যবস্থা হয়েছে। আমেরিকার আকাশ থেকে যেগুলি ছাড়া হবে তার এক-একটির ওজন হবে সাড়ে একুশ পাউণ্ডের মত। ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে সেগুলি মহাশূন্যে ছুটতে থাকবে,—অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগে এই সব উপগ্রহ আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। চাঁদের চেয়ে অনেক—অনেক জোরে, এবং বেশ কয়েক বছর ধরে। তার পর হয়তো তারা একদিন উল্কার মতই জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে—পৃথিবীই হয়তো তখন টেনে নেবে তাদেরকে নিজের কোলে।

এই কৃত্রিম উপগ্রহের চালচলন—গতিবিধি দেখবার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী কতকগুলি স্বয়ংক্রিয় দূর পাল্লার দূরবীণ-ক্যামেরা তৈরী করা হয়েছে। সারা পৃথিবীর বুকে ১২টি জায়গা বেছে নিয়ে সেগুলো বসানো হচ্ছে। ভারতেও নৈনিতালে পাহাড়ের ওপর এই রকম একটি ক্যামেরা বসছে।

পৃথিবীর ৫৬টি দেশ মিলে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-কার্যে কত টাকা খরচ করবেন বলে ঠিক করেছেন জান? - প্রায় হাজার কোটি টাকা।

—আর একটি স্মরণীয় বছর— ইতিহাসের—

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পলাশীর "যুদ্ধে" সত্যিকার যুদ্ধ কতটুকু হয়েছিল, আর জাল, জুয়াচুরি, বিশ্বাস-

ঘাতকতা এর কতখানি অংশ দখল করেছিল তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। কিন্তু সে যাই হোক, এই 'যুদ্ধের' ফলেই যে ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় সে কথা অস্বীকার করার যো নেই।

পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশ' বছর পরে ১৮৫৭ সালে হয় সিপাহীযুদ্ধ - ইংরেজ ঐতিহাসিকের ভাষায় যার নাম সিপাহীবিদ্রোহ। এখানেও ব্যাপারটা বিদ্রোহ না যুদ্ধ তা নিয়ে তর্কাতর্কি অনেক হয়েছে। শেষ পর্যন্ত শেষেরটিকেও মেনে নিয়েছেন বেশীর ভাগ ইতিহাসকাররা। অবশ্য যারা এই ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেছিল তারা অনেকেই ইংরেজেরই বেতনভোগী সৈনিক ছিল তা অস্বীকার করা যায় না, তবে এই যুদ্ধে যাঁরা নায়ক ছিলেন তাঁরা কেউই ইংরেজের অধীনে চাকুরে ছিলেন না—ইংরেজের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করাই ছিল তাঁদের কাম্য। তাই ইংরেজরা যাই বলুক, সিপাহীযুদ্ধই যে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম কোন দ্বিধা না করেই তা বলা যায়।

সিপাহীযুদ্ধ অবশ্য শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করে নি। এর অনেকগুলি কারণ ছিল। সিপাহীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব ছিল যথেষ্ট, তা ছাড়া যুদ্ধ করতে হলে যে রকম সুপরিকল্পনা নিয়ে নামতে হয় তাও তারা করে নি। ফলে শেষ রক্ষা করতে পারে নি কেউ। নির্বিচারে ইংরেজদের মারা আর লুটপাট করা এদিকেই নজর ছিল তাদের বেশী। সব চেয়ে বড় ত্রুটী ছিল এই, যে, দেশের জনগণের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করে নি। তাদের ওপরেও অত্যাচার করেছে যথেষ্ট। ফলে সিপাহীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোকের যেমন অভাব ছিল না—তেমনি ইংরেজকেও সমর্থন করেছে বহু ভারতীয়। এর ওপর আবার নায়কদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ ছিল খানিকটা। দেশের মুক্তির সঙ্গে নিজেদের স্বার্থের দিকেও ছিল তাঁদের যথেষ্ট নজর। তবু ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, কুঙার সিং, তাঁতিয়া টোপী, নানা সাহেব এঁরা যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। অবশ্য দিল্লীর সম্রাট্ বাহাদুর শা'কে যেন খানিকটা জোর করেই নামানো হয়েছিল। তবে তাঁর লাঞ্ছনাও বড় কম হয় নি। অবশ্য তিনি তখন ৭০ বছরের বৃদ্ধ, কী-ই বা করতে পারতেন! তা ছাড়া প্রজাদের সংযত করার মত প্রতিভাও ছিল না তাঁর। পলাশীর মত এ ক্ষেত্রেও ইংরেজদের বন্ধু ছিল এ-দেশী অনেক রাজা-মহারাজা। কাশ্মীরের মহারাজা, নেপালের মহারাজা—এঁরা তো খুবই সাহায্য করেছিলেন। গোড়ার দিকে শিখরাও কিছু কিছু করেছিল, পরে অবশ্য তারাও বিরুদ্ধে যোগ দেয়।

সিপাহীযুদ্ধে বিজয়ী হবার পর ইংরেজ যত রকম ভাবে পেরেছে প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে নি। তাদের সেই অকথ্য অত্যাচার—হাজার হাজার নিরপরাধকে ধরে নির্বিচারে

ফাঁসী দেবার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় চিরকাল ইংরেজের কলঙ্ক-কালিমা হয়ে লেখা থাকবে।

সিপাহীযুদ্ধের পর আবার একশ' বছর চলে গেছে। এবারে, এই ১৯৫৭ সালে ভারতের সেই প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের শতবার্ষিকী। স্বাধীন ভারত অবশ্যই তা স্মরণ করবে—সমারোহের সঙ্গে।

বাইসন-শিকার

শ্রীনন্দিতা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীচিত্রিতা মুখোপাধ্যায়

"বাইসন মোর নাম ভীষণ মূরতি।

... .

মাথা নীচু করি ধায় যমদূত মত,
ভূত তায় ভয় পায়—রাগ তার অত।"

বাস্ রে, এ হেন বাইসন শিকার! সহজ কথা নয় তো!

দাদু বললেন, "না না, শিকার নয়—অস্বীকার। বাইসন হ'ল বন-গরু। গোহত্যা কি করা যায়—হিন্দু হয়ে? থাকলেই বা আমাদের তিন ভাইয়ের কাছে তিনটে বন্দুক!"

ব্যাপারটা তা হলে খুলেই বলা যাক্। ১৯২৯ সাল। আগষ্ট মাস। সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। এক রাতে প্রায় দশ ইঞ্চি বৃষ্টি। জলপাইগুড়ি সহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ত্রিস্রোতা নদী—চলতি কথায় তিস্তা। এমনিতে তার বুকে বেশী জল থাকে না—অনেক সময় হেঁটেই পার হওয়া যায়—যদিও চওড়া কম নয়। কিন্তু বর্ষাকালে তার উদ্দাম, ভয়াল রূপ। পাহাড়ে নদী—প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসে পাহাড়ের বুক থেকে, আর সামনে যা পায় তাই ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার খরস্রোতে। হিমালয়ের দু'টি অতিকায় বাইসন কোন রকমে বোধ হয় এই তিস্তার সামনে এসে পড়েছিল, নদী তাদেরকেও ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে।

স্রোতে ভাসতে ভাসতে বাইসন দু'টি কূল পেল জলপাইগুড়ি সহরে, এক সাহেবের বাংলোর পাশে। তখন শেষ রাত। স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত জানোয়ার দু'টো নদীর ধারেই অনেকক্ষণ পড়ে রইল। তার পর একটু চাঙ্গা হয়ে এগিয়ে এল সহরের দিকে।

আমাদের দাদুর বাড়ী হচ্ছে এই সহরেরই উকিলপাড়ায়, নদীর ধার থেকে বেশ খানিকটা দূর। আর ওখানকার প্রথামত সব বাড়ীরই সীমানায় বাঁশের বেড়া দেওয়া। সারা রাত প্রচণ্ড বৃষ্টির পর ভোরের দিকে তখনও লোকজন কেউ পথে বেরোয় নি। একটা বাইসন কোন বাধা না পেয়ে বেড়া টপ্‌কে টপ্‌কে অবশেষে এসে হাজির হ'ল দাদুর বাড়ীর সামনে। এ বাড়ীতে তখন লোকের ঘুম ভেঙেছে, সামনের ফটকটাও খোলা হয়েছে। বাইসন সুযোগ পেয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ীর উঠোনে।

দাদুর বাবা বাইরে বেরিয়ে এসেছেন ; গোয়াল-ঘরের দিকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ শুনে মনে করলেন, বুঝি গোয়াল-ঘরে শূয়োর-টুয়োর কিছু ঢুকেছে, তাই গরুগুলো চেঁচাচ্ছে। কাছেই একটা বাঁশ পড়ে ছিল. সেটা তুলে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন।

মানুষের সাড়া পেয়েই বাইসনটা বেরিয়ে এল। দেখে তো দাদুর বাবার চক্ষুস্থির। বন্য মহিষের মত ভয়াল চেহারার অতিকায় জীব। উঁচুতে প্রায় ৭।৮ ফুট, লম্বায় ৯।১০ ফুট। মাথায় প্রায় ২ ফুট লম্বা দু'টো শিং। জন্তুটার সারা গায়ে চক্ চক্ করছে কালচে বাদামী মখমলের মত বড় বড় লোম। চোখ দু'টি রক্তবর্ণ, বিস্ফারিত নাসা, তার পাশে মুখ দিয়ে অনবরত ফেনা উঠছে। দাদুর বাড়ীর পুরোনো কুকুর ভোলা সাহস করে এগিয়ে গেল। বাইসন কিন্তু তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মাথা নুইয়ে আক্রমণ করল দাদুর বাবাকে। দাদুর বাবার উপস্থিত-বুদ্ধি ছিল খুব। তিনি বেগতিক দেখে বাঁশ ফেলে দিয়ে কাছেই পাটাতনের ঘরের প্ল্যাংকিংএর নীচে ঢুকে পড়লেন। জলপাইগুড়িতে অনেক বাড়ীতেই এই রকম পাটাতনের ঘর আছে। ঘরের মেঝেটা কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরী। পাটাতনটা আবার ২।৩ হাত উঁচু অনেকগুলি কাঠের খুঁটির ওপর বসানো। ফলে ঘরের মেঝের তলাটা ফাঁকা। অত বড় বাইসনটা তো আর অত নীচু পাটাতনের নীচে ঢুকতে পারে না! খানিকক্ষণ বিফল চেষ্টা করে সে বাইরে বেরিয়ে এল এবং. এসেই, তার মনোমত শিকার পেয়ে গেল।

দাদুর পাশের বাড়ীর রাঁধুনে ঠাকুর তখন মাটিতে ঘাসের ওপর বসে দাঁতন করছিল। বাইসন তড়িৎ-বেগে গিয়ে তাকে শিংএ তুলে নিল. তার পর শিংএর আগায় ক্রমাগত ঘোরাতে লাগল বন্ বন্ ক'রে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে অন্যান্য বাড়ী থেকে বহু লোক ছুটে এসেছে, আর তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে আসবার জন্যে দাদুকে ডাকছে। অন্য পাড়া থেকেও লোক এসেছে, কেউ কেউ বন্দুক নিয়েও এসেছে।

ঠাকুরকে খানিকক্ষণ শিংএ ঘুরিয়ে বাইসনটা তাকে আছড়ে মাটীতে ফেলে দিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তুলে নিল শিংএ। সবাই ঠাকুরের আসন্ন মৃত্যু দেখে 'হায় হায়' করে উঠল।

হঠাৎ গুড়ুম শব্দে গর্জ্জে উঠল একটা বন্দুক। ভিড়ের ভিতর থেকে একজন মুসলমান শিকারী বন্দুক ছুঁড়েছে বাইসনের বুক লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্য। গুলি বাইসনের পাঁজরা ভেদ করে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ঠাকুরটা তখনও তার শিংএর ওপর।

বিরাটকায় জন্তুটা গুলি খেয়েই উল্টে পড়ল। বার কয়েক উঠবার চেষ্টা করল। তার পর স্থির হয়ে গেল।

পুলিশ সাহেব এসে শিকারীটিকে দু'শ' টাকা পুরস্কার দিলেন। তার পর দু'টো গরুর গাড়ী করে বাইসনটাকে নিয়ে সমস্ত সহর ঘুরিয়ে দেখান হ'ল।

ঠাকুরটাকে তখনই হাসপাতালে পাঠানো হ'ল। সে শেষ পর্য্যন্ত প্রাণে বেঁচেছিল, তবে তার সারতে লেগেছিল ছ' মাস।

বাদ্‌লা দিনে

শ্রীপম্পা ভট্টাচা

সাত সকালে মেঘের ঘটা
সারা আকাশময় ;
গুড়্ গুড়্ গুড়্ শব্দ শুনে
অম্‌নি লাগে ভয়।

সুয্যি মামার আজ দেখা নেই—
লুকোয় মেঘের ফাঁকে ;
ব্যাঙ্‌গুলোতে জট্‌লা ক'রে
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ডাকে।

বাজ পড়ে না—নেই বিজুলী,
ঝরছে খালি জল ;
দাঁড়কাকেরা ভিজ্‌ছে ব'সে,—
সৃষ্টি টলোমল !

বৃষ্টি-শেষে রামধনু যে
উঠ্‌ছে ভেসে হোথা ;
আয় ছুটে ভাই, ক'রবো খেলা,—
থাক্ না পড়ার কথা।

আমার স্বপন

শ্রীসুচেতা ভট্টাচার্য

দূরে আকাশের কোল ঘেঁসে ওড়ে পাখী,
সাদা মেঘ হাসে স্নিগ্ধ নীলিমা ঢাকি,
ওখানে আমার স্বপন মেলেছে পাখা ;

যেখানে রূপ্‌সা দুকূলে উঠেছে ছেপে,
হাওয়া উল্লাসে ছুটে চলে কেঁপে কেঁপে,
সেখানে আমার স্বপনের ছবি আঁকা।

দূরের বনানী ভরেছে সবুজ কোল
সোনালী চুম্‌কি জাগালো কী হিল্লোল !
আমার স্বপন সেখানে রয়েছে জেগে ;

সন্ধ্যার সাথে মিষ্টি দখিনা বায়
শিরীষ ফুলের গন্ধ লাগায় গায়,
আমার স্বপন উতলা সে বায় লেগে।

নতুন যুগের কবি

শ্রীঅরুণকুমার ভট্টাচার্য

ওগো নতুন যুগের কবি,
অনুরোধ করি লিখ নাকো শুধু
কল্পলোকের ছবি।

মলয় বাতাস, ফুলের সুবাস,
চাঁদের মিষ্টি হাসি
অনেক দেখেছি—অনেক পড়েছি,
আজ সবি লাগে বাসি।

লেখ বসে আজ মানুষের জয়গান,
দেশের লাগিয়া দেশ ছাড়ি' যারা
দিল ডালি কোটি প্রাণ।

মৃত সন্তানে কোলে লয়ে মাতা
কাঁদে ব'সে রাস্তায়,
এক মুঠি চাল, এক কণা ছাদ—
তাও যে জোটে না হায়।

বাঁচার দাবীতে মানুষের এই
চরম আত্মগ্লানি—
তারি ছবি আঁক - শোনাও তাদেরে
তব আশ্বাস-বাণী।

ঐক্যবদ্ধ জনতার গাহ জয়,
তাই লেখ আজ,—মলয় বাতাস,
ফুলের সুবাস নয়।

দুষ্টু মেয়ে বৃষ্টি এলো

শ্রীগুণধর বর্ধন

দুষ্টু মেয়ে বৃষ্টি এলো—
কিন্তু ভারী মিষ্টি গো,
হঠাৎ জেগে উঠলো ধরা—
জাগলো সারা সৃষ্টি গো !
আঁধার এসে নামলো শেষে
বিরাট কালো দানব-বেশে,
ঝাপ্‌সা হ'ল দৃষ্টি চোখের
হায় কি অনাছিষ্টি গো !

ঝরুক কত ঝরবে ধারা—
আবার পরে থামবে তো !
আঁধার ঘুচে আলোর ধারা
ধরার 'পরে নামবে তো !
কিসের তরে ভয়টা করো,
একটুখানি ধৈর্য ধরো—
দুঃখ-সুখের এই যে রীতি
তখন তাহা জানবে তো !

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

ভারত স্বাধীন হবার পর দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে গেল। এই দশ বছরে অনেক দিক্ দিয়ে দেশের উন্নতি হয়েছে—বিশ্বের দরবারে স্বাধীন ভারত খানিকটা মর্য্যাদাও পেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমাদের ধ্যানের ভারত আজও আমরা পাই নি। দুঃখ, কষ্ট, অন্নাভাব, গৃহসমস্যা, বেকার-সমস্যা অনেক কিছুরই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আজও আমরা মুক্ত হতে পারি নি। তার ওপর আছে বাস্তুহারাদের মর্মন্তুদ সমস্যা। কিন্তু এ সবের প্রতিকার আমাদেরই হাতে—তোমাদেরই হাতে। স্বাধীন ভারতকে সর্ববিপদ্ থেকে মুক্ত করে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নিজেদেরকেও সেই ভাবে গড়ে তুলতে হবে। স্বাধীনতা-দিবসে এই হোক আমাদের সংকল্প।

এ বছরের স্বাধীনতা-দিবসটি আর একদিক্ দিয়ে স্মরণীয়। সিপাহীযুদ্ধের শতবার্ষিকীও পালন করা হচ্ছে এই সঙ্গে। ইংরেজের কাছে 'বিদ্রোহ' ব'লে পরিচিত হলেও সিপাহীযুদ্ধই যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সত্যিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম তা আমরা ভুলতে পারি না। আজ একশ' বছর পরে সিপাহীযুদ্ধের সেই বীর যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানাবার দিন এসেছে।

এবারে তোমাদের চিঠির জবাব :

শ্রীআনন্দগোপাল বিশ্বাস (দহকুলা)—ভ্রমণকাহিনী তোমার এত ভাল লাগে। সত্যি, দেশভ্রমণের মত মজার আর কি আছে ? আমার কোন্ লেখাটার সঙ্গে তোমাদের গ্রামের মিল আছে লেখ নি তো ! পিকনিকের নেমন্তন্ন পেয়ে আবার তোমাদের সমবয়সী হবার সাধ জাগছে। শ্রীশিকুল চক্রবর্তী (সাহারসা)—তোমার কবিত্বপূর্ণ বিরাট চিঠিখানি নিজেও উপভোগ করলাম, আর সবাইকেও প'ড়িয়ে শোনালাম। হরিণের গল্প শুনে আমার কন্যা তো লাফিয়ে ওঠে আর কি ! বেশ আছ তোমরা। আবার, মোটর-গাড়ী চালাতে শিখেছ ? সেও তো একটা জোর খবর ! কাউকে চাপা দেও নি তো ? শ্রীজয়া রায় (আইজটনগর)—তোমার মিষ্টি চিঠিখানায় তোমার মিষ্টি মনের ছোঁয়া পেলাম। আরও লেখনী-বন্ধুর নাম-ঠিকানা পাঠাচ্ছি। বর্ষা বাস্তবিকই আমার প্রিয় ঋতু—যদি না বাড়ীর বাইরে কাজ নিয়ে বেরুতে হয়। কাজ থাকলে সে অবশ্য একটা সমস্যা। কিন্তু আজকাল তো প্রতি পদেই সমস্যা ! তোমার আমন্ত্রণ মনে রইল, কিন্তু তখন বর্ষা কোথায় পাব ? শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়—পুরোনো রামধনু ১ম ও ১২শ বছরের বাঁধানো (প্রতি সেট ৩৲) কিছু এখনও আছে। তার পরের গুলো খুচরো পাওয়া যায়—তবে কোন কোন বছরের কোন কোন সংখ্যা নেই। তালিকা পেলে খুঁজে দেখতে বলব। দাম ১৫শ বছর পর্যন্ত প্রতি সংখ্যা ।০, ১৬শ—১৯শ বর্ষ প্রতি সংখ্যা ।/০, তার পর থেকে প্রতি সংখ্যা ।৶০। রামধনুতে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের নৃমুণ্ডশিকারী, অমৃতদ্বীপ, রণু-টমুর এ্যাডভেঞ্চার প্রভৃতি উপন্যাস বেরিয়েছিল। শ্রীঅমল সেনগুপ্ত (কলিকাতা-১০)—হ্যাঁ, নতুন পয়সার মত দশমিক ওজনও ক্রমে ক্রমে চালু হবে ভারতে, এবং বছর ঘুরতে না ঘুরতেই। ওটা চালু হয়ে যাবার পর হিসাবপত্র খুবই সহজ হয়ে যাবে—এবং খাঁটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব'লে ওটার একটা আন্তর্জাতিক মূল্যও থাকবে। বিজ্ঞানীরা তো অনেক দিন থেকেই এই প্রথা মেনে নিয়েছেন পৃথিবীর সর্বত্র। তবে প্রথম সুরু হবার পর কিছু দিন বেশ খানিকটা গোলমাল হবে বই কি—সর্বত্রই যা হয়। আর সমস্ত বদলে ফেলতে অর্থব্যয়ও হয়তো হবে কোটি কোটি টাকা ! শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত (ভাগলপুর)—রাধামাধবের রত্নহার এখনও বই হয়ে বেরোয় নি। বের করার ইচ্ছা আছে। বৈজ্ঞানিকের বিপত্তির শেষের অংশ লেখক যথা সময়ে লিখে উঠতে পারেন নি—পরে বই করে বার করেছেন। পুরোনো রামধনু সম্বন্ধে কার্যাধ্যক্ষ মশাইকে ব্যবস্থা করতে বলছি। শ্রীবাসুদেব সরকার (কাঁচড়াপাড়া)—নাক নিয়ে রসিকতা করতে গিয়ে তুমি যে রকম ভাবিত হয়ে পড়েছ তাতে আমাদেরই ভাবনা হচ্ছে ! কবির ভাষায় তুমি কি ওকে "তুচ্ছতার বেড়া হ'তে মুক্তি" দিতে চাও ? শ্রীপ্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—'সন্দেশ' সকলেরই প্রিয়। আবার তৈরী হলে পাবে বৈকি ! বারোয়ারী উপন্যাস কত বড় হবে সে তো তোমাদেরই হাতে ! কিন্তু এবারে যে সবাই ফেল্, কারও লেখা ছাপবার মত হয় নি। এ লজ্জা ঢাকবার জন্য কি এগিয়ে আসবে না কেউ ? শিশুসাহিত্যিকদের পরিচিতি বয়স বা গুণাগুণ দেখে আগে-পরে দেওয়া হবে না এ তো গোড়াতেই বলে দেওয়া হয়েছে ! মাঝে মাঝে বাদও পড়বে—যেমন এবারে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণা সুর (কলিতাতা-৪)—শব্দচৌকি ভাল হলে কেন বেরোবে না ? নির্ভয়ে পাঠাতে পার।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ এইখানে শেষ করি। ইতি—রাঃ সঃ

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

সাড়ে সাত মাইল

উত্তরদাতাদের নাম :— মননকুমার দেব (আগরতলা) ; গুণধর বর্দ্ধন (ঝাড়বনী) ; অরুণাভ, দীপক, মাধন, সুপ্রভাত, কালীপদ, বংশী, বিনয়, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি (ব্যানাজিডাঙ্গা) ; কৃষ্ণা সুর (কলিকাতা-৪) ; শম্ভুনাথ মণ্ডল, গৌর ও নিতাই (দেবালয়) ; ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী (কলিকাতা-২৯) ; নূরজাহান বেগম (ঢাকা) ; কল্যাণী চক্রবর্ত্তী (নয়া দিল্লী) ; সুবেশ ও সুতৃপ্তি (কলিকাতা-১৯) , রাণু ও গণু (লখনৌ) . সীতারাম সিংহ (গয়া) ইলা, কস্তুরী ও ইরা রায় চৌধুরী (পাটনা) ; সুব্রতা বসু (কলিকাতা-১২) ।

নূতন ধাঁধা

নীচের লেখাগুলো ঠিকমত পড়া যাচ্ছে না ? আচ্ছা, শূন্য স্থানগুলি একটি করে খাদ্যদ্রব্যের (মাছ তরিতরকারী, ফলমূল, মশলা, মিঠাই ইত্যাদি) নাম দিয়ে পূর্ণ কর দেখি ! তার পর দেখ পড়তে পার কিনা !

জা — থেকে পো — এসেছে । গা — মী জরি বসানো, — লমা-চুমকির কাজ করা। তাই পরে হা — দিচ্ছি — লতে মাসে গড়ে — শ দিন । বাঁধা — ন । তা রো — উঠুক আর ঝড় — এ — ই ভেঙ্গে পড়ুক ঘরের — এ । একটা — কার আছে তাই বাঁচোয়া । দুপুরে — দর — দিয়ে একটু শোব তার যো — ? অবশ্য টেবি — ড়োরা ঘুমু — জ্জা পায় না । — রা তাদের — রে সকাল-বিকে — ভঙ্গ থেকে সুরু করে বে — স্থানের আইনকা — নিয়ে লাগাই আড্ডা । আর চলে যত রক — পরামর্শ, যা এ — হয় না । কে কার — খাঁ, কার চ — ণ্টো, কে কার — — ভাঙ্গল ইত্যাদি । কেউ যদি বলে, —, ওঁকে তো — না, আ — বাই হেসে বলে, আ — লুন, তবে মাপ চাই গে !

সুরিনা স্পেশাল
কালি

আপনার কলমের আয়ু অক্ষুন্ন রাখে!

সুপ্রীম কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ • কলিকাতা

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৵০

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২।০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১। জয়যাত্রা — ৪৲
২। দেবালয় — ৪৲
৩। ইন্দ্রধনু — ৪৲
৪। বসুধারা — ৪৲
৫। পরশমণি — ৪৲
৬। ছোটদের চয়নিকা — ৩৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸০

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥০

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১।০

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥৵০

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানি বই]

শিশু উপন্যাস

[প্রায় ৩০০ শত খানি বই বাহির হইয়াছে]

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

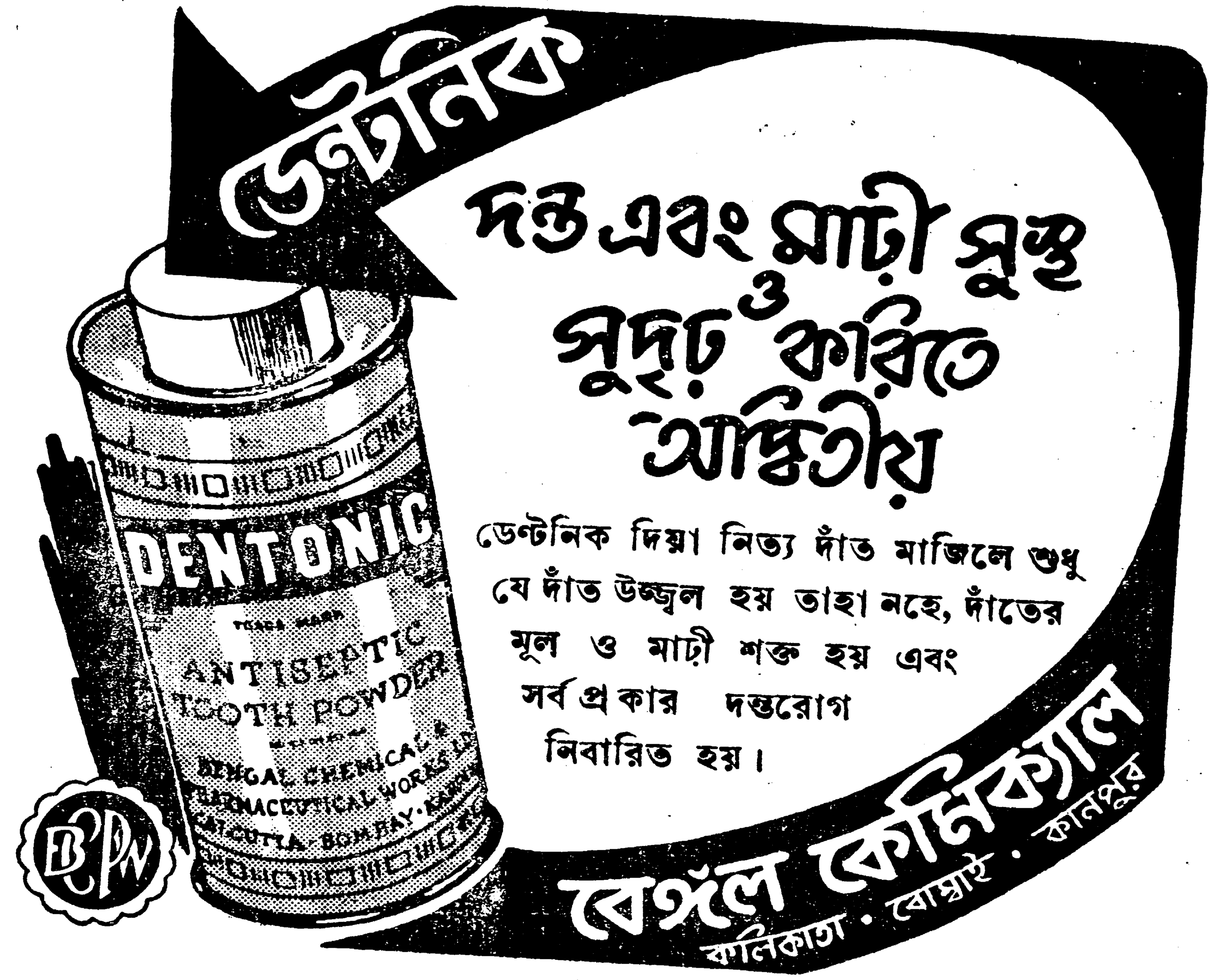

লেখা চাই

অভিনব, সচিত্র কিশোর-মাসিক; বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ; বার্ষিক সডাক ২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১।০, নমুনা ৵০. যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়; ভি, পি, হয় না। তিনটি রচনা-প্রতিযোগিতায় মোট আঠারটি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে; পুরস্কার-প্রাপ্ত ১৮টি "লেখা"ই ৺শারদীয়া সংখ্যায় ছাপা হইবে; অন্ততঃ ষাণ্মাসিক 'গ্রাহক' না হইলে রচনা গ্রাহ্য হইবে না। ক-বিভাগে, বিষয় "স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কবিতা", আয়তন "লেখা চাই"এর এক পৃষ্ঠা, প্রতিযোগীর বয়স ১৮ বছরের কম। খ-বিভাগে, বিষয় "দেশ"-প্রেমিকের আত্ম-বিসর্জ্জন-সম্পর্কীয় ছোট গল্প", তিন পৃষ্ঠা, বয়স ১৮এর নীচে। গ-বিভাগে, বিষয় "শ্রীঅরবিন্দের সাধনা"-শীর্ষক প্রবন্ধ, ২ হইতে ৪ পৃষ্ঠা, বয়সের কোন গণ্ডী নাই। "টাকা" ও "লেখা" পৌঁছিবার শেষ তারিখ আগামী ১৪ই ভাদ্র। ঠিকানা:—শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, বি-টি, সম্পাদক "লেখা চাই", লেখা চাই কার্য্যালয়, পোঃ দেবালয়, জিলা ২৪ পরগণা।

ছোটদের গ্রন্থাগারে রাখবার মত বই

শ্রীঅমলেন্দু সেনের
রায় পাহাড়ীর নিশাচর ৸০
অনুসন্ধানী ১।০
দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্স্ ।৶০
(কুপারের বিখ্যাত উপন্যাস)

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
দি অলিভার টুইষ্ট ।৶০
(ডিকেন্সের অমর উপন্যাস)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ১৲
(বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের গল্প)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
ধূমকেতু ৸০
(বিজ্ঞানের ভিত্তিতে রহস্য-উপন্যাস)

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
রহস্যময় ডিটেকটিভ উপন্যাস
পদ্মরাগ ১।০
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ১।০
মজাদার হাসির গল্প
চায়ের ধোঁয়া ৸০
এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ১৲
(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর সহযোগে)

একখানি দরকারী বই

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

ঘরে বসে সাবান, কালি, দাঁতের মাজন এবং আরও হরেক রকম রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার সহজ প্রণালী।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ—দাম ১।০

রামধনু কার্য্যালয়,
১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ।০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১।০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি এ

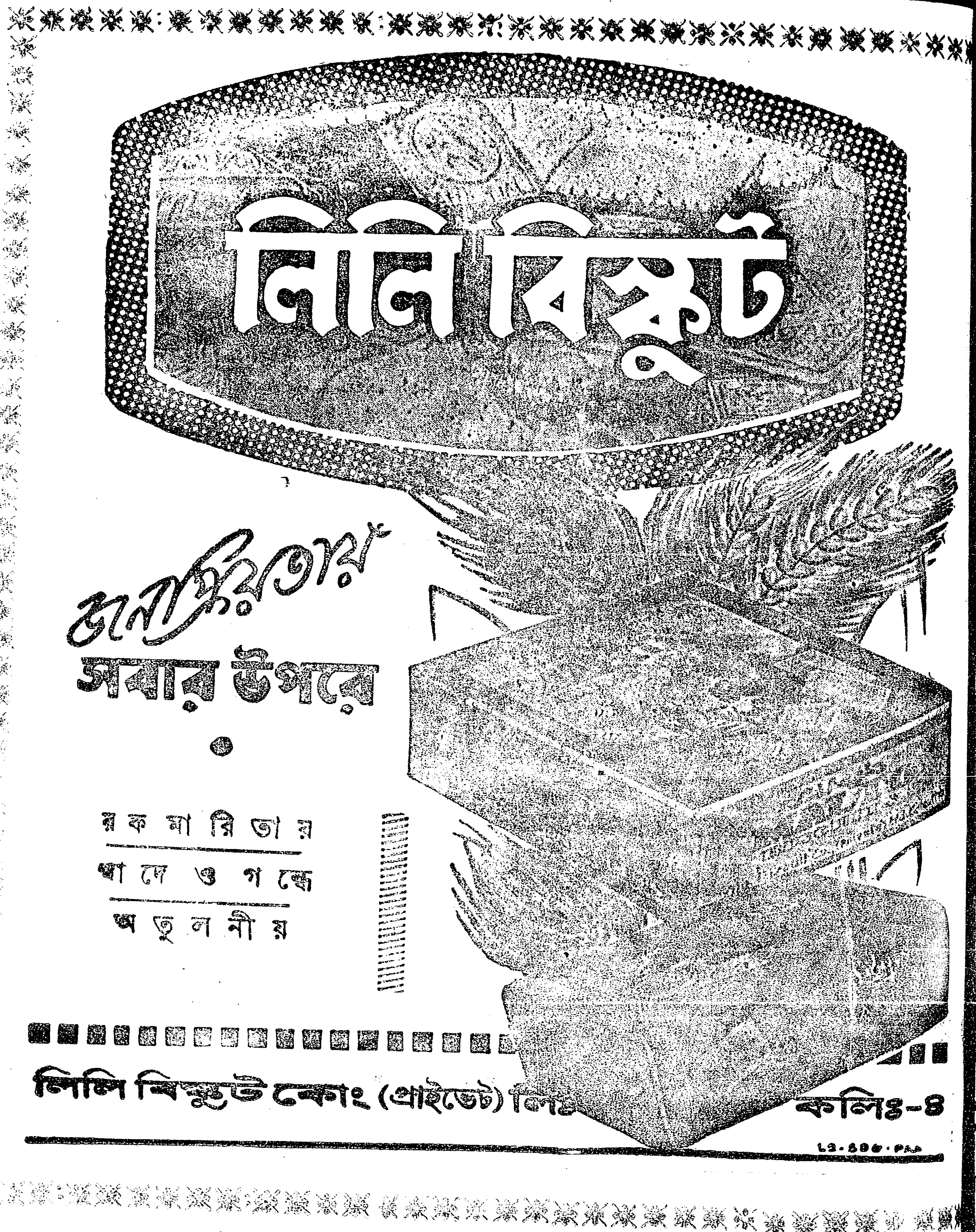

রামধনু

৩০শ বর্ষ
ধুন—১৩৬৪
১ শকাব্দ

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

বার্ষিক ৪ টাকা
ষান্মাসিক টা. ২'২৫
প্রতি সংখ্যা ৩৭ন.প.

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন–৩৫–২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

৵২॥০, ৵৫, ।১৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

ছোটদের ভাল ভাল বই ঃঃ নামকরা বই

নলীগোপাল চক্রবর্ত্তীর—

কাঠ ও কাঠের কাজ	১॥০
বাঁশ, বেত, পাতা ও সোলার কাজ	১৲
তন্তুশিল্পের কাজ	১৲

আলোক চক্রবর্ত্তীর—

মনসামংগল	১৲
চৈতন্যমংগল	১৲
কুমারসম্ভব	১৲

শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তীর—

রঘুবংশ	১৲
রাণী রাসমণি	১৲
জাগ্রত মেদিনী	১৲

ছোটদের অভিনব মাসিক পত্রিকা

চয়নিকা

১৮ বছরে পড়ল : বাষিক মূল্য মাত্র ৩৲

যে-কোন মাসে টাকা পাঠালেও বৈশাখ থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক হতে হয়। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা মাত্র ।০ আনা। অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গ ও সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত।

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

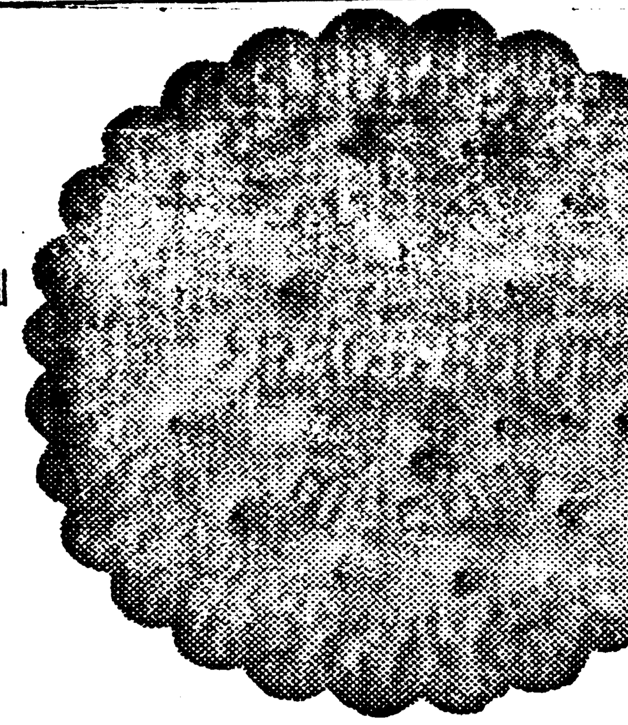

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুনে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

আনন্দে এবং নির্বিঘ্নে
ব্যবহার করুন
ইণ্ডিয়া সাইকেল

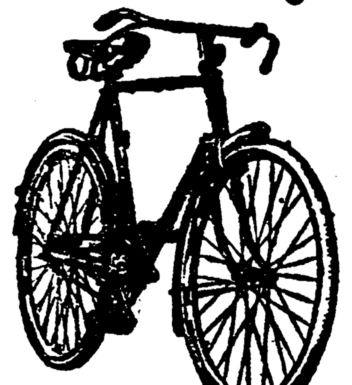

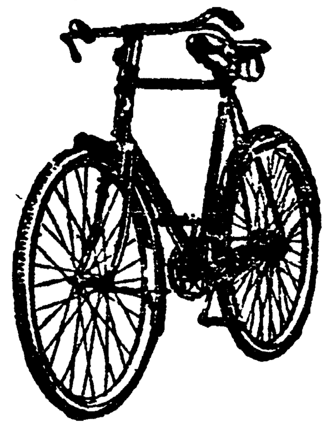

সুপার ডি-লুক্স
সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে নিখুঁত ভাবে প্রস্তুত

রোডস্টার
সর্বকর্মোপযোগী ও সর্বজন প্রশংসিত আদর্শ সাইকেল

ইণ্ডিয়া সাইকেল ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং লিঃ কলিকাতা-১

Kirti ADVERTISING AGENCY
REPRESENTATIVE OF
FAMOUS NEWS PAPERS & MAGAZINES
72, HINDUSTHAN PARK, CALCUTTA-29

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়

লক্ষ্মী ঘি

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্বত্র
সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন-২২-৭২৪৩

শরতের ভরা নদী

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৬৪ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পূজার পদ্ম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আকাশ সুনীল, স্বচ্ছ সলিল,
শরৎ এলো সদ্য,—
শঙ্খ, চক্র, গদার চেয়ে
শ্রেষ্ঠ যে ওই পদ্ম।
সকল ফুলের সেরা ও ফুল,
রূপে এবং গন্ধে অতুল,
কালিদাসের শ্লোকের মত—
স্নিগ্ধ অনবদ্য।

অপর আসন কি আর দেব
অমন আসন থাকৃতে ?
দশভূজা ভালবাসেন
এতেই চরণ রাখতে।
তাঁকে ও ফুল দিয়েই পুজি,
তাই পারিজাত দেখে বুঝি
অভিমানে ম্লান হয়ে—যায়
'বিজয়া'কে ডাকৃতে।

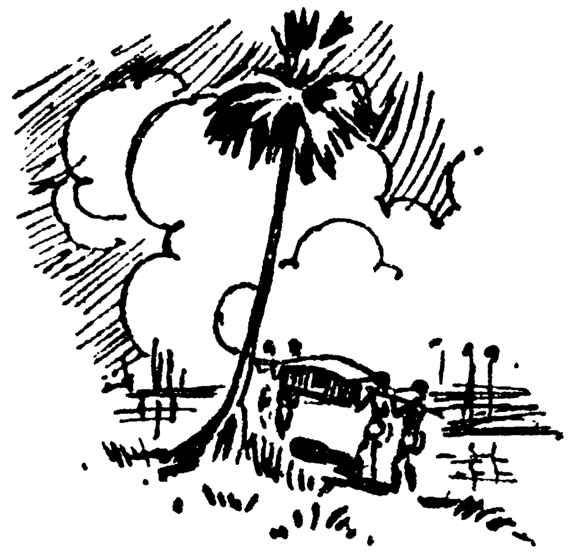

পারিজাত হায় স্বর্গে থাকুক—
গর্ব্বে রহুক অন্ধ,
করেন 'কমল-কামিনী' মা
পঙ্কজই পছন্দ।
পদ্ম তাঁহার সংসারেতে
আছে সোহাগ আদর পেতে,
তাঁরে করে আনন্দিত
তাহার মকরন্দ।

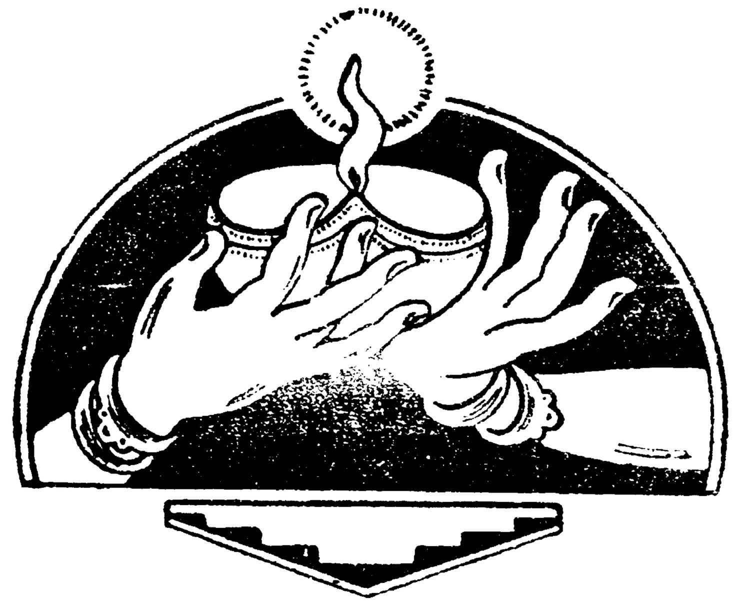

ঝন্ ঝন্ ঝন্

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঝন্ ঝন্ ঝন্।

রাত দুপুর। চারিদিক্ নীরব। শুইয়া আছি ঘরে। ঝন্ ঝন্ ঝন্—এই শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল ঘুম।

দিদিমা! ও দিদিমা! এ শব্দ কিসের?

দিদিমা সারাদিন খাটেন, রাত্রিতে শুইলেই তাঁর ঘুম আসে।

আবার ঝন্ ঝন্, ফোঁস্ ফোঁস্!

আমরা ভয়ে জড়সড়।

দিদিমা, ও দিদিমা— !

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে দিদিমা উত্তর দিলেন—'সেই যে পুকুর-পাড়ের যক্ষটা সে তার টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।' সন্ধ্যাবেলা বুড়ী যে গল্প বলিয়াছিল তারই জের টানিয়া যাইতেছিল ঘুমের ঘোরে। বিরক্ত হইলাম—'কি যে বলো! ওঠ, আলো জ্বাল। কি হয়েছে দেখ। এমন ত' কোনদিন হয় নি!'

সেকালে পাটের শলার আগায় গন্ধক লাগাইয়া হইত দেশলাই তৈরী। শোবার কাছে থাকিত তুষের আগুন দেওয়া আগুনের হাঁড়ি বা পাতিল।

দিদিমা আলো ধরাইলেন। কোরোসিনের কুপি ধরাইবা মাত্র দেখিলাম ভীষণ দৃশ্য।

দিদিমাও আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'এঁ্যা! এ ত' পুকুর-পাড়ে যক্ষের টাকা গণা নয়!'

আমরা সচকিতে মশারির ভিতর হইতে চাহিয়া দেখিলাম—ওরে বাবা!! একটা গোখরো সাপের সঙ্গে একটা সজারুর লড়াই চলিতেছে! আমরা সহজ কথায় বলিতাম 'সেজা',—ভাল কথায় 'সজারু'। তোমরা, সহরের ছেলেরা, কয় জনে সজারু দেখিয়াছ জানি না। জীব-জন্তুদের বইতে এই প্রাণীটির কথা লিখিতে অনেকেই ভুল করেন।

আমরা ছেলেবেলা ওদের গতিবিধি দেখিয়াছি। আমাদের বাড়ীর উত্তর দিকে একটা মস্ত বড় দীঘি ছিল। দীঘির তিন পাড়েই ছিল বনজঙ্গল। বেতের ঘন বন—বাঁশঝাড়, নানা ধরণের কাঁটাগাছ ও বড় বড় গাছ। সে বনের মধ্যে নানা রকমের ফলের গাছও ছিল—যেমন কালোজাম, গোলাপজাম, গাব, লটকা, কাউ ফল, ডুমুর, আম, কাঁঠাল প্রভৃতির গাছ। সে সময়ে আমরা যথেচ্ছ সেখান হইতে ফল সংগ্রহ করিয়া

আনিতাম, খাইতাম, কেউ কোন কথা বলিতেন না। বাগানের মালিক আমরা যেমন ছিলাম, দু'-একজন সরিকও তেমনি ছিল। অভিভাবকদের কাছে নালিশ করিলে তাঁহারা উত্তর দিতেন, 'বানরে খেলেও খাবে—ছেলেরা খেলেও খাবে।' আমাদের যে কর্ত্তারা বানরের পর্য্যায়ে ফেলিতেন সে জন্য খুব দুঃখ হইত। আমরা কিনা বানরের দলে! ছিঃ, এ কি কম অপমান? বল ত'!

সজারু কি দেখিয়াছ কোন দিন? চিড়িয়াখানায় আমি কিন্তু দেখি নাই। তবে আজকাল নাকি আসিয়াছে। আমরা ছেলেবেলা সজারু অনেক দেখিয়াছি, তাহাদের বাচ্চাদের ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি। সজারুরা বনের ভিতর গর্ত্ত করিয়া, একেবারে সুড়ঙ্গের মত সে গর্ত্ত,—তাহাতে বাস করে। সংস্কৃতে এ প্রাণীর নাম শল্লকী। গায়ে কাঁটা, ইংরাজী নাম—পরকুপাইন (Porcupine)। সজারুর গায়ে লোমের পরিবর্ত্তে হয় কাঁটা। কাঁটার আগাটা সূক্ষ্ম ছুঁচের মত। সেকালে মেয়েরা সযত্নে সজারুর কাঁটা রাখিতেন এবং সিঁদুরের টিপ পরিতেন কপালে সজারুর ছুঁচালো আগা দিয়া।

সজারুদের দিনে বড় একটা দেখা যাইত না। রাত্রিবেলা গৃহস্থের বাড়ীর মাটির ভিটিতে গর্ত্ত করিয়া প্রবেশ করিয়া যা কিছু খাবার পাইত তাহাই খাইত। তাদের চলার সময় কাঁটাগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া হইত ঝন্ ঝন শব্দ। ছোট ছোট পোকা-মাকড়, পিঁপড়া যেমন খাইত, তেমনি ফল ফলারি, চাউল, ডাল, ভাত, তরকারি খাইতেও এদের কসুর ছিল না। এক কথায় সজারুরা রাত্রিচর প্রাণী। ইহারা কাঁটার সাহায্যেই কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে।

যখন শীতের সময় নোয়াখালি বা পশ্চিমাঞ্চল হইতে মেঠেলরা দীঘি, পুকুর কাটিতে আসিত তখন তারা সজারুর সুড়ঙ্গ ভাঙ্গিয়া সজারু মারিয়া মাংস খাইত। দলে দলে হল্লা করিয়া মাটি কাটার লোকেরা অতি নির্দ্দয়ভাবে এদের বধ করিত। আমরা সেই সুযোগে সজারুর গায়ের সেই সুন্দর লম্বা লম্বা কাঁটা সংগ্রহ করিতাম, নিব লাগাইয়া পেন্-হোল্ডার করিতাম। দু'-চারিটি ও-রকম কলম হয়ত এখনো খুঁজিয়া পাইব।

এইবার শোন আমার কথা।

দিদিমা বিছানায় জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিলেন। মুখে কথা নাই। দিদিমা ঘরে সাপ পুষিতেন। সাপ কি কেউ পোষে? তবু পোষা বৈকি! কয়েকটি সাপ আমাদের ঘরে গর্ত্ত করিয়া পরম আনন্দে বাস করিত। আমরা ছুটিছাঁটায় বাড়ী আসিতাম, কাজেই দিদিমা থাকিতেন একা ঘরে। পাহারা ছিল তাঁর সাপেরা! আমরা কয়েকবার পাড়ার মুসলমানদের, বেদেদের - যারা সাপ ধরে, ঝাঁপি কাঁধে করিয়া বাঁশী বাজাইয়া সাপের খেলা দেখায়,—তাদের ডাকিয়া আনিয়াছি, সাপ ধরিবার বা

মারিবার ব্যবস্থা করার জন্য। দিদিমা এমন চীৎকার করিয়া বাধা দিতেন যে—তাহারা বলিত, 'দেখবেন কর্ত্তা, এই বুড়ি মা একদিন সাপের ছোবলেই প্রাণ হারাইবো!' তা কিন্তু হয় নাই। দিদিমার মৃত্যু হইয়াছিল আশীর পারে, বেশ শান্তিতেই।

সজারুকে আক্রমণ করিয়াছে একটা গোখরো সাপ। কি কালো, কি লম্বা! ফোঁস ফোঁস করিয়া ফণা তুলিয়া ছোবল মারিতেছে। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করিতে পারিতেছে না। সাপটা লেজ দিয়া সজারুকে জড়াইয়া কাবু করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সজারুর কাঁটাগুলি তার গায়ে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে এবং সাপকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। দিদিমার মুখে কথা নাই। আমাদের অবস্থাটা ভাবিবার মত বটে! নিশ্চল নিথর হইয়া বসিয়া আছি। সজারুটা কুমারের চাকার মত ঘুরিতেছে সাপের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য। পারিতেছে না। শেষটায় সাপের ফণার মধ্যে তার কাঁটা কতকগুলি ঢুকিয়া গেল। সাপ হতবল হইয়া লুটাইয়া পড়িল। এদিকে সজারুরও অর্দ্ধমৃত অবস্থা। সাপ কোন রকমেই সজারুর কাঁটাবিহীন স্থানে দংশন করিবার সুযোগ পায় নাই। তবু তার শেষ ছোবল পড়িয়াছিল গলার দিকে—নরম যায়গায়। সাপের দফা শেষ হইয়াছে। সজারুর কাঁটা তার গলায় ও গায়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হইয়া বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে একটা অদ্ভুত রকমের গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে সজারু কাঁপিতে কাঁপিতে মরিয়া গেল। সাপও শেষ সজারুও শেষ।

পরদিন সকালবেলা গ্রামের সকলে এ সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিল এই অদ্ভুত দৃশ্য। দুইটি প্রাণী যেন আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে।

জীবনে এমন ভয়াবহ দৃশ্য আর চোখে পড়ে নাই! গ্রামের ছেলের দল এ দুটিকে শক্ত করিয়া বাঁশের আগায় বাঁধিয়া বাড়ী বাড়ী দেখাইয়া আনিয়া নদীর তীরে পোড়াইয়া ফেলিল—মহা আনন্দে।

হ্যাঁ, দিদিমার মৃত্যুর পরে আমরা নাগযজ্ঞ করিয়াছিলাম। ঘরের মেজে খুঁড়িয়া আমাদের গ্রামের ওঝা নজর আলি, জনাব আলি আর দুইজন বেদে বাহির করিয়া ফেলিল পাঁচ-ছয়টা বিরাটাকার গোখরো সাপ আর একরাশ বাচ্চা। কি বীভৎস দৃশ্য! অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলাম দুই ভাইয়ের ও বেদেদের! সাপগুলির মাথা শক্ত করিয়া টিপিয়া ধরিয়া—ঝাঁপিতে পূরিল, আর বাচ্চাগুলিকে লাঠি দিয়া মারিয়া সবংশে নাশ করিল। দুই-একটি ডিম ভাঙ্গিতে বাহির হইল ছোট ছোট কালনাগিনীর বাচ্চা। সেও এক বীভৎস দৃশ্য। গা শির্ শির্ করিয়া উঠিল। তারপর উৎসুক জনতা ও বালক-কিশোরের দল নাগশিশুদের চপল ক্রীড়াকৌতুক দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়া করিল নাগযজ্ঞ।

এই সজারু-সর্পের মহাযুদ্ধের কাহিনী বলিলাম। এরূপ বিস্ময়কর ঘটনা আরো আমার চোখে পড়িয়াছে। তোমাদের শোনাইব একে একে।

হ্যাঁ, আমরা ছেলেবেলা দেখিয়াছি, অনেক সময় কলাগাছ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, সজারু দেখিলে শিকারীরা তাদের লক্ষ্য করিয়া মারিয়াছে। কলার গাছের গায়ে তাহাদের কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার ফলে তারা আটকা পড়িত, আর শিকারীরা তখন তাহাদের ধরিয়া প্রাণনাশ করিত।

তোমরা যদি কখনো সজারুর দেহ পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাও, তবে তাহাদের দাঁতে দেখিবে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। উহাদের শ্ব-দন্ত বলিয়া কোন ভিন্ন রকমের দন্ত নাই।

বাংলা দেশের জীবজন্তুর সম্বন্ধে তোমরা খোঁজ-খবর নিতে ভুলিও না

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি. দিদিমাকে আমরা যখন বলিতাম—'ওঃ দিদিমা, ঝন্ ঝন্ ঝন্।' দিদিমা ক্ষেপিয়া আমাদের লাঠি নিয়া তাড়া করিতে আসিতেন।

শরৎ এলো

শ্রীপূর্ণেন্দু মল্লিক

চুপ্‌টি ক'রে ব'সে ছিলাম একলা ঘরের মাঝে—
এমন সময় নীল আকাশে ছুটির বাঁশী বাজে।
ছোট্ট আমার ভাঙা ঘরে ছোট্ট আমার ভাই,
তার জন্যে একটা শুধু সস্তা জামা চাই।
কোথায় পাবো, কোথায় যাবো—ভেবেই দিশেহারা—
এমন সময় শরৎ এলো—চোখে জলের ধারা!

হাজার জনার মাঝখানেতে ছিলাম নানান্ কাজে
এমন সময় সবুজ মাঠে ছুটির বাঁশী বাজে।
ভাঙা ঘরে কাঁপছে জ্বরে ছোট্ট আমার বোন,
তার জন্যেই ভেবে আমার পাগল হ'লো মন।
ওষুধ কোথা পাবো— আমার প্রাণ যে কেমন করে —
এমন সময় শরৎ এলো—শিউলি কুঁড়ি ঝরে।

রায় বরুয়ার শিকার কাহিনী

২

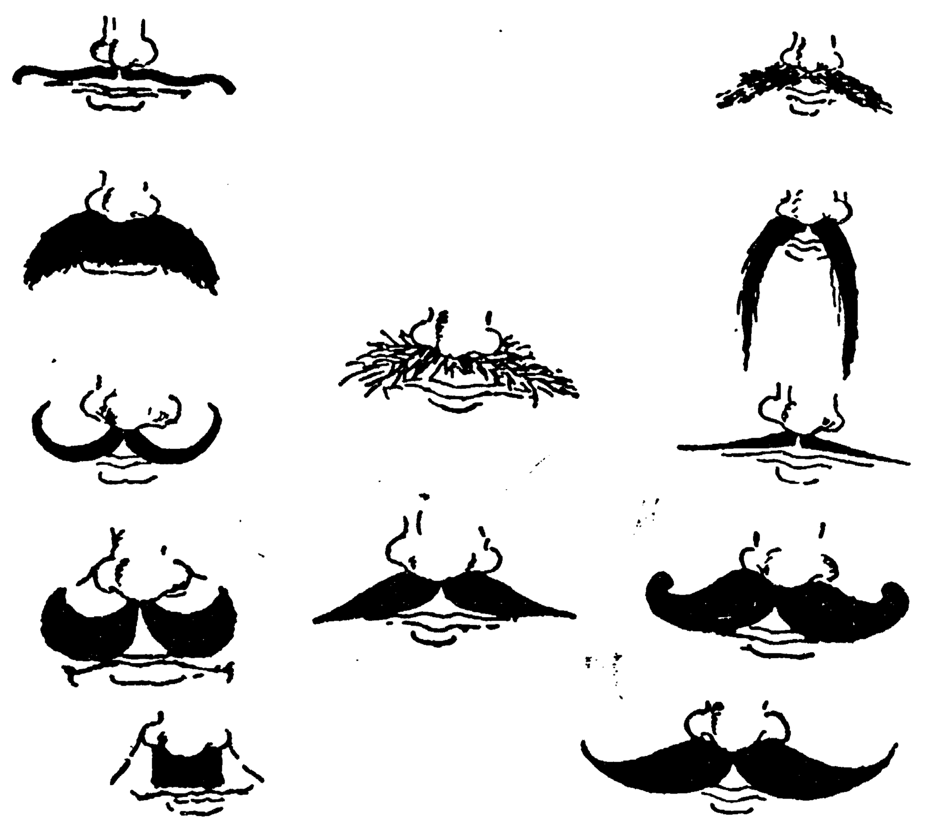

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

সেতুবন্ধ দিয়ে কখনো কখনো মানুষ যাওয়া-আসা করে বটে কিন্তু কদাচিৎ। খুব প্রয়োজন হলে মেয়েরা দল বেঁধে জঙ্গলে যায় কাঠ আনতে। তাংকিকে জিজ্ঞেস করে রায় বরুয়া জানতে পারলেন, শেষ দল গিয়েছিলো মাস তিনেক আগে। একটা পাথরের ওপর উঠে তিনি টর্চ্ জেলে পরীক্ষা করতে লাগলেন তার ওপর কোনো পায়ের চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা। চকচকে মসৃণ পাথর। তার ওপর কোনো চিহ্নই পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু সবগুলোই কি ঐ রকম মসৃণ?

রায় বরুয়া একটার পর একটা পরীক্ষা করে চললেন। নদীর মাঝামাঝি এসে দু'-তিনটে পাথরের ওপর এব্ড়ো-খেব্ড়ো কয়েকটা খাঁজ চোখে পড়লো। বর্ষার ঘোলা জলের সঙ্গে মাটি এসে খাঁজে খাঁজে খুব পাৎলা পলি পড়েছে। এইবার গভীর মনোযোগ দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতে হবে। সাধারণ পলির ওপর যেমন স্রোতের আঁকাবাঁকা দাগ থাকে, বেশীর ভাগই তাই। শুধু কয়েক জায়গায় কে যেন একটা কঞ্চী ঠুকতে ঠুকতে চলে গেছে। খুব ছোট ছোট গর্ত। কিন্তু তাদের মধ্যে দূরত্ব এত বেশী যে সাধারণ ভাবে চললে যে ভাবে দাগ পড়ে সেগুলো সে ধরণের নয়। কে যেন একটা কঞ্চী কিংবা লোহার নাল-বসানো লাঠিতে ভর করে বেশ খানিকটা দূর দূর লাফ দিয়েছে।

কোনো মেয়ের পক্ষেই ওধরণের লাফ দেওয়া সম্ভব নয়। ছেলে-ছোকরারা পারে। কিন্তু কাঠ আনতে ছেলেরা সাধারণতঃ যায় না। অবশ্য কোনো ছোকরা যে মেয়েদের সঙ্গে যায় নি তা বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে একটা ছেলে জুটে গিয়েছিলো। এবং, মেয়েদের কাছে বাহাদুরী দেখাবার জন্যে, সে হয়তো বার কতক লাফ দিয়েছিলো। কিন্তু এখানে রায় বরুয়ার মনে খটকা লাগলো। দাগগুলো বেশী দিনের নয়। টর্চের আলো ফেলে খুঁজে খুঁজে তিনি এ ধরণের অনেকগুলো দাগ আবিষ্কার করলেন।

ওগুলো কিসের দাগ? রায় বরুয়া তাঁর সজারু-কাঁটার মত গোঁফের প্রত্যেকটি কেশ গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত টেনে টেনে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর নিজের মনে বললেন, "নাঃ,

ও ছাড়া আর কেউ নয়। এ কালা শয়তান!" চিতা বেড়ালের জাত। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে জলে নামবে না। ঐ সেতুবন্ধই কালো চিতার যাতায়াতের পথ। নখ গুটিয়ে সে লাফ দেয়, তাই সমস্ত থাবাটার দাগ পড়ে না। একটা নখ হয়তো কখনো কোনো রকমে জখম হয়েছিলো, সেটাকে গোটানো যায় না। ঐ সরু সরু গর্তগুলো ঐ একটা নখেরই দাগ।

রায় বরুয়া স্থির করলেন ঐ পাথরের সেতুবন্ধের কাছেই কোনোখানে অপেক্ষা করা। কিন্তু কোথায়? ধারে-কাছে দু'-একটা বড় বড় গাছ আছে বটে কিন্তু গাছে ওঠা রায় বরুয়ার ধাতস্থ নয়, এবং কখনো অভ্যাসও করেন নি। কিছুক্ষণ অন্বেষণ করার পর প্রায় বিশ গজ দূরে তাঁর চোখে পড়লো বেশ বড় গোছের একটা পাথরের চাঁই। সুদূর আদিম যুগে হয়তো এক বিরাট ভূমিকম্পের ঝাঁকানি খেয়ে নদীর ওপর এসে পড়েছিলো, হাজার হাজার বছরের জলের সংঘাতে তার মাঝখানটায় ক্রমে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একটা গুহার আকার ধারণ করেছে। নদীর শুক্‌নো বালুচরের ওপর এ ধরণের গুহা খুঁজে পাওয়া পরম সৌভাগ্য। তার ভেতরে দু'জনে কোনো রকমে পাশাপাশি বসতে পারে এবং সামনের ফাঁক দিয়ে কালা শয়তানের যাতায়াতের পুলের প্রায় সবটাই চোখে পড়ে।

সে রাত্রে বেশ শীত পড়েছে। তার ওপর হাড়-জমানো কন্‌কনে হাওয়া। রায় বরুয়ার পরনে মোটা ওভার-কোট থাকা সত্বেও তাঁর কাঁপুনী ধরেছে। বাইরে বেশ একটা বড় গোছের আগুন জ্বালাতে পারলে দিব্যি আরামে রাত কাটানো যেতো। তাংকি দু'-একবার কথাটা পেড়েও ছিলো। বলা বাহুল্য আগুন জ্বাললে কালা শয়তানের ওদিকে যাবার কোনই সম্ভাবনা থাকবে না। শীত নিবারণের নানা উপায় চিন্তা করে অবশেষে রায় বরুয়া সঙ্গে-আনা মোটা কম্বলটা গুহার মুখে পর্দার মত করে টাঙিয়ে তার ওপরে গোটাকয়েক পাথর চাপিয়ে কোনো রকমে ঝুলিয়ে রাখলেন। তাতে ঠাণ্ডা হাওয়া অনেক পরিমাণে আটকানো গেলো। তারপর ধরালেন তাঁর মোটা চুরুট। তাংকি ধরালো তার রূপো আর তামার তৈরী কারুকার্য করা পাইপ। ক্রমে গুহার ভেতরটায় বেশ একটি ঘরোয়া আবহ গড়ে উঠলো।

অপরূপ চাঁদের আলো সে রাত্রে। হাওয়ায় কুয়াসা নেই। জ্যোৎস্না ম্লান ব'লে তা চারিপাশের গাছপালা, বন আর দূরে দূরে পাহাড়গুলোকে দিনের আলোর মত নির্লজ্জ উদ্ভাসে ব্যক্ত করে দেয় নি। দিগ্‌দিগন্ত আবছা মায়ায় আচ্ছন্ন। জেগে-দেখা স্বপ্নের মত। তাংকি দিগারু ভাষায় গুন্‌ গুন্‌ করে গান গাইতে লাগলো। সভ্য মানুষ প্রকৃতিকে আপন দাসী-বাঁদী ভাবে নিযুক্ত করে, তার রূপে আর মোহিত হয় না। প্রকৃতির শোভা উপজাতির মনকে গভীর ভাবে অধিকার করে। জীবনের সকল শোককে ভুলিয়ে দিয়ে আনে এক নিবিড় কবিতার আকুতি, হর্ষ ও বিষাদে মেশানো পরম আনন্দ। তাংকির গানের অর্থ বোঝা না গেলেও তা রায় বরুয়ার দর্শনশাস্ত্র-অধ্যয়নে মোহমুক্ত মনকে দ্রবীভূত করলো। রায় বরুয়া শুনতে লাগলেন দিগারু ভাষার অদ্ভুত উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বরের ওঠা-নামা আর মাঝে মাঝে সুরের মূর্চ্ছনা। সুরের মীড়ের সঙ্গে শব্দের মীড়, সে এক অপূর্ব সঙ্গত। তাংকি তার অবোধ্য ভাষায় গাইতে লাগলো :

"ম্বা বিআন শ্যিপা তারংসে পিমিন্দী
ম্বা পং প্রুমাহ তান্‌ য়ে মিং"... ..

রায় বরুয়া সহসা তার গা টিপে ইসারায় চুপ করতে বললেন। কম্বলের ফাঁক দিয়ে দেখা গেলো নদীর ওপারে ছায়ার মত কী একটা নিশ্চল ভাবে লেগে আছে ঢালুর ওপর। সেখানে গাছ নেই, পাথর নেই, অথচ ছায়া। তাংকির দৃষ্টি ও অনুভবশক্তি প্রখর। সে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, "হ্যাঁ।" কালা শয়তান নদী পার হতে যাচ্ছিল, এময় সময়ে মানুষের আওয়াজ শুনেছে। তাই পাড়ের ওপর শুয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করছে।

সাধারণ নরখাদক বাঘ হলে হয় বেপরোয়া নদী পার হয়ে গ্রামে ঢুকতো, না হয় সটান এদিকে ঝাঁপ দিয়ে আক্রমণ করতো। চিতার হিংস্রতায় অতি সূক্ষ্ম ধূর্ততা। এক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে বুঝতে পারে বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা। না থাকলে সে যেমন বেপরোয়া, তেমনি দুর্দ্ধর্ষ আর নিষ্ঠুর। বিপদের খবর তার কাছে পোঁছয় হাওয়ায় ভর করে। কালো চিতার অনুভবশক্তি আরো তীক্ষ্ণ। তাই কালো শয়তান তার দৈনন্দিন অভিযানে বিরত হয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

বহুক্ষণ ধরে চললো সে চিন্তা। পাড়ের গায়ে লেগে-থাকা নিশ্চল কালো ছায়ার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই। রায় বরুয়া 465-এ টোটা ভরে তৈরী রইলেন। তাংকিও তার দোনলা 12 বোর নিয়ে প্রস্তুত। দু'জনেই নিস্তব্ধ। তাঁরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছেন সেখান থেকে গুলী করা চলে না যে তা নয়, তবে ঠিক লক্ষ্য স্থির করা কঠিন। সুতরাং ইসারায় ওঁরা স্থির করলেন, কালা শয়তান উঠে আর একটু এগিয়ে এলেই দু'জনে একসঙ্গে গুলী করবেন।

কালা শয়তান আগের মতই নিশ্চল। তার ঐ শয়তানী মগজে কী মৎলব জন্মলাভ করছে কিছু বোঝবার উপায় নেই। তার এত দূর আত্মসংযম যে রায় বরুয়ার এক একবার সন্দেহ হতে লাগলো ছায়াটা হয়তো একটা মরীচিকা। দু'-একবার ভাবলেন উঠে গিয়ে পরীক্ষা করে সন্দেহ ভঞ্জন করে আসবেন। ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করার পর ছায়া আপন সত্বা আপনি প্রকাশ করলো। মাথা তুলে তাকালো একবার ওঁদের দিকে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোর প্রতিফলনে ভয়ঙ্কর দুটো সবুজের আমেজ-লাগা ফিকে হলদে চোখ! তাংকি গুলী করতে যাচ্ছিলো, রায় বরুয়া ইসারায় নিরস্ত করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এতক্ষণে কালা শয়তানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। এইবার হয় সে বনে ফিরে যাবে, না হয় সেতুবন্ধ দিয়ে যাবে গ্রামের দিকে. আর না হয় আক্রমণ করতে আসবে এদিকে। শেষোক্ত সম্ভাবনা কম বলেই তাঁর মনে হলো, যদিও তিনি প্রস্তুত হয়ে রইলেন। বনে ফিরে না যেতেও পারে। দিনের পর দিন সংহার করে তার হত্যাবৃত্তি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একবার বদ্‌-অভ্যাসের বশবর্তী হলে তা ত্যাগ করা সহজ নয়।

ছায়া উঠে দাঁড়িয়ে একবার বেরালের মত সটান হয়ে আড়ামোড়া ভেঙ্গে নিলো। তারপর স্বচ্ছন্দগতিতে দু'-এক পা চলে সেতুবন্ধের প্রথম পাথরটার ওপর লাফ দিয়ে উঠলো। এইবার কালা শয়তানকে পরিষ্কার ভাবে বন্দুকের লক্ষ্যে পাওয়া গেলো। রায় বরুয়া ও তাংকি উভয়েই একসঙ্গে গুলী ছুড়লেন। বেরাল ও বাঘের শব্দের মাঝামাঝি বিকট আওয়াজ করে কালা শয়তান পাথরগুলোর ওপর লাফাতে লাফাতে উধাও হলো গ্রামের দিকে।

তাংকি ছুটে গিয়ে পরীক্ষা করতে যাচ্ছিলো, পাথরগুলোর ওপরে বা কাছে রক্তের দাগ

আছে কিনা। রায় বরুয়া তাকে প্রায় জোর করে ধরে রাখলেন। চিতা, বিশেষতঃ কালো চিতার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি ভয়ঙ্কর। রায় বরুয়া স্থির করলেন, ঐ গুহাতেই রাত কাটানো ছাড়া উপায় নেই। কালা শয়তান যদি না মরে থাকে তো সে কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে ঠিক নেই। তা ছাড়া যদি একেবারে পঙ্গু না হয়ে গিয়ে থাকে তো বনে ফিরবে ঐ পথ দিয়েই। সক্ষত শরীরে সাঁতার দিয়ে নদী পার হবে না।

তাংকি তার সমস্ত শোক ভুলে গেছে। তার বদ্ধমূল ধারণা কালা শয়তান হয় মরেছে, না হয় গুরুতররূপে আহত হয়েছে। সে বারংবার রায় বরুয়াকে আলিঙ্গন করে কৃতজ্ঞতা জানালো। তারপর আবার গেয়ে চললো অবোধ্য দিগারু ভাষায় তার গান :

…"বিআন শ্যিপাওয়ে সিমিন্‌দী তারংসে সিমিন্‌দী
প.র্‌রম্ পা মাকং স মেহাম…"

চাঁদ হেলে পড়েছে চক্রবালের দিকে। শুকতারা জলজ্বল করছে নীলাভ পীত আকাশের বুকে। পেঁজা তুলোর মত মেঘের টুকরোগুলোয় ফ্লেমিঙ্গোর বুকের পালকের লালচে আভা। পূবদিকের আকাশে নানা রঙের চাঞ্চল্য। ভোর হয়ে এসেছে।

এইবার রায় বরুয়া গুহা থেকে বেরিয়ে পাথরগুলোকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তাংকি বন্দুকের ঘোড়া খাড়া রেখে সতর্ক রইলো, কারণ কালা শয়তানের অসাধ্য কিছুই নেই। হয়তো সে কাছেই কোথাও প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে ওৎ পেতে বসে আছে। রায় বরুয়া বহু অন্বেষণ করে মাত্র দু' জায়গায় রক্তের চিহ্ন পেলেন। কালা শয়তান জখম হয়েছে বটে তবে তার আঘাতের গুরুত্ব নিরুপণ করা সম্ভব হলো না। চোট খেয়েই সে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে লাফ দিয়েছে। শেষ পাথরের ওপর রক্ত পড়েছে বেশ অনেকটা। তার পর আর চিহ্ন নেই। নদীর ধারের ঝোপগুলোর ভেতর লাফিয়ে পড়েছিলো বলে মনে হয়। আগাছার জঙ্গলে রক্তের হদিস পাওয়া কঠিন। তবু ওঁরা দু'জনে সন্তর্পণে আগাছা সরিয়ে অনেক খুঁজলেন। কিন্তু কোনো চিহ্ন পাওয়া গেলো না।

গ্রামে ফিরে তাংকি দ্বারে দ্বারে করাঘাত করে সোল্লাসে সুসংবাদ ঘোষণা করলো। কালা শয়তান ঘায়েল হয়েছে। তার মৃতদেহ খুঁজে বের করতে হবে। পূর্বকালে যেমন গ্রামের শত্রুর মুণ্ড বাঁশের ডগায় রাখা হতো সেইভাবে রাখা হবে কালা শয়তানের মাথা। হবে ভোজ, গান, নাচ।

গ্রামবাসীরা আপন আপন দাও নিয়ে খুঁজতে বেরুলো কালা শয়তানের দেহ। গেলো দলে দলে, যদি আহত চিতা শেষ আক্রমণ করে! ধারে-কাছের বনজঙ্গল তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করলো। ধারালো দাওয়ের ঘায়ে আগাছা প্রায় সাফ করে ফেললো গাঁয়ের চারিপাশে। কালা শয়তানের তবু কোনো তল্লাস পাওয়া গেলো না। তখন সবাই অনুমান করলে সে নিশ্চয় অনেক দূরে চলে গেছে। হয়তো একদিন কোনো গভীর জঙ্গলে কোথাও পাওয়া যাবে তার কঙ্কাল।

কালা শয়তানকে আপাততঃ না পাওয়া গেলেও তাংকি কেবাং বা সভা আহ্বান করলে। সভাস্থ সবাই একমত হলো, কালা শয়তান নিহত হয়েছে। গত রাত্রে সে গ্রামে প্রবেশ করে নি, এবং বহু দূরে যেন মাঝে মাঝে গোঙারানির শব্দ পাওয়া গিয়েছিলো। সেই দিনই রাত্রে হবে বিজয়োৎসব।

রায় বরুয়ার পক্ষে কার্যবশতঃ উৎসবে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না বলে তাংকির বাড়ীতেই মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন হলো। বুদ্ধিমানের আশা এইবার সফল হলো। সে পরম উৎসাহে মনিবকে উপহারপ্রদত্ত একটি নিহত মৃগের প্রায় সবটাই ধান্সমদ প্রস্তুত করবার প্রকাণ্ড কড়াইয়ে তার নানা মন্ত্রগুপ্ত মসল্লা সংযোগে আগুনে চাপিয়ে দিলে। পাশেই পাথর সাজিয়ে আর একটা কাঠের চুলা তৈরী করে ভোজের প্রকাণ্ড হাঁড়িতে চাপালো পোলাও। তাংকির ক্ষেতের ঝুম্* পদ্ধতিতে বোনা মিহি ও সুগন্ধ ধানের চালের পোলাও। সারা সকাল প্রায় সারা গ্রামে বুদ্ধিমানের পাক-কাব্যের সৌরভ ভুর্‌ভুর্ করতে লাগলো।

রায় বরুয়া স্নান সেরে ভোজের প্রতীক্ষায় আম-জামের সময়োপযোগী একটি দীর্ঘ দিবানিদ্রা দিয়ে নিলেন। মধ্যাহ্নের ভোজে নিমন্ত্রিত তাংকির কয়েকজন নিকট-আত্মীয়। সবার সাক্ষাতে তাংকি রায় বরুয়ার প্রতি বারবার কৃতজ্ঞতা জানালো। তার পর গোছগাছ করে রায় বরুয়া সদিয়ায় ফেরবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

এ সব বিষয়ে বুদ্ধিমানের সব কাজ মুখস্থ, কোনোখানে কোনো ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। মনিবের সঙ্গে সে প্রচুর ভ্রমণ করেছে। রায় বরুয়াকে কখনো বলতে হয় নি সে অমুক জিনিষটি ফেলে এসেছে। বুদ্ধিমান্ সামগ্রীপত্র গাড়ীতে তুলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে গুণে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে তার রীতি অনুসারে মনিবের প্রবেশের সুবিধার জন্যে গাড়ীর সামনের দরজাটি খুলে রেখে পেছন দিকে মোট-ঘাটের মধ্যে ইঞ্চি কয়েক স্থান করে নিয়ে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

রায় বরুয়া সবার কাছে বিদায় নিয়ে খাঁজ-কাটা গুঁড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গাড়ীতে উঠতে যাবেন, এমন সময়ে তাংকির বাড়ীর খিলানের তলায় আগাছার জঙ্গলে এক অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা গেলো। যেন কী একটা জন্তু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। তাংকির শূকরের একটাও হতে পারে। রায় বরুয়ার অভিজ্ঞ শিকারীর সন্দিগ্ধ মনে কিন্তু তড়িৎগতিতে একটা অনুমানের বিদ্যুৎ ছুটে গেলো। কালা শয়তান নয় তো? তিনি ছুটে গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ করতে করতেই লাফ দিয়ে গাড়ীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো কালা শয়তান।

কাঁচ বলে কোনো পদার্থ সে আগে দেখে নি, তাই কাঁচের ব্যবধানের ওপর সে কতকটা হতবুদ্ধি হয়ে বারে বারে থাবা দিয়ে ঘা দিতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার সেই বেড়াল ও বাঘের শব্দের মাঝামাঝি বিকট আওয়াজ! আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই গাড়ীর মোটা কাঁচ সে ভেঙ্গে ফেলতে পারতো। বুদ্ধিমান্ বন্দুকে গুলী ভরে মনিবকে এগিয়ে দিলো। রায় বরুয়া কাঁচের ওপর দিক্‌টা একটু খুলে 465-এর নলটাকে বাইরে চালিয়ে দিলেন। এবং যেমন আশা করেছিলেন, আহত, রাগান্বিত কালা শয়তান নলটা কামড়ে ধরে তাকে তার তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি দিয়ে দোমড়াতে চেষ্টা করতে লাগলো।

রায় বরুয়া বন্দুকটা ঐ অবস্থায় আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে এমন জায়গায় আনলেন যাতে গুলী মূর্দ্ধা ভেদ করে ব্রহ্মতালু দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার পর টিপলেন ঘোড়া।

* ঝুম্—উত্তরপূর্বী পাহাড়ী অঞ্চলে উপজাতিরা জঙ্গল জ্বালিয়ে দিয়ে তার ছাইয়ে ধান বোনে। এর নাম ঝুম-কৃষি।

কালা শয়তান এবার গর্জন পর্যন্ত করলো না। নির্বোধের মত স্থিরদৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে সে ধীরে ধীরে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো। শিকারীর রীতি অনুসারে রায় বরুয়া তার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে আর একবার গুলী করলেন।

এর পর আর রায় বরুয়ার সেদিন সদিয়া ফেরা চললো না। মিশমীদের কেবাঙে স্থির হয়েছে ওঁকে সন্ধ্যার উৎসবে যোগ দিতেই হবে। কেবাঙের বিচার উল্লঙ্ঘন করা দেবতার অসাধ্য।

সারারাত চললো ভোজ, নাচ আর গান। রায় বরুয়া শুনলেন পুরুষরা গাইছে ঃ

…"তায়ুহাম্ য়ুয়ায়িম্ রৎসব্ মিং হমন্যু য়েক্ থকি
না য়ু থি সে জোউ ওয়ে দেপ্ তাংদী ·"

আর মেয়েরা গাইছে ঃ

"প্ র্মা হ্য বাপোং, প্ র্মা হ্য তাথম্
সিং থান্য়ে সঙেই ঙ্ দি রপ্ রম্ পঙি
মাতুংস কেহলং কেহা·· …"

দুর্বোধ্য ভাষার রক্ত-নাচানো তাল ও ঝঙ্কার নৃত্যের সঙ্গে পা মিলিয়েছে।

পাহাড়ী

শ্রীস্বকুমার দে সরকার

এই কালো কালো পাহাড়ী কেল্লায় আকাশ যেন দিক্-বিদিক্ হারিয়ে ফেলেছে। আলো নিয়ে পথ দেখাতে এসে চাঁদের ফালিটা আকাশে হিম হয়ে জমে গেছে। মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায় নি বটে, কিন্তু সে হাসি বড় ম্লান, করুণ হলুদ বরণ। কালো উষ্ণীষ তোলা ফার্ গাছগুলো নিঃশব্দ প্রহরীর মত নিথর। দীর্ঘ দেওদার গাছগুলোর মাথায় অনেক উঁচুতে যাযাবর বুনো হাঁসের দলের ডাক ভেসে এল—হঁক - হঁক, হঁক—হঁক। বাতাসে শীতের তুষার-নিঃশ্বাস।

রাত-শেষের আলো-আঁধারিতে এই পাহাড়ী বুনো বিলের শিরশিরে ঠাণ্ডা জলে ঘুম ভেঙ্গে উঠে কাদাখোঁচারা যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। এখনও কি ওঠে নি সেই

মহা হিমালয়ের আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ে ধাক্কা-খাওয়া উত্তুরে বাতাস? সেই হিমেল হাওয়া – যা টেনে নিয়ে যায় মনকে, কোথায় কতদূরে, ঘরছাড়া করে ভারতের সমতলের দিকে? পেছনে পড়ে থাকে তাক্‌লা মাকান, মানস সরোবর, নেলাং আর গুরিংলা গিরিপথ। কিন্তু সর্দ্দার এখনও হুকুম দেয় নি।

ঘুম ভেঙ্গে দলে দলে বিলের ওপর ভেসে আসতে আসতে ছোকরা কাদাখোঁচার দল খাওয়া ছেড়ে জলের ওপর ডানা ঝাপটাতে থাকে। সকলেরই মন উড়ু উড়ু। সর্দ্দার আর দলের অভিজ্ঞ পাখীগুলো যেন কি? এই ত' আর একটা সকাল, রূপোর মত ঝক্‌ঝকে। বাতাসে হিম তুষারের আমেজ। এখনও সর্দ্দারদের ঘুমই ভাঙ্গল না! এমন সময় দলে দলে আরও সব কাদাখোঁচারা শরবনের ভিতর থেকে, বিলের কোলের ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে শিরশিরে জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসতে আসতে কেউ মাথা ডুবিয়ে যেতে লাগল, কেউ ডানা ঝাপটে স্নান সেরে নিল। ছোকরাদের মত ব্যস্ত হবার কি আছে?

কাদাখোঁচাদের মাথার দু'পাশ সাদা, গলা আর পিঠ খয়েরী। পা দু'খানা সবুজ আর ঠোঁট বেশ লম্বা। বিলের ভেতর মুখ ডুবিয়ে এরা পোকামাকড় সন্ধান করে খায়। দূর থেকে সবুজ গাছের ছায়া-মাখা জলে, কাঁপা-কাঁপা কালো পাহাড়ের মাথার তুষারচূড়ার ছায়া-ধরা জলের মাঝখানে দলকে দল খয়েরী রঙের কাদাখোঁচাদের দেখলে মনে হয় যেন জলে কে গেরুয়া রঙ ঢেলে দিয়েছে।

ছোকরা কাদাখোঁচারা দল পাকিয়ে এসে সর্দ্দারদের জিজ্ঞেস করল, "আর দেরী কেন? আজ ত' গেলেই হয়!

সর্দ্দাররা বলল, "কেন? তুষার শেয়াল দেখা গেছে কি?"

"কই?" ছোকরারা চমকে বলল।

"তবে এখনও সময় হয় নি। ওপর পাহাড়ে যখন তুষারনদী ধীরে ধীরে নামতে নামতে কঠিন বরফ হয়ে জমে যাবে, ফার্ আর দেবদারুর মাথা যখন বুড়ো মানুষদের মত সাদা হয়ে উঠবে তুষারের ছোঁয়ায়, তখন নামবে ওপর পাহাড় থেকে লাল শেয়াল বন-তিতিরদের পেছু পেছু। তখন হোল যাত্রী পাখীদের যাওয়ার সময়। কাদাখোঁচারাও তখন মেলে দেবে পাখা।"

"কিন্তু"—ছোকরা পাখীরা বলল, "কাল রাতে কড় হাঁসেদের হঁক হঁক যাওয়ার ডাক শোনা গেছে আকাশে। তারা কি বোকা?"

"কড় হাঁসেদের জিজ্ঞাসা কর।"—সর্দ্দার কাদাখোঁচারা একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলে, "ওই দেখ—দূরে ভাসছে তারা।"

অভ্রভেদী রূপোলী বরফান মুকুট পরা পাহাড়ের মাথা ডিঙ্গিয়ে সূর্য্য উঠে রূপোলী মুকুটের ওপর সোনা ঢেলে দেয়। পাহাড়ী বনের ভেতর বন-তিতিরের চড়া ডাক ভেসে আসে। কাদাখোঁচাদের একটা ছোট দল জলা থেকে উড়ে যায় বন-তিতিরদের কাছে লাল শেয়ালের খোঁজ নিতে। ছ'টো কিয়াং গম্ভীর গতিতে বিলে জল খেতে আসে।

কিয়াংরা এক রকম বুনো গাধা, পাহাড়ী হাওয়ার মত স্বাধীন।

কাদাখোঁচাদের সর্দ্দাররা জিজ্ঞেস করল, "ও ভাই কিয়াং, লাল শেয়াল-টেয়াল নেমেছে জান ?"

"হুঁ !" কিয়াংরা বলল, "লাল শেয়ালদের আবার কি ভয় ? তুষার নেকড়েগুলো কিন্তু ভারী শয়তান !"

"নেকড়েদের ভয় থাকলে মানুষের ঘরে গিয়ে থাকলেই পার।"

কিয়াংরা বলল, "আমার কি য়্যাক্ ? মানুষের মোট বয়ে মরব, বাচ্ছাদের দুধ না দিয়ে মানুষদের দুধ দেব ? কিয়াংদের বাঁধা আর পাহাড়ী হাওয়া বাঁধা একই কথা। কিয়াংরা য়্যাক্ নয়।"

য়্যাক্ এক রকম পাহাড়ী চমরী গরু, পোষমানা অথচ সবল দুর্দ্দান্ত।

ছোকরা কাদাখোঁচারা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। তারা দল বেঁধে কড় হাঁসেদের কাছে গিয়ে হাজির। কড় হাঁসেরা এক হাত দেড় হাত লম্বা পাখী। তাদের পিঠ, ঘাড় আর মাথার পালকের রঙ কতকটা খয়েরী! বুক আর পেটের রঙ ধূসর। এই মেলান-মেশান খয়েরী ধূসরের মধ্যে ঠোঁট আর পায়ের রঙ হলদে। কড় হাঁসেরা তখন দল বেঁধে কুচকাওয়াজ করছিল। একটা দল ঠিক একেবারে এক সারে ভেসে চলেছে, বাঁক নিচ্ছে ঠিক সার বজায় রেখে, আবার ঘুরে আসছে। ঠিক যেন একটা ময়ূরপঙ্খী নৌকোর সার ভেসে চলেছে। কোন সারের মাথায় বা তিনটে করে কড় হাঁস, আবার কোথাও বা গোল হয়ে একটা হাঁসের দল যেন মস্ত বড় একটা পদ্মফুল ভেসে আছে।

ছোকরা কাদাখোঁচারা শুধোলো, "হ্যাঁ ভাই কড় হাঁস, তোমরা বুঝি যাওয়ার কুচকাওয়াজ করছ ?"

কড় হাঁসেরা বলল, "কড় হাঁসেরা এলোমেলো ওড়া পাখী নয়। কুচকাওয়াজ না করলে পাহাড়ী হাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে !"

ছোকরারা অস্থির।—"তা যাবে না তোমরা ?"

"লাল শেয়াল নেমেছে কি ?"—একজন কড় হাঁস জিজ্ঞেস করল।

"নেকড়ে বাঘ কি কিয়াংদের পেছনে ছুটছে ?" —আর একজন।

"শ্লথ ভাল্লুক কি ঘুমোতে ঢুকেছে গুহায় ?" আরও একজন।

"ওদের সঙ্গে কড় হাঁসেদের আর কাদাখোঁচাদের কি দরকার ?" জিজ্ঞেস করলো কাদাখোঁচারা।

"তবেই ত বুঝতে হবে আসছে উত্তর মেরু বয়ে, সাইবেরিয়ার ওপর দিয়ে তুষার-কম্বল মুড়ি দেওয়া উত্তুরে ঝড়। তারই আগে পাখীদের যাবার সময়।"

"কাল রাতে য়্যাক্‌দের বাঁকান শিঙের মত চাঁদ যখন পশ্চিম পাহাড়ের মাথা ছোঁয় ছোঁয় তখন যে আমরা শুনলাম কড় হাঁসেরা ডাকছে আকাশে !"

কড় হাঁসেরা হেসে বলল, "কড় হাঁস নয়, ওরা কড় হাঁসেদের পশ্চিমে জ্ঞাতি ভাই, রাঙামুড়ি, শরাল আরও কত কে ! আসে সাইবেরিয়া থেকে, সুইডেন থেকে, নরওয়ের ফিয়োর্ড ছেড়ে। বহু দূরের যাত্রী ওরা। সাহেবী বুলি ওদের, সব বোঝা না গেলেও ভারতের সমতল জলায় সমান হয়ে একেবার মেশে হাঁসেরা।"

বন-তিতিরেরা বনের নিরীহ পাখী। গোলগাল টেপাটোপা চেহারা। পিঠের ওপরটা লালচে পাঁশুটের ওপর সাদা সাদা ফুটকি, গলার তলাটি কালো, আর গলা থেকে ডানার নীচে পর্যন্ত হলদে পাঁশুটের ওপর কালো কালো ডোরা। এদের নাম গুলু তিতির। হিমালয়ের বনে আট-ন' হাজার ফুট উঁচুতে পর্যন্ত এরা থাকে। গুলু তিতিরদের গিন্নীরাই বাড়ির মালিক। কর্ত্তামশাই খান দান আর গাছের ডালে উড়ে গিয়ে গান গা'ন। ভোরের আলোয় পাহাড়ী বরফান চূড়া যখন সোনা-রঙ মেখে ঝলমল করে ওঠে, গুলু কর্ত্তার আনন্দ-মাখা সুর বেজে ওঠে বনে বনে। গিন্নী ধমক দেয়,—"ডর্-র্ ডর-র্ ! ওরে, শেয়াল আসবে।"

কিন্তু পাহাড়ী ঝক্‌ঝকে আকাশ যখন সুনীল হয়ে হেসে উঠেছে, ঠাণ্ডা বাতাস যেন একতারার চমকান ঝঙ্কার, তখন কি আর শেয়ালের কথা মনে থাকে ? বাসার মাথার ঘাসের ডগার চাঁদোয়া সরিয়ে গুলু গিন্নী উড়ে আসে কর্ত্তার পাশে, আর গুলু তিতিরদের ডাক এ বন থেকে ও বনে ছড়িয়ে যায়। গুলু তিতিরদের বাসা মাটিতে ঘাসের গর্ত্তে, যেখানে লম্বা লম্বা ঘাসের ডগা বাসার মাথায় ঝুঁকে পড়ে ঢেকে রাখে, আকাশে মাথা তুলে সরল দেবদারু গাছেরা শির শির করে কাঁপে, ফার্ গাছেরা আকাশে হাতছানি দিয়ে চেয়ে থাকে। ভাল্লুক দাদা বন-তিতিরদের ডাকে আড়ামোড়া ভেঙ্গে উঠে পড়ে। আবার একটা ঝক্‌ঝকে সকাল। ফলটা মূলটা, উইটিপি কোথায় আছে ? মৌমাছিদের চাকে মধু কি শেষ ? কিয়াংরাও একবার পাহাড়ী চড়াইয়ে দাঁড়িয়ে থমকে শোনে গুলু তিতিরদের প্রভাতী আবাহন। নীচে খাদ নেমে গেছে কোথায়—কোন্ অতলে। সাপের খোলসের মত নীচে কোথায় একটা পাহাড়ী নদী যেন চিক্‌চিক্ করছে

আর সামনে নিঃসীম নীল আকাশ। হাওয়ার মত স্বাধীন আর একটা দিন তার ঐশ্বর্য্য নিয়ে ফুটে উঠেছে।

"কঁ ক ডর্-র্—ডেকে উঠে গুলু কর্ত্তা ঘাসের বাসার ভেতর থেকে সভয়ে লাফিয়ে উঠল।

"পালা পালা, শেয়াল, লাল শেয়াল!" চেঁচিয়ে উঠল গুলু গিন্নী। গুলু গিন্নী তখন উড়ে গিয়ে গাছের ডালে। আর দেখা গেল লালচে মোটা সিল্কের মত লোমে ভরা একটা লাল শেয়াল তাড়া করেছে গুলু তিতিরটাকে। লাল শেয়ালের মোটা লেজের ডগাটি তুষারের মত সাদা, চম্‌কাচ্ছে।

গুলু গিন্নী চেঁচিয়ে ডেকে ওঠে, "ওরে বোকা, উড়ে যা না গাছের ডালে।"

কিন্তু গুলু তিতিরটা তখন গুলিয়ে ফেলেছে মাথা। ঝটপট করে সে খানিকটা উড়ে যাচ্ছে, আবার মাটিতে লাফিয়ে পড়ছে। আর শেয়ালটা ঘাসের ভেতর দিয়ে, গাছের ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে কখন লাফিয়ে পড়েছে গুলু তিতিরের ঘাড়ে।

দুঃখ হয়েছিল বৈ কি গুলু গিন্নীর। কর্ত্তাকে যখন লাল শেয়াল মুখে করে নিয়ে চলে গেল গুলু গিন্নী তখন রাগে আর দুঃখে ডর্‌র্ ডর্‌র্ করে অনেকক্ষণ ধরে বলল, "কি বোকা! কি বোকা!"

লাল শেয়াল বাসার সন্ধান পেয়ে গেছে। আর একটা খুঁজতে হবে তাকে। আবার একটা কর্ত্তাও জোগাড় করা চাই। বেশীক্ষণ দুঃখ করার অবসর কোথায়?

পাহাড়ী সন্ধ্যা অপরূপ রঙ ফলিয়ে দেয় পশ্চিম আকাশে। সে দিক্‌টা পাহাড় আর পাথর, গাছপালা নেই। পাহাড়ী গুহার মুখে পাথর জড় করে দিয়ে ভাল্লুক দাদা গুহার ভিতর ঝিমোচ্ছিল। পেটটি সে যতদূর সম্ভব ভরে নিয়েছে। এইবার ঘুমের সাধনা। সারা শীতটা সে এই গুহায় ঘুমিয়ে কাটাবে। তুষার আর বরফে ছেয়ে যাবে চারদিক্। ভাল্লুক দাদার কিছু এসে যাবে না। তারপর যে দিন বরফ গলে মাটি থেকে আবার দেখা দেবে সবুজ অঙ্কুর, রডোডেনড্রন গাছে ফুটে উঠবে থোকা থোকা ফুল, মৌমাছিরা ছুটে আসবে গন্ধ-বাতাসে, ভাল্লুক দাদার ঘুম ভাঙ্গবে চন্‌চনে ক্ষিধে নিয়ে।

হঠাৎ দৌড়ের শব্দে আর হো হো হাসির আওয়াজে ভাল্লুক দাদার ঝিমুনি ভেঙ্গে গেল। ঘুমের ব্যাঘাত হলে ভাল্লুক দাদা মহা রগ-চটা লোক। হুড়মুড় করে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ভাল্লুক দাদা দেখে কিয়াংদের তাড়া করেছে তুষার-নেকড়ে। কিয়াংরা

ভাল্লুক দাদাকে ঘাঁটায় না, আর নেকড়ে পাজীটা কিনা এসেছে ঘুম ভাঙ্গাতে! ভাল্লুক দাদা দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে নেকড়ের পথ যুড়ে বলল,—"গর্‌র্, গোঁ, গর্‌র্।"

নেকড়েটা থমকে দাঁড়িয়ে দাঁতগুলো খিঁচিয়ে বলল—"হো হো হুড্ডা হুর্‌র্।"

ভাল্লুক দাদা এক লাফে এগিয়ে গিয়ে চালাল এক থাবড়া। নেকড়েটা ক্ষিপ্র পায়ে পেছিয়ে গেল, "হো হো হুড্ডা হুড্ডা র্ র্ র্!"

ভাল্লুক দাদার আর এক লাফ, আর বাতাসে থাবড়াটা তার ঘুরে গেল। কিয়াংরা পালিয়েছে। নেকড়েও হাওয়া। ভাল্লুকদের কে ঘাঁটায়?

ভাল্লুক দাদা গর্ গর্ করতে করতে এসে গুহায় ঢুকে থাবার ভেতর মুখ গুঁজে আবার ঝিমোতে সুরু করল।

কুচ কাওয়াজ। কুচকাওয়াজ।

কড় হাঁসেরা তে-কোণা সার বেঁধে বেঁধে আকাশে উঠছে। দলের পর দল। যাত্রার হুকুম বেজে বেজে উঠছে আকাশে—হুঁক হুঁক! আর দলের পর দল তে-কোণা লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আকাশে।—পাহাড়ের মাথা ডিঙ্গিয়ে, য়্যাকের বাঁকান শিঙের মত বাঁকা চাঁদের কোল ঘেঁসে, ভেদ করে ধোঁয়াটে মেঘরাজার সৈন্যসামন্ত। প্রচণ্ড বেগ তাদের পাখায়।

আর কাদাখোঁচারাও পরদিন ভোরে আকাশ ছেয়ে আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গিরিবর্ত্মের ফাঁকে ফাঁকে, দেবদারু, ফারের মাথায় মাথায় উড়ে চলে তারা। কোথায় কোন সুদূর সমতল জলা তাদের ডাক দিয়েছে। পাখা তাই চঞ্চল যাযাবর। হয়ত পথে বাজপাখী ঝাঁপিয়ে পড়বে দলে, হয়ত শিকারেরা নেবে ক'জনকে, হয়ত বন্দুকের মুখে টুপটাপ ঝড়ে পড়বে কেউ শীতের গাছের পাতার মত। আর পেছনে ফার্ গাছের ডাল তুষার মেখে সব-ছাড়া ছাই-মাখা সন্ন্যাসীর মত সাদা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেবদারুর মাথা তুষার-ভারে নুয়ে আসে। বরফান পাহাড় আলোয় আঁধারে ধাঁধিয়ে ওঠে।

পাথরে তুষারে গুহামুখ ঢাকা। ভাল্লুক দাদা ঘুমোয়।

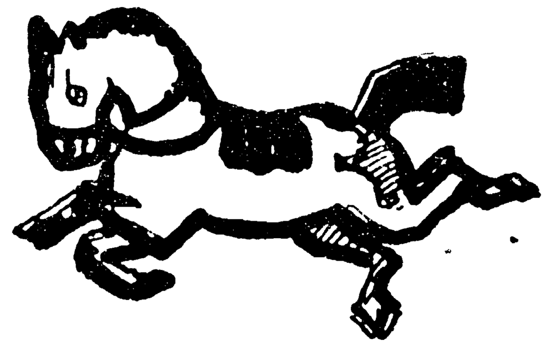

একযে ছিল

ছড়া ও ছবি—চণ্ডী লাহিড়ী

এক যে ছিল রাজা—
সে একলা খেত খাজা,
গরীব মানুষ চাইতে গেলে
দিত কঠোর সাজা।
সে মানতো একটি আইন—
নালিশ করলে ফাইন,
ভোর না হতে ফাঁসিঘরে
জমত লম্বা লাইন।

এক যে ছিল রাণী—
সে মাথায় ঘোমটা টানি'
পরমান্নে লঙ্কা ফোড়ন
দিত চাট্টিখানি।
সে অমাবস্যার রাতে
ভাঙ্গা-মাজার বাতে
কবরেজী ঘি করত মালিস
দালদা দিয়ে সাথে।

এক যে ছিল পুলিশ—
সে ভাবত সবাই ফুলিস্,
গোঁফ ছিল তার ঝাঁটার মত,
চোখটি কঠোর-কুলিশ।
সে গিলত রুটি গোস্ত,
গাল দিত খুব চোস্ত,
চোরেরা সব ছাড়ল চুরি—
ঘুষ দিতে সব খসতো।

গানের আসর

শ্রীইন্দিরা দেবী

রাজসভা গমগম করছে, লোক আর ধরে না। এমনিতেই রাজা-রাজড়ার সভায় লোক ধরে না— আজকে একেবারে লোকারণ্য, তিল ধারণের ঠাঁই নেই। রাজ্যে যত গণ্যমান্য সকলেই আজ এই সভায় উপস্থিত। তাছাড়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ও পাত্রমিত্র সভাসদ্‌রা আছেন। একপাশে সূক্ষ্ম মসলিনের পর্দা ঝুলছে, তার অন্তরালে অন্তঃপুরিকাদের আসন নির্দিষ্ট হয়েছে—আজ সেখানেও স্থানাভাব। সকলের চোখে-মুখে অধীর আগ্রহ ফুটে উঠেছে।

রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে স্রোতময়ী ভাগীরথীর তরঙ্গের উপর অপরাহ্ণ-সূর্যের রঙ্গিন আভা ছড়িয়ে পড়ছে। কর্ম-কোলাহলমুখরিত দিনের অবসানে সর্বত্র একটি গভীর প্রশান্তি।

নিস্তব্ধ সভাকক্ষে নদীর মৃদু কলতান ভেসে আসছিল। একটু পরেই সভায় প্রবেশ করলেন মহারাজ লক্ষ্মণ সেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখালেন।

রাজা আসন গ্রহণ করলে পর তাঁর অনুমতি নিয়ে সভার কাজ সুরু হলো।

আজকের সভার প্রধান আকর্ষণ বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গীত। সেই কারণেই এত জনসমাগম।

লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গীতানুরাগের খ্যাতি বাংলা-বিহারের সীমা অতিক্রম করে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশ থেকে বহু জ্ঞানী, গুণী শিল্পী তাঁর রাজসভায় আসতেন আর রাজার কাছ থেকে সমাদরও পেতেন প্রচুর। নাম-করা বহু শিল্পী স্থায়ীভাবে তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করে থাকতেন। সেকালে নৃত্যগীত চর্চার খুব প্রচলন ছিল। যাঁরা এই সবের চর্চা করতেন সমাজে তাঁরা সম্মানের আসন পেতেন। এমনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন নটগাঙ্গো। সঙ্গীতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বহু তরুণ-তরুণী তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করে সঙ্গীতজগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। গাঙ্গোর পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গীতপ্রতিভার কথা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ সেই বিদ্যুৎপ্রভা সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। সুতরাং জনসমাগম হবে তাতে আর বিচিত্র কি?

বিদ্যুৎপ্রভা সভার কেন্দ্রস্থলে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। তারপর মহারাজকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে আরম্ভ করলেন সঙ্গীত।

ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা সভাকক্ষে ছড়িয়ে পড়লো। শ্রোতারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন এই সঙ্গীত শুনে।

সভাকক্ষে আসবার সৌভাগ্য যাদের হয় নি—এ রকম বহু শ্রোতা কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে সেই অপূর্ব সঙ্গীত শুনছিলেন। তাঁদের নিস্পন্দ দেহের দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল—সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন তাঁরা একে গ্রহণ করছেন।

রাজপ্রসাদের অদূরে একটি কূয়া ছিল। মধ্যবিত্ত প্রতিবেশীরা সেই কূয়ার জল পানীয়রূপে ব্যবহার করতেন। এক বণিক্‌-বধূ এখানে জল নিতে এসে কিছুক্ষণ এই সঙ্গীত শুনলেন। তারপর তাঁর মনে পড়লো তাঁকে ফিরতে হবে,—তাই তাড়াতাড়ি জল তুলতে গেলেন। বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গীত তাঁর মন এ রকম আচ্ছন্ন করে ছিল যে তিনি সব ভুলে কূয়ার মধ্যে কলসী না নামিয়ে কোলের ছেলেটীর গলায় দড়ী পরিয়ে জলে নামিয়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ পরে গান যখন থামলো তখন তাঁর সম্বিৎ ফিরে এলো—কিন্তু ছেলের জীবন আর ফিরিয়ে আনা গেল না।

বিদ্যুৎপ্রভা তাঁর সঙ্গীত শেষ করে উঠে এলেন। তারপর এলেন বুঢ়ন মিশ্র। ইনি উড়িষ্যার অধিবাসী। অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ বলে এঁর খ্যাতি সর্বত্র প্রসারিত ছিল। ভারতবর্ষের বহু স্থান ভ্রমণ করে তিনি তাঁর সঙ্গীতদক্ষতার পরিচয় দিয়ে গুণীজনের কাছ থেকে সমাদর লাভ করেছিলেন। গুণগ্রাহী লক্ষণ সেনের বিশেষ আমন্ত্রণে ইনি রাজসভায় তাঁর সঙ্গীতনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে এসেছেন। বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গীতের রেশ তখনও কাটে নি—এমনি সময় রাগ আলাপন আরম্ভ করলেন বুঢ়ন মিশ্র। তিনি বেছে নিলেন পটমঞ্জরী।

মুগ্ধ-বিস্ময়ে নিঃস্পন্দ হয়ে শ্রোতারা সেই সঙ্গীত শুনতে লাগলো। সভাকক্ষের বাইরেও যারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল তারা সবিস্ময়ে দেখলো—প্রাসাদ-অঙ্গনে যে পিপুল গাছ ছিল তার সব পাতাগুলি ঝর ঝর করে ঝরে পড়লো। সঙ্গীত আরম্ভের পূর্বে যে গাছ ঘন সবুজ সতেজ পাতায় পূর্ণ ছিল, সঙ্গীত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে গাছ নিষ্পত্র হয়ে গেল।

বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গীত শেষ হবার পর সভাকক্ষ ধ্বনিত হয়েছিল 'সাধু, সাধু' রবে; কিন্তু বুঢ়ন মিশ্রের সঙ্গীতপ্রতিভা দেখে সভার লোকেরা এত বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন যে সাধুবাদ জানাতেও তাঁরা ভুলে গেলেন। এঁদের নীরব অভিনন্দন সরব অভ্যর্থনার চেয়ে বেশী।

লক্ষ্মণ সেন আসন ছেড়ে গায়কশ্রেষ্ঠকে জয়মাল্য পরিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। এমনি সময় সভাকক্ষে ব্যস্ত-ত্রস্তপদে প্রবেশ করলেন কবি জয়দেব-পত্নী

পদ্মাবতী। ইনি সর্বজনপরিচিতা—স্বয়ং মহারাজেরও স্নেহভাজনা। সভামঞ্চের দিকে এগিয়ে ইনি করজোড়ে নিবেদন করলেন, 'মহারাজ, আপনি জয়মাল্য দান করার আগে প্রতিযোগিতা শেষ করতে দিন। আমার স্বামীকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত না করা পর্যন্ত জয়মাল্য কারুর প্রাপ্য হতে পারে না।' সভাসদ্‌দের মধ্যে অনেকেই পদ্মাবতীর কথা অনুমোদন করলেন। সভার জনতা প্রতিযোগিতার কথায় আরো উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

জয়দেবকে সংবাদ পাঠান হলো, আর, সকলের অনুরোধে, পদ্মাবতী সঙ্গীত আরম্ভ করলেন। তিনি বেছে নিলেন গান্ধার রাগ। লহরীর পর লহরী তুলে সঙ্গীত বিস্তার হতে লাগলো। সঙ্গীতের ধ্বনি কক্ষ অতিক্রম করে প্রতিধ্বনিত হলো গঙ্গাবক্ষে।

পদ্মাবতীর সঙ্গীতমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে গঙ্গার ওপারে যে সব নৌকা ছিল সে সবগুলি ভেসে এলো এপারে। এই ব্যাপার দেখে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, কারুর মুখে কথা ফুটলো না।

তারপর যখন তাঁরা আত্মস্থ হলেন তখন সভাগৃহ মু রিত হলো অবিমিশ্র অভিনন্দন-বাণীতে। সকলে বলতে লাগলেন, বুঢ়ন মিশ্রের সঙ্গীতের সুরে গাছের পাতা ঝরে পড়েছে—সে তো সজীব; কিন্তু পদ্মাবতীর সঙ্গীতমাধুর্য আকৃষ্ট করেছে নির্জীব নৌকাকে!

পদ্মাবতীর প্রশংসায় যখন সভা মুখর হয়ে উঠেছে—এমন সময় জয়দেব এসে দাঁড়ালেন সভাস্থলে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের কোনো ইচ্ছাই ছিল না তাঁর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পদ্মাবতীর অনুরোধে তিনি সঙ্গীত পরিবেশনে সম্মত হলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে সেদিন উৎসারিত হলো স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুষমা। এ রকম অপূর্ব সঙ্গীত কেউ কোনোদিন শোনে নি। তিনি আরম্ভ করলেন বসন্ত রাগ—দেখতে দেখতে সেই নিষ্পত্র পিপুল গাছে জেগে উঠলো নতুন প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল কচি পাতা ও কুঁড়ি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত গাছ ভরে উঠলো সবুজ পাতায়। সভায় জয়ধ্বনি উঠলো।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন জয়দেবকে। সে দিনের মত আসর শেষ হলো।

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

শ্রীকৌটিল্য

"কেমিষ্ট্রি" অর্থাৎ রসায়ন বিজ্ঞান এখন তুনিয়ার চেহারা বদলে দিচ্ছে। কেমিষ্ট্রি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের আমরা বলি 'কেমিষ্ট্'। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়েছিল—আয়ুর্বেদকে কেন্দ্র করে। নাগার্জুন, চরক, সুশ্রুত, প্রভৃতি বিজ্ঞানী-দের নাম বৌদ্ধ ও হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রে অমর হয়ে আছে। পাশ্চাত্য জগতে যাঁরা প্রথম এই বিজ্ঞান চর্চা করতেন তাঁদের বলা হ'ত 'এল্-কেমিষ্ট্'। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃত্রিম উপায়ে অন্য পদার্থকে সোনায় রূপান্তরিত করা। তা অবশ্য তাঁরা পারেন নি, কিন্তু সেই চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁরা এমন সব মূল্যবান্ আবিষ্কার করে গেছেন যার ওপর ভিৎ গেড়েই বর্তমান রসায়ন বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। তাই তাঁদেরকে আধুনিক বিজ্ঞানীদের নমস্য বলা চলে।

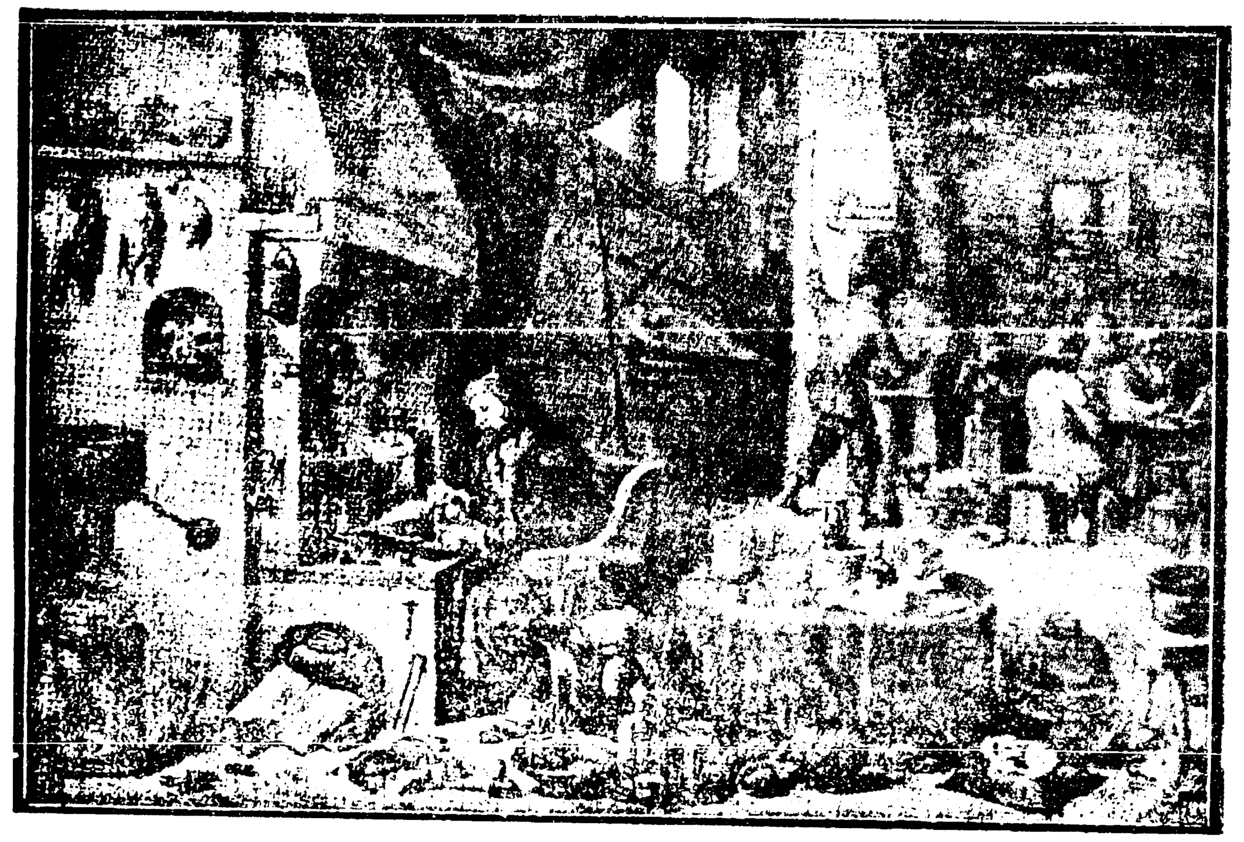

পরীক্ষাগারে একজন এল্‌কেমিষ্ট

*　　*　　*　　*

প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসা যাক্ বর্তমান যুগে—যাকে বলা হয় যন্ত্রযুগ। মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কমিয়ে সমস্ত ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এ যুগের একটা বিশেষত্ব। শুধু যন্ত্রপাতিই নয়, যন্ত্রের কৌশলে এ যুগের বিজ্ঞানী নকল মানুষও তৈরী করেছেন। এই যান্ত্রিক বা নকল মানুষকে বলা হয় 'রবট্'। এই নকল মানুষ

অবশ্য সত্যিকার মানুষ নয়—মানুষের মত তাদের মগজও নেই, হৃদয়ও নেই, সুখতুঃখবোধ বা শখ-আহ্লাদও নেই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে এরা এমন ভাবে সাড়া দেয়, এমন নির্ভুল ভাবে এক-একটা কাজ করে দেয় যাতে এদের যন্ত্র বলে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। টেলিফোনে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, অঙ্ক কষে দেওয়া, টিকেট বিক্রী করা, লোককে অভ্যর্থনা করা—কত হরেক রকম কাজই না এরা করে! কোন কোন রবট্ সত্যিকার মানুষের মতই হেঁটে চলাফেরা করতে পারে। মানুষের মত পোষাক পরিয়ে দিলে তখন হয়তো সত্যি মানুষ বলেই এদেরকে ভুল করে বসবে লোকে। ছবিতে

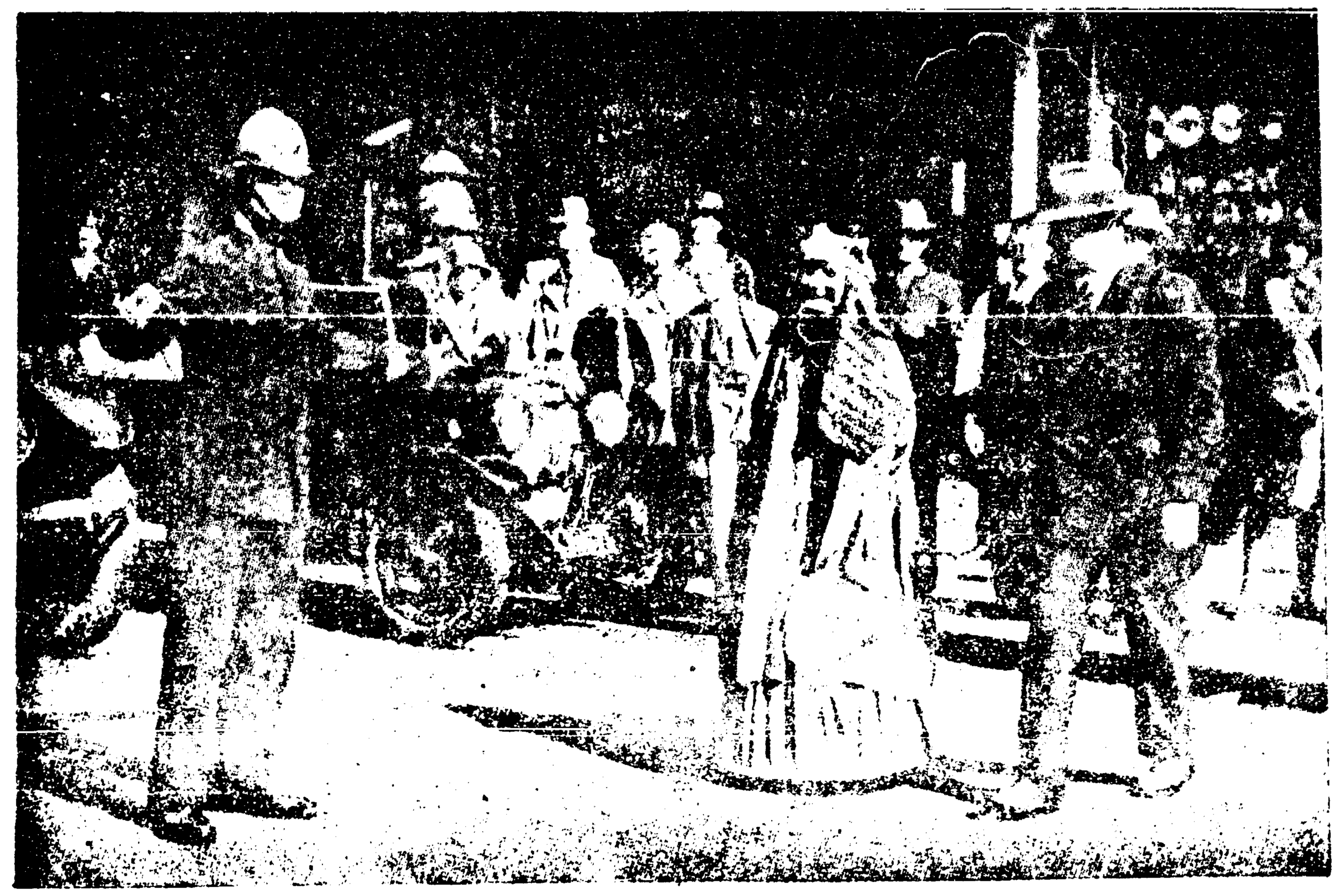

নকল মানুষ 'রবট্' পায়ে হেঁটে রাস্তা পার হচ্ছে।

দেখ না—এই রকম একটি রবট্ (বুড়ী মেম সাহেব) কেমন হেঁটে হেঁটে রাস্তা পার হচ্ছে!

*　　*　　*　　*

আর একটি অদ্ভুত যন্ত্র দেখ ও পাতায়। এটা কি বলতে পার? প্রথমটা ছবি দেখে আমি তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। পরে জানলাম এটা একটা মোটর সাইকেল। বাইরের য়্যাক্সিডেণ্ট অর্থাৎ তুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবার জন্য মোটর সাইকেলটিকে সুদৃঢ় লোহার বর্মে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে আরোহী বসলে তার মনে হবে সে যেন নিরাপদ তুর্গে বসে চলেছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গুলিগোলার মধ্যে দিয়েও এই মোটর সাইকেল চড়ে দিব্যি নির্ভয়ে চলাফেরা করা যায়।

আত্মরক্ষার জন্য বিজ্ঞানীরা যেমন নানা ব্যাপারে নানা কৌশল অবলম্বন করছেন, তেমনি করছেন আরামের জন্যও। চলাফেরার ব্যাপারে মোটর-কার আজকাল একটা আরামদায়ক গাড়ী সন্দেহ নেই। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে, যেখানে মোটর চলাচলের জন্য হাজার হাজার মাইল লম্বা চমৎকার সব রাস্তা আছে, সেখানে লোকে অনেক সময় ট্রেনে না চড়ে দীর্ঘ পথ মোটরেই পার হয়ে যায়। সম্পূর্ণ নিজেদের ইচ্ছেমত ভাবে চলাফেরা করা যায় তাতে। কিন্তু রাত্রি কাটানোই হচ্ছে সমস্যা। ৩।৪ দিনের পথ হলে, এবং ঘুমোবার জন্য পথের পাশে হোটেল বা বিশ্রামাগার না থাকলে, তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাতে হয়। ওখানকার যন্ত্র-বিজ্ঞানীদের নজর এই ছোটখাট ব্যাপারেও পড়েছে। তাঁরা নতুন ধরণের টুরিষ্ট কারে এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে দিনের বেলা যেটা থাকে আরামে বসবার গদী, রাত্রেই সেটা হয়ে যায় গদীওয়ালা শোবার খাট। কাজেই এ রকম গাড়ী থাকলে রাত কাটাবার জন্য আর হোটেলের খোঁজ করতে বা তাঁবু গাড়তে হয় না, মোটর-গাড়ীতেই আরামে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়।

বর্ম পরানো মোটর সাইকেল

*　　*　　*

উল্কা কাকে বলে জান তো? পৃথিবী, বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহগুলি যেমন সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘুরছে তেমনি আরও ছোটবড় লক্ষ লক্ষ জড়পিণ্ড সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এদেরই নাম উল্কা। ঘুরতে ঘুরতে উল্কারা যখন পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে এসে পড়ে তখন পৃথিবী তাদের নিজের দিকে টেনে নেয়। ফলে প্রচণ্ড বেগে তারা পৃথিবীর দিকে ছুটতে থাকে। প্রচণ্ড বেগ বলতে বন্দুকের গুলির চাইতেও বেশী বেগে। এই সময় বাতাসের সঙ্গে তাদের দারুণ ঘষাঘষি হতে থাকে, ফলে দেখতে দেখতে তারা জ্বলে ওঠে, তাদের ভিতরকার যা উপাদান তাও বাষ্পাকারে পরিবর্তিত হয়। তার পর সেগুলোও জ্বলে উঠে দারুণ উত্তাপ সৃষ্টি ক'রে দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে

যায়। রাত্রে দূর থেকে দেখলে মনে হয় বুঝি এক-একটা তারা ছুটে যাচ্ছে। এই জন্য উল্কাপাতকে চলতি কথায় বলে 'তারা খসে পড়া'।

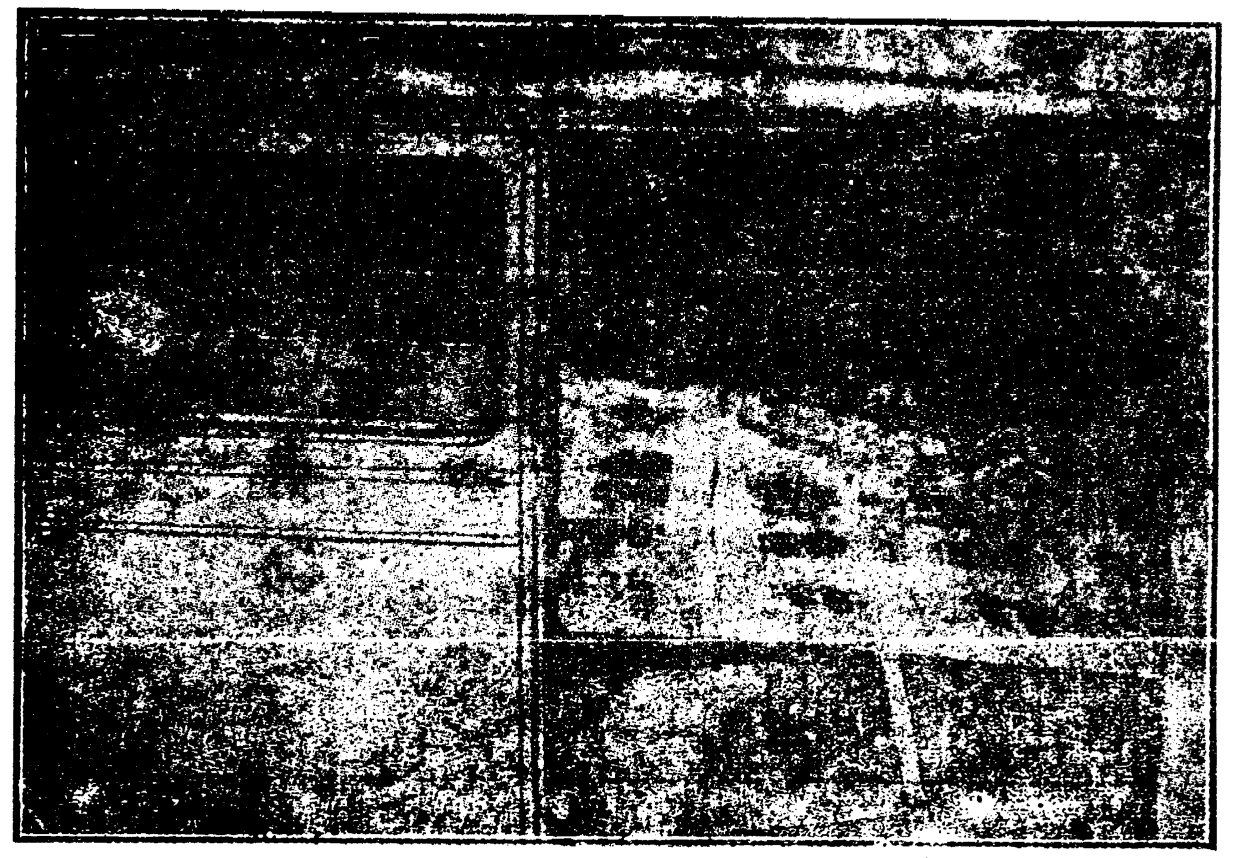

দিনে মোটরের সীট, রাত্রে শোবার খাট।

পাহাড় নয় - অতিকায় উল্কা

কিন্তু সব উল্কাই পড়ে ছাই হয়ে যায় না। যেগুলো খুব বড় আকারের তার কোন কোনটার খানিকটা অংশ আস্তও থেকে যায় আর ভীম বেগে সেগুলি এসে মাটীতে পড়ে। এত জোরে পড়ে যে তার ফলে মাটী ফেটে চৌচির হয়ে যায়, সময় সময় বিরাট অগ্নিকাণ্ডেরও সৃষ্টি করে। আগের পৃষ্ঠায় এই রকম একটি অতিকায় উল্কার ছবি দখ।

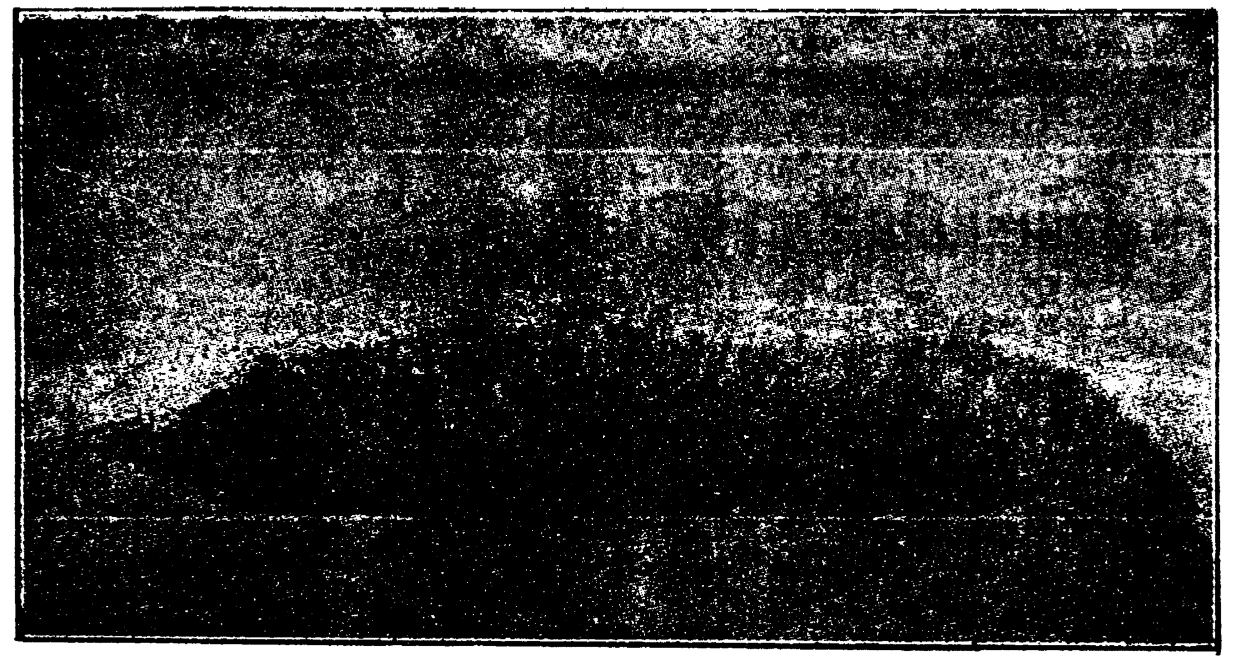

উল্কাপাতের ফলে তৈরী অতিকায় গর্ত

হঠাৎ দেখলে পাহাড় বলে মনে হবে। এটির ওজন হাজার মণের ওপর। এটি গ্রীণল্যাণ্ডে পাওয়া গেছে। কত দিন আগে যে এটা আকাশ থেকে পড়েছিল তা কেউ বলতে পারে না।

ক্যালিফোর্ণিয়ায়ও এই রকম একটি বিরাট প্রাচীন যুগের উল্কাপাতের চিহ্ন আছে। উল্কাটা পড়েই মাটীতে ঢুকে গিয়েছিল। যেখানে পড়েছিল সেখানে একটা বিরাট পুকুরের মত গর্ত হয়ে যায়। ছবিতে দেখ কী বিরাট সেই গর্ত!

১৯০৮ সালেও সাইবেরিয়ার এক জঙ্গলে একটি অতিকায় উল্কা পড়েছিল। এটির ওজন ছিল সাড়ে তিন হাজার মণ। ছোটখাট উল্কা তো হামেশাই পড়ে। কলকাতার যাদুঘরে এ রকম বহু উল্কার নমুনা সংগৃহীত আছে।

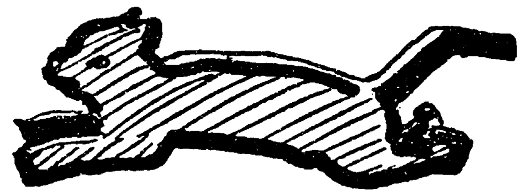

মানুষের গল্প

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

আমাদের বড়ো মেসোমশাই যেন গল্পের ঝুলি! কতো গল্প যে তাঁর ষ্টকে আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মেসোমশাই বেড়াতে এলেই আমাদের মধ্যে রীতিমত উৎসব পড়ে যায়।

'গল্প! গল্প! মেসোমশাই, গল্প!' ছেঁকে ধরি আমরা।

মেসোমশাই হেসে বলেন, 'গল্প বলে বলে তো ফতুর হয়ে গেছি। আর গল্প কোথা?'

আমরা অতো সহজে হার মানি না। পাঁচ জনে মিলে ছোট ছেলেদের "জট নড়ে তেঁতুল পড়ে"র মতো সবেগে মাথা নাড়ি আর বলি, 'ওসব জানি না। গল্প না শুনে ছাড়ছি না।'

'না শুনে ছাড়ছই না!—আমি বললে তো?' মেসোমশাই মিটিমিটি হাসেন। এ হাসি আমরা চিনি, এ হচ্ছে গল্পের পূর্ব্বসূচনা। এ হাসি মানেই মেসোমশাই মনে মনে গল্প ভাঁজছেন। কাজেই আমরা পূর্ণোদ্যমে চেঁচাই, 'বলতেই হবে! বলতেই হবে!'

'বলতেই হবে? তা'হলে হবে। কি গল্প চাই? ভূতের?'

'যা'হোক! মোট কথা ভীষণ ভালো হওয়া চাই।' আমরা চারজনে বলি এ কথা। কিন্তু ক্ষুদে ঘেঁটুচন্দ্র চুপিচুপি বলে, 'ভূতের গল্পয় কী দরকার রে? মেসোমশাইকে বল না মানুষের গল্পই বলুন।'

মেসোমশাই পাকা ভুরু নাচিয়ে বলেন, 'ঘেঁটু যেন কি ষড়যন্ত্র করছে মনে হচ্ছে!'

আমরা সমস্বরে বলি, ও বলছে ভূতের গল্পে ওর ভয় করে, মানুষের গল্পই বলুন।'

'মানুষের গল্প?' মেসোমশাই আর একবার হেসে ওঠেন, 'মানুষ কি আর এতো সস্তা জিনিষ রে, বাপু, যে চট্ করে তা'র গল্প খুঁজে পাওয়া যাবে? ওর জন্যে ইতিহাসের পাতা ঘাঁটতে হয়। ভূতের গল্প বরং অনেক সোজা। তাই জন্যেই তো এখনকার লেখকেরা যতো ভূতের আর অদ্ভুতেদের নিয়ে গল্প লেখে, বুঝলি?'

আমরা অতো বাজে কথা শুনতে চাই না, মেসোমশাইয়ের কাঁধ, হাত আর পকেট ধরে ঝুলে পড়ি, 'হোক্ গে! ওসব জানি না, গল্প বলুন তাড়াতাড়ি। মানুষের গল্প।'

মেসোমশাই নড়েচড়ে ব'সে, পানের কৌটোটি খুলে সুরু করেন, 'আচ্ছা তা'হলে শোন, হ্যাঁ, মানুষের গল্পই বলি শোন:

'আমাদের গ্রামের রাঘব চাটুয্যে ছিলেন সাংঘাতিক লোক। যেমন বদ্‌মেজাজী তেমনি দাম্ভিক। গ্রামের সমস্ত লোক তঁর ভয়ে থরহরি কম্প!'

ঘেঁটু চোখ পিটপিটিয়ে বলে, 'বদমাইস মানুষের গল্প বলছেন বুঝি মেসোমশাই?' আমরা নেপথ্যে ধমকে উঠি ওকে, 'থাম না! শোন না চুপ করে!'

মেসোমশাই কিন্তু আপন মনে বলেই চলেন,— 'তাঁর দম্ভের কথা যদি শুনিস তাজ্জব হয়ে যাবি। গ্রামে ভোর থেকে বেলা দশটা পর্য্যন্ত কারো জুতো পায়ে দেবার হুকুম ছিলো না! কেন? না

রাঘব চাটুয্যে ভোরবেলায় গঙ্গাস্নানে যান। তিন ক্রোশ দূরে গঙ্গা; হেঁটে যাবেন, হেঁটে ফিরবেন খালি পায়ে। তাঁর ফিরতে প্রায় দশটাই বাজতো।'

অবাক্ হয়ে বলি, 'তার সঙ্গে অন্য লোকের জুতো পরার কি?'

'আহা, বুঝলি না? তাঁর মতে হচ্ছে, তিনি যতোক্ষণ খালি পায়ে থাকবেন, ততোক্ষণ আর কারো জুতো পায়ে দেওয়া বেয়াদপি। অতএব এই হুকুম।'

'কী আবদার! নিজে তো জমিদার, হেঁটে যাবার দরকার কি? পাল্কী চড়লেই পারতেন।'

'সে ওঁর খেয়াল। মা গঙ্গার কাছে নম্র ভাবে যাবেন। তাই বলে প্রজাদের কাছে তো আর নম্র হতে পারেন না? এই হচ্ছে কথা। একদিন একটা ছেলে, মানে দেশেরই ছেলে তবে কলকাতায় মামার বাড়ী থাকতো, ছুটিতে বাড়ী গিয়েছিলো। সহুরে মেজাজ তার। সে করেছে কি, একদিন সকাল বেলা ইয়া এক বুটজুতো পরে খটমট করে চলেছে রাস্তায়। জমিদার-বাড়ীরই সামনের রাস্তায়। ভাবখানা যেন, দেখি না কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়!

'ব্যস্! পড়বি তো পড় রাঘব চাটুয্যের চোখে।

'হাতে গঙ্গাজলের ঘটি, খালি পা, পরনে গরদের ধুতি-চাদর, মন্ত্রপাঠ করতে করতে আসছেন চাটুয্যে। ব্যাপার দেখে একবার থমকে দাঁড়ালেন, তারপর মন্ত্র পড়তে পড়তেই বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন।

'ছেলেটা বীরদর্পে আশেপাশে-লুকিয়ে-থাকা বন্ধুদের কাছে এসে বললো, "দেখলি? কি ঘোড়ার ডিম হলো? তোরা সব ভয়েই মরে যাবি তার কি হবে? সাহস করে করতে পারলে যা খুসি করা যায়।" আর সব বন্ধুরা সত্যি অবাক্। ওরা ভেবেছিলো হয়তো বা হাতের ঘটিটা ছুঁড়েই একে ঠাণ্ডা করে দেবেন রাঘব চাটুয্যে। কিছুই হলো না! একটা ধমক পর্য্যন্ত না!

"হুঁ, বাবা, অতো সোজা নয়।" ছেলেটা বলে।

'কিন্তু খানিক পরে জমিদারের কাছারিতে তলব পড়লো। ছেলে তো ছেলে—ছেলের বাপের শুদ্ধ। বাপের মুখ শুকিয়ে আমসি, ছেলে তখনো তড়পাচ্ছে,—কি হবে? কচুপোড়া! আমি চোট্‌পাট্ শুনিয়ে দিয়ে আসবো, দেখো সবাই।'

'তা দেখলো সবাই। একটা দৃশ্য দেখলো।

'দেখার মতোই দৃশ্য!'

'সেই বুট জুতো দুটোর মধ্যে পায়ের বদলে হাতের চেটো দুটো পুরে রাস্তায় হামা দিচ্ছে ছোঁড়া, আর সাত হাত অন্তর মেপে তিন হাত নাকেখৎ দিচ্ছে! সঙ্গে দু'পাশে দুই পাইক। এক ক্রোশ রাস্তা ওই ভাবে নাকেখৎ দিতে দিতে যেতে হলো।

'রাঘব চাটুয্যে নাকি না-ধমক না-বকুনি, হেসে হেসে খোসমেজাজে বলেছিলেন তার বাপকে, "ওহে, শুনছো, তোমার ছেলেটির জুতো দু'খানা বড়ো খাসা তো! দিব্যি নতুন ধরণের! কি বলে ওকে?"

ছেলেটা বুক চিতিয়ে বলে উঠেছে, "বুট!"

'বলেই ভাবছে যদি জিজ্ঞেস করেন কলকাতার কোন্ দোকান থেকে কেনা, একটা বিলিতি

দোকানের নাম করে দেবে চট্‌পট্। চাটুয্যে কিন্তু সে দিক্ দিয়ে যান না। তিনি তেমনি হেসে হেসে বলেন, "হুঁঃ! তাই। তা বাপু, তোমার এই নতুন চালের জুতো পরে অমন পুরোনো চালে হাঁটা তো ঠিক নয়! আমার এই পাইক দু'টোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো দিকি একবার! এরা নতুন চালের হাঁটন শিখিয়ে দেবে।"

'সঙ্গে সঙ্গে দুই পাইক বিছুটির ডাল হাতে নিয়ে তৈরি। পরের কথা তো আগেই বলেছি।'

'এ কিন্তু ভারী অন্যায়!'—আমরা বলি।

মেসোমশাই বলেন, 'অন্যায় আর ন্যায় সবই নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর। বুঝলে? এ শাসন তিনি করলে মানিয়েছিলো, আমি করতে গেলে কি আর মানাবে? না কেউ মানবেই? তাঁর কথার চালই আলাদা ছিলো।—নইলে, ধরো, জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা চলছে, পাঁচ ক্রোশ দূরে সহরে গিয়ে কোর্টে হাজির হ'তে হবে। রাঘব চাটুয্যে সেই শত্রুপক্ষকে সমানে নিজের বাড়ীতে ভাত খাইয়ে নিজের পাল্কীতে চড়িয়ে নিয়ে কোর্টে গেছেন!'

'তার মানে?' আমরা তো অবাক্!

'মানে আর কি! বলতেন, "আমার বাড়ীতে এক প্রহর বেলাতেই পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তৈরী, আর ওরা হয়তো ভাতে ভাত গিলে কোর্টে ছুটবে! এ চলবে না।—যারা যারা সদরে যাবে সবাইয়ের জন্যে এ বাড়ীতে চাল্ নেওয়া হবে।" আর পাল্কী? তারও যুক্তি আছে। বলতেন, "আমার বেহারাগুলো তো হেঁটে মরবেই, আবার ওরা গরুর গাড়ী ভাড়া দেবে কেন?"

'শত্রুপক্ষ রাজী হতো?'

'ওই তো মজা! ওইখানেই মহিমা।'—মিটমিটী হাসতে থাকেন মেসোমশাই।

'শুধু একটি শত্রুপক্ষ ছিলেন দুঁদে। আমাদের রাঙা দাদু। আমার মায়ের কাকা। একমাত্র তিনিই রাঘব চাটুয্যেকে কেয়ার করতেন না। গ্রামের লোক বলতো—সাপে নেউলে। দু'জনেই সমান শরীক্, দু'জনেই দুঁদে।

'সেই রাঙা দাদুর মেয়ের, মানে পুঁটি মাসীর, লাগলো বিয়ে। আমরা তখন ছোট, শুনতে লাগলাম এমন জামাই নাকি এ তল্লাটে আর কখনো কেউ করে নি! রাঘব চাটুয্যের জামাইরা এর কাছে কিস্যু না।

'এ পাত্র কলকাতায় থাকে, ওকালতি পড়ে, বাপের অবস্থা ভালো, দেখতে সুপুরুষ, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের তখন ওসব কথায় অতো মাথাব্যথা ছিলো না, কানে আসতো এই পর্য্যন্ত। আমরা বরং মন দিয়ে শুনতাম ভোজের আয়োজন কতো দূর হবে।

'দেশ বিদেশ থেকে নাকি ময়রা আনানো হবে, সাত দিন ধরে নাকি ভিয়েন হবে, লেডিকেনিগুলো নাকি বাতাবীলেবুর সাইজ আর মিহিদানার দানা সাবুদানার সাইজ হবে, এই সব। আবার নাকি লুচিও হবে! অবাক্ হয়ে তাকাচ্ছিস যে? সেকালে—আমাদের গ্রামে ঘরে অতো লুচি-কুচি ছিলো না।'

'নেমন্তন্ন-বাড়ীতেও না?'—'হাঁ' হয়ে প্রশ্ন করি আমরা।

মেসোমশাই মাথা নেড়ে বলেন, 'না। ভাতই চলতো। তবে কে কতো মিহি আর ভাল চাল

জোগাড় করতে পারে তা'র কম্‌পিটিশন ছিলো বটে। ঢালাও মাছ তরকারী দই মিষ্টি আর সরু চালের ভাতই নেমন্তন্ন। লুচি? সে তো আমাদের কাছে স্বর্গীয় ব্যাপার ছিল!

'তার আগে আমরা, ছোটরা, কখনো লুচি খাই নি, তাই আগামী লুচির আলোচনাতেই বিভোর থাকতাম। কে কোথায় কার শত্রুতা করতে কি কলকাঠি নাড়ছে, কি ধার ধারি তা'র?

'অবশেষে এলো বিয়ের দিন।

'আর বলবো কি, সকাল থেকে যেন আকাশ ভেঙে নামলো বর্ষা! বর্ষাকাল, বৃষ্টি ক'দিন ধরেই চলছিলো; কিন্তু সে দিন একেবারে রীতিমত ভয়াবহ।

'বড়রা সকলে বলাবলি করতে লাগলেন, "রাঘব চাটুয্যেকে আর শত্রুতা করতে হবে না, স্বয়ং ভগবান্‌ই নিজের হাতে সে ভারটা নিয়েছেন।"

'আমরা দেখলাম, রাঙা দাদু বিপন্ন মুখে নানাদিকে ছুটোছুটি করছেন। রাঙা দিদিমা অবিরত কাঁদছেন। আমার মা-মাসীরা এবং আরো অনেক গাদা গাদা মেয়ে শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেটাছেলেরা বিস্তর ডাকহাঁক করছেন। কারণ কি?

'না—রাত্তিরে বৃষ্টি পড়ে আটচালার চালা ভেদ করে সমস্ত মিষ্টি নাকি ভিজে থৈ থৈ করছে!

'ভেবে দেখ আমাদের মনের অবর্ণনীয় অবস্থা!

'এর মধ্যে কে এসে খবর দিলো রাঘব চাটুয্যে নাকি ভোরবেলায় কোথায় ভিন্ গাঁয়ে গেছেন।

'শুনে মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন রাঙা দাদু। আর কিছু নয়, নিশ্চয় পাত্র পক্ষকে ভাঙচি দিতে সদর ইষ্টিশানে গেছেন। ষ্টেশান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে এই গ্রাম। মাঝে আবার এক নদী! বালু নদী, কিন্তু বর্ষাকালে বেজায় বেড়ে ওঠে। এই পার হয়ে পরের মেয়ের বিয়ের ভাঙচি দিতে যাওয়া! বোঝ!

'আবার একজন এসে বললো—বৃষ্টিতে নদীর জল নাকি হঠাৎ এতো বেড়ে গেছে যে প্রায় একূল ওকূল দেখা যাচ্ছে না। তার ওপর ঘাটে একখানাও খেয়া নৌকা নেই। মাঝিরা সব নো পাত্তা!

'অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ!

'রাঙাদাদু বসে পড়লেন। "খেয়া নৌকো নেই তো—বর বরযাত্রী আসবে কি করে?"

'কি করে তা কে জানে!

'বর যদি এসে না পৌঁছতে পারে পুঁটি মাসী জন্মের শোধ খতম্। কি? কথাটার মানে বুঝতে পারছিস না? সেকালে ওই ছিলো শাস্তর। যে লগ্নে বিয়ে হবার কথা সেই লগ্নে যদি বিয়ে না হলো মেয়ের – তো সে মেয়ের আর জন্মেও বিয়ে হবে না।'

'অ্যাঁ—অ্যাঁ!'

মেসোমশাইয়ের রাঙা দাদুর মতোই 'অ্যাঁ' করে উঠি আমরা। মেসোমশাই টিপি টিপি হাসেন। —শাস্তরের তোরা দেখলি কি? সেকালে যে কতো শাস্তর ছিলো!

'সকলেই বুঝে নিলো—এ আর কারো নয়, রাঘব চাটুয্যের কাজ। যেখানে যতো খেয়া নৌকো ছিলো সব চুরি করে বসে আছেন। বাঃ, পুকুর চুরি হয় আর নৌকো চুরি হতে পারে না?

সবই পারে। রাঘব চাটুয্যে মাঝিদের হুকুম করে দিলে তাদের সাধ্য কি যে নৌকা ঘাটে রাখে? কোথায় দূরে নিয়ে গিয়ে বালির চরায় উল্টে রেখে দিয়েছে!

'নিন্দের হৈ হৈ পড়ে গেলো রাঘব চাটুয্যের। এতো শয়তান মানুষে হয়? ভদ্রলোকের কন্যাদায়, তখনো এই শত্রুতা? এদিকে বৃষ্টিরও বিরাম নেই। নদীর জল বেড়েই চলেছে। বিকেল হয়ে গেলো, আর গোধুলি লগ্নে বিয়ে। আকাশ অবিশ্যি সারাদিনই সন্ধ্যের মতো অন্ধকার, গোধুলির কোনো মানে ছিল না। তবু শাস্তর বলে কথা। রাঙা দিদিমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, লোকে তাঁর মাথায় মুখে জল দিতেও ভুলে গেছে। আমরা উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখছি, পুঁটি মাসী আলপনা-পীঁড়ির ওপর কাঠ হয়ে বসে আছে। ওদিকে নতুন চালায় যজ্ঞির রান্না বসেছিলো, তাকে টুপ্ করে দেওয়া হয়েছে। মাথা-ময়দার তাল আর ভাজা মাছের ঝোড়া নিয়ে বামুনগুলো হাঁড়িমুখে বসে আছে, আর আমরা সমাহিত চিত্তে জলে-কাদায় ছপ্ ছপ্ করতে করতে একবার রান্না-বাড়ী একবার বার বাড়ী আর একবার ভেতর-বাড়ী করে বেড়াচ্ছি। পান্তয়ার গামলাগুলো জলে ভর্ত্তি, তবু ছোট ছেলেদের হাতে দেবার হুকুম নেই, এই আশ্চর্য্য। দে না কেন বাবা, উঠোনে বার করে! আমরা যা পারি করি! তা' নয়!

'সন্ধ্যে বোঝবার উপায় নেই, তবু এ-বাড়ী ও-বাড়ী শাঁখ বেজে ওঠার শব্দে বোঝা গেলো—সন্ধ্যা আসন্ন। আর সেই শাঁখের শব্দে হঠাৎ বিয়ে-বাড়ী সুদ্ধ চীৎকার করে কান্না উঠলো। কেন? না, হয়ে গেলো পুঁটি মাসীর দফারফা! লগ্নভ্রষ্ট হলো বলে। নদীর জল বেড়ে মাঠে উঠেছে। রাতের মধ্যেও ওপার থেকে বর এসে পৌঁছবার আর কোনো আশা নেই।

'ঝড়বিষ্টি, কান্নাকাটি—সে এক ধুন্ধুমার ব্যাপার, আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে – হ্যাঁ খুব মনে আছে, আর একটা প্রবল চীৎকার উঠলো। যেন পঞ্চাশটা ডাকাত পড়লো বাড়ীতে। তাদেরই চীৎকার।

'না, পঞ্চাশটা ডাকাত নয় – একা রাঘব চাটুয্যের গলা। "চুপ! সব চুপ! বিয়ে-বাড়ীতে মরাকান্না তুলেছে!"

'উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন রাঘব চাটুয্যে, জলে টইটুম্বুর!

'রাঘব চাটুয্যের সেই জলে শপ্‌শপে বিরাট মূর্ত্তি জীবনে ভুলবো না! সে যেন ঝড় আর বৃষ্টির একটা প্রতীক।

'সেই চেহারায় কাঁধে গামছা ফেলার ভঙ্গীতে বিরাট একটা মাছ! চমকে উঠছিস? হ্যাঁ, তা আমরাও প্রথমে অমনি চমকে উঠেছিলাম। মাছটা মাছ নয় দেখে। না, মাছ নয়, জিনিষটা হচ্ছে ওই বিয়ের বর! চোখ গোল্লা করে ফেলছিস—মানে?

'বেগুনি রঙের বেনারসীর জোড় পরে বড়ো আহ্লাদ করে বিয়ে করতে এসেছিলেন বাছাধন! সেই জোড় ভিজে লেপটে একেবারে মাছের আঁশ। নিজেও ছোকরা প্রায় অজ্ঞান হয়ে লটপটিয়ে সেঁটে ছিলো রাঘব চাটুয্যের কাঁধে।

'ব্যাপার জানবার জন্যে, বুঝতেই পারছো, তখন কী হৈ চৈ! রাঘব চাটুয্যে বজ্রকণ্ঠে হুকুম দিলেন, "সব চুপ। কথা পরে—আগে বিয়ে। ভটচায! লাগাও।"

"বরের ভিজে কাপড়?"

'থাক ভিজে! বিয়ের বর, সে এখন আবার ভিজে ছেড়ে পরবে কি? বেনারসীর জোড় তো চাই। তা ছাড়া - সময় কোথা অতো? সেই পচা শিঙিমাছের মতো ভিজে ছেলেটাকে সমানে ধরে থেকে পিঁড়ির ওপর খাড়া বসিয়ে রাখলেন রাঘব চাটুয্যে। পুঁটি মাসী তখন ঢুলছে। ভটচায সুরু করে দিলেন মন্ত্রপাঠ। আর আমরা— কলকাতার বরের দুর্গতি দেখে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলাম। অবিশ্যি হাসির আরও একটা উৎসও ছিলো রান্নাবাড়ীতে।

'নিভন্ত উনুনে কাঠ ঠেলে ঘিয়ের কড়া চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দেখে এসেছি।

'ব্যাপারটা কি?

'পরে সবাই শুনতে পেলো।

'রাঘব চাটুয্যের এক মামা মর মর শুনে, নদী পার হয়ে ভিন্‌গাঁয়ে গিয়েছিলেন চাটুয্যে, মামাকে দেখতে। যাবার সময়ই আকাশের অবস্থা দেখে ঘাটের মাঝিগুলোকে হুকুম দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন— "সব ব্যাটারা এইবেলা ওপারে গিয়ে বসে থাক গে। ও-বাড়ীর ছোট কর্ত্তার আজ মেয়ের বিয়ে। কলকাতার বর, বরযাত্রীরা যেন এসে বিপদে না পড়ে। আর মেয়েটার বিয়ে না পণ্ড হয়।" অতএব মাঝিরা তাই গিয়ে বসে আছে সকাল থেকে। বোঝো, এই মানুষকে অপবাদ দেওয়া হচ্ছিলো নৌকো চুরির!

'তার পর? নৌকোগুলোর হলো কি?

'চারখানা নৌকো বরকর্ত্তা আর বরযাত্রী বোঝাই হয়ে ওপারে আটকে বসে আছে। নদীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখে কলকাতা সহরের লোকেরা কিছুতেই ছাড়তে দিতে রাজী হচ্ছে না। সন্ধ্যেমুখো রাঘব চাটুয্যে ফিরছিলেন, ঘাটে এসে দেখেন ওই অবস্থা। পাত্রপক্ষকে অনেক মিনতি - অনেক হাতজোড় করেছেন, অভয় দিয়েছেন— এখানের মাঝিরা বিশেষ সুদক্ষ বলে, তারা কিন্তু অটল। "ছেলের বিয়ে দিতে এসে কি প্রাণ খোয়াবে? মেয়ের লগ্নভ্রষ্ট হলো তো তাদের কি?"

'শেষ পর্য্যন্ত ধমকও দিয়েছিলেন রাঘব চাটুয্যে, তাতে তারা মহা রাগারাগি করতে সুরু করেছিলো। অতঃপর রাঘব চাটুয্যে—আচ্ছা, তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি,—"দেখলাম তখন ব্যাটাদের সায়েস্তা করতে বসলে বিয়ে পণ্ড হয়। ভাবলাম, আচ্ছা, থাকো। পরে দেখাচ্ছি মজা! বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পাত্তরটাকে নিলাম নৌকো থেকে ছিনিয়ে। ব্যস্, পিঠে ফেলে সোজা সাঁতরে পাড়ি! থাক তোরা প্রাণ নিয়ে বসে, আমাদের কন্যাদায় তো উদ্ধার হোক। পেছনে চার নৌকো লোকের 'রে রে রে রে' শব্দ, আমি এদিকে জয় মা কালী বলে সাঁতরাচ্ছি প্রাণপণে, যাতে লগ্নটা না ভ্রষ্ট হয়।"

'রাঙা দাদু দু' হাতে রাঘব চাটুয্যের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলেন, "দাদা, আপনি দেবতা!"

'রাঘব চাটুয্যে হা হা করে হেসে উঠে বললেন, "মতলবটা কি হে? ওই ছুতোয় মামলাটা ফাঁসাতে চাও নাকি? মামলা চলবে ঠিকই, বুঝলে ছোট কর্ত্তা? এটা হলো পুঁটু মায়ের ব্যাপার! সম্পর্কে আমি ওর জ্যাঠা হই মনে রেখো!" আশীর্ব্বাদ করতে হবে। সঙ্গে কিছু নেই। নিজের হাতের দু'টো আঙটি খুলে বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করলেন রাঘব চাটুয্যে। তার পর বর যখন বাসরে

বসেছে, বৃষ্টির জোর কমেছে, তখন সেই চার নৌকো বরযাত্রী এসে পৌঁছলো। তারা তো অতো ভিজেও ভেজে নি, এসেছে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে। পাছে গোলমাল করে তাই দাঁড়িয়ে তদ্বির করে আর ধমকে-ধামকে সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় নিলেন রাঘব চাটুয্যে। রাত তখন ভোর হয় হয়।

'রাঙাদাদু হাতযোড় করে বললেন "দাদা, অপরাধী করে রেখে গেলেন, পুঁটির বিয়েতে এসে এক ফোঁটা মিষ্টিমুখ করলেন না?"

'রাঘব ধমকে উঠলেন, "মিষ্টিমুখ? পুঁটির বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিলি আমায়?"

'রাঙাদাদু তো, বুঝতেই পাচ্ছো তোমরা, যাকে বলে লজ্জায় অধোবদন। বোধ করি দয়া হলো রাঘব চাটুয্যের, বললেন, "ওহে নাস্তিক ছোকরা, খেয়াল আছে সন্ধ্যের আগে থেকে এই ধুন্ধুমার চলছে? সন্ধ্যে-আহ্নিক করবার ফুরসৎ পেয়েছি? মিষ্টিমুখ, সে কালকে তখন দেখা যাবে। ওই সহুরে শয়তানগুলো যতোক্ষণ না গ্রামছাড়া হচ্ছে, নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকতে পারবো না। কে জানে আজকের রাগ কাল বর-কনে বিদেয়ের সময় তুলবে কিনা! সকাল হলেই চলে আসছি আমি।"

'শুনলি তো মানুষের গল্প?'

মেসোমশাই থামতেই আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠি, 'আর আপনারা কি করলেন?—আপনারা? খেয়েছিলেন লুচি দেওয়া নেমন্তন্ন?'

মেসোমশাই হতাশভাবে দুই হাত উল্টে বলেন, 'এই দেখো, তোরা এতো বোকা! সেও কি আবার জিজ্ঞেস করে জানতে হয়?'

শুভ লগন

স্বপনবুড়ো

সবাই যখন স্রোতের জলে তার তরণী বায়—
আমায় কেন বসিয়ে রাখো ঘাটের কিনারায়?
শুনি স্রোতের কুলুধ্বনি,
তীরে বসে প্রহর গণি,
তাদের দেহে অকারণেই পুলক উছলায়!

অশথ-তলের শীতল ছায়ায় নাই যে স্রোতের ধারা
কবে আমায় ঢেউয়ের তালে করবে বাঁধনহারা?
জোয়ার জলের পরশ পেয়ে
ঘুমন্ত মন উঠ্‌বে গেয়ে—
সেই লগনে তুলবো যে পাল আমার ভাঙ্গা নায়!

নালন্দা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

নালন্দা ভ্রমণের গল্প আগে তোমাদের কিছু কিছু বলেছি। এবারে আবার শোন। আগে প্রাচীন নালন্দা সম্বন্ধে খানিকটা বলে নিই।

বুদ্ধ নাকি এক সময় বলেছিলেন, যে, কোন এক পূর্বজন্মে বোধিসত্বরূপে তিনি নালন্দায় জন্মেছিলেন।

বোধিসত্ব এখানকার রাজা হ'ন। প্রজাদের দুঃখ তিনি দেখতে পারতেন না, সর্বদাই মুক্তহস্তে তাদের দান করতেন। সেই অবারিত দানের জন্যই এখানকার নাম হয় নালন্দা ন + অলম্ + দা - নালন্দা।

নালন্দায় এই শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার মূল পরিকল্পনা প্রথম করেছিলেন সম্রাট্ অশোক। মহামতি অশোক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ও বৌদ্ধধর্ম চর্চার জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। এই নালন্দা বিহারের পত্তনও নাকি তাঁরই কীর্ত্তি। সেই জন্যই এর নাম হয়েছিল নরেন্দ্র বিহার। কালে লোকের মুখে মুখে 'নরেন্দ্র' 'নালন্দায়' রূপান্তরিত হয়েছে।

এই স্থানটি অশোক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য নির্বাচন করেছিলেন শুধু খেয়ালের বশে নয়,— বুদ্ধের মহাজ্ঞানী ও মহাগুণী দুই শিষ্য সারীপুত্ত ও মোগ্গল্যায়ন ছিলেন এইখানকারই বাসিন্দা, এবং বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে পাণ্ডিত্যে তাঁদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। তাই বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র ধর্মানুরাগী অশোক প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এই নালন্দাতেই।

মোগ্গল্যায়ন যখন রাজগৃহে দেহত্যাগ করলেন, সারীপুত্ত তখন নালন্দায়। দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গতা ছিল যমজ ভাইয়ের মত। বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ যখন সারীপুত্তের কাছে এসে পৌছালো সারীপুত্ত সে আঘাত সইতে পারলেন না, তিনিও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সারীপুত্তের সেই সমাধিভূমিতে মহামতি অশোক মহাসমারোহে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন; সেখানে নিয়মিত ভগবান্ বুদ্ধের পূজা-অর্চনা করা হতো।

আবার কেউ কেউ বলেন যে ভগবান্ তথাগত বুদ্ধ এখানে আসতেন, দুঃখক্লিষ্ট শোকার্ত নরনারীদের তিনি সান্ত্বনা দিতেন, ধর্মোপদেশ দিতেন। তাঁর অমৃতময় বাণী শুনে কত তাপিত নরনারী সান্ত্বনা লাভ করতো। কেউ কেউ আবার তাঁর কাছে দীক্ষাও গ্রহণ করতো। সেই জন্যই এখানকার গ্রামবাসীরা এই স্থানটির নাম দেয় 'নালন্দা'।

আবার অন্য লোকে বলেন যে এখানে নাকি প্রকাণ্ড এক দীঘি ছিল, সেই দীঘিতে অনেক সাপ ছিল। তাদের মধ্যে যে সাপটি ছিল সবচেয়ে বড়, লোকে তার নাম দিয়েছিল 'মহানাগ'। এই মহানাগের নাম থেকেই এ অঞ্চলের নাম ছিল 'নাগ-নন্দ'। তা থেকেই পরে হয় নালন্দা।

সে যা হোক্, আমাদের তো কথাই আছে—'নাস্তি মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।'— যত মন তত মত। তবে এ কথা ঠিকই যে এখানকার পল্লীর শোভা তখন ছিল চিত্তহারী নয়নাভিরাম। এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তখন শুধু বুদ্ধদেবকেই মুগ্ধ করে নি, মুগ্ধ করেছিল তাঁর সঙ্গী অনুগামীদেরও। বুদ্ধ যখন মহাপরিনির্বাণের স্থান নির্বাচনের কথা তুলেছিলেন, তখন কথায় কথায় আনন্দ বলেছিলেন, আপনি লুম্বিনীর মনোরম উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নালন্দার মনোরম আম্রকাননেই আপনার মহাপরিনির্বাণের উপযুক্ত স্থান।

এ থেকেই নালন্দার মনোরম পরিবেশের কথা কিছুটা ধারণা করা যাবে।

সম্রাট্ অশোকের পরে আরো অনেক রাজা বৌদ্ধ স্থবিরদের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বৌদ্ধ নীতির ভক্ত হয়েছিলেন। বহু রাজা-মহারাজার দানে নালন্দা সমৃদ্ধি লাভ করে। বিশেষ করে এটি উত্তর ভারতের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠে গুপ্ত সম্রাট্দের আমলে।

সেদিনের নালন্দা মহাবিদ্যালয়ে দশটি মহল ছিল। এই দশটি মহলে তিনশো ঘর ছিল। অধ্যাপনার জন্য আটটি বড় বড় কক্ষ ছিল। ছাত্র ও শিক্ষকেরা সেখানে থাকতেন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। খাওয়া-পরার জন্য তাঁদের চিন্তা করতে হতো না। মগধ-সম্রাট্গণ প্রায় দু'শো গ্রাম দান করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে। তারই আয় থেকে এখানকার মহাবিদ্যালয়ের খরচ চলতো।

শুধু রাজা-মহারাজাই ন'ন, বৌদ্ধ-আচার্য নাগার্জুনের এক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন

সুবিষ্ণু। তিনি একশো আটটি বিহার নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন এইখানে। সে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের কথা। তখনই নালন্দার গৌরব উত্তর ভারতে খ্যাতিলাভ করেছে।

সুবিষ্ণুর মত ছোটবড় অরো কত ধর্মানুরাগীর অর্ঘ্যে এই শিক্ষানগরীটি সমৃদ্ধ হয়েছিল। আজ আর তার কোন পরিচয় কোথাও নেই।

নালন্দা বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে গুপ্ত সম্রাট্‌দের আমলে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে অষ্টম শতক অবধি ছিল এই গৌরবের যুগ। এই সময় এখানকার শিক্ষা-কেন্দ্রে পর পর কয়েকজন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতের সমাবেশ হয়। অসঙ্গ, বসুবন্ধু, জয়দেব, চন্দ্রকীর্তি, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভাকরমিত্র, জিনমিত্র, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, জ্ঞানচন্দ্র, শীলভদ্র প্রভৃতি মনীষীর নাম এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে।

স্বনামধন্য অধ্যাপকদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় নাগার্জুনের। নাগার্জুন ছিলেন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক। কথিত আছে তিনি নাকি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পারদ থেকে সোনা তৈরী করতে পারতেন। এইভাবে সোনা তৈরী করে, সেই অর্থ দিয়ে শস্য কিনে, তিনি নাকি একবার কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনগণের মুখে অন্ন জোগান। এ কথা কতদূর সত্য তা আজ আর কেউ জানে না।

নাগার্জুনের মত পণ্ডিত তখনকার দিনে উত্তর ভারতে আর ছিলেন না। যিনিই তাঁর সংস্পর্শে আসতেন তিনিই তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করতেন। তাঁর সময় মহাযান ও হীনযানপন্থীরা সাধারণের চোখে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিল, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। নাগার্জুন তা রোধ করেন। সুবিষ্ণু নাগার্জুনেরই ব্রাহ্মণ ছাত্র। নাগার্জুনেরই অনুরোধে নালন্দায় সুবিষ্ণু একশো আটটি বৌদ্ধ মন্দির তৈরী করে দেন। মহা সমারোহে সেখানে নিত্য পূজা-অর্চনা চলতে থাকে, তার ফলে বৌদ্ধদের প্রতি সাধারণের মন কিছুটা প্রসন্ন হয়।

আর্যদেব ছিলেন চতুর্থ শতকে মস্ত বড় দার্শনিক, তিনি নালন্দায় অধ্যাপনা করতেন।

পঞ্চম শতকে যোগাচারী অসঙ্গ ছিলেন নালন্দার অধ্যক্ষ। দীর্ঘ বারো বছর ইনি নালন্দায় অধ্যাপনা করেছিলেন।

আচার্য অসঙ্গের পর তাঁর ভাই বসুবন্ধু হ'ন নালন্দার অধ্যক্ষ। এই বসুবন্ধুর কাছেই বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করেন মহামতি দিঙ্‌নাগ। দিঙ্‌নাগ ছিলেন কাঞ্চীপুরের ব্রাহ্মণ। নাগদত্তের কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করে ইনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেন ও নালন্দায় আসেন বৌদ্ধ শাস্ত্র আরো বেশী পড়াশুনা করার জন্য। দিঙ্‌নাগ ছিলেন দর্শন শাস্ত্রে খুব বড় পণ্ডিত, নৈয়ায়িক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। সুতুর্জয় নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তখন এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নিয়ে তর্ক তুলে অনেককে পরাস্ত করে বেশ সুনাম করেছিলেন।

দিঙ্‌নাগের সঙ্গে তাঁর তর্ক বাধে। সুতুর্জয় দিঙ্‌নাগের সঙ্গে তর্ক করে পেরে উঠলেন না, হেরে গেলেন। নালন্দার পণ্ডিতেরা তখন সমাদরে দিঙ্‌নাগকে 'তর্কপুঙ্গব' উপাধি দেন। তারপর দিঙ্‌নাগ্ ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং সব জায়গাতেই দার্শনিক পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করেন। নালন্দার পণ্ডিতেরা তখন তাঁকে 'শিরোভূষণ' উপাধি দেন।

তারপর এলেন ধর্মপাল। কিন্তু সে গল্প আর একদিন বল্‌ব।

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥"—চৈঃ চঃ

দাস রঘুনাথ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এই রঘুনাথ ছিলেন সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র। সেই সময়ে সপ্তগ্রাম ছিল ভাগীরথীর তীরে অতি উন্নত একটি বাণিজ্য-বন্দর। সমস্ত বাংলা ও পূর্ব্বভারতের বাণিজ্য চলিত এই বন্দরের মধ্য দিয়া। এ হেন সমৃদ্ধিশালী স্থানের মালিক ছিলেন দুই ভাই হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস। তাঁহাদের জমিদারীর আয় ছিল বার্ষিক বিশ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ কালের হিসাবে প্রায় এক কোটি। যেমন ছিলেন তাঁহারা ধনবান্, তেমনি ছিলেন পূতচরিত্র,

বিদ্বান্ আর দাতা। তাঁহাদের দানশীলতা তখন গৌড় বঙ্গে প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। লোকে বলিত 'গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা'।,

দুই ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্য দাসের কোন সন্তান ছিল না, কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের একমাত্র পুত্র বালক রঘুনাথ তখন কুলগুরু বলরাম আচার্য্যের গৃহে থাকিয়া পড়াশুনা করেন।

একদিন বিকাল বেলা গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়া রঘুনাথ সাধু হরিদাসের দেখা পাইলেন। হরিদাস তখন তাঁহার আগের আশ্রম বেনাপোল হইতে চাঁদপুরে আসিয়া বলরাম আচার্য্যের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। তিনি রঘুনাথকে চিনিতেন। একবার বলরামের সঙ্গে দাস ভ্রাতৃদ্বয়ের সভায় গিয়া হরিনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সময় হরিদাস রঘুনাথকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন এই বালক সামান্য মানুষ নয়,—'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি'।

তারপর আবার গঙ্গাতীরে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। রঘুনাথকে দেখিয়াই হরিদাসের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি স্নেহকরুণা-পূর্ণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া প্রসন্ন চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"হরিপদে মতি হউক তোমার।" ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কি একটা অদৃশ্য শক্তির প্রবল তরঙ্গ রঘুনাথের হৃদয়ের মধ্য দিয়া বহিয়া গেল, কি যে হইল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। সেই দিন হইতে রঘুনাথের কেমন এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল। কৃষ্ণগুণগান ও কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য প্রাণ অধীর হইয়া উঠে, আর কিছুই ভাল লাগে না।

ইতিমধ্যে হরিদাস চাঁদপুর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, খালি সাধন-কুটীরখানি গঙ্গাতীরে পড়িয়া আছে। অধীর হইয়া রঘুনাথ ছুটিয়া যান সেখানে, শুনিতে পান যেন হরিদাস ভিতরে বসিয়া উচ্চকণ্ঠে হরিনাম করিতেছেন। ভাবাবেশে তিনি বসিয়া পড়েন সেখানে, চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যায়। এই ভাবে কাটিল কিছুকাল। সংসারে মন বসে না সর্ব্বদা যেন কাহার প্রেমমধুর আহ্বান শুনিতে পান—"ওরে, চলে আয়, চলে আয়— ।'

পুত্রের হাবভাব দেখিয়া পিতামাতা ও জ্যেঠা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। শেষে গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী ও গুণবতী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। ভাবিলেন, এইবার হয়তো রঘুনাথের মতির পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

এই সময় মহাপ্রভু নবদ্বীপচন্দ্রের প্রেমে ' শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়—'। গৌরপ্রেমের বন্যায় চারিদিক্ ভাসিয়া যাইতেছে। রঘুনাথের প্রাণ অস্থির হইয়া

উঠিল মহাপ্রভুর চরণ দর্শনের জন্য। তিনি শুনিলেন, সোনার গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন এবং পুরীযাত্রার পথে শান্তিপুরে আসিয়াছেন।

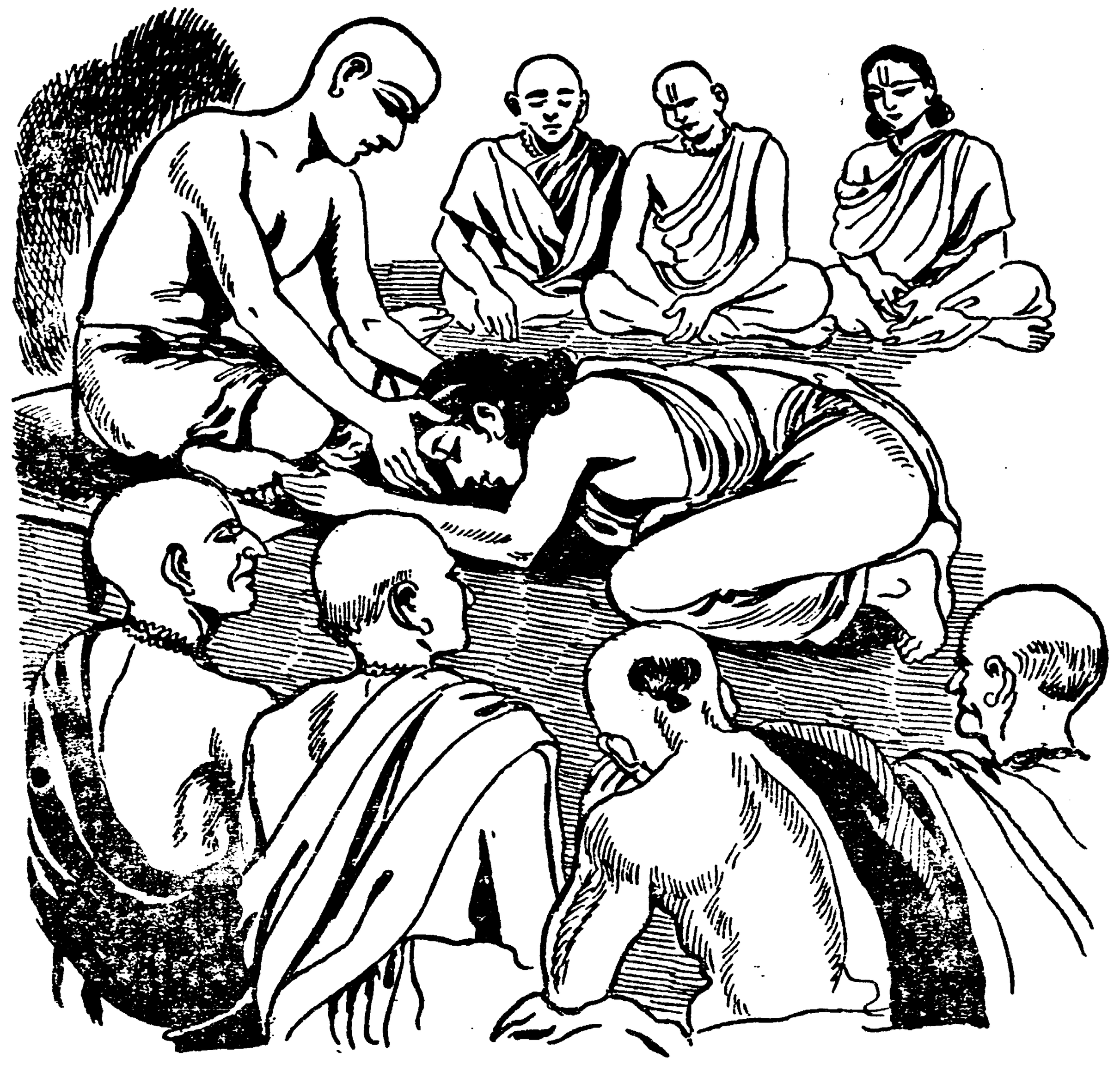

"প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হইয়া।"

এই খবর পাইয়া রঘুনাথ উন্মাদের মত ছুটিয়া গেলেন শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বাড়ীতে ছিলেন মহাপ্রভু। রঘুনাথ সেখানে উপস্থিত হইয়া অদ্বৈত প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে রঘুনাথের পিতা ও জ্যেঠার পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা ছিল। অদ্বৈত রঘুনাথের ভাব দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং মহা সমাদরে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। যথা সময়ে মহাপ্রভুর সঙ্গে রঘুনাথের দেখা হইল। ভক্তমণ্ডলী-পরিপূর্ণ ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন সোনার গৌরাঙ্গ, তাঁহার পদ্মপলাশ চক্ষু দুইটি হইতে যেন বিশ্বের করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে, আর মৃদুমধুর হাসিতে যেন ঝরিতেছে অমিয়—রাশি রাশি। তৃষিত চাতকের মত রঘুনাথ পান করিতে লাগিলেন সেই অমিয়রাশি দুই চোখ দিয়া—পলক পড়ে না।

মৃদু হাসিয়া মহাপ্রভু রঘুনাথকে নিকটে ডাকিলেন। আদেশ পাইয়া রঘুনাথ—

"প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
প্রভুপদ স্পর্শ কৈল করুণা করিয়া ॥"—চৈঃ চঃ

মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া রঘুনাথ কৃতার্থ হইয়া গেলেন। যে কয়দিন মহাপ্রভু

শান্তিপুরে ছিলেন রঘুনাথও সেই কয়দিন সেইখানে রহিলেন। অদ্বৈতের অনুগ্রহে তিনি রোজ মহাপ্রভুর প্রসাদান্ন পাইয়া আনন্দসাগরে ডুবিয়া গেলেন, বাড়ী ফিরিবার কথা মনেও পড়িল না। প্রায় পাঁচ-সাত দিন কাটিল এইভাবে, তারপর একদিন মহাপ্রভু সকলের কাছে বিদায় লইয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। চোখের জল মুছিতে মুছিতে রঘুনাথও বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া রঘুনাথের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। মন কিছুতেই ঘরে থাকিতে চায় না, প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের চরণোদ্দেশে ছুটিয়া যাইতে চায়। মহাপ্রভুর প্রবল আকর্ষণে অধীর হইয়া—

"বার বার পালাল তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥" চৈঃ চঃ

পিতামাতা তাহাকে যাইতে দিবেন না, ঘরের ভিতর নজরবন্দী হইয়া রহিলেন রঘুনাথ। পাঁচজন বিষম সাহসী ও শক্তিশালী পাইক ঘরের চারিদিকে দিনরাত বসিয়া পাহারা দিতে লাগিল।

কিন্তু তারপর ?—সে গল্প আর একদিন শুনাইব।

পুজোর দিনে, এস আমার একটা প্রিয় ম্যাজিক শিখিয়ে দিই।

সাধারণতঃ আমি যে ভাবে খেলাটা দেখাই তাই বলছি। একটা চৌকো খালি কাঠের বাক্স দর্শকদের দেখাই। আমার সহকারীরা এক একটা কাঠের ট্রেতে করে বিভিন্ন

রংএর রঙীন কাগজের খুব ছোট ছোট কুচি নিয়ে আসে। একটা ট্রেতে লাল রংএর কাগজ, একটাতে নীল, একটাতে হলদে, একটাতে সাদা এই রকম। আমি সেই ধূলোর মত কাগজের কুচিগুলো দর্শকদের দেখিয়ে এক মুঠো করে সব রকম কাগজের কুচো ট্রে থেকে নিয়ে বাক্সর মধ্যে রেখে সব একসঙ্গে মিশিয়ে দিই। তারপর আবার বাক্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একে একে রঙীন কাগজের কুচিগুলো আলাদা আলাদা ভাবে বের করে এনে ট্রেতে রেখে দিই। সবশেষে আবার বাক্সটা খালি দেখাই। এতে সকলেই খুব অবাক্ হন।

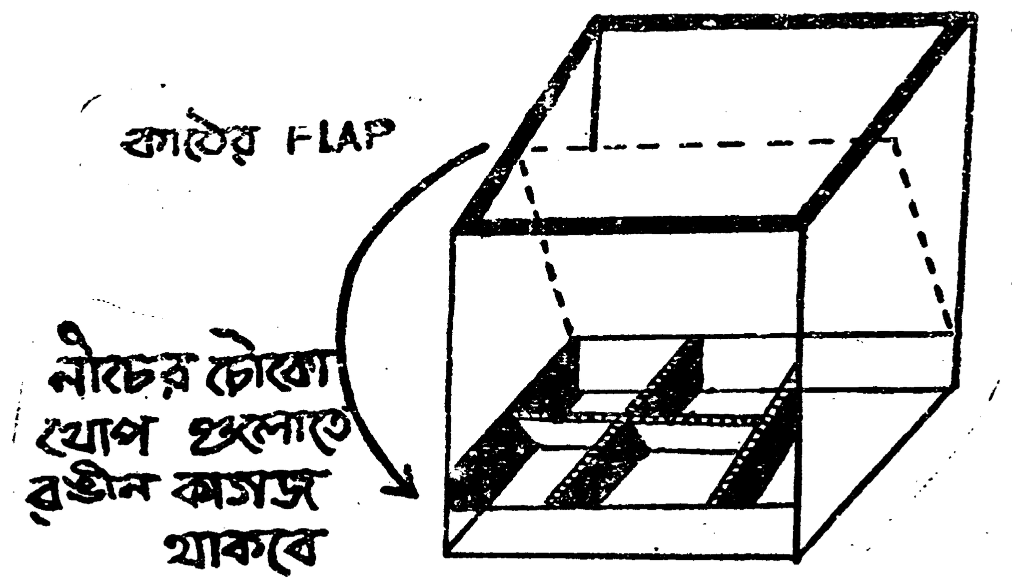

এখন খেলার কৌশলটা তোমাদের কাছে প্রকাশ করছি। তিন পিস্ কাঠ বা কোন পাৎলা কাঠ নিয়ে নীচের ছবির মত একটা বাক্স তৈরী কর। বাক্সটার তলায় কতগুলো চৌকো খোপ থাকবে এবং পাশে একটা বড় খোপ থাকবে। চৌকো খোপটার ঠিক উপরে কব্জা দিয়ে একটা পাৎলা কাঠের 'ফ্ল্যাপ্' তৈরী করতে হবে। এই ফ্ল্যাপ্টা উঠিয়ে নিলে বাক্সের ভেতর দিকে গায়ের সঙ্গে মিশে থাকবে এবং ফ্ল্যাপ্টা ফেলে দিলে তলার খোপগুলো চাপা পড়ে যাবে। স্প্রিং সিস্টেম করে এটা ওঠা-নামার ব্যবস্থা করতে পার অথবা হাত দিয়ে ফ্ল্যাপ্টা তোলা-নামান'র জন্য ফ্ল্যাপের গায় একটা সরু কাঁটা পেরেক মেরে দিতে পার। খেলা দেখাবার আগে এই খোপগুলোর মধ্যে এক এক রংএর কাগজের কুচি রেখে দেবে এবং ডান পাশের বড় খোপটা একদম খালি রাখবে। খেলা দেখাবার সময় বাক্সটা খালি দেখাবার জন্য ফ্ল্যাপ্টা ফেলে দিয়ে কাৎ করে বাক্সটা খালি দেখিয়ে টেবিলে বাক্সটা রাখার সময় আবার ফ্ল্যাপটা তুলে দেবে। ট্রে হ'তে রঙীন কাগজের কুচিগুলো নিয়ে বাক্সের ভিতরে ডান পাশের বড় খোপটার মধ্যে রাখবে এবং ওগুলো ওখানেই মিশিয়ে তুলে দর্শকদের দেখাবে। বাকী অংশ আশা করি আর বলতে হবে না। এখন পাশের খোপ থেকে একে একে পূর্ব্বরক্ষিত কাগজের কুচিগুলো মুঠো করে বের করে এনে ট্রেতে রাখবে। সবশেষে আবার ফ্ল্যাপ্টা ফেলে দিয়ে বাক্সটা খালি দেখাবে। মনে রেখো, বাক্সটা যেন পরীক্ষার জন্য দর্শকদের হাতে দিও না।

গান ভার্সাস প্রাণ

শ্রীআশা দেবী, এম্. এ, বি. টি

বিনুদের রকে বসে কেষ্টমামা প্রথমে কট্ কট্ করে গোটা কতক শক্ত শক্ত ছোলা ভাজাকে কায়দা করে যেন কেমন ভিজে ব্লটিংএর মত নেতিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ বাঁ কানে বাঁ হাতখানা চেপে ধরে উবু হয়ে বসে খপ্ খপ্ করে যেন কয়েকটা মাছি ধরে ফেললে।

: এ আবার কি? তুমি অমন ছট্‌ফট্ করছো কেন ঘোড়ার মত?—বিনু জিজ্ঞাসা করলো।

: রাগ!—বলেই কেষ্টমামা চোখ দুটোকে উল্টে দিলো।

: রাগ? কার ওপর? অবাক্ হয়ে বিনু জিজ্ঞাসা করলো।

: রাগ—মানে, রাগ সঙ্গীত, বুঝলি? উঁচু দরের গান—বলেই কেষ্টমামা সামনের তালগাছটা দেখিয়ে দিলো।

: ওখানে কি? দুটো দাঁড়কাক তো বসে আছে! বিনু ভড়কে গিয়ে বললে।

: দাঁড়কাক? মূর্খ! আমি তোকে উঁচু দরের গানের কথা বললাম। মানে মনে মনে একটা সুর ভাঁজছিলাম। এত বকালে কি গান গাওয়া যায়? মানে, ভাবটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। বলেই হু-হু করে কেঁপে একশো চার ডিগ্রি জ্বর আসার মত হুঁ-হুঁ—হু-র-র-র করে উঠলো। তারপর কাঠি কাঠি আঙ্গুলের নখগুলোর খোঁচা কোন রকমে সামলে নিয়ে একটু মিষ্টি হেসে বললে: তান ছাড়লাম।

বিনু আঙ্গুল দুটোর দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে চোখ দুটো বাঁচিয়ে বললে: অ--ও!

: হ্যাঁ, গান যদি শুনতে হয় তবে আমাদের বাড়ী যাবি। গান কাকে বলে বুঝবি তখন। আমাদের পাড়ার সবাই নাম দিয়েছে সুর-তীর্থ, মানে বাড়ীর চারিদিক্ সুরে ভরা। কেষ্টমামা বিনুকে বেশ ভালো করে অর্থ করে বুঝিয়ে দিলে: রবিবার দিন সকালে যাবি, আমি নিমতলায় দাঁড়িয়ে থাকবো—দেখবি রকমারি গান কাকে বলে।

কেষ্টমামার বাড়ী কাঁঠালপাড়া। কাঁঠালের গন্ধেই হয়তো সেখানে যত রাজ্যের গরু গিয়ে জুটেছে। ষ্টেশনে নেমেই বিনু তা অনুভব করলে। ষ্টেশনের পাশের রেল লাইনের ধারেই কেষ্টমামার বাড়ী। ছুটীর দিন, তাই বিনু একটু সকাল সকালই এসে পড়েছে। ভালোই হবে, বেশ গল্প-সল্প করা যাবে ছুটীর দিনে। পুকুর-টুকুরে স্নান করা যাবে,—দিনটা কাটবে ভালোই। বাড়ীর কোন ঠিকানা কেষ্টমামা বলে নি। শুধু বলেছিল, যে দিকে কতগুলো গরু ছুটে গিয়েই ফিরে আসবে তুই সে পথে নির্ভয়ে

চলে যাবি বুকের পাটা নিয়ে। কারণ আমাদের বাড়ী সুর-তীর্থ। সেখানে সাধ্যি কি গরুর মত অসুর প্রকৃতির প্রাণী ঢুকতে পারে?

বিনু সত্যিই লক্ষ্য করলো, কতগুলো গরু আর বাছুর লেজ তুলে পাগলের মত ছুটেছে। বিনু সাহসে ভর করে এগিয়ে চললো সে দিকে। বাড়ীর কাছে একটা পুকুর, তার পাশে দিগন্তপ্রসারী এক মাঠ। মাঠ পেরুলেই বাড়ী।

হঠাৎ বিনুর কানে একটা তীব্র আর্ত্তনাদ এসে পৌঁছলো। কেউ হয় তো কাঁদছে। কিন্তু বাড়ীর কাছে যেতেই শোনা গেল হারমোনিয়ম্ বাজিয়ে কে গাইছে—"বড় দাড়ীকে বড় বিছানা—আ—আ "

বাড়ীর সামনে যেতেই যেন বুকের ভেতর কেঁপে উঠলো। কোথায় বা নিমতলা, বিনু তো প্রায় কেওড়াতলায় এসে হাজির মনে হচ্ছে! দরজা খুলেই আবার ধপ্ করে বন্ধ করে দিতেই কে যেন খপ্ করে তার হাত চেপে ধরলো। বিনু চেয়ে দেখে—কেষ্টমামা।

: চল্, আমার বোন নেড়ীর গান শুনবি। বলে হিড় হিড় করে টেনে বিনুকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল কেষ্টমামা।

একটা মশারি টাঙ্গানো, তার মধ্যে একটা এলার্ম-দেওয়া ঘড়ি সামনে রেখে নেড়ী পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে - "বড় দাড়ীকে বড় বিছানা - আ—আ "

: বাপ্ রে, বড্ড চেঁচায়!

: না চেঁচালে কি ভালো গান হয়? এ আর কি, চেঁচান আমার কাকা। তিনি মালসী গান করেন কিনা। শোনাব এখন—

: রক্ষে কর। আমি কিন্তু এখুনি যাব আর—

: যাবি কি রে? গান তো মোটে শুনলিই না!

: আর শুনে দরকার নেই —বলে বিনু দুই কানে হাত দিলো।

: বোস বোস। বলে একটা চেয়ার টেনে কেষ্ট মামা তাকে বসিয়ে দিয়ে হাতের ওপর পাখা দিয়ে একটা আওয়াজ করতেই নেড়ী ফের সেই দাড়ীর গান বিরাট হাঁ করে চিলের বাচ্চার মত চেঁচিয়ে সুরু করলো।

: বাবা! উনি এত চেঁচান বলেই ওঁর মাথার সব চুলগুলো ঝরে গেছে শুকনো পাতার মত।—বিনু বললে।

: আবার গজাবে কিছুদিন পর।—ও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যখন অসুস্থ হয়ে পড়বে তখন কচি ঘাসের মত মাথা ভরে আবার ছুঁচের মত চুল গজাবে।

: উনি মশারির মধ্যে বসে গান গাইছেন কেন?—উঠে দাঁড়িয়ে বিনু বললে।

: মুখে পোকা-মশা ঢুকে পড়ে যে! ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে ও রাত থাকতে উঠে

প্র্যাক্‌টিস করে কিনা ! কাজেই মশারি না টাঙ্গালে হয়তো গানের লোভে পায়ে স্যাপেও কামড়ে দিতে পারে —

ঃ আমার বড় মাথা ঘুরছে, আমি কানে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আমি এক্ষুনি যাব, শরীর বড় খারাপ লাগছে।— বলার সঙ্গে সঙ্গে নেড়ী "দাড়ী়" ওপর এমন এক গিটকিরীর কাজ সুরু করলে যে দেওয়ালের ওপর একটা হুলো বসে ঝিমোচ্ছিল, সে হুড়মুড় করে জলের কুঁজোর ওপর পড়লো, আর সেটা জল শুদ্ধ ধপাৎ করে বিনুর মাথায় এসে পড়তেই সে বাবা রে—মা রে করে একলাফে একেবারে গেটের কাছে।

বেরুতে যাবে, কে যেন দৃঢ় ভাবে হাত চেপে ধরলো। ঃ কোথায় যাচ্ছো গান না শুনে ?—ওকে ধর কেষ্টা !—চল, মাঠে গিয়ে গান করি। বলতে বলতে লোকটি, মানে, কেষ্টর কাকা, ওকে একেবারে টেনে মাঠের মাঝখানে নিয়ে বসলো।

সূর্য্য তখন উঠছে। এক গাদা গোবরের ওপর পড়ে বিনু বললে ঃ আমায় ছেড়ে দাও, আমি সত্যিই সামনের রবিবারে এসে গান শুনে যাব, কথা দিচ্ছি। তোমার পায়ে ধরি কেষ্টমামা !— বলতে বলতে কেষ্টমামার জ্যাঠামশায়ও এসে একেবারে বিনুর শার্টের কলার চেপে ধরলেন,— ওহে ছোকরা, এলেই যদি, আমার ধামার না শুনে যাবে কোথায় ? বলি শুনেছ কোনদিন ? বসে বসে শুধু কাঁদবে—স্রেফ্‌ কাঁদবে।

ঃ এখুনি কাঁদছি জ্যাঠামশায় ! - গান আর একদিন শুনবো – নিশ্চয় ! হাবুদাকে সঙ্গে নিয়ে আসবো। সে খুব জোয়ান লোক কিনা–। আজ ছেড়ে দাও আমায় কেষ্ট মামা,—সত্যি বলছি !

ঃ তা হয় না হে ছোকরা !—গান গাইতে বসলে শ্রোতা না হলে চলে ? আজ— আজ দু' বছর পর তোমাকে পেয়েছি ! - বলেই দু'জন দু'ধারে বসে তানপুরো নিয়ে গান ধরলেন। এ যদি করে হাঁও – ও করে ভোউ— ! যেন দুটো বুলডগের ঝগড়া। এ যদি বলে - দে রে—দে— রে দা—ও, ও বলে নে—নে—নে—নাও।

বিনুর আর আজ বাঁচা নেই। মাথায় তখন রক্ত গেছে চড়ে। সে হঠাৎ বোঁ করে দু'জনের মধ্যে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ে পা ছুঁড়তে লাগলো।

ঃ রাম - রাম !—জ্যাঠামশায় বললেন।—কোথা, থেকে একটা রোগা পটকা রুগী ধরে এনেছিস্‌ ?

ঃ দে কেষ্টার কান ছিঁড়ে।—কাকা বললেন। আর দু'জনে মিলে কেষ্ট মামার দু'টি কান ধরে দু'দিক্‌ থেকে যেই টানতে সুরু করেছে অমনি বিনু দেখলে পোঁ—করে নৈহাটী লোকাল ষ্টেশনের দিকে আসছে।

এই সুযোগ। হঠাৎ সে এক লাফে উঠে চোঁ করে এক দৌড়।

ঃ পাকড়ো—পাকড়ো ! ভাগতা হ্যায় !—বলে কাকা আর জ্যাঠামশায় যেই বিনুকে ধরতে যাবেন অমনি দেখা গেল সঙ্গীতরসিক সেই মাঠের শ্যামলী, ধবলী, লালী একেবারে শিং নেড়ে, হাম্বা রাগিনী ধরে মনের সাধ মিটিয়ে ছুটেছে পেছনে ; জ্যাঠামশায় আর কাকাও কাটা ঘুড়ির মত ছুটছেন। আর কেষ্ট মামাও গরুর দড়ি ধরে, তাদের থামাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে, তাদের টানে ছুটে চলেছে !

ঝুক্‌—ঝুক্‌ করে গাড়ীটা বেরিয়ে যেতেই বিনু গলা বের করে বললে ঃ আজ কাকাবাবু, ওদেরই গান শোনান, সামনের রবিবারে আমি ঠিক আসবো।

একটা আগুন-ভরা দৃষ্টি দিয়ে গাড়ীটাকে দেখে নিয়ে কাকা আর জ্যাঠামশায় বললেন ঃ সামনের রবিবারে তোর কান দু'টো ছিঁড়ে দেব, দেখিস !

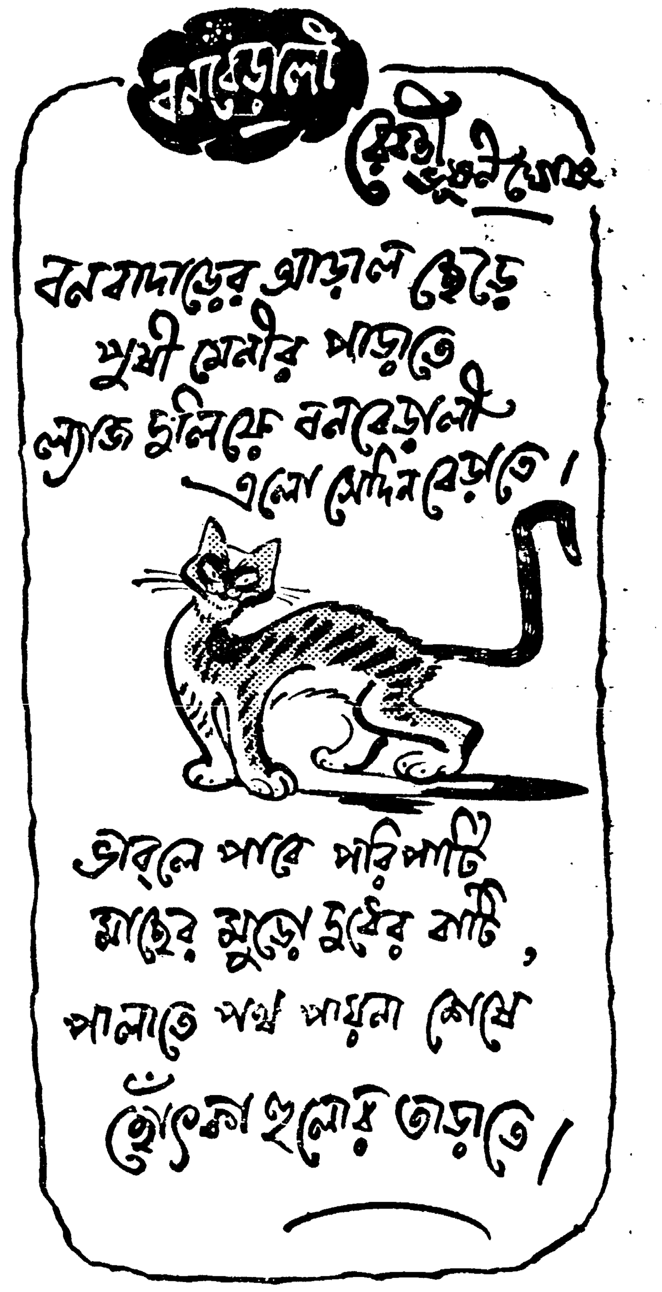

অমুর অভিযান

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

সেবার গয়ায় অমু গেল একটু বেড়াতে,
নেমেই দেখে লড়াই করে তিনটে ভেড়াতে।
ঘোড়ারা সব ডাকছে চিঁ হিঁ,
লোকের কথাও নয় যে মিহি,
টাঙ্গাওলার টানাটানি চায় সে এড়াতে।

এগুলো যেই—পথ আগুলে পাণ্ডা বাহিনী,
বলতে হবে তাদের যে রে বংশ-কাহিনী।
কোন্‌ সে জেলা, কোথায় বা গ্রাম,
পিতামহের কী ছিল নাম —
ধরল নাকের ডগায় নামের খাতা যে আনি !

অমুর গায়ে সাহেবী সাজ, কাঁধে ক্যামরা,
তাই ত' বিশেষ করতে কাবু পারল না এরা।
রিকসা চড়ে এঁকেবেঁকে
রামশিলাকে ডাইনে রেখে,
ভারত সেবাশ্রমে গিয়ে বাঁধল সে ডেরা।

হাঁটতে হাঁটতে চলছে অমু গয়া সহরে,
ব্রহ্মযোনি পাহাড় দেখে বেজায় বহরে।
ফল্গু নদী দেখে নিয়ে
বিষ্ণু পাদপদ্মে গিয়ে
ভিড়ের চাপে চেপ্টা হয়েও প্রণাম সে করে।

প্রেতশিলাটা অনেক দূরে,— ছম্‌ছমে যে নাম,
অমু বলে, ‘দূরের থেকে, প্রণাম রাখিলাম।’

তুলোট মেঘের ভাসছে ভেলা
শরতের এই দুপুর বেলা,
এই ত’ সময় যাবার যে রে বুদ্ধগয়া ধাম।
মন্দির কি গগন-ছোঁয়া চোখের সমুখে,
অশোক রাজার কীর্তি আজো বয় সে যে বুকে।
তথাগতের পুণ্য-স্মৃতি,
‘মার’ বিজয়ের মধুর গীতি
বোধিদ্রুমের ছায়ায় যেন বাজছে রে সুখে!

পূজোর চিঠি

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

ছোড়দা লিখেছে পূজোর কবিতা, ছোড়দি লিখছে ছড়া,
আকাশ কী নীল! টুটুলের চলে নামতা কি আর পড়া?
ধারাপাত ফেলে চুপি চুপি তাই শিউলি-তলায় যায়,
হিজিবিজি ক’রে কাঁচা হাতে চিঠি লিখছে দুর্গা মায়।
—মাগো, তুমি আনো বাবলুর তরে একগাল সোনা হাসি,
ঘ্যান ঘ্যান করে নাকে-কাঁদা ওর দেখতে না ভালবাসি।
ছোড়দার বড়ো দেমাক বেড়েছে—ভারি তো পদ্য লেখে—
কলমটা তার ছুঁয়েছি একটু, তেড়ে আসে তাই দেখে।
মুটকী ওদের দু’ চোখের বিষ ছোড়দির বড়দির,
এক-আধটু মাছ চুরি করে, তাই তাড়নায় অস্থির।
পেট ভরে যেন বাছাটি আমার দুধুভাতু খেতে পায়,
পূজোর দিনেতে ভালো খাওয়া পেতে সবারি ইচ্ছা যায়।
নন্তকে নিয়ে বড়ই দেখছি সোহাগ যে সবাকার,
আস্কারা দিয়ে মাথায় ওঠায়— মজা টের পাবে তার।
দেড় বছরের এক ফোঁটা ছেলে চলে সবে ওর মতে,
মাগো, ব’লো বড়দিকে মোর ’পরে একটু নরম হতে।
সেজদি লিখলো মধুপুরে যেতে, মেজদিরও চিঠি পাই,
মণ্টুকে কথা দিয়েছি থাকবো, কথার মূল্য নাই?
থাকবো এবং ঘুরবো দেদার। তাই লিখি এই চিঠি,
এবার কিন্তু খিষ্টিকে তুমি আনবে না, লক্ষ্মীটি!

নতুন বই

পূজোর ভিড়ে এবং তার আগে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর বই বেরিয়েছে ছোটদের জন্য। তার কয়েকখানির কথা আজ বলি।

ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর আড়াই হাজার বচর পূর্ণ হওয়ায় ইদানীং তাঁর সম্বন্ধে ছোট-বড় যে সব বই বেরিয়েছে তাদের সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ছোটদের বুদ্ধ’। অল্প কথায়, স্বচ্ছ, মিষ্টি ভাষায় গুছিয়ে লেখা বইখানি পড়লে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাবে। শেষ দিকে জাতকের কয়েকটি গল্প যোগ করায় বইটি আরও লোভনীয় হয়েছে। রূপসজ্জা সুরুচিপূর্ণ; মুখপত্রে নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিখানিও চমৎকার।

জীবনী-সাহিত্যে আর একখানি ছোট্ট কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘লোকমান্য তিলক’। যে তেজস্বী মহামানব উদ্ধত বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সগর্বে মাথা তুলে বলেছিলেন “স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার”—তাঁরই পুণ্য জীবনকথা অল্প কথায়, সহজ-সুন্দর ভাষায় পরিবেশন করা হয়েছে এই বইতে। বড় বড় হরফে পরিষ্কার ছাপা, বেশ আরামে পড়া যায়।

বাংলায় ছোটদের জন্য ভ্রমণ-কাহিনী খুব বেশী লেখা হয় নি, তাই শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধরের ‘মন্দিরে মন্দিরে’ এদিক্ দিয়ে শিশুসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান সন্দেহ নেই। মন্দিরের দেশ দক্ষিণ ভারত—কন্যাকুমারী পর্যন্ত যেখানে যাও শুধু মন্দির আর মন্দির। আর কী অদ্ভুত তাদের কারুশিল্প! অপরূপ ভঙ্গীতে, অনবদ্য ভাষায় তারই কথা লেখা হয়েছে এই বইতে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব মন্দির ও বিগ্রহ উপলক্ষ্য করে যে সব পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী প্রচলিত তাও শুনিয়েছেন লেখক। গত বছরকার রামধনুতে যখন এই সব কাহিনী প্রকাশিত হয় তখন পাঠকেরা প্রচুর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, বইএর আকারে পেয়ে তাঁরা আরও খুসী হবেন নিশ্চয়। মলাট, ছাপা, কাগজ বইএর সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। প্রথম দিকে ৬খানি বড় বড় ‘প্লেট’ বইএর মূল্য আরও খানিকটা বাড়িয়েছে।

এ ছাড়া শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত ব্যালান্‌টাইনের ‘মার্টিন র‍্যাটলার’ ও জুলে ভার্নের ‘অকূল পাথারে’ এবং শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘অবন পটুয়া’ ও ‘মিঠুয়া’ প্রভৃতি আরও যে সব ভাল ভাল বই আমাদের হাতে এসেছে তাদের কথা আর একদিন বলব।

ছোটদের বুদ্ধ (১৷০) শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। লোকমান্য তিলক (৮০)—শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। শরৎ বুক হাউস, ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মন্দিরে মন্দিরে (২৲) শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মার্টিন র‍্যাটলার (১৷০) ও অকূল পাথারে (২৲) শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত। তুলি কলম, ৫৭ এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। অবন পটুয়া (২৲) শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়, শিশু রংমহল, ৮, মোহিনী-মোহন রোড, কলিকাতা-২০। মিঠুয়া (১৲) শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়, নাভানা ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

পিস্তল

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রায়বাড়ীর বৌ হয়ে আসবার পর মাসখানেকের মধ্যে এখানকার প্রায় সব কিছুই দেখে নিয়েছে শোভনা। শ্বাশুড়ীই দেখিয়েছেন ডেকে ডেকে। মস্ত বড় বাড়ি। সাতাশখানা ঘর। সব জিনিষপত্রে ঠাসা। কত দামা দামী আসবাব! বেশীর ভাগই সাহেবী দোকান থেকে কেনা। রায়গিন্নী বৌকে শুধু দেখান নি, সেই সঙ্গে শুনিয়েছেন ওদের রকমারি ইতিহাস। কোন্ রাজার দেওয়ান চমৎকার কাজ-করা কর্পূর কাঠের টীপয়ে চা খাইয়েছিল কর্ত্তাকে। জাঁক দেখিয়ে বলেছিল, 'এর দাম কত জানেন, রায়বাহাদুর? এক হাজার টাকা।' ব্যস্, আর যায় কোথায়! সেই দিন থেকেই ক্ষেপে গেলেন—ঐ রকম টীপয় চাই। লোক চলে গেল মাইশোরে। ঠিক ঐ রকম কি আর পাওয়া যায়? জিনিষ যদি বা পছন্দ হয়, দাম বলে কম। শেষকালে এক দালালের পাল্লায় পড়ে কিনলেন ঐটা। যখন আনা হল, ভুরভুর করছে কর্পূরের গন্ধ। ও হরি! তখন কি জানি বাজে কাঠের উপর কর্পূরের সেণ্ট্ মাখিয়ে দিয়েছে? মাসখানেক যেতেই সব গন্ধ উবে গেল। তখন আর তাকে পাই কোথায়?—বলে হাসলেন রায়গিন্নী।

শোভনা বলল, কত দাম নিয়েছিল?

—দেড় হাজার।

—কী সর্বনাশ! ডাকাত নাকি লোকটা?—কপালে চোখ তুলল শোভনা।

—আর ঐ যে বুদ্ধমূর্তিখানা দেখছ, ওটা কিনেছিলেন এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে। আমি গিয়েছিলাম কালীঘাট। বাড়ি ফিরতেই সিঁড়ির মুখ থেকে ধরে নিয়ে এলেন এই ঘরে। ছাখ কী জিনিষ একখানা! আসল শ্বেত পাথরের মূর্তি। দাম মোটে আড়াইশ'। চমকে উঠলাম, বল কি! ওটা যে পেটেণ্ট ষ্টোন্। সাড়ে তিন টাকায় বিক্রী হচ্ছে কালীঘাটের মোড়ে। শুনেই ছুটলেন সে লোকের খোঁজে। সে কি আর তখন বসে আছে ওঁর জন্যে?

একটা বড় ড্রেসিং টেবিল দেখিয়ে বললেন রায়গিন্নী, এটা যে দিন কিনতে যাই, কি মজার কাণ্ড শোন। আমাকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে গেলেন সেই সাহেব-পাড়ায়। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তেষ্টাও পেয়েছে খুব। এস, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, বলে ঢুকে পড়লেন এক রেস্তোরাঁয়। আমি তো ভয়ে মরি! চারদিকে খালি সাহেব মেম। একটা কোণ বেছে বসলাম আমরা। মাছ-মাংস চলবে না,

খাবার কথা শুধু আইসক্রীম। কী খেয়াল হল, বলে বসলেন, দাঁড়াও, নতুন ধরণের নিরিমিষ কিছু নেওয়া যাক্ ঐ সঙ্গে। বয় মেনু নিয়ে এল। পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে দিলেন। খাবার যখন এল, উনি চান আমার দিকে, আমি চাই ওঁর দিকে। ছ'ডিস জোড়া এই বড় বড় দুই ঢ্যাঁড়স!

—ঢ্যাঁড়স! হেসে গড়িয়ে গেল শোভনা।

—হ্যাঁ; গোটা ঢ্যাঁড়স সেদ্ধ, বেশ করে সাজিয়ে দিয়েছে ডিসের ওপর। বয় আসতেই রেগে উঠলেন, এটা কী এনেছ?

—আজ্ঞে, লেডিস ফিঙ্গার। তাই তো অর্ডার ছিল আপনার, বলে দেখিয়ে দিল পেন্সিলের দাগ। চারিদিকে লোকগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তখ্খনি বিল চুকিয়ে মানে মানে সরে পড়লাম।

ফেরবার পথে বললেন গাড়ীতে বসে—মনে করলাম, নামটা যেমন মিষ্টি, জিনিষটাও আ-মরি-গোছের হবে, নিশ্চয়ই। লেডিস্ ফিঙ্গার মানে যে ঢ্যাঁড়স্ তা কেমন করে জানবো! যেমন বিটকেল জাত, তেমনি ব্যাটাদের ভাষা!

ইংরেজী তো শেখেন নি, আর একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন রায়গিন্নী। প্রথম প্রথম নাম লিখতেও জানতেন না। এদিকে অত বড় রাজার ম্যানেজারি পেয়ে গেলেন। বড় টাইপ করা চিঠি সই করতে হবে। কী করেন? ছেলেকে ডেকে বললেন, আমার নামটা লিখে দে তো একটা কাগজে। খোকা লিখল, এন্ এন্. রায়। তার ওপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে যা হোক একটা দাঁড় করালেন। কাজ চলে গেল। সই তো অনেকেরই পড়া যায় না। তারপর ছেলের কাছেই শিখতে সুরু করলেন এ, বি, সি, ডি। বেশী দূর এগোতে পারেন নি। সাহেবসুবোদের সঙ্গে কথা-বার্তা হিন্দিতেই চালাতেন। চিঠিপত্তর পড়ে শোনানো আর উনি যেমন যেমন বলে দিতেন, সেইভাবে মুসাবিদা করে উত্তর লিখে টাইপ করতে পাঠানো—এ সব কাজের ভারও ছিল খোকার হাতে। এই জন্যেই ওকে চাকরি করতে দেন নি। ওকালতি পাশ করিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

এই সব কথা বলতে বলতে কোথায় যেন ডুবে যেতেন রায়গিন্নী। তারপর নিশ্বাস ফেলে বলতেন, তবু একটা জীবনে কী না করে গেছেন! এই যা কিছু দেখছ, সব এক হাতের গড়া।

শোভনা গালে হাত দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনত। ভারী অদ্ভুত লাগত এই ভেবে, অত বড় শ্বশুর তার, তাঁর জীবনেও ছোট ছোট মজার কাহিনীর অন্ত নেই! সব বড় লোকের জীবনেই বোধ হয় এমন ধারা ঘটে, বাইরের লোক তার খবর রাখে না।

এমনি আস্তে আস্তে খানিকটা খানিকটা করে শ্বশুরের সব কথাই জানতে পারল শোভনা।

বরিশাল জেলার কোন্ এক গ্রামে গরীবের ঘরে নগেন রায়ের জন্ম। ছেলেবেলায় বাপ-মা দুইই মারা যান। কাকার সংসারে দিনগুলো সুখের ছিল না। গ্রামের পাঠশালায় দিন কয়েক বাংলা আর ধারাপাত পড়েছিল। ঐ পড়া পর্যন্তই। শেখাটা বেশী দূর এগোয় নি। তার চেয়ে অনেক বেশী শিখেছিল মাছ ধরতে, খোল বাজাতে আর তাসের আড্ডায় তামাক টানতে। একদিন এই শেষের বিদ্যাটা কাকার চোখে পড়তেই নগদ পুরস্কার জুটল বেশ গোটা কয়েক খড়মের ঘা। পিঠের দাগ হয়তো একদিন মিলিয়ে যেত, কিন্তু মনে যে দাগ পড়ল তা সহজে মিলতে চাইল না। তার দিন দুই পরেই ভোর রাত্রে ঘর ছাড়ল নগেন রায়। কত আর বয়স তখন? চৌদ্দ-পনের হবে। ষ্টীমারের কেরাণীর সঙ্গে ভাব ছিল। খুলনা পর্যন্ত বিনা ভাড়াতেই যাওয়া গেল। তারপর রেল। তার আগে পেটে কিছু পড়া দরকার। এদিকে পকেট গড়ের মাঠ। অগত্যা সোজা সহরের দিকে হাঁটতে সুরু করল। হঠাৎ চোখে পড়ল এক ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারী। ডাক্তার বাবু বসে বসে চা খাচ্ছেন। নগেন রায় ঢুকে পড়ে চেয়ায় টেনে বসল। গম্ভীর ভাবে বলল, 'আমার জন্যেও এক কাপ আনতে বলে দিন স্যর! তার সঙ্গে কিছু খাবার।' ডাক্তারের চোখ তো ছানাবড়া। বেশ কিছুক্ষণ লাগল সামলাতে। তারপর বললেন, তোমাকে তো চিনতে পারছি না?

—চিনবেন কেমন করে? আমি তো এখানকার লোক নই!

ডাক্তার গলায় ঝুলানো রবারের নলটা হাতে তুলে নিলেন। বাগিয়ে ধরবার আগেই রাস্তায় নেমে পড়ল নগেন। সঙ্গে সঙ্গে লম্বা।

ষ্টেশনে ফিবে দেখল মস্ত বড় এক বরযাত্রীর দল চলেছে কলকাতা। ভিড়ে পড়ল তাদের মধ্যে। হাঁকডাক করে জিনিষপত্র ধরে নামাল কুলীর মাথা থেকে, গুছিয়ে সাজিয়ে রাখল যেখানে যেটা মানায়। খাটতে সুরু করল বাবুদের ফাই ফরমাস। তামাক সেজে হুঁকোটা ধরিয়ে দিল কর্ত্তার হাতে। কোন্ এক বড় ষ্টেশনে আসতেই জল বদলাবার নাম করে নেমে গেল। আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভরে দিয়ে নিল কয়েকটা লম্বা টান। বর বেচারা খিদের জ্বালায় ছটফট করছিল। বিয়ের দিনে তো খাওয়া চলে না! হাতের ইশারায় নামিয়ে নিয়ে গেল নগেন। দোকানের পিছন দিকে বসে পেট ভরে খাইয়ে দিল সিঙ্গাড়া, সন্দেশ আর চা। সেই সঙ্গে নিজের ব্যবস্থা যা হল তার পরিমাণটা বেশ গুরুতর।

বিয়েবাড়ীতে পৌঁছে নগেন একাই এক শ'! রান্না থেকে ভাঁড়ার, বাসর থেকে বৈঠকখানা চলল তার ছুটোছুটি। বরপক্ষ মনে করল কনেপক্ষের ছেলে; আর কনেপক্ষ ভাবল বরপক্ষের কুটুম্ব। খাতিরযত্ন পাওয়া গেল দু' তরফেই। পরদিন সকালে যখন জানাজানি হল, তার আগেই উধাও হয়ে গেছে নগেন রায়। টাকাকড়ি, জিনিষপত্তর সব ঠিক আছে। পাওয়া গেল না খালি খান দুই শান্তিপুরী ধুতি, একটা সিল্কের জামা আর এক জোড়া নতুন জুতো।

তারপর কেমন করে, কাদের চোখে ধূলো দিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ি চড়ে হঠাৎ একদিন দেওঘরে গিয়ে উদয় হল নগেন রায়, সেও এক মস্ত বড় কাহিনী। সে কথা আরেক দিন হবে তার পরের টুকু আজ বলে রাখি।

ওখানে ছিলেন ওর এক মাসতুতো ভাই। এক টিকায়েৎ অর্থাৎ সাঁওতাল রাজার সদর কাছারির নকলনবিশ। তাঁরই বাসায় গিয়ে উঠল নগেন। ক'দিন পরে তিনিই নায়েব বাবুকে বলে কয়ে ঢুকিয়ে দিলেন চাকরীতে। তহ্‌শিলদারের পেয়াদা। মাইনে পাঁচ টাকা; তার সঙ্গে খাওয়া পরা। কাজ হল সাঁওতালদের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরা, মনিবের ফরমাস খাটা, রান্নাবান্না করা, আর দরকার মত মাথায় পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে করে তার সঙ্গে খাজনা আদায় করে বেড়ানো। দেখতে দেখতে সাঁওতালী ভাষাটা বেশ রপ্ত হয়ে গেল। শুধু ভাষা নয়, আপন জনের মত জানতে চাইল ওদের মনের খবর; ওদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ।

আগের সব পেয়াদাদের বাইরে ভয় আর মনে মনে ঘৃণা করত সাঁওতালেরা। নগেন রায় পেল ওদের ভালবাসা আর বন্ধুত্ব। এতে করে লাভই হল রাজ সরকারের। অনেক বেয়াড়া প্রজা, যারা কোনদিন বাগ মানে নি, রীতিমত খাজনা দিতে সুরু করল। আদায়ের পরিমাণ বেড়ে গেল অনেক গুণ। ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন টিকায়েতের ম্যানেজার। কয়েক মাস যেতেই পেয়াদা থেকে তহশিলদার হল নগেন রায়। তারপর ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে মুহুরি, নায়েব এবং সহকারী ম্যানেজার। শেষটায় একেবারে শেষ ধাপ ডিঙ্গিয়ে পূরোপূরি ম্যানেজার মিষ্টার এন. এন. রায়। সাঁওতাল রাজা কিছু দেখেও না, বোঝেও না। ম্যানেজারই হল আসল রাজা।

—ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন।—গর্বের সঙ্গে বললেন রায়গিন্নী. দশটা বছর ডাঁটের সঙ্গে রাজত্ব করে গেছেন। বাড়ি, গাড়ি, টাকাকড়ি, লোকজন, তার সঙ্গে 'রায় বাহাদুর' খেতাব। কোন দিকে কোন অভাব রেখে যান নি।

সবই দেখল শোভনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝিয়ে দিলেন শ্বাশুড়ী। বাকী রইল

শুধু একটা ঘর। তেতালায় ঠাকুর দালানের পাশে। সেখানে কোনদিন নিয়ে যান নি বৌকে। সে তালাটাও কখনো খুলতে দেখে নি শোভনা। ওখানে কী আছে? জানতে তার ভারী কৌতূহল। কিন্তু নিজে থেকে যখন দেখালেন না, বলতে কেমন বাধো বাধো লাগে। গেল কয়েক দিন। শেষটায় আর থাকতে পারল না। হাজার হলেও মেয়েমানুষ তো! ক'দিন আর চেপে রাখবে পেটের কথা? ঠাকুর দালানে বেড়াতে বেড়াতে জিজ্ঞেস করে বসল, ও ঘরটায় কী আছে, মা? রায়গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। একটু কি ভেবে নিয়ে বললেন, আজ থাক্ মা, আরেক দিন দেখো। শুধু দেখালে তো বুঝবে না, বলতেও হবে অনেক কিছু।

তারপর একদিন নিজে থেকেই বললেন সব কথা।

—দেশ শুদ্ধ সাঁওতাল একবার ক্ষেপে গিয়েছিল জান তো? লোকে যাকে বলে সাঁওতাল বিদ্রোহ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ : বইতে পড়েছি।—মাথা নেড়ে বলল শোভনা।

—আর আমরা চোখে দেখেছি। বইতে আর কতটুকু লিখেছে? সে যে কী জিনিষ, না দেখলে ধারণা করা যায় না। এমন শান্তশিষ্ট জাত, কাজের সময় গাধার মত খাটে; ফাঁকি দেওয়া কাকে বলে জানে না। কাজ যখন থাকে না, দল বেঁধে নাচে, গায়, বাঁশী বাজায় আর প্রাণ ভরে হাড়িয়া টেনে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। তারাই একদিন রুখে উঠল তীর, ধনুক আর বর্শা নিয়ে। যাকে দেখে তাকেই মারে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। অথচ কী যে হয়েছে বেশীর ভাগ লোকই জানে না। সর্দ্দার বলেছে, ব্যস্! সর্দ্দারদেরও জানা নেই সব কথা।

একটুখানি থেমে, সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর উপর যেন একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন রায়গিন্নী,—যুদ্ধ লেগেছে পশ্চিমে। মেসোপটেমিয়া না কী দেশ সেখানেও ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। নতুন রাস্তাঘাট তৈরী করতে হবে, পুল বানাতে হবে। হাজার হাজার কুলী চাই। সাঁওতালের মত কাজের লোক পাবে কোথায়? তাই ইংরেজ সরকারের হুকুম এল আমাদের রাজার উপর—কুলী পাঠাও। তোমার শ্বশুরকে ডেকে পাঠালেন লাটসাহেব। চাপিয়ে দিলেন কুলী জোটাবার ভার আর তার সঙ্গে এক বোঝা আনকোরা নতুন নোট্। বললেন, টাকার জন্যে ভাববেন না দরকার হলে আরো দেবো। হুকুম মানতেই হবে। গ্রামে গ্রামে আড়কাঠি লেগে গেল। অনেকেই ভিড়ল চকচকে টাকার লোভে। কোথাও কোথাও বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না। তখন চলল জোর-জুলুম। সেখান থেকেই সুরু হল গণ্ডগোল। তাবপর, যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যেও একদল মেয়ে-পুরুষ কী সব হাঙ্গামা বাধিয়ে গুলি খেয়ে মরল। কতগুলো

পালিয়ে এসে রটিয়ে দিল, ওখানে অনেক কষ্ট. খাওয়া-পরার কষ্ট, থাকবার কষ্ট, মেয়েদের মান নেই। তা ছাড়া কথায় কথায় মারধোর, গুলিগালাজ। এই সব শুনে বেঁকে বসল সাঁওতালরা। কুলী আর পাওয়া যায় না। আড়কাঠিরা মার খেয়ে ফিরে এল। খুনও হয়ে গেল জন কয়েক। সরকারী লোকও মারা পড়ল কিছু। ধর-পাকড় সুরু হতেই গোলমাল ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। উনিও জড়িয়ে পড়লেন। এত যে ভালবাসত ওঁকে, সব কোথায় তলিয়ে গেল! গোপনে খবর এল, ফাঁক পেলে ওঁকেও তারা ছাড়বে না। কথাটা আমার কাছে চেপে গেলেন।

মাঝে মাঝে বড় বড় বস্তিতে সভা ডেকে উনি গিয়ে ওদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন। এমনি এক সভায় যাচ্ছিলেন একদিন। শালবনের ভিতর দিয়ে পাল্‌কী চলেছে। আগে পিছে পাইক বরকন্দাজ। হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল। পাল্‌কী থামিয়ে নেমে এসে দেখলেন, পিঠের মাঝখানে বিঁধে গেছে সাঁওতালী তীর। মারাত্মক বিষ থাকে তার ফলায়। একবার বিঁধলে ধন্বন্তরী এসেও বাঁচাতে পারেন না। হঠাৎ সোরগোল কানে যেতেই দেখা গেল, শালবন ভেঙ্গে জোয়ারের মত ছুটে আসছে বিশাল দঙ্গল। চোখের নিমেষে পাল্‌কী, বেয়ারা, পাইক বরকন্দাজ যারা ছিল, সব কোথায় মিলিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন উনি একা। লোকগুলো খানিকটা কাছে আসতেই চেঁচিয়ে বললেন, খবরদার! আর এক পা এগোলেই গুলি করবো।—বলে পকেটে হাত দিলেন। প্রথমটা ওরা একটু থমকে গেল। তারপরেই আবার হট্টগোল করে এগিয়ে আসতে লাগল। আর দেরী করা যায় না পকেটে যে জিনিষটা ছিল উঁচিয়ে ধরে উনিও মরিয়া হয়ে ছুটলেন ওদের দিকে, চিৎকার করে বললেন, এখনো বলছি, সরে যা; নইলে গুলি করবো। ঠিক সেই সময় সাঁ করে একটা তীর বেরিয়ে গেল ওঁর ঠিক কানের পাশ দিয়ে। তখনো উনি তেমনি হাত উঁচিয়ে সমানে এগিয়ে চলেছেন সেই মারমুখী লোকগুলোর দিকে।

হঠাৎ ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠল,—পিস্তল! সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে সেই শ' পাঁচেক লোক একেবারে হাওয়া। দশ মাইল হেঁটে উনি বাড়ী ফিরে এলেন।

এতক্ষণে যেন নিঃশ্বাস পড়ল শোভনার। চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, শ্বাশুড়ী বললেন, চল, ওপরে চল।

এতদিন যে তালা সে খুলতে দেখে নি, শ্বাশুড়ীর হাত থেকে চাবি চিনে নিয়ে আজ নিজেই সেটা খুলে ফেলল। সামনেই বেদীর উপর একটা কাঠের বাক্স। রায়গিন্নী ডালাটা তুলে বললেন, এইটাই তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল সেদিন।

শোভনা ভিতরে একবার উঁকি মেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ও মা, এ যে একটা তামাকের পাইপ। কিন্তু কত বড়!

— হ্যাঁ অনেকটা আমাক ধরবে বলে অর্ডার দিয়ে করানো। সেই ছেলেবেলার হুঁকোর নেশা তো।

ভীষণ হাসি পেল শোভনার। কিন্তু গলাটা চড়িয়েই হঠাৎ থেমে গেল খাশুড়ীর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে। উনি বললেন, একে প্রণাম কর, বৌমা!

বেথুন কলেজের বি.এ পাশ করা মেয়ে প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে গেল তারপর গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল সেই পাইপটার সামনে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস্-সি

মানে দেখতে গেলে—

রমেশ বাবু মস্ত পণ্ডিত, কিন্তু বড্ড কাঠখোট্টা। সেদিন একদল ছোকরা এসেছে, তাঁকে তাদের সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করতে হবে তাই বলতে।

“কি হবে সভায়?” প্রশ্ন করলেন রমেশ বাবু।

“এই সাহিত্যিকরা বক্তৃতা দেবেন, প্রবন্ধ পাঠ করবেন, আলোচনাও হবে তা নিয়ে। আপনি আর প্রধান অতিথি বিভীষণ বাবুও ভাষণ দেবেন। আর—”

“আর কি?”

“আর সবার শেষে আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।”

“সেটা আবার কি জিনিষ?”

“এই নাচ, গান, আবৃত্তি ছোট একটা নাটকাভিনয়ও আছে।”

“ও, অর্থাৎ তোমাদের মতে সংস্কৃতি মানে হচ্ছে শুধু নাচ, গান আর থিয়েটার? আর প্রবন্ধ পাঠ, সাহিত্য নিয়ে বক্তৃতা এগুলো সব তোমাদের সংস্কৃতির বাইরে। যত সব অর্বাচীনের দল! যাও, যাব না তোমাদের সভায়।”

ছেলেরা আমতা আমতা করে বেরিয়ে এল, জবাব দিতে পারল না।

কিন্তু রমেশ বাবু রাগ করুন আর যাই করুন ‘সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান’ কথাটি এখন ঐ অর্থে এত ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত ঐ বিশিষ্ট অর্থই হয়তো ওর দাঁড়িয়ে যাবে। বাংলা ভাষায় এ রকম আগে হরদম্ হয়েছে, রমেশ বাবুর মত পণ্ডিত লোকের হয়তো তা অজানা নয়। অল্প কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। আমি ঔদরিক, ও সংস্কৃতি-টংস্কৃতির চাইতে খাওয়াটাই বেশী বুঝি, তাই খাওয়ার কথা দিয়েই সুরু করি।

দুপুরে ভাত খেতে বসেছ। ভাত কথাটা সংস্কৃত ‘ভক্ত’ থেকে এসেছে। ভক্ত মানে যা রান্না করা হয়েছে। তা সে ডালও হতে পারে, তরকারীও হতে পারে, চালও হতে পারে। কিন্তু আমরা ভাত বলতে শুধু শেষেরটিকে মেনে নিয়েছি। যদি শুদ্ধ বাংলায় ভাত না বলে বলি অন্ন, তা হলেও কিছুমাত্র সমস্যা কমবে না। ‘অন্ন’ কথাটার মানে খাদ্য, শুধু ভাতই নয় যে খাদ্য আমাদের শরীর পুষ্ট করে তাই হচ্ছে অন্ন। প্রাচীনকালে এই অর্থেই অন্ন চিরকাল পরিচিত হয়ে এসেছে। যারা ভাতের বদলে রুটী খায় তাদের অন্ন রুটী। কিন্তু অন্ন চাইলে তোমাকে যদি ঠাকুর রুটী এনে দেয়, তুমি চটে যাবে। কাজেই দেখ এখানেও অন্নের মূল অর্থ আমরা মেনে নিচ্ছি না। যদি অন্ন বাদ দিয়ে পোলাও চাও, তা হ'লেও বিপদ্। পোলাও হচ্ছে পলান্ন। পল মানে মাংস, তা হলে পলান্ন শব্দের আসল অর্থ মাংস মেশান অন্ন। কিন্তু ঐ ভাবে পোলাও রাঁধতে হবে এ কথা তোমার মা-কাকীমাকে বলে দেখ, তাঁরা কি বলেন। পোলাওএ যে মাংস দেওয়া যায় না এমন নয়, কিন্তু কোন দিন কোনও নেমন্তন্নে সে রকম পোলাও দেখেছ কি?

আচ্ছা, যদি বল পোলাও চাই না, আন পায়েস আর সন্দেশ। পূর্ববঙ্গে পায়সকে বলে মিষ্টান্ন—মিষ্টি ভাত। দুধ আর চাল ছাড়া পায়স হয় না। কিন্তু যাবতীয় মিঠাইকেও মিষ্টান্ন বলা হয়। অন্নের প্রকৃত অর্থ ধরলে শেষেরটা খাটতে পারে, কিন্তু যে অর্থে আমরা বলি তাতে খাটে না—বরঞ্চ এদিক্ দিয়ে পূর্ববঙ্গবাসীরাই ঠিক বলেন। আর সন্দেশ তো একেবারেই ভুল। সন্দেশ মানে সংবাদ—খবর। আগেকার দিনে আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী লোক পাঠিয়ে খবর নিতে হলে ভদ্রতা করে সঙ্গে কিন্তু মিষ্টি খাবার দিয়ে দেওয়া হ'ত। সেই থেকে বাংলায় সেই মিষ্টি খাবারের নাম হয়ে গেল সন্দেশ।—সন্দেশের আসল অর্থ কোথায় চাপা পড়ে গেল! আবার সন্দেশ বলতেও যে-কোন মিষ্টি খাবার

নয়—বিশেষ এক রকম ছানার খাবারকেই বোঝাচ্ছে। কোথাকার জল কোথায় গড়িয়েছে দেখ! বিয়েতে যে 'তত্ত্ব' পাঠান হয় সেও ঠিক এই ব্যাপার। তত্ত্বের আসল অর্থ (খোঁজখবর) ঘুচিয়ে উপহার সামগ্রীকেই বলা হচ্ছে তত্ত্ব!

এ রকম ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ দেওয়া যায়—কি করে এক অর্থের শব্দ অন্য অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। সংস্কৃত তো বটেই, বিদেশী শব্দও কম নয়। সন্ধ্যা মানে কি? আমরা সবাই জানি রাত্রির ঠিক আগের সময়টা সন্ধ্যা, কিন্তু সন্ধ্যা বলতে যে সংস্কৃতে মধ্যাহ্ন এবং ভোরবেলাও বোঝায় তা জান কি? মৃগ বলতে আমরা হরিণই বুঝি কিন্তু আসলে মৃগ মানে যে-কোন পশু। মৃগয়া বলতে হরিণ শিকার বোঝায় না, যে-কোন পশু শিকারই বোঝাতে পারে। গায়ে বা মাথায় যখন "বিশুদ্ধ সরিষার বা নারিকেলের তৈল" মাখ তখন কি ভাব যে ওটা একেবারে ভুল বলা হচ্ছে? তৈল একমাত্র তিল থেকেই হতে পারে—আর কিছু থেকে নয়।

দুই-একটি বিদেশী শব্দ আবার একেবারে অন্য অর্থে বাংলায় ব্যবহার করা হয়। তোমাকে যদি 'বুজরুগ' বলি, চটে মারতে আসবে; কারণ বুজরুগ মানে বাংলায় শঠ বা ভণ্ড। কিন্তু ফারসী-ভাষীদের কাউকে বুজরুগ বললে সে হয় তো খুসীই হবে। কেন না কথাটার আসল মানে হচ্ছে বিজ্ঞ। গুলাব বা গোলাপ বলতে আমরা এক রকম সুগন্ধি ফুলই বুঝি, কিন্তু আসলে ওটা হচ্ছে ফুলের রস বা জল,—যে কোন ফুলের।

রমেশ বাবু একা কত ঠেকাবেন?

তুমি কি জান

বিজ্ঞান আজকাল যে ভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে তাতে নানা নতুন নতুন শব্দ, যা নাকি এক সময় বিজ্ঞানীদের নিজস্ব ভাষা বলে ধরা হ'ত,—তা আজকাল সাধারণ লোকেও হামেশা ব্যবহার করছে। খুবই ভাল কথা সন্দেহ নেই; কিন্তু অনেক সময়, মুখে ব্যবহার করলেও, দেখা গেছে কথাটির ঠিক ঠিক অর্থ সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা নেই। এই রকম ২।১টির কথা বলি।

মাইক:—সভা-সমিতি মাইক না থাকলে আজকাল অচল। মাইক জিনিষটা কি? ওটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত নাম—পুরো নাম হচ্ছে মাইক্রোফোন। এই যন্ত্রের কাজ হচ্ছে শব্দের ঢেউকে বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত করা। মাইকের দু'টি অংশ—একটিকে বলা হয় প্রেরক যন্ত্র, আর একটিকে গ্রাহক যন্ত্র। প্রেরক যন্ত্রের সামনে কথা বললে সেখানে শব্দের যে ঢেউ বা তরঙ্গ ওঠে তাই বৈদ্যুতিক স্পন্দন রূপে তারের (সময় সময় বেতারেরও) ভেতর দিয়ে গিয়ে হাজির হয় গ্রাহক-যন্ত্রে, যার কাজ হচ্ছে

ফের ঐ বৈদ্যুতিক স্পন্দনকে অবিকল আগের মত শব্দের ঢেউএ ফিরিয়ে আনা। লাউড স্পীকার এই শব্দের ঢেউকে আরও জোর করে দেয়—যাতে আওয়াজও তেমনি জোরে বেরোতে পারে।

শর্ট ওয়েভ্:–'ওয়েভ'এর বাংলা হচ্ছে 'ঢেউ' বা ভাল কথায় 'তরঙ্গ'। এখানে এ তরঙ্গ হচ্ছে ঈথারের তরঙ্গ—যে ঈথার নাকি সমস্ত শূন্য বা আকাশ ভরে রেখেছে, আর যার ফলে আমরা পাচ্ছি আলো, বেতার ইত্যাদি। জলে ঢিল ফেললে যে রকম ঢেউ ওঠে ঈথারের ঢেউও অনেকটা সেই রকম। এই রকম একটা ঢেউয়ের চূড়া থেকে আর একটা ঢেউয়ের চূড়ার যা দূরত্ব তাকেই বলা হয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য। ইংরাজীতে বলে ওয়েভ্ লেংথ্। এই দৈর্ঘ্য কত বড় তারই ওপর নির্ভর করছে আলো বা বেতারের রূপ বা পার্থক্য। এই দৈর্ঘ্য মাপা হয় মিটার (৩৯·৩৭") বা মিটারের শতাংশ সেন্টিমিটার দিয়ে। রেডিও ষ্টেশন থেকেও যন্ত্রের সাহায্যে এই ঢেউ ছড়িয়ে দিয়েই বেতার-বার্তা প্রচার করা হয়। সেখানে সাধারণতঃ ১০ থেকে ১০ হাজার মিটার পর্যন্ত লম্বা এক একটা ঢেউ ছাড়া হয়। ১০ থেকে ১০০ মিটার লম্বা ঢেউগুলো হচ্ছে এদের হিসাবে ছোট ঢেউ, তাই তাকে বলা হয় 'শর্ট ওয়েভ' বা হ্রস্ব তরঙ্গ। তারপর ১০০ থেকে হাজার মিটার পর্যন্ত 'মিডিয়াম ওয়েভ' বা মধ্যমাকৃতি তরঙ্গ এবং তার পরেরগুলো হচ্ছে 'লং ওয়েভ' বা 'দীর্ঘ তরঙ্গ'।

পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

(বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৬৪)

'মজাদার গল্পের' প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত লেখকদের পুরস্কার দেওয়া হ'ল—

১ম পুরস্কার – শ্রীঅমিত চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা-১৯)

২য় পুরস্কার – শ্রীবাণী পাল (বনারস)

৩য় পুরস্কার—শ্রীসন্ধ্যা নিয়োগী (কলকাতা-২৯)

এ ছাড়া শ্রীআলো পাল চৌধুরী (কলিকাতা-২৬), শ্রীরবীন্দ্র ও রণেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ঘৈরালি) ও শ্রীপম্পা ভট্টাচার্য (কলকাতা-১৯)—এঁদের গল্পগুলিও ভাল হয়েছে। ১ম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পটি ও পরে সুবিধামত পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্য দু'টি গল্পও রামধনুতে প্রকাশ করা হবে। এবারে আবার নতুন প্রতিযোগিতা দেওয়া হ'ল।

কে এসেছে আজ ?

শ্রীরত্নাবলী ভট্টাচার্য

শাল-পিয়ালের বনে আজি দোল দিল কে বল ?
পাতায় পাতায় খুসীর নেশা — আনন্দে বিহ্বল ।
উদাস হাওয়া তাদের প্রাণে
রাঙা আলোর পরশ আনে,
সোনালী রোদ খেলায় মেতে হ'ল কি চঞ্চল !

নীল আকাশে শুভ্র তুলির শুভ্র আলিম্পন,
শিউলি, জবা ভ্রমর দলে জানায় আমন্ত্রণ ।
ঘুম টুটেছে আজকে যে তার,
পাপড়ী মেলে চায় বারে বার,
কোন্ মায়াবী মাখিয়ে দিল মায়ারি অঞ্জন !

বন-বনানীর কোমল হিয়া সবুজে ভরপুর,
গহন বনে রাখাল বাজায় বাঁশীর মিঠে সুর ।
চপল মেয়ে ঝর্ণাধারা
যায় ছুটে সে পাগল পারা,
মেঘ শিশুরা চলছে ভেসে অনেক — অনেক দূর ।

এল পূজা

শ্রীঅরুণকুমার ভট্টাচার্য

এল পূজা তবু চারিদিকে শুনি
ক্ষুধিতের ক্রন্দন,
পথ চেয়ে আছি সারাটি বছর
তবু কেন বন্ধন ?

তুমি যার মাতা তার কেন আজ
দিন কাটে অনশনে ?
পূজার মন্ত্র ভুলে ভুলে যাই—
কিছু যে পড়ে না মনে !

ক্ষুধার অন্ন চাহি না তো শুধু—
প্রাণের অন্ন চাই,
মনের কালিমা মুছে দাও এসে—
রাঙা পায়ে দাও ঠাঁই ।

পুরীযাত্রা

শ্রীঅসিতকুমার রায়

ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখি
আটটা বেজে কুড়ি,
যাত্রী বোঝাই ক্লান্ত গাড়ী
পৌঁছে গেছে পুরী ।

ব্যস্ত মুটে যাত্রী নিতে—
ষ্টেশন মাতোয়ারা,
আগ্‌লে ফটক টিকিট বাবু
তৈরী আছেন খাড়া ।

আর দেরী সয় ? তোমরা বল
থাকতে পারে কেউ ?
জগন্নাথের সঙ্গে টানে
সমুদ্রের ঐ ঢেউ ।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

পূজো এসে গেল । হাসিকান্নায় ভরা আমাদের পূজো । বাংলা দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব । ছুটীর গন্ধ পাচ্ছি হাওয়ায়, কিন্তু তাও যেন বেদনা-মাখানো ।

তাড়াহুড়োর মধ্যে পূজা-সংখ্যা তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি । অনেক ভাল লেখকের অনেক ভাল লেখা দিয়ে অনেক পাতায় ভর্তি করে রামধনুকে সাজাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে বার করতে হবে যে ! অনেক লেখা তাই দিয়েও শেষটা তুলে রাখতে হ'ল বারান্তরের জন্য । যেটুকু দিতে পারলাম তাতেই তোমরা খুসী হলে আমরা খুসী ।

পূজা-সংখ্যা বলে ধারাবাহিক উপন্যাস ২টি (তোমাদেরটাও) এবার বন্ধ রইল বরাবরাকর মত । আসছে মাস থেকে আবার সেগুলো বেরুবে । সেই সঙ্গে শ্রীঅপূর্বমণি দত্তের চমৎকার একখানি নতুন উপন্যাস 'মহাকালের অভিশাপ'ও সুরু হবে ।

ব্যক্তিগত চিঠি এবার সব ফাইল-চাপা রইল । আসছে বারে বেশ ভা-লো করে জবাব লিখবার চেষ্টা করব । স্নেহ, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ এখানেই চিঠি শেষ করি । কেমন ?

ইতি—তোমাদের সম্পাদক মশাই ।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

পান, শাক, ময়দা, পায়স, জিরা, আদা, আটা, রুটি, দই, জল, ডাল, চাল, মটর, চা, মুড়ি, কই, লেবু, তেল, আম, ঘি, লবঙ্গ, লুচি, নুন, মশলা, কলা, খয়ের, লাউ, পিঠে, কাঁঠাল, রসুন, চিনি, রস, মরিচ ।

উত্তরদাতাদের নাম : নির্ভুল—অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর) ; নীলিমা সেন (মধ্যমগ্রাম) ; সবিতা দত্ত ও শোভা রায় (আগ্রা) ; বাবুল, কিংশুক, গোপাল, নেপাল, বুবলা, টুবলা, দেবজ্যোতি ও ধ্রুবজ্যোতি (পুরী) ; শেখর ও প্রভাকর ঘোষ (নতুন দিল্লী) ; আর্থার ও এলফ্রেড মিত্র (রাঁচী) ; কমলা ভট্টাচার্য (কলিকাতা-১২) ; শিউলি মজুমদার (কলিকাতা-২৯) ; নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত (কলিকাতা-২৬) ; অনসূয়া হালদার (কালীঘাট) ; সুবন্ধু ও বসুবন্ধু রায় (লখনৌ) ; নিমাই ও নিতাই (কায়েতডোবা) ; সুচেতা ও রত্নাবলী ভট্টাচার্য (কলিকাতা-২৫) । আংশিক—দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-১২) ; মুরারিমোহন মণ্ডল

(কুমুড়সা); উজ্জ্বলা মহান্তি (কটক); শীলা বসু (দিল্লী); সত্রাজিৎ চৌধুরী (কলিকাতা-১৯); রাবেয়া ও আয়েষা (ঢাকা): খোকন, সমু, বুধু, চিন্নু ও রাঘবন্ (কলিকাতা-২৯); তপতী বড়ুয়া (শিলং)।

নূতন ধাঁধা

নীচের লেখাটি পড়বার চেষ্টা কর। সাঙ্কেতিক ভাবে লেখা। মাঝে মাঝে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা বসানো। প্রত্যেকটি সংখ্যার বদলে একটি করে উপযুক্ত শব্দ বেছে বসাতে পারলেই লেখাটি পড়া যাবে। একটি সংখ্যার বদলে কিন্তু একটি শব্দই কেবল বসবে!

১পাতার ঘরে সবাই ১ হয়ে বসেছি, হঠাৎ দেখি ২ঘরে আগুন। মোম ৩নো বন্ধ রেখে ৩ দিয়ে খাম এঁটে পা৪এর মত ছুটে এসে দেখি, কারা ৫২ ছুঁড়ছে। ছা৪টার ৬ দিয়ে ৪৪ করে গড়াচ্ছে রক্ত। ৬ দিয়ে শব্দ বেরোল না, ৫খোরের মত চেয়ে রইলাম। ২মি করার এই তো ৪দ! ৭ বেয়ে জল পড়তে লাগল, ৩৭ দিতে ইচ্ছে হ'ল সবাইকে।

দ্রষ্টব্য :—পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কার্যালয় বন্ধ থাকবে, তাই কার্তিকের রামধনু কার্তিকের মাঝামাঝি (২য় সপ্তাহের শেষে) প্রকাশিত হবে।

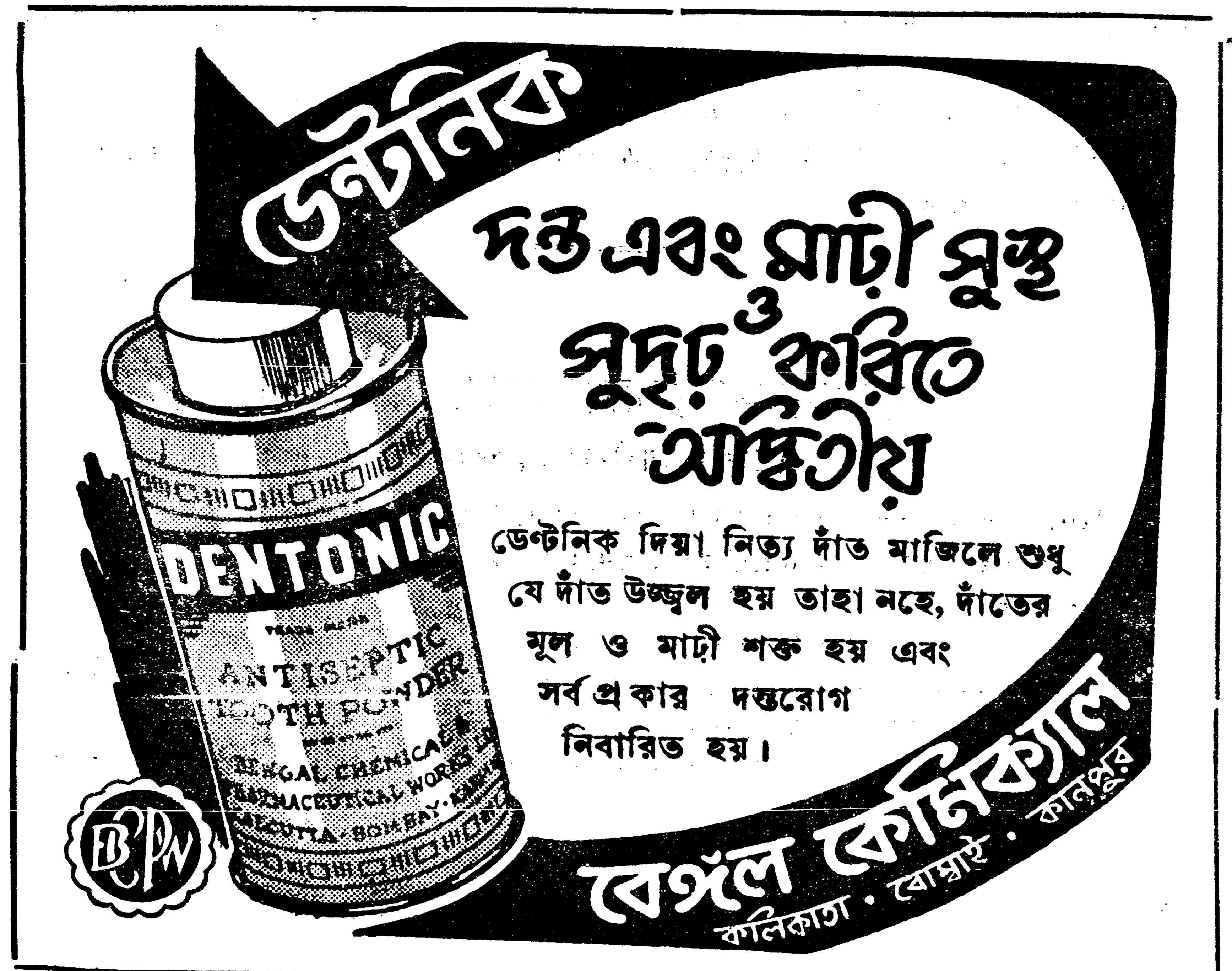

খোকার কথা!

রচনা লিখে নিয়ে যাই না—তাই
মাষ্টারের বকুনি রোজ খাই—
আর খাবো না, যাবো না স্কুলে,
খোকন বলে ভীষণ রেগে ফুলে॥

অফিস থেকে এসে
বাবা বলেন হেসে :
রচনা তুমি লেখো না—এ তো তোমারি অন্যায়!
খোকন বলে : কালি কোথায়?
কালি বিনে রচনা লেখা যায়?

বাবা বলেন : অনেক কালি আছে দিদির কাছে,
আমারো আছে বিলেতী কালি দেরাজে এক ডজন;
এ সব দিয়ে লেখো না কেন? বকছো শুধু বাজে,
লেখার ভয়ে কালির দোষ দিচ্ছ কেন খোকন?

খোকন বলে ঘাড় বেঁকিয়ে, দু'চোখ ক'রে টেরা :
তোমার কালি, দিদির কালি, কালি তো নয় ছাই!
লেখার মতো লিখতে হলে সব দেশের সেরা
সবার প্রিয় সুলেখা কালি চাই॥

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২ হইতে প্রচারিত।

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৵৹

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২।০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১।	নব পত্রিকা	৪৲
২।	জয়যাত্রা	৪৲
৩।	দেবালয়	৪৲
৪।	ইন্দ্রধনু	৪৲
৫।	বসুধারা	৪৲
৬।	পরশমণি	৪৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸০

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥০

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥৵০

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানি বই]

এবার পুজায় বাহির হইল

১। যত হাসি ততই মজা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী— ২৲
২। পূজার দিনের উপহার—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্‌ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

লে খা চা ই

অভিনব, সচিত্র কিশোর-মাসিক; বৈশাখ হইতে বর্ষারম্ভ; বার্ষিক সডাক ২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১।০, নমুনা ৶০; যে কোনও মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়; ভি, পি, হয় না। তিনটি রচনা-প্রতিযোগিতায় মোট আঠারটি পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে; পুরস্কার-প্রাপ্ত ১৮টি "লেখা"ই ৺শারদীয়া সংখ্যায় ছাপা হইবে; অন্ততঃ ষাণ্মাসিক 'গ্রাহক' না হইলে রচনা গ্রাহ্য হইবে না। ক-বিভাগে, বিষয় "স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কবিতা", আয়তন "লেখা চাই"এর এক পৃষ্ঠা, প্রতিযোগীর বয়স ১৮ বছরের কম। খ-বিভাগে, বিষয় "দেশ-প্রেমিকের আত্ম-বিসর্জ্জন-সম্পর্কীয় ছোট গল্প", তিন পৃষ্ঠা, বয়স ১৮এর নীচে। গ-বিভাগে, বিষয় "শ্রীঅরবিন্দের সাধনা" -শীর্ষক প্রবন্ধ, ২ হইতে ৪ পৃষ্ঠা, বয়সের কোন গণ্ডী নাই। "টাকা" ও "লেখা" পাঠাইবার ঠিকানা:—শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, বি-টি, সম্পাদক "লেখা চাই", লেখা চাই কার্য্যালয়, পোঃ দেবালয়, জিলা ২৪ পরগণা।

পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

নীচে ৬টা বাক্যের প্রত্যেকটিতে একটি করে ড্যাশ্ চিহ্ন আছে আর তার পাশে ব্র্যাকেটে ৩টে করে বাক্যাংশ দেওয়া আছে। ওর থেকে যেটি তোমার সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হবে সেইটি দিয়ে ড্যাশ্ চিহ্নটি পূর্ণ করতে হবে। আলাদা কাগজে বাক্যগুলো টুকে আমাদের কাছে পাঠাবে। আমাদের কাছে এর একটা উত্তর তৈরী করা আছে। যারটা তার সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে যাবে কিংবা তার সবচেয়ে কাছাকাছি হবে তাকেই দেওয়া হবে পুরস্কার। ১ম ও ২য় ২টি পুরস্কার আছে। ২ জনের বেশী ঠিক ঠিক উত্তর দিলে পুরস্কার সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। উত্তর ৩০শে কার্তিকের মধ্যে রামধনু কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে, তবে প্রত্যেক উত্তরের সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে পূর্ণ করে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে ধরা হবে।

১। বোকা চাকর ভাল হলেও তার উপর —। (রাগ হয়, অনুকম্পা হয়, মায়া হয় না।)

২। ব্যস্তবাগীশ হলে —। (ঠকতে হবেই, কাজে বাধা পড়বেই, ভুল হবেই।)

৩। আপিসের বেয়ারাটাকে বখশিস না দিলে সে —। (তোমায় দেখে নেবে, তোমায় আমলই দেবে না, চটবেই।)

৪। কারও সঙ্গে ভদ্রতা করেও যদি ভদ্র ব্যবহার না পাওয়া যায় তবে —। (অবাক্ হতে হয়, লজ্জা পেতে হয়, মেজাজ ঠিক থাকে না।)

৫। দরকারী জিনিষটা ভেঙ্গে ফেললেও মা আদুরে ছেলের —। (দোষ ধরবেন না, ওপর বিরক্ত হবেন না, দোষ ঢাকতে চেষ্টা করবেন।)

৬। বিজলী-বাতির তারে আগুন ধরে উঠলে দৌড়ে —। (মেইন স্যুইচ বন্ধ করবে, জল দিয়ে নিভিয়ে দেবে, লোক ডেকে আনবে।)

কুপন : পু ৬-৬৪

নাম——

রামধনু

ঠিকানা——

উৎসবে ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার

পথের পাঁচালীর অপরাজেয় কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। মানুষের বসতি হইতে দূরে যেখানে নিবিড় অরণ্য—বিচিত্র পত্রপুষ্প-শাখা-পল্লবের দেশ—পশুপক্ষীর স্থায় মানুষও যেখানে প্রকৃতির দোসর – তাহারই মনোহর কাহিনী। ছোটদের বোধগম্য ভাষায় অপূর্ব্ব সচিত্র উপন্যাস

ছেলেদের আরণ্যক ৩·০০

বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রশংসা-প্রাপ্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘বুনো ওল বাঘা তেঁতুল’, ‘কেমন জব্দ’, ‘সেয়ানে সেয়ানে’ আর ‘জয় পরাজয়’—শিবাজীর জীবনের চারটি চমকপ্রদ ঘটনা লইয়া লেখা ছত্রপতি শিবাজীর জীবন চরিত।

শিবাজী মহারাজ ১·০০

শিবাজীর জীবনের এই ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাগুলি উপন্যাসকেও হার মানাইয়াছে।

রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় যশস্বী ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থের লেখা

রাজা-উজিরের কথা ০০·৫০

যেমন মা ছাড়া শিশুর ডাক হয় না, তেমনি রাজা ছাড়া কোন দেশ হয় না। আগের দিনের রাজা আর তাঁর উজিরের কাজ এবং আজকালকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্য শাসনের কথা সহজ সরল ভাষায় ছোটদের জন্য এই প্রথম প্রকাশিত হইল। বাংলা ভাষায় এই ধরণের বই আর নাই।

রঙিন কালীতে ছাপা মরমী কবি মোহিতলাল মজুমদারের ছোটদের জন্য লেখা

রূপকথা ১·০০

বিখ্যাত শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের অঙ্কিত ছবি পাতায় পাতায়। উপহারের অপরিহার্য বই।

তামসরঞ্জন রায়ের

স্বামী বিবেকানন্দ ১·৫০

"স্বাধীনতা লাভের চেয়েও যে মানুষ হওয়া বড় কথা আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিতেছি। ···· আজ তাই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ দেশের সম্মুখে আবার ধরিতে হইবে। ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য কোন পথ নাই। এই কারণেই গ্রন্থখানি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলিয়া মনে করি।" বলিয়াছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।

বিখ্যাত লেখিকা বাণী রায়ের লেখা

হাসি কান্নার দিন ১·৫০

একটি বালিকা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া কয়েকজন ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর দৈনন্দিন জীবনের স্বপ্ন-কল্পনাই এই বইয়ের উপজীব্য। কিশোরী জীবনের আনন্দ ও নিরানন্দের কাহিনী।

আমাদের নূতন বিক্রয়-কেন্দ্র

জেনারেল বুকস্টল

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মহালয়ার শুভক্ষণে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করলো

সাত সমুদ্দুর

ইন্দিরা দেবীর সম্পাদনায় যাঁদের লেখা এই সংকলনে থাকবে: নরেন্দ্র দেব॥ সুখলতা রাও॥ খগেন্দ্রনাথ মিত্র॥ প্রভাতকিরণ বসু॥ আশা দেবী॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য॥ প্রভাকর মাঝি॥ সুলতা কর॥ শঙ্কর দাস॥ বেলা দে॥ স্বপনবুড়ো॥ ইন্দিরা দেবী॥ দিলীপ মুখোপাধ্যায়॥ তারক মিত্র॥ নিশীথ রায়॥ চণ্ডী লাহিড়ী॥ অলক চক্রবর্ত্তী॥ কুমারেশ ঘোষ॥ নীহার ঘোষ॥ বিজন গঙ্গোপাধ্যায়॥ জয়দেব রায়॥ অরুণ চক্রবর্ত্তী॥ বংশীধর হাজরা॥ প্রবাস-বেণু গঙ্গোপাধ্যায়॥ গোপাল ভৌমিক॥ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত॥ রেখা চট্টোপাধ্যায়॥ জীবন চৌধুরী॥ আশাবরী দেবী॥ বৈদ্যনাথ গুপ্ত। রাণা বসু॥ শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়॥ ৺অন্নপূর্ণা গোস্বামী॥ সুনীল বসু॥ অমলেন্দু দত্ত॥ প্রভাসরঞ্জন দে॥ মনোজিত বসু॥ চিত্তরঞ্জন দে॥ বাণী রায়॥ হিমালয়নির্ঝর সিংহ॥ অমরনাথ রায়॥ বিমানচাঁদ মল্লিক॥ নবগোপাল সিংহ॥ দীপালী নাগ চৌধুরী॥ এবং আরো অনেকে॥

আর্ট পেপারে ছাপা সুদৃশ্য বাঁধাই এই বইটির দাম এবারেও দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র। ডাক মাশুল বার আনা।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

অরুণালোক প্রকাশনী, ৪০, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

মহালয়ায় ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি ফোটাতে চান? তা হলে বাড়ীতে ছাড়ুন শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্র মজুমদারের

হাসির তুবড়ি

যেমন মজাদার বিচিত্র ছড়ায় ভরপুর তেমনি শৈল চক্রবর্ত্তীর কৌতুকপ্রদ ছবিতে জমজমাট। আর যা সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক সমগ্র বঙ্গের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা বিদ্যালয়ের প্রাইজ, লাইব্রেরী ও কিশোরপাঠ্য রূপে অনুমোদিত হয়েছে (৩ টি বি—১১. ৭. ৫৭. কলিকাতা গেজেট ১. ৮. ৫৭)। দাম—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান:—এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট - কলি-১২
আশুতোষ লাইব্রেরী—কলি-১২
এ ছাড়াও নামকরা সকল দোকানে।

সুরিনা স্পেশাল
কালি

আপনার কলমের জন্যে জন্মস্থল রাখে!

সুপ্রীম কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ • কলিকাতা

ছোটদের গ্রন্থাগারে রাখবার মত বই

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

রায় পাহাড়ীর নিশাচর ৷৷৵০

অনুসন্ধানী ১৷০

দি লাষ্ট্‌ অফ্‌ দি মোহিকান্‌স্‌ ৷৷৵০

(কুপারের বিখ্যাত উপন্যাস)

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

দি অলিভার টুইষ্ট ৷৷৵০

ডিকেন্সের অমর উপন্যাস)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ১৲

(বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

ধূমকেতু ৷৷৵০

(বিজ্ঞানের ভিত্তিতে রহস্য-উপন্যাস)

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

রহস্যময় ডিটেকটিভ উপন্যাস

পদ্মরাগ ১৷০

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ১৷০

মজাদার হাসির গল্প

চায়ের ধোঁয়া ৷৷৵০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ১৲

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর সহযোগে)

একখানি দরকারী বই

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

ঘরে বসে সাবান, কালি, দাঁতের মাজন এবং আরও হরেক রকম রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার সহজ প্রণালী।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ—দাম ১৷০

রামধনু কার্য্যালয়,

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ৷৷০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১৷৷০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি,এ

Regd. No. C—1641

রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

৩০শ বর্ষ
কার্ত্তিক—১৩৬৪
১৮৭৯ শকাব্দ

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

বার্ষিক ৪ টাকা
ষাণ্মাসিক টা. ২·২৫
প্রতি সংখ্যা ৩৭ন প.

Regd. No. C—1641

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন–৩৫–২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২৷৷০, /৫, ৷৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা–৬

ছোটদের ভাল ভাল বই ঃঃ নামকরা বই

ননীগোপাল চক্রবর্ত্তীর –	
কাঠ ও কাঠের কাজ	১৷৷০
বাঁশ, বেত, পাতা ও সোলার কাজ	১৲
তন্তুশিল্পের কাজ	১৲
আলোক চক্রবর্ত্তীর—	
মনসামংগল	১৲
চৈতন্যমংগল	১৲
কুমারসম্ভব	১৲
শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তীর—	
রঘুবংশ	১৲
রাণী রাসমণি	১৲
জাগ্রত মেদিনী	১৲

ছোটদের অভিনব মাসিক পত্রিকা

চয়নিকা

১৮ বছরে পড়ল : বার্ষিক মূল্য মাত্র ৩৲

যে কোন মাসে টাকা পাঠালেও বৈশাখ থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক হতে হয়। নমুনার জন্য ৵০ আনার ডাক টিকিট অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা মাত্র। আনা। অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গ ও সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত।

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

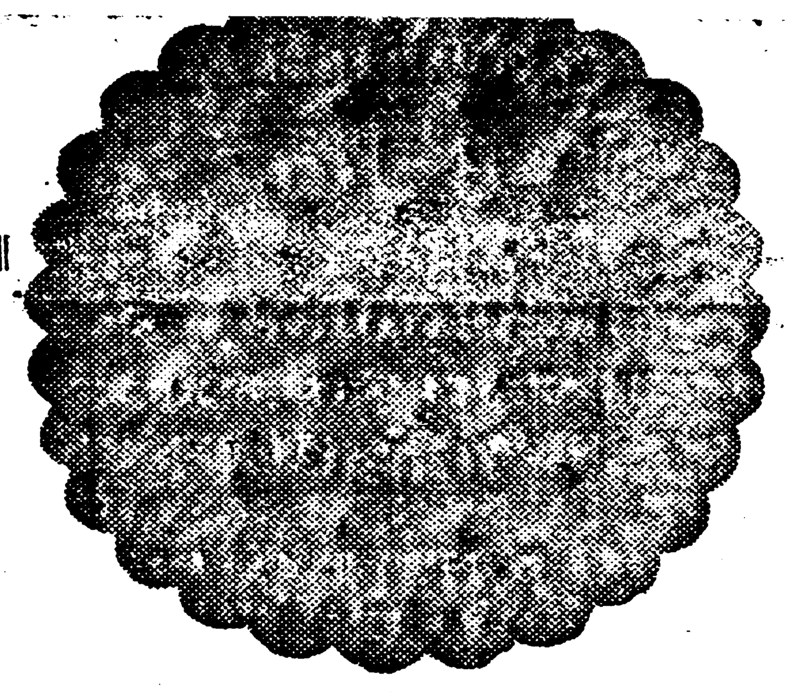

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে ; গুণে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৵৹

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২॥০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১।	নব পত্রিকা	— ৪৲
২।	জয়যাত্রা	— ৪৲
৩।	দেবালয়	— ৪৲
৪।	ইন্দ্রধনু	— ৪৲
৫।	বসুধারা	— ৪৲
৬।	পরশমণি	— ৪৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸৹

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥০

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১।০

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥৵৹

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানি বই]

এবার পূজায় বাহির হইল

১। যত হাসি ততই মজা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী— ২৲
২। পূজার দিনের উপহার—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

"আমরা নাচি দুলে দুলে—"

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৬৪ { ৭ম সংখ্যা

সবুজ চিঠি

শ্রীদীপালি সেনগুপ্তা, এম. এ

সোনারাঙ্গা ভোরে বসে আছি আজ— আসবে চিঠি,
কাল সে খবর দিয়ে গেছে মোরে নীল পাখীটি।
এখনো রয়েছে বনে বনে জমা আঁধার কালো,
আকাশের কোণে এখনো চাঁদের রূপালী আলো ;
শিশিরস্নিগ্ধ কোমল সবুজ বনের তলে
স্বপ্নমদির সুবাস ছড়ায় শেফালি দলে ;
দিকে দিকে চলে ভোর-বাতাসের ঝর্‌ঝরানি—
আমি খুঁজে ফিরি, কোথায় ফেলেছে সে চিঠিখানি !

পূবের দুয়ারে কালো আঁধারের ওড়্না সরে,
স্নিগ্ধ সুনীল আকাশে সোনার ঝর্‌ণা ঝরে।
মেঘের শিশুরা চলেছে আলোর তরণী বেয়ে,
কার স্নেহময় আশীষ ঝরে এ ভুবন ছেয়ে!
সমুখে সবুজ শান্ত উদার ধানের ক্ষেতে
ঢেউ বয়ে যায়, সোনারাঙ্গা শীষ উঠছে মেতে!
এসেছে এ চিঠি, বলে গেছে তাই নীল পাখীটি—
নীল খামে মোড়া সোনার আখরে সবুজ চিঠি।

নালন্দা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

নালন্দার কথা বলছিলাম।—নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষদের কথা। এঁদেরই একজন ছিলেন ধর্মপাল। ইনি কাঞ্চীপুরের লোক। এঁর পিতা ছিলেন কাঞ্চীপুরের মন্ত্রী। অল্প বয়সেই ইনি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। এঁর সুন্দর চেহারা আর মিষ্টি স্বভাবের জন্য কাঞ্চীরাজ ও রাণী এঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ধর্মপাল শাস্ত্রপাঠ শেষ করলে তাঁর সম্মানে রাজা-রাণী কাঞ্চীপুরে এক আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ধর্মপাল তখন বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ে বৌদ্ধনীতির ভক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মনে জেগেছে বৈরাগ্য। সেই উৎসবের মাঝেই তিনি গৃহত্যাগ করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে তিনি চলে আসেন নালন্দায়। এখানে এসে অধ্যাপনা সুরু করেন।

কয়েক বছর অধ্যাপনা করার পর তাঁর উদাসী মন আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনি নালন্দা ছেড়ে চলে যান কবি ভর্ত্তৃহরির কাছে পাণিনির ব্যাকরণ পড়তে।

ধর্মপালের পর নালন্দার অধ্যক্ষ হন শীলভদ্র। ইনি ধর্মপালের ছাত্র। অনেকে বলেন, ইনি ছিলেন বাঙালী,—নবদ্বীপে এঁর জন্মস্থান। আবার কেউ কেউ বলেন বিক্রমপুরের রামপাল গ্রামে এঁর জন্ম। শীলভদ্র ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিশারদ, অসাধারণ ছিল এঁর পাণ্ডিত্য। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এঁর কাছেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। শীলভদ্রের উপাধি ছিল 'দণ্ডদেব'।

এর পর তাঁর শিষ্য ধর্মকীর্তি নালন্দার অধ্যক্ষ হ'ন। ধর্মকীর্তি ছিলেন এই অঞ্চলেরই লোক। নালন্দার ছ'ক্রোশ দক্ষিণে কালপিনাক গ্রামে তাঁর জন্ম। নালন্দাতেই তিনি পড়াশুনা করতেন। বেদ, ব্যাকরণ, শিল্পবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে তিনি ছিলেন অসামান্য ব্যুৎপন্ন। পাঠ শেষ করে তিনি বৌদ্ধ হয়ে যান, এজন্য স্বজনেরা তাঁকে সমাজচ্যুত করে। তিনি নালন্দায় এসে বসবাস করতে সুরু করেন। অসামান্য ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রই ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। কথিত আছে যে কুমারিল ভট্ট যখন ধর্মতর্কে দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিলেন, তখন ধর্মকীর্তির সঙ্গে নালন্দায় তাঁর তর্কযুদ্ধ হয়। কুমারিল ভট্ট ধর্মকীর্তিকে পরাস্ত করতে পারেন নি।

নালন্দার শাস্ত্রপাঠের খ্যাতি চীনদেশ অবধি বিস্তৃত ছিল। এখানকার তর্কশাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন প্রভাকরমিত্র। প্রভাকরও ছিলেন বাঙালী। তিনি চীনদেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও ব্যাখা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

তিব্বতের রাজা খৃস্‌রণ্‌ দিউৎসাব নালন্দার অধ্যাপক শান্তরক্ষিতকে আমন্ত্রণ জানান ধর্মের জটিল তথ্যগুলি তিব্বতী পণ্ডিতদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য। শান্ত-রক্ষিত তিব্বতে যান। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

শান্তরক্ষিতের সঙ্গে ছিলেন নালন্দার আর একজন অধ্যাপক,—পদ্মসম্ভব। তিব্বতে যে বৌদ্ধধর্মনীতি আজ অবধি চলছে, যার নায়ক হচ্ছেন লামা—দলাই লামা ও পাঞ্চেন লামা,—ওখানে সেই লামা-বাদের প্রবর্তন করেন পদ্মসম্ভব।

"জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্য প্রবাহিনী,
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম উপহার,
রেখে গেল তা'র।
আপনার প্রাণসূত্রে যুগযুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি' স্বাক্ষর।"

নালন্দার স্তূপের উপর বসেছিলাম। সূর্য্য মধ্যাহ্নের আকাশ অতিক্রম করে পশ্চিমের আকাশে ঢলে পড়ছে। তৃতীয় প্রহর বেলা এগিয়ে চলেছে। শীতের দুপুর। চারিপাশে যতদূর চোখে পড়ে পরিষ্কার স্বচ্ছতা। মাথার উপর নীল নির্মেঘ আকাশ, নীচে মুক্ত প্রান্তর আকাশের গায়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছে। পিচঢালা পথটি সোজা গিয়ে হারিয়ে গেছে মাঠের মাঝে। সেই পথের পানে তাকিয়ে মনে হয় ওই পথ দিয়ে সারি সারি আসছে পথচারীর দল। আসছে শিক্ষার্থীর দল,—চোখে প্রতিভার দীপ্তি, মুখে তারুণ্যের উৎসাহ।

স্তূপের নীচে অতিথিশালায় এসে তারা সমবেত হলো। দ্বারপাল পণ্ডিতের কাছে নিজ নিজ পরিচয় দিল। দ্বারপাল পণ্ডিতেরা এবার জিজ্ঞাসা করলেন—নানা কূট প্রশ্ন। একে একে সকলেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। যাঁদের উত্তর যোগ্য বলে বিবেচিত হলো তাঁরাই এখানে পড়াশুনা করার অনুমতি পেলেন। কে কি পড়বে তাই তখন পণ্ডিতেরা স্থির করে দিলেন। এখানে যোগশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, অভিধর্ম, জ্যোতির্বিদ্যা, বৌদ্ধশাস্ত্র, বেদান্ত প্রভৃতি সব কিছুই পড়ানো হতো। দেড় হাজার অধ্যাপক পড়াশুনা করাতেন। অধ্যাপকেরা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ, সেই জন্য বৌদ্ধধর্মের চর্চাই এখানে বেশী হতো। ধর্মকর্ম ব্যতিরেকে কোন কার্যই সম্পন্ন করা হতো না। যে সব ছাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে এখানকার পরীক্ষায় পাশ করতেন, তাঁরা ইচ্ছা করলে এখানকার অধ্যাপক হ'তে পারতেন। সেই সব শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিপুল সমাবেশে এখানে সদাই সমারোহ। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের গৈরিক বসনের সমারোহ, মুণ্ডিত মস্তকের সমারোহ। সেই সমারোহ স্তূপের চারিপাশে ধূসর মাটির সঙ্গে যেন মিশে আছে। তাদের পদক্ষেপের দাগ যেন রয়েছে ওই বালুকণাগুলির গায়, স্তূপের সিঁড়ির প্রতি ধাপে ধাপে। ওই দেয়ালের প্রতিটি ইটের গায়ে তাদের হাতের স্পর্শ।

স্তূপ থেকে নেমে এলাম নীচে। নালন্দার দ্বারপথের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো, এই দ্বারে মাথা নত করে আসছেন বিদেশী আগন্তুকের দল। আসছেন হিউয়েন সাঙ, আসছেন ইৎসিং, আসছেন তিব্বতরাজের দূত, আসছেন চীনরাজের বার্তাবহ, আসছেন সুবর্ণদ্বীপ থেকে ভারতীয় রাজার দূত। সকলেই সাদর অভ্যর্থনা পাচ্ছেন,—সুস্বাগতম্!

হিউয়েন সাঙ এসেছিলেন শাস্ত্র পড়তে। হীনযান ও মহাযান দর্শন, হেতুবিদ্যা শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অথর্ববেদ পাঠ করার জন্য কয়েক বছর তিনি নালন্দাতেই রয়ে গেলেন।

হিউয়েন সাঙ বিদায় নিলেন। শুধু শিক্ষা গ্রহণ করেই তিনি গেলেন না, তিনি লিখে রাখলেন কি তিনি দেখলেন, কি তিনি শিখলেন :

"বিরাট বিরাট সঙ্ঘারাম। মহারাজ শক্রাদিত্য তৈরী করে দিয়েছেন একটি। তার দক্ষিণে তাঁর পুত্র বুদ্ধগুপ্ত নির্মাণ করিয়েছেন আরেকটি সঙ্ঘারাম। তার পূর্ব দিকের গৃহটি তথাগতগুপ্তের তৈরী। তার উত্তরপূর্বে বালাদিত্যের সঙ্ঘারাম। তার পশ্চিমের গৃহটি বজ্রের তৈরী। উত্তরে সব শেষের সঙ্ঘারামটি মধ্যভারতের এক রাজার তৈরী। তিনি আবার সব ক'টি সঙ্ঘারাম ঘিরে এক দীর্ঘ দেয়াল তুলে দিয়ে গেছেন।

"এখানে কয়েক হাজার শ্রমণের বাস। প্রত্যেকেই অসামান্য প্রতিভাধর। এমন অনেকে আছেন যাঁদের খ্যাতি ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত। এঁদের চরিত্র নিষ্কলুষ। ধর্মের নীতিগুলি এঁরা বর্ণে বর্ণে পালন করেন। এখানকার রীতিনীতি—আচার-ব্যবহারের অনুশাসন বড় কঠিন, কিন্তু এই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সে সবই যথারীতি পালন করেন। অন্যান্যেরা তাঁদের দেখে শেখেন। অধ্যাপনাতে তাঁদের সারাটা দিন কাটে। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁরা শাস্ত্র আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেন, সারাদিন ধরে কঠিন কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁদের এতটুকু ক্লান্তি দেখা যায় না। সকলেই পরস্পরকে সহায়তা করার জন্য উন্মুখ। নানা স্থান থেকে নানা ধরণের পণ্ডিত এখানে এসে সমবেত হয়েছেন,—শাস্ত্রের যেখানে যা কিছু সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা আলোচনা করে সহজবোধ্য মীমাংসা করে নেবার জন্যে। এখানে শিক্ষা শেষ করে যাঁরা চলে যান, বাইরে তাঁদের সম্মান খুবই—'নালন্দার ছাত্র'! কিন্তু নালন্দার ছাত্রা হওয়া বড় নেহাৎ সহজ নয়। বাইরে থেকে এখানে কেউ এলেই, তাকে অনেক পড়াশুন করে আসতে হয়। যে সব পণ্ডিতেরা দ্বার রক্ষা করেন, তাঁদের কাছে নবাগতদের পরীক্ষা দিতে হয়। প্রশ্নগুলি নেহাৎ সহজ হয় না, প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থ পড়া না থাকলে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। উত্তর দিতে না পারলেই ব্যর্থকাম হয়ে শিক্ষার্থীকে ফিরে যেতে হয়। প্রতিভাধর ছাত্র না হলে নালন্দায় প্রবেশ করা কঠিন। যদি দশজন আসেন, তো তাঁদের মধ্যে সাত-আট জনই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান।"

হিউয়েন সাঙ এই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন। শীলভদ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁকে মুগ্ধ করে। পাঁচ বছর এখানে থেকে যোগ, অভিধর্ম হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি 'মোক্ষদেব' উপাধি পান।

হিউয়েন সাঙের পরে এলেন ইৎসিং। দীর্ঘকাল তিনি এখানে ছিলেন। তিনি এখানে প্রায় তিন হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে পড়াশুনা করেন। এখানকার সুশৃঙ্খলা তাঁকে মুগ্ধ করে। ইৎসিং দশ বছর নালন্দায় থাকেন। দেশে ফেরার সময় চারশো সংস্কৃত গ্রন্থ ও পাঁচ লক্ষ শ্লোক ইনি নকল করে নিয়ে যান।

কোরিয়া থেকে, তিব্বত থেকে আরো কতজন আসেন নালন্দায়, তাঁদের নাম এখন আর আমাদের জানা নেই।

'হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান;
বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি, বুঝিতে না পারি.
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি?"

তারপর আমরা এলাম নালন্দার যাদুঘরে। সে গল্প আর একদিন বলব।

চন্দ্রবাবুর ত্রিজ

শ্রীকল্যাণী দেবী

দাঁতের আর একটা নাম দ্বিজ, কারণ দাঁত দু বার জন্মায়। একবার অতি শৈশবে, আর একবার সেগুলো পড়ে গিয়ে ছ'-সাত-আট-নয় এই রকম বয়সে।

চন্দ্রবাবুর দাঁতগুলোকে কিন্তু ত্রিজ বলা যেতে পারে। কারণ তাঁর অধিকাংশ দ্বিজগুলোই যখন পায়োরিয়ার হাত ধরে মাড়িকে ফাঁকি দিয়ে ফাঁক করে গেল, তখন ডেন্টিষ্ট সুধীরবাবু অতি যত্নে চন্দ্রবাবুর সেই ফাঁকগুলোকে ভরাট করে দিলেন। আশ্বাস দিলেন, পায়োরিয়ার বাবা এলেও এদের কিছু করতে পারবে না। বল্লেন, এ ভরাটের মধ্যে এমন কোন ফাঁক তিনি রাখেন নি যেখান দিয়ে পায়োরিয়া, দন্তশূল, দাঁতের পোকা কিংবা অন্য কেউ মাথা গলাতে পারে।

চন্দ্রবাবু কিন্তু প্রথমটায় এই ত্রিজদের সাহায্য নিতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। খাদ্য ছাড়া অন্য কিছু মুখের ভেতর ঢুকে বসে থাকবে, এ চিন্তাও তাঁর অসহ্য মনে হ'ত। অবশ্য শিশুকালে, যখন জ্ঞান হয় নি তখন স্বেচ্ছায় যে সব জিনিষ মুখের মধ্যে পুরেছেন, তার অধিকাংশই হয়ত খাদ্যতালিকাভুক্ত ছিল না; তাই বলে এই বয়সেও? কিন্তু গোল বাধালো তাঁর বন্ধুরা। প্রকাশবাবু বল্লেন, 'কি রকম ফোক্‌লা হয়ে আছ হে, বড়ই বিশ্রী দেখায়—দাঁতগুলো বাঁধিয়ে ফেলো।' মণ্টুবাবু বল্লেন, 'তা ছাড়া কি যে বল, কিছুই বুঝতে পারি না; ফাঁকা মাড়ি দিয়ে তো ফক্‌ফক্ করে সব কথাই বেরিয়ে যায়।' বিমলবাবু বল্লেন, 'বয়সটাই কি তোমার ফোক্‌লা হবার মত হয়েছে নাকি? দেখো তো আমাদের দাঁত, কেমন সব পাহারাদার দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুমি তো আমাদেরই বয়সী!'

তা বটে। বয়সটা সত্যিই তাঁর ফোক্‌লা হবার মত নয়। যেদিন প্রথম দাঁতটা পড়ে, তাঁর ছ' বছরের ছেলে খোকন দৌড়ে গিয়েছিল চন্দ্রবাবুর মা-কে সংবাদটা দিতে। 'ঠাক্‌মা,

বাবার দাঁত পড়ে গিয়েছে।' ঠাক্‌মা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে খোকনের দিকে চেয়ে ধমকে উঠেছিলেন—'দাঁত পড়েছে কি? বল দুধের দাঁত!'

আজকাল অনেকেই তাঁকে 'বুড়ো বাবু' বলে সম্বোধন করে—এ সম্বোধনটা তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। তার ওপর ট্রামে নাকি সেদিন একটি ছোক্‌রা তাঁকে বলেছিল—'একটু সরে বসুন না দাদু!' কাজেই তিনি দাঁত বাঁধাতে রাজি হয়ে গেলেন। ডেন্টিষ্ট সুধীরবাবু তাঁর মুখের ও মাড়ির নানা রকম মাপজোক. ছাপ ইত্যাদি নিয়ে বেশ পরিপাটি করে তাঁর পুরোপুরি দু' পাটি দাঁতই বাঁধিয়ে দিলেন, বল্লেন, 'দেখবেন, কথা বলে সুখ হবে, খেয়ে সুখ হবে, আর চেহারা তো খোলতাই হ'লই।'

কয়েক দিন পর চন্দ্রবাবুর বন্ধুরা এসে ডাকতেই খোকন বেরিয়ে এল। বল্‌ল, 'বাবার ভয়ানক দাঁতব্যথা হয়েছে।' বন্ধুরা শুনে অবাক্! 'সে কি রে, তোর বাবার দাঁত কই যে দাঁত ব্যথা হবে?' খোকন বলল—'ও মা, বাবার যে এখন অনেক দাঁত—ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে কিনে এনেছেন, জানেন না বুঝি?' বিমলবাবু বল্লেন, 'ডাক তোর বাপকে, দেখি কেমন দাঁতব্যথা!'

চন্দ্রবাবু বেরিয়ে এলেন। মণ্টুবাবু বল্লেন, 'কি হে, ভয়ানক নাকি দাঁতব্যথা?' চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চেয়েই প্রকাশ বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—'আরে রাম, দাঁতের পাটি যে খুলে ফেলেছ দেখছি, তবে ব্যথাটা কোথায়?' বন্ধুরা খুব হাসতে লাগলেন। বিরক্ত হয়ে চন্দ্রবাবু বল্লেন—'অমন আহাম্মুকের মত হেসো না। এতদিন দাঁতও ছিল না, ব্যথাও ছিল না। তোমাদের পরামর্শে দাঁত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাও এল। এখন দাঁত নেই, খুলে ফেলেছি, কিন্তু ব্যথাটি আছে।'

চন্দ্রবাবুর কাছে বন্ধুরা ব্যাপারটা শুনলেন। নতুন দাঁত পরবার পর চন্দ্রবাবুর যেন একটু ব্যথা বোধ হচ্ছিল। ডাক্তারবাবু বল্লেন, 'ও কিছু নয়, প্রথমটায় ওরকম মনে হচ্ছে; ওটা পরে থাকা অভ্যেস করুন।' সেই পরে থাকাটা অভ্যেস করতে গিয়েই এই বিপদ। দাঁতের পাটি সব সময় পরে থেকে ব্যথায় তাঁর দাঁতকপাটি লাগবার জো হয়েছে। সমস্ত মাড়ি ফুলে গিয়েছে, খাওয়া দূরস্থান কথাই বলতে পারছেন না। মা একটু হড়্‌হড়ে করে সুজির পায়েস রেঁধে দিচ্ছেন, কোনমতে তাই গলাধঃকরণ করছেন।

আবার ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হতে হ'ল। তিনি বল্লেন, 'ঠিকমত বসে নি দাঁতের পাটি, তাই ব্যথা হচ্ছে। আচ্ছা আমি ঠিক করে দিচ্ছি।'

দাঁত ঠিক হ'ল, চন্দ্রবাবুর দাঁতের ব্যথাও সেরে গেল! কিন্তু তাঁর কথা বলাটা কিছুতেই সহজ হতে চাইল না। একটু জোরে কথা বলতে গেলেই পুরো পাটিটাই যেন ঠেলা খেয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। সুতরাং তাঁকে ছেলেদের ধমকানো বা কোনও কারণে রাগারাগি চটাচটি করা প্রায় বন্ধ করে ফেলতে হ'ল। কারণ দাঁতের পাটি হাতে নিয়ে ধমকচমক করা কেমন যেন বিসদৃশ দেখায়। অথচ ওটি না খুলে জোরে কথা কইবারও উপায় নেই; তাহলে কথার আগে ও-ই মুখ থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। চন্দ্রবাবু অগত্যা দাঁত চেপে কথা কইতে সুরু করলেন। কিন্তু তাতেও মুস্কিল

বাধলো। বন্ধুরা ব্যঙ্গ করতে সুরু করলেন, 'কি হে, আজকাল অমন ব্রাহ্ম ষ্টাইলে কথা কইছ কেন?' চন্দ্রবাবু ভাবলেন, দূর হোক্ গে, দাঁত আর পরবেন না। না হয় লোকে বুড়োই বলবে, না হয় একটু খারাপই দেখাবে! কিন্তু অনেকগুলো টাকা খরচ করে দাঁত করিয়েছেন, সেটা অব্যবহারে পড়ে থাকবে! ভাবতেই তাঁর গা কর্‌কর্ করে উঠল। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি স্থির করলেন যে প্রত্যহ খানিকটা করে কথা বলা তাঁকে অভ্যাস করতে হবে—জোরে জোরে কথা বলা। কিন্তু কেমন করে তা অভ্যাস করবেন? অকারণে কার সঙ্গে তিনি জোরে জোরে কথা কইবেন? আর সত্যিকার রাগ না হলে রাগারাগিই বা কেমন করে করা সম্ভব? শেষ কালে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তিনি ঠিক করলেন, রোজ একটু করে তিনি আবৃত্তি করবেন—বীররস আবৃত্তি। তাইতেই কথা বলাটা বেশ সড়গড় হয়ে যাবে। কিন্তু সকলের সামনে তো এটা করা যায় না, ছেলেমেয়েরা হাসবে যে! কোন একটা উপায় ঠিক করতে হবে।

পরদিন সকালে তিনি ছেলেমেয়েদের পড়ার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বড় মেয়েকে বল্লেন, 'দেখি, কেমন পড়ছিস্? বার কর তো তোর ইংরিজি বই।' মেয়ে বই বার করল। চন্দ্রবাবু বল্লেন, 'কিছুই তোরা পড়িস্ না, খালি ফাঁকি মারিস। আয়, আমি নিজে তোদের পড়াব।' ছেলে-মেয়েরা তো অবাক্! বাবার হ'ল কি? কোনদিন তিনি তাদের পড়া দেখেন না, কখনও পড়া বুঝতে গেলে বলেন, 'আমার সময় নেই, ওবেলা মাষ্টারমশাই এলে দেখে নিস।' সেই বাবা আজ যেচে পড়াতে চাইছেন! চন্দ্রবাবু একটা চেয়ারে বসে পড়ে ইংরেজি বইটা টেনে নিলেন। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তাঁর 'You are old father William' এর দুটো লাইন চোখে পড়ল। "In my youth", said his father, "I took to the Law, and argued each case with my wife—" (যৌবনে আমি ওকালতি করতাম এবং প্রত্যেকটি মাম্‌লা নিয়ে বাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদ করতাম।)

চন্দ্রবাবুর মনে হ'ল বুড়ো উইলিয়ামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে কেমন হয়? স্ত্রীর সঙ্গে রোজ একটু তর্কাতর্কি যদি করা যায়! কিন্তু পরক্ষণেই তিনি মনে মনেই মুষড়ে পড়লেন। কারণে তর্কাতর্কিই তাঁর স্ত্রী সহ্য করতে পারেন না, আর অকারণে?·· তিনি ফর্‌ফর্ করে পাতা উল্টে যেতে লাগলেন; একটা কটোমটো ধরণের কবিতা খুঁজতে লাগলেন; পেলেনও—

'The Assyrians came down like wolves on the fold'—বেশ পছন্দ হ'ল কবিতাটা তাঁর। তিনি মেয়েকে বল্লেন, 'শোন্, আমি পড়ি।' তারপর তাঁর পড়া চল্‌ল। পড়ার ছন্দের তালে তালে তাঁর দাঁতের পাটি নাচতে লাগল—অনেক কসরৎ করে তিনি সেটা মুখের ভিতরে আটকে রাখতে সমর্থ হলেন। বাবা যে এমন থিয়েটারী ঢংএ আবৃত্তি করতে পারেন তা মেয়ের একেবারেই জানা ছিল না, সে অবাক্ হয়ে বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ঐ কবিতাটা যে তাদের পাঠ্যতালিকায় নেই, সে কথাটা বলতেও ভুলে গেল। হঠাৎ মেয়ের মুখের দিকে নজর পড়তেই চন্দ্রবাবু লজ্জিত হয়ে থেমে গেলেন। 'আচ্ছা, আজ থাক্'—বলে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে পালিয়ে গেলেন।

এর দু'-চারদিন বাদে একদিন রাত দুপুরে চন্দ্রবাবুর স্ত্রীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলেন, ঘরে

আলো জ্বলছে আর চন্দ্রবাবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট দুটো টেনে টেনে কি যেন করছেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ভাবলেন, আবার নিশ্চয় তাঁর দাঁতব্যথা হয়েছে। জিজ্ঞেস করতে গেলেন, 'কি হল?'—হঠাৎ চন্দ্রবাবু দু' হাতে ঘুঁষি পাকিয়ে নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে আস্ফালন করে উঠলেন—

"মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে? জান না কি
তাতার বালক মাতৃ-অঙ্ক হতে ছুটে যায়
সিংহশিশু সনে করিবারে মল্লরণ?"

চন্দ্রবাবুর স্ত্রী চমকে উঠলেন। কি ব্যাপার! তাঁর স্বামীর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? কিন্তু কোন দিন তো তেমন আভাস্ পাওয়া যায় নি! তাঁর ভয়ানক ভয় হ'ল, ভাবলেন শ্বাশুড়ীকে ডেকে আনবেন। কিন্তু চন্দ্রবাবুর আস্ফালন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে দেখে তিনি আর উঠতে সাহস করলেন না। কি জানি ওঁকে উঠতে দেখে যদি শেষকালে ওঁর সঙ্গেই তিনি মল্লরণ শুরু করে দেন! তিনি নিঝুম হয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখে শুয়ে রইলেন। চন্দ্রবাবুর আস্ফালন সমানভাবেই চলতে লাগল।

কিছুদিন পর। রবিবার। চন্দ্রবাবু খেতে বসেছেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। মাংস রান্না হয়েছে, ছেলেপুলেরা আনন্দ করে খাচ্ছে। কিন্তু চন্দ্রবাবু তেমন যুৎ করতে পারছেন না। ডাক্তার বাবু দাঁত পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'খেয়ে সুখ হবে, কথা বলে সুখ হবে, চেহারা তো খোলতাই হ'লই।' এর ভেতর চেহারাটাই যা একটু খোলতাই হয়েছে, নইলে তিনি কথা বলেও সুখ পাচ্ছেন না, খেয়ে তো নয়ই! মাংসের হাড় কই চিবুনো যাচ্ছে?

ছেলেবেলায় তাঁর একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সব দাঁত যখন পড়ে গেল, সবাই বল্লে দাঁত বাঁধিয়ে ফেলতে। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। কোন মেকি জিনিষেই তাঁর আস্থা ছিল না। বলতেন, 'মেকি জিনিষ মাত্রেই ফাঁকি।' সবাই বল্লে, 'চিবুতে অসুবিধা হবে যে!' তিনি বল্লেন, 'কেন, আমার মাড়ি নেই?' তারপর মাড়ি দিয়ে নানা শক্ত জিনিষ চিবোতে চিবোতে তিনি সত্যিই মাড়িটাকে এমন শক্ত করে ফেল্লেন যে মাংসের হাড় পর্য্যন্ত দিব্যি কড়মড় করে চিবিয়ে খেতেন।

চন্দ্রবাবুর মনে পড়ল তাঁর সেই মাষ্টারমশায়ের কথা। গুরুজনের পন্থা অনুসরণ করে দেখলে কেমন হয়? একজন যাহা পারিয়াছে তুমিই বা তাহা পারিবে না কেন? 'পাঁচজনে পারে যাহা তুমিও পারিবে তাহা' ইত্যাদি মহাজনবাক্য তাঁর মনে পড়তে লাগল। দাঁতের পাটি খুলে ফেলে তিনি থালার একপাশে রেখে দিলেন।

খাওয়া শেষ করে অন্যমনস্কভাবে উঠে গেলেন চন্দ্রবাবু। আঁচাতে গিয়ে দেখলেন মুখে দাঁত নেই। থালাটার কাছে ফিরে এলেন কিন্তু দাঁত তো নেই থালাতে! মাষ্টার মশাই বলতেন, মেকি টাকার মত মেকি দাঁতও অচল। সেই অচল দাঁত আজ সচল হ'ল নাকি? তিনি ব্যস্ত হয়ে ছেলে-মেয়েদের ডাকতে লাগলেন, 'ওরে খোকন, টুকু, আমার দাঁত কোথায় গেল?'

তাই তো, বাবার দাঁত গেল কোথায়? এই তো থালার একপাশে রাখা ছিল, তারাও দেখেছে। হঠাৎ খোকন লাফিয়ে উঠল, 'নিশ্চয় বিট্‌লে নিয়ে গেছে হাড় মনে করে!'

ধর—ধর—সবাই ছুটল বিট্‌লের সন্ধানে। বিট্‌লে সবেমাত্র সামনের থাবা দুটির মধ্যে দাঁতের

পাটিটি নিয়ে বসেছিল, এরা তেড়ে আসতেই সে টপ্ করে সেটা মুখের মধ্যে ফেলে ছুট দিল। চন্দ্রবাবু বললেন, 'দু'-পাটিই মুখে পুরেছে নাকি? নাকি একপাটি কোথাও ফেলেছে ছাখ্।' বিটলে সারা বাড়ী ছুটে বেড়াতে লাগল, পেছন পেছন ছেলেমেয়েরা। চন্দ্রবাবুর মা বললেন, 'মাগো, কি অনাছিষ্টি!'—শেষকালে বৈঠকখানাতে বিটলেকে পাকড়াও করা গেল। ধমকচমক, খোসামোদ, মিষ্টিকথা—অনেক কিছু চলতে লাগল, যাতে দাঁতগুলোকে উগড়ে দেয়। কিন্তু বিটলে একেবারে মুখ বন্ধ করে আছে। খোকন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল 'ওটা হাড় নয় রে বিটলে, বাবার দাঁত। দিয়ে দে না রে, তোকে ভাল হাড় দেবো খেতে।' টুকু হাঁড়ি থেকে বেছে বেছে ভাল দেখে দুটো হাড় নিয়ে এসে বিটলের নাকের সামনে নাচাতে লাগল, কিন্তু বিটলে নির্বিকার।

ঠিক এই সময়ে চন্দ্রবাবুর বন্ধুরা এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা রবিবারের আড্ডা দিতে এসেছেন।

মণ্টুবাবু বললেন, 'কি রে, তোরা কুকুরটাকে নিয়ে অমন ধ্বস্তাধ্বস্তি কচ্ছিস কেন?'

খোকন বলল, 'ওর মুখের ভেতর দাঁত!'

কথা শুনে হাঁ হয়ে গেলেন মণ্টুবাবু; বললেন, 'দাঁত মুখের ভেতর থাকবে না তো কি মাথার ভেতর থাকবে?'

প্রকাশবাবু বললেন, 'মুখের ভেতর দাঁত। তাই তো, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে!'

টুকু বলল, 'ওর দাঁত নয়, বাবার দাঁত!'

'এঁ্যা, বিটলের সঙ্গে দাঁত বদল করেছে নাকি তোর বাবা?'

চন্দ্রবাবু এমন সময়ে বাইরের ঘরে ঢুকলেন। বিমলবাবু বললেন, 'কি হে, বিটলের সঙ্গে দাঁত বদল করেছ শুনেছি—এবার তেড়ে কামড়াতে আসবে নাকি?' খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে লাগলেন তিনি।

চন্দ্রবাবু চটে উঠলেন—'অমন বর্ব্বরের মত হেসো না। তোমাদের পরামর্শে দাঁত বাঁধিয়েই তো এ সব ফ্যাসাদে পড়েছি।'

অনেক কষ্টে বিটলের মুখ থেকে চন্দ্রবাবুর দাঁত উদ্ধার করা গেল। নানা ভাবে সে দাঁতকে শোধন করে নিয়ে তিনি সেটাকে আবার মুখস্থ করলেন।

চন্দ্রবাবু প্রত্যহ খাবার সময় কিছু না কিছু খোকনের জন্য প্রসাদ রেখে যেতেন, খোকন খুব খুশী হয়ে সেটা খেত। কিন্তু ইদানীং খোকনের মা দেখলেন, সে আর তার বাবার প্রসাদ খায় না। একদিন তিনি ডেকে বললেন, 'ওরে খোকন, তোর বাবার রেকাবীতে ক'খানা লুচি রয়ে গেছে, খেয়ে ফেল্।'

খোকন বলল, 'আমি খাব না।'

'কেন?'

খোকন নাক সিঁটকে বলল—'উঃ, বিটলের এঁটো!' মা বললেন, 'ও মা, বিট্‌লে আবার কখন রেকাবীতে মুখ দিল?'—'রেকাবীতে মুখ দেবে কেন, বাবার দাঁত বুঝি বিট্‌লে এঁটো করে ফ্যালে নি?'

অনেক রাগারাগি, বকাবকি, খোসামোদ ইত্যাদি করলেন মা, কিন্তু কিছুতেই খোকনকে লুচি ক'খানা খাওয়াতে পারলেন না।

চন্দ্রবাবুর ছোট শালার পৈতে। শ্বাশুড়ী অনেক করে যাবার জন্যে লিখেছেন। অনেকদিন

মেয়ে-জামাই ও নাতি-নাতনীদের দেখেন নি, তাই—ইত্যাদি ইত্যাদি। চন্দ্রবাবুর স্ত্রী বললেন, 'চলই না, ছুটি তো তোমার পাওনা আছে।'

অগত্যা সপরিবারে তিনি গেলেন শ্বশুরবাড়ী পাটনায়। শ্বশুরবাড়ী জমজমাট্। শালীরা, ভায়রাভাইরা, কর্ম্মস্থল থেকে শালারা এবং কাছাকাছি জায়গা থেকে কোনও কোনও আত্মীয়বন্ধুও এসেছেন। চন্দ্রবাবুও তাঁর ছেলেমেয়ের খুব সমাদর চলতে লাগল, কারণ বহুদিন পর এসেছেন তাঁরা। বিশেষ করে তাঁর জ্যাঠ্‌শ্বশুরের কাছে। তাঁর নিজের মেয়ে ছিল না, আর চন্দ্রবাবুর স্ত্রী শৈলই ছিল বাড়ীর প্রথম মেয়ে। তাই এই ভাইঝিটিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন।

পৈতের উৎসব অনুষ্ঠান সমারোহের সঙ্গে শেষ হয়ে গেল। তারপর একদিন দুপুরবেলা লম্বা টানা বারান্দার দু'ধারে সারি সারি জায়গা পড়েছে, শৈল জ্যাঠামশায়ের আসনখানা একটু দূরে পেতে দিয়েছে কারণ সেদিন মুর্গী রান্না হয়েছে, জ্যাঠামশাই আবার মুর্গী খান না।

কিন্তু জ্যাঠামশাই গোলমাল করে উঠলেন—'হ্যাঁ রে শৈল, আমি কি অছুৎ, অমন দূরে দিয়েছিস্ কেন আমাকে?'

শৈল বলল, 'এরা সব মুর্গী খাবে, আপনি তো খান্ না, তাই—'

—'তাই বলে আমি পরম বৈষ্ণব নাকি? না, না, সবার সঙ্গে দে আমাকে—চন্দরের জায়গাটা আমার পাশেই দিস্।'

সকলের সঙ্গে চন্দ্রবাবুও আনন্দ করে খেতে লাগলেন। মুর্গী দেখে খুব আশান্বিত হয়ে উঠলেন তিনি। মুর্গীর নরম হাড়, নকল দাঁত দিয়ে চিবোতে পারবেন নিশ্চয়ই।

কিন্তু বিধি তাঁর ওপর প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি একটা পুরুষ্টু ঠ্যাং নিয়ে যেমনি কড়াং করে কামড় বসিয়েছেন অমনি ওপরের দাঁতের পাটি আল্‌গা হয়ে বেরিয়ে পড়ল। তিনি তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে সামলাতে গেলেন কিন্তু তাঁর হাত ফসকে হাড় সমেত দাঁতটা গিয়ে পড়ল জ্যাঠামশায়ের পাতে। জ্যাঠামশাই খেতে খেতে নাতি-নাতনীদলটির সঙ্গে হাসিতামাসা করছিলেন। তারা খাচ্ছিল একপাশে বসে। হঠাৎ থালার ওপর খট করে আওয়াজ হতেই সেদিকে চোখ ফেরালেন। হাড়টার দিকে নজর পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ কি শৈল, আমার পাতে মাংস দিলি যে!'

—'কই, না তো!' শৈল অবাক্ হয়ে বলল।

—'তবে ছাখ্ তো এটা কি পড়ল আমার পাতে?'

মাংসের হাঁড়ি হাতে শৈল এগিয়ে এল। জ্যাঠাইমা একটু দূরে বসে খাওয়ার তদারকি করছিলেন; তিনি জ্যাঠামশায়ের থালার দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, রাঁধলি তো মুর্গী, পাঁঠার দাঁত এল কোত্থেকে?'

দাঁতটা যে কোন্ পাঁঠার, বুঝতে শৈলর এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় নি; সবার অলক্ষ্যে সে কটমট করে চন্দ্রবাবুর দিকে চাইল। ছেলেপুলেরা দাদুর পাতে পাঁঠার দাঁত দেখবার জন্যে খাওয়া ফেলে উঠে এল, আর সকলেও আপন আপন আসন থেকে গলা উঁচু করে জ্যাঠামশায়ের পাতের দিকে চেয়ে রইল।

একমাত্র চন্দ্রবাবুর দৃষ্টিই তাঁর নিজের পাতের দিকে নিবদ্ধ। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তিনি তখন ভাবছেন, সীতার জন্যে ধরণী একবার দ্বিধা হয়েছিলেন, তাঁর জন্যে কি আর একবার হবেন না?

বাংলার মন্দির

হংসেশ্বরী-মন্দির—বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।

প্রত্যেক দেশেই ঘরবাড়ীর চেহারায় একটা নিজস্ব ঢং আছে। বাংলার মন্দিরগুলি দেখলেও স্থাপত্যের এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট চোখে পড়ে। এখানে তার হু'টি নমুনা দেওয়া হ'ল।

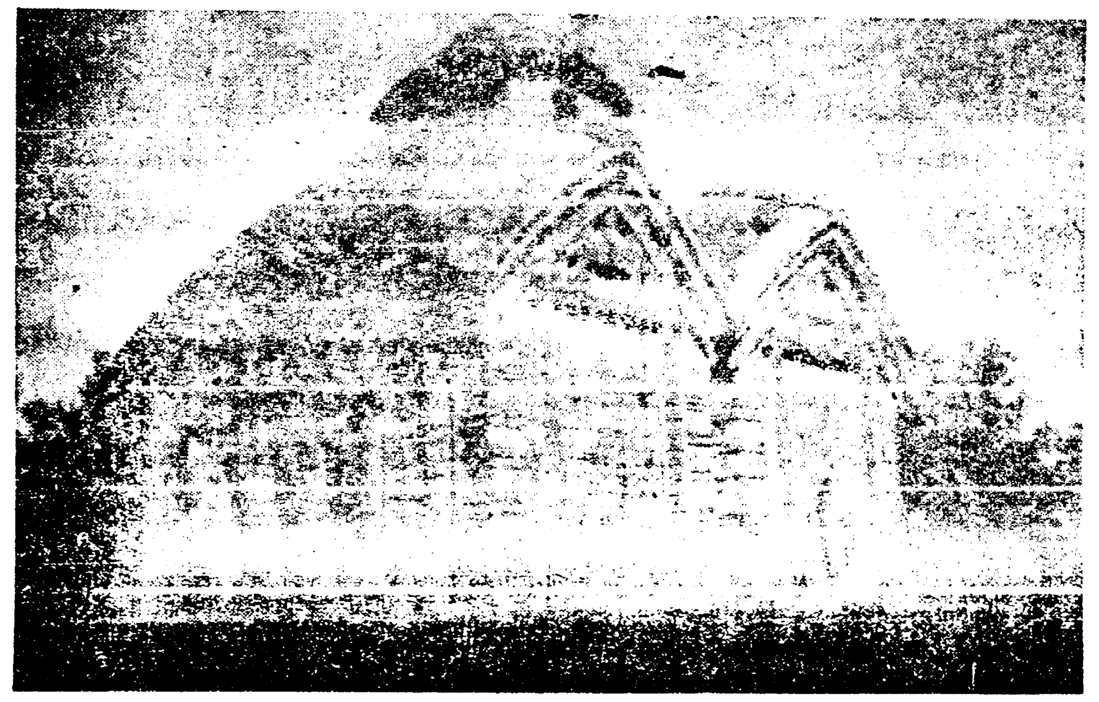

যোড়াবাংলা-মন্দির—বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

ভাগ্যিস্—

শ্রীজয়দেব রায়, এম্. এ

মস্ত এক ওষুধের দোকান। শহরের সেরা সেরা ডাক্তারেরা এখানকার ওষুধই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব'লে ব'লে থাকেন। তাই সর্বদাই এখানে খরিদ্দারের ভীড়।

সেদিনও সন্ধ্যাবেলা দোকান ভর্তি খরিদ্দার। এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিরাট একটা মোটর গাড়ী ক'রে দোকানের সামনে এসে নামলেন; এবং এসেই, খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে, একটা খুব দামী বিলাতী ওষুধের বড়ির নাম করলেন। দোকানের একটি চটপটে ছোকরা তখনই ওষুধটা এনে ক্যাশ মেমো করে তাঁর হাতে তুলে দিল। বৃদ্ধ তেমনি ব্যস্তভাবে আবার গিয়ে মোটরে উঠলেন।

সেই রাত্রিতেই দোকানে একটা জরুরী তার এল। যারা ঐ ওষুধ পাঠিয়েছিল তারাই তার করেছে। জানিয়েছে, এর আগের মেলে যে ওষুধের চালানটা এসেছে সেটার বিক্রী যেন বন্ধ রাখা হয়। কারণ ওটায় ভুলক্রমে একটা বিষাক্ত ওষুধ পড়ে গেছে যা খেলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

তার পেয়েই মালিক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তখন তাড়াতাড়ি ওষুধের বাক্সগুলো সীল ক'রে ফেলা হ'ল। কিন্তু দেখা গেল একটা শিশি এরই মধ্যে বিক্রী হয়ে গেছে। সেল্‌স্‌ম্যান্‌দের ডাকা হ'ল। একটু ভাবতেই সেই ছোকরা সেল্‌স্‌ম্যান্‌টির মনে পড়ল—ব্যস্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির কথা।

দোকানের মালিক হয়তো ইচ্ছা করলে ব্যাপারটা বেমালুম চেপে যেতে পারতেন, কারণ তিনি তো ইচ্ছা ক'রে জেনেশুনে ঐ ওষুধ বিক্রী করেন নি! কিন্তু বিবেক ব'লেও একটা জিনিষ আছে তো!

তাড়াতাড়ি ক্যাশ মেমো উল্‌টিয়ে দেখা গেল—ক্রেতা ভদ্রলোকটির নাম দেওয়া আছে—মিঃ দত্ত। নিজের মস্ত গাড়ী ক'রে ভদ্রলোক এসেছিলেন, কাজেই বাড়ীতে নিশ্চয়ই তাঁর ফোন্ আছে। তখনই টেলিফোন তালিকা ঘেঁটে যেখানে যত মিঃ দত্ত আছে সবাইকে অনুরোধ করা হ'ল—'বড়িগুলো বিষাক্ত, স্যার, দয়া ক'রে খাবেন না।'

কিন্তু এতেও মন মানে কই? তখন ডাক্তারখানা এক এক করে শহরের সব ডাক্তারদের জানাতে সুরু করল 'মিঃ দত্ত নামে তাঁদের যদি কোন রোগী থাকেন, তাঁকে বড়িগুলো খেতে বারণ করবেন।' খবরের কাগজেও একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল ঐ মর্মে,—সেই রাত্রেই, জরুরী চার্জ দিয়ে।

এদিকে আরও মজা! বৃদ্ধ ভদ্রলোক মি দত্ত থাকেন দমদমে। জিনিসপত্র

কিনে তখনই তিনি বাড়ী ফিরে গিয়েছেন। বাড়ী গিয়ে কিন্তু তিনি ওষুধের প্যাকেকটা আর খুঁজে পান না!

ব্লাড প্রেসারের রোগী তিনি, রেগেমেগে অস্থির। ড্রাইভার ভয়ের চোটে আর আসল কথা বলতে সাহস করছিল না। সে যখন গাড়ী চালিয়ে আসছিল, সেই সময় ঝাঁকুনি খেয়ে ওষুধের শিশিটা ভেঙে যায়। সে তখনই লুকিয়ে সেটা রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।

পরদিন সকালে খবরের কাগজের প্রথম পাতা দেখেই দত্ত মশাইএর চক্ষু চড়ক গাছ। ভাগ্যিস কাল ওষুধটা হারিয়ে গিয়েছিল, নইলে এতক্ষণে—! টেলিফোন্‌টাও আবার কাল গতিক বুঝে বিগড়ে ছিল।

যাই হোক্, মিঃ দত্ত তখনই ডাক্তারখানায় ফোন্ করে জানিয়ে দিলেন যে ওষুধটা তিনি খান নি তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।*

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

দেবতার রোষ

বন্দে আলী মিয়া

অনেক দিনের অনেক কালের কথা !
সেই সে কাহিনী বুকে আনে আজ বাক্‌হীন নীরবতা।
আমার যখন কিশোর বয়স—সেই পুরাতন দিনে
ঘুরেছি ফিরেছি আপনার মনে অজানা পথটি চিনে।
বনে ও বাদাড়ে খুঁজেছি কোথায় পাখী বাঁধিয়াছে বাসা,
এনেছি শাবক—মায়েরে ধরিতে মনে রাখিয়াছি আশা।

গঞ্জের পাশে আজিকে যেথায় উঠিয়াছে কোঠাঘর
আজি সেই ঠাঁয়ে জনতার ভিড়—কলরব দিনভর।
সেদিন হোথায় ছিলো ঘন বন—ছিলো অকারণ ভয়,
দল বেঁধে মোরা গেছি সেইখানে—ঘুরিয়াছি বনময়।
বনের এ পাশে তেমাথার 'পরে সুবিশাল বটগাছ
শাখা ছড়াইয়া রহিয়াছে হোথা কলির অবধি আজ।

গাছের ওপাশে পুরাতন এক মন্দির মতো আছে,
উপরে তাহার জোড়া দু'টি চাল—নীচে বেদী তার কাছে।
কেহ বলে একে 'শিব-মন্দির'—'মাজার' বলিছে কেহ,
হিঁদু মুস্‌লিম চেয়ে তার পানে করে শুধু সন্দেহ।
কেহ জানে নাকো ইতিহাস তার—কত শতাব্দী আগে
কোন্ ধর্মের গড়িয়াছে কে বা—প্রশ্ন মনেতে জাগে।

জোড়া বাংলার আশে আর পাশে ছিলো কত ঘরবাড়ী,
সেথায় যাহারা রহিত তাদের নাম বলে দিতে পারি।
ছিরিশ দাসের মুদিখানা ছিলো আমের গাছের তলে—
প্রথম জীবনে সেথা হতে মোর মাসের সওদা চলে।
এই বাড়ীঘর বেচিল ছিরিশ—অপরে খরিদ করে,
রাখাল পালের জিলাপী-দোকান চলিল তাহার পরে।
পাশের ঘরেতে তব্‌লা খোলের ছাউনী হইত রোজ,
উঠিয়া গিয়াছে সে সব দোকান—নাহিকো কাহারো খোঁজ।
পাশে ছিলো হোথা গৌরী দাসের সোনা ও রূপার ঘর—
ঠুক্‌ঠাক্ করি গড়িত গহনা সারাটি দিবস ভর।
পাশেতে তাহার কাঠের আড়ত—ছিলো বড়ো কার্‌খানা,
সন্তোষ তার আছিল মালিক—ইহা আমাদের জানা।
সেই দু'টি ঘর নাহি কো আজিকে উঠিয়া গিয়াছে কবে,
সেই ঠাঁয়ে হলো চায়ের দোকান—সেও উঠে গেছে সবে।

পথের এ পাশে ব্যবসা করেন অমূল্য কবিরাজ,
দীর্ঘ সতেরো বছর হইতে রয়েছে অবধি আজ।
দেখিছেন তিনি জোড়া বাংলার ভগ্ন ইটের সারি,
গায়েতে তাহার আগাছা অঢেল খেলা করে পাতা নাড়ি'।
এই বাংলার পাশে যারা এসে ব্যবসা দোকান করে—
নারিল তাহারা রহিতে সেথায় বেশী দিনেকের তরে।
আজি আর কেহ নাহিকো সেথায়—পড়ে আছে ফাঁকা ঠাঁই,
বারে বারে কেন ভেঙে ভেঙে যায়—আজো কেহ বোঝে নাই।

দেবতার রোষ—থাকিতে দেয় না হোথা তাহাদেরে বুঝি,
আপন মহিমা জানায় সবারে—দূর্ করে সোজাসুজি !
'শিব-মন্দির' অথবা 'মাজার'—যা হোক নামটি তার
তারে দিই মোর প্রাণের শ্রদ্ধা—চেয়ে দেখি বার বার।

দাস রঘুনাথ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের আকর্ষণে সপ্তগ্রামের জমিদার ধনকুবের গোবর্দ্ধন দাস ও হিরণ্য দাসের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ সংসার ত্যাগ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন পিতামাতা তাঁহাকে যাইতে দিবেন না. ঘরের চারিপাশে পাঁচ জন পাইক তাঁহাকে পাহারা দিতে লাগিল। সে গল্প তোমরা আগেই শুনিয়াছ। অবশ্য শুধু পাহারা দেওয়াই নহে, সেই সঙ্গে চারজন সেবক আর একজন ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া রঘুনাথের পরিচর্য্যাও করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের কিন্তু সেদিকে মোটেই খেয়াল নাই, দিনরাত তিনি প্রভুর ধ্যানেই বিভোর।

এইভাবে কাটিতে লাগিল রঘুনাথের দিনগুলি সোনার গৌরাঙ্গের চিন্তায়। তারপর দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল। মহাপ্রভু নীলাচল হইতে চলিয়া গেলেন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি যখন আবার নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন তখন রথযাত্রা উৎসব প্রায় আসন্ন। গৌড় বঙ্গের ভক্তমণ্ডলীকে লইয়া অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। ৺পুরীধামে আনন্দের বান ডাকিল। মহা-আনন্দে রথযাত্রা উৎসব শেষ হইল, ভক্তেরা আবার মহাপ্রভুর চরণধূলি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। রথযাত্রা উৎসবের পর প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল, মহাপ্রভু তখন নীলাচলের ভক্তমণ্ডলীর কাছে বিদায় লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে গৌড় বঙ্গ ঘুরিয়া বৃন্দাবন যাইবেন।

শুভ ৺বিজয়া দশমীর দিন প্রভু যাত্রা করিলেন গৌড় বঙ্গের পথে, এবং উড়িষ্যা রাজ্য ছাড়িয়া গৌড় রাজ্যে পদার্পণ করিলেন। তারপর ক্রমে পানিহাটি, কুমারহট্ট ও ফুলিয়া হইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। নদীয়ার চাঁদ আবার নদীয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া কাতারে কাতারে লোক ছুটিল তাঁহার চরণ দর্শনে নজরবন্দী রঘুনাথেরও কানে গেল এই কথা। মহাপ্রভুর চরণ দর্শনের জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠতাত তাহাতে রাজী হইলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া রঘুনাথ আরম্ভ করিলেন অনশন। তাঁহার কথায় রাজী না হইলে তিনি উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন।

রঘুনাথের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং হিরণ্য গোবর্দ্ধনকে এই কথা জানাইলেন। শেষে রঘুনাথেরই জয় হইল, পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাকে শান্তিপুর যাইতে অনুমতি দিলেন। বহু লোকজন আর জিনিষপত্র সহ রঘুনাথ শান্তিপুর যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় পিতা গোবর্দ্ধন দাস বলিলেন, "বেশী দিন সেখানে থেকো না বাবা, তোমার জন্য আমরা সারাক্ষণ পথ চেয়ে থাকব।"

শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া রঘুনাথ মহাপ্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুও তাঁহাকে পরম স্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহা আনন্দে রঘুনাথ -

"সাত দিন প্রভু সঙ্গে শান্তিপুরে রহে।
রাত্রি দিবসে এই মনঃকথা কহে॥
রক্ষকের হাতে আমি কেমনে ছুটিব।
কেমন প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব॥" চৈঃ চঃ

অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু জানিতে পারিলেন ভক্তের মনের কথা ; কিন্তু তখনও সময় হয় নাই, তাই তিনি রঘুনাথকে বলিলেন—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কুল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবে উদ্ধার॥"—চৈঃ চঃ

"বৃন্দাবন দর্শন করে আমি যখন নীলাচলে ফিরে আসবো তখন সুযোগ বুঝে আমার কাছে চলে যেও।"

রঘুনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রভু, যে ভাবে আমাকে দিনরাত পাহারার মধ্যে থাকতে হয় তাতে কি করে যে সুযোগ মিলবে বুঝতে পারি না।"

মৃদু হাসিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, "সে জন্য তোমাকে আর ভাবতে হবে না রঘুনাথ! যাঁর সুযোগ তিনিই তা জুটিয়ে দেবেন। অনন্ত শক্তির আধার শ্রীকৃষ্ণ যাকে কৃপা করে আকর্ষণ করেন তাকে কেউ আটকে রাখতে পারে না। যাও, এখন ঘরে ফিরে যাও, যা বললাম তা কর গে!"

মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী কেমন করিয়া সত্য হইয়াছিল সে গল্প আর একদিন শুনাইব।

রবিনসন ক্রুশো রচয়িতা ডিফো

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

আজ থেকে আড়াই শ' বছর আগেকার কথা।

ইংলণ্ডে একদিন একটা সহরে হুলস্থুল পড়ে গেল। রাজার পরোয়ানা বেরিয়েছে:

কৃশকায়, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, দেখতে মাঝারি ধরণের, চোখের রং ফিকে নীল, সরু চিবুক—নাম ডানিয়েল ডিফো। যে ঐ ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারবে তাকে উপযুক্ত মত পুরস্কার দেওয়া হবে।

ডিফোর অপরাধ কি জান? দেশের রাজা যে ধর্মকে অপছন্দ করতেন তাকে সমর্থন করে তিনি একটা বই লিখেছেন। তখনকার দিনে ইংলণ্ডে এ ধরণের

অভিযোগকে অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে করা হ'ত। সেজন্য রাজা মনস্থ করলেন ডিফোকে গ্রেপ্তার করে গারদে পূরে রাখা হবে।

রাজার সৈন্যসামন্তেরা দলে দলে বেরোলো ডানিয়েলকে খুঁজে বের করতে। তবে তার জন্য বেশী বেগ পেতে হ'ল না তাদের। কারণ, ডানিয়েল গ্রেপ্তারের জন্য এক রকম তৈরীই ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, রাজার ধর্মমতকে সমর্থন না করার দরুণ রাজা কখনই তাঁকে ছেড়ে দেবেন না।

রাজরোষে পড়ে ডানিয়েলকে কিছুদিন কারাবাস করতে হ'ল। জেলের দিনগুলি তাঁর কোনো রকমে কাটলো। জেল থেকে যখন বেরোলেন তখন তিনি কপর্দকহীন। জীবিকার সংস্থানই বা তাঁর হবে কি করে—এই চিন্তা তাঁকে ব্যাকুল করে তুললো। সাহায্যের জন্য তিনি বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী ঘুরতে লাগলেন।

পরিশেষে একটা ব্যবস্থা হ'ল। বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি কিছু টাকা ধার পেলেন। ঐ টাকা দিয়ে তিনি ব্যবসা করবেন ঠিক করলেন।

কিন্তু কিসের ব্যবসা সুরু করা যায়—সেও এক মস্ত সমস্যা। বহু বছর আগে তিনি একবার মোজার ব্যবসা করেছিলেন। এবার ঠিক করলেন, টালীর ব্যবসা করবেন।

ব্যবসায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি খুব পরিশ্রম করতে লাগলেন। ব্যবসা তিনি বুঝতেনও ভাল। সুতরাং অল্প দিনের ভিতরেই বেশ লাভ হতে লাগল।

ব্যবসায়ে নামবার পর তাঁর মনটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হ'ল। এইবার তিনি সুরু করলেন জ্ঞানচর্চা। প্রচুর বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন তিনি। এর মধ্যে শুধু ইংরাজী বইই ছিল না,—ফরাসী, ইটালীয়, গ্রীক্ ও স্প্যানিশ ভাষায় লেখা বইও ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি এই সব ভাষা শিখেছিলেন লণ্ডনের একটা গীর্জার স্কুলে। ঐ স্কুলে বহু রকম ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল।

ডানিয়েল নানা ভাষার বই পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলতেন। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের ভাবধারা তাঁকে অভিভূত করে ফেলত। ফলে মনে তাঁর ইচ্ছা জাগত, নিজেও কিছু কিছু বই লিখতে।

ক্রমে তিনি অল্প অল্প লিখতে সুরু করে দিলেন। বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর লেখা প্রবন্ধ ছাপা হতে লাগল—শুধু সাহিত্য নিয়ে নয়, সামাজিক প্রসঙ্গ ও রাজনীতি নিয়েও। তবে তাঁর কোন রচনা শিক্ষিত সমাজে তেমন সমাদর পেল না সে সময়ে।

কিন্তু এই ডানিয়েলই, যখন তাঁর বয়স ষাট বছর,—তখন এমন একখানা বই লিখে ফেললেন যা শেষ পর্যন্ত তাঁকে অমর করে রাখল। বইখানি একটি উপন্যাস,

প্রধানতঃ কিশোরদের উপযোগী। বইখানির নাম 'রবিনসন ক্রুশো'। শুধু ইংরাজী কিশোরসাহিত্যে নয়—বিশ্বসাহিত্যেও খুব কম বই এমন সমাদর পেয়েছে। তোমরা অনেকেই হয়তো, মূল বই না পড়লেও, সংক্ষিপ্ত আকারে ওটি পড়েছ। বাংলা তর্জমাও অনেকে পড়ে থাকবে। তবে যারা পড় নি তাদের জন্যে ওর গল্পটি সংক্ষেপে বলছি, শোনো ঃ.

রবিনসনের খুব জাহাজে জাহাজে বেড়ানোর সখ ছিল। একবার তাঁর জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায়। নিরুপায় হয়ে তিনি সাঁৎরাতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সমুদ্রে সাঁতার কাটা কি সহজ কথা? সাঁতার কাটতে কাটতে তাঁর হাত-পা অবশ হয়ে এল। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন পা দুটী যেন কোনও শক্ত জিনিষে ঠেকেছে। সত্যিই তো তাই! সমুদ্রের মাঝখানে একটি দ্বীপ! ঐ দ্বীপের বালিতে তাঁর পা ঠেকেছে। মুখ তুলে রবিনসন দেখেন, সামনে একটা বেলাভূমি। কোন রকমে তিনি ঐ বেলাভূমিতে গিয়ে উঠলেন।

সম্পূর্ণ জন-মানবহীন একটা দ্বীপ। ক্ষিদেয় তাঁর পেট চন চন্ করছে। কিন্তু খাবারের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়? হঠাৎ মনে হ'ল অর্ধেক-ডুবে-যাওয়া তাঁদের সেই জাহাজেই হয়ত খাবারের সন্ধান মিলতে পারে। অনেক কষ্টে সাঁতার কেটে তিনি ফের গেলেন জাহাজে। জাহাজের ভিতর এদিক্ ওদিক্ খুঁজে সন্ধান মিলল রাশি রাশি খাদ্যদ্রব্যের। শুধু খাদ্যদ্রব্যের নয়, ছোটখাটো একখানি সংসার পাতবার জন্য যা কিছু আসবাবপত্রের প্রয়োজন তারও সন্ধান পাওয়া গেল। কতকগুলি তক্তা একসঙ্গে বেঁধে তাতে করে জিনিষগুলি ঐ দ্বীপে তিনি উঠিয়ে নিয়ে এলেন।

ক্রমশঃ তিনি একটা তাঁবু খাটিয়ে তার নীচে বাসা তৈরী করলেন। তারপর ঐ তাঁবুর চারদিকে কাঠের তক্তা বসিয়ে স্থানটি ঘিরে ফেললেন, যাতে কোন হিংস্র জন্তু এসে তাঁকে তাঁবুর ভিতর আক্রমণ করতে না পারে। পরে ঐ ঘেরা জায়গা থেকে বাইরে আসার জন্য একটি মই বানালেন।

দিনভর রবিনসন দ্বীপময় ফলমূল খুঁজে বেড়ান ও রাত্রে তাঁবুতে ঘুমান। মাঝে মাঝে রবিনসন জংলী ছাগল, শূয়োর প্রভৃতি জন্তু শিকার করেন ও ঐ জন্তুগুলির মাংস পুড়িয়ে খান. আর অবসর সময়ে বসে কাঠ, পেরেক ও স্ক্রুর সাহায্যে চেয়ার, টেবিল ও শেল্ফ্ তৈরী করেন।

রবিনসন আলো জ্বালার বন্দোবস্ত কি ভাবে করলেন জান? ছাগলের চর্বি দিয়ে প্রদীপ জ্বালালেন। আগুন পেলেন কোথায় জান? পাথরের সঙ্গে পাথর ঘষলে যে আগুন বেরোয় সেই আগুনই তিনি কাজে লাগালেন।

দ্বীপে ধান, যব ও গমের চারা খুঁজে পাওয়া গেল। ঐ চারা লাগিয়ে ফসল ফলানোও সম্ভব হ'ল। প্রথম বছর চাষ করা হয় নি, কারণ চাষ করার প্রণালী রবিনসনের জানা ছিল না। প্রথম বছর বিফলমনোরথ হয়ে দ্বিতীয় বছর রবিনসন ঐ কাজে কৃতকার্য হলেন।

রবিনসনের নিঃসঙ্গ জীবনে সাথী জুটে গেল দু'টি বিড়াল, একটি কুকুর ও একটি টিয়া পাখী। কুকুর ও বিড়াল অবশ্য প্রথম থেকেই জাহাজ থেকে সাঁতরে তাঁর কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁর নতুন সঙ্গী জুটল একটি টিয়া পাখী। ঐ জন্তুগুলির সঙ্গে তিনি অবসর সময়ে খেলা করতেন। কুকুর তাঁর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করত, বিড়াল তাঁর গা ঘেঁসে চুপটি করে বসে থাকত, টিয়া তাঁকে দেখলেই ডাকত— রবিন, রবিনসন!'

একদিন ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখতে পেলেন বালির উপর একটা মানুষের পায়ের ছাপ। এ কি!—জনশূন্য দ্বীপে পায়ের ছাপ এল কোত্থেকে? তবে কি মানুষ থাকে এই দ্বীপে? আর একদিন তাঁর চোখে পড়ল এক জায়গায় কয়েকটি আধপোড়া কাঠ পড়ে রয়েছে; সেগুলির পাশে মরা মানুষের মাথার খুলি ও হাড়। তবে কি এই দ্বীপে মানুষখেকো জংলীরা বাস করে? রবিনসনের কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সেদিন তাড়াতাড়ি তিনি বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর পর কয়েক বছর কেটে গেল কিন্তু কোন মানুষ তাঁর চোখে পড়ল না।

একদিন তিনি দেখতে পেলেন দূরে একটা জাহাজ যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কাঠ-কুটো জোগাড় করে তিনি আগুন জ্বালালেন। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। জাহাজটি ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। তার দু'দিন পরে একটি ছেলের মৃতদেহ জলে ভেসে আসতে দেখা গেল। রবিনসন বুঝলেন জাহাজখানির কোন বিপদ ঘটে থাকবে। পরে দেখা গেল সত্যিই তাই। নৌকো করে রবিনসন ঐ জাহাজের কাছে গেলেন। দেখলেন জাহাজখানি পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে আছে। জাহাজের ভিতরে গিয়ে দেখলেন তাতে রয়েছে শুধু একটি কুকুর। এ ছাড়া আছে অনেক বন্দুক, বারুদ, চকোলেট, বাসন-কোসন, কয়েক থলি টাকা, জামা-কাপড় ও দু' জোড়া জুতো। রবিনসন ঐ সব জিনিষ সঙ্গে নিয়ে দ্বীপে ফিরলেন।

একদিন ভোরে রবিনসনের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তিনি বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখে পড়ল পাঁচখানা নৌকোয় চড়ে জন ত্রিশ জংলী গোছের লোক চরে এসে উঠল সঙ্গে হাত-পা বাঁধা দু'জন লোক। জংলীরা বালির উপর আগুন ধরালো। তারপর তারা লোক দু'টির বাঁধন খুলল ও তাদের ভিতর একজনের মাথায় লাঠির ঘা মেরে আগুনের দিকে ঠেলে দিল। সেই ফাঁকে আরেকজন দিল ছুট।

তিনজন জংলী ছুটল তাকে ধরতে। রবিনসন তখন জংলীদের দিকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লেন। একটি জংলী সঙ্গে সঙ্গে শেষ হ'ল। পরে রবিনসন দৌড়ে গিয়ে আর একজনকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে দিলেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা। লোকটি মাটিতে পড়ে গেল। তৃতীয় জংলী দৌড়ে পালিয়ে গেল। তখন পলাতক মানুষটি এসে রবিনসনের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। রবিনসন দেখলেন লোকটির বয়স অল্প। দেখতে সে জংলীদের মতনই। রবিনসন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলেন।

ঐ লোকটির কাছে রবিনসন জানতে পারলেন এ দ্বীপ থেকে লোকালয় খুব বেশী দূরে নয়। রবিনসনের মনে ভরসা হ'ল, একদিন তিনি তাহ'লে হয়ত বা নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবেন।

একদিন একটি নৌকো এসে চরায় ঠেকল। রবিনসন দেখতে পেলেন হাত-পা বাঁধা তিনটি লোককে একপাশে সরিয়ে রেখে একজন লোক এদিক্-ওদিক্ ঘুরছে। সেই সুযোগে রবিনসন কাছে গিয়ে ঐ লোক তিনটির বাঁধন খুলে তাদের মুক্তি দিলেন। তাদের ভিতর একজন বলল, "আমি ঐ জাহাজের কাপ্তেন, আমাকে জাহাজের খালাসীরা বেঁধে রেখেছিল। আপনি আমায় মুক্ত করলেন। আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না।" রবিনসন বললেন, "আপনি যদি আমাকে দেশে পেঁৗছে দিতে সম্মত হন তাহ'লে আমি আপনার খালাসীদের সঙ্গে লড়াই করতে পারি। তবে জাহাজের ভাড়া আমি দিতে পারব না।" কাপ্তেন খুসী হয়েই রাজী হলেন।

এরপরে সুরু হ'ল যুদ্ধ,—খালাসীদের সঙ্গে রবিনসনের। যুদ্ধে খালাসীরা হেরে গেল। তখন রবিনসন, কাপ্তেন ও তাঁর সহচরেরা মিলে জাহাজ ভাসালেন সমুদ্রে।

সাতাশ বছর পরে রবিনসন আবার দেশে ফিরলেন। তাঁর সঙ্গে যে টাকা-পয়সা ছিল তাতে জীবনের বাকী দিনগুলি বেশ আরামেই কেটে গেল।

এইখানেই গল্পের শেষ।

কেমন লাগল গল্পটা ?—ভালই বোধ করি ?

বইখানি যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল তখন কিশোরবয়স্ক পাঠকদের ভিতর রীতিমত একটা সাড়া পড়ে গেল। গল্পটা তাদের কাছে একেবারে নতুন ধরণের বলে মনে হ'ল।

রবিনসন ক্রুশোর জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বহু সাহিত্যিকই ঐ ধরণের গল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন। তাঁদের ভিতর জোহান ওয়াইস্-এর "সুইস্ ফ্যামিলি রবিনসন" অতি আকর্ষণীয় রচনা হিসাবে গণ্য হয়েছে। এ গল্পটিও, বহুবার পড়লেও, পুরোনো লাগে না। পরে তোমাদের একদিন শোনাব গল্পটা।

চলো দিল্লী

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

দখল করতে নয়,—বেড়াতে। স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লী এখন অনেকের কাছেই হয়তো ডালভাত। তবু কেন আমি দিল্লীর কথা লিখতে বসেছি ? কারণ খুবই সহজ। আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে দিল্লী দেখলাম, অন্যে হয়তো তা দেখবে না। আবার অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমিও দেখব না। কাজেই কাহিনীর নূতনত্ব ক্ষুণ্ণ হবার ভয় কম - এই বিশ্বাস নিয়েই দিল্লীর গল্প শোনান যেতে পারে।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, দিল্লীর রাস্তায় বাসের দেখা কদাচিৎ মেলে। কিন্তু দিল্লীর রাস্তায় কি জাতীয় যানবাহন দেখা যায় সে সম্বন্ধে লেখক কোন উত্তর দেন নি। দিল্লী যাওয়ার আগে আমিও এ কথাটা অনেকবার ভেবেছি, কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করি নি। দিল্লী দেখি নি—এ কথা প্রকাশ করতেই যেন কোন্ খানটায় খচ্ করে লাগত। কাজেই ঠিক করেছিলাম যখন সময় হবে নিজের চোখেই দেখে নেব।

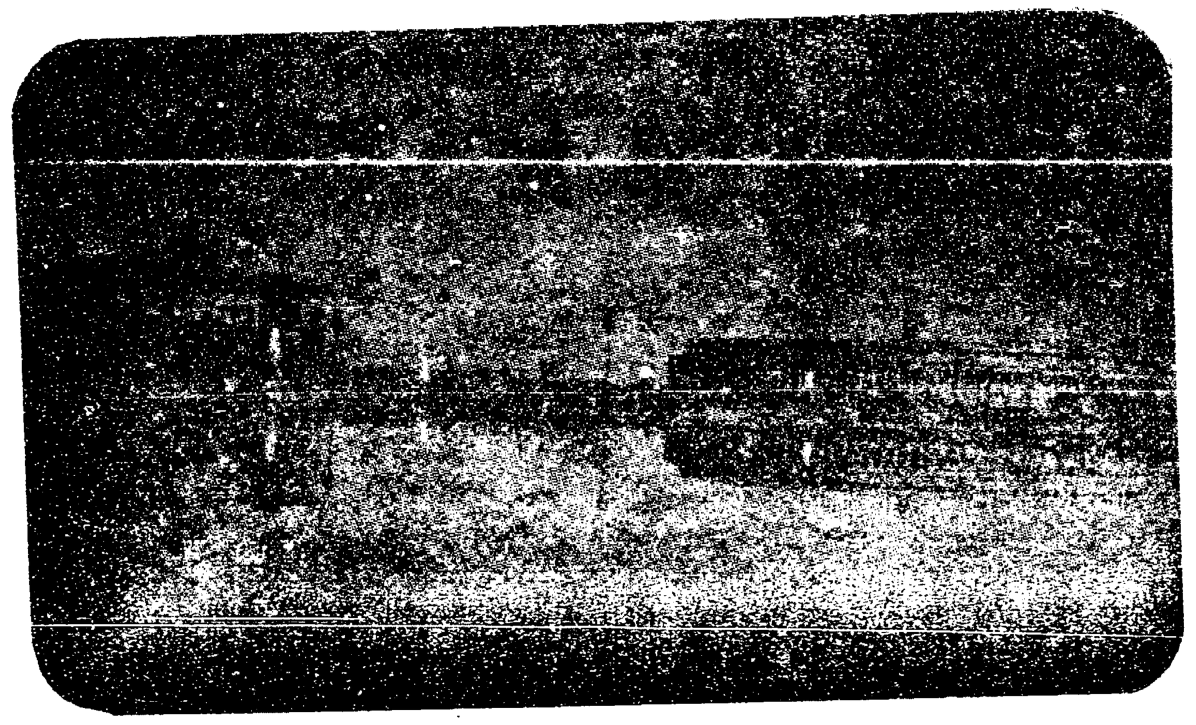

ভারতের পার্লামেণ্ট বা লোকসভা (ডান দিকে)—দিল্লী

মনে কর, তুমি বিকেল প্রায় পৌণে পাঁচটার সময় নয়া দিল্লী ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামলে। কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে ষ্টেশনের বাইরে এসে টাঙ্গা ঠিক করলে গন্তব্য স্থানে যাবার জন্যে। দরদস্তুর, কথা-কাটাকাটি, চেঁচামেচি—সে তো আমাদের দেশের সর্ব্বত্র। কাজেই ওর মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নেই। টাঙ্গায় চেপে কিছু দূর গেছ মনে কর। হঠাৎ অদ্ভুত ব্যাপার ! হাজার হাজার সাইকেল সারিবদ্ধভাবে চলেছে।—রাস্তার যে দিকে তাকাও শুধু সাইকেল—ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে ! কাছে সাইকেল, দূরে সাইকেল, তারপর সাইকেল ! সর্বশ্রেণীর লোকই চলেছে সাইকেলে—মেয়ে পুরুষ সকলেই ! তাজ্জব ব্যাপার বলে মনে হবে, নিশ্চয়ই। সাইকেল

রেসের অলিম্পিক চলেছে নাকি দিল্লীতে! আসলে তা নয়। ওটাই ওখানকার রেওয়াজ। সর্ব্বত্র সাইকেল,—সব কাজে সাইকেল। সকাল দশটা আর বিকেল পাঁচটার পর তো আর কথাই নেই! ছুতোর মিস্ত্রী চলেছে মিস্ত্রী-গিন্নীকে সাইকেলে চাপিয়ে, তরকারীওয়ালা চলেছে তরকারীর ঝুড়ি সাইকেলে নিয়ে। কলকাতার রাস্তায় ফুটপাথ আছে পথচারীদের জন্যে, দিল্লীর রাস্তায় ফুটপাথ নেই,—আছে সাইকেলপাথ—সাইকেল-আরোহীদের জন্যে সংরক্ষিত। তবে হ্যাঁ দিল্লীর রাস্তায় বাস্ যে নেই তা

পুরানো দিল্লীর প্রবেশপথ—কাশ্মীর গেট

নয়—ডি. টি. এস্এর বাস্ চলে দিল্লীর রাস্তায়। দিন পনেরো দিল্লী অবস্থানের মধ্যে ক'খানা বাস্ দেখেছি তা আঙ্গুলের ডগায় গুণে বলতে পারি। বাসে দু'বার চড়েওছি। একবার পয়সা দিয়ে, নিতান্ত দিল্লীর বাসে চড়বই এই প্রতিজ্ঞা করেই, বেরিয়েছিলাম সেদিন। আর একবার বাধ্য হ'য়ে।

এ তো গেল নিউদিল্লী। আসা যাক্ পুরানো দিল্লীতে। এখানকার অতি সরু সরু সব রাস্তা-ভর্তি ধূলো-ময়লা, আবর্জনা দেখেছি, আর দেখেছি লোকের ভীড়। টাঙ্গা, রিক্সা এদের তো কথাই নেই! তবে মজার ব্যাপার, পথচারীরা গাড়ী-ঘোড়া সম্বন্ধে একদম বেপরোয়া। গাড়োয়ান সমানে চেঁচিয়ে চলেছে একটু রাস্তার জন্যে। কে শোনে কার কথা?—কার দায় পড়েছে? ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী নির্বিকারভাবে চলেছে তো চলেইছে। আরও একটা জিনিস দেখেছি। সেটা হচ্ছে দিল্লীর ট্রাম। দেখে একটা কথাই বারে বারে মনে পড়েছে,—ট্রামগুলোকে আর না চালিয়ে এবার মিউজিয়ামে রেখে দেওয়াই বোধ হয় সমীচীন। বহু পুরানো সহর দিল্লী, ট্রামগুলো যেন তারই সাক্ষী।

তোমাদের মধ্যে যারা দিল্লীর অধিবাসী তারা একবাক্যে বলবে, সাইকেলের সমারোহ, লোকজন আর গাড়ীঘোড়ার ভীড়, আর পুরানো দিনের ট্রাম—এই দেখবার জন্যেই মশাই দিল্লী এসেছিলেন নাকি? পাগল! তা কি হয়? দিল্লীর কুতব মিনার,

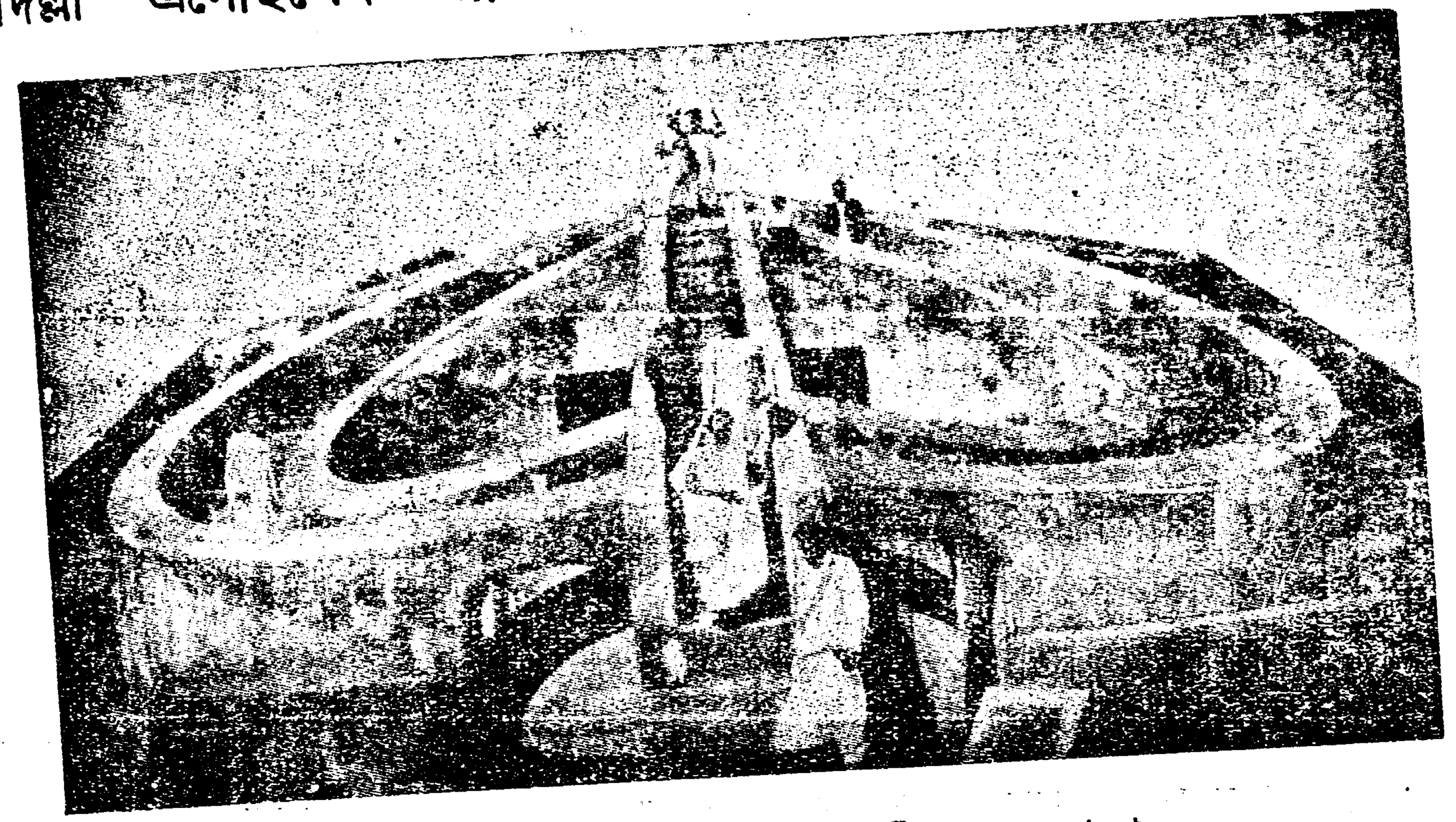

যন্ত্রমন্তর বা প্রাচীন মানমন্দিরের একাংশ

লাল কেল্লা, জুম্মা মসজিদ, যন্তরমন্তর, রাষ্ট্রপতিভবন, পার্লামেন্ট প্রভৃতি না দেখলে দিল্লী আসাই তো বৃথা! তবে এ সব সম্বন্ধে তোমরা এত শুনেছ যে নতুন আর বলবার কি আছে? তবে একটা চিন্তা মনকে ভীষণ ভাবে পীড়ন করেছে। লাল কেল্লার শীশমহল, রংমহল, খাসমহল, দেওয়ান-ই খাস, দেওয়ান-ই আম, কৃত্রিম সরোবর, কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখতে দেখতে কেবলই মনে হয়েছে কী জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতেন দিল্লীর বাদশা'রা। নিজেদের ভোগের, নিজেদের

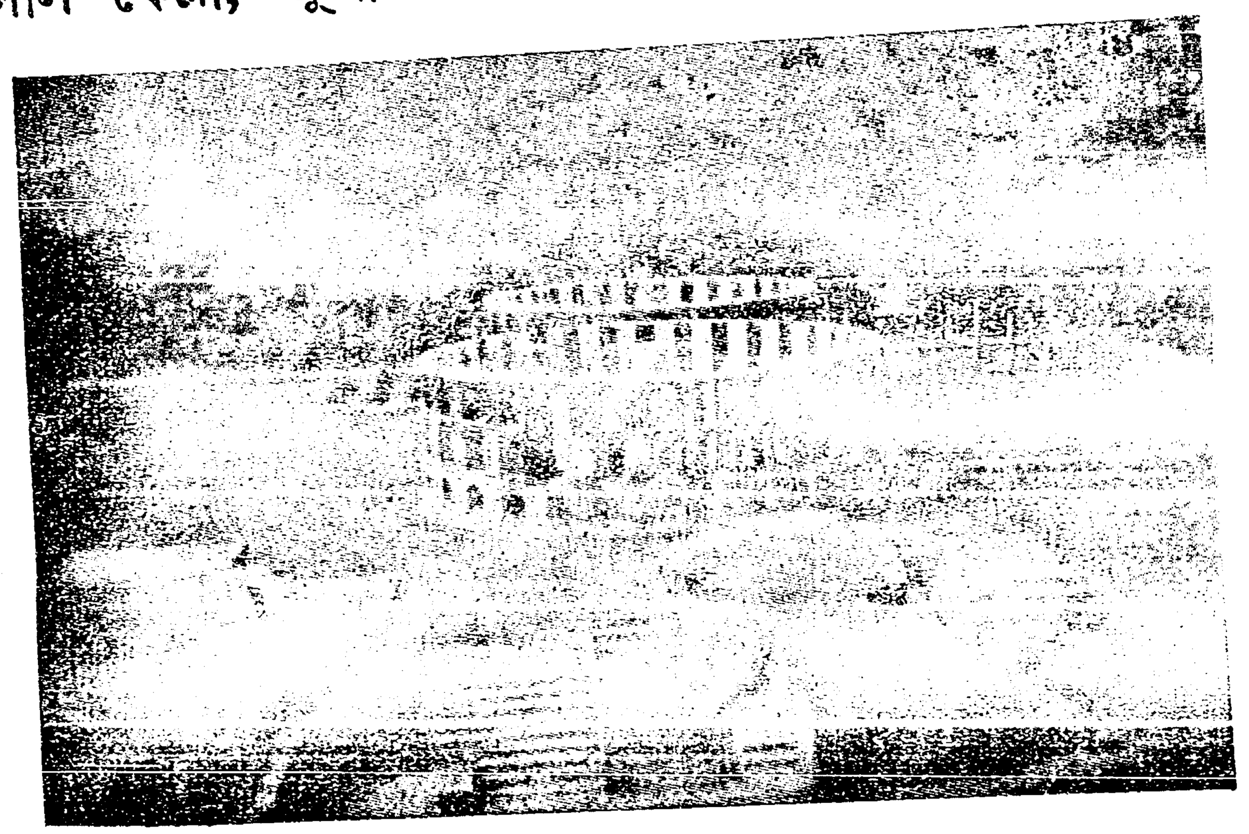

যন্তরমন্তর—ওপর থেকে কেমন দেখায়।

সুখশান্তির জন্যে কোন কিছুই বাকী রাখেন নি এঁরা। আর এর পেছনে রয়েছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের হাহাকার। সাধারণ লোকের সম্বন্ধে এঁরা একটি বারও ভেবেছেন কিনা তা বলতে পারেন ঐতিহাসিকগণ; তবে যে নিদর্শন তাঁরা রেখে গেছেন তা শুধু তাঁদের নিজেদের ভোগ-ঐশ্বর্য-দম্ভের প্রতীক ছাড়া তো কিছুই নয়! কিন্তু কাল তো তাকে ক্ষমা করে নি। কোথায় সে দম্ভ? কোথায় সে আত্ম-অহঙ্কার?—কালের বুকে তা মিলিয়ে গেছে। শুধু অতীতের বহু কাহিনীর সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সব অট্টালিকা। তবু এ সুন্দর। এর কারুকার্য, এর ভাস্কর্য, এর স্থপতি বিস্মিত করে মনকে। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে সেই সব শিল্পী, এঞ্জিনীয়ার ও কারিকরদের কাছে। বাদশা'রা চলে গেছেন,—এঁরা চিরকাল বেঁচে থাকবেন এঁদের কাজের ভিতর দিয়ে।

নয়া দিল্লীর রাস্তা ও বাড়ীগুলো বাস্তবিকই সুন্দর—ছবির মত। ছোট ছোট একতলা বাড়ী, সামনে সুরুচিপূর্ণ ভাবে সাজান বাগান চোখকে আনন্দ দেয় বই কি! তবে আমরা, যারা কলকাতার লোক, তাদের চোখে একটু জানি কেমন লাগে যখন দেখা যায় কোন বিদেশী সরকারের দূতাবাস একটি বাগান-বাড়ীতে বা কোন ফটোগ্রাফীর দোকান একটি বাগানের মধ্যে। কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের চাকুরীজীবী কারোর পক্ষে যেন কি রকম মনে হয়!

দিল্লীভ্রমণ শেষ করবার আগে নিউ দিল্লী কালীবাড়ীর কথা উল্লেখ না করলে কর্তব্যে অবহেলা করা হবে। দিল্লীর বাঙ্গালীদের সংস্কৃতির এটিই কেন্দ্র বাইরে থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের যে কত ভাবে এঁরা সাহায্য করেন তা বলে শেষ করা যায় না।

দিন পনেরো দিল্লীতে কাটিয়ে একদিন নয়া দিল্লী ষ্টেশন থেকে সিটি অব্ সাইকেল্স্'কে 'গুড বাই' জানিয়ে রওনা হলাম আগ্রা। কিন্তু সে গল্প আর একদিন হবে।

১

আমাদের গৃহদেবতা পঞ্চানন্দ যে কত দিনের পুরোনো তা কেউ বলতে পারে না। আমাদের কোন্ পূর্ব্বপুরুষ কোথা থেকে কি সূত্রে এই বিগ্রহ নিয়ে এসে স্থাপন করেন সে রহস্য আজও অনাবিষ্কৃত। তবে শোনা যায় খুব জাগ্রত ঠাকুর ইনি। একবার নাকি একদল ডাকাত আমাদের বাড়ী লুঠ করতে এসেছিল, কিন্তু বাবা পঞ্চানন্দের কৃপায় তারা নাকি তাঁর বেদীর কাছে এসেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সকাল হলে তারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। তখন সবাই উর্দ্ধশ্বাসে পালায়। যাওয়ার সময় একখানা তলোয়ার ফেলে পালিয়েছিল তারা, সে তলোয়ারখানা বাড়ীতে এনে রেখে দিয়েছিলেন আমাদের তখনকার পূর্ব্বপুরুষ। সে তলোয়ার বরাবর আমাদের বাড়ীতেই ছিল, আমরাও ছেলেবেলায় দেখেছি। যখন স্বদেশী আন্দোলনে দেশ মেতে ওঠে, সেই সময় বাড়ীতে ঐ রকমের একখানা অস্ত্র রাখা উচিত হবে না ভেবে আমার বাবা সেখানি পুকুরের ভেতর ফেলে দেন।

পঞ্চানন্দ নাম বটে বিগ্রহের, কিন্তু সাধারণতঃ পঞ্চানন (পঞ্চানন্দ নয়) বলতে আমরা মহাদেবকে বুঝি। এ বিগ্রহ কিন্তু মহাদেবের নয়। আসলে এর কোনও মুখই নেই। একটা শিলাখণ্ড—খুবই প্রাচীন তাতে আর সন্দেহ নেই, তার উপরে দু'খানি ভাঙ্গা পা। পায়ের গঠননৈপুণ্য অতি চমৎকার, তার অলঙ্করণও ভারি সুন্দর। বেশ বোঝা যায়, কোনও একটা আস্ত মূর্ত্তি ভেঙ্গে যায়, তারই নিম্নাংশ হচ্ছে এই বিগ্রহ। পা দুটি দেখলে মনে হয় হয়তো কোন বিষ্ণুমূর্ত্তি বা নৃত্যরত কোনও যক্ষ বা যক্ষিণী-

মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এটি। পাথরের দেশ এটা নয়। কাজেই, কি সূত্রে মূর্ত্তির এই অংশটি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দূর অতীতে সংগ্রহ করে এখানে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এবং কি সূত্রেই বা তাঁর নাম হয়েছিল পঞ্চানন্দ, তার কাহিনী কেউ জানে না। বৈশাখী পূর্ণিমায় পঞ্চানন্দ দেবের পূজা হয়। ছোটখাটো একটা মেলাও বসে। ফুলুরি, পাঁপর ভাজা, তেলেভাজা জিলাপীর কয়েকটা দোকান আসে। একটা ফাটা ঢোলক নিয়ে এসে বাজায় নান্নু মুচী, পুরোহিত ঘোষাল মশাই এসে পূজো করে যান। আশপাশের কয়েকখানা গ্রাম থেকে পূজার উপচার নিয়ে আসেন মেয়েরা, বধূরা, গৃহিণীরা। বেশ সচেতন হয়ে ওঠে সেদিন গ্রামের এই অচলায়তন।

আমি যেদিনকার কথা বলছি সেদিন বৈশাখের সংক্রান্তি। কয়েকদিন আগেই বৈশাখী পূর্ণিমা হয়ে গিয়েছে, পঞ্চানন্দ দেবের বার্ষিক পূজা-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটেছে। আমবাগানের দু'-একটা গাছে আম পাকতে সুরু হয়েছে।

খবরের কাগজখানার পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় একটি লোকের আবির্ভাব হোল। শীর্ণকায়, ঋজু ধরণের চেহারা। মাথার সামনে টাক, পিছনের চুলটা ঝাঁকড়া, গায়ে একটা আধময়লা হাফশার্ট, খালি পা। কাঁধে একটা ঝোলা,—বাজারে যে ধরণের বার্মিজ ব্যাগ বিক্রী হয়, সেই রকমের। চোখ দুটো অত্যন্ত উজ্জ্বল।

পল্লীগ্রামে অপরিচিত লোকের হঠাৎ আবির্ভাবে একটা কৌতূহল জেগে ওঠে। আমি কিছু বলবার আগেই লোকটি বললেন, আপনিই কি অজয় বাবু?

জানালাম যে তাঁর অনুমান সত্য।

তিনি বললেন,—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

লোকটিকে সাধারণ বেঞ্চিতে বসতে বলবো, না চেয়ারে বসতে বলবো মনের মধ্যে সে সম্বন্ধে একটু ইতস্ততঃ চলছিল, এমন সময় তিনি নিজেই বললেন, নিজের পরিচয়টা নিজেই দিই। আমার নাম শ্রীপরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতি। এক সময়ে বাড়ী ছিল নবদ্বীপের কাছেই, এখন স্থায়ী বসবাস কোথাও নেই। —

বিস্ময় বোধ করলাম। শাস্ত্রবাচস্পতি!—তা হলে তো একজন মহাপণ্ডিত লোক। বেঞ্চি নয়, চেয়ার দেখিয়ে দিলাম। একটু সসম্ভ্রমেই জিজ্ঞাসা করলাম, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

ঘুরছি, কেবল ঘুরেই বেড়াচ্ছি। সাধু ভাষায় যাকে বলে যাযাবর।

বিচিত্র ধরণের উত্তর। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, এ রকম করে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য আছে বৈকি। বিনা উদ্দেশ্যে কি কেউ এমনি টো টো করে ঘুরে বেড়ায় সারা বাংলা দেশ?

মনে ভাবলাম, পাগল নাকি?

শাস্ত্রবাচস্পতি মহাশয় বললেন, একটু চা খাওয়াবেন? খুব টায়ার্ড্ ফীল্ করছি।

চাকরকে বললাম চা নিয়ে আসতে। লোকটি ইংরাজিও জানে দেখছি!

এ ধরণের লোক আমাদের গ্রামে কখনও দেখি নি। কোথা থেকে এলো, কেন এলো, কোথায় যাবে এর পর, - একটা কৌতূহল বোধ করলাম এই পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতির সম্বন্ধে।

চা খেয়ে তিনি বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ। কি জানেন অজয় বাবু, জীবনে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সে উদ্দেশ্য কখনও সফল হবে কি না জানি না। সফল যদি না হয়, তার জন্যই যদি জীবন যায়, যাবে। জীবনের উদ্দেশ্য—লাইফ্‌স্ মিশন সকলের কি পূর্ণ হয়?—হয় না। যাক্, দুঃখ নেই।

লোকটির মাথায় যে একটু গোলযোগ আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না। বললাম, পণ্ডিত মশাই, স্থির হয়ে একটু বিশ্রাম করুন। তারপর স্নান করে, আমাদের গৃহদেবতা পঞ্চানন্দের প্রসাদ খেয়ে, তার পর যাবেন।

তিনি বললেন, অল্‌রাইট, তাই হবে। পঞ্চানন্দের প্রসাদ? পঞ্চানন—না পঞ্চানন্দ? পঞ্চানন হলেন মহাদেব – যাঁর পাঁচটা মাথা, কিন্তু পঞ্চানন্দর মনে কি? পাঁচ রকমের আনন্দ?

বললাম, এ নিয়ে কোনো দিন চিন্তা করি নি। ঠাকুরের নাম পঞ্চানন্দ – বহুকাল থেকে চলে আসছে। পঞ্চানন থেকে লোকের মুখে মুখে পঞ্চানন্দ হয়েছে কিনা কেউ বলতে পারে না।

তিনি বললেন, খুব পুরোনো ঠাকুর বুঝি?

পঞ্চানন্দ দেব সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানা ছিল, তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, বেশ ইন্‌টারেষ্টিং তো! একবার ভালো করে দেখবো আপনাদের পঞ্চানন্দ দেবকে?—আচ্ছা, থাক্. স্নান করে উঠে তারপর দেখবো। দেবস্থানে এই বাসি কাপড় পরে যাবো না।

বিচিত্র এই আগন্তুক। শিক্ষিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শাস্ত্রবাচস্পতি উপাধিটা সত্য কিনা তা যাচাই করবার উপায় আমার নেই।

স্নান করে শাস্ত্রবাচস্পতি তাঁর ঝোলা থেকে একখানি তসরের কাপড় বের করে

পরলেন। একখানা আয়না এবং চিরুণীও বেরুলো ঝোলা থেকে। মাথার সামনের টাকেও একবার চিরুণীটা বুলিয়ে নিলেন, তারপর পিছনের ঝাঁকড়া চুলগুলো বেশ করে আঁচড়ে নিয়ে আমাকে বললেন, চলুন, দর্শন করে আসি আপনাদের পঞ্চানন্দ দেবকে।

ঠাকুরের কোনও মন্দির নেই। আমাদের বাড়ীর সামনেই একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, তারই নীচে বেদী গাঁথা, তারই উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন পঞ্চানন্দ দেব।

পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতি গিয়ে বসলেন বেদীর উপর। সিঁদূর এবং চন্দনে পাষাণখণ্ডের নিম্নাংশ একেবারে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরশুরাম কয়েক মিনিট নিবিষ্ট মনে দেখলেন ঠাকুরকে। তারপর আমাকে বললেন, সিঁদূর-চন্দনের এই প্রলেপটা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবো ?

বিগ্রহকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্থান থেকে একটুও সরানো ধর্ম্মবিগর্হিত, সে কথা জানালাম। তিনি বললেন, অল্‌রাইট্। যখন বারণ করছেন তখন হাত দেবো না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে নীচের যে অংশটায় সিঁদূর-চন্দনে ঢেকে গিয়েছে, সেখানে কোনও লিপি আছে। সিঁদূর-চন্দন তুলে ফেললে সেটা পড়া যেত এবং এই মূর্ত্তির গোড়ার ইতিহাস জানা যেত।

কিন্তু মূর্ত্তিকে স্থানভ্রষ্ট করার কল্পনাও করা যেতে পারে না।

পরশুরাম বললেন, ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস আছে আপনাদের বাড়ী ?

পল্লীগ্রামে—এখানে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস কোথায় পাবো ? অদ্ভুত আবদার তো !

তিনি বললেন, খুব বেশী পাওয়ারের চশমা ?

তাও পাওয়া যাবে না জেনে তিনি বললেন, যাক্, যা দেখলাম এতেই হবে।

আশ্চর্য্য লোক ! আমাকে অনেক প্রশ্নই করলেন। আমার কোন্ পূর্ব্বপুরুষ এই বিগ্রহ নিয়ে আসেন ? কত দিন আগে ? কি সূত্রে ? সঠিক তারিখ না বলতে পারলেও আনুমানিক কিছু আমি বলতে পারি কিনা—এমনি অনেক প্রশ্ন।

কোনটারই সদুত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জানি না যে বিবরণ, সে সম্বন্ধে উত্তর কি দেবো ? যতটুকু বিবরণী জানা ছিল সেটুকু তাঁকে তো আগেই বলেছি !

এবার তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম আমি। লোকটাকে শিক্ষিত বলে মনে হয়েছিল, অথচ মাথায় গোলমাল আছে কিনা সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হতে পারি নি। তাঁর এ লক্ষ্যহীন যাযাবর বৃত্তিরও কারণটা দুর্ব্বোধ্য।

নবদ্বীপের কাছে তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল, সে কথা আগেও বলেছেন, এবারও বললেন। একটা টোলের অধ্যাপক ছিলেন কিছুকাল, তারপর ভগবানের প্রেরণায়

তাঁকে ঘরছাড়া হতে হয়েছে। যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তার সন্ধান আজও পেয়েছেন কিনা ঠিক বলতে পারেন না।

বিচিত্র লোকটি ! অনেক জিজ্ঞাসা করেও বেশী কিছু জানা গেল না।

ঈশ্বরের প্রেরণায় তিনি ঘর ছেড়েছেন। কিসের প্রেরণা ? সে কথা জিজ্ঞাসা করলেই চুপ করে থাকেন।

শাস্ত্রবাচস্পতি চলে গেলেন সন্ধ্যার আগেই। কোথায় এবারে যাবেন জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি একটু হেসে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আওড়ালেন—'পথে পথেই বাসা বাঁধি, মনে ভাবি পথ ফুরালো।'—বলেই বললেন, কি জানি পথ ফুরালো কি না !

হাসি পেল আমার। লোকটার মধ্যে কবিত্ব আছে। রবীন্দ্রসাহিত্যও তাঁর অপরিচিত নয়। আশ্চর্য্য !

পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতির কথা এখানেই শেষ হয়ে গেল। আমার বাড়ীতে একদিন একজন আধ-পাগলা পণ্ডিত গোছের লোকের আগমন এমন কিছু বিস্ময়কর ঘটনা নয়, কিন্তু ব্যাপারটার শেষ সেখানেই হোল না।

(ক্রমশঃ)

সিংহের গল্প শোন

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস্-সি

"হাসিখুসি"র সেই বিখ্যাত ছড়া কে না পড়েছে ?—

"সিংহ মশাই, সিংহ মশাই, মাংস যদি চাও,
রাজহংস খেতে দেব—হিংসা ভুলে যাও।"

আমার ভাগ্নে অরুণ বলত, "নাজমাঞ্চ খাতে দিব" ; অর্থাৎ রাজহংস নয়—একেবারে খোদ রাজ-মাংস ! হয়তো তার অবচেতন মনে ধারণা এসেছিল যে এক সময় রাজারা যেমন সিংহকে দিয়ে খাইয়ে অপরাধীদের শাস্তি দিতেন, তেমনি রাজতন্ত্রের অবসানে, রাজাদের যখন অন্য কোন কাজ থাকবে না, তখন তাঁদের দিয়েই সিংহভোজন করানো যেতে পারবে। অরুণ এখন বড় হয়েছে, মস্ত বড় গেজেটেড্ অফিসার। কাজেই এ সব গল্প লিখলে সে হয়তো লজ্জা পাবে। কাজেই ও প্রসঙ্গ এখন থাক।

কিন্তু কথাটা দাঁড়াচ্ছে কি? কবি সিংহকে হিংসা ছাড়তে বলছেন—রাজহংস খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে। অর্থাৎ হিংসার লোভ দেখিয়েই হিংসা ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু তা কি হবার? সিংহ কথাটিই যে হিংসার প্রতীক্! তোমাদের পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস কোরো কি করে 'সিংহ' শব্দের উৎপত্তি হ'ল। তিনি বলবেন, হিন্‌স্ ধাতুর সঙ্গে অল্ প্রত্যয় যোগ করলে তবেই হয় সিংহ। আর বিজ্ঞানীরা তো আরও এক ধাপ ওপরে যাবেন। তাঁরা বলবেন, হিংসা না করে সিংহের উপায় নেই, তা হ'লে তাকে না খেয়েই মরতে হবে। তার মুখের—দাঁতের যা গড়ন তা'তে নিরামিষ খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। মাংস তাকে খেতেই হবে। শুধু রাজহংস নয়—হরিণ, জিরাফ জেব্রা, গরু, মোষ, এবং বাগে পেলে, মানুষও। তা সে মানুষ রাজাই হোক আর প্রজাই হোক্।

বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, এ বিধানও প্রকৃতিরই বিধান। ভারসাম্য বলে যে একটা কথা আছে তা অন্য সব জায়গার মত প্রকৃতির রাজ্যেও মেনে চলতে হয়। ধর, পৃথিবীতে যদি কোন হিংস্র প্রাণী না থাকত, সবাই যদি নিরামিষাশী হ'ত, তা হলে গাছপালার জীবনে হয়তো দেখা দিত পরম বিপর্যয়। খেয়ে খেয়েই হয়তো বহু জায়গার গাছপালা নিঃশেষ করে দিত তারা। আর গাছপালা—বনজংগল যে প্রাকৃতিক আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয় তা কে না জানে? কোন জায়গার গাছপালা যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তবে সেখানকার আবহাওয়াও শুকনো হয়ে যেতে বাধ্য। ফলে অল্প দিনেই সে জায়গা হয়ে যাবে মরু-অঞ্চল। এ রকম ঘটনা নাকি ঐতিহাসিক যুগেই অনেকবার ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা ভূমধ্যসাগরের আশপাশের কোন কোন জায়গার নাম করেছেন। এমন কি, ওখানে নাকি এমন জায়গাও আছে, যেখানে শুধু বুনো ছাগলের উৎপাতে বিস্তৃত অঞ্চল গাছপালা হারিয়ে, শুকনো হয়ে, জলবৃষ্টির অভাবে মরু-অঞ্চলে এসে দাঁড়িয়েছে। ওখানে নাকি কোন রকম হিংস্র জন্তু ছিল না তাই ছাগলেরা অবাধে গাছপালা মুড়ে খেয়ে এই কাণ্ডটি বাধিয়েছে। কী সাংঘাতিক কথা বল দেখি!

আবার এর উল্টোটাও হতে পারত পৃথিবীতে যদি হিংস্র জন্তুর সংখ্যা বেশী থাকত তা হলেও রেহাই ছিল না। বনজংগলে দেশ ভরে যেত, আর নিরুপদ্রবে কারও পক্ষে বাস করাও সম্ভব হ'ত না এরও তাই বিধান প্রকৃতি দেবীই করেছেন। হিংস্র জন্তুরা পরস্পর খাওয়াখাওয়ি করে তাদের সংখ্যা বাড়তে দিচ্ছে না। আর মানুষ (সেও কম হিংস্র নয়) তার বুদ্ধিবলে হিংস্র জন্তুকে সায়েস্তা করে আসছে—সেই আদিম যুগ থেকে।

তবে মানুষেরা যেন একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে

বনজংগল তারা উড়িয়ে দিয়েছে প্রচুর সংখ্যায়, সেই সঙ্গে বন্য জন্তুদেরও নিশ্চিহ্ন করেছে প্রচুরতর সংখ্যায়।—যার ফলে প্রাণিবিজ্ঞানীরা এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কি ক'রে বিভিন্ন পশুবংশকে টিকিয়ে রাখা যায়। একেবারে লোপ পাবে ওরা পৃথিবী থেকে—এ কি রকম কথা!

কথাটা বলছি এই জন্য যে পশুরাজ সিংহও আজ এই বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আগে পৃথিবীর নানান্ জায়গায় সিংহ দেখা যেত—ইয়োরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা,—কোথায় নয়? কিন্তু এখন সিংহের নিবাস, ধরতে গেলে, একমাত্র আফ্রিকাই বলতে হয়। ভারতবর্ষে আজ মাত্র একটি জায়গায় সিংহ আছে—জুনাগড় অঞ্চলে। তাও সংখ্যায় সামান্য। অথচ আগে সারা ইয়োরোপময় সিংহ দেখা যেত। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী প্রভৃতি বহু জায়গায় সিংহের প্রস্তরীভূত কংকাল পাওয়া গেছে—যাকে বলা হয় 'ফসিল'। গ্রীসে যে এক সময়ে প্রচুর সিংহ দেখা যেত তা ঐতিহাসিকদের বিবরণীতেই দেখা যায়। ভারতেরও নানা জায়গায় প্রচুর সিংহ দেখা যেত.—এই শ' খানেক বছর আগেও। মধ্য ভারতে, নর্মদার তীরে; তারপর এদিকে পালামৌর জংগলে, এমন কি বাংলা দেশের প্রান্তেও। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আমলে ভারতের বহু জায়গায় সিংহের বাস ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমন কি, সিপাহীযুদ্ধের সময়েও, এক সাহেব নাকি দিল্লী সহরের আশপাশের জংগলেই কম ক'রে পঞ্চাশটা সিংহ শিকার করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে জব্বলপুরের কাছে একবার একটা জংলী সিংহ রেল লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে। তা ছাড়া সিন্ধু উপত্যকায়, আবু পাহাড়ে, পালানপুরে এর পরেও সিংহ দেখা গেছে। পালানপুরে শেষ সিংহ দেখা গিয়েছিল ১৮৮০ সালে। কিন্তু এখন আর ওসব জায়গার কোথাও সিংহ দেখা যায় না।

গভীর জংগলে পশুরাজ—ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

হ্যাঁ, গোটা ভারতে এখন একটি মাত্র জায়গায় সিংহ দেখতে পাওয়া যায়।—গুজরাট প্রদেশের জুনাগড় অঞ্চলে। সেখানকার গির জংগলই এখন ভারতের একমাত্র সিংহসদন। সিংহকে যদি পশুরাজ বল, তা'হলে এখানেই এখন ভারতের পশুরাজ্যের রাজধানী বলতে হবে। তবে বড় ছোট রাজ্য, কারণ গির জংগলের আয়তন বড় জোর ৫০০ বর্গ মাইল।

কিন্তু গির জংগলেও সিংহ প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। ১৯১৩ সালে ওখানকার বনরক্ষক অত্যন্ত উদ্বেগের সংঙ্গে জানান, 'এখানে এখন বড় জোর গোটা আষ্টেক সিংহ আছে। এ ক'টি শেষ হয়ে গেলে গোটা ভারতবর্ষ থেকেই সিংহ লোপ পেয়ে যাবে।' তখন কর্তাদের টনক নড়ল। যত হিংস্র প্রাণীই হোক, কোনও বিশেষ প্রাণী একেবারে লুপ্ত হয়ে যাক এ কেউ চায় না—বিজ্ঞানীরা তো নয়ই। তখন আইন করে ওখানে সিংহ শিকার বন্ধ করে দেওয়া হ'ল, এবং ওরা যাতে নিরুপদ্রবে বাড়তে পারে তারও ব্যবস্থা করা হ'ল। এর ফলে বছর তিরিশের মধ্যেই ঐ ৮টি সিংহ সংখ্যায় প্রায় পঁচিশ গুণ বেড়ে গেল। ১৯৩৬ সালে আবার এখানকার সিংহ গণা হ'ল। হিসেবে পাওয়া গেল মোট ২৮৭টি। হিসেবটা এই রকম: ১৪৩টা সিংহ, ৯১টা সিংহী আর বাচ্চাকাচ্চা ৫৩টা। বর্তমানে গির জংগলে ২৯০টি সিংহ আছে বলে হিসেব পাওয়া গেছে। এখনও ওখানে সিংহকে সংরক্ষিত জানোয়ার বলেই ধরা হয়—বিশেষ বিশেষ কারণ ছাড়া এখনও ওখানে সিংহ মারা একদম নিষেধ। ভ্রমণকারীরা মাঝে মাজে জ্যান্ত সিংহ দেখতে ঐ সংরক্ষিত বনে বেড়াতে যান। কিছুদিন আগে জওহরলালজীও গিয়েছিলেন। ইংরেজীতে এই ধরণের

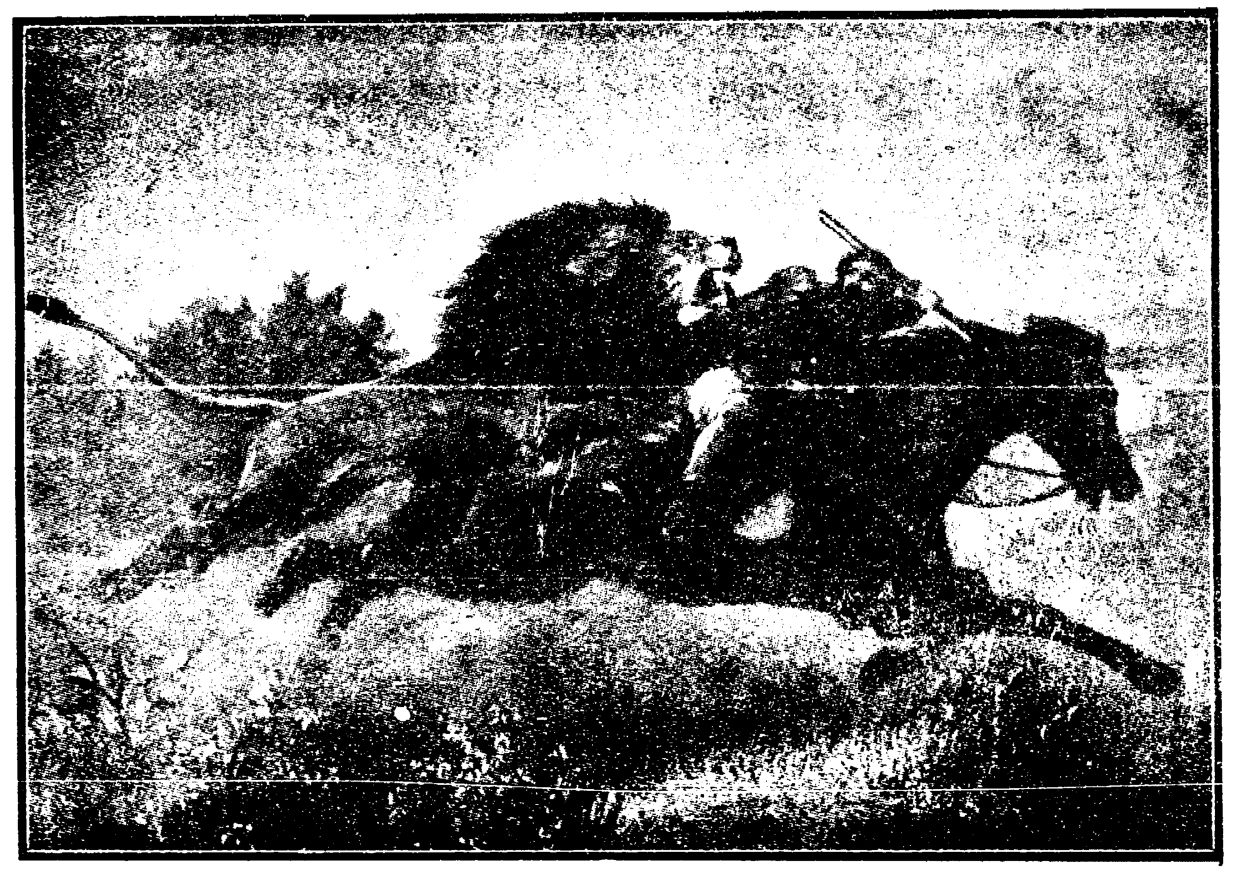

বাগে পেলে সিংহ মানুষকেও ছাড়ে না।

সংরক্ষিত বনকে বলা হয় 'স্যাংচুয়ারী'। আসামে বিশেষ ক'রে গণ্ডার ও অন্য কয়েকটি প্রাণীর জন্য, মধ্য প্রদেশে বিশেষ বিশেষ ধরণের হরিণের জন্য এবং আরও কয়েকটি জায়গায় এ রকম স্যাংচুয়ারী আছে। আফ্রিকায় বহু আছে।

এখানে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই তোমাদের মনে আসবে। সিংহের মত ভয়ঙ্কর প্রাণীকে জংগলে গিয়ে গণা হয় কি করে? প্রথমতঃ, জীবনের ভয় তো আছেই, তার ওপর সব ক'টা সিংহই যে গুণতিতে আসবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? বিজ্ঞানীরা কিন্তু বলেন, অল্প জায়গার মধ্যে এই 'গণা' ব্যাপারটা তেমন কঠিন নয়। সিংহ সাধারণতঃ দিনে একবার জল খায়। গরমের সময়, যখন বেশীর ভাগ ঝরণা, নালা, ডোবা শুকিয়ে যায় তখন সিংহের জল খাবার জায়গা খুব বেশী থাকে না। সিংহ জল খেতে আসতে পারে এ রকম সব ক'টি জলাশয় আগে খুঁজে বার করা হয়। তার পর পুরোনো পায়ের দাগ মুছে ফেলে লক্ষ্য করা হয় পর দিন কতগুলি নতুন পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। সিংহের পায়ের ছাপ বিশেষজ্ঞদের পক্ষে চেনা খুব কঠিন নয়। শুধু সিংহ কেন, পায়ের ছাপ দেখে তাঁরা বলে দিতে পারেন কোন্‌টা সিংহের পায়ের দাগ, কোন্‌টা সিংহীর, কোন্‌টা তাদের বাচ্চার। বিজ্ঞানীরা বলেন, কয়েকদিন এই ভাবে পরীক্ষা করলেই দেখা যায় পায়ের দাগ প্রত্যহই প্রায় সমান হচ্ছে। কাজেই এই ভাবে সিংহের সংখ্যা গণা হ'লে অনেকটা নির্ভুল বলা যেতে পারে।

পোষা সিংহ—মোটরে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

সিংহের আসল ডেরা এখন আফ্রিকা। সেখানেও কোন কোন জায়গায় সিংহের সংখ্যা কমে যাচ্ছে দেখে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। তবে আফ্রিকার বিস্তৃত জংগলে প্রচুর সিংহ আছে। ভারতীয় সিংহের চাইতে আফ্রিকার সিংহ আকারে সামান্য একটু বড়ই হয়। চেহারায়ও দু'-এর মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

যেমন ধর, মাথার খুলির গড়ন, লেজ, কেশর, লোম ইত্যাদি। ভারতীয় সিংহের লেজের আগায় লোম অনেক বেশী হয়, গায়ের লোমও বেশী ঝঁকড়া, কিন্তু কেশর অনেক পাৎলা আর ছোট। কেশরহীন সিংহের কথা কিন্তু শোনা যায় নি, তবে হ্যাঁ, সিংহীর কখনও কেশর গজায় না—তা সে গুজরাটী সিংহীও হোক আর কাফ্রী সিংহীই হোক।

প্রমাণ মাপের এক একটা সিংহ আকারে লেজ সমেত প্রায় দশ ফুট হ'তে পারে,—নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা পর্য্যন্ত মাপলে। ওজনে এক-একটা অন্তত: ছু' মণ হয়। আড়াই বছর তিন বছর বয়সেই ওরা (সিংহ বা সিংহী) পূরো জোয়ান হয়ে ওঠে। এদের আয়ু সাধারণতঃ তিরিশ বছর। বাচ্চা হয় একসঙ্গে ২টি বা সময়ে সময়ে আরও বেশী।

সিংহের চেহারাখানা বেশ ডাকসাইটে। শরীরের তুলনায় মাথাটা বিরাট্‌ই বলব। কেশরের গুণে তাকে আরও বিরাট লাগে। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি—বিশেষ করে সামনের থাবায়। এক-একটা থাবা বেড়ে প্রায় ১৯ ইঞ্চি হয়। মজবুৎ মোটা হাড়ের কাঠামোর ওপর মাংসপেশীতে ভরা—যেন ইস্পাতে গড়া। এই থাবা দিয়ে সে এত জোরে আঘাত করতে পারে যে এক চড়েই মানুষের মুণ্ডু ধড় থেকে বেরিয়ে আসে। বড় বড় ষাঁড়, বুনো মোষ সিংহের একটি থাবাতেই ঘায়েল হয়। হরিণ, জেব্রা প্রভৃতি ছোট ছোট প্রাণীর তো কথাই নেই! থাবার আগায় বড় বড় বাঁকা বাঁকা ধারাল নখ। এই নখের সাহায্যে সে অবলীলাক্রমে হাড় থেকে মাংস খুলে নেয়,—ঠিক যেমন করে আমরা কমলা লেবুর খোসা ছাড়াই তেমনি সহজে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—পশুরাজ্যে তিনটি জিনিষ হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী। এক—তিমির লেজের ঝাপটা, ছুই—জিরাফের লাথি, আর তিন—সিংহের থাবা। শেষেরটিই নাকি সবচেয়ে ভয়ানক। সিংহের গায়ে কি রকম জোর তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সিংহ অবলীলাক্রমে একটা বলিষ্ঠ ষাঁড় বা মহিষকে (আকারে তার চাইতে অনেক বড়) মুখে করে বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে চলে যেতে পারে ঠিক যেমন করে বেড়াল ইঁতুর মুখে ক'রে ছোটে। ছেলেবেলায় "আফ্রিকা স্পীক্‌স্‌" নামে একটা সিনেমার ছবিতে এই ধরণের বুনো মোষ মুখে ক'রে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে সিংহের ছোটার দৃশ্য আমার আজও মনে পড়ে।

খুব জোরে ছুটতে পারলেও সিংহ কিন্তু খুব বেশী ছুটতে পারে না। প্রচণ্ড লাফ দিয়ে খানিকটা পথ সে উল্কার মতই ছুটে যায়, কিন্তু তার পরই তার গতি কমে আসে। কাজেই দ্রুতগামী হরিণ, জিরাফ ইত্যাদি একটুখানি সময় সিংহকে পেছনে রাখতে পারলেই বেঁচে যেতে পারে। তা হ'লে সিংহ তার শিকার ধরে কি ক'রে? খানিকটা

চালাকির সাহায্যও নিতে হয় তাকে। শিকার কোথায় জল খেতে আসে সিংহ সে খবর রাখে, আর তারই কাছাকাছি কোন পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে থাকে। শিকার এলে হঠাৎ অতর্কিতে তার ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়ে তাকে ঘায়েল করে। সময় সময় ছু'টো সিংহ একত্র হয়ে শিকার ধরতেও দেখা গেছে। একজন তাড়া দেয়। এমন ভাবে তাড়া দেয় যাতে তাড়া খেয়ে শিকার একটা বিশেষ দিকেই ছুটতে থাকে। আর সেই পথে ওৎ পেতে বসে থাকে তার সঙ্গী। সে তখন ঘপাৎ করে এসে পড়ে শিকারের ঘাড়ে। শিকার ধরা পড়লে অপর সিংহ এসে ভাগাভাগি করে তা খেয়ে নেয়। সিংহের চোয়ালও থাবার মতই শক্ত। এক কামড়ে যে কোন শক্ত হাড় সে চূরমার করে দিতে পারে। আর জিভের মধ্যে আছে অগুণতি কাঁটা বসানো। হাড়ের মতই শক্ত সে কাঁটা। সেই কাঁটাওয়ালা জিভ দিয়ে চেটে চেটে সিংহ হাড় থেকে মাংস ছাড়িয়ে নিতে পারে। সিংহের গর্জনও মেঘের মত। কেউ কেউ বলেন, অকারণ গর্জন করা ওর একটি স্বভাব। কিন্তু আসলে বোধ হয় তা নয়। ঐ গর্জনে ছোট জন্তুরা ভয় পেয়ে দিগ্বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটাছুটি করে, আর আচমকা সিংহের খপ্পরে এসে পড়ে।

সিংহ আর বাঘ কিন্তু প্রায় এক জাতীয় জানোয়ার। ছু'টোই বিড়াল জাতীয় জীব। একই পূর্বপূরুষ থেকে বাঘ সিংহ তুই-ই এসেছে বলে পণ্ডিতেরা বলেন। আন্দাজ ১৫ লক্ষ বছর আগে ওদের পূর্বপুরুষ একই প্রাণী ছিল। সেকালকার খড়্গদন্ত বাঘ শুধু বাঘের নয়, সিংহেরও পুর্বপূরুষ বলে অনেক বিজ্ঞানীর মত। এখনও বিজ্ঞানীরা বাঘ-সিংহের বিয়ে দিয়ে ছু'য়ের মাঝামাঝি জীব সৃষ্টি করা যায় বলে প্রমাণ করেছেন। এই নতুন জীবের নাম 'সিংঘ্র' বা 'ব্যাংহ' বলা যেতে পারে। ইংরেজীতে বলে 'টায়ন' বা 'লাইগার'। এখানে একটা মজার কথা শোন। আমাদের দেশ থেকে সিংহ যে লোপ পেয়েছে তার একটা কারণ, কোন কোন পণ্ডিতের মতে,—বাঘ। সিংহকে পশুরাজই বলি আর যাই বলি, বাঘের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধে নাকি তার এত বার পরাজয় হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত তার বংশই গেছে উজাড় হয়ে। অবশ্য বাঘের সংখ্যা সিংহের তুলনায় বেশী ছিল কিনা এবং ফলে লড়াইটা অসমান লড়াই (অভিমন্যুর মত) হ'ত কিনা জানা নেই। বাংলা দেশের সিংহও নাকি এইভাবেই সুন্দরবনের রয়াল টাইগারের হাতে উচ্ছেদ হয়েছে। অবশ্য অনেক পণ্ডিত এ কথা মানতে চান না। সিংহ বাঘের মত গভীর জংগল পছন্দ করে না, পাহাড় বা ঘাসের বনই তার বেশী প্রিয়। বাঘের মত অত ধূর্তও সে নয়। ফলে শিকারীর হাতে সহজেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এ ছাড়া আরও কয়েকটা বৈজ্ঞানিক কারণ হয়তো আছে এ দেশ থেকে সিংহের লোপ পাওয়ার মূলে।

হিমালয়ের জংগলে সিংহ আছে কি? বোধ হয় না। বিজ্ঞানীরা তো তাই বলেন। তবে প্রাচীনকালে ছিল কিনা বলা কঠিন। মহাকবি কালিদাস তাঁর হিমালয়ের বর্ণনায় সেখানকার বড় বড় সিংহের কথা লিখে গেছেন। একটা বর্ণনা শোন। কুমারসম্ভবের এক জয়গায় আছে হিমালয়ের ওপর শিকারীরা কেমন করে সিংহের সন্ধান পায় তারই কথা। হিমালয়ের শিখরে সিংহ যেমন আছে তেমনি বড় বড় হাতীও আছে। আর সিংহ হচ্ছে হাতীর শত্রু। হাতী দেখলেই তারা তার পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়বে আর প্রচণ্ড থাবায় ভেঙ্গে দেবে হাতীর মাথার খুলি। এখন, হিমালয়ের ঐ সব বড় বড় হাতীর মাথায় আছে গজমুক্তা। সিংহ যখন তাদের মাথায় থাবা মারে তখন তার নখে সেই গজমুক্তা আটকে যায়। তার পর সিংহ নেমে হেঁটে চলে যায়। বরফ-ঘেরা পাহাড়ের চূড়ায় তাদের রক্তমাখা পায়ের দাগ বেশীক্ষণ থাকে না—বরফ গললেই ধুয়ে মুছে যায়। কিন্তু মুক্তোগুলো তখনও পড়ে থাকে। শিকারীরা সিংহের খোঁজে বেরোলে তাদের পায়ের ছাপ পায় না, কিন্তু তার বদলে দেখতে পায় সিংহের চলার পথে ছড়ানো গজমুক্তা। তখন তাই দেখেই তারা ঠিক করে—এই পথে সিংহ গেছে—এই পথে গেলেই তাকে পাওয়া যাবে। রাজকীয় হিমালয়ের সবটাই রাজকীয় ব্যাপার, নয় কি?

ইংরেজী বারের নাম কোথা থেকে এল

সান্‌ডে, মন্‌ডে, টিউস্‌ডে…… এক নিঃশ্বাসে ইংরেজী সাতটি বারের নাম তো দিব্যি বলে যাও, কিন্তু ও নামকরণ কি ক'রে হ'ল ভেবে দেখেছ কখনও?

সানডে আর মন্‌ডে যে সান্ (সূর্য্য) আর মুন (চন্দ্র) থেকে এসেছে তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। বাকি নামগুলো কিন্তু সবই এসেছে ওদিক্‌র প্রাচীন দেবতাদের নাম থেকে। যেমন ধর টিউস্‌ডে নাম হয়েছে 'টিও' দেবতার নাম থেকে, ওয়েডনেস্‌ডে হয়েছে ওডিন্ (বা অডিন্) দেবতার নাম থেকে, থার্সডে নাম এসেছে থর থেকে—সেই হাতুড়ীওয়ালা বিখ্যাত দেবতা। স্যাটার্ণ থেকে স্যাটারডে। বাকি রইল ফ্রাইডে। এ নামও এসেছে আর এক দেবতার নাম থেকে—ফ্রেয়ার। এঁরা প্রায় সকলেই নর্সদের দেবতা।

বাংলা সাত বারের নাম কিন্তু সবই গ্রহ-উপগ্রহের কাছ থেকে নেওয়া। অবশ্য এই গ্রহেরাও, পুরাণের মতে, সবাই এক একটি দেবতা। রবি—হলেন সূর্যদেব। আসলে গ্রহ না হলেও গ্রহদের কর্তা তিনি। সোম হচ্ছে চন্দ্রের নাম। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি এরা সকলেই আমাদের পরিচিত—গ্রহ।

শ্রী মনিলাল অধিকারী

—সতেরো—

বসন্ত রায়ের লেখা ছোট্ট চিঠিটার দিকে তাকিয়ে তাপস বসে রইল অনেকক্ষণ। চিঠির লেখাগুলোর উপর বার বার দৃষ্টি বুলিয়ে গেল, কিন্তু মন্তব্য প্রকাশ করল না কিছুই।

মলয় আর সুজিত উৎসুক দৃষ্টি আর আকুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েছিল তাপসের দিকে। তাপসের মুখ থেকে কিছু একটা শুনতে চায় ওরা। চিঠি সম্পর্কে ছোট্ট একটি মন্তব্য। গুপ্তধন আবিষ্কারের একটা ক্ষীণ আশা। অন্ততঃ কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কিছু একটা শুনতে চায়।

কিন্তু তাপসের মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। নিঃশব্দে বসে রইল তাপস। শান্ত, নিশ্চল, সমাহিত দেহ যেন।

সময় কাটতে লাগল নিঃশব্দে।

উসখুস করতে লাগল সুজিত। তাপসের মুখ থেকে কিছু একটা শোনার আগ্রহে অস্থির হয়ে উঠল সে। অবশেষে জিজ্ঞাসা করল,—'কি লেখা আছে ওতে? গুপ্তধনের ঠিকানা?'

নড়েচড়ে বসল তাপস। তারপর নিঃশব্দে লেখা কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিল সুজিতের দিকে। বলল,—'পড়ে দেখ।'

এক নিঃশ্বাসে লেখাটা পড়ে ফেলল সুজিত। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে চিঠিটা এগিয়ে দিল তাপসের দিকে। বলল,—'আবার সেই হতাশা! মায়ামৃগের মরীচিকা?'

মৃদু মৃদু হাসতে লাগল তাপস। বলল,—'হতাশ হবার মত কিছু দেখছি নে আমি। দেখতে পাচ্ছি আশার নতুন আলো।'

উত্তেজিত সুজিত বলল,—'অর্থাৎ—তুই এখনও গুপ্তধনপ্রাপ্তির আশা রাখিস?'

দৃঢ়কণ্ঠে তাপস বলল,—'নিশ্চয়ই।'

ব্যঙ্গের হাসিতে বক্র হয়ে উঠল সুজিতের ঠোঁট জোড়া। বলল, 'চেষ্টা কর বন্ধু, চেষ্টা কর। পাইলেও পাইতে পার অরূপ রতন।'

সুজিতের বিদ্রূপ গায়ে মাখল না তাপস, বলল,—'আশা মানুষকে সফলতার পথে এগিয়ে দেয়। এ রহস্যের শেষ কোথায় আমি দেখতে চাই।'

তাপস চিঠিটা এগিয়ে দিল মলয়ের দিকে। বলল—'পরীক্ষা করে দেখ মলয়, কিছু বুঝতে পারিস কিনা।'

মলয় উৎসুক হয়ে চিঠিটা পড়তে লাগল। পড়া শেষ হলে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লেখাগুলোর দিকে।

মলয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করল তাপস। জিজ্ঞাসা করল,—'কিছু বুঝলি?'

—'কিছুমাত্র না।'

—'কিছুই লক্ষ্য করলি নে?'

—'অন্য চিঠির সঙ্গে এ চিঠিটার কিছু পার্থক্য আছে লক্ষ্য করেছি; কিন্তু তার সঙ্গে গুপ্তধন-রহস্যের সম্পর্ক কোথায় বুঝতে পারছি নে।'

—'সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে, আর সেটা এত সূক্ষ্মভাবে আছে যা তোর আর আমার চোখে এখনও ধরা পড়ছে না। কিন্তু এ চিঠিটার মধ্যে নূতনত্ব কি দেখলি বল তো?'

—'বসন্ত রায় এই চিঠিটা সাধারণ কালি দিয়ে না লিখে লিখেছেন গাঢ় কালি দিয়ে—যা নাকি এখনকার চাইনীজ ইঙ্কের মত স্থায়ী। হাতের কাছে সাধারণ কালি থাকতে বসন্ত রায় কেন যে চিঠিটা অমন একটা কালি দিয়ে লিখতে গেলেন বুঝতে পারছি না।'

—'কেন, এতে না বোঝবার কি আছে? বসন্ত রায় চেয়েছেন—তাঁর লেখা চিঠিটা যাতে সহজে নষ্ট না হয়। এমন কি জলে ভিজলেও যাতে লেখাগুলো অস্পষ্ট না হয়ে যায়।'

—'তিনি যদি এতই সাবধানী তো আগের চিঠিটা সাধারণ কালিতে লিখেছেন
কেন? সেটাও চাইনীজ ইঙ্কের মত কোনও কালি দিয়ে লিখলেন না কেন?'
—'ঠিক। চিঠিটা পড়ে এবং পরীক্ষা করে ঠিক এই সন্দেহ হয়েছে আমার।
ঐ গাঢ় কালিটা আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছে। হাতের কাছে সহজলভ্য সাধারণ
কালি থাকতে বসন্ত রায় ঐ রকম কালি ব্যবহার করলেন কেন? সাধারণ কালির
পরিবর্তে ঐ কালি দিয়ে লিখলে কি সুবিধা হতে পারে? চিত্র অঙ্কনের কাজে ঐ
রকম কালির নানা রকম সুবিধা আছে, কিন্তু লেখার ব্যাপারে একটি মাত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ
হতে পারে। সেটা হচ্ছে, জলে ভিজে গেলেও লেখা নষ্ট হবে না। এর থেকে কি
অনুমান করা চলে? এর থেকে নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে যে কোন কারণ বশতঃ
চিঠিটা জলে ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, আর সেই সত্যটা পূর্বেই অনুমান
করেছিলেন বসন্ত রায়। অবশ্য এর পেছনে আর একটা সম্ভাবনা আছে। সেটা সত্য
কিনা আমি এখুনি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

মলয় জিজ্ঞাসা করল,—'আমাকে কিছু করতে হবে?'

—'বিশেষ কিছু নয়। শুধু এক গামলা জল আন নীচের থেকে।'

অল্পক্ষণের মধ্যে মলয় গামলা ভরতি জল এনে টেবিলের উপর রাখল।

তাপস বসন্ত রায়ের লেখা চিঠিটা গামলার ভরতি জলে ফেলে দিল। কয়েক
মিনিটের মধ্যে চিঠির কাগজ সম্পূর্ণ ভিজে গেল। পর মুহূর্তে ভিজে কাগজের উপর
ধীরে ধীরে ফুটে উঠল কয়েক ছত্র লেখা।

ক্ষিপ্রহস্তে তাপস জল থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে আলোর দিকে মেলে ধরল
সাবধানে। ততক্ষণে বেশ কয়েক ছত্র লেখা ফুটে উঠেছে কাগজের উপরে স্বচ্ছ কালিতে।
খুব স্পষ্ট জলছাপের মত লেখাগুলো ফুটে উঠেছে ভিজে কাগজের উপরে।

গোটা গোটা সুন্দর লেখা বসন্ত রায়ের। পড়তে একটুও কষ্ট হ'ল না তাপসের।

উত্তেজিত তাপসের কণ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে এল আনন্দধ্বনি, —'গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। বসন্ত রায়ের রত্নসিন্দুকের কাহিনী স্বপ্ন নয়, সত্য।'

(ক্রমশঃ)

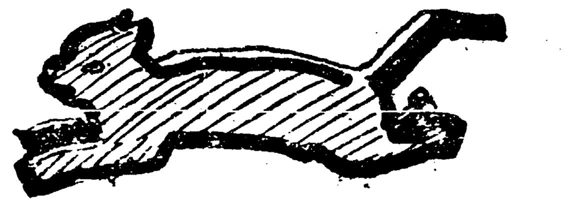

হাসিপাতালে

শ্রীশামুক

বাবলু বলে,— হাসপাতাল নয়, হাসিপাতাল, হাসতে হাসতে পাতালে প্রবেশ।

কথাটা উদ্ভট সন্দেহ নেই, কিন্তু যখন ওর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তখন অস্বীকার করার উপায় নেই। কেবল লালু পিসের সামনে কথাটা উচ্চারণ করা হয় না। 'হাসপাতাল' কানে গেলে পিসে এমন কতকগুলো আওয়াজ করেন যেন হয় উনি ফেটে চৌচির হয়ে যাবেন, আর নয় তো দম আটকে ধড়াস করে পড়ে একটা কিছু হয়ে যাবে।

প্রবাসে অসুখ করে বাবলুকে হাসপাতালে গিয়ে থাকতে হ'ল। ছেলেমানুষ, তা ছাড়া অসুখও তেমন মারাত্মক নয়, কিন্তু ভোগান্তি আছে। তাই নিজের লোক কাউকে বাবলুর কাছে এসে থাকবার অনুমতি দেওয়া হ'ল। ঐ একই ঘরে। কলকাতায় চিঠি লেখা হ'ল—যদি কেউ গিয়ে থাকতে পারে তো ভাল হয়। এ যেন ইচ্ছে করে শহুরে লোকদের বিপদে ফেলা। বিয়ে পৈতে হয়,—আত্মীয়ের আমন্ত্রণে, অসুবিধা থাকলেও, দু'দিন ঘুরে চট্ করে দেশটা দেখে আসা যায়। কিন্তু হাসপাতালে, দিনের পর দিন!—কাজকর্ম নেই বুঝি ?

মাঠে ফুটবল আছে, হাটে হুজুগ আছে, পয়সা থাকলে সিনেমা আছে, ভাল সিনেমা না থাকলে খারাপ হোটেল আছে অনেকগুলো। সকলেরই কোন না কোন একটা বাধা প'ড়ে যাবার ফুসরৎ হয় না। কিন্তু লালু পিসের কানে কথাটা যেতে তিনি রাজী, তখুনি।

তিরিশ বছর চাকরি করে সবে পেনসন নিয়ে মনে হঠাৎ দারুণ সাহস, যে কোন কাজই করা যায়—অথচ ভাজা মাছটি উলটে খান নি কোন দিন।

দোতালার কোণের ছোট ঘরটি বাবলুর। পূবে ও দক্ষিণে বড় বড় জানালা। গরাদে নেই—সোজা দেখা যায় নিমের ঝাড়ালো মাথা, কৃষ্ণচূড়ার ঝুমকো, লোহার থামের ওপর জলের বিরাট ট্যাংক, আর দূরে কারখানার কালো চিমনি ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশ ছোঁবার চেষ্টা করছে।

হাসপাতালের বড় ছোট সকলে বাবলুর ব্যবহারে মুগ্ধ। রোগীর এমন আনন্দী মেজাজ দেখা যায় না। নিজের যন্ত্রণা ভুলে সব সময়ে মিষ্টি হেসে অন্যের সুবিধা দেখার চেষ্টা। এ হেন রোগীর পিসেকে খাতির করা তো স্বাভাবিক!

বড় ডাক্তার পিসেকে সঙ্গে করে বাবলুর কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল। ডাক্তারের যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তেমনি ছুঁচালো মেজাজ। দু'পাশে গালের গভীর খাঁজ, যেন দড়ি-

দড়া দিয়ে চোয়াল দুটো শক্ত করে বেঁধে রেখেছে। হাসবে না কিছুতেই। বাবলু একলা শুয়ে শুয়ে কত সময় দারুণ মজার ঘটনা ভাববার চেষ্টা করে—যাতে এমন মানুষও হেসে লুটোপুটি খেয়ে যাবে।

পিসে নিজের জিনিস সবে গুছিয়ে নিয়েছেন, আর বেঁটে মোটা নার্স খুট্ খুট্
করে আসে জ্বর দেখতে। থার্মোমিটার ঝাড়তে গিয়ে তার অনামিকার সঙ্গে কড়ে
আঙুলের ধাক্কা লেগে চটাস্ চটাস্ আওয়াজ করে। ওর ঐ রকমই হয়, কেউ কান
দেয় নি কোন দিন। পিসে থার্মোমিটার কেড়ে নিয়ে বলেন,—না না, এ ঠিক নয়। যখন
রুগী ঘুমাবে তখন এ রকম শব্দ হলে চলবে কি করে? আমি নামিয়ে দিচ্ছি।

বাস্, ডান হাত মাথার ওপর থেকে এক ঝটকায় নীচে নেমে ওপরে ওঠে আর
থার্মোমিটার পাখীর মত জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল ফুড়ুৎ। উ-উ-ক্—একটা তীক্ষ্ণ
শব্দ করে নার্স টাট্টুর মত দৌড়ে চলে যায়। বাবলুর পিসে—কিছু বলা যায় কি?

আনন্দ, দুঃখ, রাগ, লজ্জা এ সবের পরই মানুষের খিদে পায়। পিসের ঐ
অনুভূতিগুলি যেমন প্রবল, তারপর খাবার ইচ্ছাও হয় প্রচণ্ড। এবারে জালতি আলমারি
খুলে দেখতে হয় আছে কি কি। বাবলুর যা অসুখ তাতে খাওয়াদাওয়ার তেমন
কড়াক্কড়ি নেই—যা খুসী খেতে পার। ব্যবস্থাও রয়েছে সেই রকম। বাজার দূরে,
তাই নানা উপাদেয় জিনিসে ঠাসা।

—নে নে, তুইও খা।

—খাবার এখনও সময় হয় নি।

—খাবার আবার সময় আছে নাকি? খিদে পেলেই সবচেয়ে ভাল সময়।

ফল, মিষ্টি, বিস্কুট, চকোলেট জেলি, জ্যাম ও মাখনের নানা রকম মাখামাখি অবস্থায়
অদৃশ্য হতে থাকলো। নিজের নির্দিষ্ট খাবার ছাড়াও এই রকম টুকরো-টাকরার
টাক্না চলল সেই রাত্তির পর্যন্ত।—চল্, এবারে শুয়ে পড়া যাক। সারাদিনের
পরিশ্রমের পর ভাল ঘুম দরকার। তোর খাটটি তো বেশ! মাথার দিকে পায়ের দিকে
উঁচুনীচু করা যায়—পায়ের তলায় পাশ-বালিশের মত দুমড়ে গোল করা যায়।
আমারটা অমন নয় কেন? শুধু রোগীর জন্যে? বেশ, তুই ওটায় শো, আমি তোর
খাটে শুই।

হাতল ঘুরিয়ে নিজের মাপের সই সব করে নিয়ে বলেন,—তুই ঘুমো, আমি
আসছি। হাসপাতালে তো বরফের অভাব নেই—বাপ রে! কী গরম! মানুষ বেঁচে থাকে
কি করে?

পিসে ফিরে এসে বরফের টুকরো ভরা আইস্ ব্যাগ নিজের মাথায় চাপিয়ে দুর্গা

বলে সটান শুয়ে পড়েন। তাঁর নাকের ঘড়ঘড়ানি শুধু হাসপাতাল নয়, যেন সমস্ত শহরটাকেই ধমকে শাসন করতে থাকল।

রাত্রিবেলা ডাক্তার, নার্স সব বদলি হয়। ছোকরা ডাক্তার মোহন ছুটিতে গিয়েছিল, সেই রাত থেকে আবার কাজ সুরু। ডাক্তার মোহন যেমন চটপটে তেমনি ছটফটে। তার মতে সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি করাই আসলে ডাক্তারি। নির্দ্দেশ-নামা পড়ে দেখে দশ নম্বরে রাত্রে একটা বড় ইন্‌জেকসন দিতে হবে। তৈরী হয়ে ছুঁচ বাগিয়ে পা টিপে টিপে ঘরে এসে যায়।

বরফ মাথায় রোগী দারুণ ঘুমাচ্ছে। ডেকে সোরগোল তুললে আর হ'ল কি ডাক্তারি? 'প্যাট' করতেই রোগী তেড়ে কুঁকড়ে ওঠে। সুতরাং—এবারে জোর করে, বুকে হাঁটু দিয়ে বাকিটুকু শেষ করতে হয়। এই ইন্‌জেকসনে বেশ জ্বালা করে—রোগী তো চেঁচাবেই। রোগীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে ডাক্তার মোহন তেমনি পা টিপে টিপে চলে গেল।

বাবলুর ঘুম ভেঙে মনে হ'ল তিন-চারটে সিংহ এক সঙ্গে গজরাচ্ছে। দেখে, পিসে নিজের জামা-কাপড় পরতে পরতে ভীষণ অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে পালাচ্ছেন। একজন নার্স আসছিল, তাকে তাড়া দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পরে আপিসে খানিকটা বেশ চেঁচামেচির পর হাসপাতাল শান্ত হলে নার্স এসে বলে ব্যাপার কি। পিসে বাকি রাত ষ্টেশনে কাটিয়ে সকালের ট্রেনে ফিরে যাবেন।

সকালে রোগী দেখতে দেখতে বড় ডাক্তার দশ নম্বরে এল। কবজি টিপে, নাড়ি দেখে উঠে দাঁড়ায় বুক-পিঠ দেখতে। গলায় ঝোলা নল কানে লাগাতে লাগাতে পা দিয়ে পিছনের চেয়ার সরিয়ে দেয়, ঝুঁকে দেখার জায়গা চাই। হঠাৎ খেয়াল হ'ল,—তোমার আঙ্কল্ কই? পিসে কোথায়?

বা'লু উত্তর দিতে পারে না। নার্স ভয়ে শিটকে ওঠে। মোহন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, তাড়া খেয়ে তাড়াতাড়ি বলে দেয় কি হয়েছে।

বড় ডাক্তারের চোয়াল দুটো যে দড়িদড়া দিয়ে শক্ত করে বাঁধা ছিল হঠাৎ খুলে গেল যেন। হো হো করে হাসতে হাসতে হাসির ধমকে হাত-পা এলিয়ে চেয়ারে বসতে গেল,—মনে নেই নিজেই একটু আগে সেটা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং?—গলায় ঝোলা নল খপ্ করে ধরেও কোন লাভ হ'ল না—প্রমাণ হ'ল হাসপাতাল নয়,—হাসিপাতাল—হাসতে হাসতে পাতালে প্রবেশ।

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

শ্রীঅপূর্বমণি দত্ত

জন্ম—১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০২। জন্মস্থান—দত্তপুলিয়া (নদীয়া)।

কলকাতা ট্রেনিং একাডেমী, মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশন্ ও পরে মেট্রোপলিটন্ (বর্তমান বিদ্যাসাগর) কলেজের ছাত্র। ১৯১৬ সালে ভারত সরকারের অধীনে কর্মজীবন সুরু হয় এবং প্রধানতঃ দিল্লী-সিমলায় বিভিন্ন বিভাগে তা অতিবাহিত হয়। যোগাযোগ বিভাগে এ্যাড্‌মিনষ্ট্রেটিভ্ অফিসার, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর জেনারেল প্রভৃতি নানা পদে কাজ করবার পর কলকাতায় পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন ১৯৫৪ সনে। বর্তমানে গ্রামের বাড়ীতেই বেশীর ভাগ থাকেন ও প্রধানতঃ পড়াশোনা ও সাহিত্যচর্চায় অবসরজীবন যাপন করেন।

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে সাহিত্যজীবন সুরু হয় ১৯১৬ সালে—তাঁরই সম্পাদিত মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকায়। তার পর ক্রমে মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, পঞ্চপুষ্প, গল্পলহরী, মালঞ্চ, উত্তরা, আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ, কথাসাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতে থাকেন—প্রধানতঃ বয়স্কদের জন্য গল্প।

শিশুসাহিত্যে আবির্ভাব 'ভাইবোন' মারফৎ। এখন রামধনুরও নিয়মিত লেখক। মাসিকের পাতায় এঁর লেখা প্রথম ছোটদের উপন্যাস 'মুকুন্দ ভট্টর পুঁথি' পুস্তকাকারে বেরোবার আগেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। বড়দের জন্যও ইনি অভ্রপুঞ্জ, সিদ্ধিকবচ, সোনার শাঁখা প্রভৃতি বই লিখেছেন।

প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজে ইনি বিশেষ পরিচিত। নয়াদিল্লীর বেঙ্গলী ক্লাবের সম্পাদক ও সহ-সভাপতি ছিলেন অনেকদিন। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের (এখন নাম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন) সঙ্গে প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন এবং বহুদিন তার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। এক সময়ে এই সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উপাধি পরীক্ষার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকও ছিলেন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক।

জন্ম—২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৯। জন্মেছেন ভবানীপুর, কলকাতায়, বিখ্যাত মল্লিক পরিবারে। এঁর পিতা ৺ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক সাহিত্যিক হিসাবে ও ইক্‌মিক্ কুকারের আবিষ্কারক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

ভবানীপুর সাউথ সুবার্বান্ স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র। কর্মজীবনে ইনি হাইকোর্টের ও সুপ্রীম কোর্টের য়্যাড্‌ভোকেট। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় আইনজীবীদের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে চীন, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশ ঘুরে এসেছেন।

স্কুলে থাকতেই সাহিত্যসেবা সুরু হয়। প্রথম কবিতা স্কুল ম্যাগাজিনেই বেরোয়। তারপর 'রামধনু' ও 'রংমশাল' পত্রিকায় বহু মজাদার হাসির কবিতা ও ছড়া লিখে অল্প দিনেই খ্যাতি লাভ করেন। দুঃখের বিষয় ইনি খুবই কম লেখেন। সাহিত্যচর্চা হয়তো এঁর কাছে অবসর যাপনের অন্যতম আনন্দ মাত্র। এঁর রচিত 'কবির লড়াই' শিশুরংমহল ও অন্য নানা জায়গায় অভিনীত হয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। ইংরেজী কবিতাও ইনি সুন্দর লেখেন। এঁর প্রকাশিত বইএর

মধ্যে 'রবিবারের দেশে', 'ছোটদের অআকখ' উল্লেখযোগ্য। 'কবির লড়াই' ও 'ব্যাঙ্ককে কয়েক দিন' শীঘ্রই পুস্তকাকারে বেরোচ্ছে।

উপেন্দ্র বাবু খুব মজলিসি লোক এবং সু-অভিনেতা। হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের ন্যাট্যসমিতির ইনি একজন প্রধান স্তম্ভ। শিশুসাহিত্য-পরিষদেরও ইনি কার্যনির্বাহক সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য।

অকালে রেনি ডে

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

ভোর বেলা মেঘ করা
ভারি লাগে মিষ্টি,
চুপ্‌চাপ্‌ অকালের
ঝুপঝাপ্‌ বিষ্টি।

পথ ঘাট সব ঠাঁই
জলে টই-টম্বুর,
বিষ্টির ছাটে জামা
ভিজে গেছে শস্তুর।

কালো মেঘ নেমে আসে
তেতলার ছাতেতে,
হাতখানি বাড়ালেই
ধরা যায় হাতেতে।

স্বরগের ধারা নামে
ধরণীর অঙ্গে,
ভগবান্‌ মিশে যান
মানুষের সঙ্গে।

খাব না মা, ভাত ডাল,—
ঝোল আজ খাব না;

রেনি ডে হবেই হবে—
ইস্কুলে যাব না।

চিংড়ি ও আলু দিয়ে
চড়াও মা খিচুড়ি,
মামুলি ও রান্না
রেঁধো নাক' কিছুরই।

মেট্‌লির চচ্চড়ি,
পোস্তোর বড়া ও,
ইলিশের ঝালটক,
ডিম ভাজা চড়ায়ো।

ঝমাঝম্‌ আরো জোরে
আয় ভাই বিষ্টি,
কেয়া মজা, খিচুড়ি ও
ইলিশের কিষ্টি!

রাস্তাটা হয়ে থাক
জলে ভরপুর রে,
রেনি ডে! রেনি ডে!
হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে!

যে গল্প জানা নেই

শ্রীবাসুদেব সরকার

—চৌদ্দ—

বাবার সঙ্গে গোপাল যখন তাদের বাড়ীতে পৌঁছাল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ক্লান্ত সূর্য্যি মামা পশ্চিমের কোলে ঢ'লে পড়েছেন। তাঁর রাঙা আলোর স্পর্শ বনান্তরের মাথায় পড়ে অপরূপ এক আলোক-মায়ার সৃষ্টি করেছে।

সারাটি পথ গোপাল যে স্বপ্ন রচনা করেছিল, বাড়ীতে এসে তা নিষ্ঠুর ভাবে ভেঙে গেল। ভেবেছিল মা, দিদি ওর পথ চেয়ে বসে আছে; কিন্তু দিশাহারা গোপাল দেখলো, কেউ দাঁড়িয়ে নেই তার জন্য। বাবা নিতান্ত নিস্পৃহভাবে পাশের বড় ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আর গোপাল, যেন অপরিচিতের মতই, উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল। তার আশৈশব স্মৃতিবিজড়িত চিরচেনা বাড়ী, সেখানেও যেন আজ আর তার স্থান নেই। একবার ভাবলো, এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তার বুকটা হয়তো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

'খুট্' করে দরজা খোলার আওয়াজ হ'লো। গোপাল চমকে ফিরে তাকালো। দেখলো ওপাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিদি—উমা। গোপালের মুখ থেকে নিজের অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে এল,—'দিদি!'

দিদি এসে গোপালের হাত ধরে বললো, 'আয়!' তার গলার আওয়াজ শুনে গোপাল বিস্ময়ে বলে উঠলো, 'তুই কাঁদছিলি দিদি!'

একটু ম্লান হেসে দিদি বল্‌লো, 'নাঃ তো!' ছোট্ট এই উত্তরটুকু দিয়ে গোপালকে ঘরে নিয়ে দিদি বসালো চৌকির উপর। গোপাল বসেই আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলো, 'মা কোথায় গেল? খোকনকেও ত' দেখছি না!'

দিদি বললো, 'মা ঠাকুর-ঘরে, খোকনও সেখানেই বোধ হয়।' কথা-শেষে গোপালের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌লো, 'গোপাল, একটা সত্যি কথা বল্‌বি ভাই?'

গোপাল বুঝলো কি তাকে বলতে হবে। তবু বললো, 'দিদি, তোর কাছে ত' আমি কোনদিন মথ্যে কথা বলি নি!'

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে দিদি বললো, 'গোপাল, আমি যদিও জানি তুই দোষী ন'স্, তবুও তোরই মুখে আমি শুনতে চাই সত্যিই কি তুই বুলুর বই—'

গোপালের চোখ ফেটে জল এল। দিদি।—দিদি পর্যন্ত আজ তাকে এই প্রশ্ন করছে! গোপালকে সে কি চেনে না! এই ক'দিনে এত বদলে যাবে গোপাল!

নিদারুণ অভিমানে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে। কেউ কি তার মনের কথা বুঝবে না? সে তো সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তবুও তাকে এত জবাবদিহি করতে হচ্ছে!

দিদি বোধ হয় বুঝতে পারল সব। গোপালের মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে, আঁচলে চোখের জল মুছে দিল। তার পরে মিষ্টি ভর্ৎসনা করে বললো, 'ছিঃ! পুরুষ মানুষের কাঁদতে আছে? জানিস্, মামার কাছ থেকে যখন চিঠি এল তখন সব শুনে মা'র মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছিল। মা তো তোকে চেনে, তাই তোর ব্যথার চেয়ে মায়ের ব্যথা আরও গভীর! ঠাকুর-ঘর থেকে মা বেরিয়ে এলে দেখবি, মাত্র ক' দিনে মা কেমন হ'য়ে গিয়েছে।'

বল্‌তে বল্‌তে দিদির চোখ দু'টিও জলে ভরে এলো। মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লো, 'তুই বোস্, মাকে আমি এক্ষুণি সব জানিয়ে দিয়ে আসি। এ গুমোট আর সহ্য হয় না।'

ত্বরিতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল উমা।

(ক্রমশঃ)

কবি

শ্রীমুরারিমোহন মণ্ডল

প্রকাণ্ড এক শহরেতে
এক যে ছিলেন কবি,
গাড়ী বাড়ী ছিল তাঁহার—
আর যা থাকে সব-ই।
ফ্যানের তলায় পদ্য লেখেন,
বিষয়—'গাঁয়ের ছবি'।

পদ্য মাঝে মনটি তাঁহার
গাঁয়ের চাষীর তরে
অসহ্য এক বেদনাতে
আকুল হয়ে মরে;
লেখার মাঝেই চক্ষু দু'টি
অশ্রুজলে ভরে।

সেই কবিরই প্রশংসাতে
ভরল যখন দেশ,
কবি এলেন গ্রাম-ভ্রমণে—
পৌষ মাসের শেষ;
হ্যাট্-কোট্-প্যান্ট পরনে তাঁর—
চেহারাটাও বেশ।

গেঁয়ো বন্ধুর আমন্ত্রণে
ওঠেন তাঁহার বাড়ী,
মাটির ঘরের দোরের গোড়ায়
রইল বাঁধা গাড়ী;
গাঁয়ের লোকে অবাক্ মানে,—
পড়লো সাড়া ভারী।

কবি বলেন বন্ধুরে তাঁর,
'ন্যাষ্টি—এরা কারা?
গায়ে কেন নেইকো জামা?'
বন্ধু বাক্যহারা।
হেসে বলেন, 'তোমার লেখার
বিষয়বস্তু এরা।'

একা

শ্রীযমুনা গঙ্গোপাধ্যায়

গাঁয়ের পথে চৈত্রের রোদ্দুরে
রাখাল ছেলের বাঁশরিয়ার সুরে
বটের ছায়ে ক্লান্ত পথিক এসে
তন্দ্রাচোখে পড়বে শুয়ে শেষে,—
আমি তখন বসে তারই ছায়
রইব চেয়ে দূরের সীমানায়।

চাঁদের আলোয় নীরব নিশীথ রাতে
কুয়াসারই ইন্দ্রজালের সাথে
শান্তশুভ্র শেফালিকার রাশে
জড়ায় যবে ধরায় মায়াপাশে,—
আমি তখন আঁধার ঘরের কোণে
সুরের ধারা ঢালব অকারণে।

শ্রাবণধারার নির্ঝর সংগীতে,
বাদল হাওয়ার ব্যাকুল আকুলিতে,
তড়িৎ-শিখায়, সজল কাজল মেঘে
বনের হিয়া উঠবে যখন জেগে,—
একা বসে শুনব তারি বাণী
ভরে নেব হৃদয়-কুম্ভখানি।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

আরম্ভেই রামধনুর পক্ষ থেকে তোমাদের শুভ ৺বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানাচ্ছি, আর, সেই সঙ্গে, তোমাদের কাছ থেকেও যে অজস্র শুভেচ্ছাজ্ঞাপক চিঠি পেয়েছি, তারও প্রাপ্তিস্বীকার করছি। প্রত্যেককে আলাদা ক'রে জবাব দেবার জায়গা থাকলে তা অবশ্যই দিতাম. কিন্তু তা পারলাম না ব'লে সংকোচ বোধ করছি। কিন্তু খুসী যে কতখানি হয়েছি ঐ চিঠিগুলি পেয়ে, তা বলবার নয়।

তারপর, পূজোর ছুটি কে কেমন কাটালে বল। অনেকে বোধ হয় এই সুযোগে বাইরেও ঘুরে এসেছ? আমিও ইতিমধ্যে দিন কয়েকের জন্য আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতা থেকে শ' দুই মাইল দূরে কাটিয়ে এলাম। ছোট্ট জায়গা; নিরিবিলি, কিন্তু সুন্দর। বিশেষতঃ আমাদের একঘেয়ে শহুরে জীবনে এই সাময়িক পরিবতন পরম উপভোগ্য। দেখে এলাম ছোট্ট

পাহাড়ের নীচে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী নদী, ঝির্‌ঝির্‌-ক'রে-ঝরা ছোট ছোট ঝরণা, লাল মাটীর উঁচুনীচু প্রান্তর আর ছোট ছোট-'ছায়া-সুনিবিড়' গ্রাম। 'শান্তির নীড়' কিনা ঠিক জানি না, কিন্তু অনাড়ম্বর সন্দেহ নেই।

কিন্তু বাজে কথায় সময় নষ্ট করব না, প্রচুর চিঠি স্তূপীকৃত হয়ে আছে টেবিলে। সবগুলির জবাব একবারে দেওয়া সম্ভব হবে না জানি, তবু যতগুলি পারি চেষ্টা করতে দোষ কি?

শ্রীবাসুদেব সরকার (কাঁচড়াপাড়া)—তোমার চিঠির ভঙ্গীতে প্রলুব্ধ হয়ে প্রায় লম্বা একটা জবাবই লিখে ফেলেছিলাম আর কি! খুব সামলে নিয়েছি। তোমার লেখাটাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরোল! খুসী তো? শ্রীশিকুল চক্রবর্তী (ধানবাদ)—তোমার চিঠিতে ওখানকার সবুজ ঘাসের আর ভিজে মাটীর গন্ধ পাচ্ছি যেন! তুমি তো দেখছি স্বভাবকবি! শ্রীমুরারি-মোহন মণ্ডল (কুমুড়সা)—সাপের গোঁফ দেখেছ?—বেড়ালের মত? বল কি! ছবি পাঠাতে পার? ভারতের বাইরে চিঠি লিখতে বেশী দামের ডাকটিকিট লাগে বৈ কি! কোথায় কত লাগে তা যে কোন ভাল পকেট ডায়েরীর মধ্যেই পাবে। ডাকঘরেও জেনে নিতে পার। রামধনুর জনৈকা বান্ধবী—"অন্নদামঙ্গলে" ঈশ্বরী পাটনীকে স্বয়ং অন্নদাও কৌশলে পরিচয় দিয়েছিলেন, তুমি দেখছি তাতেও নারাজ! যাক্, রামধনুর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব অটুট থাকুক এই চাই। ধাঁধাই সম্পর্কে দপ্তরীকে সাবধান করে দেব। শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ (বোম্বাই)—তোমার স্বাক্ষরের বাহাদুরী আছে। ভেতরের রহস্য জেনে আরও মজা লাগল। তুমি তা হ'লে কেবল পাকা ফটোগ্রাফারই নও,—লিখনপটীয়সীও বটে। ইংরেজী ধাঁচে বেমালুম বাংলায় স্বাক্ষর দুরস্ত করেছ! হিন্দী কাগজে প্রায়ই লিখছ জেনে খুব খুসী হলাম। হাতে পেলে নিশ্চয়ই পড়ে দেখব যদিও রাষ্ট্রভাষায় জ্ঞান আমার তেমন প্রখর নয়। 'এলিফ্যান্টা' সম্বন্ধে হতাশ হবার সময় এখনও আসে নি। শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা-৪০) পুরোনো রামধনু তোমার ভাল লেগেছে? ও সম্পর্কে তোমার যুক্তিপূর্ণ মতামত পড়ে খুসী হলাম। প্রত্যেক যুগেই নতুন নতুন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু যাঁকে হারানো যায় তাঁর জায়গা সত্যি আর পূর্ণ হয় না। গতানুগতিক পাঠকদের সঙ্গে তোমার বই পড়ার ধরণে একটু পার্থক্য আছে মনে হচ্ছে। তুমি যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বই পড় তা প্রশংসনীয়। শ্রীসুশান্ত লাহিড়ী (নিউ দিল্লী-৩)—তোমরা দিল্লী সহরে 'চিল্‌ড্রেনস্‌ কর্ণার' (C-২।১০৪ লোদী রোড, নিউ দিল্লী-৩) নামে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছ এবং ইতিমধ্যেই নতুন ও পুরোনো দিল্লীতে যার অনেক শাখা খোলা হয়েছে—তার কথা জেনে আনন্দিত হলাম। তোমরা ওখানে 'দিগন্ত' নামে একটা হাতে-লেখা সচিত্র সাপ্তাহিক বার করেছ এবং তার জন্য ছোটদের উপযোগী লেখা ও ছবি (৫"×৫"-র মধ্যে) আহ্বান করেছ এ খবরটাও, তোমাদের অনুরোধে, রামধনুর পাঠকপাঠিকাদের জানিয়ে দিলাম। শ্রীসুকুমার রায় (বিদ্যাপীঠ)—তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট কুপনই ব্যবহার করতে হবে, পুরোনো কুপন অচল।

আজ কিন্তু এখানেই দাঁড়ি টানব আর একবার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে।

—ইতি তোমাদের সম্পাদক মশাই।

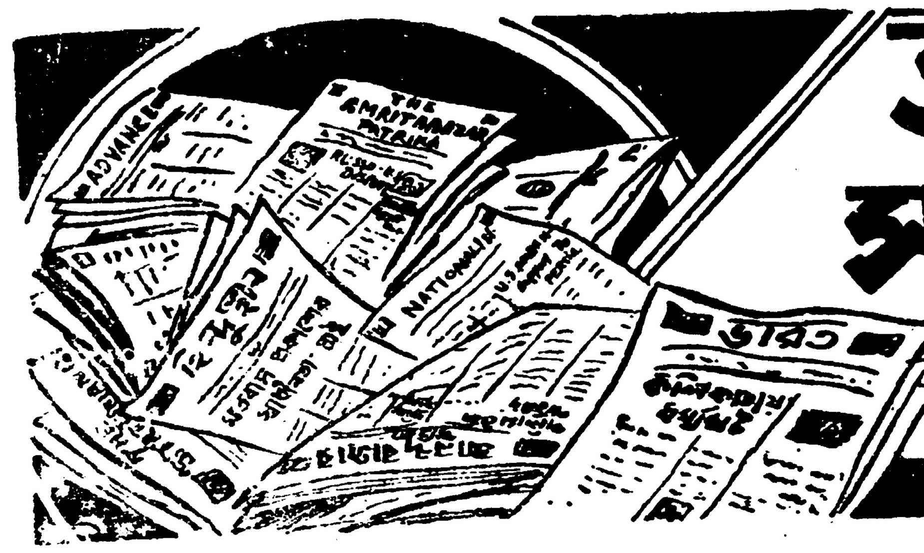

আমাদের সংবাদ পত্র বিভাগ

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৭। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দিনটি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাজিত করে মানুষ এই দিন প্রথম মহাশূন্যের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপন করল। এই অসম্ভব কাণ্ড হাসিল করেছেন সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। বাহাদুর বলতে হয় তাঁদের। আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও নাকি অনেক দিন থেকে এর জন্য তোড়জোড় করছিলেন, কিন্তু তাঁদের আগে তাঁদেরই রাজনৈতিক বিপক্ষ দেশ তাঁদের ওপর টেক্কা দিয়ে গেল।

খবরটা আজ আর কারও অজানা নয়। মানুষের হাতে গড়া শিশু চাঁদ হাউই বা রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে উঠে এখনও দ্রুতবেগে চক্কর দিচ্ছে,—পৃথিবী থেকে ৫৬০ মাইল উঁচুতে। প্রচণ্ড তার বেগ,—ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল। প্রতি ৯৫ মিনিটে অর্থাৎ প্রায় মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে সে এক একবার পৃথিবীকে পাক খেয়ে আসছে। শুধু এই চাঁদই নয়, যে রকেটটি তাকে অত উঁচুতে ঠেলে তুলে দিয়েছে সেও তার সঙ্গে একটু আগে আগে অমনি বেগে পৃথিবীকে চক্কর দিয়ে চলেছে।

কলকাতার ওপর দিয়ে যখন এই চাঁদ বা রকেট ছুটে যায় তখন খালি চোখেও অনেকে তা দেখতে পেয়েছেন।

এই শিশু চাঁদের মধ্যে ভরা আছে নানা রকম স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে বেতার প্রেরকযন্ত্র। পৃথিবীর বুকে বসে বিজ্ঞানীরা তার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। এই শিশু চাঁদের বিষয় বারান্তরে তোমাদের ভাল করে বলা যাবে!

* *

বেশী বয়সে যাঁরা নতুন করে লেখাপড়া শিখছেন তাঁদের উপযোগী বই লেখার জন্য ভারত সরকার গত কয়েক বছর ধরে কয়েকটি করে পুরস্কার দিচ্ছেন। এবারে যাঁরা এই পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন রামধনুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রীমান্ অমরনাথ রায়। এঁর লেখা বিজ্ঞানের গল্প তোমরা রামধনুতে অনেক পড়েছ। যে বইখানার জন্য ইনি পুরস্কার পেয়েছেন সেটির নাম "ফেলবার নয়"। শ্রীমান্ অমরনাথ বয়সে তরুণ। তাঁর এই সাফল্যে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি, তোমরাও নিশ্চয়ই করবে।

* *

এ বছর সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন ফরাসী লেখক আল্‌বেয়ার কামু। এঁর বয়স এখন ৪৪ বছর। সাধারণতঃ সাহিত্যিকদের আরও পরিণত বয়সেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়। সেদিক্ দিয়ে কামু অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই পেলেন বলতে হবে। অবশ্য ইংরেজ লেখক রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং আরও কম বয়সে ৪২ বছর বয়সে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

১ = গোল, ২ = গোলা, ৩ = গালা, ৪ = গল্প ৫ = গুলি, ৬ = গলা, ৭ = গাল।

উত্তরদাতাদের নাম : নির্ভুল—অনাথ, দীপক, দিলীপ ও ব্রহ্মচারী (সোনাই-মুখ); কৃষ্ণা স্থর (কলিকাতা-৪); রূপা চৌধুরী (কলিকাতা-৪০); স্থগত সেনগুপ্ত (কলিকাতা-২৬); স্থনির্মল মল্লিক (কলিকাতা-২৯); বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা-৪০); রত্নাবলী ভট্টাচার্য (কলিকাতা-২৫); নির্মলকান্তি ঘোষ (বালুরঘাট); স্থচেতা ভট্টাচার্য (কলিকাতা-২৫); স্থধাংশুগোপাল মণ্ডল (কলিকাতা-৫); রজত ও সঞ্জয় চন্দ (শিলং); খোকা, রেবা, মহে, মদন, মিন্থ, পাঁচুদা, মুরারিমোহন মণ্ডল (কুমুড়সা), বাবু ও ঝুনু (কলিকাতা-২৬); ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী (কলিকাতা-২৫); নির্মলেন্দু গাঙ্গুলী (পীরপুর); প্রণতি ভট্টাচার্য (চন্দননগর); নন্দিতা চক্রবর্ত্তী (শিলচর); অমিতাভ ও অশোকেনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর); অশোক ও স্থজিত দাশগুপ্ত (কলিকাতা-২৬); জাহ্নবী, শুক্লা, যমুনা, বৌদি, সিপ্রা, ডাকু, মুন্‌মুন্‌ (ধুবড়ী); অমিতাভ, বাচ্চু ঘোষ ও কাকা (কলিকাতা-২৫); দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-১২) ছায়া, জয়া, মিতা, তন্দ্রা ভট্টাচার্য (কলিকাতা-২৬); জয়দেব, প্রফুল্ল, পরেশ, দিলীপ (দেউলপুর); স্বপনকুমার সেন (বর্ধমান)। আংশিক—অজয়কুমার মাল (দেউলপুর); ধীরেন্দ্র নাথ মান্না (শুসরক ; মিলনেন্দু, আনন্দগোপাল, অমল রবি, শান্তি, পুলক, অলোক প্রভৃতি (দহকুলা)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীকৃষ্ণা স্থর

শব্দচৌকি : তিন অক্ষরের তিনটি শব্দ এমন ভাবে বেছে নিয়ে সাজাতে হবে যাতে পাশাপাশি পড়লেও যা হবে, উপর নীচে পড়লেও তাই হবে। পাশে একটা নমুনা দেওয়া হ'ল।

	(১)	(২)	(৩)
(১)	চ	শ	মা
(২)	শ	ঠ	তা
(৩)	মা	তা	ল

এইভাবে চেষ্টা কর :—

ক। ১) পৃথিবীর তলায় নামলে কি পাব? ২) অদ্ভুত জিনিষটি দেখলে আমরা কি বনে যাব? ৩) পরিমাপ ছাড়ালেই জিভের দফা কাহিল করে দেবে কে?

খ। ১) কি বাঁচাবার জন্য আমরা সব সময়ে সতর্ক থাকি? ২) খাবারে বিষক্রিয়া হলে কি হয়? ৩) কোন্ সম্পর্ক শুধু বৌদির সঙ্গেই হতে পারে?

গ। ১) গয়নাও পরব শব্দও শুনব—কি দিয়ে? ২) কোন্ ভাবটি সকলেরই প্রিয়? ৩) এই ধরণেরই বদলে কি হতে পারে?

ঘ। ১) কোন্ জিনিষ বেশ নরম হলে ভারী আরাম? ২) রামকে এনে কা'কে আরও বড় করা যায়? ৩) ছোটদের একখানি প্রিয় বই কি?

(সবগুলির উত্তর একত্র পাঠাতে হবে।)

লে খা চা ই

অভিনব কিশোর-মাসিক ; বার্ষিক সডাক ২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১৷০, প্রতি সংখ্যা ৶০। কার্ত্তিক (৭ম) সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে "যেই ভকত, সেই জানে" শিশু-উপন্যাস বাহির হইতেছে। নবীন লেখক-লেখিকাদিগকে লিখিতে উৎসাহ দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। ছোটদের 'লেখা' ব্যতীত, বড়রাও লিখিয়া থাকেন। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমলকুমার মিত্র, যাদুশ্রী শঙ্কর দাস প্রভৃতিও ইহাতে লেখেন। আগামী বৈশাখ হইতে ২য় বর্ষ আরম্ভ হইবে, কলেবর বর্দ্ধিত হইবে ও বার্ষিক চাঁদা ৩ টাকা হইবে। এখনই গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইলে, অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না।
ঠিকানা :— শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, বি-টি, সম্পাদক, 'লেখা চাই', দেবালয়—২৪ পরগণা।

চ য় ন

রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ (হিন্দুস্থান মার্টের সন্নিকটে)
সব রকম বই—বিশেষ করে রামধনু পত্রিকা (যে কোন সংখ্যা) এবং রামধনু কার্যালয় থেকে প্রকাশিত সব রকম বই আমাদের কাছে পাওয়া যাবে।

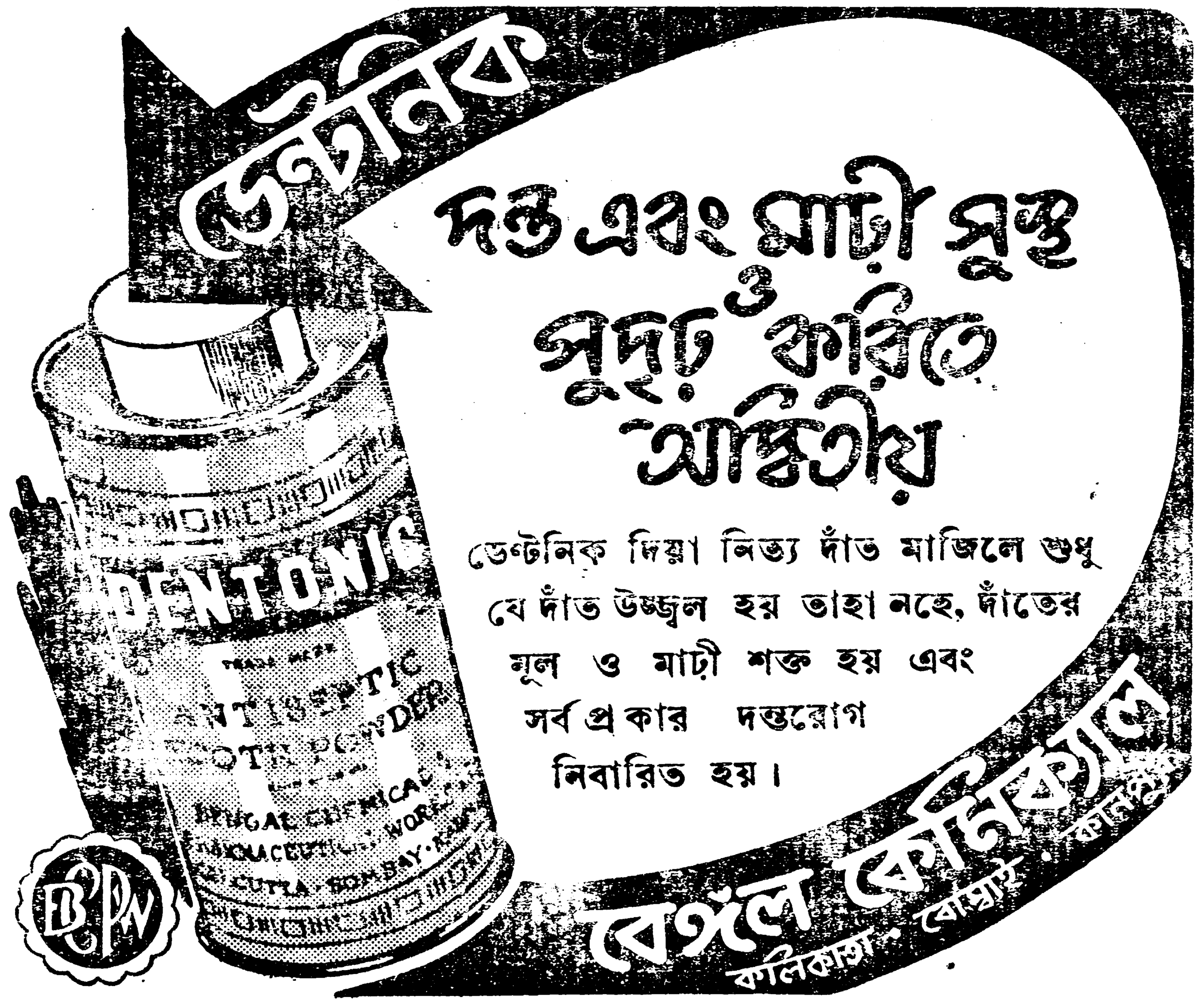

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

লেখা বই

— বিজ্ঞানের গল্প —

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

আবিষ্কারের গল্প

*আকাশের গল্প

*বিজ্ঞান বুড়ো

— উপন্যাস —

ধূমকেতু

রাত যখন সাতটা

*রাধামাধবের রত্নহার

— বিদেশী বই অবলম্বনে —

ব্ল্যাক্ টিউলিপ্

দি ইলিয়াড্

দি অডিসি

— ছোট গল্প —

*জন্মদিনের উপহার

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সহযোগে

*গল্পসল্প

*ছুটীর গল্প

*আজব গল্প

*অনেক গল্প

— নাটিকা —

অয়েল পেন্টিং

— যন্ত্রস্থ —

ছোটদের বিশ্বকোষ

(আনুমানিক ১২ খণ্ডে)

*চিহ্নিত বইগুলি বর্তমানে ছাপা নেই

সুরিনা স্পেশাল কালি

আপনার কলমের আয়ু অক্ষুন্ন রাখে!

সুপ্রীম কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ • কলিকাতা

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে

অতুলনীয়

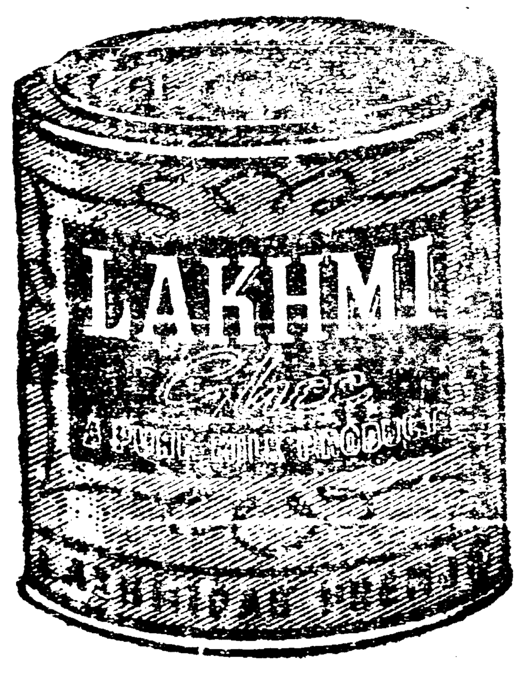

লক্ষ্মী ঘি

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্ব্বত্র সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন-২২-৭২৪৩

ছোটদের গ্রন্থাগারে রাখিবার মত বই

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

রায় পাগাড়ীর নিশাচর ৷৷০

অনুসন্ধানী ১৷৷০

দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্স্ ৷৷৵০

(কুপারের বিখ্যাত উপন্যাস)

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

দি অলিভার টুইষ্ট ৷৷৵০

ডিকেন্সের অমর উপন্যাস)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ১৲

(বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের গল্প)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

ধূমকেতু ৷৷০

(বিজ্ঞানের ভিত্তিতে রহস্য-উপন্যাস)

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

রহস্যময় ডিটেকটিভ উপন্যাস

পদ্মরাগ ১৷০

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ১৷০

মজাদার হাসির গল্প

চায়ের ধোঁয়া ৷৷০

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে ১৲

(শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর সহযোগে)

একখানি দরকারী বই

অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা

ঘরে বসে সাবান, কালি, দাঁতের মাজন এবং আরও হরেক রকম রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করার সহজ প্রণালী।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ—দাম ১৷০

রামধনু কার্য্যালয়,

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ! আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ৷৷০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১৷৷০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়

১৩১বি, রসা রোড

কলিকাতা-২৬

সম্পাদক

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

Regd. No. C—1641

রামধনু

১০শ বর্ষ —১৩৬৪ শকাব্দ	সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য	বার্ষিক ৬ টাকা ষাণ্মাসিক টা. ২.২৫ প্রতি সংখ্যা ৩৭ন প.

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন – ৩৫–২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

৴২॥০,৴৫,।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

ছোটদের ভাল ভাল বই ঃঃ নামকরা বই

নবীগোপাল চক্রবর্ত্তীর –

কাঠ ও কাঠের কাজ	১॥০
বাঁশ, বেত, পাতা ও সোলার কাজ	১৲
তন্তুশিল্পের কাজ	১৲

আলোক চক্রবর্ত্তীর—

মনসামংগল	১৲
চৈতন্যমংগল	১৲
কুমারসম্ভব	১৲

শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তীর—

রঘুবংশ	১৲
রাণী রাসমণি	১৲
জাগ্রত মেদিনী	১৲

ছোটদের অভিনব মাসিক পত্রিকা

চয়নিকা

১৮ বছরে পড়ল : বার্ষিক মূল্য
মাত্র ৩৲

যে কোন মাসে টাকা পাঠালেও বৈশাখ থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক হতে হয়। নমুনার জন্য ৴০ আনার ডাক টিকিট অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা মাত্র ।০ আনা। অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গ ও সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত।

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৭ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

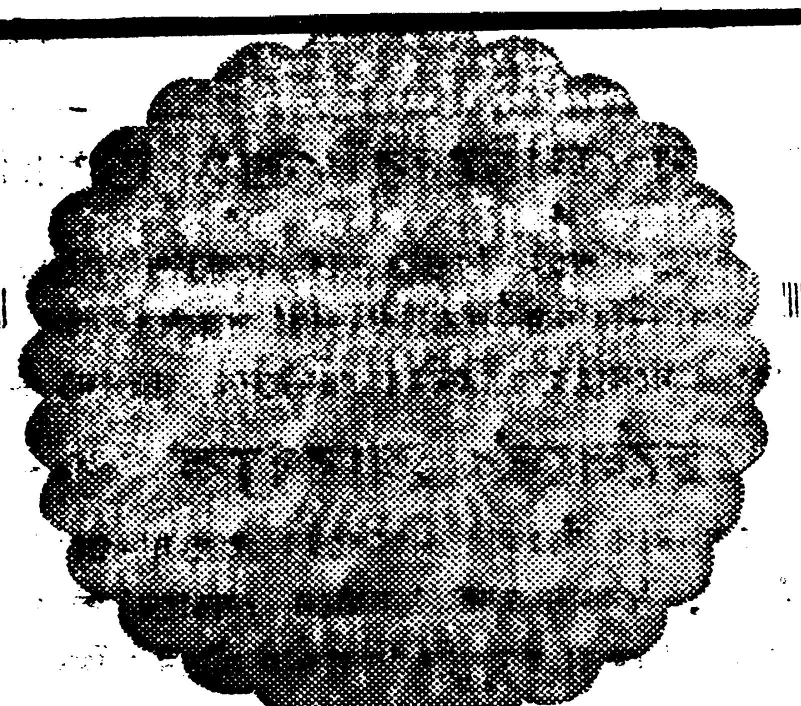

বিজ্ঞাপনের মতামতে

কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?

স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে ; গুনে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

উৎসবে ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার

পথের পাঁচালীর অপরাজেয় কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। মানুষের বসতি হইতে দূরে যেখানে নিবিড় অরণ্য—বিচিত্র পত্রপুষ্প-শাখা-পল্লবের দেশ—পশুপক্ষীর ন্যায় মানুষও যেখানে প্রকৃতির দোসর - তাহারই মনোহর কাহিনী। ছোটদের বোধগম্য ভাষায় অপূর্ব্ব সচিত্র উপন্যাস

ছেলেদের আরণ্যক ৩·০০

বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রশংসা-প্রাপ্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বুনো ওল বাঘা তেঁতুল', 'কেমন জব্দ'. 'সেয়ানে সেয়ানে' আর 'জয় পরাজয়'—শিবাজীর জীবনের চারটি চমকপ্রদ ঘটনা লইয়া লেখা ছত্রপতি শিবাজীর জীবন চরিত।

শিবাজী মহারাজ ১·০০

শিবাজীর জীবনের এই ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাগুলি উপন্যাসকেও হার মানাইয়াছে।

রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় যশস্বী ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থের লেখা

রাজা-উজিরের কথা ০০·৫০

যেমন মা ছাড়া শিশুর ডাক হয় না. তেমনি রাজা ছাড়া কোন দেশ হয় না। আগের দিনের রাজা আর তাঁর উজিরের কাজ এবং আজকালকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্য শাসনের কথা সহজ সরল ভাষায় ছোটদের জন্য এই প্রথম প্রকাশিত হইল। বাংলা ভাষায় এই ধরণের বই আর নাই।

রঙিন কালীতে ছাপা মরমী কবি মোহিতলাল মজুমদারের ছোটদের জন্য লেখা

রূপকথা ১·০০

বিখ্যাত শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের অঙ্কিত ছবি পাতায় পাতায়। উপহারের অপরিহার্য বই।

তামসরঞ্জন রায়ের

স্বামী বিবেকানন্দ ১·৫০

"স্বাধীনতা লাভের চেয়েও যে মানুষ হওয়া বড় কথা আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিতেছি। ··· আজ তাই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ দেশের সম্মুখে আবার ধরিতে হইবে। ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য কোন পথ নাই। এই কারণেই গ্রন্থখানি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলিয়া মনে করি।" বলিয়াছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।

বিখ্যাত লেখিকা বাণী রায়ের লেখা

হাসি কান্নার দিন ১·৫০

একটি বালিকা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া কয়েকজন ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর দৈনন্দিন জীবনের স্বপ্ন-কল্পনাই এই বইয়ের উপজীব্য। কিশোরী জীবনের আনন্দ ও নিরানন্দের কাহিনী।

আমাদের নূতন বিক্রয়-কেন্দ্র
জেনারেল বুকষ্টল
এ-৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মহাবিজ্ঞানী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

এই মাসেই এঁর জন্ম-শতবার্ষিকী

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ { ৮ম সংখ্যা

প্রজাপতি

ডক্টর বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, এম্. এ., পি. আর. এস্. ডি. লিট্

প্রজাপতির অঙ্গ জুড়ে
রঙের বাহার চমৎকার!
চন্‌মনিয়ে যাচ্ছে উড়ে,—
চোখ ধাঁধালো ঝলক তার।

বন্ধুরা তায় পরম স্নেহে
সাজায় বুঝি রোজ ভোরে?
নইলে কিসে পোকার দেহে
রামধনুকের রঙ্ ঝরে!

জাফ্‌রানি রোদ ঘাগ্‌রা পরায়—
মুক্তো জরির পাড় যা'তে ;
কাঁচপোকারা গয়না জোগায়,
বেগ্‌নি ফিতে দেয় মাথে।

ঝর্ণাপরী ওড়্‌না-কোণে
চুম্‌কি গাঁথে পান্নারি ;
আল্‌তো ক'রে তুই নয়নে
সুর্মা পরায় দিঙ্‌নারী।

কম্‌লা মধুর কৌটো আনি'
মৌমাছি দেয় ছোপ বুকে ;
পদ্মকুঁড়ির পাপ্‌ড়ি ছানি'
ভোম্‌রা মাখায় তার মুখে।

হলুদ বেটে টিপ পরালো
শিউলি-বোঁটায় বুল্‌বুলি ;
যেম্নি ময়ূর নাচ শেখালো—
উড়্‌লো রূপের ঢেউ তুলি'॥

২

আমি কলকাতা ফিরে এসে নিজের কাজে মনঃসংযোগ করেছি, পরশুরামের আবির্ভাব-কাহিনী মন থেকে মুছেই গিয়েছে। এমন সময় একদিন একখানি টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত।

টেলিগ্রামের আগমন এখনও আমাদের মনে একটা ভীতির সঞ্চার করে। আমরা জানি যে খুব গুরুতর ব্যাপারে না হলে কেউ টেলিগ্রাম করে না। কাজেই অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে টেলিগ্রামটা খুলে দেখলাম আমাদের গ্রামের কাছে যে রেল ষ্টেশন সেখান থেকে এসেছে। পাঠিয়েছেন শচীন ঠাকুর, আমাদের পুরোহিত। টেলিগ্রামে পরিষ্কার

করে কিছুই লেখা ছিল না, কেবল লেখা ছিল—অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার, অবিলম্বে আমার যাওয়া প্রয়োজন।

কৌতূহল এবং দুশ্চিন্তা খুবই বেড়ে উঠলো। কি এমন ব্যাপার? সেটা টেলিগ্রামে খুলে লিখলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? এ ধরণের টেলিগ্রামে দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দেয় মাত্র।

সন্ধ্যার সময় এসে পৌছুলাম। মা আছাড় খেয়ে পড়লেন। সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে। শচীন ঠাকুর এবং গ্রামের আরও ২।১ জন খুব চিন্তাকুল মুখে দাঁড়িয়ে। কি ?—ব্যাপারটা কি ? কিসের সর্ব্বনাশ ?

শেষে ব্যাপারটা শুনলাম। আমার মা প্রতি সকাল এবং সন্ধ্যায় পঞ্চানন্দ দেবের বেদীতে গঙ্গাজল ছড়িয়ে ধূনা ও ধূপ দিয়ে আসতেন। গতকাল সন্ধ্যাতেও দিয়ে এসেছেন, কিন্তু আজ সকালে গিয়েই দেখলেন বেদীতে পঞ্চানন্দ দেব নেই। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামের অনেকেই এসে উপস্থিত হলেন। এ অসম্ভব ঘটনায় সবাই হতবাক্ হয়েছেন। এত দিনের পঞ্চানন্দ দেব—কত দিনের - তা কেউ বলতে পারে না, তাঁর এ রকম অন্তর্দ্ধান কেবল যে বিস্ময়কর তা নয়, গাঁয়ের এত বড় অমঙ্গলসূচক ব্যাপার আর কি হতে পারে ?

মা বললেন, এখনও যে কি সর্ব্বনাশ হবে আমাদের সংসারে তা তো ভেবে পাই নে বাবা !

শচীন ঠাকুর বললেন, শুধু সংসারের সর্ব্বনাশ কেন বলছেন খুড়ি মা, গাঁয়ের সর্ব্বনাশ বলুন।

জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বললেন, এতকাল পরে বাবা পঞ্চানন্দ যখন আমাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন, তখন কি যে হবে সত্যিই তা তো ভেবে পাই না। এখন উপায় কি ?

শচীন ঠাকুর বললেন, আঁশখালিতে লোক পাঠিয়ে একবার শিরোমণি মশায়ের কাছ থেকে একটা ব্যবস্থা নিয়ে আসা হোক। একটা অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত তো করতেই হবে, দ্বাদশটি ব্রাহ্মণভোজন, তারপর—

আমি কিন্তু সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম। দেবপ্রতিমার অঙ্গে সোনা-রূপোর গহনা থাকলে অনেক জায়গায় চুরি হয়ে যাওয়ার কথা শোনা গিয়েছে। কিছুকাল আগে তো দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির থেকেই এই রকম ঘটনার কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো তা নয়, কোনও অলঙ্কারই তো সেই শিলাখণ্ডে ছিল না ! তবে সেটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা বা প্রয়োজন কার থাকতে পারে ?

জ্ঞান চাটুয্যে বললেন, ঠাকুর চুরি করে আর কে নিয়ে যাবে বাবা! পঞ্চানন্দই আমাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন। গ্রামে পাপ ঢুকেছে তো—

কয়েকটি লোকের সাম্প্রতিক পাপাচরণের দৃষ্টান্ত তিনি দিলেন। এক সের মাছ কিনে বাড়ী এসে ওজন করে দেখা গিয়েছে তিন পোয়ার বেশী নয়—এ কাহিনীও সখেদে বললেন শচীন ঠাকুর।

একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখলাম, এ ব্যাপারে কার স্বার্থ বা ইষ্টসিদ্ধির প্রশ্ন উঠতে পারে? একটা শিলাখণ্ড সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত আমার মনে পড়লো সেই পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতির কথা। সেই আধপাগলা লোকটা কিছুকাল আগে এসে ঠাকুর সম্বন্ধে বড় বেশী কৌতূহল প্রকাশ করেছিল। ঠাকুরের স্থাপনের ইতিহাস জানবার জন্য তার ব্যাকুলতা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার পক্ষেই কি এ কাজ সম্ভব? কিন্তু কি লাভ হবে তার এ কাজ করে? শিলাখণ্ডের ওজন নেহাৎ কম নয়! সে ভবঘুরের মত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়, তার পক্ষে এত ভারী পাথর একখানা বয়ে বেড়ানো কি সম্ভবপর?

কি জানি, এটা হয়তো আমার মনের উন্মাদ কল্পনা। কিন্তু এখন তার সন্ধানই বা কোথায় পাই? পরিচয়ে সে বলেছিল নবদ্বীপের ওই দিকে তার বাসগ্রাম ছিল, কিন্তু বিস্তৃত ঠিকানা আমিও জিজ্ঞাসা করি নি, সেও বলে নি। কাজেই নিজের মনের সন্দেহ নিরাকরণ করতে গেলেও তাকে এখন খুঁজে পাবো কোথায়?

গ্রামের কেউ কেউ পুলিশে খবর দেওয়ার কথা বললেন। কিন্তু এ ব্যাপারে পুলিশ কি করবে? সোনা-রূপোর কোনও গহনা ঠাকুরের অঙ্গে থাকলে হয়তো পুলিশের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হোত, কিন্তু ভারি একখানা পাথর—তার সন্ধানে পুলিশ কি সাহায্য করবে?

মনের মধ্যে একটা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। অন্য সকলে একটা আসন্ন সর্ব্বনাশের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে রইলেন। শেষে স্থির করলাম, শাস্ত্রবাচস্পতির সম্বন্ধে আমি নিজেই একটু খোঁজখবর নেবো।

গ্রামের হাট—আমার বাড়ীর থেকে বেশী দূরে নয়। সপ্তাহে তিন দিন হাট বসে, অনেক দূরের গ্রাম থেকে লোকে এই হাটে আসে কিনতে এবং বেচতে। হাটে গিয়ে সুরু করলাম আমার অনুসন্ধান পর্ব্ব।

কিন্তু কোনও ফল হোল না। হাটের কোনও দোকানদার বলতে পারলে না যে সে সম্প্রতি পরশুরাম বা ওই চেহারার কোনও লোককে দেখেছে।

একটা লোক প্রায় প্রত্যেক হাটে আসে বাইরে থেকে। একটা পেটেন্ট সালসা জাতীয় ওষুধ ক্যানভ্যাস করে। নানা জায়গার নানা হাটবাজারে ঘুরে বেড়ায় সে লোকটা। তার কাছে একটা সন্ধানের সূত্র পাওয়া গেল। সে বললে ৪।৫ দিন আগে ওই রকম চেহারার একটা লোককে সে দেখেছে রাণাঘাটে একটা চায়ের দোকানে। সেই দোকানে ওষুধ-বিক্রেতা এই ব্যক্তিও চা খাচ্ছিল, এমন সময় আগন্তুকের প্রবেশ। তিনি এসেই চায়ের দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথাকার চা আপনার? আসাম—না দার্জ্জিলিঙ? চায়ের দোকানের মালিক বললেন, মশাই, এসেছেন চার পয়সার এক ভাঁড় চা খেতে, তাতে আর আসাম দার্জ্জিলিঙয়ের খবর নিয়ে কি হবে বলুন? তার পর চা নিয়ে বাধলো দোকানদারের সঙ্গে তর্ক। সে তর্কের সবটা শোনা হয় নি। ওষুধওয়ালার চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, সে পয়সা ফেলে দিয়ে চলে আসে। সে লোকটা তখনও বসে রইলো সেই দোকানে। মাথার সামনে টাক, পিছনে ঝাঁকড়া চুল, গায়ে ছিটের হাফশার্ট, কাঁধে ঝোলা। রাণাঘাট ষ্টেশনে নেমে বাইরে গিয়ে নরহরির চায়ের দোকানে খোঁজ করুন, সে বলতে পারবে।

ওষুধওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কবে এ ঘটনাটা ঘটেছিল?

সে বললে, আজ তো শনিবার, মঙ্গলবারে তাকে দেখেছি চায়ের দোকানে। বিকেল বেলা, সাড়ে তিনটের কাছাকাছি। কেন না, আমি পৌনে চারটের ট্রেনে চলে গিয়েছিলাম কৃষ্ণনগর।

ভেবে দেখলাম। বুধবারের সকালে পঞ্চানন্দ দেবকে বেদীতে দেখতে পাওয়া যায় নি। সেই দিনই শচীন ঠাকুর আমাকে টেলিগ্রাম করেছে, আমি সন্ধ্যার সময় চলে এসেছি কলকাতা থেকে। মাঝে দুটো দিন কেটে গিয়েছে। মঙ্গলবারে যদি পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতিকে রাণাঘাটে দেখা গিয়ে থাকে, তাহ'লে একটু খোঁজ করে দেখলে ক্ষতি কি?

(ক্রমশঃ)

দাস রঘুনাথ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সপ্তগ্রামের জমিদার-পুত্র রঘুনাথের প্রথম জীবনের গল্প তোমাদের ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। কেমন ক'রিয়া কিশোর রঘুনাথ সংসার ছাড়িয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, আর কেমন করিয়াই বা তাঁহার পিতা ও জ্যেঠা—গোবর্দ্ধন দাস ও হিরণ্য দাস তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। শেষে স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ শান্তিপুর আসিলে রঘুনাথ তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, "এখনও তোমার সময় হয় নি। সময় হ'লে ডেকে নেব।"

মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রঘুনাথ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। এত দিন তিনি ছিলেন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, এখন হইলেন গৃহী। কিন্তু—

"ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখি তার মাতাপিতার আনন্দিত মন॥"—চৈঃ চঃ

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের মনের দুঃখ দূর হইল, তাঁহারা বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার রঘুনাথের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই সপ্তগ্রামের অধিকার আগে এক মুসলমান চৌধুরীর হাতে ছিল। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস পরে ইহার মালিক হন। তাঁহারা মালিক হইবার পর হইতে সপ্তগ্রামের আয় ক্রমেই বাড়িতে থাকে। বলা বাহুল্য ইহা সেই চৌধুরী সাহেবের মোটেই ভাল

লাগিল না। তিনি আসিয়া দাস ভ্রাতাদের কাছে কিছু অংশ চাহিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাজী হইবেন কেন? তখন ক্রুদ্ধ হইয়া চৌধুরী সাহেব গেলেন গৌড় নগরে এবং সুলতানের কাছে আর্জ্জি করিয়া একজন উজিরকে লইয়া আসিলেন সপ্তগ্রামে।

"প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।"

উজির আসিয়াই দাস ভ্রাতাদের কাছে পত্র দিলেন—তাঁহারা বৎসরে যে শাহী খাজনা দেন তাহাতে চলিবে না; কারণ আগের চেয়ে রাজ্যের আয় অনেক বাড়িয়াছে। কাজেই তাঁহারা যেন বর্দ্ধিত হারে খাজনা লইয়া উজির সাহেবের কাছে উপস্থিত হন। পত্র পাইয়া দুই ভাই অত্যন্ত ভয় পাইলেন এবং একদিন রাত্রে সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন। ইহাতে উজিরের ভারি রাগ হইল। তিনি সিপাহীশান্ত্রী লইয়া রাজবাড়ী ঘেরাও করিলেন এবং ভাই দুইজনের বদলে রঘুনাথকেই বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন।

হাতের মুঠায় পাইয়া চৌধুরী সাহেব

"প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
বাপ জ্যেঠা আন, নহে পাইবে যাতনা॥

মারিতে আনয়ে যদি, দেখি রঘুনাথে।
মন ফিরি যায়, তবে না পারে মারিতে ॥
বিশেষ কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর ॥"—চৈঃ চঃ

বিশেষতঃ রঘুনাথের শান্তসৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া চৌধুরী সাহেব বিশেষ জোর করিতে পারিলেন না, কিন্তু বন্দী করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু এই ভাবে বন্দী থাকিলে ত' চলিবে না, তাই রঘুনাথ একদিন চৌধুরী সাহেবকে বলিলেন, "দেখুন, চৌধুরী সাহেব, আমার বাবা আর জ্যেঠামশাই আপনার ভাই। আজ আপনারা ভাইএ ভাইএ ঝগড়া করছেন, কাল আবার মিল হয়ে যাবে। ভগবানের রাজ্যে এ রকম তো হয়েই থাকে! কিন্তু আমাকে অনর্থক কষ্ট দিয়ে লাভ কি? আমি যেমন বাবার, তেমনি আপনারও সন্তান। বাপ হয়ে ছেলেকে রক্ষা করবেন, না তাকে কষ্ট দেবেন আপনিই বিচার করে দেখুন। আপনি প্রবীণ ও শাস্ত্রজ্ঞ আপনাকে আমি আর কি বলব বলুন?"

"এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হইল।
দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে, কান্দিতে লাগিল ॥"—চৈঃ চঃ

চোখের জলে ভাসিয়া চৌধুরী বলিলেন, "আর বলবার দরকার নেই রে বাবা, আজ থেকে তোমাকে সত্যি সত্যিই পুত্র বলে গ্রহণ করলাম। যে ভাবেই হোক তোমার মুক্তিসাধন করিয়ে দেব। কিন্তু বাপজান, একটি কথা বলি, তুমিই বিবেচনা করে দেখ। এই সপ্তগ্রামের বর্ত্তমান আয় কুড়ি লক্ষ টাকা। সুলতানকে চার লক্ষ টাকা খাজনা দিয়ে বাকী ষোল লক্ষ টাকা ভায়ারা নিজেরাই ভোগ করেন, আমাকে এক কাণাকড়িও দেন না! এটা কি ভাল?"

মৃদু হাসিয়া রঘুনাথ বলিলেন, "নিশ্চয়ই ভাল নয়।"

উৎসাহিত হইয়া চৌধুরী বলিলেন, "জিতা রহ বেটা! এবার তোমার বাপ-জ্যেঠাকে এনে আমার সঙ্গে একটা আপোষ রফা করে ফেল, সব গোল মিটে যাবে।"

চৌধুরীর চেষ্টায় রঘুনাথ মুক্তিলাভ করিলেন এবং বাপ-জ্যেঠাকে আনিয়া চৌধুরীর সহিত মিলন করাইয়া দিলেন। আপোষ রফায় সন্তুষ্ট হইয়া চৌধুরী চলিয়া গেলেন। সপ্তগ্রামে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিল। এই ভাবে কাটিল পূর্ণ এক বৎসর। বৎসর শেষ হইলে রঘুনাথের মন আবার অস্থির হইয়া উঠিল। একদিন তিনি শেষ রাতে চুপি চুপি বাহির হইয়া পলাইলেন ৺পুরীধামের পথে। কিন্তু বেশীদূর যাইতে পারিলেন

না, পিতার পাইক-বরকন্দাজরা পথেই তাঁহাকে আটকাইয়া রাজবাড়ীতে লইয়া আসিল।

"এইমত বারে বারে পলায় ধরি আনে।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা স্থানে।।"—চৈঃ চঃ

"ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওকে এবার থেকে হাতে পায়ে বেঁধে রাখ, দেখি কি করে পালায়।"

বিষাদের হাসি হাসিয়া পিতা বলিলেন, "বড় ভুল করলে গিন্নী,—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য-ভোগ, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন ॥"—চৈ চঃ

তাকে তুমি সামান্য দড়ি দিয়ে কি করে বেঁধে রাখবে বল? এ হচ্ছে চৈতন্যের টান—এ টানকে বন্ধ করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই। চৈতন্যের পাগলকে আটকে রাখব তুমি-আমি! সে আশা ছেড়ে দাও। সুযোগ পেলেই সে পালাবে মায়ার বাঁধন কেটে। কেউ আটকে রাখতে পারবে না।"

ঠিক এমনি সময় ভাগীরথীর তীরে তীরে মধুর রবে বাজিয়া উঠিল মৃদঙ্গ-মন্দিরার ধ্বনি। হরে কৃষ্ণ হরে রাম গানে চারিদিক্ মাতাইয়া চলিলেন দয়াল নিতাই। সঙ্গে সঙ্গে চলিল অগণিত ভক্ত হরিনামে মত্ত হইয়া। পানিহাটি গ্রামের ভক্ত বৈষ্ণব রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে প্রভুর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সেইখানে থাকিয়া দয়াল নিতাই আচণ্ডালে বিতরণ করিতে লাগিলেন গৌরপ্রেম।

"যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি ॥
অধম পাষণ্ডী সবের ঘরে ঘরে গিয়া।
অবিরাম হরিনাম দেয় বিলাইয়া ॥"

নদীয়ার লোক হরিনামে মত্ত হইয়া উঠিল। এই খবর পাইয়া রঘুনাথ স্থির করিলেন যে ঐ দয়াল ঠাকুরের শরণ লইতে হইবে। ইনিই গৌরপ্রেমের সত্যকার ভাণ্ডারী। ইঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে হয়তো তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে। এই চিন্তা করিয়া রঘুনাথ পিতাকে বলিলেন যে তাঁহার একবার নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ দর্শনের ইচ্ছা হইয়াছে, ইহাতে অনুমতি না দিলে দেহে প্রাণ থাকিবে না। পুত্রের পীড়াপীড়িতে গোবর্দ্ধন দাস সম্মতি দিলেন এবং বহু লোকজন ও কীর্ত্তনের দল সহ রঘুনাথকে পাঠাইয়া দিলেন পানিহাটিতে।

গঙ্গাতীর আলো করিয়া প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া আছেন অবধূত নিত্যানন্দ। চারিদিকে ভক্তমণ্ডলী। পানিহাটি গ্রামে আনন্দের বান ডাকিয়াছে। এই সময়ে

রঘুনাথ উপস্থিত হইলেন সেখানে। নিত্যানন্দের করুণাঘন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। বুকের ভিতর যেন মোচড় দিয়া উঠিল। রঘুনাথ মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ভক্তদের একজন নিত্যানন্দকে বলিলেন, "প্রভু, ঐ দেখুন সপ্তগ্রামের রাজকুমার রঘুনাথ আপনাকে প্রণাম করছেন।"

"শুনি প্রভু কহে চোরা ! দিলি দরশন।
আয় আয় আজ তোর করিব দণ্ডন ॥"

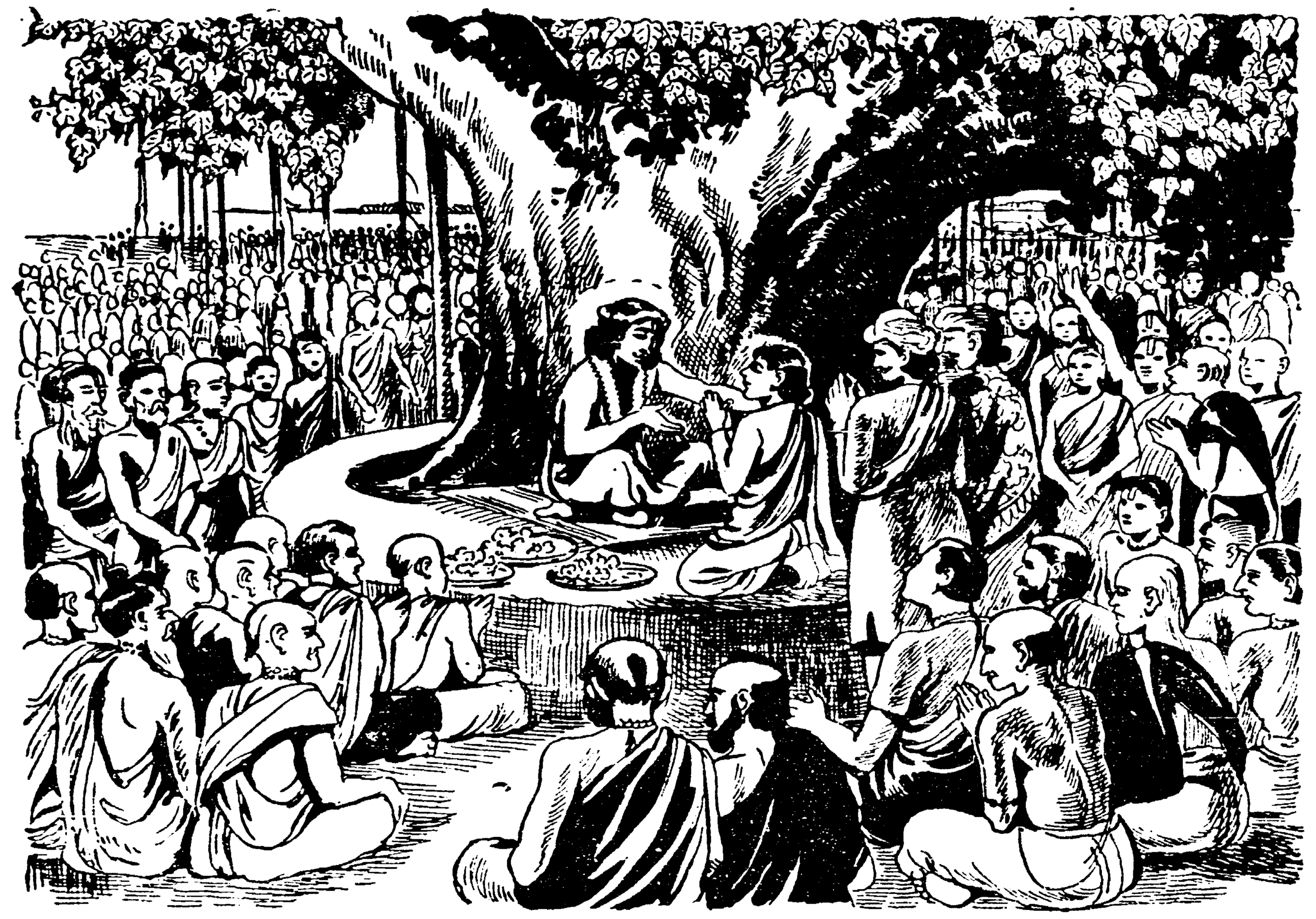

"এবার ধরে ফেলেছি, দণ্ড না দিয়ে ছাড়ব না।"

দীনতার অবতার রঘুনাথ কিন্তু অগ্রসর হইলেন না, সেখানেই ছল ছল চোখে করযোড়ে বসিয়া রহিলেন। তখন প্রভু নিত্যানন্দ উঠিয়া গিয়া তাঁহার মাথায় রাখিলেন তাঁর অভয় চরণখানি। মধুর হাসিয়া বলিলেন, "তবে রে, চোরা, তুই কাছে আসিস না, কেবল দূরে দূরে থাকিস ! এবার ধরে ফেলেছি, দণ্ড না দিয়ে ছাড়ব না।"

অশ্রুসজল চোখে রঘুনাথ জোড়হাতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হাসিতে হাসিতে নিত্যানন্দ বলিলেন, "শুনবি তোকে কি দণ্ড দেব ? তুই এই সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে পেট ভরে দই-চিঁড়ে দিয়ে ফলার খাওয়া, এই তোর উচিত দণ্ড।"

আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন রঘুনাথ। ভাণ্ডারীর কৃপা হইয়াছে, আর চিন্তা কি ? রঘুনাথ

"সেই ক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥
চিঁড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
আনি আনি প্রভু আগে সকল ধরিলা ॥"—চৈঃ চঃ

দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোক আসিয়া মিলিত হইল। গঙ্গাতীরে লাগিয়া গেল বিরাট মহোৎসব। যে আসে সেই খায় ! আবার নিজ হাতে অন্যের মুখে প্রসাদ তুলিয়া দেয়। প্রভু নিত্যানন্দের আকর্ষণে সেই মহোৎসবে যেন ভগবান্ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইল। হরিনামের গভীর রোলে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যে যেখানে পারিল বসিয়া প্রসাদ পাইতে লাগিল। কোন বাছ-বিচার নাই। চারিদিকে আনন্দের হাট।

ইহার পরে কি হইল ? সে গল্প আর একদিন বলিব।

নীল পায়রা

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

যেখানে আমি কাজ করি, রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে কখনো সেখান থেকে ছুটি পাই না। শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। আশেপাশের সমস্ত বাড়ির লোক তখন দিব্যি খেয়েদেয়ে সুখে ঘুমুচ্ছে। আর আমি—! যার যেমন কপাল।

সুখী লোকের সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নিয়ে, হায়, আমার জন্যে কেউ ব'সে নেই। আমার জন্যে যার বসে থাকবার কথা সে তখন শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে কাদা হ'য়ে আছে।

যথারীতি দরজায় কড়া নাড়লাম। আস্তে আস্তে গলা ছাড়লাম। কিন্তু তার বয়ে গেছে।

গলার স্বর চড়তে লাগলো ক্রমশঃ,—বিন্দাবন, ও বিন্দাবন !

বিন্দাবন হাত দিয়ে বেশ শব্দ করে মশা মারলো বোধ করি। ঘুমের মধ্যেই জড়িত গলায় বললো—এত রাত্তিরে কে ডাকে ?

রেগে গিয়ে বললাম—আমি।

—আমি কে ?

— আমি যমরাজ।

—তা আজ্ঞে, বাবু এখন বাড়ি নেই। কাল আসবেন।

এ সব কথা বিন্দাবন কিন্তু ঘুমুতে ঘুমুতেই বলে। জাগ্রত অবস্থায় বিন্দাবন নিপাট ভালোমানুষ। বিন্দাবনের মাথায় গোলমাল থাকতে পারে, কিন্তু মনটি তুলসীপাতার মতো পবিত্র। অন্ততঃ বিন্দাবন নিজে সে রকম বলে থাকে।

জানালার শিক ফাঁক করে মাথা গলিয়ে আবার আমি পরিত্রাহি চিৎকার করি—বিন্দাবন, সোনা আমার, দরজা খোল। আর তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে পারি না!

অনেক সাধ্য-সাধনায় বিন্দাবনের নিদ্রাভঙ্গ হ'লো। দরজা খুলে দিয়ে বললো,—কেমন বাবু, আজ আপনার এক ডাকেই উঠে দরজা খুলে দিয়েছি কিনা? তবু তো আপনি নিত্যি তিরিশ দিন বলেন ব্যাটা বিন্দাবন ঘুমোলে কেওড়াতলার মড়াকে বলে ওদিক্ থাক।

বিন্দাবনকে একটা ধমক দিয়ে বললাম ঢের হয়েছে। এখন বাপু, যা হোক কিছু খেতে দাও, পিণ্ডি গিলে একটু ঘুমোই।

বিনা বাক্যব্যয়ে বিন্দাবন রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। আমি হাতমুখ ধুয়ে হাঁ করে বসে আছি। কিন্তু কোথায় বিন্দাবন!

আবার হাঁক ছাড়লাম বিন্দাবন!

রান্নাঘর থেকেই বিন্দাবনের সাড়া এলো—আজ্ঞে, একটু বিপদ হয়েছে।

বিপদ্? কিসের বিপদ্?

—আজ্ঞে, যা কিছু রান্না ছিলো, সব এসে বেড়ালে খেয়ে গেছে। উনুনে আঁচ দিয়েছি, একটুখানি বসুন, গরম গরম খেয়ে তারপর ঘুমোবেন 'খন।

রাগে আমার মুখ থেকে আর কোন শব্দ বেরোল না। আশে-পাশের দোকানপাটও এখন সব বন্ধ হ'য়ে গেছে। এক গ্লাস জল খেলাম। কিন্তু পেটের আগুন তাতে নিভবার কথা নয়। মনে মনে সাব্যস্ত করলাম কাল ভোরেই বিন্দাবনকে তাড়াবো। আজ রাতটা তো কাটুক। এখন একটু ঘুমোই।

কিন্তু ঘুম কোথায়? মনে মনে এক-দুই গুণতে আরম্ভ করলাম। তাতে নাকি ঘুম আসে। কিন্তু আমার বেলায় সব কিছু অন্য রকম দেখা যাচ্ছে। গুণতে গুণতে একলাখ ছাড়িয়ে গেলো। ঘুম এলো না, এলো বিন্দাবন।

—নিন, খেয়ে নিন। আলুসেদ্ধ দিয়ে গরম ভাত দিব্যি লাগবে।

খেয়ে উঠে যখন শুতে গেলাম, ঘড়িতে তখন রাত তিনটে।

রোজ রাত্রেই ভাবি বিন্দাবনকে তাড়াবো, কিন্তু তাড়ানো আর হ'য়ে ওঠে না। ফলতঃ অনিবার্যভাবেই আমাকে বিন্দাবনের তাড়না সইতে হয়।

বিন্দাবন পরম বৈষ্ণব। কোনো কিছুর ওপরেই তার হিংসে নেই। এমন কি মাছ-মাংসের ওপরেও নয়। মাছ-মাংস বিন্দাবন অম্লানবদনেই রন্ধন ও ভোজন করে থাকে। কেবল মাঝে মাঝে আমার কাছে নিবেদন করে—দেখবেন বাবু, মাছ-মাংসের কথাটা যেন প্রচার না হয়ে যায়। আমি

স্বপ্নাদেশ পেয়েছি, রাধাগোবিন্দ আমাকে অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সে সব কথা সবাই বিশ্বাস করবে না। আমার কথাটা আপনি বুঝলেন তো বাবু? দেখবেন। কিন্তু সে সবও তেমন মারাত্মক কিছু নয়। আসল হচ্ছে গিয়ে বিন্দাবনের নিদ্রা। অমন নিদ্রাকাতর মানুষ বিশ্ব-সংসারে ক'জন আছে জানি না। নিদ্রার ব্যাপারে বিন্দাবনের চেয়ে বড়ো বোধ করি একজনই আছেন বিশ্ব-সংসারের ঊর্দ্ধে—শ্রীভগবান্। তা না হ'লে সসম্মানে এত বোমা ফাটবার কোনো অর্থ হয় না।

কিন্তু অতি বৃহৎ ব্যাপারে আমার শিরঃপীড়া নিষ্ফল। আমি আগে আমার বিন্দাবনের দিক্‌টা তো সামলাই।

একদিন বললাম,—আচ্ছা বিন্দাবন, রাত্তিরে ফিরে এলে তুই যদি আমাকে ঠিকমতো চারটে গরম ভাত খেতে দিতে পারতি, তবে আর আমার কোনো দুঃখ থাকতো না।

বিন্দাবন গামছা দিয়ে চোখ মুছলো।—সামান্য কথা বাবু। আপনার খাই, পরি। অথচ রাত্তিরে আপনাকে চারটে গরম ভাত খাওয়াতে পারি না এ-দুঃখ কি আমার কম বাবু? দু-চোখে কি যে পোড়া ঘুম! রাধাগোবিন্দজী কৃপা না করলে তো কিছুই হবার উপায় নেই।

কিন্তু আমার ওপর রাধাগোবিন্দজীর কৃপা হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তিনি বিন্দাবনের চোখের নিদ্রাকেই কৃপা করে বসে আছেন। তার ফলে আমার যা দুরবস্থা হয় তা আর কহতব্য নয়।

হপ্তায় তিনদিন তো বেড়ালের উপদ্রব। দরজা-জানালা বন্ধ করে একদিন বিন্দাবন বেড়াল ঠেকালো। সেদিন আবার খেতে বসে ভাতের মধ্যে আবিষ্কার করা গেলো মস্ত একটা ইঁদুর। খেয়ে ঢোল হ'য়ে ভাতের মধ্যেই আরাম করে নির্ভয়ে শুয়ে আছে। ইঁদুরের পরে আরশোলা আছে। আরশোলাতেই কি শেষ? না, আরো আছে,—আরো অনেক আছে। পিঁপড়ে আছে, ডেঁয়ো আছে, উপদ্রবের কি অন্ত আছে? রাধাগোবিন্দজীর দেখলাম সর্বজীবের ওপরেই কৃপা আছে, শুধু এই অধমকেই তিনি কোন্ অজ্ঞাত অপরাধে বিষ-নজরে দেখেছেন কে জানে!

এক-একদিন—সত্যি বলছি—বিন্দাবনকে স্বহস্তে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু খুন করা দূরস্থান, তাকে তাড়ানো পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। বিন্দাবনকে তাড়ালে তার জায়গায় আরেকজনকে তো নিয়ে আসতে হয়! কিন্তু সেই নবনীচন্দ্রই যে আমার এই বিন্দাবনচন্দ্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবেন, এমন ভরসা কোথায়? বিন্দাবনচন্দ্র আর যাই হোক, চোর-ছ্যাঁচোড় নয়। একে তাড়িয়ে আর কাউকে আনলে তিনি যদি সেদিকেও সরেস হন?

তার চেয়ে আমার বৃন্দাবনচন্দ্রই বহাল থাক—আমার অতি সাধের অতি পুরাতন ভৃত্য। তার হাতের রান্না গরম ভাত খেতে খেতে রাত তিনটে বেজে যাক, তার পর বিছানায় শুয়ে রাধাগোবিন্দজীকে স্মরণ করি।

রাধাগোবিন্দজীর কৃপা কিনা কে জানে, আমার মাথায় একটা মতলব এলো। এলার্মওয়ালা একটা টাইমপীস্ ঘড়ি কিনে নিয়ে এলাম। পরদিন আপিসে যাবার সময় হিসেব ক'রে দেখলাম রাত দশটায় ঘুম ভাঙলেই বিন্দাবন সব ব্যবস্থা নিপুণভাবে করতে পারবে। তা সেই রাত দশটায় এলার্ম লাগিয়েই আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম।

বিন্দাবনকে খোলাখুলি কিছু বললাম না। শুধু বলে গেলাম—দেখিস, আজ ঠিক দশটার সময়েই তোর ঘুম ভাঙাবো।

বিন্দাবন একবার ঘড়িটার দিকে তাকালো, একবার আমার দিকে তাকালো। তারপর কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে বললো,—সবই রাধাগোবিন্দের ইচ্ছা।

কিন্তু হা রাধাগোবিন্দ! বাড়িতে ফিরে সেদিনও দেখি যে-কে-সেই। বিন্দাবন পরমানন্দে নিদ্রিত। অনেক হাঁকাহাঁকির পর দরজা খুলে বললো—কৈ বাবু, আপনি যা ব'লে গেলেন তা হ'লো কোথায়? রাত দশটার সময়…

—রাত দশটার সময় তুই কোনো শব্দ-টব্দ শুনিস নি বিন্দাবন?

—শব্দ? কই, না তো!

তাহ'লে কি ঘড়িটা খারাপ? এলার্ম-টেলার্ম ঠিকমতো বাজে না? কিন্তু না, পরখ ক'রে দেখলাম সে সব ঠিক আছে। বোঝা গেলো, বিন্দাবনের ঘুম ভাঙানো ও এলার্মের সাধ্য নয়। আমার কপালে দুর্ভোগ আছে, ঠেকাবে কে? ঘরের মধ্যে টাইম-বম্ ফাটালে হয়তো বিন্দাবনের ঘুম ভাঙানো যায়, কিন্তু যাক গে।

মর্মে-মর্মে টের পাচ্ছি, বিন্দাবনের রাধাগোবিন্দ আমাকে নাচাচ্ছেন। আমি রাধাগোবিন্দের হাতের নাচের পুতুল। বিন্দাবনরূপী সুতোয় বেঁধে রাধাগোবিন্দ আমায় মজা দেখাচ্ছেন। সবই রাধাগোবিন্দের ইচ্ছা!

বিজ্ঞানের যুগে, ভেবে দেখলাম, বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়াই প্রশস্ত। বেশ কিছু খরচ করে ঘড়িটাকে দিব্যি কায়দাদুরস্ত করে ফেলা গেলো। কায়দাদুরস্ত কিংবা বিজ্ঞানদুরস্ত যাই বলো।

ঘড়ির সঙ্গে দুটো লম্বা তার লাগানো দেখে স্বয়ং বিন্দাবন অবধি বিচলিত হ'লো। বিন্দাবনকে বললাম—সন্ধ্যের পর ঘুমোনোর আগে তারের ডগা দুটো কানে লাগিয়ে ঘুমোবি।

—কানের মধ্যে কষ্ট লাগবে না বাবু?

—আরে, না না। দেখতে পাচ্ছিস না, তারের ডগা দুটো কেমন মোলায়েম করে দিয়েছি?

আজ আর ভাবনা নেই। আজ নির্ঘাত বিন্দাবনের ঘুম রাত দশটার সময়ে ভাঙবে। বিজ্ঞানের দৌলতে তার-মাহাত্ম্যে এলার্মের শব্দ আজ বিশগুণ জোরে বিন্দাবনের কানের মধ্যে বাজবে। আজ নিশ্চয়ই আমি বাড়ি গিয়ে সময় মতো গরম ভাতটাত খেয়ে সুখে ঘুমোতে পারবো। আঃ!

কিন্তু সেদিনও বাড়ি ফিরে আমার যে অভিজ্ঞতা হ'লো তাতে বুঝলাম রাধাগোবিন্দ ইচ্ছে করলে বিজ্ঞানকে ও আমাকে একসঙ্গেই ধরাশায়ী করতে পারেন। হ্যাঁ, বিন্দাবনের ঘুম এলার্মে ভাঙে নি। গলা ফাটিয়ে আমিই মাঝরাত্তিরে বিন্দাবনকে ঘুম থেকে তুললাম।

—কোনো শব্দ তোর কানে যায় নি? আজও যায় নি?

—আজ্ঞে গিয়েছে বাবু।—বিন্দাবন যুক্তকর কপালে ঠেকালো। বোধ করি রাধাগোবিন্দের উদ্দেশ্যে। সেই শব্দেই আরো কেমন যেন বেশি ঘুম পেয়ে গেলো। ঘুমে একেবারে অচৈতন্যি হয়ে গেলাম। কী রকম শব্দ জানেন বাবু?

—কী রকম?

—আজ্ঞে, ঘুমের মধ্যে শুনলাম রাধাগোবিন্দের কোন ভক্ত পরমানন্দে করতাল বাজাচ্ছে। মধুর, মধুর। ও-জিনিস শুনতে শুনতে ভক্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম বাবু! সবই রাধাগোবিন্দের ইচ্ছা। যাই, উনুনে আঁচ দিয়ে আপনার ভাতটা চাপিয়ে দিই গে। কতক্ষণ আর লাগবে? আপনি ততক্ষণ বরং তার দুটো কানে লাগিয়ে একটু করতাল শুনুন। রাধাগোবিন্দ, তুমিই সত্য।

রাধাগোবিন্দের, দেখা গেলো, আমার কষ্ট লাঘবের কোনো ইচ্ছে নেই। বিন্দাবন অসাড় হ'য়ে ঘুমুবে, আমি রাত তিনটের আগে অন্ন পাবো না, এই বোধ করি বিধিলিপি। যাক্ গে, এ সব নিয়ে উচ্চবাচ্য করে কোনো লাভ নেই।

কিন্তু ক্রমাগত এই প্রক্রিয়ায় আমার শরীর—রাধাগোবিন্দের ইচ্ছা বটে—হয়তো কিছু অধিক মাত্রায় খারাপ হ'য়ে থাকবে। সেটা নজর পড়লো অন্নদা বক্সীর। সে আমার সহকর্মী। তার আরো অনেক পরিচয় আছে, কিন্তু সে সব এ গল্পের পক্ষে অবান্তর।

আমার দুর্দশার কথা অন্নদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলো। আমার মুখ থেকেই শুনলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো—কিছু খরচ করতে পারবে?

—কিছু মানে কতো?

—এই ধরো গোটা পঞ্চাশেক টাকা?

পঞ্চাশ টাকা? তা পঞ্চাশ টাকায় যদি একটু শান্তি (মানে সময়মতো দুটো গরম অন্ন) পাই তো তাই আমার সৌভাগ্য। অনেক তো গেলো, আরো পঞ্চাশ টাকাও যাক্। মোট কথা, আমি টাকা খরচ করতে রাজি হলাম।

আর একদিন অন্নদা বললে,—ওহে, তোমার সেই লাট সাহেবের নামটা যেন কী?

বললাম,—বিন্দাবন। সাধু ভাষায়—'বৃন্দাবন'।

—ও বিন্দাবনই ভালো। তা বিন্দাবনের কাপড় বা গামছা থেকে একটা সুতো নিয়ে আসতে পারো?

অনায়াসে পারি। বিন্দাবনের গামছা থেকে একটা সুতো খুলে নিয়ে এলাম পরদিন। বলা বাহুল্য বিন্দাবনকে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলি নি। গোপনেই সব প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছি।

অন্নদা আমাকে নিয়ে গেলো একদিন বৌবাজারের এক বাড়িতে। বুক পর্যন্ত শাদা দাড়ি, গলায় সরু সোনার হার, এবং হাতে রুদ্রাক্ষের মালা যে-ভদ্রলোকের সামনে অন্নদা আমাকে আদর করে বসালো, পরে জেনেছি সে ভদ্রলোক গৃহী হ'লেও সন্ন্যাসী,—অন্নদার গুরুদেব। অন্নদা আগেই তাঁকে আমার ইতিহাস-ভূগোল ব'লে রেখেছে।

বেশি কথা বলেন না ভদ্রলোক, আমিও অন্নদার ইশারাতে দশ টাকার পাঁচখানা নোট অন্নদার গুরুদেবের পায়ের কাছে রাখলাম। গুরুদেব সংস্কৃত ভাষায় চেঁচিয়ে কাকে কী বললেন (সংস্কৃতে আমি একটু কাহিল), অনতিবিলম্বে একটি ছোটো খাঁচা এলো বাড়ির ভেতর থেকে। খাঁচার মধ্যে একটি নীল পায়রা। নীল,—একেবারে নীল। এ রকম নীল পায়রা আমি জীবনে কখনো দেখি নি।

বিন্দাবনের গামছার সেই সুতোটুকু হাতে নিয়ে গুরুদেব তাতে কয়েকটি ফুঁ দিলেন। তারপর নীল পায়রাটাকে খাঁচা থেকে বের করে এনে কোলে বসিয়ে সেই সুতোটি খাইয়ে দিলেন।

অধিক কথার মানুষ ন'ন গুরুদেব। অন্নদা আমার হাতে খাঁচাটা দিলো, তারপর খাঁচাটি হাতে ঝুলিয়ে আমি অন্নদার সঙ্গে বাইরে এলাম। এই সাধের নীল পায়রা দিয়ে আমি কী করবো রে বাবা।

অন্নদা আমাকে সব কথা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলো। খাঁচাটা সব সময় আমার সঙ্গেই থাকবে। যখন বিন্দাবনের ঘুম ভাঙানো দরকার, তার আধঘন্টাখানেক আগে খাঁচার দরজা খুলে দিলেই আর ভাবনার বিষয় কিছু থাকবে না।

—কিন্তু বিন্দাবনকে তো এই নীল পায়রা কখনো চোখেও দেখে নি। ও চিনবে কী করে?

আমার অজ্ঞতায় অন্নদা শব্দ করে হাসলো। বললো,—আরে, এ কি তোমার অর্ডিনারি পায়রা পেয়েছো? বিন্দাবনের গামছার সুতো গুরুদেব ওকে নিজের হাতে খাওয়ালেন না? পৃথিবীর যেখানেই বিন্দাবন ঘুমিয়ে থাক, গন্ধে গন্ধে ও ঠিক তোমার বিন্দাবনকে খুঁজে বের করবে। তাকে ঘুম থেকে ও যেমন করে হোক ঠিক জাগিয়ে তুলবে। আরে, একবার পরখ করেই দ্যাখো না।

—কিন্তু পায়রাটা আবার আমি ফেরং পাবো তো? নাকি একবার বিন্দাবনকে ঘুম থেকে তুলে দিয়েই পায়রাটা উধাও হয়ে যাবে?

অন্নদা একটু ক্ষুণ্ণ হ'লো। বললো,—তুমি পাকে-প্রকারে আমার গুরুদেবকে জোচ্চোর বললে! ছি ছি, এ রকম নীচ মন হ'য়ে যাচ্ছে তোমার! কিন্তু তোমার দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। কাজ সেরে দিয়েই খাঁচার পায়রা আবার খাঁচায় ফিরে আসবে।

আগে থাকতে বিন্দাবনকে আমি কিছুই জানাই নি। সেদিন রাত দশটার সময় খাঁচার দরজা খুলে আমি নীল পায়রা উড়িয়ে দিলাম। অন্নদার কথা যদি খাঁটি হয়, নীল পায়রা যদি আধঘন্টার মধ্যে গিয়ে বিন্দাবনের ঘুম ভাঙাতে পারে, তাহ'লে আজ আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তাহলে আজ আমি নির্ঘাত বাড়ি ফিরেই গরম ভাত খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে ঘুমোতে পারবো। নীল পায়রার দৌলতে যদি আমার প্রাণে শান্তি আসে, তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই অন্নদার গুরুদেবের শিষ্য হয়ে যাবো। গুরুদেবের জয় হোক! নীল পায়রার জয় হোক! আমার পঞ্চাশটি টাকা খরচ সার্থক হোক!

বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। গল্পের বাকিটুকু বলে ফেলি। বাকিও নেই আর বিশেষ কিছু। গল্পেরও বাকি নেই, আমারও বাকি নেই।

সেদিন যথারীতি বাড়ি ফিরে আমি মহাপুলকিত। আনন্দে আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটার কী প্রচণ্ড নর্তন-কুর্দন! বিন্দাবন জেগে আছে। জয় গুরুদেব! জয় নীল পায়রা!

— কী বিন্দাবন, আজ ঘুম ভাঙলো?

—সবই রাধাগোবিন্দের ইচ্ছা বাবু!- বিন্দাবন একগাল হাসলো।—রান্না-টান্না সব হ'য়ে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে এক্ষুনি খেতে বসুন।

জয় গুরুদেব! জয় নীল পায়রা!

—কী রেঁধেছিস রে আজ বিন্দাবন?

—আজ আপনার অদেষ্ট ভালো বাবু! রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কোত্থেকে একটা নীল পায়রা এসে আমায় আঁচড়ে, ঠুকরে একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার সুরু করলো। তা কায়দা করে সেইটাকেই ধরে-বেঁধে কেটে-কুটে রেঁধে ফেলেছি। চমৎকার হয়েছে বাবু মাংসটা! আমি নিজে চেখে দেখেছি! ও কি বাবু, আপনি নিজের চোখ জোড়া কপালে তুলে ফেললেন কেন?

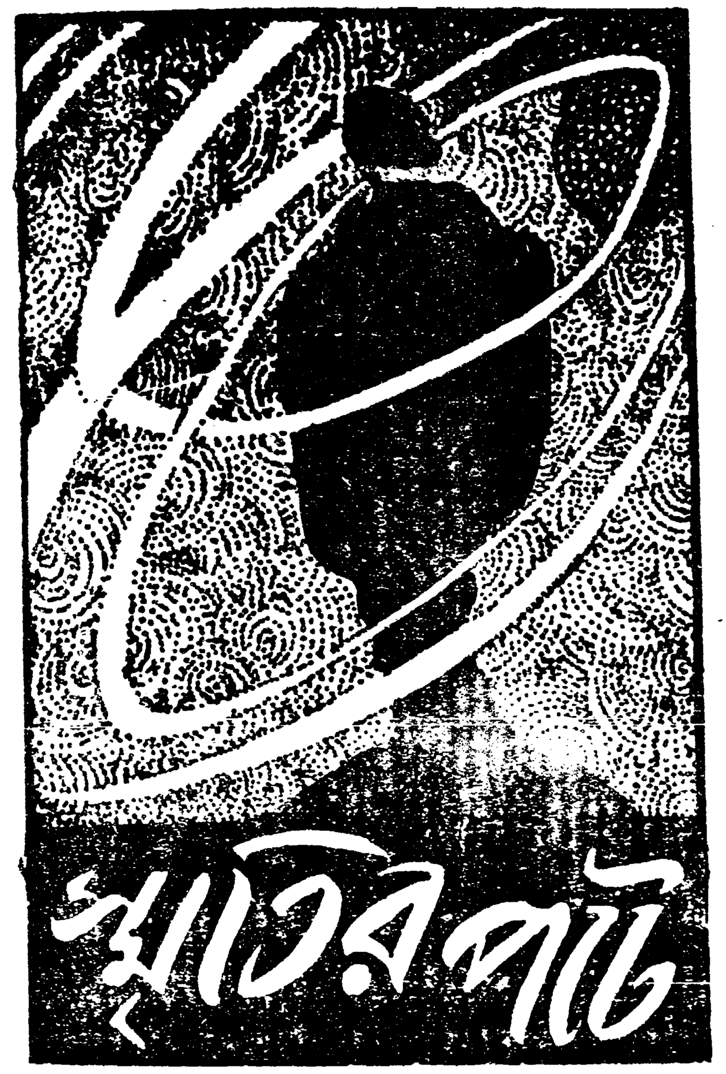

শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী, এম্. এ

'কত কি যে আসে কত কি যে যায় বহিয়া চেতনা বাহিনী'। পিছন ফিরে চাইলে জীবনের পর্দ্দায় ফুটে ওঠে কত ছবি! একদিন এমনই জীবন্ত তারা ছিল। জীবনকে দোলা দিয়ে দিয়ে তারা সব আবার কোথায় মিলিয়ে যায়! তার মধ্যে কতকগুলি এঁকে যায় স্মৃতির পটে রঙ্গীন ছবি।

সেটা ছিল ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। ইংরাজ জার্ম্মানীতে জীবন-মরণ রণ। আমাকে ভারতরক্ষা আইনে অন্তরীণ করে রেখেছে গবর্ণমেণ্ট—দিনাজপুর জেলার কাহারুলের ইন্‌স্‌পেকশন বাংলোয়। দিনাজপুর সহর থেকে বার মাইল দূরে এই বাংলোটি ছিল মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ভরা। ছোট একটি নদী এঁকেবেঁকে আমার বাংলোর কাছ দিয়ে গিয়েছে। তার দু'ধারে ছোট ছোট গাছের ঝোপজঙ্গল। বাংলোর আধ মাইলের মধ্যে লোকালয় না থাকায় নির্জ্জন নদীতীরের সেই বাংলোকে মনে হ'ত এক রহস্যপুরী। বই পড়ে আর ঘুরে বেড়িয়ে সেখানে দিনগুলি ভালই কাটছিল। বৈচিত্র্য এনেছিল বাঘ, আর একবার বান। আজ বাঘের কথাই বলি।

বছরখানেক আগে সেখানে গিয়ে একটা কুকুরের বাচ্চা পুষেছিলাম। এক

বছরে সেটা বেশ বড় ও তাগড়া হয়ে উঠেছিল। বাংলোর বারান্দায় চৌকীর নীচে একটা ঝুড়িতে বিচালী বিছিয়ে তার শোয়ার জায়গা করে দিয়েছিলাম। রাত্রে কখনও কখনও দূরে কোন কিছুর সাড়া পেলে সে গভীর গলায় ডেকে উঠতো। বাংলোর বড় ঘরে থাকতাম আমি, আর পাশের ছোট কুঠুরীতে থাকতো আমার হিন্দুস্থানী পাচক। একদিন রাত দুপুরে বাংলোর বারান্দায় ঘন ঘন কুকুরের ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারপরমনে হ'ল বাইরে দরজার কাছে যেন দুটি জন্তুতে ঝটাপটি করছে। কানে এলো ঠাকুরের গলার ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজ—'বা—বু, লল্ঠেন···বা-আ-ঘ, !' আমি এক লাফে উঠে পাশের ঘর থেকে লণ্ঠন উস্‌কিয়ে দিয়ে ভেজান দরজা খুলতেই সড়াৎ করে একটা আওয়াজ! কুকুর, কি কিছুই নেই! সামনে ঠাকুরের ভয়চকিত মূর্ত্তি। বললো, "গেল্ !" অর্থাৎ—"চলে গেল"।

ঠাকুর বলল, তার হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং বাইরে যাবার দরকার হওয়ায় এক লোটা জল নিয়ে সে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এসেই বারান্দায় দেখে অন্ধকারে রোয়াকের ধার দিয়ে শিয়ালের মত কি একটা জন্তু চলে যাচ্ছে আর চৌকীর নীচে কুকুর পরিত্রাহী চিৎকার করছে। শিয়াল মনে করে ঠাকুর লোটা থেকে জল নিয়ে 'দূর্ শা—, দূর্ শা—' বলে জন্তুটির গায় ছিটিয়ে দিতে সে একটু দূরে সরে গেল। তারপর যেমন ঠাকুর বারান্দার নীচ নেমেছে, জন্তুটি আর একদিক্ থেকে এসে চৌকীর তলা থেকে কুকুরটাকে তাড়িয়ে বের করল। ঠাকুর দেখে, বারান্দায় তার চোখের সামনে বাঘে কুকুরে ঝটাপটি করছে। তাই দেখে আমাকে ডেকেছে। ঠাকুর বলল, "বাবু, যদি একটা লাঠি থাকিল হ্যায়।" আমি বললাম, "তা হলে আজ তোমার কাম সারিল হ্যায়। ভয়ে কথা বেরুচ্ছিল না, আর তুমি বল কিনা লাঠি যদি থাকিল হ্যায়!"

তারপর মাস দুই গিয়েছে। একদিন আমি নদীর ধারের পথ দিয়ে বিকেলে বাংলোর দিকে ফিরছি। বাংলোর কাছে আমার রান্নাঘরের পিছনে বেশ খানিকটা জঙ্গলময় জায়গা। সেদিকে দেখছি আর ভাবছি এইখানটায় জ্বালানী কাঠ কেটে কতকটা জায়গা কেমন পরিষ্কার হয়েছে। সেদিকে তাকাতেই দেখি ছোট একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে আছে বেশ বড় একটা বাঘ। আমার কাছ থেকে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে। তার চোখে চোখ পড়তেই আমার ভিতর দিয়ে যেন একটা ইলেকট্রিক শক্ বা বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল। বনের ছাড়া বাঘের চোখের দিকে চাইলে ঐ রকমই বুঝি হয়। একবার মনে হ'ল ছুটে পালাই। ভিতরে কে যেন সাবধান করলে, তা হলেই ও আমাকে ধরবে। বাঘটা ছিল একটু উঁচু জায়গায়। বড় একটা লাফ দিলেই হ'ল। আমি তখন ধীরে ধীরে রাস্তা ধরে এগুতে লাগলাম, আর মাঝে

মাঝে বাঘের দিকেও চেয়ে দেখছি। কয়বার চোখোচোখিও হয়ে গেল। দেখলাম সে একদৃষ্টে আমাকে দেখছে। কিছু দূর যেতেই বাঘ আড়ালে পড়ে গেল।

ঘরে ফিরে সে ঘটনা বর্ণনা করে বাড়ীতে চিঠি লিখলাম। আমার যত কিছু চিঠি অন্তরীণ আইন মত থানায় দিতে হয়। সেখান থেকে তাঁরা জেলার পুলিশ সাহেবের কাছে পাঠান। তিনি দেখে পোষ্ট অফিসে ছাড়েন। কয়েক দিন পরেই থানার দারোগা বাবু মুখ ভার করে আমায় বললেন, 'বড়ই মুস্কিলে পড়েছি বিজয় বাবু!' আমি অবাক্। বললেন, পুলিশ সাহেব তাঁকে লিখেছেন—'ডেটেনিউর চিঠিতে জানলাম ওখানে বাঘ এসেছে। আমি আর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শিকারে যাব, ব্যবস্থা ঠিক রাখবেন।' আমি বললাম, 'সে তো ভালই, আমার ঘরের কাছের বাঘটা মারা পড়বে।' দারোগা বাবু বললেন, 'ঠেলা তো জানেন না ?—কয়দিন ক্যাম্প করে থাকবে তার ঠিক নেই। মুরগী আর ডিম যোগাতে প্রাণ অন্ত হবে। আপনার ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানর দফারফা।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন উপায় ?' বললেন, 'উপায় আপনার হাতে। বাড়ীতে আর একটা চিঠি এখনই লিখে দিন যে বাঘের সাড়া আর পাচ্ছি না, বোধ হয় চলে গিয়েছে। আর আমরাও লিখে দেব - বাঘ এখন আর এদিকে নেই।'

তাই করা ঠিক হলো।

আমি তখন বললাম, 'আমার ঘরের কাছের বাঘটা মারার ব্যবস্থা তা হলে আমাদেরই করতে হবে।' দারোগা বাবু বললেন, 'থানার বন্দুক কাজে লাগান যাবে না। ওর একটি গুলি ছুঁড়তেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি চাই।' তখন কাছাকাছি, যাঁর বন্দুকের পাশ আছে, এমন এক জমিদারের বন্দুক দারোগা বাবু কনেষ্টবল পাঠিয়ে আনালেন। দেখা গেল সব ক'টি কার্ট্রিজ ছর্‌রার (তাতে শুধু পাখী মারা যায়)। আমি চা মোড়া রাংতা (আগের দিনে শিসের পাতলা আবরণে চা মোড়া থাকতো) যোগাড় করে কামার-দোকানে গালিয়ে বন্দুকের ব্যারেলের মাপে কয়েকটি গুলি তৈরী করিয়ে আনলাম।

থানার চারজন কনেষ্টবল, আমার হিন্দুস্থানী ঠাকুর এবং আমি—এই কয়জনের বাঘ শিকারে যাওয়া ঠিক হ'ল। বন্দুকটি থাকবে কনেষ্টবল বিষণসিংএর হাতে, আর আমরা নেব লাঠি, টাঙ্গী ও কুঠার। বাঘ শিকার সহজ ব্যাপার নয়। যুক্তি করে ঠিক হলো, যার যত জামা কাপড়, র‍্যাপার আছে বেশ করে গায়ে জড়িয়ে, মাথা ঢেকে যেতে হবে, যেন শুধু চোখ দুটি বেরিয়ে থাকে। দৈবাৎ বাঘ ঘাড়ে পড়লেও সেই বস্ত্রব্যূহ ভেদ করে নখ গলাতে পারবে না। যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করে সকলেই যার যার গেঞ্জি, শার্ট, সোয়েটার, কোট, ওভার কোট পরে, আর মাথা, ঘাড় গরম গায়ের কাপড়ে পুরু করে ঢেকে, লাঠি ঘাড়ে যখন জঙ্গলে ঢুকলাম সে এক অপরূপ দৃশ্য। পরস্পরের

সাজ দেখে নিজেদেরই তাক্ লেগে গেল। পোষাকের বিপুল আবরণের ভিতর থেকে উঁকি মারছে শুধু এক জোড়া করে চোখ !

সারা জঙ্গলে ঢুঁড়েও সে দিন বাঘের দেখা মিললো না। ভাগ্য ভাল আমাদের, না বাঘের,—কে জানে ?

—আঠারো—

তারপর ?

তারপর সময় এগিয়ে গেছে অনেকখানি। বিকেল গড়িয়ে এসেছে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা ক্রমশঃ বিলীন হয়ে গেল মধ্যরাত্রির ঘন অন্ধকারে।

নীচের অন্ধকার খোলা বারান্দায় চুপ করে বসেছিল তাপস। মনের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। বসন্ত রায়ের রত্নসিন্দুক উদ্ধারের সময় আসন্ন। এখুনি বেরুতে হবে।

বাগানের দিক্ থেকে মৃহু পায়ের খস্ খস্ শব্দ শোনা গেল।

অন্ধকারে দৃষ্টি প্রসারিত করল তাপস। তাপসের দৃষ্টিপথে ধরা পড়ল ছুটি চলন্ত ছায়ামূর্ত্তি। চলন্ত ছায়ামূর্ত্তি ছ'টি নিঃশব্দে এগিয়ে এল তাপসের অত্যন্ত কাছে। সুজিত আর মলয়।

মৃহু চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল তাপস,—'যন্ত্রপাতি সব তোলা হয়েছে বোটে ?'

— 'হ্যাঁ।'

তাপস উঠে দাঁড়াল। বলল,—'বেশ, চল তাহ'লে। শুরু হোক নৈশ অভিযান।'

অন্ধকার বাগান পেরিয়ে তিনজনে এসে দাঁড়াল ঝিলের ধারে।

জলের ধারেই বাঁধা ছিল ছোট্ট বোটটা।

তিনজনে জলটুঙ্গিতে যাবার জন্যে বোটে উঠল। লোহার চেনে মৃহু টান দিতেই বোট তরতর করে এগিয়ে চলল জলটুঙ্গির দিকে।

টর্চ্চের আলোর সাহায্যে তিন জনে জলটুঙ্গিতে উঠে ঘরে প্রবেশ করল।

বসন্ত রায়ের চিঠির নির্দেশ মত পূর্ব্ব দিকের দেয়ালে বসান একটা আলমারির সামনে এসে দাঁড়াল তাপস।

আলমারির পাশে দেয়ালে আটকান রয়েছে চারটি দীপাধার। চারটি ব্রোঞ্জের পরীমূর্ত্তি। ডান দিক্ থেকে তিন নম্বর পরীটিকে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে ঘোরাতেই দেয়াল-আলমারি একপাশে সরে গেল। দেয়াল থেকে আলমারি সরে যাবার ফলে দেয়ালের খানিকটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল।

টর্চ্চের আলো ফেলে সুজিত চাপা কণ্ঠে বলে উঠল,—'গুপ্তপথ !'

টর্চ্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরটা দেখতে লাগল তাপস। বলল,—'হ্যাঁ, গুপ্তপথ। পথের সন্ধান পাওয়া গেল, গুপ্ত রত্নসিন্দুকের সন্ধানও পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।'

সুজিত বলল, – 'শেষ পর্য্যন্ত অসম্ভবকে সম্ভব করলি তুই !'

মৃহু মৃহু হাসতে লাগল তাপস। উত্তর দিল না কিছুই। শুধু ইঙ্গিতে মলয়কে কি যেন আদেশ দিল।

ঘরের বাইরে গভীর অন্ধকারে মলয় অদৃশ্য হয়ে গেল নিঃশব্দে।

সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে তাপস দেয়ালের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করল।

ভিতরে প্রবেশ করে টর্চ্চের আলো জ্বালাতে দেখা গেল, ঘোরাল সিঁড়ি ধাপের পর ধাপ নীচে নেমে গেছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপ এসে মিশেছে পাথরের বড় টালি দিয়ে গড়া সুড়ঙ্গ-পথে। সুড়ঙ্গ-পথ শেষ হয়েছে মাটির নীচে বড় ভারী পাথরে গড়া একটা চৌকো ঘরে।

মাটির নীচের বদ্ধ হাওয়ায় আর ভাপসা গন্ধে ওদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

ঘরের মধ্যে তাপস প্রথম ঢুকল।

ঘরে ঢুকে তাপস টর্চ্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল ভিতরটা।

তারপর সুজিতকে বলল,—'গাঁতি আর কোদাল নিয়ে আয়, আলো দু'টো জ্বালিয়ে দে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সুজিত তাপসের আদেশ পালন করল।

দিনের আলোর মত আলোকিত হয়ে উঠল ছোট্ট ঘরটি।

ততক্ষণে কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তাপস। ঘরের ঠিক মাঝখানে সাত ফুট পরিমাণ স্থানে খড়ি দিয়ে বিরাট একটা চৌকো দাগ কাটল সে।

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল সুজিতের দিকে। বলল,—'এই হচ্ছে বসন্ত রায়ের নির্দিষ্ট স্থান। এখানের মাটীর নীচে আছে মতিলালের মৃতদেহের কঙ্কাল আর রত্নসিন্দুক। কাজে লেগে যা সুজিত! গাঁতি দিয়ে ওপরের পাথরগুলো খুলে ফেল আগে। তারপর মাটি খুলতে হবে।'

সুজিত কাজে লেগে গেল। একটার পর একটা টালি খুলতে লাগল গাঁতির সাহায্যে। কিন্তু এ রকম কাজে সুজিত একটুও অভ্যস্ত নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, অবশ হয়ে এল শক্তিমান্ হাত দু'টো। গাঁতিটা একপাশে রেখে বসে পড়ল মেঝের উপরে, জিজ্ঞাসা করল,— কতখানি মাটি খুলতে হবে?'

তাপস গাঁতি নিয়ে ততক্ষণে টালি খুলতে আরম্ভ করেছে।

টালির কোণায় গাঁতির চাড় দিয়ে একটা টালি খুলে ফেলে তাপস বলল,—'টালির নীচে থেকে ছয় হাত মাটি তুলে ফেলতে হবে। ছয় হাত নীচে আছে মতিলালের মৃতদেহ আর রত্নসিন্দুক।'

কিছুক্ষণের চেষ্টায় ওপরের বাকি টালিগুলো সব তুলে ফেলল তাপস। তারপর টালির নীচের নরম মাটি কোপাতে লাগল বিপুল উদ্যমে। আর চাপ চাপ খোলা মাটি তুলে উপরে ফেলতে লাগল সুজিত।

দেখতে দেখতে একঘণ্টা কেটে গেল। ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে চলেছে তাপস আর সুজিত। অর্ধেক মাটি খোলা হয়ে গেছে।

মাটি তুলতে তুলতে এক সময় সুজিত বলল,—'ঠিক এই সময় এক কাপ্ চা পেলে কেমন হয়?'

—'কি বললি? চা? আছে সঙ্গে?' মাটি খোঁড়ার দারুণ পরিশ্রমে শুষ্ক ঠোঁট জোড়া জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে তাপস জিজ্ঞাসা করল।

—'ফ্লাস্ক্ ভরতি গরম চা সঙ্গে এনেছি। বলিস্ তো আনি।'

—'আন্ তাহ'লে।'

তাপস গর্ত থেকে উঠে এসে মেঝেতে বসে পড়ল।

উপরের ঘর থেকে চায়ের ফ্লাস্ক্‌টা নিয়ে এল সুজিত। কয়েক মিনিটের মধ্যে দু'জনে চা পান শেষ করল।

তারপর আবার সুরু হল মাটি খোঁড়া। এবার সুজিত কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল, আর তাপস খোঁড়া মাটি গর্তের উপরে তুলতে লাগল।

দেখতে দেখতে আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। ততক্ষণে প্রায় ছয় ফুট সমান চৌকো গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে।

সহসা সুজিত কোদালটা একপাশে রেখে খোলা মাটি হাতড়াতে লাগল; তারপর চাপাকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল,—'আলোটা তুলে ধর দিকিনি তাপস, আমার হাতে যেন কি একটা লেগেছে।'

তাপস জোরাল আলোটা নামিয়ে ধরল গর্তের মধ্যে। আলোকিত হয়ে উঠল গর্তের ভিতরে আধো-অন্ধকার।

উজ্জ্বল আলোয় বিস্মিত তাপস আর সুজিত দেখল নরম মাটির বুকে জেগে উঠেছে মানুষের পায়ের কঙ্কাল।

কেটে গেল কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত। দু'জনেই স্থিরনিশ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

ধীর মৃদুকণ্ঠে তাপস বলল,—'হতভাগ্য মতিলালের কঙ্কাল, সুজিত!'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুজিত। অতীতের সেই রহস্যময় কাহিনীর কথাই বোধ হয় চিন্তা করছিল সে।

তাপস আবার বলল,—'এবার অত্যন্ত সাবধানে আমাদের মাটি খুঁড়তে হবে। আর কোদাল চলবে না, খন্তাটা দে।'

খন্তাটা তাপসের হাতে দিল সুজিত।

খন্তার সাহায্যে অত্যন্ত সাবধানে মাটি খুঁড়তে লাগল তাপস। আলগা মাটিগুলো উপরে তুলে দিতে লাগল সুজিত।

ধীরে ধীরে গোটা নরকঙ্কালটা প্রকাশিত হয়ে পড়ল নরম মাটির বুকে। দেহের একটি হাড়ও স্থানচ্যুত হয় নি। কেউ যেন অতি সাবধানে—অতি যত্নে শুইয়ে রেখেছে।

কঙ্কালের মাথার নীচের মাটি গোল করে খুলতে লাগল তাপস। মাথার নীচের মাটি সরিয়ে ফেলতেই দেখতে পাওয়া গেল ছোট্ট একটি লৌহসিন্দুক।

উত্তেজিত সুজিত স্থান-কাল ভুলে চীৎকার করে উঠল,—'বসন্ত রায়ের রত্নসিন্দুক!'

তাপস কোন উত্তর দিল না, নীরবে দেখতে লাগল সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

মর্মান্তিক গুরুগম্ভীর হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য—অদ্ভুত, ভয়াল, ভয়ঙ্কর। মাটির বুকে রত্নসিন্দুকের উপর মাথা রেখে যে নরকঙ্কাল যখের মত রত্নসিন্দুক আগলে দু' শ' বছর

ধরে নিঃশব্দে শুয়ে আছে—একদিন তার প্রাণ ছিল। পাপের রক্তাক্ত পথে সঞ্চয় করেছিল প্রচুর ধনরত্ন। ধনরত্নের মত একটু একটু করে সঞ্চয় করেছিল পাপ। রক্তের বদলে রক্ত দিয়েই তাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

তাপসকে মতিলালের কঙ্কালের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুজিত জিজ্ঞাসা করল,—'কি ভাবছিস তাপস ?'

—'কিছু না। আয়, দু'জনে মিলে সিন্দুকটা টেনে তুলি।'

তাপস আর সুজিত সিন্দুকের উপর ঝুঁকে পড়ল।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিঃশব্দ রাত্রির স্তব্ধতাকে মুখর করে ঘোষিত হ'ল রিভলভারের সশব্দ গর্জন।

(ক্রমশঃ)

নালন্দা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

নালন্দার কাহিনী আগেও শুনেছ ; এবারে শেষটুকু বলি।

নালন্দা দীর্ঘকাল মাটিচাপা পড়ে ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সেই মাটির ঢিবি খুঁড়ে আজকের এই দর্শনীয় সব কিছু বের করেছেন। সেই খোঁড়ার সময় যা কিছু তাঁরা পেয়েছেন তাই তাঁরা এনে রেখেছেন এখানকার যাদুঘরে সাজিয়ে। নালন্দা শেষ দিকে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়নের কেন্দ্র হয়ে ওঠে, বহু তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায় এখানে। এখানে আগে ধাতু ঢালাই করে মূর্তি গড়ার ব্যবস্থা ছিল। মূর্তিগুলি দেখলেই শিল্পীরা কত সূক্ষ্ম কাজ করতেন তা বোঝা যায়। ছোট ছোট মূর্তিতে এতো সূক্ষ্ম ও সুন্দর

কারুকার্য যে দেখলে বিস্ময় লাগে। বড় মূর্তিও নাকি এক সময় এখানে ছিল। হিউয়েন সাং আশী ফুট উঁচু পিতলের এক দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন। সে মূর্তিটি আজ নিরুদ্দিষ্ট। এখানকার অধিকাংশ মূর্তিই বুদ্ধের। পদ্মের উপর বুদ্ধ বসে আছেন, মাথার চুলগুলি কুঞ্চিত। কোন বুদ্ধের আবার মাথায় জটাও আছে। কোথাও আবার পাথরের উপর বুদ্ধের সমগ্র জীবনীটিই খোদাই করা আছে। ধ্যানী বুদ্ধ, বজ্রপাণি, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি মূর্তিগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তিও আছে। শিবপার্ব্বতী, সিংহবাহিনী, গণেশ ও সূর্যমূর্তিও আছে।

কয়েকটি তাম্রলিপি আছে ; তাতে সমুদ্রগুপ্ত, ধর্মপাল, দেবপাল, বালাদিত্য, ও যশোধর্মদেবের নামাঙ্কিত। বালাদিত্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়ে এক তাম্রলিপিতে লিখছেন—"নালন্দার পণ্ডিতগণ শাস্ত্রজ্ঞানে ও শিল্পনৈপুণ্যে পৃথিবীর বড় বড় সম্রাট্‌দের নগরগুলিকে লজ্জা দেয়। বিদ্যাধরদের সুমেরু রাজ্যে মণিমাণিক্যের যে সৌন্দর্য, নালন্দার উচ্চ সঙ্ঘারামগুলির সৌন্দর্য তার চেয়ে অনেক বেশী। এই গৃহগুলি যেন ধরিত্রীকে মালা দিয়ে সাজিয়েছে। রাজা বালাদিত্য এখানে বুদ্ধের নামে বিরাট শাদা প্রাসাদ তৈরী করেছেন, কৈলাস পর্বতকে লজ্জা দিতেই বুঝি ! এই প্রাসাদ সৌন্দর্যে চন্দ্রকে লজ্জা দিচ্ছে, হিমালয়ের তুষারধবল গিরিশ্রেণীকেও ম্লান করে দিয়েছে, নিন্দুকের মুখকে মূক করে দিয়েছে। এই প্রাসাদ একটি গৌরবস্তম্ভের মত পৃথিবীর বুকে দণ্ডায়মান।"

এ থেকে নালন্দায় কি ধরণের মন্দির ও সঙ্ঘারাম ছিল তার খানিকটা পরিচয় আমরা পাই।

বহু ছোট ছোট সীলমোহর আছে, তাতে অক্ষর খোদিত করা আছে।

কুমারগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, শশাঙ্ক প্রভৃতির মুদ্রা আছে। কারুকার্যখচিত ইটও দেখা গেল।

কারুকার্যখচিত মৃৎপাত্রও আছে অনেক। বড় বড় ছ' ফুট উঁচু জালা দেখা গেল অনেকগুলি। পুরানো দিনের তালা, প্রদীপ, পিলসুজ, খেল্‌না প্রভৃতিও দেখা গেল।

এক জায়গায় কিছু পোড়া চাল রক্ষিত আছে। এই পোড়া চালগুলির সঙ্গে যুক্ত আছে নালন্দার শেষ ইতিহাস।

তন্ত্রবিদ্যার চর্চায় নালন্দা যখন জনসাধারণের কাছে পূর্বের শ্রদ্ধা হারিয়েছে, কুমারিল ভট্ট ও আচার্য শঙ্কর বৈদিক মতবাদে ভারতব্যাপী দিগ্বিজয় করে ফিরেছেন, তখন থেকেই নালন্দার গৌরবরবি অস্তমিত। কিন্তু অত বড় একটা মহাবিদ্যালয়, শত শত বছরের গৌরব যার ভিত্তি, কিছুকালের অগৌরব তাকে লুপ্ত করতে পারে না।

তাকে প্রচণ্ড আঘাতে ম্লান করে দিল মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জির সর্বধ্বংসী আক্রমণ। মগধ জয় করে তারা নালন্দা ধ্বংস করলো, ভিক্ষুরা কেউ কেউ তাদের হাতে প্রাণ হারালো। যারা পারলো প্রাণ নিয়ে পালালো।

তারপর মুদিতভদ্র নামে এক সন্ন্যাসী মগধের মন্ত্রী কুকুতসিদ্ধকে অনুরোধ করলেন, নতুন করে এখানে আবার সঙ্ঘারাম তৈরী করতে। এত বড় একটা শিক্ষা-নগরী একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে?

কুকুতসিদ্ধ নতুন করে সঙ্ঘারাম তৈরী করিয়ে দিলেন, আবার সেখানে শিক্ষার্থী ভিক্ষুদের সমাবেশ হলো। একদিন, মন্দিরে যখন ধর্মব্যাখ্যা হচ্ছে, এমন সময় সেখানে তু'জন ব্রাহ্মণ তীর্থিক এসে উপস্থিত হলেন। নালন্দায় তখন পূর্বের সে শৃঙ্খলাবোধ আর নেই। যুবক শিক্ষার্থীরা ব্রাহ্মণ তু'জনকে দেখে পরিহাস করলেন, এবং বিদ্রূপ করে তাদের গায়ে বাসন-ধোয়া জল ঢেলে দিলেন। তীর্থিক তু'জন এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য বারো বছর তাঁরা সূর্যব্রত পালন করলেন; শেষে হোম করে সূর্যদেবকে আহুতি দিয়ে সেই হোমের জ্বলন্ত কাঠকয়লা এনে ফেললেন নালন্দার বৌদ্ধমন্দিরে। তার ফলে বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেল। সেই আগুনে নালন্দা ভস্মীভূত হলো, নালন্দার যা গৌরব—সেই রত্নগঞ্জও পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

রত্নগঞ্জ নালন্দার বিখ্যাত গ্রন্থাগার। তিনখানি বড় বড় বাড়ীতে এই গ্রন্থাগার ছিল।—রত্নসাগর, রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক। মহা মহা মনীষীর শত শত বছরের জ্ঞান সঞ্চিত ছিল এই গ্রন্থাগারে। কয়েক মুঠি ছাই ছাড়া তার অবশেষ কিছু রইল না।

নালন্দা চিরদিনের মত লুপ্ত হলো।

তারপর সেই ভস্মস্তূপ মাটির ঢিবি হয়ে গেল একদিন। শত শত বছর সেই ঢিবি পড়ে রইল। পাঠান ও মুঘলদের রাজত্বকালে হিন্দু সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের রক্ষার কথা আর কেউ মনেই স্থান দিতে পারলো না। এলো ইংরাজ। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঐতিহাসিক বুকানন হ্যামিল্টন সাহেব প্রথম এলেন এখানে, আবিষ্কার করলেন কয়েকটি দেবদেবী ও বুদ্ধমূর্তি। তাঁর পঞ্চাশ বছর পরে এলেন কানিংহাম। তিনিই প্রথম বললেন—'এই ঢিবিটি নালন্দার ধ্বংসাবশেষ।' বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি পড়লো এখানে। ব্রড্‌লি সাহেব এসে সুরু করলেন খনন-কার্য। একটি মন্দির তিনি খুঁড়ে বের করলেন। তারপর বিংশ শতকে লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি বললেন—'খরচ আমরা দেবো, খুঁড়ে দেখা হোক, কি আছে।' ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে) এবার নিয়মিতভাবে খনন-কার্য চালিয়ে সমস্ত

ধ্বংসাবশেষটিকে উন্মুক্ত করলো, গড়ে তুললো যাতুঘর। যা কিছু পেলো এই যাতুঘরে রক্ষা করার ব্যবস্থা করলো। স্তূপ ও ধ্বংসাবশেষকেও উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে রাখলো। আজকে এখানে আমরা যা কিছু দেখছি তা ইংরাজ ঐতিহাসিকদের অবিস্মরণীয় কীর্তি।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। মন হারিয়ে গিয়েছিল অতীতের বিস্মৃত দিনের মাঝে। ধীর পদক্ষেপে আমরা ষ্টেশনে এসে পৌঁছুলাম। গয়লার 'চূড়া-দহি' নিমন্ত্রণ তখন আর মনে নেই।

টিকিট কোথায়?

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

একখানা ছেলেদের আড্ডার ঘর। অনেকটা যেন ইংরেজীতে যাকে বলে হষ্টেলের 'ডর্মিট্রী'। তিন-চারখানা খাট, টেবিল, চেয়ার, কিছু বই, হকি ষ্টীক, ক্রিকেট ব্যাট ইত্যাদি। অনুষ্ঠান সবটাই ছেলেদের। বড় একান্নবর্তী পরিবারের ছেলেদের থাকবার ও পড়বার ঘর।

একটি ১০।১২ বছরের ছেলে শিষ দিচ্ছে আর প্রাণপণে বুট জুতো পরবার চেষ্টা করছে।—

আরে লাগ্‌, লাগ্‌, লাগ্‌ লাগ্‌ বুট—
আরে বাপ রে, আরে মা রে!
লাগ্‌, লাগ লাগ্‌ লাগ্‌, বুট্—

অনেক চেষ্টার পর বুট পরা হলে দেখা গেল উল্টো পরা হয়েছে। কপাল চাপড়ে ছেলেটি বললে—

আরে খোল্‌ যা মেরা বুট—

এমনি করে বুট পরা আর খোলার পর্ব চলতে লাগল। শেষে ঘেমে নেয়ে স্বস্থানে বুট এসে গেলে তু'হাতে তালি বাজিয়ে ছেলেটি (টিটু) বলল—

ব্যস্‌,—আ' ম্যাম রেডী! হেই বুন্টু, ঝুন্টু, ঘুন্টু—তোমারা রেডী?

(নেপথ্যে—ইয়াঃ। এক সেকেণ্ড। একটা রুমাল পেলেই হয়ে যায়—)

হাঁফাতে হাঁফাতে ঝুন্টুর প্রবেশ।

ঝুন্টু—আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো টিটু? (এক পাক ঘুরে গিয়ে) হুম্‌ বাবা, কেউ বলতে পারবে না যে আমাকে ক্যাবলা দেখাচ্ছে।

টিটু—না, তা আর কি পারবে? শুধু টুপিটা পরেছ উল্টো আর শার্টটাও তাই। দেখাচ্ছে যেন উল্টো কার্ত্তিক!

ঝু—অ্যাঁঃ! তাই নাকি? এতো কাণ্ড করেও? (হ্যাট্ ঠিক করে পরে নিয়ে শার্ট খুলতে গিয়ে টুপিতে আটকে প্রাণ যায় আর কি!)

এঁ্যাই, টিটু ভাই, আটকে গেছি. খুলে দে না—

টি—(হাসিতে ফেটে পড়ে) এই ঘুন্টু, দেখবি আয়—ব্রাদার ঝুন্টু কট্—

এদিকে ট্রেন ধরাও নট্—বলতে বলতে ধুতি, পাঞ্জাবী পরা ঘুন্টুর প্রবেশ এবং ঝুন্টুর ব্যাপার দেখে ফের হাসির হুল্লোড়।

টিটু ও ঘুন্টু টানাটানি করে শার্টটা খুলে দিল। তখন টিটুর জুতোর ওপর নজর পড়ল ঘুন্টুর। আবার হাসির ফোয়ারা ছুটল।

ঝু—ফের যদি আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে তবে আমি আর যাচ্ছি না তোমাদের সঙ্গে।

ঘু—আরে, তোকে না। (ইসারায় টিটুর পায়ের দিকে দেখাল। তখন দু'জনেরই অট্টহাস্য।)

ঝু—এই যে চাঁদ, এবার? এক পায়ে মোজা!

(ইতিমধ্যে বুন্টুও এসে পড়েছে) বুন্টু—খুব যে বলেছিলে আমার দেরী হবে?—গাড়ীর আর কুড়ি মিনিট বাকী আছে, চল। —তারপরই, টিটুর পায়ের দিকে নজর পড়তেই, সেও যোগ দিল হাসিতে।

কিন্তু আর সময় নেই। ঘুন্টু বললে—বুন্টু, তুই ধর্ ডান পা, আমি ধরছি বাঁ পা।

তিনজনে মিলে টিটুকে শুইয়ে ফেলে বুট খোলা হোলো। ফের মোজা পরিয়ে বুট পরানো হ'ল। টিটুর পরিত্রাহি চিৎকার—বাবা গো, মা গো, গেলুম গো, খুন করলে গো!

বু—এ দিকে বাবুর বুট না পরলে ইষ্টাইলই হয় না। বললুম, গ্রীসিয়ান স্যাণ্ডেল কেন্—না উনি লড়াইয়ে গোরা হবেন—নাও, এখন চলো—

পিপ্পির প্রবেশ। তার কাঁধে হ্যাবারস্যাক, এক পাশে ক্যামেরা—আর এক হাতে প্রজাপতি ধরার জাল। পিপ্পি ন্যাচারালিষ্ট—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপর ওর অগাধ টান। মেজোমামার শিষ্য কিনা!

পিপ্পি—হোয়াট্—হোয়াট্—হোয়াট্—? এখনও তৈরীই হও নি!—ট্রেনের ১৫ মিনিট বাকী। মেজদা ফট্টিনাইন ডাউনে এসেছেন, বললেন থার্টিটু আপ্ রাইট টাইম্।

টি—আরে আরে, তাই তো। চল্ বেরিয়ে পড়া যাক্।

ঘু—দয়া করে টিকিট নিয়েছো তো?

টি—এঁ্যা, তাই তো! টিকিট কার কাছে? হ্যাঁ, মনে পড়েছে টিকিট বুন্টুর কাছে।

বু—মোটেই না।

টি—আমি বলছি তোমার কাছে। তুমিই তো ভালো জায়গায় রেখে দেবে বলেছিলে।

বু—আমি বলছি আমি রাখি নি।

ঘু—কেন ঝগড়া করছ?

টি—ঠিক বলেছ, আচ্ছা। তাহ'লে কোথায় গেল? টিকিট কিনেছিলাম আমি, মনে পড়ছে, কিন্তু

ঝু—(জেচিং কেটে) কিন্তু··· ট্রেন এলো বলে।

টি—ভাবতে দাও। উঁহু, মনে পড়ছে না তো!

পি—ভাঙা চায়ের কেটলীতে টিকিট রেখেছিলাম বলে মনে পড়ছে।

(সকলে মিলে ছুটে গেল চায়ের কেটলী যেখানে ছিল। টুল, বেঞ্চি উল্টে পড়ল, একটা গ্লাসও।)

ঘু—নেই তো কেটলীটা!

বু—মাসীমা ধুতে নিয়ে যান নি তো? দেখে আসব?

পি—না রে, টুব্লু তখন ওটাতে চাএর জল ভেজাবার জন্য নিয়ে গিয়েছিল, তাইতে ওটা সরিয়ে রেখেছিলাম।

টি—দয়া করে বলবে কোথায় রেখেছ?

পি—ভাবতে দাও। হুঁ হুঁ···

বু—ইয়া আল্লা, ভাবতে দাও ওকে? (পিপ্পির মাথায় চাঁটি মারল।)

পি—বেশ, তাহ'লে বস্লাম, আর ভাববো না।

সকলে—আরে, না না, দোহাই তোমার···

ঘু—প্লিজ্ ভাই, ভাবো!

টি—একটু তাড়াতাড়ি ভাবো। গাড়ী তোমার ভাবনা শুনছে না।

ঝু—আমি বলছিলাম কি, আমার যেন মনে হচ্ছে আমি ওটা বাঁধানো "রামধনুটার" মধ্যে রেখেছিলাম। কিন্তু···

টি—ওরে বাবা, আবার কিন্তু?

ঝু—বইটা রায়েদের পিন্টু নিয়ে গেছে পড়তে।

বু—ও টি—এঁ্যা? তবে? টিকিট শুদ্ধ বই নিয়ে গেছে?

ঝু—না স্যর, এতো বোকা পাও নি আমায়। আমি তার আগে টিকিটগুলো মেজদা'র ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম।

টি—তা এতক্ষণ বলতে কি হয়েছিল? (ড্রয়ার খোলা হ'ল। মেজদার বই, কাগজ, পেন্সিল ওলোটপালোট)

পি—এই এই, আমার দেরাজ তছনছ করে দিলে! এই, এই টিটু, ভালো হবে না বলছি!

টি—আবার গোছালেই হবে। কিন্তু কই, টিকিট নেই তো!

পি—থাকবেই না তো। ড্রয়ার গোছাবার সময় আমি তা সরিয়ে রেখেছিলাম।

বু—(গাঁট্টা মেরে) কোথায় রেখেছিলে শুনি?

পি—এই, লাগে না বুঝি? ঐ তো সিগারেটের খালি কৌটোর মধ্যে···

বু—সিগারেটের কৌটোয়? কেন?

পি—ওতে আমাদের মশলা থাকে, তাই। কখনো না কখনো মশলা খেতে মনে হবেই!

ঘু—হায়—হায়—হায়!

টি—হায় হায় কেন?

ঘু—মনে পড়েছে। ঐ টিকিটগুলি সরিয়ে আমি বিস্কুটের টিনে রেখেছিলাম।

সবাই—বিস্কুটের টিনে? (সবাই ছুটল—যে তাকের উপর বিস্কুটের টিন আছে। আরো জিনিষপত্র উল্টে পড়ল।)

পি—আর ১০ মিনিট ট্রেনের দেরী—(বিস্কুটের টিন উল্টে) টিকিট নেই তো!

টি—এই রে, আমার মনে পড়েছে—

ঝু—(ভেংচি কেটে) মনে পড়েছে—মনে পড়েছে! টিকিট কোথায় বল?

টি— সকালে দু'টো বিস্কুট মুখে পুরেছিলাম। মনে হ'ল ভুল করে যদি কেউ টিকিট মুখে দেয়! তাই তুলে বালিশের ওয়াড়ের নীচে রেখেছি—

(সবাই ছুটে গিয়ে বালিশের বারোটা বাজিয়ে দিল। তলা থেকে হরেক রকম জিনিষ বেরুল—কিন্তু কোথায় টিকিট?)

সবাই—নেই তো! (জানালা দিয়ে তাকিয়ে) ঐ দেখ সিগন্যাল পড়ল—

টি—মনে হচ্ছে সকাল বেলায় বিছানা গোছাবার সময় ক্ষীরো তা মাটীতে ফেলে দিয়েছে।

(সবাই তন্ন তন্ন করে বিছানার তলা, টেবিল-চেয়ারের নীচে খুঁজতে লাগল।)

পি—ঘর ঝাঁট দেবার সময় ফেলে দেয় নি তো? এই ঝুন্টে, ময়লা রাখবার ঝুড়িটা আন তো!—

(ঝুন্টু ঝুড়ি নিয়ে এসে উল্টে দিল। দূরে ট্রেনের বাঁশী!)

বু—ঐ রে, ট্রেন এল যে—!

(নোংরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে)

টি—হুর্‌রে, আমার গলার বোতাম—!

বু—কেয়া বাৎ, আমার ইয়ো ইয়ো।

পি—এ্যাঃ, এই তো সেই গন্টকি প্রজাপতির ছবিটা—মাই গ্র্যাণ্ড ফাদার!

ঝু—তা নয় হ'ল—কিন্তু টিকিট?

টি—(হঠাৎ লাফিয়ে উঠে) ইউরেকা! মনে পড়েছে। ক্ষীরো ঝি টিকিটগুলি তুলে রেখেছিল।

(ট্রেন ষ্টেশনে এসে গেছে।)

সবাই—কোথায়? কোথায়?

টি—আমাকে বলল, দাদাবাবু, টিকিটগুলি তুলে রাখুন না—

সবাই—মরেছে! কোথায়, তাই বল না?

ঝু—যাই ক্ষীরোকে জিজ্ঞেস করি।

পি—জিজ্ঞেস করলেই হ'ল! সে জ্যেঠাইমার সঙ্গে ঝগড়া করে কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেছে।

সবাই—তবে?

টি—(লাফিয়ে উঠে) গট্ ইট্। ক্ষীরো বলল—তাকের উপরে টিকিট রাখলুম দাদাবাবু!

(সবাই লাফিয়ে উঠে ছুটল তাকের দিকে। যা কিছু ফারনিচার দাঁড়িয়েছিল সব কাৎ)

পি—না, তাকে নেই। ঠিক বলছ তাকের ওপর?

টি—হ্যাঁ, তবে মনে হচ্ছে তাকের ওপরে কিছু ছিল, তারই মধ্যে রেখেছে।

সবাই—সে জিনিষটা কি?

(গাড়ীর প্রথম ঘণ্টা পড়ল। হায় রে পিক্‌নিক্!)

টি—ইয়াঃ, আরে আরে, এইবার মনে হয়েছে। ক্ষীরো বলল, তাকের ওপর তোমার মানি-ব্যাগে রাখলুম। (গাড়ী ছাড়ার হুইস্‌ল্।)

সবাই—মানি ব্যাগ? কোথায় ব্যাগ?

টি—(পকেট থেকে ব্যাগ বের করে খুলতেই বেরিয়ে পড়ল পাঁচটা হলদে রঙের টিকেট।)

সবাই—হুর্‌রে, চল এবার ষ্টেশন।

পি—(কাঁধ থেকে আস্তে আস্তে হ্যাবারস্যাক্ নামাতে নামাতে) জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখ, থাট্টিটু আপ্ ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যাল পার হয়ে গেছে।

সবাই এর ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। দূরে ট্রেনের হুইস্‌ল্ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে হতে মিলিয়ে গেল।*

---

*এনিড ব্লাইটন্‌স্-এর একটি ইংরেজি গল্পের ছবি অবলম্বনে। শিশুরংমহলের আগামী শিশু-উৎসবে অভিনীত হবে।

চল ভাই, চাঁদে যাই

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে গত ৪ঠা অক্টোবর রাশিয়া একটি কৃত্রিম চাঁদ আকাশে উঠিয়ে দিয়েছে। এ চাঁদটি পৃথিবী থেকে ৫৬০ মাইল উপরে থেকে ৯৬ মিনিটে একবার করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল। চাঁদটি নিতান্ত ছোট নয়, ব্যাসার্ধ এর সাড়ে এগার ইঞ্চি এবং ওজনে দু' মণের কিছু উপর। আশ্চর্য্যজনক ঘটনা সন্দেহ নেই। গোটা পৃথিবীর লোক একেবারে অবাক্। নানা দিকে নানা ভাবে নানা আলোচনা। কেউ বলছে, ক' দিনের মধ্যে আমরা গিয়ে সত্যিকারের চাঁদে পৌঁছব; কেউ বলছে, মঙ্গল গ্রহে যেতে আর দেরী নেই। সত্যি সত্যি জাপানে আবার মঙ্গল গ্রহে জায়গা সংগ্রহের বেজায় ভীড় লেগে

গেছে। আট হাজার লোক ইতিমধ্যে সেখানে জায়গা কিনে ফেলেছে, জায়গার দাম চড়ে গেছে। পৃথিবীর বুকে যে জায়গা আছে তার তুলনায় লোক বেশী। কাজেই মঙ্গল গ্রহে যদি কিছু জায়গা মিলে যায় সস্তায় তবে হয়তো একটু নিশ্চিন্ত আরামে বসবাস করা যাবে।

তবে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু কিন্তু এখনো অতটা আশা পোষণ করতে ভরসা দিতে পারছেন না। রাশিয়ার এক রকেট-বৈজ্ঞানিকের বয়স ষাট বছর। তিনি কিন্তু ভরসা দিয়ে বলেছেন, তাঁর জীবদ্দশায়ই চাঁদে পৌঁছান সম্ভব হবে। তবে এ করতে গেলে তিনি যে সব কর্মধারার ফিরিস্তি দিয়েছেন তা যে রীতিমত ভাবিয়ে তোলে !

এদিকে বিলেত-আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের তাক্ লেগে গেছে সব দেখে শুনে। লণ্ডনের সংবাদ হচ্ছে, যে, কৃত্রিম চাঁদ ক্রমে পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে ; আর বেশী দিন নয়। গেল ব'লে বেচারী চাঁদ, আর সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের ভবিষ্যৎ বসবাসকারীদের আশা-ভরসা ! কিন্তু এঁদের সব দুশ্চিন্তার গুড়ে বালি দিয়ে কৃত্রিম চন্দ্র বহাল তবিয়তে আকাশমার্গে বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন।

বিস্ময়ের এইখানেই শেষ নয়। রাশিয়া গত ৩রা নভেম্বর দ্বিতীয় কৃত্রিম চাঁদ উড়িয়ে দিয়েছে আকাশে। এবার যন্ত্রপাতি-ভরা চাঁদ নয় শুধু ! রীতিমত প্রাণী ভরা ছিল এ চাঁদে। ভাগ্যবান্ প্রাণীটি একটি কুকুর। দ্বিতীয় চাঁদের সঙ্গে তিনিও দিব্যি আরামে (?) ঘুরে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর চারিদিকে ! যারা খবরের কাগজ পড় তারা এই কুকুরের ছবিও হয়তো দেখেছ। কেউ কেউ নাকি আবার বেতারে এর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ, এমন কি এর ঘেউ ঘেউ শব্দ পর্য্যন্ত শুনেছে ! তা ছাড়া এবারকার চাঁদটি আকারে বড়, ওজন প্রায় ১৪ মণ। ৯৩০ মাইল উর্ধে থেকে এ ১০২ মিনিটে একবার করে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে।

বেশ তো, রাশিয়া আকাশে চাঁদ উড়িয়েছে তো বেশ করেছে ! তাতে কার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ল ! কি এমন প্রয়োজন ছিল আকাশে দু'টো বা দশটা চাঁদ ওড়াবার ? ব্যাপারটাই বা এমন শক্ত কি ? আমরাও তো আকাশে ঘুড়ি উড়াই। তবে ? শোন সে কথা।

তোমরা জান ন'টা গ্রহ নিয়েই আমাদের সৌরজগৎ গঠিত। মাঝখানে সূর্য্য। গ্রহগুলি ডিম্বাকৃতি পথে সূর্য্যের চারিদিকে অনবরত ঘুরে বেড়ায়। এর মধ্যে কয়েকটা গ্রহের আবার উপগ্রহ আছে। বিশ্বজগতের প্রতিটি পদার্থ প্রতিটি পদার্থকে আকর্ষণ করে। একে বলা হয় মহাকর্ষ। একটা দড়ির মাথায় এক টুকরো ভারী জিনিস

বেঁধে যদি তা চারদিকে ঘুরান যায় তবে কি ব্যাপার ঘটে দেখা যাক্। ভারী জিনিষটার নিজের ইচ্ছা হ'ল দড়ি ছিঁড়ে ছিটকে যাওয়া, দড়ি তাকে অনবরত টেনে রাখছে কেন্দ্রের দিকে। তাহ'লে আমরা বলতে পারি যে ভারী জিনিষটার বাইরে চলে যাওয়ার শক্তি আর দড়ির টান এক বলে ভারী জিনিষটা সব সময় ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। গ্রহ-উপগ্রহের বেলায়ও এই-ই নিয়ম। মহাকর্ষের জন্যে এরা কখনো ছিটকে চলে যেতে পারে না।

পৃথিবী গ্রহের উপগ্রহ হ'ল চাঁদ। মহাশূন্যে চাঁদই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। দূরত্ব মাত্র ১ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল। পৃথিবীর চারদিকে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। যত উপরে ওঠা যাবে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বও ততই কমে আসবে। এমনি ভাবে বায়ুমণ্ডল কমে কমে এক সময় একদম মহাশূন্য অবস্থা মিলবে। ৪০ থেকে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব মেলে ; তারপর প্রায় ৫০০ মাইল পর্য্যন্ত অতি হাল্কা বায়ুমণ্ডল রয়েছে বিদ্যমান। অত উঁচু তো দূরের কথা, দু'-এক মাইল উপরে উঠলেই শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কষ্টকর, বেশী উঁচুতে বেঁচে থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

মহাশূন্য থেকে এক রকম রশ্মি অনবরত পৃথিবীর উপর পড়ছে। একে বলে মহাজাগতিক রশ্মি বা কস্‌মিক্ রে। বৈজ্ঞানিকরা এ সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু তথ্য আবিষ্কার করেছেন বটে, কিন্তু এ যে কোত্থেকে আসে তার কোন হদিস তাঁরা আজও পান নি। পৃথিবীতে জীব আছে, অন্য কোন গ্রহে জীবজন্তু আছে কি ? অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা কি রকম ? মানুষ কি কোন দিন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করতে পারবে ? তা ছাড়া পৃথিবীর চারিদিকে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তার উপর কিন্তু আমাদের এ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে। পণ্ডিতেরা দেখেছেন, সূর্য্য থেকে এক রকম রশ্মি নির্গত হয় যা আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। তারপর আছে উল্কারাশি। ঝাঁকে ঝাঁকে এরা পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ছে ; পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডল আছে তাই রক্ষে। বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে এরা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে, পৃথিবীকে কোন রূপ আঘাত করতে পারছে না। কিন্তু বহু উর্ধের বায়ুমণ্ডল যতই হাল্কা হোক্ না কেন, যত কমই হোক্ না কেন, এর মস্ত একটা ক্ষমতা বর্তমান। এই হাল্কা বায়ুমণ্ডলে অতি জটিল প্রকৃতির সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটছে যার জন্যে মহাজগতিক রশ্মি, সূর্য্যের ক্ষতিকারক রশ্মি এবং উল্কা-রাশির ধূলোবালি সবই প্রাণিজগতের কাছে ক্ষতিশক্তিহীন হ'য়ে পৌঁছায়। কাজেই সব দিক্ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় বহু উর্ধের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা বিশেষ ভাবে জানা খুবই প্রয়োজন। বহু উর্ধে উঠলে প্রাণিদেহের উপর সেখানকার আবহাওয়ার

চাঁদ পৃথিবীর সমান্তরাল পথে তার যাত্রা সুরু করেছে। মাধ্যাকর্ষণের জন্যে চাঁদকে নিশ্চয়ই খানিকটা চক্রাকার পথে চলতে হচ্ছে। ধরে নাও, কিছুক্ষণের মধ্যে চাঁদ খানিকটা পথ এগিয়ে গেছে ঘুরে ঘুরে। তারও উপরিভাগ গোল। কাজেই পৃথিবীর যে বিন্দুর উপর থেকে চাঁদকে ছাড়া হয়েছিল সে বিন্দুটিও যে ইতিমধ্যে খানিকটা নীচে নেমে গেছে! কাজেই কৃত্রিম চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্ব মোটামুটি একই থেকে যাচ্ছে। দড়ির মাথায় ভারী জিনিস বেঁধে ঘুরানোর ব্যাপারটার সঙ্গে তুলনা করে নিলেই এটা পরিষ্কার হবে। এ কাজের জন্যে চাই সেকেণ্ডে ৫ মাইল বা ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল গতিবেগ।

তাহ'লে দেখা গেল, কৃত্রিম চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার পথেই ঘুরতে থাকবে। কিন্তু পথটি বৃত্তাকার না থাকবারই সাম্ভাবনা খুব বেশী। কেন, বলছি। আমরা জানি, পৃথিবী পুরোপুরি গোল নয় বলে ভূপৃষ্ঠের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সব জায়গায় এক নয়। বিষুবরেখার উপর এ আকর্ষণ শক্তি সব চাইতে বেশী, যতই মেরুবিন্দুর দিকে এগোন যাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ততই কমে আসবে। তার ফলে কৃত্রিম চাঁদ যখন মেরুবিন্দুর কাছাকাছি থেকে চলতে থাকবে তখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম হবে বলে সে পৃথিবী থেকে খানিকটা দূরে সরে যাবে; কিন্তু বিষুবরেখার কাছ দিয়ে যাবার সময় সে পৃথিবীর দিকে বেশী ঝুঁকে পড়বে। এতে করে চাঁদের পথ গোলাকৃতি না হ'য়ে ডিম্বাকৃতি হবে। হিসেবে দেখা গেছে যে এজন্য পৃথিবী থেকে কৃত্রিম চাঁদের দূরত্ব মেরুবিন্দুর কাছে প্রায় ১৩ মাইল বেশী হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু রাশিয়ার চাঁদ এমন ভাবে ঘুরছে যে এরা কখনো মেরুবিন্দুর উপর তো আসবেই না, এমন কি মেরুবিন্দু থেকে ২৫ ডিগ্রী দূরত্বেই থাকবে সব সময়। কাজেই ভূপৃষ্ঠের মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া কিছুটা কম থাকবে এ চাঁদের উপর। আরও একটা কথা মনে রেখ। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের জন্যে কৃত্রিম চাঁদের গতিপথ পরিবর্তিত হবে মাত্র তিন ফুট মত।

পৃথিবীর উপরকার বায়ুমণ্ডলের উচ্চতাও সব জায়গায় এক নয়। বিষুবরেখার উপর বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা বেশী। এর ফলে কৃত্রিম চাঁদ যখন বিষুবরেখার নিকট পৃথিবীর খানিকটা কাছে এসে পড়বে তখন বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণের জন্যে গতিপথে ব্যাঘাত বেশী হবে। ফলে পথের দৈর্ঘ্য খানিকটা কমে যাবে। এমনি ভাবে কৃত্রিম চাঁদের পথ বৃত্তাকার হয়ে যাবে।

তারপর এ পথ আরও কমবে। এমনি ভাবে এক সময় পৃথিবীর ঘন বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে কৃত্রিম চাঁদ জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। প্রশ্ন করতে পার, তা কত দিন

পরে? এ প্রশ্নের জবাব শক্ত। তবে সে সময়টা এক সপ্তাহ থেকে আরম্ভ করে কয়েক বছরও হতে পারে।

কৃত্রিম চাঁদের ভেতর রয়েছে সব জটিল যন্ত্রপাতি। এরা অনবরত উর্ধাকাশের বিস্তৃত বিবরণ পাঠাচ্ছে পৃথিবীতে। এ সব বিবরণ ওখানকার অবস্থা ভাল ভাবে বুঝতে অনেক সাহায্য করবে। দ্বিতীয় চাঁদের কুকুরটি প্রথম কয়েকদিন বেশ ভালই ছিল। সম্প্রতি, মনে হচ্ছে, তার মৃত্যু হয়েছে। এবং এ মৃত্যু যে হবেই তা জেনেশুনেই বিজ্ঞানীরা তাকে ওপরে পাঠিয়েছিলেন।

কৃত্রিম চাঁদের এ সব যন্ত্রপাতি আপনা থেকেই কাজ করে যাচ্ছে সত্যি, কিন্তু যন্ত্রপাতি চালাবার শক্তি আসে কোত্থেকে? কৃত্রিম চাঁদের উপর সব সময়ই সূর্য্যালোক পড়ছে। আর সূর্য্যালোকের শক্তিই ঐ সব যন্ত্র চালাবার শক্তি জোগাচ্ছে। সে রকম ব্যবস্থাও রয়েছে এ চাঁদে। তা ছাড়া তৃতীয় রকেট থেকে চাঁদকে ছেড়ে দেওয়ার আগে, চাঁদকে বেশ করে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় লাট্টুর মত; এতে করে কৃত্রিম চাঁদের সর্ব্বত্রই সমানভাবে সূর্য্যালোক পড়তে পারে; ফলে নিখুঁত ভাবে চলবে ওসব যন্ত্রপাতি। পৃথিবীর সত্যিকারের চাঁদের কিন্তু একটা দিকেই শুধু সূর্য্যালোক পড়ে। সেও নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘোরে বটে, কিন্তু বড় আস্তে। যতটা সময় তার পৃথিবীর চারদিকে একবার পাক খেতে লাগে, নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে পাক খেতেও ঠিক সেই একই সময় লাগে।

আর একটা কথাও জেনে রাখ। কৃত্রিম চাঁদ আকাশে ওঠাবার জন্যে বিজ্ঞানের কোন বিশেষ শাখাই একা কাজ করে নি। এই বিস্ময়কর কাজের জন্যে প্রয়োজন হয়েছে এঞ্জিনীয়ার, পদার্থবিদ্, রসায়নবিদ্, গণিতজ্ঞ, ভূতাত্ত্বিক, শরীরতত্ত্ববিদ্ প্রভৃতি সকলেরই। এক কথায় বিজ্ঞানের সব রকম শাখার মিলিত চেষ্টায়ই তৈরী হয়েছে কৃত্রিম চাঁদ।

প্রতিশোধ

শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস

সাধু তুকারাম একদিন যেতে বিঠোবার মন্দিরে
দেখেন কে যেন রেখে গেছে পথ কাঁটার বেড়ায় ঘিরে।
যাওয়া-আসাতেই মুস্কিল হয় যাত্রী জনের বড়ো ;
সরায়ে সে কাঁটা করে দেন তিনি পথের দু' ধারে জড়ো।

পেয়ে সে খবর মম্বাজী আসি' মন্দিরে বরাবর
করেন অযথা সাধু তুকারামে প্রহারেতে জর্জর।
সারা দেহে তাঁর কাঁটার আঘাতে রক্তের ধারা ছোটে,
একটুও তবু কাতর-আকুতি মুখে তাঁর নাহি ফোটে।

সেই দিনও সাঁঝে মন্দিরে এসে ঠিক আগেকার মত
ভগবৎ-গান সাধু গেয়ে যান পর পর অবিরত।
সংগীত-শেষে শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টি পড়েছে যেই,
দেখেন সাধুজী তাঁদের মাঝে তো মম্বাজী আজ নেই।

কি হ'লো তাঁহার খবর আনিতে পাঠালেন অনুচর :
সে আসিয়া ফিরে সংবাদ দিলো—তাঁহার ভীষণ জ্বর।
সর্বাংগেই অসহ যাতনা, বেদনার ছাপ মুখে।—
সেই কথা যেন শেলের মতন বাজে সাধুজীর বুকে।

পর দিন ভোরে গিয়ে তাঁর বাড়ী সাধুজী বলেন, "ভাই,
আমার কারণে কষ্ট তোমার, তার তরে ক্ষমা চাই।
যদি না প্রহার করতে হঠাৎ এ দেহে কাঁটার বেতে ;
তা' হ'লে কি ভাই এত যন্ত্রণা তুমি অকারণে পেতে ?"

এই কথা শুনি' তাঁরে বুকে টানি' মম্বাজী বলে, "ভাই,
খুলে দেছ চোখ, উদার জগৎ দেখতে এখন পাই।
আমার গর্ব করেছ খর্ব,—বলিহারী তুকারাম !
নিতাইয়ের মত বিখ্যাত হোক ভারতে তোমার নাম।"

আজব কাণ্ড

বাঁ-দিকের ভীষণাকৃতি জানোয়ার-টিকে চিনতে পার ? ভীষণাকৃতি হলেও আসলে কিন্তু এটি কোনও জানোয়ার নয়,—ছোট্ট একটি পোকা,—আমাদের পরিচিত বোলতা ! ক্যামেরার সামনে বসিয়ে বড় করে ছবি তোলায় দেখতে এই রকম ভয়ঙ্কর লাগছে।

ডান পাশে ওটা কি দেখছ ? শুকনো পাতা বসানো একটা গাছের ডাল ? গাছের ডাল ঠিকই, কিন্তু ওর সবগুলোই পাতা নয়— ওর মধ্যে কতকগুলি আসলে প্রজাপতি জাতীয় একরকম পতঙ্গ। দেখতে অবিকল শুকনো পাতার মত। পাতার ভিতর এই ভাবে লুকিয়ে থেকেই এরা শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে।

ম্যাজিক শেখ

যাদুরাজ এস.ডি. মুখার্জ্জী

এই খেলাটার জন্য একটা ৬২০ ও একটা ১২০ কোডাক ফিল্মের এল্যুমিনিয়ামের বাক্স যোগাড় করতে হবে। উপরের ঢাকনার প্রয়োজন নেই, একটার ভেতরে আর একটা ঢুকে গেলেই চলবে। ফটোর দোকানে বা যাঁদের ফটো তোলার বাতিক আছে তাঁদের কাছেই এগুলি পাওয়া যাবে। এইবার একটা বড় পিন্‌কে ইংরাজী S অক্ষরের মত করে নিয়ে ভেতরের বাক্স অর্থাৎ ১২০ ফিল্মের বাক্সের একপাশে উপরের দিকে লাগিয়ে নাও ও প্লায়াস্‌ (সাঁড়াশী) দিয়ে চেপে বাক্সের সঙ্গে ভাল করে আট্‌কে নাও। তারপর ছোট বাক্সটা বড় বাক্সের ভেতর লুকিয়ে রেখে ও এস্‌ হুকের দিক্‌টা আঙ্গুলে চেপে আড়াল করে ধরে বাক্সটা দর্শকদের কাছে আন ও সাবধানে উল্টে দেখাও যে ভেতরে কিছুই নেই। তার পর দর্শকদের কাছ থেকে নয়া পয়সা বা পুরোনো আনি ইত্যাদি নিয়ে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে বাক্সটী ভর্ত্তি কর ও সকলকে দেখিয়ে ডান হাতে উঁচু করে তুলে ধর এবং বাঁ হাত নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখ। সকলের যখন বাক্সর দিকে নজর তখন বাক্স সমেত ডান হাতটা বাঁ হাতের পিছনে নিয়ে যাও ও এস্‌ হুক্‌টা জামার পেছনে আট্‌কে নিয়ে বড় বাক্সটা সামনে এনে ধর ও ছুঁড়ে দর্শকদের পরীক্ষা করতে দাও। দর্শকেরা যখন পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকবেন তখন আসল বাক্সটা পয়সা সমেত কৌশলে সরিয়ে ফেল। দর্শকেরা অবাক্‌ হয়ে ভাববেন, সত্যি, পয়সাগুলো গেল কোথায় ?

এই খেলাটি আরও নানা ভাবে দেখান যায় কিন্তু স্থানাভাবে তা উল্লেখ করলাম না।

বিলাতে কালো জামাকাপড় পরে ম্যাজিসিয়ানরা খেলা দেখান, তাই তাঁরা বাক্সটার রংও কালো করে নেন। কালোয় কালোয় মিলিয়ে যায় বলে খুব কাছে থাকলেও দেখা যায় না। আমরা সাধারণতঃ সাদা জামা-কাপড় পরেই খেলা দেখাই, কাজেই তোমরা ইচ্ছা করলে বাক্সটার রং সাদা করে নিতে পার।

যারা ম্যাজিক পছন্দ কর তাদের এই সুযোগে আর একটা খবর দিচ্ছি। ভাল করে ম্যাজিক শিখতে হলে যাদু-প্রতিষ্ঠান 'মায়াজাল' (১৩৫, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬)—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পার। প্রতি ইংরেজী মাসের ১ম শনিবার . বিকেলে আমাকেও ওখানে পাবে।

পল্টুর পরামর্শ

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

নয়া পয়সা চালু হবার আগের কাহিনী।

বাটুল গিয়েছিল বাজারে মাছ কিনতে। কুচো চিংড়ি দেড় টাকা সের। দাম শুনে লাফিয়ে উঠল বাটুল। কুচো চিংড়ির দাম এত ! কিছুতেই হতে পারে না।

কিছুতেই যে হতে পারে না তার প্রমাণ হাতে হাতেই সে পেয়ে গেল। একটি হিন্দুস্থানী মাছওয়ালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—কত করে সের হে ?

হিন্দুস্থানী মাছওয়ালা বলল—এক রূপাইয়া।

বাটুল বলল—বারো আনা করে দেবে ?

মাছওয়ালা বলল—লিজিয়ে বাবু !

সস্তায় মাছ পেয়ে বাটুল খুব খুশী। তিন আনা দিয়ে এক পো মাছ কিনে তাড়াতাড়ি সে বাড়ী ফিরল।

বাড়ীতে ঢুকতেই দেখা হল মেজদা'র সঙ্গে। কিন্তু মেজদা মাছ দেখে খুশী হবেন কি, বেরসিকের মত ধমক দিয়ে উঠলেন—শীগ্‌গীর ফিরিয়ে দিয়ে আয় এই মাছ। না হয় নর্দামায় ফেলে দে। এ পচা মাছ যে খাবে তার ঠাকুরদাদারও পেটের অসুখ করবে।

বাটুল তখন বাধ্য হয়েই মাছ নিয়ে বাজারে চলল।

তা'তেও কোন দুঃখ ছিল না। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখল হিন্দুস্থানী মাছওয়ালা নেই। মাছ বিক্রী শেষ করে চলে গেছে। গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাটুল। অগত্যা নর্দমাতেই মাছগুলো ফেলে দিল। এবার আর চিংড়ি মাছ নয়—ভাল দেখে পোনা মাছ কিনবে।

তিন টাকা সের পোনা মাছ। এক পো মাছ কিনে বারো আনা পয়সা বাটুল দিল মাছওয়ালার হাতে। মাছওয়ালা পয়সা হাতে নিয়ে তার থেকে একটা সিকি ফেরৎ দিয়ে বলল এ চলবে না বাবু, একেবারে মেকী।

মেকী ! চমকে উঠল বাটুল। তারপর হাতে নিয়ে নিজেই বোকা বনে গেল। সত্যি, সিকিটা একেবারে সীসেতে ভরতি। চিংড়ি মাছওয়ালা তাকে শুধু পচা মাছ দিয়েই ঠকায় নি, অচল সিকি দিয়েও ঠকিয়েছে।

বাটুলের এবার কান্না পেতে লাগল। পয়সাগুলো ফেরৎ নিয়ে মাছশুদ্ধ থলিটা সেখানে রেখে বলল—এটা রেখে দাও, পয়সা নিয়ে আসছি।

কিন্তু বাড়ী ফিরতেও লজ্জা করতে লাগল তার। কি করে আবার বাড়ী গিয়ে পয়সা চাইবে?

হঠাৎ পথে তার বন্ধু পল্টুর সঙ্গে দেখা। পল্টু জিজ্ঞেস করল—কি রে, অমন হাঁড়িমুখো হয়ে চলেছিস কোথায়?

—তোর কাছে চার আনা পয়সা হবে? বাটুল পকেট থেকে অচল সিকিটা বের করে দেখাল পল্টুকে। বলল—ত্যাখ্ মাছওয়ালার কাণ্ড!

সমস্ত ব্যাপারটাই খুলে বলল বাটুল।

পল্টু সিকিটা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর বলল,—হুঁ, এর জন্য ভাবছিস? এ সিকি ঠিক চলে যাবে। যা ঐ চানাওয়ালার দোকানে দু' পয়সার ছোলাভাজা কিনে নে। ঠিক সিকিটা নিয়ে নেবে চানাওয়ালা।

বাটুলের মাথায় এ রকম বুদ্ধি আগে খেলে নি। দু' পয়সার কেন, চার পয়সার ছোলাভাজা কিনতেও সে রাজী, যদি সিকিটা চালানো যায়। তাই তাড়তাড়ি চলে গেল চানাওয়ালার দোকানে। বেশ ভারিক্কী চালে বলল দাও তো চার পয়সার ছোলাভাজা!

দোকানদার চার পয়সার ছোলাভাজা একটা ঠোঙায় ভরে দিল বাটুলের হাতে। বাটুল বলল—ত্যাখ্ রে, কি গরম! টাটকা ভাজা।

পল্টু বলল—তাই নাকি? দেখি?—বলে একমুঠো ছোলাভাজা হাতে নিয়ে মুখে পুরে ফেলল।

বাটুল সিকিটা বের করে দিল দোকানদারের হাতে। কিন্তু দোকানদার তৎক্ষণাৎ সেটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল—বাবু, এ চলেগা নেই, একদম রদ্দি হ্যায়।

এদিকে পল্টু ততক্ষণে ছোলাভাজা আধাআধি শেষ করে এনেছে। বাটুল সেদিকে কাতর নয়নে চেয়ে চারটে পয়সা বের করে দিল দোকানদারের হাতে।

পল্টু বল্ল—সিকিটা চললো না? ঘাবড়াস্ নে। বাসে ঠিক চলে যাবে। ভিড়ের মধ্যে কন্ডাক্টার কি অত দেখবে? চল্ যাই, বাসে ঘুরে আসি ধর্ম্মতলা থেকে।

বুদ্ধিটা মন্দ নয়। বাটুলের মনে ধরল। অচল পয়সা চলে যাবে—বেড়ানোও হবে।

লোক-ভরতি একটা বাস্ আসছিল শ্যামবাজারের দিক্ থেকে। বাটুল আর পল্টু অনেক কষ্টে তা'তে উঠে বসল। এত ভিড় ঠেলেও কিন্তু কন্ডাক্টার পয়সা চাইতে ভুল করল না। বাটুল সিকিটা তুলে দিল কন্ডাক্টারের হাতে। কনডাক্টার

এত ভিড়ের মাঝেও পয়সাটা হাতে ঘষে তারপর চোখের সামনে নিয়ে দেখল। তারপর বাটুলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল,—দোস্রা দিজিয়ে বাবু!

একজন যাত্রী পেছন থেকে বলে উঠল—ভিড়ের মাঝে অচল পয়সা চালাবার মতলব?

কথা শুনে বাটুলের চোখমুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। দু' কান দিয়ে বের হতে লাগল গরম বাতাস। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পয়সা বের করে কন্ডাক্টারের হাতে দিয়ে দিল। দু'টি টিকিটের দরুণ খরচ হয়ে গেল চৌদ্দটি পয়সা।

ধর্ম্মতলায় নেমে পল্টু বলল—বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি রে! যে ভিড় বাস্টার মধ্যে! দম ফেলবার যো নেই।

কাছ দিয়েই একটা আইস্ক্রীমের গাড়ী যাচ্ছিল। সে দিকে তাকিয়ে পল্টু বলল আইসক্রীম খাওয়া রে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

লজ্জায় আর অপমানে বাটুলেরও গলা শুকিয়ে এসেছিল। আইসক্রীম খেতে তারও ইচ্ছে হ'ল খুব। দুটো আইসক্রীম খেতে খরচ হয়ে গেল চার আনা। এবার আর সেই সিকিটা দিতে সাহস করল না বাটুল। হাতে ওঠাতে গিয়েই কি রকম বাধ বাধ ঠেকল।

আইসক্রীম খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে উঠল দু'জনেই। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। বাটুলের মুখ আবার শুকিয়ে এল। বলল—এখন তো আছে শুধু দুটো পয়সা আর সেই অচল সিকিটা। কি করে বাড়ী ফিরবে এখন?

পল্টু বলল—কেন, বাসে! ঐ সিকিটাই ফের দিবি। শেষ চেষ্টা এবার করতে হবে। যদি না চলে তবে হেঁটেই যাবো বাস্ থেকে নেমে।

বাটুল বলল—সর্ব্বনাশ, এতটা রাস্তা হাঁটতে হবে? পল্টুও এবার সুর পালটে ফেলল। নরম গলায় বলল কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কি বল্?

বাস্তবিক, এ ছাড়া আর কোন উপায় বাটুলের মাথায় খেলল না। গাড়ীতে উঠবার আগেই বাটুল সিকিটা পল্টুর হাতে দিয়ে বলল—তুই-ই এটা কনডাক্টারের হাতে দিবি। আমার দিতে আর সাহস হচ্ছে না।

খুব ইচ্ছে না থাকলেও পল্টু হাত বাড়িয়ে সিকিটা নিল।

বাসে উঠে বাটুল চুপ। বুক দুর দুর করছে। হঠাৎ হুড়মুড় করে এক লটবহর মালপত্র নিয়ে একটা লোক এসে পড়ল তার ঘাড়ের উপর। সে উহু করে উঠবার আগেই কন্ডাক্টার হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল—হটাও, হটাও, এত্তা মাল গাড়ীমে নেই যায়েগা। ঠেলামে লে লেও।

অনেক তর্কাতর্কির পর মালের জন্য লোকটার কাছ থেকে কষে বেশী ভাড়া আদায় করে কন্‌ডাক্‌টারের মনটা খুসী হয়ে উঠল। গলা ছেড়ে একটা হিন্দী গান গাইতে গাইতে সে পল্‌টুর কাছে এসে ভাড়ার জন্য হাত বাড়াল। পল্‌টু মুখ গম্ভীর করে অন্য দিকে চেয়ে সিকিটা বের করে দিল পকেট থেকে। শুধু বলল—শ্যামবাজার, দু' টিকিট।

কন্‌ডাক্‌টারের মনটা তখনও সেই হিন্দী গানের পেছনে পেছনে ঘুরছিল। সিকিটা ভাল করে না দেখেই সে ব্যাগে রেখে দিল। দুটো পয়সা ফেরৎ দিয়ে দুটো টিকিট দিয়ে দিল পল্‌টুর হাতে।

বাস্ থেকে নেমে পল্‌টু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল - কি রে, বলেছিলাম না বাসে ঠিক সিকিটা চলে যাবে?

কিন্তু বাটুলের মনটা হঠাৎ দমে গেল। বাজারে মাছওয়ালার কাছে মাছশুদ্ধ তার থলিটা যে এখনো পড়ে আছে। আর পয়সা? পকেট হাতড়িয়ে দেখল—মাত্র দুটো পয়সা আছে পকেটে। আর দুটো পয়সা আছে পলটুর কাছে। বারো আনা পয়সা খরচ হয়ে গেছে অচল সিকিটা চালাতে গিয়ে।

পল্‌টু বলল—তোর কাছে পয়সা আছে রে? ঐ ত্যাখ্, কেমন গরম গরম তেলেভাজা বিক্রী হচ্ছে। খাওয়া না চার পয়সার। একটা অচল সিকি চালিয়ে দিলাম তোর।

বাটুল কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল- আর যে মাত্তর দুটো পয়সা আছে!

পল্‌টু বলল—ও', মাত্র দুটো পয়সা আছে? তা-ই দে। আমার কাছেও আছে তোর দু' পয়সা।

বাটুলের কাছ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে পলটু বলল- এখান থেকে কিনবো না রে! আমাদের পাড়ায় খুব ভাল একটা তেলেভাজার দোকান আছে, সেখান থেকেই কিনে খাবো। আচ্ছা আসি—

রাস্তাটা পার হয়ে চলে গেল পলটু। বাটুল ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে চেয়ে রইল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

শ্রীশিবপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন কালে এক ব্রাহ্মণ ঋষির দুই স্ত্রী ছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ-কন্যা ও অপর জন শূদ্রা। যথা সময়ে দুই স্ত্রীর দুই ছেলে হলো। ক্রমে ক্রমে তাদের শিক্ষার সময়ও ঘনিয়ে এলো। তখনকার দিনে যজ্ঞস্থলে বসেই শিক্ষা দেওয়া হতো। সুতরাং মায়েরা শিক্ষা দেবার জন্যে ছেলেদের যজ্ঞস্থলে পাঠিয়ে দিলেন তাদের পিতার কাছে। ঋষি কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যার ছেলেটিকেই কেবল আদরযত্ন করে শিক্ষা দিতে লাগলেন, শূদ্রা স্ত্রীর পুত্রকে তো শিক্ষা দিলেনই না, বরঞ্চ তাড়িয়ে দিলেন।

ছেলে মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে এসে বললে—"মা, বাবা যেন আমাকে চিনতেই পারলেন না! তা হ'লে আমার শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে?"

মা বললেন—"তোমার পিতাই যখন তোমাকে অগ্রাহ্য করলেন তখন কে আর তোমার শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন? আচ্ছা, আমি তো শূদ্রা অর্থাৎ পৃথিবীর কন্যা, তবে আমার মা বসুন্ধরাকেই একবার ডেকে দেখি!" এই বলে তিনি মাতা পৃথিবীকে কাতর ভাবে ডাকতে লাগলেন।

মেয়ের ডাকে মাতা বসুন্ধরা এসে বললেন—"ভয় নেই, সব জ্ঞানই তো আমার মধ্যে আছে, দাও ছেলেকে আমার হাতে, আমিই তাকে সুপণ্ডিত করে দেব।"

মা বসুন্ধরা ছেলেকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পিতার অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে, সেই ছেলে ঋগ্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থ রচনা করলেন এবং শূদ্রার অর্থাৎ ইতরার ছেলে বলে নিজের নাম রাখলেন—ঐতরেয়। তখন থেকে ঐতরেয় রচিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম হলো—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। এই গ্রন্থ না পড়লে কোন পণ্ডিত জ্ঞান-পিপাসুই ঋগ্বেদে প্রবেশ করতে পারেন না।

ছড়া

শ্রীআনন্দগোপাল বিশ্বাস

কালো কালো মেঘগুলি
আকাশের গায়
বাতাসের তাড়া খেয়ে
কোথা ছুটে যায়?

পাইনের কচি পাতা
শিলঙের বনে—
তাই খেয়ে ফিরে আসে
খুসী ভরা মনে।

দ্রষ্টব্য: "যে গল্প জানা নেই" বারোয়ারী উপন্যাসটির জন্য এবারেও কোন ভাল (ছাপবার উপযোগী) লেখা পাওয়া যায় নি। রামধনুর মান অনুযায়ী লেখা এলে তবেই তা ছাপা যেতে পারে।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

প্রতি বছর এই সময়টা বাৎসরিক পরীক্ষা নিয়ে তোমরা সকলেই প্রায় ব্যতিব্যস্ত থাক, কিন্তু এবার মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নতুন নিয়ম জারী করায় তার ব্যতিক্রম ঘটল। ব্যাপারটা ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল এই প্রশ্ন তুলেছ অনেকেই। কিন্তু যা ঠিক হয়ে গেছে—যার আর রদ-বদল হচ্ছে না—এখন তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? কয়েক বছর পরে দেখবে এইটেই হয়তো স্বাভাবিক মনে হবে।

কিন্তু পরীক্ষা-টরীক্ষা ও সব হ'ল অপ্রিয় কথা—ও তোলা থাক স্কুলের জন্য; এস, আপাততঃ দু'টো ভাল গল্পগুজব করা যাক্। তোমাদের চিঠির থলি খুলেও দেখা যাক্ কার চিঠির কি জবাব দেওয়া যায়। তার আগে একটা সুখবর দিয়ে নেই। গত বছর (১৯৫৬) UNESCO থেকে জাপানে আন্তর্জাতিক শিশুদের একটা চিত্র-প্রতিযোগিতা হয়। শ্রীমান্ শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাতে ৭ বছরের গ্রুপে পুরস্কার (একটি চমৎকার এম্‌বস্ করা পদক) ও বিশেষ প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট পেয়েছে। সেই সঙ্গে পুরস্কৃত ছবিগুলির একটি য়্যাল্‌ব্যামও পেয়েছে। ঐ য়্যাল্‌ব্যামে তার ছবিটিও ছাপা হয়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ বিভাগে আর কোন ছেলেমেয়ে পুরস্কার পায় নি। ইতিপূর্ব্বে শঙ্করস্ উইক্‌লী পরিচালিত সামনে-বসে-ছবি-আঁকার প্রতিযোগিতায়ও সে পুরস্কার পেয়েছিল। শ্রীমান্ শুভঙ্কর হচ্ছে রামধনুর বন্ধু ও তোমাদের প্রিয় লেখক শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র।

চিঠির জবাব : শ্রীআনন্দমোহন বিশ্বাস (দহকুলা)—কবি সুনির্মল বসুর "ছন্দের টুং টাং" বইটির প্রকাশক ছিল বাগচী এণ্ড সন্স। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি এখন নেই। বইটিও, যতদূর জানি, ছাপা নেই। বহু বছর আগে রামধনুর ছাপাখানাতেই বইটির নতুন একটি সংস্করণ ছাপা সুরু হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশক অসুস্থ হওয়ায় ছাপা বন্ধ করে দেন। শ্রীসর্ব্বেশ্বর সাহু (খাগরাগেরিয়া)—অনেকগুলি প্রশ্ন করলে এক সঙ্গে জবাব দেওয়া যায় কি? যে সব ধাঁধায় লেখকের নাম থাকে না সেগুলো সম্পাদকীয় বিভাগ থেকেই প্রস্তুত বলে ধরে নিতে হবে। অন্য কেউ তৈরী করলে তার নাম প্রকাশ করা হয়। তরুণ গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখায় উৎসাহ দেবার জন্যই "ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক" বিভাগটি। অপর লেখকদের জন্য তো পত্রিকার বাকি সমস্ত পাতাই পড়ে রয়েছে। তবে গ্রাহকেরা যে-কোন লেখা পাঠালেই কি আর তা তাদের বিভাগে ছাপা যায়? লেখা নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী হলে তবেই তা ছাপার প্রশ্ন ওঠে; এবং লেখার ভিড় থাকলে, মনোনীত হলেও বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করতে হয়। শ্রীপ্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—তোমার কথা মত "পুরানো পাতা" বিভাগটি চালু রাখবার ইচ্ছা আছে—বিশেষ করে যে সব পুরানো গল্প এখন কোন বইএ পাওয়া যায় না সেগুলোর

পুনর্মুদ্রণ পাঠকের কাছে লোভনীয়ই হবে মনে হয়। তোমার লেখাগুলো বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে অনুরূপ কয়েক হাজার লেখার সঙ্গে। শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী (জাগলগড়ী)—তুমি রোজ যাওয়া-আসায় ১০ মাইল হেঁটে স্কুল কর! বল কি? এখানকার ছেলেরা তো দেখি ৫।১০ মিনিটের পথ হলেই বলতে চায়—'ওরে বাবা, অতটা কে হাঁটবে? ট্রামে ওঠ বা বাসে চল।' ব্যায়াম বিষয়ে প্রবন্ধ শীগ্‌গিরই দেব। শ্রীপ্রণতি ভট্টাচার্য (চন্দননগর)—মনে হচ্ছে তোমার রামধনু নিয়মিত ভাবে পথে হারাচ্ছে। ডাক বিভাগে এ বিষয়ে অভিযোগ করবে। আমরাও ব্যবস্থা করছি। শ্রীদ্বিজমণি সিংহ (শিলচর)—শ্রীশামুক ছদ্মনাম বৈ কি। ছদ্মনাম সম্পর্কে রামধনুতে এর আগে বহু আলোচনা হয়েছে। সুযোগ পেলে যোগাড় করে নিয়ে পড়ে দেখো। জওহরলালজী যে বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকদের একজন বলে প্রায় সকল দেশেই স্বীকৃত হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে কে সবচেয়ে বড় সেটা দেশ, কাল এবং ব্যক্তিগত মতামতের ওপর নির্ভর করে। নোবেল পুরস্কার আজকাল এমন সব লোক পাচ্ছেন যে মনে হয় ওর মধ্যেও রাজনৈতিক মতবাদই প্রাধান্য লাভ করছে। শ্রীসুশান্ত লাহিড়ী (নিউদিল্লী)—বিদেশী ভাষা শেখা সম্পর্কে ঐ সব দেশের 'এম্‌ব্যাসী' থেকে সাহায্য পেতে পার। ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে দেখ না। কিছু দিন আগে "সোভিয়েট দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে রুশ ভাষা (বাংলার মাধ্যমে) শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। রুশ ভাষা শিখতে হলে সেগুলো যোগাড় করবার চেষ্টা ক'র। শ্রীঅমলকুমার মিত্র (কলিকাতা)—তোমার শোকবার্তাবাহী চিঠিখানা ডাকের গোলমালে আমাদের হাতে পৌঁছতে এত দেরী হয়েছে যে বলবার নয়। গৌহাটীর শরদিন্দুবিকাশ দাস রামধনুর একজন কত বড় উৎসাহী গ্রাহক ছিল তা আমি জানি। ব্যক্তিগত ভাবে তার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও চিঠিতে তার সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তার প্রিয় 'পরশমণি' কাগজ নিয়ে সে আমার কাছে নানান্ পরামর্শ চাইত। সে যে এত অকালে পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারে তা যেন ভাবতেই পারছি না! তার আত্মীয়-বন্ধুদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। ভগবান্ শরদিন্দুর আত্মাকে শান্তি দিন।

আজ এখানেই চিঠি শেষ করি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। ইতি—রাঃ সঃ

শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি

শ্রীনীলরতন দাশ

জন্ম ৭ই কার্তিক, ১৩০৪ সাল। জন্মস্থান—মহাদেবপুর (রাজসাহী)।

১৯১৬ সালে সরকারী বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২০ সালে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করেন ও নওগাঁ মহকুমা হাই স্কুলে শিক্ষাব্রতী রূপে কর্মজীবন সুরু করেন। ১৯২৬ সালে মহাদেবপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং এখনও সেই পদেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

দীর্ঘদিন যাবৎ সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। প্রধানতঃ শিশুসাহিত্যে, তবে বড়দের জন্যও (প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বঙ্গশ্রী প্রভৃতি পত্রিকায়) লিখেছেন। ছোটদের প্রায় সব

পত্রিকায়ই এঁর অসংখ্য লেখা - কবিতা ও প্রবন্ধ বেরিয়েছে এবং এখনও বেরোচ্ছে। এর মধ্যে শিশুসাথী, রামধনু, শুকতারা, কিশোরকিশোরী, জয়যাত্রা, যুগান্তর ও আনন্দবাজারের ছোটদের বিভাগ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। কবিতার হাত এঁর সুন্দর।

বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে থাকেন এবং সেখানকারও আজাদ, ঢাকাপ্রকাশ, ইমরোজ, সওগাত, শিশুসওগাত প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ক)	পা	তা	ল	খ)	জী	ব	ন	গ)	নূ	পু	র	ঘ)	বি	ছা	না
	তা	জ্জ	ব		ব	ম	ন		পু	ল	ক		ছা	গ	ল
	ল	ব	ণ		ন	ন	দ		র	ক	ম		না	ল	ক

উত্তরদাতাদের নাম: যাঁরা নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন—রূপা চৌধুরী (কলিকাতা-৪০); সুধাংশুগোপাল মণ্ডল (কলিকাতা-১৫); কল্যাণ কীর্ত্তি (এলাহাবাদ); চম্পা, সুমিত্রা, জয়ন্ত, সুকুদা ও বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা-৪০); সুচেতা, রত্নাবলী ও মনোরমা দেবী (কলিকাতা-২৫); সভ্যবৃন্দ, শক্তি-পীঠ (দেউলপুর); মন্দিরা চক্রবর্ত্তী (নিউদিল্লী); শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা-১২); আবুল ফজল (রাজসাহী); কমলা, বিমলা ও অতুল (পাটনা); শ্যামা ও মিত্রা (বোম্বাই); জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত (পুনা); কানু, মোহন, গোপী (কলিকাতা-২৬); প্রণতি ভট্টাচার্য (চন্দননগর); যাঁদের আংশিক শুদ্ধ হয়েছে—দিলীপ সমাজদার (কলিকাতা-১২); জয়শ্রী, রূপশ্রী ও শ্যামশ্রী সেন (বনারস); অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর); অজয়কুমার মাল (দেউলপুর)।

নূতন ধাঁধা

নীচের শূন্য স্থানগুলি একটি করে ফলের নাম দিয়ে পূর্ণ করলেই লেখাটি পড়া যাবে। চেষ্টা করে দেখ তো:—

মেঠো পথে এ— চলেছি। —া হলেও এধারে রোদ —উ ক্ষেত দু'ধারে। —ড়া দেয় নি এখনও, স— ফেলা হয়েছে। হঠাৎ দেখি —ক্ক আসছে! গায়ে —া নেই, মনে হ'ল খা—পড়ি মাথায়। কাছে এলে দেখি তা নয়, এক —ল্লিকা। বল্লে দাদা, পথ ভর্ত্তি -টবহর নিয়ে চলাই দায়। — ঢালা পথ নয় তো! বল্লাম, একজন —কে নিলেই পারতে, এ তো সোনার— নয়, কিই — এর! ও বল্লে, সো— —াসে পড়তে পারে লোক বিশেষে। তা ছাড়া —রা তো ধনী নই তোমার মত! হেসে বলি, — ই বল, বিল - সত্যি বলেছ! ও-ও জবাব দেয়, আরে রা— যে কথা ব'ল না। — গুড়ির;সবাই তাই বলে।

লে খা চা ই

অভিনব কিশোর-মাসিক; বার্ষিক সডাক ২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১৷০, প্রতি সংখ্যা ৵০। কার্ত্তিক (৭ম) সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে "যেই ভকত, সেই জানে" শিশু-উপন্যাস বাহির হইতেছে। নবীন লেখক-লেখিকাদিগকে লিখিতে উৎসাহ দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। ছোটদের 'লেখা' ব্যতীত, বড়রাও লিখিয়া থাকেন। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমলকুমার মিত্র, যাদুশ্রী শঙ্কর দাস, প্রভৃতিও ইহাতে লেখেন। আগামী বৈশাখ হইতে ২য় বর্ষ আরম্ভ হইবে, কলেবর বর্দ্ধিত হইবে ও বার্ষিক চাঁদা ৩ টাকা হইবে। এখনই গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইলে, অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না।

ঠিকানা:— শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, বি-টি, সম্পাদক, "লেখা চাই", দেবালয়—২৪ পরগণা।

চ য় ন

রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ (হিন্দুস্থান মার্টের সন্নিকটে)

সব রকম বই—বিশেষ করে রামধনু পত্রিকা (যে কোন সংখ্যা) এবং রামধনু কার্যালয় থেকে প্রকাশিত সব রকম বই আমাদের কাছে পাওয়া যাবে।

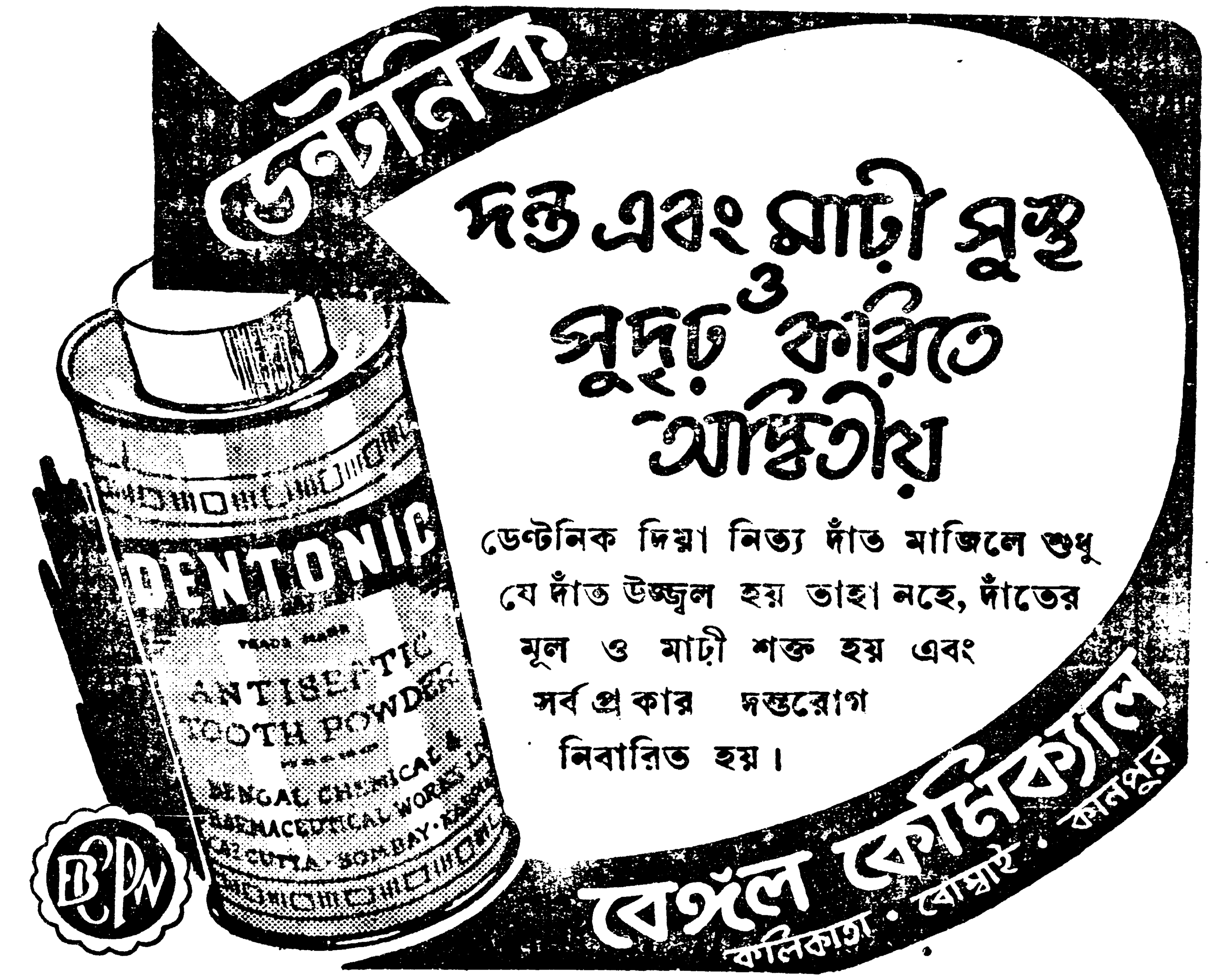

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার-দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও যাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি.এ

সুরিনা স্পেশাল
কালি

আপনার কলমের জন্য উজ্জ্বল রাখে!

সুরিনা কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ • কলিকাতা

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে

অতুলনীয়

লক্ষ্মী ঘি

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্ব্বত্র সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন-২২-৭২৪৩

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৵০

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES by A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২॥০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১।	নব পত্রিকা	— ৪৲
২।	জয়যাত্রা	— ৪৲
৩।	দেবালয়	— ৪৲
৪।	ইন্দ্রধনু	— ৪৲
৫।	বসুধারা	— ৪৲
৬।	পরশমণি	— ৪৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸০

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥০

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ।৵০

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানি বই]

এবার পুজায় বাহির হইল

১। যত হাসি ততই মজা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী— ২৲
২। পূজার দিনের উপহার—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা, ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

Regd. No. C— 1641

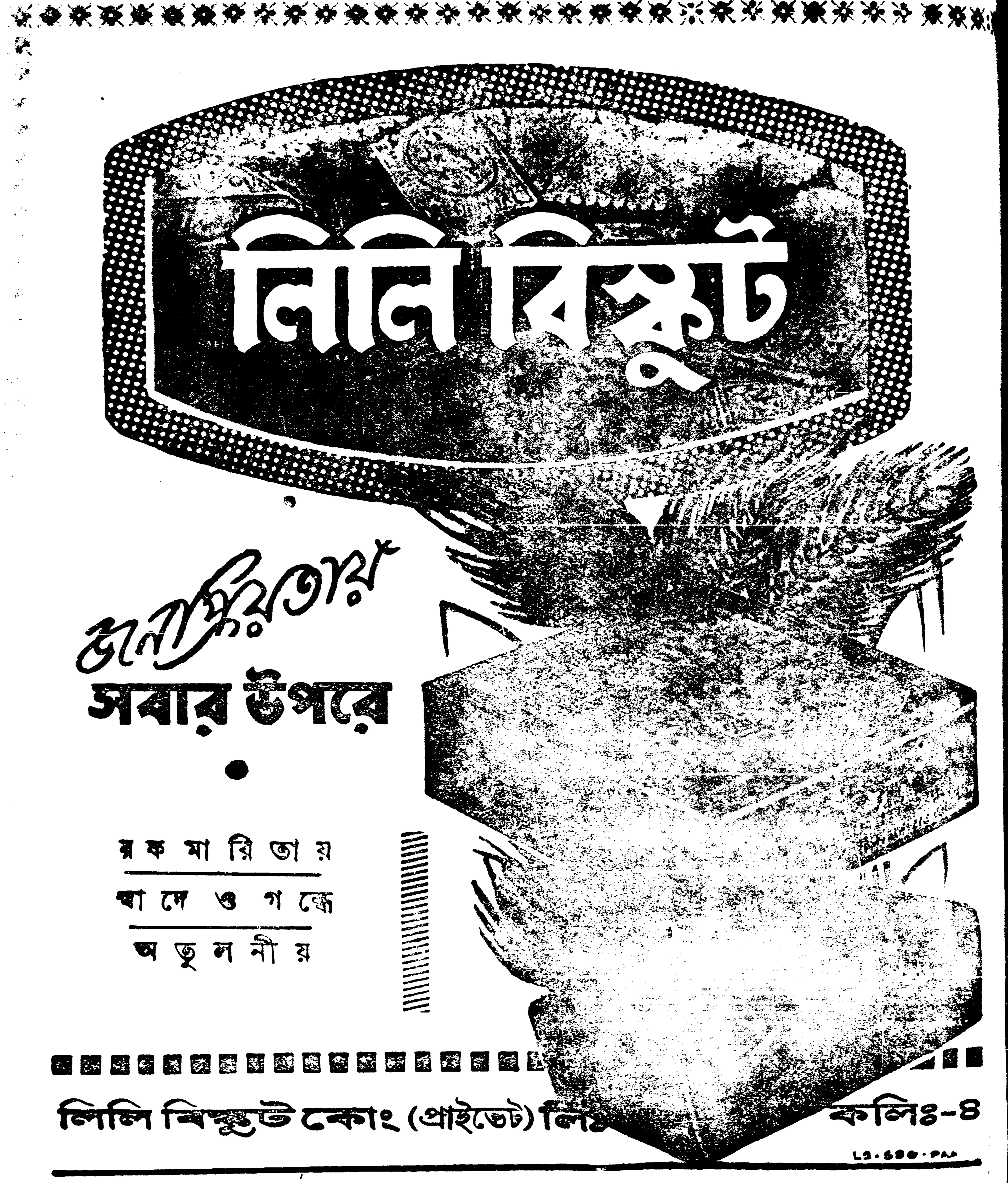

রামধনু

সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

বার্ষিক ৪ টাকা
ষাণ্মাসিক টা. ২.২৫
প্রতি সংখ্যা ৩৭ন প.

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন–৩৫–২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২॥০, /৫, ১৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

ছোটদের ভাল ভাল বই ঃঃ নামকরা বই

নলীগোপাল চক্রবর্ত্তীর

কাঠ ও কাঠের কাজ	১॥
বাঁশ, বেত, পাতা ও সোলার কাজ	১৲
তন্তুশিল্পের কাজ	১৲

আলোক চক্রবর্ত্তীর—

মনসামংগল	১৲
চৈতন্যমংগল	১৲
কুমারসম্ভব	১৲

শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তীর—

রঘুবংশ	১৲
রাণী রাসমণি	১৲
জাগ্রত মেদিনী	১৲

ছোটদের অভিনব মাসিক পত্রিকা

চয়নিকা

১৮ বছরে পড়ল : বার্ষিক মূল্য মাত্র ৩৲

যে কোন মাসে টাকা পাঠালেও বৈশাখ থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক হতে হয়। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা মাত্র ।০ আনা। অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গ ও সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

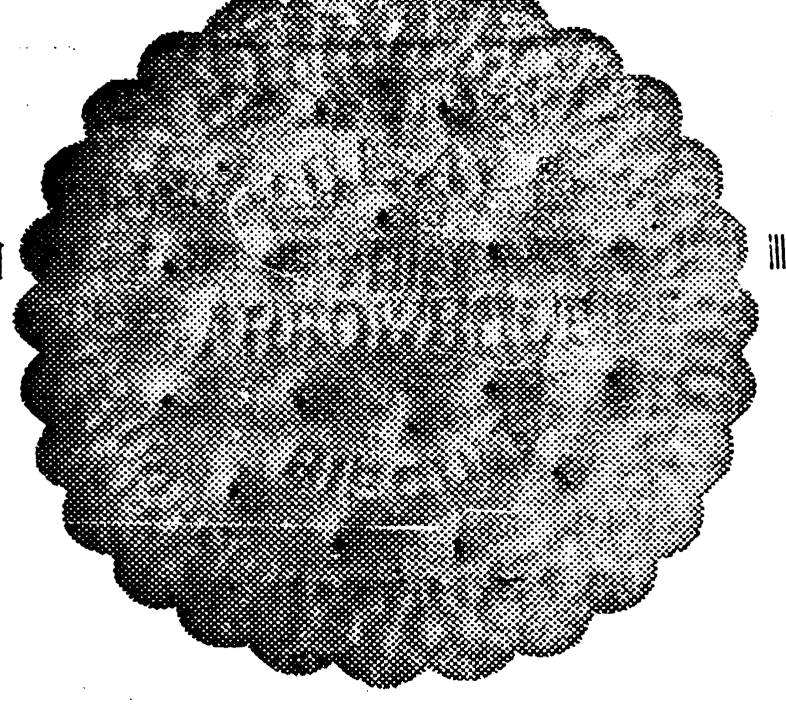

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
‘থিনের’ মধ্যে ; গুনে, স্বাদে সবার সেরা “কোলে”

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু “থিনই” নয়,
সবরকমের “কোলে বিস্কুটেই” সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

উৎসবে ছোটদের শ্রেষ্ঠ উপহার

পথের পাঁচালীর অপরাজেয় কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। মানুষের বসতি হইতে দূরে যেখানে নিবিড় অরণ্য—বিচিত্র পত্রপুষ্প-শাখা-পল্লবের দেশ—পশুপক্ষীর ন্যায় মানুষও যেখানে প্রকৃতির দোসর - তাহারই মনোহর কাহিনী। ছোটদের বোধগম্য ভাষায় অপূর্ব্ব সচিত্র উপন্যাস

ছেলেদের আরণ্যক ৩·০০

বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রশংসা-প্রাপ্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বুনো ওল বাঘা তেঁতুল', 'কেমন জব্দ'. 'সেয়ানে সেয়ানে' আর 'জয় পরাজয়'—শিবাজীর জীবনের চারটি চমকপ্রদ ঘটনা লইয়া লেখা ছত্রপতি শিবাজীর জীবন চরিত।

শিবাজী মহারাজ ১·০০

শিবাজীর জীবনের এই ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাগুলি উপন্যাসকেও হার মানাইয়াছে।

রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনায় যশস্বী ক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থের লেখা

রাজা-উজিরের কথা ০০·৫০

যেমন মা ছাড়া শিশুর ডাক হয় না, তেমনি রাজা ছাড়া কোন দেশ হয় না। আগের দিনের রাজা আর তাঁর উজিরের কাজ এবং আজকালকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্য শাসনের কথা সহজ সরল ভাষায় ছোটদের জন্য এই প্রথম প্রকাশিত হইল। বাংলা ভাষায় এই ধরণের বই আর নাই।

রঙিন কালীতে ছাপা মরমী কবি মোহিতলাল মজুমদারের ছোটদের জন্য লেখা

রূপকথা ১·০০

বিখ্যাত শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষ দাস্তিদারের অঙ্কিত ছবি পাতায় পাতায়। উপহারের অপরিহার্য বই।

তামসরঞ্জন রায়ের

স্বামী বিবেকানন্দ ১·৫০

"স্বাধীনতা লাভের চেয়েও যে মানুষ হওয়া বড় কথা আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিতেছি। ··· আজ তাই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ দেশের সম্মুখে আবার ধরিতে হইবে। ইহা ভিন্ন মুক্তির অন্য কোন পথ নাই। এই কারণেই গ্রন্থখানি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলিয়া মনে করি।" বলিয়াছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।

বিখ্যাত লেখিকা বাণী রায়ের লেখা

হাসি কান্নার দিন ১·৫০

একটি বালিকা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া কয়েকজন ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীর দৈনন্দিন জীবনের স্বপ্ন-কল্পনাই এই বইয়ের উপজীব্য। কিশোরী জবনের আনন্দ ও নিরানন্দের কাহিনী।

আমাদের নূতন বিক্রয়-কেন্দ্র

জেনারেল বুকষ্টল

এ-৬৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদ—

এক ঝলক হাসি

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৬৪ { ৯ম সংখ্যা

ঘুম পাহাড়ের বাড়ী

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

ঘুম পাহাড়ের মাথার উপর
সেন সাহেবের বাড়ী,
পথের ধারে আকাশ-ছোঁয়া
পাইন গাছের সারি।

চারদিকে তার ফুলের বাগান—
নামটি 'সেনাবাস',
মাটির বুকে আলু, কপি,
মটর-সুঁটির চাষ।

সাপের মত এঁকে বেঁকে
পথটি গেছে নেমে,
রেল লাইনের ধারে এসে
থমকে গেছে থেমে।

পিঠে বোঝা পাহাড়িয়া
ছোট্ট মেয়ের দল
ঢেউ-খেলানো পাহাড়-পথে
চলছে অবিরল।

পাহাড় থেকে নীচের দিকে
যতই দেখি তত
সব মনে হয় খেলাঘরের
পুতুল খেলার মত।

দার্জিলিং এর সহরখানি
স্বপনপুরী হেন,
দূরের থেকে কাছে যেতে
হাতছানি দেয় যেন।

কোন্ সুদূরে বাড়ী ওদের—
কোন্ পাহাড়ের পারে—
কে জানে কোন্ সহরতলীর
পাইন-বনের ধারে!

ঝক্ ঝকা ঝক্ শব্দ ক'রে
ছোট্ট রেলের গাড়ী
এগিয়ে চলে পিছিয়ে চলে—
দেখতে মজা ভারি।

নীল আকাশে সকাল বিকাল
ছুপুর সন্ধ্যাবেলা
মেঘের সাথে সুয্যিমামার
লুকোচুরি খেলা।

দম্‌কা হাওয়ায় মাঝে মাঝে
ফগের রাশি যত
কাপড়-জামা ভিজিয়ে বেড়ায়
দস্যি ছেলের মত।

ধ্যানে মগন গিরিরাজের
তুষারকিরীট মাথে,
উদয়ভানু প্রণাম জানায়
প্রতিটি দিন প্রাতে।

সবুজ শ্যামল পাহাড়গুলি
আকাশ মায়ের বুকে
হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে
স্বপন-ভরা সুখে।

বাতাসিয়া লূপের থেকে
পাগ্‌লা বাতাস এসে
পাইন গাছের চামর দোলায়
সবুজ হেসে হেসে।

রামধনু রং প্রজাপতি
ফুল ফোটাতে চায়,
হিমেল হাওয়ায় ফোটা ফুলের
গন্ধ ভেসে যায়।

ঘুম পাহাড়ী পাখীরা গায়
ঘুম-পাড়ানি গান,
ছন্দমধুর সে গান শুনে
আকুল করে প্রাণ।

হাল্‌কা হাসি, আনন্দ আর
শান্তি দিয়ে ঘেরা—
ঘুম পাহাড়ের সেই বাড়ীটি
সকল বাড়ীর সেরা।

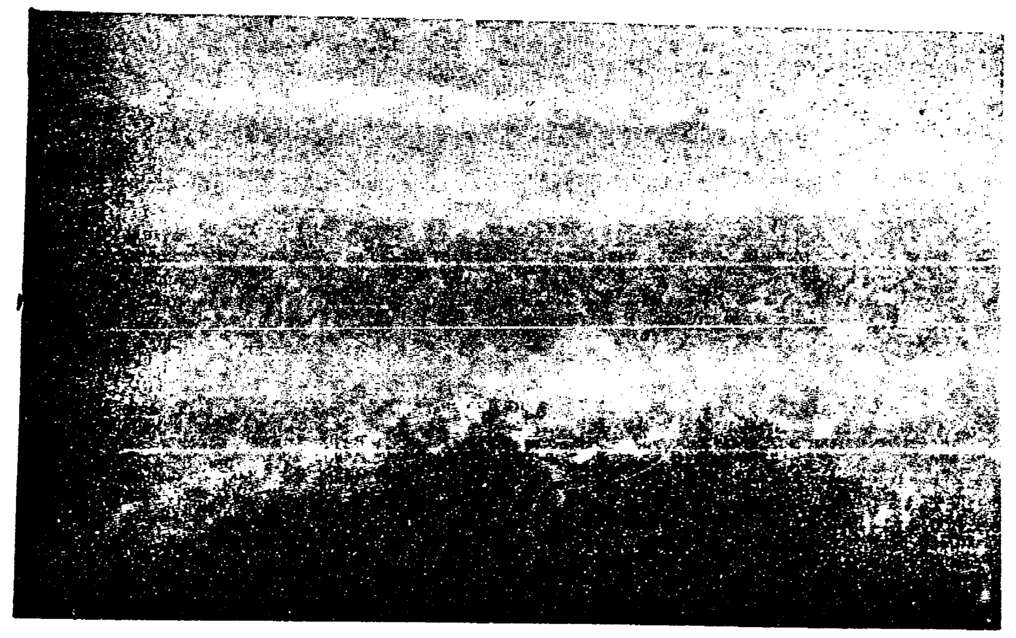

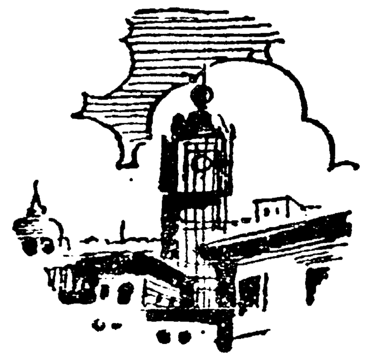

৩

আমাদের গ্রাম থেকে রাণাঘাট সহর প্রায় মাইল দশেক দূরে, কিন্তু আজকাল বাস্ সার্ভিস হয়েছে, কাজেই আসতে কোনও অসুবিধা নেই। ষ্টেশনের বাইরে এসে নরহরির চায়ের দোকান খুঁজে বার করতে দেরী হোল না। দোকানের মালিক নরহরি পোদ্দার তখন নিজেই ছিলেন। তিনি বললেন, মশাই, চায়ের দোকানে প্রতি মিনিটে কত রকম লোক আসছে, কত রকম লোক যাচ্ছে—তাদের সকলের কথা মনে রাখা কি সম্ভব? এই রাণাঘাট সহরে যাদের সঙ্গে দু'বেলা দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে তাদেরই কথা মনে রাখতে পারি না, এ তো একটা বাইরের লোক!

দোকানের যে ছোকরাটি চা এনে দেয়, সে বললে, দাঁড়ান—দাঁড়ান, মশাই! মাথায় টাক, চুল ঝঁকড়া, রোগা মতন লোক? খুব ঝগড়াটে? এসেছিল বটে ৪।৫ দিন আগে, —আরও বার কয়েক এসেছিল তার আগে। মাঝে মাঝে তো দেখতাম তাকে এই সোজা রাস্তা ধরে নদীর ঘাটের দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দার্জিলিঙ চা না আসাম চা এই নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছিল সে দিন। কর্ত্তা সেদিন ছিলেন না দোকানে।

বললাম, কোথায় থাকে সে লোকটা জানো কিছু?

না মশাই, তা কি করে জানবো? কেন, কিছু নিয়ে লম্বা দিয়েছে নাকি? কিন্তু সে রকম তো মনে হয় না!

আর কোনও খবর পাওয়া গেল না। সত্য কথাই তো! রাণাঘাট সহরে এত লোকের যাতায়াতের মধ্যে একটা অপরিচিত লোকের সন্ধান কে রাখতে যাবে এবং কেনই বা রাখতে যাবে?

নরহরির দোকানে এক পেয়ালা চা খেয়ে উঠলাম। কোথায় যাই? সামনেই ষ্টেশন। এসে বসলাম। মহাশব্দে এসে দাঁড়ালো লালগোলা প্যাসেঞ্জার। মনে মনে ভাবলাম, লোকটা বলেছিল নবদ্বীপের কাছে তার বাড়ী ছিল, টোলের পণ্ডিতিও করেছিল কিছুকাল। তবে কি একবার খোঁজ নিয়ে দেখবো নবদ্বীপে? সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লালগোলার ট্রেন, তাতে যদি উঠে বসি, তিন-চারটে ষ্টেশন পরেই কৃষ্ণনগর। সেখানে নেমে নবদ্বীপ ঘাট যাওয়ার ছোট রেল আছে, দূরও খুব বেশী নয়। তবে কি একবার দেখবো সেই চেষ্টা করে?

পঞ্চানন্দ দেবকে যে পরশুরামই চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে, এর অবশ্য কোনও প্রমাণই নেই। কিন্তু আমার মনের মধ্যে কেবলই সন্দেহ হচ্ছে যে এ কাজ সে ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। এতকালের বিগ্রহ—হঠাৎ পরশুরামের আবির্ভাব হোল আমাদের বাড়ীতে, বিগ্রহের সম্বন্ধে তার কৌতূহলটাও বোধ হয়েছিল যেন অস্বাভাবিক রকমের,—তারপর কয়েকদিন পরেই হঠাৎ সেই বিগ্রহের অন্তর্দ্ধান!—আমার মন বলছে এ সব ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। সেই জন্যই পরশুরামের উপর আমার সন্দেহটা হয়ে গিয়েছে বদ্ধমূল।

কৃষ্ণনগরের একখানা টিকিট কেটে উঠে পড়লাম ট্রেনে। ওখান থেকে ছোট রেলে নবদ্বীপ ঘাট বেশী দূর নয়। আট মাইল মাত্র।

ছোট্ট ষ্টেশন, কিন্তু চমৎকার জায়গা নবদ্বীপ ঘাট। ষ্টেশনের পেছনেই জলাঙ্গী এসে মিশেছে গঙ্গায়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। জলাঙ্গীর নীল জল আর গঙ্গার ঘোলা জল যেখানে সম্মিলিত হয়েছে, সে একটা চমৎকার ব্যাপার। ঠিক এমনটিই দেখেছিলাম প্রয়াগতীর্থে, সেখানে যমুনা এসে মিলিত হয়েছে গঙ্গার সঙ্গে। যমুনার নীল জল গঙ্গার ঘোলা জলে এসে ঠিক এমনি ভাবেই মিলিত হয়েছে সেখানে। কিন্তু প্রচার-মাহাত্ম্য এমনই যে লক্ষ লক্ষ লোক যাচ্ছে প্রয়াগতীর্থে স্নান করতে, আর এখানে জলাঙ্গী-গঙ্গা সঙ্গমে কেবল আশপাশের নিত্যস্নানার্থীরাই স্নান করে থাকে।

অনেক খেয়া নৌকা রয়েছে সবাই চেঁচাচ্ছে, আসুন বাবু, নবদ্বীপ, চার পয়সা সোয়ারী।

ওপারেই নবদ্বীপ। সোয়ারী নৌকায় উঠে বসলাম। মাঝনদীতে গিয়ে যেন বুকের ভেতর গুড়গুড় করে। একখানা নৌকায় ৫০।৬০ জন লোক এবং মালপত্র বোঝাই, জল থেকে বোধ হয় ইঞ্চিখানেক ভেসে আছে সেই পারাপারের তরণী। যদি একটু কাৎ হয়, তা হলেই গঙ্গা এবং নবদ্বীপলাভ হতে দেরী হবে না। মাঝগঙ্গায় গিয়ে যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠলো—জয় শ্রীচৈতন্য!

আমিও সেই মিলিত চীৎকারে যোগ দিয়ে বললাম, জয় শ্রীচৈতন্য !

ওপারে পৌঁছেই সামনে দেখলাম এক চায়ের দোকান। সেখানেই উঠলাম। চায়ের দোকানে অনেক রকম লোকের আসা-যাওয়া, কাজেই কোন রকম সংবাদ সংগ্রহের পক্ষে এর চেয়ে অনুকূল স্থান আর নেই। নবদ্বীপ সহর একটু দূরে, ঘোড়ার গাড়ী এবং সাইকেল-রিক্সা প্রচুর।

চা-ওয়ালার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতির কথাটা উত্থাপন করলাম। বেশী বলতে হোল না, সে বললে শুঁটকো মত লোকটা তো ? এসেই জিজ্ঞাসা করে কোথাকার চা ? দার্জ্জিলিঙ,না আসাম ?

বললাম—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই। বুঝলাম চা সম্বন্ধে এই প্রশ্নটা করা পরশুরামের অভ্যাসের মধ্যে।

দোকানী বললে, কোথায় থাকে তা তো জানি নে মশাই ! কালেভদ্রে আসে বটে। পার হওয়ার নৌকায় ওঠবার আগে আমার এখানে বসে চা খায়।

আমি বললাম, সম্প্রতি তাকে এখানে দেখেছেন কি ? মানে ২।৪ দিনের মধ্যে ?

তিনি বললেন, ২।৪ দিনের মধ্যে ? তা দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে তিনি আমার দোকানে না এসে অন্য দোকানেও তো চা খেতে পারেন। চায়ের দোকানে ঢুকেই তাঁর জিজ্ঞাসা করা অভ্যাস,—দার্জ্জিলিঙ, না আসাম ? এ কথাটা অন্য পাঁচটা দোকানে জিজ্ঞাসা করুন, দেখুন, হয়তো সন্ধান পেতে পারেন।

কিন্তু পণ্ডশ্রম। কোনও দোকানদারই বলতে পারলে না যে সম্প্রতি তাঁকে দেখেছে।

চায়ের দোকানওয়ালা আমাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। নাম এবং উপাধি শুনে বললে, তা হলে তো মশাই, তিনি একজন পণ্ডিত লোক। আপনি এক কাজ করুন বরঞ্চ। সহরের ভেতর পোড়ামা-তলায় যান, সেখানে অনেক পণ্ডিত লোকের আসা-যাওয়া আছে, সেখানে গিয়ে একবার খোঁজ নিন।

কি করি, এত দূর যখন এসেছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখাই যাক্। একখানা সাইকেল-রিক্সা নিয়ে গেলাম পোড়ামা-তলায়।

এই পোড়ামা হচ্ছেন নাকি নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। একটা বিরাট গাছের চারিদিকে অনেকগুলি মন্দির। নবদ্বীপ পণ্ডিতপ্রধান স্থান, সে জন্য পণ্ডিতেরা পোড়ামাকে সাধু ভাষায় নাম দিয়েছেন বিদগ্ধ জননী।

সেখানে গিয়েও খোঁজ নিলাম। নামাবলী গায়ে একজন সৌম্য-মূর্ত্তি বৃদ্ধ বসেছিলেন একটা মন্দিরের রোয়াকে। তিনি বললেন, কি নাম ? পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি বৈ কি ! মস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি, মাঝে মাঝে বিলাতে যায়, আমেরিকাতে যায়। এই তো গেল বছর জারমেনীতেও গিয়েছিল কি একটা সভায় বক্তৃতা করতে। —তা সে তো এখানে বড় একটা আসে না ! দৈবাৎ যদি কখনও এসে ২।১ দিন থাকে—না, না, এর মধ্যে তাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না !

বোঝা গেল এই বৃদ্ধ যাঁর কথা বলছেন তিনি আর যেই হোন, আমি যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, সে লোক ন'ন ? আরও মনে হোল, পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতি নামে নবদ্বীপে আর একজন লোক আছেন, যিনি মহাপণ্ডিত এবং ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যাঁর গতি-বিধি আছে।

মনে হোল, এটাও হয়তো অসম্ভব নয় যে আমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, সে ওই মহাপণ্ডিতের নামটা ব্যবহার করে আমার কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে। তার নিজের নাম হয়তো অন্য কিছু !

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যেন আরও গোলমাল বেধে গেল।

বাড়ী ফিরে এলাম হতাশা ও নৈরাশ্য নিয়ে। মা তখনও কান্নাকাটি করছেন মাঝে মাঝে। পঞ্চানন্দ দেবের শূন্য বেদীতেই তিনি যথানিয়মিত ধূপ-ধুনা গঙ্গাজল দিয়ে যাচ্ছেন।

শচীন ঠাকুর এবং জ্ঞান চাটুয্যে আমার হিতৈষী। এঁরা বললেন ইতিমধ্যে আঁশমালি থেকে বিধান আনানো হয়েছে। অন্য বিগ্রহ যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে নূতন বিগ্রহ কিনে এনে তাকে অভিষেক ইত্যাদি করতে হবে। আর তা যদি না করি, অন্য কোনও একটা পাথর কিংবা একখানা ইটকেও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে দেবতা ব'লে। আসলে বিগ্রহ হচ্ছে শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রতীক, সেটা পাথর কিংবা মাটি কিংবা কাঠ—যে কোনও বস্তুরই নির্ম্মিত হোক না কেন। এই দুর্ঘটনার জন্য আমাদের দশ দিন অশৌচ পালন করতে হবে।

এ ছাড়া, এই দুর্ঘটনায় গ্রামের কোনও ব্যাপক ক্ষতি যাতে না হয়, সে জন্য রক্ষাকালীর পূজার কথাও জানালেন চাটুয্যে মশাই।

এ সব তো হোল সামাজিক বিধান, কিন্তু আসল রহস্যের সমাধান হোল কই ? কি প্রয়োজনে পঞ্চানন্দ দেবকে অপহরণ করা হোল এবং কেন ? কার দ্বারা এ কাজ হোল ? আমি পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতিকে সন্দেহ করেছি, কিন্তু সে ছাড়া আর কাকেই বা সন্দেহ করা যেতে পারে ?—এই প্রশ্নগুলি নিয়ে মনের মধ্যে বহুবার নাড়চাড়া করলাম, কিন্তু কোনও সদুত্তর পেলাম না মনের কাছে।

কুসংস্কার আমি মানি না বলেই লোকের কাছে গর্ব্ব করে বেড়াতাম, কিন্তু এখন

দেখছি গৃহদেবতা চুরি হয়ে যাওয়ায় একটা আজানা বিপর্য্যয়ের আশঙ্কায় মনের মধ্যে বেশ যেন একটা ভয়ের ভাব বোধ করছি। কেন এমন হলো ?

দিন কেটে যেতে লাগলো। বর্ষাকাল এসে পড়লো। কলকাতায় গিয়ে আবার নিজের কাজে মনঃসংযোগ করতে হোল। তবু মনের মধ্যে একটা মস্ত খটকা থেকে গেল, কোথায় গেলেন আমাদের গৃহদেবতা পঞ্চানন্দ এবং সেই সঙ্গে কোথায়ই বা অন্তর্হিত হলেন সেই বিচিত্র অতিথি পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতি! সেইটাই তাঁর আসল নাম কিনা তাই বা কে জানে! পোড়ামা-মন্দিরের সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথাও মনে উদয় হতে লাগলো। এ কি প্রহেলিকা!

(ক্রমশঃ)

—উনিশ—

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল তাপস। কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন চিন্তা করে নিল। তারপর শক্ত মুঠিতে রিভলভারটা চেপে ধরে দ্রুতপদে উপরে উঠে গেল সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে।

উপরে উঠে জলটুঙ্গির ঘরে প্রবেশ করে তাপস টর্চ্চ জ্বালল।

টর্চের আলোয় তাপস দেখল, কালো কম্বল চাপা সংগ্রামরত শত্রুকে মেঝের উপর চেপে ধরে বসে আছে মলয়।

তাপসকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মলয় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—‘আমাকে সাহায্য কর তাপস, —এটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলি আগে, তারপর সব কথা শুনিস।’

একটা মোটা দড়ির সাহায্যে তাপস আর মলয় কম্বলচাপা ধৃত লোকটাকে বেঁধে ফেলল অল্প চেষ্টায়। মেঝের উপর পড়ে রইল বন্দী লোকটা।

তাপস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মলয়ের দিকে।

মলয় বলল,—‘তোর অনুমান ঠিক তাপস! অরুণকুমার গোপনে বরাবর আমাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল। তোর আদেশ মত দোরের ভিতরে দড়ির ফাঁদ পেতে অন্ধকারে আত্মগোপন করে পাহারা দিতে লাগলাম। সতর্ক দৃষ্টি রাখলাম হলুদ-কুঠির দিকে। কিছুক্ষণ আগে দেখলাম অন্ধকারে ছায়ামূর্ত্তির মত অরুণকুমার এসে দাঁড়াল জলটুঙ্গির দোরে। কম্বলটা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম আক্রমণের জন্যে। দোরের ভিতরে পা দিতেই দড়ির ফাঁদে পা আটকে অরুণকুমার মেঝের উপর ছিট্‌কে পড়ল। ওর হাতের রিভলভারটাও অন্ধকারে ছিট্‌কে পড়ে সশব্দে গর্জন করে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কম্বলটা নিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর দেহের উপরে। তার পরমুহূর্ত্তে তুই এসে পড়লি। এ তো গেল আমার কথা, তোদের খবর ?’

ছোট্ট কথায় উত্তর দিল তাপস,—‘শুভ’।

একটু থেমে তাপস আবার বলল,—‘ঘরের দোর-জানালাগুলো বন্ধ করে দে। আর একটা আলো জ্বালা। আমি আসছি এখুনি।’

তাপস আবার দেয়ালের ফাঁকে সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করল।

ঘরের দোর-জানালাগুলো ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল মলয়। জোরাল একটা আলো জ্বেলে দিল ঘরে।

প্রায় দশ মিনিট পরে তাপস ফিরে এল সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে। ঘরে প্রবেশ করে প্রথমে সুড়ঙ্গ-পথের মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর অরুণকুমারকে টেনে তুলে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। খুলে দিল মুখের বাঁধন আর কম্বলের আবরণ। জিজ্ঞাসা করল,—‘তারপর, অরুণবাবু, কি মনে করে ?’

অরুণকুমার ক্লান্তদৃষ্টি মেলে তাকাল তাপসের দিকে। বলল,—‘আমার প্রয়োজনটা তো আপনার অজানা নেই তাপসবাবু!’

—‘আপনার প্রয়োজনটা অবশ্য আমার জানা আছে। কিন্তু আপনার কি ধারণা, আজ রাতে আমরা জলটুঙ্গিতে এসেছি বসন্ত রায়ের রত্নসিন্দুকের সন্ধানে ?’

—‘আমার তো অনুমান তাই। গাঁতি, কোদাল, মাটি খোঁড়ার নানান্ যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে মাঝরাতে লোকে আর কি উদ্দেশ্য নিয়ে জলটুঙ্গিতে আসবে ?’

—'আপনার অনুমান সত্য। কিন্তু আপনি তো জানেন বসন্ত রায়ের রত্নসিন্দুকের কাহিনী সত্য নয়।'

—'রত্নসিন্দুকের অনুসন্ধান করতে গিয়ে বার বার হতাশ হয়ে আমার অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু আপনি আমার সেই ধারণা পালটে দিয়েছেন। কারণ রত্নসিন্দুকের কাহিনী যদি সত্য বলে বিশ্বাস না করতেন তাহ'লে আপনি অন্ততঃ আমার বাড়ি থেকে গভীর রাতে লালশঙ্খ চুরি করবার ঝুঁকি নিতেন না।'

একটু চুপ করে থেকে তাপস আবার জিজ্ঞাসা করল,—'আপনার কি ধারণা—আজ রাতে আমি রত্নসিন্দুকের সন্ধান পেয়েছি ?'

—'আমার দৃঢ় ধারণা আপনি রত্নসিন্দুক পেয়েছেন।'

—'হঠাৎ আপনার এ ধারণা হ'ল কি করে ?'

—'একটু আগে আপনি মলয় বাবুর প্রশ্নের উত্তরে তাকে জানালেন—সংবাদ শুভ। আপনি ভুলে যাচ্ছেন তাপস বাবু, আপনারা আমাকে কৌশলে দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন, কম্বল ঢাকা দিয়েছেন চোখে, কিন্তু আমার কান দুটো খোলাই ছিল।'

— 'ধরুন, আপনার অনুমান সত্য—আমি রত্নসিন্দুক পেয়েছি। কিন্তু তাতে আপনি কি আশা করেন ?'

—'বিশেষ কিছু না.—শুধু আমার পূর্ব্বপুরুষ মতিলালের উত্তরাধিকারী হিসেবে, রত্নসিন্দুকে সঞ্চিত রত্নের অর্ধেক অংশ চাই।'

—'দু'শ' বছর পরে যে রত্নসিন্দুক সুজিত উদ্ধার করেছে—তার অর্ধেক ধনরত্ন আপনাকে দিতে রাজী হবে কেন সে ?'

— 'সুজিত মামার অন্ততঃ রাজী হওয়া উচিত। কারণ সুজিত মামা আর আপনি ভাল করেই জানেন, যে, সিন্দুকে সঞ্চিত ধনরত্নের উপর ঠিক যতখানি অধিকার তাঁর আছে ঠিক ততখানি অধিকার আমারও আছে।'

— 'আর সুজিত যদি অংশ দিতে রাজী না হয় ?'

— 'তা হলে যাতে আমি আমার ন্যায়সংগত অংশ পাই তার চেষ্টা করব।'

— 'কিন্তু কি উপায়ে ?'

—'সেটা এখনও কিছু ভেবে ঠিক করি নি।'

—'কিন্তু ধরুন, আপনাকে যদি এখানে চিরদিনের মত মাটির নীচের অন্ধকার গুপ্ত কক্ষে বন্দী করে রাখা হয় বা চিরদিনের মত আপনাকে ভাববার অবসর দেওয়া না হয়, তা হলেও কি আপনি আপনার মতের পরিবর্ত্তন করবেন না ?'

—'আপনার কথা ঠিক বোধগম্য হ'ল না তাপস বাবু!'

—'পরিষ্কার করে বলছি—শুনুন। আপনার পূর্ব্বপুরুষ মতিলালকে যেমন মাটির নীচের গুপ্তকক্ষে সমাধি দেওয়া হয়েছিল—ঠিক সেখানেই যদি আপনাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়, তাহ'লেও কি আপনি গুপ্ত ধনরত্নের অংশ দাবী করবেন ?'

—'আমাকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

—'আপনি ভুলে যাচ্ছেন অরুণ বাবু, আপনি আমাদের বন্দী। আপনাকে নিয়ে আমরা এখন যা খুসী তাই করতে পারি।'

— 'যা খুসী বলতে কি বলতে চাইছেন জানি নে। কিন্তু আর যাই করুন, আপনারা আমাকে খুন বা মাটির নীচের গুপ্ত কক্ষে চিরদিনের জন্য বন্দী করে রাখতে পারবেন না।'

— 'সম্ভব নয় কেন অরুণ বাবু ? দু' শ' বছর আগের খোঁড়া মাটির নীচের গোপন কক্ষে মতিলালের কবরে আপনাকে জীবন্ত সমাধি দিলে কেউ টের পাবে না—আপনার কি হ'ল জানতেও পারবে না কেউ কোন দিন।'

'সব বুঝলুম ; কিন্তু তবু বলছি আপনার পক্ষে তা সম্ভব হবে না কখনো।'

অরুণের কথা বলার ভঙ্গীতে দৃঢ়তা থেকে অবাক্ হয়ে গেল তাপস। (ক্রমশঃ)

খোকন এলে

শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র, বি.এ, বি.টি., সাহিত্যশাস্ত্রী

এই যে খোকন এলে!
স্বর্গপুরীর পারিজাতের মেলায় খেলে খেলে।
অঙ্গ তোমার পরাগ মাখা, কল্পলোকের স্বপ্ন আঁকা,
মন-জুড়ানো কাজল-চোখের পাপড়ি মেলে মেলে।

এই যে খোকন হাসে!
বাদল রাতের বিজ্‌লী যেন আঁধার মনে আসে।
চম্‌কে-ওঠা সুখের ঘোরে বক্ষে তোমায় জড়িয়ে ধরে,
তুলতুলে গাল টোল খেয়ে যায়, দেখেই নয়ন ভাসে।

এ কি, খোকন কাঁদে!
চরকাবুড়ীর হাতছানিতে চাও কি যেতে চাঁদে ?
লক্ষ্মী মানিক, কেঁদো না আর লক্ষ চাঁদের উজল বাহার
তোমার মুখেই উছলে ওঠে নিত্য নতুন ছাঁদে।

দাস রঘুনাথ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পানিহাটিতে গঙ্গা-তীরে প্রভু নিত্যানন্দের সহিত রঘুনাথের মিলনের কথা তোমরা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছ। উৎসব-শেষে রঘুনাথ নিত্যানন্দের চরণে প্রণাম করিয়া গৌরাঙ্গপ্রেম প্রার্থনা করিলেন। দয়াল নিতাই অভয় দিয়া বলিলেন, "ভাবনা কি রঘুনাথ, তুমি যা করলে তার তুলনা হয় না।

"তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাও আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ॥"—চৈঃ চঃ

চিরকাল তুমি চৈতন্যের সেবক, তোমাকে তিনি সেবকের মতই চরণে স্থান দেবেন।"

আনন্দে অধীর হইয়া রঘুনাথ সমবেত ভক্তগণকে প্রণাম করিলেন এবং যথোচিত দক্ষিণা দিয়া বিদায় লইলেন।

বাড়ী ফিরিয়া রঘুনাথ আর ভিতর মহলে প্রবেশ করিলেন না। বাহিরে দুর্গা-মণ্ডপে বাসা লইলেন। অবস্থা দেখিয়া হিরণ্য দাস চিন্তিত হইয়া উঠিলেন এবং যাহাতে রঘুনাথ আর পালাইতে না পারেন সেই জন্য দুর্গামণ্ডপে কড়া পাহারা বসাইয়া রাখিলেন।

এইভাবে চলিল কিছুকাল। ক্রমে রথযাত্রার সময় আসিয়া পড়িল। সেন শিবানন্দের নেতৃত্বে গৌড়ের ভক্তমণ্ডলী ৺পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। ইহা শুনিয়া রঘুনাথের মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি পালাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় শীঘ্রই সেই সুযোগ মিলিয়া গেল। একদিন রাতে পাহারাওয়ালারা ঘুমাইয়া পড়িতেই রঘুনাথ চুপিসারে বাহির হইয়া পড়িলেন বাড়ী হইতে। তারপর বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিলেন পুরুষোত্তমের পথে।

পরদিন ভোরে দেখা গেল পাখী পালাইয়াছে। মাতা ও স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। জ্যেঠা হিরণ্য দাস মনের দুঃখে অধীর হইয়া পাহারাওয়ালাদের উপর তম্বি করিতে লাগিলেন,—"শয়তানের দল, এই বুঝি তোদের পাহারার নমুনা! পড়ে পড়ে ঘুম মারছিলি, ভাল চাস তো এক্ষুণি বেরিয়ে পড়। যেখানে পাবি ধরে নিয়ে আসবি তাকে এখানে।"

পাহারাওয়ালাদের সর্দ্দার বলিল, "হুজুর, গৌড়ের ভক্তগণ শুনেছি পুরী যাচ্ছেন। আমার মনে হয় কুমার বাহাদুর তাঁদের সঙ্গেই গিয়েছেন। হুকুম করেন তো দেখে আসি।"

হিরণ্য তাহাতে রাজী হইলেন। তাঁহার পত্র লইয়া লোকজন সহ সর্দ্দার গিয়া দেখা করিল সেন শিবানন্দের সঙ্গে। শিবানন্দ পত্র পড়িয়া বলিলেন, "রঘুনাথ আবার পালিয়েছে! কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো সে দেখা করে নি। তোমরা অন্যত্র খোঁজ করে দেখ পাও কিনা।"

বিফলমনোরথ হইয়া সর্দ্দারের দল সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পিতা গোবর্দ্ধন দাস বলিলেন, "অনর্থক আর খোঁজাখুঁজি করে লাভ কি দাদা, ওর আশা আমি বহুদিন থেকেই ছেড়ে দিয়েছি। ও তো ঘরে থাকবার ছেলে নয়, জোর করে আর কত আটকাবে বল?"

এদিকে রঘুনাথ সোজা পথ ছাড়িয়া বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিয়াছেন, যাহাতে ধরা না পড়েন। খাওয়া-দাওয়ার দিকে মোটেই লক্ষ্য নাই—

"ভক্ষণ নাহি, সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ প্রাপ্তে মন॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধ পান।
যবে যেই মিলে, তাতে রাখয় পরাণ॥"

এই ভাবে চলিয়া বারো দিনে রঘুনাথ ৺পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ সহ বসিয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়

রঘুনাথ গিয়া তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিলেন। একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। ভক্ত মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, ঐ দেখুন আমাদের রঘুনাথ এসে গেছে।"

ভাবে গর গর মহাপ্রভু বলিলেন, "এই যে রঘু, এসে গেছ দেখছি! এসো, এসো।"

চোখের জলে ভাসিয়া রঘুনাথ গিয়া পড়িলেন একেবারে প্রভুর শ্রীচরণে। মহাপ্রভু অমনি তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। রঘুনাথের অন্তর-বাহির অমৃতময় হইয়া উঠিল।

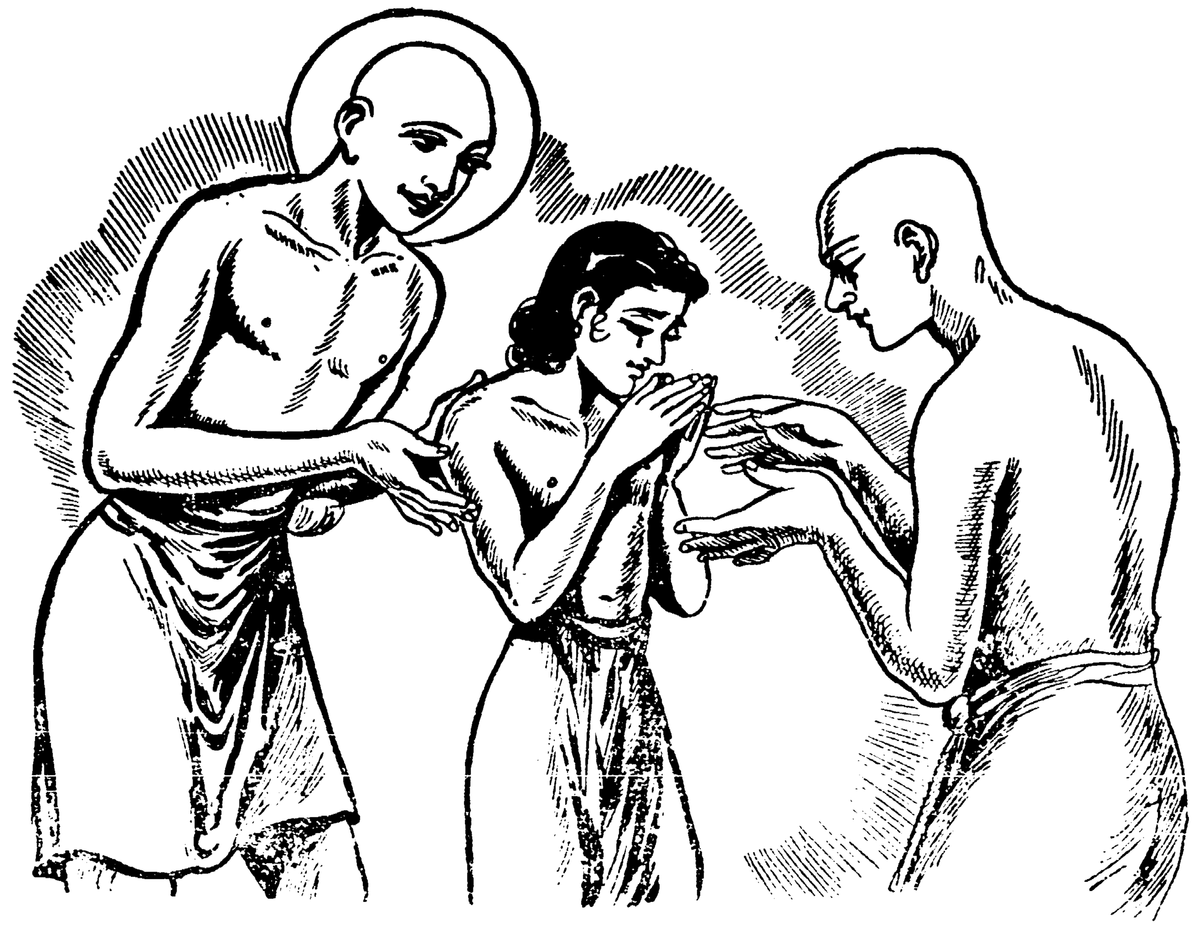

"এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।"

দীর্ঘকাল অনাহার ও পথশ্রমে রঘুনাথের শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। করুণাময় মহাপ্রভু পরম স্নেহে রঘুনাথের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "রঘুনাথ, তোমার শরীর বড়ই কাহিল হয়েছে। এখন কিছু দিন বিশ্রামের দরকার। যাক, কষ্ট না হ'লে ইষ্ট মেলে না। দয়াময় ভগবান্ যে তোমাকে বিষয়-বিষ থেকে উদ্ধার করেছেন এই-ই পরম সৌভাগ্য।"

কয়েকদিন বিশ্রামের পর রঘুনাথ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। মহাপ্রভু তখন তাঁহাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—

"এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্রভৃত্যরূপে ইহা কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নামে হয় আমার স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈল ইহার নামে॥

এত কহি রঘুনাথের হস্তেতে ধরিয়া।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে দিল সমর্পিয়া॥"—চৈঃ চঃ

উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য মিলিল। রঘুনাথ কায়মনোবাক্যে গুরুসেবা করিতে লাগিলেন। তার সঙ্গে চলিল দিনরাত ভজন মনে মনে। কিছুদিন পর গৌড়ের ভক্তগণকে লইয়া সেন শিবানন্দ ৺পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদের সঙ্গে রঘুনাথের পরিচয় করাইয়া দিলেন। পরিচয় পাইয়া সেন শিবানন্দ বলিলেন, "ওঃ, তুমিই তবে সপ্তগ্রামের রাজকুমার! তোমার খোঁজে লোক এসেছিল আমাদের কাছে। আমরা তখন ঝাঁকরা গ্রামে বাসা করে আছি। কিন্তু তুমি তো আমাদের সঙ্গে ছিলে না, তাই তারা আবার ফিরে গেছে সপ্তগ্রামে।" অদ্বৈত প্রভুও রঘুনাথের ত্যাগ-বৈরাগ্যে পরম সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ক্রমে রথযাত্রা উৎসব শেষ হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণ সহ শিবানন্দ আবার দেশে ফিরিয়া গেলেন। হিরণ্য দাস তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া জানিলেন যে রঘুনাথ ৺পুরীতে মহাপ্রভুর কাছেই আছেন। তাঁহার ত্যাগ-বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রভাবে এরই মধ্যে তিনি সেখানে সকলের পরম স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হিরণ্য দাসের মনে বড়ই কষ্ট হইল, তিনি রঘুনাথের জন্য কিছু টাকা ও কয়েকজন লোক পাঠাইবার ইচ্ছা করিয়া শিবানন্দের কাছে পত্র দিলেন। শিবানন্দ লিখিলেন যে এখন পাঠাইলে সুবিধা হইবে না। সামনের বৎসর আবার যখন তাঁহারা রথযাত্রা উৎসবে যাইবেন তখন যেন তাঁহাদের সঙ্গে পাঠান, তবেই হইবে।

তারপর— "বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে॥
সেই বিপ্র, ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া॥"—চৈঃ চঃ

আদর্শ ত্যাগী রঘুনাথ কিন্তু ঐ মুদ্রা কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। অগত্যা ব্রাহ্মণ ও সেবক দুইজন পুরীতেই রহিলেন এবং মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিবার জন্য রঘুনাথকে অনুরোধ-উপরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ একেবারে এড়াইতে না পারিয়া রঘুনাথ মাসে দুইবার মাত্র আট আনা গ্রহণ করিলেন এবং তাহা দিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করাইলেন। এই ভাবে চলিল দুই বৎসর। তারপর তাহাও ছাড়িয়া দিলেন।

ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, রঘুনাথ আমাকে আর নিমন্ত্রণ করে না কেন?"

স্বরূপ বলিলেন, "বিষয়ীর অন্ন বোধ হয় আর আপনার সেবায় লাগাতে ইচ্ছা নেই, তাই আর আপনাকে নিমন্ত্রণ করে না। ওর জ্যেঠামশায়ের লোক তো এখনো ৺পুরীতে আছে টাকাপয়সা নিয়ে। রঘুনাথ তো ওদের কাছ থেকেই পয়সা নিয়ে আপনার সেবায় লাগাতো।"

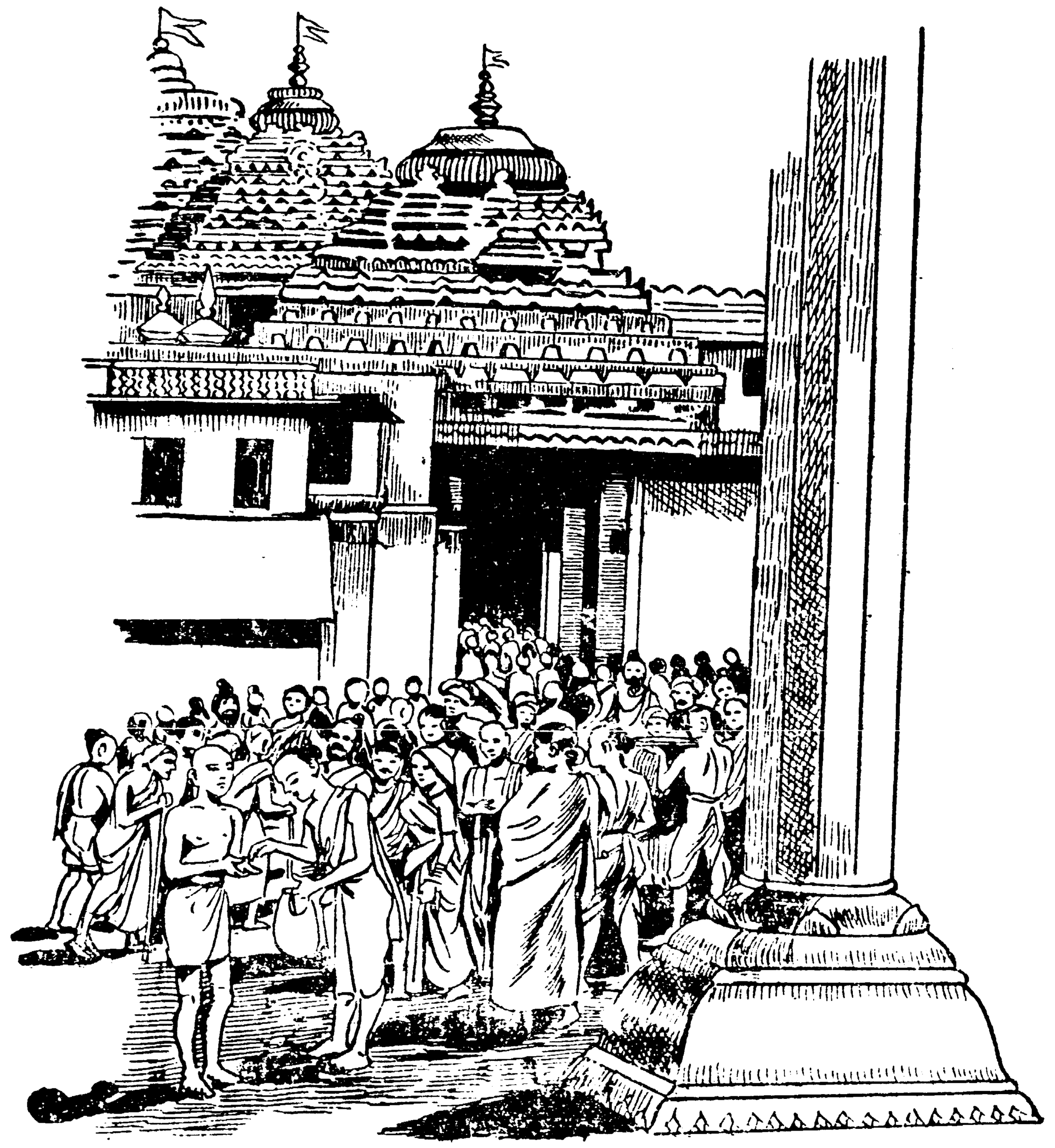

যে যাহা দেন তাহাই গ্রহণ করেন।

প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া উঠিল মহাপ্রভুর শ্রীমুখমণ্ডল। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "রঘুনাথ ভালই করেছে নিমন্ত্রণ বন্ধ করে। কারণ—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥"—চৈঃ চঃ

ইহাতে দাতা ও ভোক্তা দু'জনের মনই মলিন হয়। ওর মনে কষ্ট হবে বলে আমি এতদিন কিছুই বলতে পারি নি। নিজে ইচ্ছা করে ছেড়ে দিয়েছে, ভালই হয়েছে।"

রঘুনাথের পরনে আর এখন অন্য কাপড় নাই। সামান্য একখানি ছেঁড়া কাঁথা আর বহির্ব্বাস মাত্র পরিয়া তাঁহার দিন চলে। আহারের নিয়মও কঠোর হইয়াছে। রঘুনাথ এখন রাত্রি দশ দণ্ডের পর ৺জগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকেন। যে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করেন। তারপর আহার করিয়া নাম জপে লাগিয়া যান।

এই ভাবে কাটিল কিছু দিন। রঘুনাথ দেখিলেন যে ভিক্ষাদাতারা তাঁহাকে রাজকুমার জানিয়া ক্রমেই বেশী করিয়া ভিক্ষা দিতেছেন। এখানেও সেই জ্বালা। দুরন্ত অভিমান আসিয়া তাঁহাকে দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিরক্ত হইয়া রঘুনাথ সিংহদ্বার পরিত্যাগ করিলেন এবং অন্নসত্রে গিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইহার পরে কি হইল সে গল্প আর একদিন বলিব।

যুদ্ধ ও শান্তি

(ইতিহাসের গল্প)

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসবিখ্যাত বাংলার পাল আমলের একটি অধ্যায়। পাল সম্রাট নয়পালের রাজত্বকাল (আনুমানিক ১০৩৮ থেকে ১০৫৫ খৃঃ) তখন। একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার কথা।

নয়পাল হলেন সম্রাট প্রথম মহীপালের পুত্র। গৌড়জনের নির্ব্বাচিত রাজা গোপাল পাল-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ধর্মপাল, দেবপাল তাকে বিস্তৃত করেছিলেন বিশাল গৌড় সাম্রাজ্যে। আর্যাবর্তের অধিকাংশে ছিল সেই সাম্রাজ্যের অধিকার। তারপর দেবপালের মৃত্যুর (আনুমানিক ৮৫০ খৃঃ) পর থেকে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি ক্রমশঃ রাহুগ্রস্ত হতে থাকে। পরবর্তী পাল রাজাদের অযোগ্যতা, পারিবারিক বিরোধ, বৈদেশিক আক্রমণ ইত্যাদি নানা কারণে রাজ্যের প্রভাব, প্রতিপত্তি, সীমানা সমস্তই হয়ে আসে সঙ্কুচিত। বিগ্রহপাল (১ম), নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, গোপাল (২য়) এবং বিগ্রহপাল (২য়)—এই পাঁচ রাজার আমলে পাল-রাজত্বের একেবারে ভগ্নদশা উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল যখন (৯৮৮ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করলেন তখন পাল বংশের অধিকার বাংলা দেশের অনেকাংশেও বিলুপ্ত। এই পতন ও ধ্বংসের হাত

থেকে পাল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে তাকে পূর্বগৌরবে অনেকখানি ফিরিয়ে আনলেন তিনি। তখনকার বাংলা মগধ জুড়ে আবার প্রতিষ্ঠিত হ'ল পাল সাম্রাজ্য।

মহীপাল-পুত্র নয়পালের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা—কলচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ। দীর্ঘকাল ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। উভয় পক্ষের জয়পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র রূপ নিয়েছিল এই সংগ্রাম।

আরো একটি কারণে সম্রাট্ নয়পালের নাম আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় থাকবে।

বাংলার গৌরব, ভারতের গৌরব অতীশ দীপঙ্করের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যে নয়পালও থাকবেন গৌরবান্বিত। তিনি ছিলেন দীপঙ্করের প্রতি একান্ত অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধানত। অতীশকে তিনিই বরণ করে নিয়ে এসেছিলেন মগধে। দীর্ঘ বারো বছর দীপঙ্কর যবদ্বীপের আচার্য চন্দ্রকীর্তির কাছে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করে তখন স্বদেশে ফিরে এসেছেন। সেই সময়ে নয়পালের সাদর আহ্বানে তিনি মগধে এসে বাস করতে আরম্ভ করেন। প্রায় তিনশ' বছর ধরে পাল রাজাদের (গোপাল থেকে মহীপাল পর্যন্ত) সহযোগিতায় মগধ তখনো বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। নালন্দা, ওদন্তপুরী এবং বিক্রমশীলা মহাবিহার সমগ্র ভারতের আদর্শ শিক্ষায়তন।

দীপঙ্কর মগধে এসে বৌদ্ধ জগতের সর্বজনমান্য আচার্য রূপে সম্মানিত হ'লেন। বৃহৎ, ক্ষুদ্র নানা বিহারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে হ'ল তাঁকে। এত বেশি সংখ্যক বিহারের তিনি ভার-প্রাপ্ত ছিলেন যে সর্বদা তাঁর কোমরে বাঁধা থাকত এক গোছা চাবি।

রাজা নয়পালের সঙ্গে তাঁর ছিল অতি ঘনিষ্ঠতা। কাছে থাকলে নয়পাল তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। দূরে থাকলে দু'জনের মধ্যে চলত পত্র ব্যবহার। দীপঙ্কর রচিত ১৬৮ খানি গ্রন্থের মধ্যে একখানির নাম হ'ল "বিমলপত্রলেখন" এই বইটির বিষয় হ'ল নয়পালকে লিখিত দীপঙ্করের চিঠি।

কলচুরি-রাজবংশের লক্ষ্মীকর্ণ হলেন গাঙ্গেয়দেবের পুত্র। এই গাঙ্গেয়দেব ছিলেন উত্তর ভারতের দিগ্বিজয়ী বীর। সমগ্র উত্তরাপথ পদানত করে তিনি নয়পালের পিতা মহীপালের রাজ্যও আক্রমণ করেছিলেন। পিতার মতন লক্ষ্মীকর্ণও ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল পূর্বমুখী অভিযান। পশ্চিম-উত্তর ভারতে তখন মুসলমান আধিপত্যের জন্যেই হয়ত সেদিকে অগ্রসর হতে উৎসাহ হয় নি তাঁর।

লক্ষ্মীকর্ণ প্রায় অর্ধেক আর্যাবর্ত জয় করেছিলেন, এবং মগধযুদ্ধের আগে চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার হাতে ভিন্ন আর কখনো পরাজিত হন নি। এই বীরত্বের খ্যাতির জন্যে বিশেষ অহঙ্কারও ছিল তাঁর মনে।

সেবার তিনি এলেন গয়াতে। গয়া মগধের অংশ হিসাবে পালরাজত্বের সীমার মধ্যে। তবু নয়পাল তাঁর আগমনে আপত্তি জানালেন না। কারণ লক্ষ্মীকর্ণ জানিয়েছিলেন—"আমি গয়ায় তীর্থযাত্রী রূপে এসেছি। এখানে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করে এবং মন্দিরে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করে ফের আমার রাজ্যে ফিরে যাব।"

নয়পাল বলেছিলেন—"উত্তম কথা। আপনি নিশ্চিন্ত মনে তীর্থ দর্শন সম্পূর্ণ করুন।"

পাল-রাজা ছিলেন শান্তিপ্রিয় এবং জ্ঞানচর্চায় অনুরাগী। তাঁর রাজত্বকালে গৌড়মণ্ডলে শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদির বহুল উন্নতি হয়েছিল। তিনি নিতান্ত বাধ্য না হ'লে যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত করতেন না নিজেকে। এ ক্ষেত্রেও তিনি কলচুরি-রাজের সঙ্গে প্রথমে সম্মানিত অতিথির মতনই ব্যবহার করলেন।

লক্ষ্মীকর্ণ কিন্তু নিছক তীর্থের জন্যে গয়ায় এসেছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধসজ্জা করে বিরাট বাহিনী উপস্থিত হয়েছিল। অবশ্য রাজা তীর্থগমন করলেও তাঁর সৈন্যদল সঙ্গে থাকতে পারে। তিনি তো আর সাধারণ মানুষের মতন ন'ন। সুতরাং তাতে মনে করবার কিছু ছিল না। হয়ত এমনও হতে পারে যে কলচুরি-রাজের বিরোধের ইচ্ছা ছিল না প্রথমে।

কিন্তু দ্বন্দ্ব বাধল ঘটনাচক্রে।

গয়া প্রাচীন হিন্দুতীর্থ। আবার তারই অনতিদূরে বিখ্যাত বৌদ্ধ গয়া। সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের জন্যে পৃথিবীর বৌদ্ধদের কাছে পরম পবিত্র, বুদ্ধদেবের স্মৃতি-রঞ্জিত চার পুণ্যস্থানের অন্যতম।

গয়ার তীর্থমাহাত্ম্য নিয়ে দুই রাজার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'ল, এবং রাজাদের মনান্তরের ফলে যা ঘটে, তা-ই ঘটল।

লক্ষ্মীকর্ণ অতর্কিতে আক্রমণ করলেন নয়পালের রাজ্য।

পাল সৈন্যবাহিনী তখন প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে পরাজিত হ'ল নয়পালের সেনাদল। মহোল্লাসে মগধ অবরোধ করলেন কলচুরি-রাজ তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে।

দীর্ঘকাল ধরে নিরুপায় মগধ অবরুদ্ধ হয়ে রইল।

অতীশ দীপঙ্কর সে সময় বজ্রাসন বিহারে অবস্থান করছিলেন যুদ্ধের সেই আবহাওয়ার মধ্যে। আপনার জ্ঞানসাধনায় এবং দৈনন্দিন কর্তব্যে অবিচলিত রইলেন তিনি। যুদ্ধে কোন পক্ষের সঙ্গেই জড়িত হলেন না। সংগ্রাম বন্ধ করবার জন্যে কাউকেই অনুরোধ করবেন না স্থির করলেন।

তিনি হয়ত চিন্তা করে দেখলেন, নয়পালের ওপর তাঁর যে প্রভাব তাতে তাঁকেই শুধু তিনি বলতে পারেন। কিন্তু নয়পালকে বলা বৃথা। কারণ তিনি তখন পরাজিত। অপর পক্ষে লক্ষ্মীকর্ণ মগধ অবরুদ্ধ করে বীরবিক্রমে বর্তমান। তিনি অতীশের অনুরোধে নিশ্চয় যুদ্ধে ক্ষান্ত হবেন না।

কিছুকাল এমনি অবস্থায় কেটে গেল।

এদিকে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হতে আরম্ভ হ'ল ক্রমে ক্রমে। নয়পালের রাজ্যের নানাস্থান থেকে এসে পৌঁছতে লাগল সৈন্যসাহায্য। নতুন নতুন পাল সৈন্যদলের প্রতি-আক্রমণে অবশেষে মগধের অবরোধ চূর্ণ হয়ে গেল। সম্মুখযুদ্ধে এবার পরাস্ত হ'ল লক্ষ্মীকর্ণের বাহিনী।

চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার কাছে পরাজয়ের পর পালরাজের হাতে দ্বিতীয় বার পরাজিত হলেন কলচুরি-রাজ।

কিন্তু এই পরাজয়ের ফলে লক্ষ্মীকর্ণ আক্রোশে হীন আচরণ আরম্ভ করলেন। গৌড়সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ এড়িয়ে আক্রমণ করতে লাগলেন বৌদ্ধ মঠ এবং বিহার। অনেক বিহার লুণ্ঠন করে ধ্বংস করতে লাগল তাঁর সেনাদল।

নয়পাল এবার প্রতিশোধ নিলেন। তাঁর বিজয়ী বাহিনী লক্ষ্মীকর্ণের সৈন্যদের অমিতবিক্রমে ধ্বংস করতে লাগল। যে হারে সেনাদল নিহত হচ্ছিল তা দেখে কলচুরি-রাজ প্রমাদ গণলেন। এ ভাবে চললে তাঁর বাহিনী নির্মূল হয়ে যাবে বুঝে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইলেন অবশেষে। যদি নয়পাল তাঁর কথা অগ্রাহ্য করেন, সেজন্যে শরণ নিলেন দীপঙ্করের। গৌড়সৈন্য তখন প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তাই লক্ষ্মীকর্ণ আশ্রয়ভিক্ষা করলেন দীপঙ্করের কাছে।

সৌম্য, জ্ঞান-তাপস শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর কলচুরি-রাজের সমস্ত অপরাধ, মঠ-বিহার ধ্বংসের অপকীর্তি মার্জনা করলেন। স্মিতমুখে বললেন—"আপনি আমার আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এসেছেন, আপনাকে বিমুখ করব না। আমার কোন বিহারের মধ্যে রাজা নয়পালের সৈন্য আপনার অবশ্যই কোন ক্ষতি করবে না। আমি আশ্বাস দিচ্ছি। কিন্তু রাজা, আমার একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়।"

লক্ষ্মীকর্ণ জোড়হাতে বললেন—"মহাত্মন্! প্রশ্ন নয়, আপনি আজ্ঞা করুন।"

স্নিগ্ধ হাস্যে অতীশ বললেন—"এত কাল ধরে এত রক্তপাত, হানাহানির ফলে অন্তরে কি লাভ করলেন, রাজা?"

কলচুরি-রাজ নতমস্তকে নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

দীপঙ্কর আবার প্রশ্ন করলেন—"শান্তি চান কি? আমি তাহ'লে সেজন্যে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ যদি রক্ষা করেন, রাজা নয়পালকে এ বিষয়ে পত্র লিখি।"

লক্ষ্মীকর্ণ বিনীত ভাবে বললেন—"আপনার আদেশ শিরোধার্য।" তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—"আমার সম্মান যেন··"

—"বুঝেছি। আপনার জন্যে সম্মানজনক সন্ধিরই প্রস্তাব আমি করব। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় নয়পাল এবং লক্ষ্মীকর্ণের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হ'ল। দুই রাজারই মর্যাদা তাতে অক্ষুণ্ণ রইল। স্বাধীন রাজার মতন বন্ধুভাবে ফিরে গেলেন কলচুরি-রাজ।

যাবার আগে তিনি নয়পালের কাছে এক প্রস্তাব করে গেলেন—"আমার কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে পাল-যুবরাজের বিবাহ দিয়ে আমাদের এই বন্ধুত্ব স্থায়ী করুন. এই আমার অনুরোধ।"

নয়পাল সানন্দে বললেন—"অতি শুভ প্রস্তাব। আমি যত শীঘ্র সম্ভব তার আয়োজন করছি।"

যথা সময়ে যথারীতি দুই রাজপরিবারের মিলন হ'ল। যৌবনশ্রীর স্বামী পাল-যুবরাজ পরে বিগ্রহপাল নামে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে।

আজব নেশা

শ্রীঅজিতকুমার তারণ

অনেকের অনেক রকমের নেশা রয়েছে। কেউ করে ধূমপান, মাতালরা খায় মদ, গাঁজাখোরের গাঁজায় দম না দিলে চলে না। এই রকম বহু লোকের বহু রকমের নেশা।

এ সব তো গেল মানুষের নেশার কথা; পশুদেরও যে নেশা আছে তা জান কি? তবে শোন:

আরব দেশে আরবীদের কাছে উট অতি মূল্যবান্ এবং উপকারী প্রাণী, আর মরুভূমির দেশে হবেই তো তা। অনেক সময় 'মরুভূমির জাহাজ' এই উটকে নিয়ে আরবীদের মধ্যে তুমুল ঝগড়াও বেধে যায়। মারামারি, সময় সময় মামলা-মোকদ্দমাও চলে এই নিয়ে।

তোমাদের বোধ হয় অজানা নেই যে মরুভূমির লোকদের কাছে উটই প্রধান সম্বল। তারা উটে চড়ে মরুভূমি পার হয়, উটের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে নানা রকমের মালপত্তর পার করে, উটের দুধ খায়, আর উট মরে গেলে তার চামড়া দিয়ে তৈরী করে মজবুত জুতো, তাঁবু ইত্যাদি। এ হেন জন্তু যদি কখনো কারো হারিয়ে যায় তবে তার সমূহ বিপদ বৈ কি!

আরবী আব্দুল রউব-এর উটটীও একবার এইভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল। খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হ'য়েও সে তার কোনো হদিস পেল না। এই ভাবে দু'-তিন দিন পাগলের মত ঘুরে ঘুরে শেষে একটা মরু-উদ্যানের ধারে এসে হাজির হ'ল সে। শরীর ও মন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন, মুখে দারুণ হতাশা। ঠিক এমনি সময়ে আচমকা সে শুনতে পেল তারই উটটীর অতি পরিচিত স্বর। দৌড়ে গেল রউব উটটীর কাছে. ওর গায়ের ওপর কতকগুলো পরিচিত দাগও দেখতে পেল। পশুটীও তার পুরোনো মনিবকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আরো বেশী করে ডাকতে সুরু করল।

আব্দুল রউবের মনে আর আনন্দ ধরছে না। সে উটটীকে নিয়ে রওনা দেবে, ঠিক এমনি সময়ে পিছন দিক্ থেকে এসে বাধা দিল ছৈয়দ আব্দুল্লা। বল্লে, "আচ্ছা লোক তো তুমি! এটা আমার বাপের আমলের পুরোনো উট, আর তুমি দিব্যি নিয়ে পালাচ্ছ!"

প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর ঝগড়া ও শেষে হাতাহাতি-মারামারি। ব্যাপার দেখে আরো অনেকে এসে জড় হ'ল এবং সবাই ছৈয়দের পক্ষই সমর্থন করতে লাগল।

মাছটি বঁড়শিতে আটকে গিয়ে নাগর দোলায় পাক খাওয়ার মত একটা পাক খেয়ে পড়ল গিয়ে ডাঙ্গায়—ঘাসের মধ্যে। ছিদাম বাঁ-হাত দিয়ে তার মাথাটা চেপে ধরে খুলে নিল বঁড়শির কাঁটা। খালুইয়ের মধ্যে কৈ মাছটির লম্ফ-ঝম্ফ—কিন্তু বেরুতে আর পারল না।

ছিদাম মাছ নিয়ে বাড়ী ফিরল। পুঁটি মাছ, ট্যাংরা মাছ আর কৈ মাছ। পুঁটি-ট্যাংরার আয়ু শেষ। কৈ কিন্তু লাফাচ্ছে তখনও।

ছিদামের পিসী মাছ কুটতে বসল বঁটি নিয়ে। সম্মুখে খানিকটা ছাই। কৈ মাছটা যাতে ফসকে না যায় হাতের ভিতর থেকে সে জন্য সে ঐ মাছটার এপিঠে ওপিঠে বেশ করে ছাই মাখিয়ে নিল। তারপর কাটল তার দু'খানা কান।

সহসা কিসের একটা ছায়া পড়ল বঁটির কাছে, তার পরেই এক ছোঁ! ছোঁ মেরে একটা চিল কৈ মাছটাকে নিয়ে গেল পিসীর হাত থেকে।

কিন্তু তার কাছ থেকেও ছোঁ মেরে ঐ মাছটাকে নেবার জন্য আরও দুটো চিল উড়ছিল আকাশ দিয়ে। তিন চিলে তখন প্রচণ্ড ছোটাছুটি! সমস্ত আকাশটা ঘুরে নাছোড়বান্দা চিল অবশেষে কৈটাকে এনে ফেলল—নদীর উপর হেলা নারকেল গাছটার মাথায়। এখানেই তার বাসা। বাসায় তার ছা আছে দুটো। ছা-দুটিকে কৈ মাছটি উপহার দিয়েই চিল-মা পালাল সেখান থেকে—পাছে আর কেউ কেড়ে নিয়ে যায় শিকারটাকে।

চিলের বাসায় কিছুক্ষণ হাঁপ ছেড়ে নিয়ে কৈ মাছটি বলল :

চিলের ছানা,
দিচ্ছে হানা
দেখছ কত বাজ-পাখী ?

বাজ পাখীর নাম শুনেই ছানা দুটির মুখ একেবারে চূণ! তারা বলল :

তাই নাকি ?
ডাক ত' মাকে,
শুধাই তাকে
আমরা এখন করব কি ?

কৈ মাছ তখন তিড়িংতিড়িং লাফাতে আরম্ভ করেছে। এদিকে চিলের ছানা দুটি ভয়ে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে একে অপরকে।

এত হুটোপাটি সামান্য একটা বাসায় সইবে কেন ?—বাসা শুদ্ধ পড়ে গেল চিলের ছানা দুটি নদীর জলে।

ঠিক সেই সময়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল টাবুরে নৌকো ছোট্ট নতুন বৌকে নিয়ে।

ছইয়ে ঢাকা টাবুরে নৌকো। মধ্যে বসে আছে রঙিন শাড়ী পরে নতুন-বৌ। খোঁপা করে তার চুল বাঁধা, কপালে টিপ, হাতে চুড়ী, পায়ে আলতা। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাকে নিয়ে যাচ্ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বৌ তার ছোট ভাইটির জন্যে। ছোট ভাইটি তার হাতে ছাড়া আর কারও হাতেই খায় না।

চিলের বাসাটা পড়বি তো পড় একেবারে মাঝির মাথার উপর! মাঝি ত' সঙ্গে সঙ্গে চিৎপটাং। আর আর যারা ছিল, তারা কেউ ধরতে গেল মাঝিকে, কেউ ধরতে গেল কৈ মাছটাকে, কেউ বা চিলের ছানা দুটিকে সাপ ভেবে জলে দিল ঝাঁপ।

ওদের হুটোপাটায় নৌকা গেল ডুবে। মুহূর্তের মধ্যে কি একটা ওলট-পালট কাণ্ড ঘটে গেল।

এক মাস গত হয়ে গেছে। ছিনাথ দুলে নতুন করে বঁড়শীর মাথায় টোপ গেঁথে টিপ টিপ করে লোভ দেখাচ্ছে—নদীর জলের কৈ মাছগুলিকে।

কিন্তু সে কৈ ত' আর কাঁচা ছেলে নেই! ঠেকে শিখেছে সে অনেক। বললে সে ছিদামকে :

ছাইতে লটপট, বঁটিতে দুই কান কাটা,
ত্রিভুবন দেখাল মোরে চিলে বেটা ;
গাছে মারলাম চিলের ছা,
জলে ডুবালাম বধূর না',
যে না জানে টিপের ঘা
তার কাছে গিয়ে টিপ টিপা !

হাতের কাজ

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

সব কথা সকলকে বোঝানো যায় না। সব কথা সকলে বোঝে না ? নাকি বুঝতে চায় না ? কে জানে !

এককালে আমি অনেককে অনেক রকমে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এখন আর করি না। অদৃষ্টে যা দুর্ভোগ আছে তা ভুগতেই হবে। উপায় কি ?

কথাটা হচ্ছে এই, যে, আমার স্মরণশক্তি একটু কম। সব বিষয়েই কম না, কোনো-কোনো বিষয়ে কম,—মারাত্মক রকম কম। কোন্-কোন্ বিষয়ে আমার স্মরণশক্তি সাঙ্ঘাতিক কম ? আরে,

সে কথা পষ্টাপষ্টি বলতে পারলে তো আদ্ধেক গোলমালই মিটে যেতো! আমি অনেক বেশি সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পরতাম, তোমাদেরও এ গল্পটি পড়বার ঝামেলা সইতে হ'তো না।

তবে হ্যাঁ, একটা বিষয়ে আমার স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। ভূগোল থেকে যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রে দ্যাখো, আমি টপাটপ্ নির্ভুল জবাব দেবো। হিমালয় পর্বতের উচ্চতা কতো, আটলান্টিক কতোখানি গভীর, পৃথিবীর সব চেয়ে লম্বা নদী কোন্‌টা, বদ্বীপ, ভূমিকম্প, হ্রদ, লেগুন, উত্তমাশা অন্তরীপ—এ সব বিষয় আমার কণ্ঠস্থ। হেঁ-হেঁ, এই শর্মাই কৈলাসচন্দ্র হাই স্কুলে ভুগোল পড়িয়ে থাকে।

কিন্তু পৃথিবীতে ভুগোল ছাড়াও বহুবিধ বিষয় আছে। এবং তারাই আমাকে নাজেহাল ক'রে থাকে।

আমার স্ত্রী হামেশাই উদরের পীড়ায় ভোগেন। থানকুনি পাতা, কাঁচকলা ও শিঙিমাছের ফরমাস তিনি গত তিরিশ বছর যাবৎ প্রত্যহ আমাকে দিয়ে আসছেন। এবং গত তিরিশ বছরের প্রায় প্রত্যহই আমি ও-তিনটি জিনিষ বাদ দিয়ে বাজারের যাবতীয় বস্তু বাড়িতে এনেছি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, আমার স্ত্রীর উদরের পীড়া কমে নি। ঐ পীড়াতেই মারা যাবেন ব'লে তিনি আমাকে অহরহ শাসাচ্ছেন।

এখানে আবার একটা গোলমালের সূত্রপাত হ'লো। উদরের পীড়ায় মারা যাবার জন্যে আমাকে দায়ী করা বা নিজেকে দুঃখিত করার কোনো মানে হয় না। উদরের পীড়ার বদলে ট্রামে চাপা পড়ার মৃত্যুতে সুখ কি খুব বেশি হ'তো?

—অ্যাঁ, তুমি আমায় অভিশাপ দিলে? তুমি আমায় ট্রামের তলায় চাপা পড়তে বললে?

ব্যস্, আমার স্ত্রীর কান্না সুরু হ'য়ে গেলো। সুরু হ'লো যখন সারা হবার অনেক দেরি আছে। চেরাপুঞ্জির বর্ষা সহসা থামবার কথা নয়। হুঁ-হুঁ, আমি কৈলাসচন্দ্র হাই স্কুলে নিয়মিত ভূগোল পড়াই।

বাড়ি থেকে এখন বেরিয়ে পড়াই প্রশস্ত। কিন্তু বেরোবার মুখেই অধরচন্দ্রের সঙ্গে দেখা। অধরচন্দ্র আমার পুত্র। লেখাপড়ায় অতীব তুখোড়। ভূগোলে সে আমার নাম রাখতে পারবে ব'লে ভরসা রাখি। ক্লাসের গত পরীক্ষায় ভূগোলে সে শূন্য পেয়েছে। ভূগোলে একটি গোলাকার নম্বর পেয়েই সে একসঙ্গে বাবার ও ভূগোলের সম্মান বজায় রেখেছে।

কিন্তু এই অধরচন্দ্রকেও আমি ডরাই। ভূগোল ছাড়াও পৃথিবীতে ফুটবল ক্রিকেট ইত্যাদি নানা রকম বিষয় আছে, এবং সে সব খবর অধরচন্দ্রের নখদর্পণে। কিন্তু আমি? হায়, আমার কথা আর কেন!

অধরচন্দ্র বললো—সেই কথাটা তোমার মনে আছে বাবা?

বললাম—কোন কথাটা বাবা?

অধরচন্দ্র বললো—সেই যে পর্শুদিন তুমি বললে? বললে না, আমায় একটা ফুটবল কিনে দেবে? তারপর কাল ফুটবলের বদলে একসের আলু নিয়ে এলে। মনে পড়ছে না?

মনে পড়েছে। বললাম—তা যা হবার হ'য়ে গেছে। ফুটবল আবার সামনের মাসে হবে। এ মাসটা তুমি ঐ গোল আলু দিয়েই কোনোরকমে চালিয়ে দাও।

অধরচন্দ্র মুখখানা কালো করে বিদায় নিলো।

কিন্তু তারপরেও আছে। না না, আছে নয়, আছেন। আমার কন্যা চিত্রলেখা। তিনি কলেজে পড়েন। তাঁকে আমি 'আপনি' ক'রেই ব'লে থাকি। তাঁর মায়ের চেয়েও তাঁকে আমি ঢের বেশি ডরাই। চিত্রলেখার উদরে কোনো গোলমাল নেই, কিন্তু আমার ধারণা তাঁর মস্তিষ্কে ··। না হে, ওসব ঘরোয়া কথা চাপা থাক।

কোনো ঘোরপ্যাঁচ না ক'রে চিত্রলেখা সরাসরি বললেন—ভূগোল ছাড়া আর কোনো কথা তোমার মনে থাকে না কেন বলতে পারো বাবা?

আমি চুপ।

চিত্রলেখা বললেন—একটা সিনেমা দেখবার কথা তোমায় বলবো ব'লে ভাবছিলাম, কিন্তু সে কথা আর না বললাম। আর বলবোই বা কাকে? এক কান দিয়ে শুনবে, আরেক কান দিয়ে বের ক'রে দেবে। বলো, মিথ্যে বলছি?

আমি তথাপি চুপ।

চিত্রলেখা বললেন—মনুমেণ্টের তলায় গিয়ে একদিন দইবড়া, আলুকাবলি, ফুচকা-টুচকা খাবার সাধ ছিলো বহুদিনের, তা সে কথাও যেতে দাও। ওসব তোমাকে বলবার কোনো মানে হয়, বলো?

কে বলে? আমি নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে নির্বাক্ হ'য়ে আছি। ত্রিভুবনে বোবার শত্রু নেই।

চিত্রলেখা তবুও থামলেন না। যাক গে। যে কথা তোমাকে বলবার কোনো মানে না থাকলেও আমাকে বলতেই হবে, সে কথাটা এবার বলা যেতে পারে। গত শীতকাল থেকে তুমি আমাকে একটা আশা দিয়ে রেখেছো। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি—হ্যাঁ, আমি সেই ছাতার কথাই বলতে চাচ্ছি। মোটরগাড়ী নয়, আইসক্রীমের কারখানা কিংবা এরোপ্লেন নয়, তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ একটা ছাতা। মনে আছে?

ঘাড় নাড়তেই হ'লো এবার। নির্বাক্ ভাবেই তিনবার ঘাড় নেড়ে জানালাম—মনে আছে, মনে আছে, মনে আছে।

চিত্রলেখা বললেন—জেনে সুখী হলাম। আজ কি আমি সেই ছাতাটা পাবো ব'লে আশা রাখতে পারি?

আজ নিশ্চয়ই, আজ নিশ্চয়ই, আজ নিশ্চয়ই।—তিনটি কথা ব'লেই আমি চিত্রলেখার সম্মুখ থেকে তন্মুহূর্তে সসম্মানে অপসৃত হ'লাম। (হুঁ-হুঁ, ভূগোলের মাষ্টার হ'লেও বাঙলা ভাষাটি কী রকম রপ্ত করেছি দ্যাখো!)

না, আজ আর কিছুতেই ভুলবো না। ছাতা আজ কিনবোই। ভুল ক'রে এ যাবৎ বিস্তর দুর্নাম কিনেছি, ছাতার কথা না ভুলে, ছাতাটি কিনে আজ তার একটি অন্যথা করতেই হবে। একটা স্থায়ী কীর্তি রেখে যেতে হবে সংসারে।

ছাতা যদি আজ ঠিকঠাক আনতে পারি (আনবোই, আনবোই, আনবোই) তো চিত্রলেখা নিশ্চয়ই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। আমার মেয়ে হ'লে কী হবে, চিত্রলেখা একজন অসাধারণ

মহিলা, ভবিষ্যতে হাইকোর্টের উকিল হবেন বলে আশা রাখেন। চিত্রলেখার প্রশংসা যদি আমি পাই তো আর কিছু চাই না। চিত্রলেখার সেই প্রশংসা আমি লিখিত ভাবে নেবো, সেই প্রশংসাপত্র আমি দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমার শয়নকক্ষে টাঙিয়ে রাখবো। আঃ!

ভবানীপুর। রাধাকান্ত রেষ্টুরেণ্ট।

দিব্যি নিরিবিলি আছে জায়গাটা। বসে অর্ডার দিলাম—এক কাপ চা। গরম গরম চা।

পৃথিবীর কোন্ স্থানে উৎকৃষ্ট চা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জন্মায়?—কাল ক্লাশে ঢুকে এই প্রশ্নটিই জিজ্ঞেস করবো ছাত্রদের। দু-বেলা তো সমানে চা খেয়ে যাচ্ছো, প্রশ্নটির ঠিকঠাক জবাব দাও দিকি বাছাধনেরা। ভূগোল, বাবা, অত সহজ সাবজেক্ট নয়!

অদৃষ্ট গ্যাখো আমার, নিরিবিলি দেখে এখানে এসে বসেছি তো চুপচাপ, অবিলম্বেই একজন ফিটফাট ভদ্রলোকের আগমন হ'লো। বসলেন তিনি আমার মুখোমুখি। এবং বসতে না বসতেই অর্ডার—একটা মাটন চপ, দুটো কবরেজি কাটলেট, তিনটে পুডিং। জলদি করো। ওঃ হো, ডবল মামলেটও দিও একটা কড়া ক'রে।

সহসা যেন আমার দিকে চোখ পড়লো ভদ্রলোকের। বললেন—আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো?

বললাম—আমার অসুবিধে হবে কেন? আমি তো ওসব কিছু খাচ্ছি না।

ভদ্রলোক জিভ কাটলেন। বললেন—ছি ছি, সে কথা নয়। আপনার অনুমতি না নিয়েই আপনার টেবিলে বসে পড়লাম কিনা! মানে, সাহেবদের দেশে আপনি এটি পাবেন না। ওদের আদবকায়দা···ওঃ, চপ্‌টা এসে গেছে।

চোখের পলকে চপ্‌টা উড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক। বললেন—কী করা হয় মশায়ের জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

গম্ভীর মুখে বললাম—আমি কৈলাসচন্দ্র হাই স্কুলে নিয়মিত ভূগোল পড়াই।

—ভূগোল? জিওগ্রাফি?—ভদ্রলোক যেন নতুন একটা দেশ আবিষ্কার করলেন।—গুড্ গড্। ভূগোলের একটা প্রশ্নের জবাব আমি এই আধঘণ্টা ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কেউ বলতে পারে না! কেউ কিস্যু জানে না। খুঁজতে খুঁজতে আমার বিপুল ক্ষিদে পেয়ে গেছে। আপনি আমার একটু হেল্প করবেন স্যর?

ভূগোলের প্রশ্ন? আমার কাছে—নস্যি।

বললাম—শুনি আপনার প্রশ্নটা।

একটা কাটলেট শেষ করে ভদ্রলোক বললেন—এই, গদাধর গয়লা ফাষ্ট লেনটা কোথায় হবে বলুন দিকি স্যর? কেউ হদিস দিতে পারছে না।

ভূগোলের প্রশ্ন? গদাধর গয়লা হলো গিয়ে ভূগোলের বিষয়? ইডিয়ট!

আমি একটিও কথা বললাম না। চায়ের দাম দিয়ে ছাতাটি হাতে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। সংসারে ছাতার মতো উপকারী বন্ধু আর কেউ নয়।

কিন্তু অবিলম্বে বোঝা গেলো এই ছাতাটার মতো শত্রুও আমার কেউ হয় নি, হয় না, হবে না। সেই ভদ্রলোক একলাফে উঠে এসে আমার বাঁ হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন—দিব্যি ব্যবসা ফেঁদেছেন স্যর।

বললাম—ব্যবসা-ট্যাবসা আমি করি না। আমি কৈলাসচন্দ্র হাই স্কুলে ভূগোল পড়াই। হাত ছাড়ুন।

ভদ্রলোক হাত ছাড়লেন না। বললেন—চেহারা দেখে আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম যে আসলে আপনি একটি···

রাগে আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠলো। বললাম-আমি একটি···? বলুন, বলুন।

—হ্যাঁ, আপনি একটি ছাতাচোর। একটি ছাতাচোরচূড়ামণি।

সর্বনাশের কাণ্ড ক'রে ফেলেছি। ভদ্রলোকের ছাতাটিকে আমি নিজের ছাতা ভেবে··। ছাতাটি ভদ্রলোককে ফেরৎ দিলাম, বার বার ক্ষমা চাইলাম ভদ্রলোকের কাছে। আমার স্বভাবের কথা, স্মরণশক্তির নানা কাহিনী শোনালাম ভদ্রলোককে। কিন্তু ভদ্রলোক কোনো কথাই বিশ্বাস করলেন না, নিজের ছাতাটি বগলে নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে লাগলেন। এক সময় হাসি থামিয়ে বললেন—আমার নাম রসময় শর্মা স্যর! যত রসের কথাই বলুন এ-শর্মা কিছুতে ভুলবার নয়। তা ছাড়া···একটা সত্য কথা বলবো?

শুকনো গলায় বললুম—বলুন।

—আপনার চেহারাটাই একটি পাকা ছাতাচোরের মতো স্যর! আপনার লাইনে আপনি সকলকে নস্যাৎ করে দিতে পারবেন। যথার্থ ছত্রপতি হতে পারবেন।

আমি আর দাঁড়ালাম না। ছত্রপতি? ইস্, শেষকালে ছাতা চুরির দায়েও পড়তে হলো আমাকে! যাক্ গে, যা হবার হয়ে গেছে, চুকে-বুকে গেছে। এ-জীবনে এই ভদ্রলোকের (রসময় শর্মা নাম বললো না?) সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হলেই হ'লো।

ছাতা নিয়েই এত কাণ্ড তো! পলকে সাব্যস্ত করে ফেললাম—ছাতা কিনবো। আজই কিনবো। এখুনি কিনবো।

ভগবান আছেন্। পাশেই ছাতার দোকান। অসংখ্য ছাতা। সবগুলো ছাতা যেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে, যেন বলছে—আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক স্যর।

ভালো দেখে একটা ছাতা কিনলাম নিজের জন্যে। এই গ্যাখো, ভালো কথা মনে পড়লো চিত্রলেখার (আমার কন্যা) একটা ছাতা? দিন, দিন, আরেকটা লেডিজ ছাতা দিন।

আমার পুত্র অধরচন্দ্রকে কি কখনো ছাতার কথা বলেছিলাম? মনে পড়ছে না তো! তা হোক, নিই ওর জন্যেও একটা কিনে। কাজে লাগবে।

অধরচন্দ্রের জন্যেও একটা ছাতা কেনা হলো।

সকলের জন্যেই হলো, আমার স্ত্রী আর তাহলে বাদ যান কেন? আমার স্ত্রী যদিও পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে পা বাড়ান না, তবু স্ত্রীর একটা ছাতা থাকলে আমার পক্ষে ভালো হয়। ছাতা আড়াল দিয়ে উনি দিব্যি কাঁদতে পারবেন। আমার আর সব সময় স্বচক্ষে বর্ষণ দেখতে হবে না।

—দিন, আরো একটা লেডিস ছাতা দিন।

সর্বসাকুল্যে চারখানা ছাতা নিয়ে দোকান থেকে নামলাম। না, ভুল হয় নি, দাম দিয়েছি, ক্যাশমেমো নিয়ে বুকপকেটে রেখেছি। আমার আনন্দ আর ধরে না। ইচ্ছে করলে এখন আমি সপরিবারে চেরাপুঞ্জি গিয়ে নির্ভাবনায় বেড়িয়ে আসতে পারি।

দু'পা যেতে-না-যেতেই সেই রসময় শর্মার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো।

হাতজোড় করে রসময় শর্মা বললো—নমস্কার স্তর! নমস্কার, নমস্কার।

রসময়কে আমার নমস্কার করবার ইচ্ছেও নেই, উপায়ও নেই। চারখানা ছাতা দু'খানা হাতে আগলে আছি।

রসময় শর্মা আবার বললো – নমস্কার, নমস্কার।

নমস্কারের ঘটা দেখে বোধ হচ্ছে রসময় এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে আমি ভূগোলের মাষ্টার মশাই বটি, ছাতাচোর নই।

রসময় ফ্যাক ফ্যাক করে হাসলো। বললো—বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার খুরে-খুরে দণ্ডবৎ। ইচ্ছে হলে আপনি চোখের পলকে হাওড়ার পুল লোপাট করতে পারেন, মনুমেণ্ট হজম করে দিতে পারেন। নিজের লাইনে আপনার কোন তুলনা নেই—সেখানে আপনি যথার্থ ছত্রপতি। মনিব্যাগ নয়, ফাউণ্টেন পেন নয়, একখানা নয়, দু'খানা নয়—দশ মিনিটের মধ্যে চারখানা ছাতা হাতসাফাই করা চাট্টিখানি কথা নয়! এ রকম নিপুণ হাতের কাজ ক টা লোকের জানা আছে বলুন ?

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস

তীর্থঙ্কর

— কলকাতা থেকে আলমোড়া —

তোমরা অনেকেই হয়তো কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের সেই বিখ্যাত কবিতা "কৈলাস-বর্ণন" পড়েছ—

"কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ :
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস।"

মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূতে"ও কবি কৈলাসকে যক্ষের দেশের অন্তর্ভুক্ত

বলে ধরে নিয়েছিলেন। এই যক্ষের দেশের রাজার নাম ছিল কুবের, আর তাঁর রাজধানীর নাম ছিল অলকা। অলকা যেন মর্ত্ত্যের স্বর্গ। এখানে চিরকাল পূর্ণিমা, চিরযৌবন, চিরশ্যামলিমা! আরও কত কি!

আমি তীর্থঙ্কর, চলেছি তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে। আমারও অন্তরের ধ্যান সেই যক্ষের দেশের উপর। তবে অলকা নয়, তার পরিবর্ত্তে শ্রীকৈলাস। কৈলাস শব্দের অর্থ লীলাভূমি। এক কথায়—শিবের লীলা-নিকেতন। হরপার্ব্বতীর স্মৃতিসুষমামণ্ডিত অপরূপ রাজ্য এই শ্রীকৈলাস।

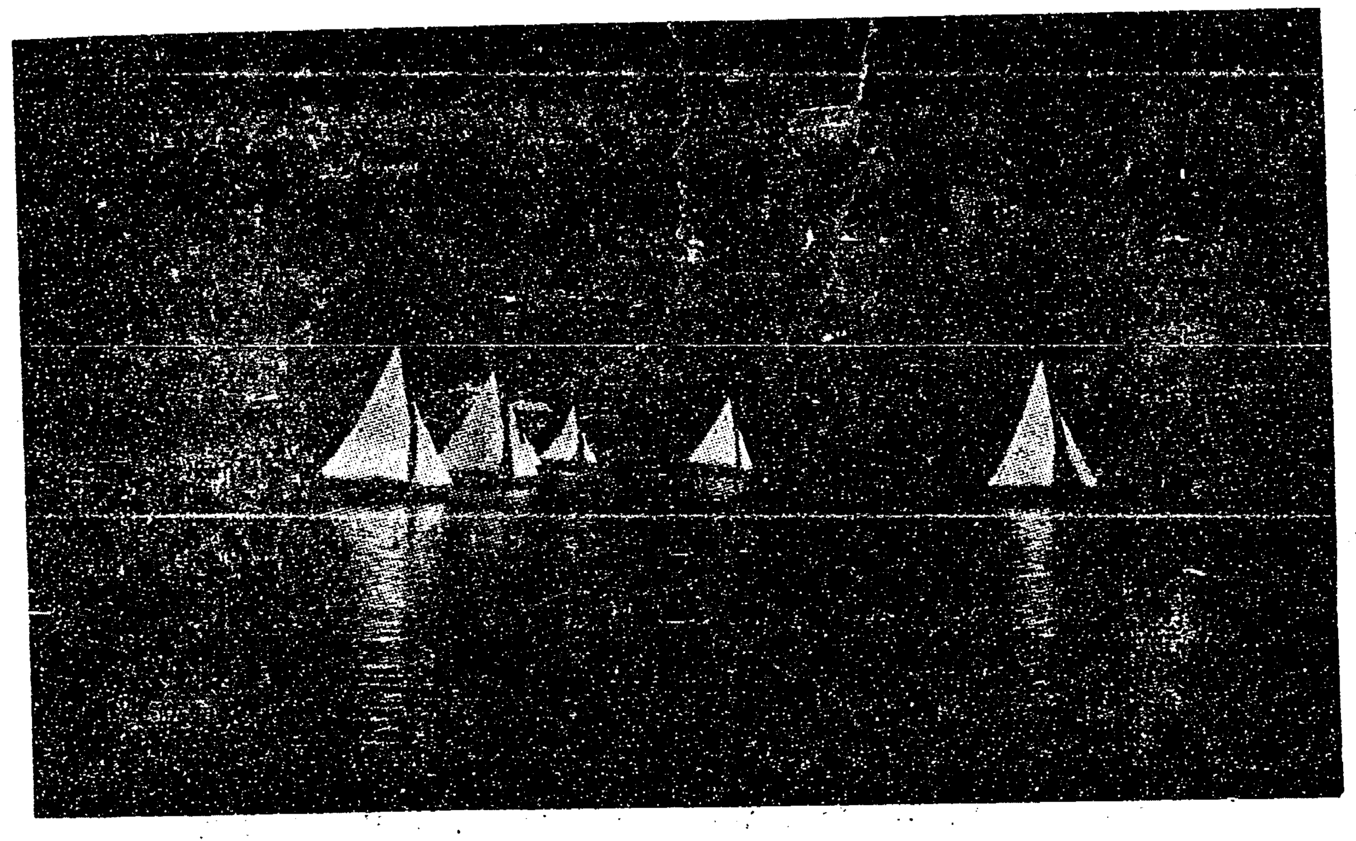

নইনীতালের একটি দৃশ্য

এর আগে আমি অনেক তীর্থে গিয়েছি। একবার নয়, একাধিক বার। বাকি ছিল শ্রীকৈলাস, মানস সরোবর ও রাবণ হ্রদ। তারই দর্শন-পিপাসা বহুদিন ধরে আমার মনকে পীড়া দিচ্ছিল।

কিন্তু মনে করলেই তো এই দূর দুর্গম তীর্থে যাওয়া যায় না। উপযুক্ত পাথেয় ও সঙ্গী পাওয়া চাই। শুধু কি তাই ? প্রকৃতিরূপা পার্ব্বতী ও দৈবরূপ পরমেশ্বরের প্রসন্নতাও লাভ করা চাই। ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা আর পথপ্রদর্শকেরা তাই দুটো জিনিষের উপর খুব বেশী ভরসা করে। তারা বলে, "কৈলাসপতিকা হুকুম নহী মিল্‌নেসে কোঈ নহী জা সকতা।" মোট কথা, দেবতার ডাক সবচেয়ে বড় ডাক। অন্তরের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দেবতার আশীর্ব্বাদ যখন আমার ভাগ্যে এক হোল—দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করার পর, তখনই সুযোগ মিলল। সেই সুযোগের কথা এখানে তোমাদের কাছে খুলে বলব।

আগের কথা একটু বলি, তা হ'লে ব্যাপারটা বোঝা একটু সহজ হবে। ১৩৫৬ সালের জুন মাস। সেবার আমরা যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ও গোমুখ দর্শন করে ফিরছি। গঙ্গোত্রীতে এসে আমরা মনে করলুম, এখনও কলেজ খোলে নি, আমাদের হাতেও

কিছু সময় আছে, আর একটু বেড়ান যেতে পারে। তাই ফেরবার পথে দেরাদূন, রাজপুর, কৃষাণপুর হয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা নৈনীতালে এলাম। সেখান থেকে রাণীক্ষেত হয়ে আলমোড়ায়।

বাস্ ষ্ট্যাণ্ডের সামনেই একটি ছোট্ট হোটেলে আমরা উঠেছি। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে অভয় মহারাজের আশ্রম "শ্রীরামকৃষ্ণ ধামে" গেলাম। মহারাজ তো খুবই অনুযোগ করলেন, বললেন, 'আলমোড়ায় এসে শেষে কিনা আপনারা হোটেলে উঠেছেন!' জোর করে তিনি আমাদের আশ্রমে নিয়ে এলেন। বেশ আনন্দের মধ্যেই দিন কাটতে লাগল এবং যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রীর পথের সমস্ত বিবরণ এখানে বসেই লিখতে সুরু করলাম। মহারাজ তাঁর লাইব্রেরী গুছিয়ে দেবার ভার আমার উপর দিলেন।

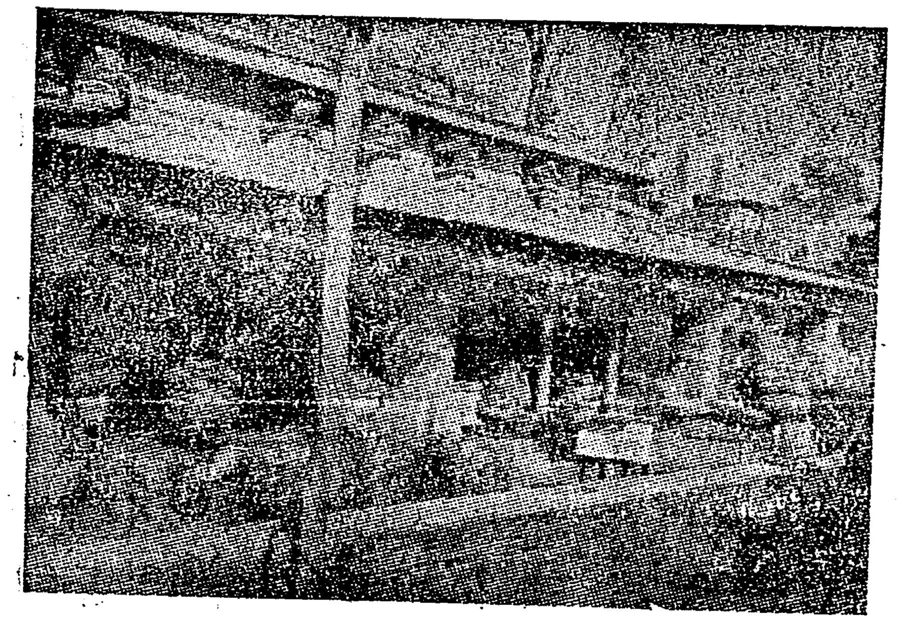

শ্রীরামকৃষ্ণ ধাম—আলমোড়া

মহারাজের "শ্রীরামকৃষ্ণ ধাম" বাড়ীটি দোতলা, কিন্তু সুন্দর বন্দোবস্ত। একতলার বারান্দায় সারি সারি বাক্স সাজান। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এগুলি হ'ল মৌমাছিদের ঘর-বাড়ী। আসলে অভয় মহারাজ হচ্ছেন একজন জীব-বিজ্ঞানী। তিনি এখানে থেকে এক ঢিলে তুই পাখী মারছেন। অর্থাৎ, নিভৃতে হিমালয়ের কোলে বসে ভগবৎ-সাধনার ধারা যেমন চালিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি আবার জীবের সেবাও করছেন। এখানে জীব বলতে মানুষ এবং মৌমাছি তুইই বোঝাতে চাই। এই সব বাক্সের মধ্যে দলে দলে মৌমাছি আসছে ও যাচ্ছে—তা আমরা সেখানে কিছুক্ষণ থাকতে থাকতেই লক্ষ্য করলাম। মহারাজের আশ্রম এক কথায় মধুময়। তাই আমরাও মধু প্রসাদ যথেষ্ট আস্বাদন করলাম। চায়ে মধু, রুটিতে মধু, পাঁউরুটিতে মধু, সব কিছুতেই মধু। দেখে প্রাচীন ঋষিদের মধুবিদ্যার কথা মনে পড়ে গেল—

"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ..."

বারান্দার ঠিক বাঁ-পাশে মহারাজের ল্যাবরেটরী—ছোট হলেও এটি একটি দেখবার মত জিনিষ বটে। কত কি সাজ-সরঞ্জাম! সব কিছুর অর্থ বুঝলাম না বটে, আমি তো নিজে বৈজ্ঞানিক নই, তবে মহারাজ যেটুকু বুঝিয়ে দিলেন তার থেকে এই জ্ঞান হ'ল যে তাঁর মধু আদায়ের উপায়টি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বলেই এত যন্ত্রপাতির আয়োজন।

এর আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, কে. এম. মুন্সী প্রভৃতি যাঁরাই এখানে এসেছেন তাঁরাই পরিদর্শন করে গেছেন তাঁর এই মধুমক্ষীপালন-পদ্ধতি।

দেখতে দেখতে মহারাজের দেওয়া কাজ শেষ করে ফেললাম। কাজ বলতে এমন কিছুই নয়। তাঁর লাইব্রেরীর বইগুলি ঝেড়েমুছে গুছিয়ে দেওয়া এবং পুস্তকের একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেওয়া। এর পর মহারাজ একদিন তাঁর ফটো-এলবাম্‌গুলি আমায় দেখতে দিলেন। ঐ সব ফটো-সংগ্রহের মধ্যে থেকে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, শ্রীকৈলাস, মানস সরোবর প্রভৃতির ফটোগুলি আমার মনকে একদম ভুলিয়ে দিল। আমি মহারাজের মুখ থেকে ঐ সব জায়গার ভ্রমণকাহিনী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলাম। তিনিও পরম আগ্রহে তাঁর তীর্থ যাত্রার বিবরণ বলে যেতে লাগলেন। সব শেষ কথা তাঁর,—যেটুকুর মধ্যে এই সমগ্র ভ্রমণ-বৃত্তান্তের রহস্যটুকু নিমজ্জিত ছিল,—সেটি হচ্ছে তাঁর যাত্রসহচর পার্ব্বত্য কিচ্‌খাম্পার অপূর্ব্ব সরল, উদার ও অমায়িক সহযোগিতা।

আশ্রমে মৌমাছির ঘর

কিচ্‌খাম্পা এক অপূর্ব্ব মানুষ। আজ চার পুরুষ ধরে এই ভারত-তিব্বত সীমান্তে এসে সে সপরিবারে বাস করছে। তার কাজ,—কাজ কেন, সারা জীবনের ব্রত,—যত যাত্রীকে পথ দেখিয়ে শ্রীকৈলাস ও মানস সরোবরে নিয়ে যাওয়া। এই গাইডের কাজ করে তার বছরের কোন এক পর্ব্বে যা উপার্জ্জন হয় তাই ভাঙিয়ে সে সারা বছর খায়। কিন্তু শুধু কি গাইড বল্লেই তার পরিচয় সমাপ্ত হয়? বোধ হয় না। সে নিরক্ষর হলেও তার মাতৃভাষা ছাড়াও হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ভাষাগুলি জানে। বড় হয়ে তোমরা যদি কখনও তিব্বতের কিংবা ভারত-তিব্বত সীমান্তের কথা ভাল করে পড়, তা হলে স্বামী প্রণবানন্দজীর নাম শুনবে। তিনি পশ্চিম তিব্বতে বহুবার পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করে সেখানকার মাপজোঁক করে ভারত সরকারকে সঠিক খবর জানিয়েছিলেন। ঐ একই সঙ্গে তিনি মানস সরোবরের কাছে একটা উষ্ণ প্রস্রবণও আবিষ্কার করেন। এ ছাড়া তিনি ক্রমে ক্রমে সিন্ধুনদ, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণালী ও শতদ্রু নদীর উৎসও আবিষ্কার করেছিলেন, এবং তার দ্বারা ডাঃ স্বেন হেডিনের বর্ণনার ভুলগুলি সংশোধন করে দিয়ে সারা বিশ্বের কাছে একজন বড়দরের ভৌগোলিকের সম্মানও পেয়েছিলেন। তা হলে বুঝে দেখ, আমার যে পথপ্রদর্শক সে কত প্রাচীন এবং অভিজ্ঞ

যে সে কয়েকবার এই স্বামী প্রণবানন্দজীকেও রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে সারাটা পশ্চিম তিব্বত অঞ্চলকে জানতে ও বুঝতে সহয়তা করেছিল। এই সব অঞ্চল যেমন দুর্গম তেমনি এর পথের দূরত্বও একটা ভয় ও বিস্ময়ের ব্যাপার। চিরকালই এই এক রকম। তাই দুঃসাহসী যাত্রী ছাড়া কেউ এদিকে পা বাড়াতে সাহস করে না। শুধু তাই নয়, বাঘের মত সাহসীও হওয়া চাই। দোভাষী গাইডের সাহায্য ছাড়া সেখানে এক পাও চলবার উপায় নেই। আর সবার উপর সকলের ভরসা বাবা কৈলাসপতির অশেষ করুণা।

যাই হোক, অভয় মহারাজের কথা খুবই সত্য। তিনি আমাকে শ্রীকৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করার দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় এই গাইডটির সংবাদ দিয়ে অশেষ উপকার সাধন করে দিলেন।

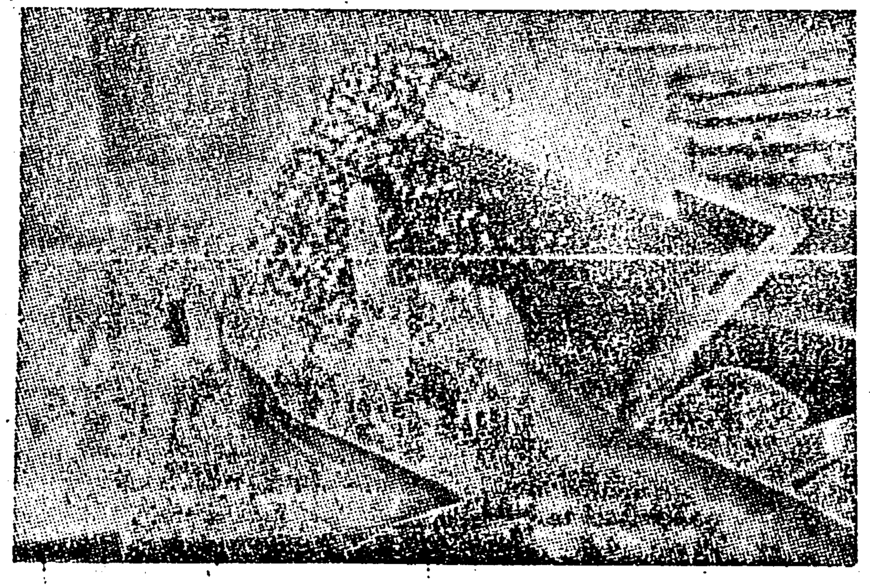
মৌমাছি পালনের আর একটি দৃশ্য

পরে যখন আমার সঙ্গে কীচখাম্পার পরিচয় হ'ল তখন বাস্তবিকই আমি তার কথাবার্ত্তা শুনে ও আচারব্যবহার দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি নি। সমতলের মধ্যে এমন সরল মানুষও বোধ হয় দেখি নি। যেমন লোভহীনতা, তেমনি উদারতা, আর তার সঙ্গে অপূর্ব্ব ধর্ম্মভীরুতা জড়িয়ে তার চরিত্রকে হিমালয়ের মত শুভ্র মহিমামণ্ডিত করে দিয়েছিল। একজন সিদ্ধ সাধু পুরুষকে যতখানি মহৎ ও পবিত্ররূপে দেখতে পাই, কিচ্খাম্পাও তাঁর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এর আগে মোট ছিয়াশি বার সে শ্রীকৈলাস ও মানস সরোবরে বিভিন্ন যাত্রীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। এ কিন্তু অর্থের লোভে নয় এই শ্রীকৈলাস ও মানস সরোবরের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এর ভিত্তি। নিজের শতবার শ্রীকৈলাস ও মানস সরোবর প্রদক্ষিণের ব্রতের সঙ্গে সে জড়িয়ে নিয়েছে পরোপকারের এই মহাব্রত।

১৩৬৩ সালে শ্রীকৈলাস ও মানস সরোবরের এই প্রায় একমাত্র গাইড এবং দোভাষী এল কলকাতায়। এর আগে তার সঙ্গে আমি চিঠি লিখেই আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলাম। সে চিঠিতেই আমার যাত্রার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিল। চৌদ্দ বছর বয়স থেকে প্রত্যেক বছর দু'বার অথবা তিনবার করে সে কৈলাস দর্শন করে—অর্থাৎ যাত্রীদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। প্রথমে সে কলকাতায় এসে বেলুড় মঠে উঠল। আমার বন্ধু ব্যোমকেশ

চট্টোপাধ্যায় তাকে সেখান থেকে তাঁর বাড়ী ভবানীপুরে নিয়ে এলেন। মোট দিন ৪।৫ কিচ্খাম্পা এখানে ছিল। আমি খবর পেয়ে বন্ধুবরের বাড়ীতে গিয়ে কিচ্খাম্পার সঙ্গে আলাপ জমালাম। শুধু আলাপ কেন বলি, নানা প্রসঙ্গ নিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হোল।—একদিন নয়, কয়েক দিন ধরেই। সবশেষে এবং সবার ওপর আমাদের যাত্রার প্রস্তাব আবার পাড়লাম। সে আমাদের পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণোপযোগী বেশভূষা ও সাজ-সরঞ্জামের কথা বলে দিল, আর যাত্রার সময় জানিয়ে দিল আগামী বৎসরের জুন-জুলাই মাস। মোট দশ দিন সে কলকাতায় ছিল। তারপর সে কাশী হয়ে তার ডেরায় চলে যায়।

কাজকর্ম্মের মধ্যে দিয়ে ১৩৬৩ সাল পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। এল ১৩৬৪ সালে। আমি ও আমার আর দুই বন্ধু—বিনয় বাবু ও সুশান্ত বাবু যাবেন স্থির হোল।

খুঁজে খুঁজে এই কলকাতার হাট-বাজার থেকেই আমাদের আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র যোগাড় করে নিলাম। জিনিষপত্র বলতে দু' জোড়া পার্ব্বত্য পথে চলবার মত জুতো, একটি সবুজ কাচের চশমা, একটি বর্ষাতি, ওভার-কোট, সোয়েটার ইত্যাদি। আর রইল প্রচুর শুকনো মেওয়া, ফলমূল—চায়ের সরঞ্জাম, ওভালটিন, কফি, কোকো ইত্যাদি।

অবশেষে যাত্রার দিন স্থির হল ২৭শে মে। চারদিন আগে টিকিট কাটা হয়ে গেল। বন্ধু দু'জন আমার কিছু আগেই চলে গেলেন। স্থির হ'ল আলমোড়ায় সকলে একত্র হব। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল হরিদ্বার দেখা। আমার তো হরিদ্বার বহুবার দেখা আছে। তাই আমি গেলাম তাঁদের পিছনে, পৃথক্ ভাবে এবং সোজা পথে।

নতুন বই

রং বেরং—শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান : ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

সতীন্দ্রমোহন এক সময়ে বাংলার ছোটদের জন্য নানা কাগজে অনেক ছড়া ও কবিতা লিখিয়াছেন। সন্দেশ, শিশুসাথী, রামধনু, রাজভোগ, কৈশোরক, খোকাখুকু প্রভৃতি পত্রিকায় এক সময়ে তাঁহার বহু কবিতা ছাপা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে গুটিকতক বাছাই করিয়া রংবেরংএ প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিতাগুলির ভাষা সহজ ও সরল। কয়েকটি কবিতা আছে প্রাণীদের উপর,—যেমন খেঁক-শিয়ালী, গঙ্গা ফড়িং, আয় রে ও মাছের দল, নাচে ভালুক মশাই, পানকৌড়ি, জোনাকি প্রভৃতি। তা ছাড়া ছোটদের হাসি যোগাইবার মতও কয়েকটি ছড়া, কবিতা আছে। শব্দচয়ন, ছন্দনৈপুণ্য ও মিলের দিক্ দিয়াও ত্রুটীহীন। সুরঞ্জিত প্রচ্ছদপট। ভিতরের ছবিগুলিও দুইরঙা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ—স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সংকলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ (উত্তর প্রদেশ) থেকে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ ছিলেন পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য। শৈশবে তাঁর নাম ছিল রাখতুরাম। তাই থেকে হ'ল লালটু। পরমহংসদেব আদর করে ডাকতেন 'লাটু'। পরবর্তীযুগে 'লাটু মহারাজ' নামেই তিনি পরিচিত হ'ন। ছাপরা জেলার এক দরিদ্র পরিবারে জন্মে এবং প্রথম জীবনে বালকভৃত্য রূপে কাটিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে চরম উন্নতিলাভ করেন এবং সারা জীবন সাধনভজনে কাটিয়ে ১৯২০ সালে দেহরক্ষা করেন। সামান্য বংশে জন্মে এবং কিছুমাত্র লেখাপড়া না শিখেও মানুষ যে কত উঁচুতে উঠতে পারে লাটু মহারাজের জীবনে আমরা তা দেখতে পাই। এই মহাপুরুষ যে সব জ্ঞানগর্ভ ধর্ম-উপদেশ দিয়ে গেছেন তার কিছু কিছু সংগ্রহ করে 'সৎকথা' নামে একটি বই ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইখানিতে সেই সব উপদেশের আরো কিছুটা সংকলন করে প্রকাশ করা হয়েছে। অনেক বড় বড়—গভীর তত্ত্বকথা, কিন্তু এত সহজ ভাবে সরল ভাষায় সেগুলি বলা হয়েছে যে ছেলেবুড়ো সকলেই তা পড়লে উপকৃত হবে। এ রকম বইএর বহুল প্রচার একান্ত কাম্য।

গল্প লেখা হ'ল না—শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

ছোটদের গল্প লেখায়—বিশেষ করে হাসির গল্প লেখায় চারু বাবুর হাত কি অসম্ভব আকর্ষণীয় তা রামধনুর পাঠকেরা জান। চারু বাবু ছোটদের জন্য খুব অল্প লেখেন—ইদানীং সেটা আরও কমিয়েছেন, কিন্তু যা লিখেছেন তার সব ক'টিই প্রায় অনবদ্য। এই বইতেও তাঁর সেই রকম ১০টি সুন্দর গল্প সংকলন করা হয়েছে। এর কোন কোনটা তোমরা রামধনুতেও পড়ে থাকবে। প্রথম গল্পের নাম থেকেই বইটির নামকরণ হয়েছে। লেখার ভঙ্গী, ভাষার মাধুর্য্য আর গল্পের রসে এর সব ক'টি গল্পই সমান চিত্তাকর্ষক। এ ধরণের গল্প তাঁর কাছে আমরা আরো অনেক—অনেক চাই। বাংলা দেশের কিশোর পাঠকপাঠিকারাও নিশ্চয়ই সেই রকমই দাবী করবে।

সিপাহীযুদ্ধের গল্প—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। প্রকাশক এন্. কে চক্রবর্ত্তী, ২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ইংরেজ আমলে ভারতের প্রথম সত্যিকার জাতীয় উত্থান হচ্ছে সিপাহীযুদ্ধ। আজ থেকে ঠিক একশ' বছর আগের ঘটনা। বিদেশী সরকার যদিও এর নাম দিয়েছিলেন সিপাহী বিদ্রোহ, তবুও এটাই যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম তা আজ সর্বত্রই স্বীকৃত। ইংরাজ আমলে এ সম্পর্কে যে সব তথ্য জানা যায় নি—এখন, নতুন ঐতিহাসিকদের চেষ্টায়, তা ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত

হচ্ছে। এই নতুন আলোকে ছোটদের জন্য সিপাহীযুদ্ধের কাহিনী শুনিয়েছেন কিশোরসাহিত্যের শক্তিশালী লেখক শ্রীধীরেন্দ্রলাল। ছোট্ট করে লেখা, কিন্তু অনেক নতুন কথা—সুন্দর ভাষায়, পরম আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন তিনি।

ভাল কাগজে ঝরঝরে ছাপা বই, সুদৃশ্য এবং সুরুচিপূর্ণ মলাটটিও উল্লেখযোগ্য। ভিতরে সিপাহীযুদ্ধের নায়কনায়িকাদের ছবিও আছে কয়েকখানি।

লেখা চাই (ছোটদের মাসিক পত্র)—সম্পাদক শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, বি.টি। পোঃ দেবালয় (২৪ পরগণা)। বার্ষিক চাঁদা ২ টাকা।

মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত এই স্বল্পায়তন ছোটদের পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা আমরা পেয়েছি। প্রধানতঃ তরুণ লেখকদের সাহিত্যসাধনায় উৎসাহ দেওয়াই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই ছোটদের নতুন হাতের রচনাতেই এর অধিকাংশ পৃষ্ঠা ভরা। মাঝে মাঝে ২।১ জন খ্যাতনামা লেখকের রচনাও যে নেই এমন নয়। সম্পাদক যে ব্রত গ্রহণ করেছেন তাতে সাফল্য লাভ করুন এই কামনা করি।

শ্রীগৌরী দেবী

যে গল্প জানা নেই

শ্রীরণেন্দ্র ও শ্রীরবীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

— পনেরো —

মা যখন ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, গোপাল তখন ভাবছে—কত আশা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরের বুকে গিয়েছিল, চোখের সম্মুখে ছিল নতুন দিনের আলো। কিন্তু শেষে ফিরল কিনা কলঙ্কের বোঝা নিয়ে!

—'গোপাল!'—স্নেহ-ঝরা আহ্বান।

গোপাল ফিরে তাকায়। মা এসে দাঁড়িয়েছেন; পেছনে দিদি উমা। গোপাল ঝুপ করে লুটিয়ে পড়ে মায়ের পায়ে, টপ্ করে গড়িয়ে পড়ে এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু।

—'আমি জানি গোপাল! তুই আমার সে ছেলে ন'স! আমি তো তোকে সে শিক্ষা দেই নি!' স্নেহার্দ্র স্বরে বলতে বলতে মা গোপালকে টেনে নেন নিজের বুকে।

ক'দিন পর। সন্ধ্যার পরে গোপাল একটা বই খুলে বসেছে প্রদীপের আলোয়। উমা খোকনকে ঘুম পাড়াচ্ছে। পাশের ঘরে মা বাবা বসে বসে কি বলাবলি করছিলেন। হঠাৎ গোপালের কানে এল বাবা বলছেন—'আমি বলি, যাই হয়ে থাকুক, গোপালকে না হয় আবার পাঠিয়ে দাও কলকাতা।'

গোপালের বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে।

মা বললেন—'না, আর দরকার নেই। বাছা আমার এখানেই থাক। আত্মীয়ের বাসায় ছেলে রেখে খুব শিক্ষা হয়েছে। বাছাকে আমার শান্তটি পেয়ে কত জ্বালাতনই না করলে! থাক্ আমার ছেলে মূখ্যু, কিন্তু অপমানের বোঝা আর আমি ঘাড়ে নিতে পারব না।'

'কিন্তু আজকালকার দিনে একটু ভাল করে লেখাপড়া না জানলে কি চলবে? তাই বলি, দাও পাঠিয়ে আর একবার। ওরাও নিশ্চয়ই জানে যে সত্যি তোমার গোপাল কোন কুকার্য্য করে নি।'

কথা শেষ হতে না হতেই উমা ঘরে ঢুকল। গোপাল ফের বইএর ওপর ঝুঁকে পড়ল।

পরদিন বেলা বাড়তেই সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়ল উঠোনের সজনে গাছের ডালে, আর ঠিক তখনই পিয়ন এসে হাজির। গোপালের নামে দু'দু'খানা চিঠি এসেছে। খামের ওপরকার হাতের লেখা দেখেই গোপাল চিনল—একখানা লিখেছেন অমিয়র দাদা সাহিত্যিক অশোক বাবু, আর একখানার হস্তাক্ষর তার কাছে অচেনা। (ক্রমশঃ)

বান্ধবীকে

শ্রীসুচেতা ভট্টাচার্য্য

সেই সে চিঠি লিখতে বসে
আর দেখা নেই 'রীণা',
ভুলেই গেলে নাকি আমায়?
দেখছি চেন কিনা!
যখন হ'ল প্রথম আলাপ
দাজ্জিলিংএর পথে
ওভারকোট এক জড়িয়ে গায়ে
দাঁড়িয়ে কোনও মতে,
'ম্যালে'র ধারে নিত্য দু'জন
সঙ্গী হয়ে দেখা,

কতই কথা! সে সব নিয়ে
গল্প চলে লেখা।
পাইন-বনের পাতার ফাঁকে
ধূসর পাহাড়-চূড়ো,
এখনও সেই পথের তরে
মনটা উড়ো উড়ো।
বেশ দু'জনায় কাটিয়েছিলুম
দলের দু'টি হয়ে,
আচম্কা সেই সুর এসে যায়
আমার কানে বয়ে।

'নূপুরদি'কে পড়ছে মনে?
কা সিয়াংএর পথে
আমরা ক'জন যাত্রী শুধু
চলছি চরণ-রথে!
'শুক্লা' এখন জাপানবাসী—
আর দেখা নেই তার

'কাজলা'দি তো সেদিন এলেন,
হয় নি দেখা আর।
তবুও দেখি তোমার মনে
পড়ছে কিছু কিনা,
চিঠির আশায় রইনু বসে,
আর কি লিখি রীণা?

তাসের রাজা তাসের রাণী

যাদুরত্নাকর এ. সি. সরকার

তাসের রাজারাণী!
চোখ বাঁধো মোর আচ্ছা করে,
কিম্বা রাখো টিপেই ধরে,
তবু বেছে দেবই আমি আনি—
তাসের রাজা-রাণী…

এই যা! কবিতা লিখে ফেললাম যে! লিখেই যখন ফেলেছি তখন আর কী করা যাবে—যাক্ গে! সাদা কথায় বলছি শোন আসল কথা।

সেবার লণ্ডনে থাকা কালে ওভারসীজ্ লীগ্ নামক বিখ্যাত ক্লাবে কয়েকজন বন্ধুর সামনেই আমি প্রথম দেখাই এই খেলাটি। খেলাটি এত চমৎকার যে এ দেখে সবাই হন চমৎকৃত,—ছেলেবুড়ো সবাই! চমৎকৃত হবার কথাই যে! এক প্যাকেট তাস। দর্শকেরা খুব ভাল করে শাফল্ করে এই প্যাকেটটির সবগুলো তাস ঢেলে দিলেন আমার টুপীর মধ্যে [বলা বাহুল্য এই টুপীটি আগেভাগেই উপুড় করে ঝেড়ে নেওয়া হয়েছে], আর সেটিকে ঢাকা দেওয়া হ'ল একটি রুমাল দিয়ে। এইবার আর একটি রুমাল দিয়ে আমার চোখ খুব 'টাইট' করে বেঁধে দেওয়া হ'ল। টুপির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আমি কবিতা আওড়ালাম মুখে—

তাসের রাজরাণী,
কোথায় আছ লুকিয়ে বসে
সঠিক আমি জানি।

এই কবিতা আওড়াতে আওড়াতে দু' হাতে আমি বের করে আনলাম দু' গোছা তাস। এক হাতে চারটে রাণী, অন্য হাতে চারটে রাজা। এ বের করতে আমার কয়েক সেকেণ্ডের বেশী লাগল না।

কাণ্ড দেখে তো সবাই হলেন অবাক্। তাই তো, কেমন করে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা করা সম্ভব হ'ল?—তোমরাও কি অবাক্ হও নি? কিন্তু ভাই, কৌশলটা যখন তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দোবো তখন তোমাদের বিস্ময় কর্পূরের মতন উপে যাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে।

কৌশলটি খুবই সহজ। আগে থেকেই টুপীর ভেতরে লুকিয়ে রাখতে হয় চারটে রাজা আর চারটে রাণী—'জেম ক্লিপ' লাগিয়ে আলাদা আলাদা ভাগে। টুপীর ভেতরে যে কাপড়ের 'লাইনিং' থাকে তার মধ্যেই একটু জায়গা করে নিতে হয় কৌশলে। টুপীর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে কৌশলে এই গুপ্ত স্থান থেকে লুকোনো তাসের গোছা দুটো বের করে আনলেই হ'ল 'জেম ক্লিপ' খুলে ফেলে দিয়ে। *

* যাদুকর এ. সি. সরকার সম্প্রতি তাঁর অপূর্ব্ব যাদুনৈপুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ 'যাদুরত্নাকর' উপাধি পেয়েছেন ভট্টপল্লী পণ্ডিত সমাজের কাছ থেকে। ম্যাজিক সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকেরা ওঁর সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে আলাপ করতে পার এই ঠিকানায়: A. C. SORCER, Magician, Post Box 16214, Calcutta-29.

উদয় মাঝারে অস্ত

শ্রীহিমালয়নির্ঝর সিংহ

যতক্ষণ মধু নাহি পায় মধুকর
গুণ গুণ করে ভেবে সবার অন্তর;
পাইলে মধুর স্বাদ গুণ গুণ গান
নীরব সাগরে ডুবি' হয় অবসান।

তপস্যায় রত থাকে মুনি-ঋষি সব,
শাস্ত্র-পাঠ, হোম, যজ্ঞ করে মহা-স্তব;
অন্তর মাঝারে যবে ঈশ্বরেরে পায়,
শাস্ত্র-হোম পরিহরি' আনন্দে কাটায়।

ছাত্রদের তর্ক যত বিদ্যার্জ্জন কালে,
দেখিলে পণ্ডিত ব'লে ভ্রম অন্তরালে
আচ্ছাদিত হয়ে যাই, কিন্তু হায় একি,
পণ্ডিত হইলে তারে সুগম্ভীর দেখি!

শুভ্র বলে দেখ যারে সে তো নয় সাদা,
গুপ্তভাবে তারি মাঝে সপ্ত-রঙ বাঁধা;
কালো বলে ভাবো যারে সে কি ঠিক কালো?
অন্তরে নিহিত তার জগতের আলো।

উদয় মাঝারে অস্ত, অস্ততেই আসা,
সন্ন্যাসীর তাই দোঁহে সম ভালবাসা।

আফগানিস্থানে ফুটবল খেলা

অধ্যাপক শ্রীঅমলকুমার মিত্র

ফুটবল খেলার মত জনপ্রিয় খেলা কি আর দুটি আছে? আমি জানি একটা বল্ দেখলেই তোমাদের পা সুড়সুড় করে। কারণ আমারও করে যে!

ফুটবল খেলা কি শুধু এ দেশেই জনপ্রিয়? উঁহু, তা নয় মোটেই। আমাদের প্রতিবেশী কাবুলিওয়ালার দেশ আফগানিস্থানও ফুটবল খেলতে ভালবাসে খুব। খেলছেও তারা অনেক বছর ধরে—সেই ১৯১৬ সাল থেকে। কাবুলের হাবিবিয়া কলেজের ছাত্ররাই প্রথম ফুটবল খেলতে আরম্ভ করে, এবং এ বিষয়ে তাদের সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেন আফগানিস্থানের রাজা—সম্রাট্ হবীবুল্লাহ খাঁ।

কাবুল থেকে এ খেলা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে থাকে আফগানিস্থানের অন্যান্য সহরে। আফগানিস্থানের সরকারের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে জনসাধারণও এ খেলা নিয়ে মেতে ওঠে। আমাদের দেশে যেমন আই. এফ. এ. শীল্ড, ডুরাণ্ড কাপ্ এবং রোভার্স কাপের খুব নামডাক, তেমনি আফগানিস্থানেও আজাদ মাহারাফ, আরিয়ানা ফুটবল প্রতিযোগিতা, খাজানি ফুটবল, কাবুল টুর্নামেণ্ট প্রভৃতি প্রতিযোগিতা খুব জনপ্রিয়।

কলকাতায় আজও একটা ফুটবল ষ্টেডিয়াম হয় নি—সে কি কম দুঃখের কথা? কত লেখালেখি হয়েছে এ ব্যাপারে, কত প্রতিশ্রুতি পেয়েছি আমরা সরকারের কাছ থেকে, কিন্তু যে তিমিরে ছিলাম সে তিমিরেই রয়েছি। আফগানিস্থান কিন্তু এ ব্যাপারে এগিয়ে গেছে অনেক দূরে। কাবুল, হিরাট এবং কান্দাহারে ফুটবল ষ্টেডিয়াম আছে। ওখানকার বড় বড় সব খেলা এই সব ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

ফুটবল-প্রিয় ভারতবাসী এক ডাকে তাদের জনপ্রিয় টিমদের চেনে। সুদূর গ্রামাঞ্চলের ছেলেদের মুখে মুখে পর্য্যন্ত মোহনবাগান, ইষ্ট বেঙ্গল, হায়দরাবাদ পুলিশের নাম ঘোরে। আফগানিস্থানেও কয়েকটি খুব জনপ্রিয় ফুটবল টিম আছে—যেমন আরিয়ানা ফুটবল ক্লাব, মাহ্মুদিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ, সামরিক একাদশ, শারওয়ালী ফুটবল ক্লাব এবং স্পিন্ ঘর ফুটবল ক্লাব।

সর্দার মহম্মদ ফারুক সিরাজের নেতৃত্বে মাহ্মুদিয়া একাদশ ১৯৩৭ সালে ভারতে খেলতে আসে। মহম্মদ ফারুক্ সিরাজ ১৯২৫ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত আফগানিস্থানের অদ্বিতীয় খেলোয়াড় ছিলেন এবং আফগানিস্থান স্পোর্টসের জনক হিসাবে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

আরিয়ানা ক্লাব ১৯৪৭ সালে সর্বপ্রথম ভারতে খেলতে আসে। ৪ বছর পরে তারা ইরাণে খেলতে যায়। আফগানিস্থানের ফুটবল একাদশ ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৫১ এবং ১৯৫৪ সালে তারা দিল্লী এবং ম্যানিলাতে অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় এশিয়ান গেম্‌স্‌এও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

সামনেই বড়দিনের ছুটী। সভা-সম্মেলনের ছড়াছড়ি পড়ে গেছে। কলকাতায় শিশুরংমহলের বার্ষিক শিশুউৎসব, সব পেয়েছির আসরের যুগজয়ন্তী উৎসব, নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন. আরও কত ছোট-বড় উৎসবের আমন্ত্রণ আসছে প্রায় রোজই। কোন্‌টা ফেলে কোনটায় যাই? ওদিকে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন সুরু হচ্ছে গুজরাটের আমেদাবাদে। সুখের বিষয় তু' বছর পরে সম্মেলনের কর্তারা শিশুসাহিত্যকে আবার তার প্রাপ্য সম্মান দিয়েছেন। শুনছি নাকি, ওখানকার লোকেরা শিশুসাহিত্যের প্রতি প্রচুর আগ্রহ দেখানোর ফলেই এই ব্যবস্থা হচ্ছে। আমেদাবাদে শিশুসাহিত্য শাখার সভানেত্রী মনোনীত হয়েছেন তোমাদের প্রিয় লেখিকা, রামধনুর বন্ধু শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার। তাঁর অভিভাষণ নিশ্চয়ই তাঁর গল্পের মতই সরস হবে। বড়দিনের কিছু পরেই আরও কয়েকটি বড় বড় সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছে। যেমন—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে (গৌহাটী) কংগ্রেসের অধিবেশন, আর মাদ্রাজে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন। এ ছাড়া আরও আছে।

ইতিমধ্যে তোমাদের চিঠিপত্রও এসে গেছে অনেক। যারা লেখা পাঠিয়ে তার সম্বন্ধে মতামত চেয়েছ তাদের চিঠির জবাব এখানে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। কেন না, আগের মাসেই বলেছি, লেখা জমে গেছে অজস্র। চিঠিপত্রের স্বল্পপরিমিত জায়গায় অত লেখা সম্বন্ধে মতামত দেওয়া যাচ্ছে না। মনোনীত লেখাগুলি ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই বেরোবে, এইটুকু আশ্বাস দিচ্ছি। পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফলও আগামী বারে বার করার চেষ্টা করছি।

শ্রীআনন্দগোপাল বিশ্বাস (বিশ্বাসবাড়ী—দহকুলা, পোঃ ধর্মদা, নদীয়া)—তোমাদের হাতে-লেখা মাসিক 'বঙ্গবাণী'র জন্য রামধনুর গ্রাহকদের সহযোগিতা চেয়েছ। সে কথা গ্রাহকদের জানিয়ে দিলাম। রণেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ঘইরালী)—'যে গল্প জানা নেই' চৈত্র মাসের মধ্যে শেষ করে দিতে লিখেছ। এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে কিনা বলতে পারি না—তবে গল্প সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ভার তো তোমাদেরই ওপর দিয়েছি। শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—গোয়েন্দাগিরিতে তোমার বাহাদুরী স্বীকার করছি। কিন্তু রসোদর শর্মা যে এখন ও নামের ব্যবহার কমিয়ে আর একটি নতুন নাম গ্রহণ করেছেন সেটা তো ধরতে পার নি! শুক্লা ও যমুনা (ধুবড়ী)—মিতালী পাতাবার বন্ধুদের নাম আলাদা ভাবে নিশ্চয়ই যাবে। তোমাদের ফরমাস মত লেখা

দেবার চেষ্টা করব। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ জানা (একবারপুর)—তোমার প্রথম তুটি প্রশ্নের উত্তর তো তোমাদের পাঠ্য ভূগোল আর বিজ্ঞানের বইতেই পাবে। সেগুলি বুঝি পড়তে চাও না? তয় প্রশ্ন 'আমি' কে? এ বড় কঠিন প্রশ্ন। প্রাচীন আর্য ঋষিদের আমল থেকে কত বড় বড় মনীষী, কত চিন্তানায়ক কত ভাবে এ প্রশ্নের উত্তরে খুঁজে আসছেন। সঠিক উত্তর বোধ হয় আজও পাওয়া যায় নি। শ্রীবিজলী সরকার (বজ্‌বজ্‌)—রামধনুর গ্রাহকদের মধ্যে এখন সবচেয়ে পুরোনো গ্রাহক হচ্ছেন ১২ নম্বর গ্রাহক শ্রীপ্রমোদচন্দ্র মুস্তাফি (জামসেদপুর)। তোমার অন্যান্য প্রশ্নের জবাব ডাকে পাবে। শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা-৪০)—পুরোনো রামধনুগুলো তুমি যে এত খুঁটিয়ে পড়েছ তা দেখে অবাক্ লাগছে। তোমার মতামতগুলোও বেশ যুক্তিপূর্ণ। সুবিধা মত তোমাকে আরও খানকয়েক ভাল ভাল বইএর কথা বলে দেব যা পড়ে সত্যি আনন্দ পাবে। শ্রীসুশান্ত লাহিড়ী (নতুন দিল্লী)—জগদীশচন্দ্রের জন্মের পর ৯৯ বছর পার হয়ে গেছে। কাজেই অগ্রহায়ণেই তাঁর জন্মের শততম বর্ষ সুরু হ'ল বলা যায়। তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব আগামী বছর হবে ব'লে ঠিক হয়েছে। তোমাদের 'চিল্‌ড্রেন্‌স্ কর্ণার'কে চিঠি লিখলেই দিল্লী সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য জানাবে লিখেছ। বেশ প্রস্তাব।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা দিয়ে আজ এইখানেই শেষ করি। ইতি—রাঃ সঃ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

—কোন্ দেশে বৈজ্ঞানিক বেশী—

বিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে ঠিক এই সময়ে আমেরিকা আর রাশিয়াই সব চেয়ে এগিয়ে চলেছে বলে আমাদের ধারণা,—কেন না রাষ্ট্রশক্তির দিক্ দিয়ে এই তু'টি দেশই এখন পৃথিবীর মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানে যে এ তুটি দেশ সত্যিই খুব উন্নত হয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীতে যুগান্তর এনেছে তারও হিসেব নেওয়া দরকার। অবশ্য সঠিক হিসেব করা খুবই কঠিন, সকলের মতও সমান

হতে পারে না। শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকে। এই নোবেল পুরস্কার যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের ফর্দ করলে একটা হিসেব পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য কেউ কেউ বলবেন, ইদানীং এখানেও নাকি গলদ আসছে। যাঁরা পুরস্কার দেবার কর্তা তাঁদের মর্জ্জিটা সব সময় নিরপেক্ষ না-ও হতে পারে। কোন কোন দেশের ওপর তাঁদের প্রীতি বা অপ্রীতি থাকাও বিচিত্র নয়। যাই হোক, আগে হয়তো এ সমস্যা ছিল না; তাই, যদি ধর ১৯৫২ পর্যন্ত যাঁরা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের একটা ফর্দ করা যায়, তা হলে এ বিষয়ে কিছুটা আলোকসম্পাত হতে পারে। এ দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে কিন্তু জার্মানী এখনও সকলের ওপর টেক্কা দিয়ে আছে। এই ৫২ বছরে এই দেশ থেকে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মোট ৩৯ জন। তা ছাড়া অষ্ট্রিয়া থেকেও পেয়েছেন ৬ জন—যা নাকি জার্মানীর অংশ বলেই অনেক জার্মান দাবী করেন। জার্মানীর পরই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—৩৩ জন, তারপর ইংল্যাণ্ড—৩২ জন, ফ্রান্স ১৫ জন ইত্যাদি। রাশিয়া থেকে কিন্তু পেয়েছেন মাত্র ২ জন। তবে বর্তমানে রাশিয়া বিজ্ঞানে যে রকম দ্রুত এগিয়ে চলেছে তাতে এই হিসেব ধরলে তাদের ওপর অবিচার করা হবে।

—তুমি কি জান—

থ্রম্বসিস্—আজকাল এই অসুখের কথা প্রায়ই ডাক্তারদের মুখে শোনা যায়। করোনারী থ্রম্বসিস্, সেরিব্রাল থ্রম্বসিস্ ইত্যাদি। অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। সে দিন আমেরিকার এক ডাক্তার বলছিলেন—আজকাল বিভিন্ন রোগের যে রকম প্রতিষেধক বেরোচ্ছে তাতে শেষ পর্যন্ত সব মানুষেরই মৃত্যুর কারণ হয়তো হবে এই একটি রোগ। আসলে থ্রম্বসিস্ কথাটার মানে হচ্ছে জমাট বাঁধা। এ রোগে শরীরের কোন কোন অংশে রক্ত জমাট বেঁধে যায়—তা হৃৎপিণ্ডেই হোক, আর মগজেই হোক বা অন্য কোন অংশেই হোক। মগজে (সেরিব্রাল) হলে জ্ঞান লোপ পেতে পারে বা শরীরের যে সব স্নায়ু মগজের নির্দেশে চলে সেগুলো অচল হয়ে যেতে পারে। হৃৎপিণ্ডে (করোনারী) হলে—রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে সেখানকার কাজও থেমে যেতে পারে। আর হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হলে কি হয় তা তো জানই। যাদের রক্তের চাপ (ব্লাড প্রেসার) অনিয়মিত বা অত্যধিক তাদেরই এ রোগের আশঙ্কা বেশী।

জেট প্লেন—বিভিন্ন ধরণের এরোপ্লেনের মধ্যে জেট প্লেন বা জেট চালিত প্লেনের

কথা আজকাল প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। এই প্লেন চালান হয় একটি বিশেষ কৌশলে—যাকে বলা হয় 'জেট' পদ্ধতি। পদ্ধতিটা এই রকম: এঞ্জিনের ভেতরে সামনে থেকে খুব চাপের সঙ্গে এসে ঢোকে হাওয়া, আর সেখানে জ্বালানী তেলের সঙ্গে সেই বাতাস মিশলে তা জ্বলে ওঠে। এর ফলে সেখানে তৈরী হয় বিরাট আয়তনের গ্যাস—যা নাকি ঐ ঘন চাপের বাতাসের সঙ্গে মিশে একটা সরু নলের (জেট) ভিতর দিয়ে ভীম বেগে বেরুতে থাকে প্লেনের পেছন দিক্ দিয়ে। বৈজ্ঞানিক নিয়মে গ্যাসের এই পেছন দিক্‌কার তীব্র গতির জন্যই প্লেন সামনের দিকে এগোতে থাকে। হাউই বা রকেট যে ওপরে ছুটে চলে তারও পদ্ধতি এই একই। রুশ বিজ্ঞানীরাও নাকি এই কৌশলেই তাঁদের কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাশূন্যে পাঠিয়েছেন।

সাহিত্যিকের বাড়ী:—কলকাতায় অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক বাস করতেন। তাঁদের স্মৃতিজড়িত সে সব বাড়ীর অনেকগুলি এখনও দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা সুযোগ পেলে সেগুলি দেখে আসবার চেষ্টা ক'র। কয়েকটি বাড়ীর খবর দিচ্ছি: চিৎপুর রোডের সংলগ্ন দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে রবীন্দ্রনাথের বাড়ীর কথা নিশ্চয়ই জান। রাজা রামমোহন রায় থাকতেন ৮৫ নম্বর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। ১১৬ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতেও তিনি অনেক বছর ছিলেন। নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ থাকতেন বাগবাজারের বোসপাড়ায়। বিদ্যাসাগর থাকতেন ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিক লেনে 'বিদ্যাসাগরবাটী'তে। এটি বর্তমান আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানার খুব কাছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাস করতেন ৫ নম্বর প্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জি লেনে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন গার্ডেন রীচ্ অঞ্চলে—পদ্মপুকুরে। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক উইলিয়াম্ থ্যাকারেও জন্মেছিলেন কলকাতায়। ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের ৩৯ নম্বর বাড়ী, যে বাড়ীতে তাঁর জন্ম হয়,—তার গায়ে আজও একটা পাথরের ফলক বসিয়ে সে কথা লেখা আছে।

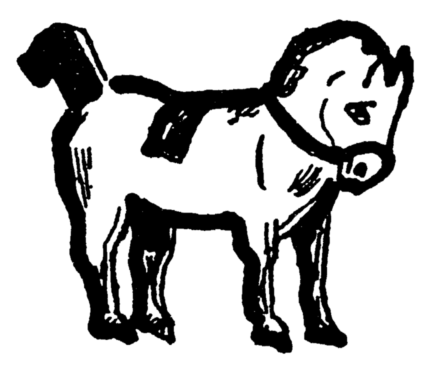

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

কলা, বেল, কমলা, ফলসা, বেদানা, শশা, জাম, লিচু, ডালিম, কাঁটাল, পিচ, কাউ, তাল, বাদাম, নারকেল, আম, আতা, কুল, খোবানি, জলপাই।

উত্তরদাতাদের নাম :—রত্নাবলী ও সুচেতা ভট্টাচার্য (কলিকাতা-২৫) ; সুজাতা, মমতা ও সিপ্রা ভট্টাচার্য (সাঁত্রাগাছী) ; সুগত সেনগুপ্ত (কলিকাতা-২৬) ; দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-১২) ; রণেন্দ্র ও রবীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ঘইরালী চা-বাগান) ; যমুনা, শুক্লা, কান্টু, মোহিতদা, ছোট্ট, রাঙ্গা, দিদিভাই, খুকুয়া, মুনু, সোনা, বুবলাই, মামণি (ধুবড়ী) ; মাখনলাল দত্ত (হুগলী) ; কল্পনা সেন (বোম্বাই) ; নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় (নয়া দিল্লী) ; কেশব ও বঙ্কু (পাটনা) ; দিলীপকুমার, ছবি, রমলা, মণ্টু, সন্টু, জণ্টু, অশোক (নিউদিল্লী) ; প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু) (কলিকাতা-৬)।

নূতন ধাঁধা

খোকা কি খেতে ভালবাসে ? বাবার কানে কানে বলে দিল খোকা। বাবা কিন্তু বাজার খুঁজেও সে জিনিষ পেলেন না। এখন কি করা ? খোকা যা অভিমানী, বায়না মত জিনিষ না পেলে কেঁদে কুরুক্ষেত্র বাধাবে। হঠাৎ বাবার মাথায় এক মতলব এল,—ওই খাবার তিনি বাড়ীতেই তৈরী করবেন আজব ভাবে, আর অবাক্ করে দেবেন খোকাকে। মা'র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করলেনও তাই। অবশ্য এর জন্য তাঁকে নানা বিচিত্র খাবার একত্র করতে হ'ল। কলা, কামরাঙা, গোলাপজাম, লেডিকেনি, মায় সাবুদানা পর্যন্ত। এর কোনটার আধখানা, কোনটার সিকি ভাগ, এমন কি কোনটা থেকে তার চেয়েও কম ভাগ নিয়ে সব একত্র মিশিয়ে তৈরী হ'ল সেই বিচিত্র জিনিষটি —যা খোকা খেতে ভালবাসে।

বলতে পার কি সে জিনিষ, আর কেমন করেই বা সেটা তৈরী করা হ'ল ?

লে খা চা ই

অভিনব কিশোর-মাসিক ; বার্ষিক সডাক ২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১।০, প্রতি সংখ্যা ৶০। কার্ত্তিক (৭ম) সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে "যেই ভকত, সেই জানে" শিশু-উপন্যাস বাহির হইতেছে। নবীন লেখক-লেখিকাদিগকে লিখিতে উৎসাহ দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। ছোটদের 'লেখা' ব্যতীত, বড়রাও লিখিয়া থাকেন। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমলকুমার মিত্র, যাদুশ্রী শঙ্কর দাস, প্রভৃতিও ইহাতে লেখেন। আগামী বৈশাখ হইতে ২য় বর্ষ আরম্ভ হইবে, কলেবর বর্দ্ধিত হইবে ও বার্ষিক চাঁদা ৩ টাকা হইবে। এখনই গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইলে, অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না।

ঠিকানা :— শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, বি-টি, সম্পাদক, "লেখা চাই", দেবালয়—২৪ পরগণা।

চ য় ন

১৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ (হিন্দুস্থান মার্টের সন্নিকটে)

সব রকম বই—বিশেষ করে রামধনু পত্রিকা (যে কোন সংখ্যা) এবং রামধনু কার্যালয় থেকে প্রকাশিত সব রকম বই আমাদের কাছে পাওয়া যাবে।

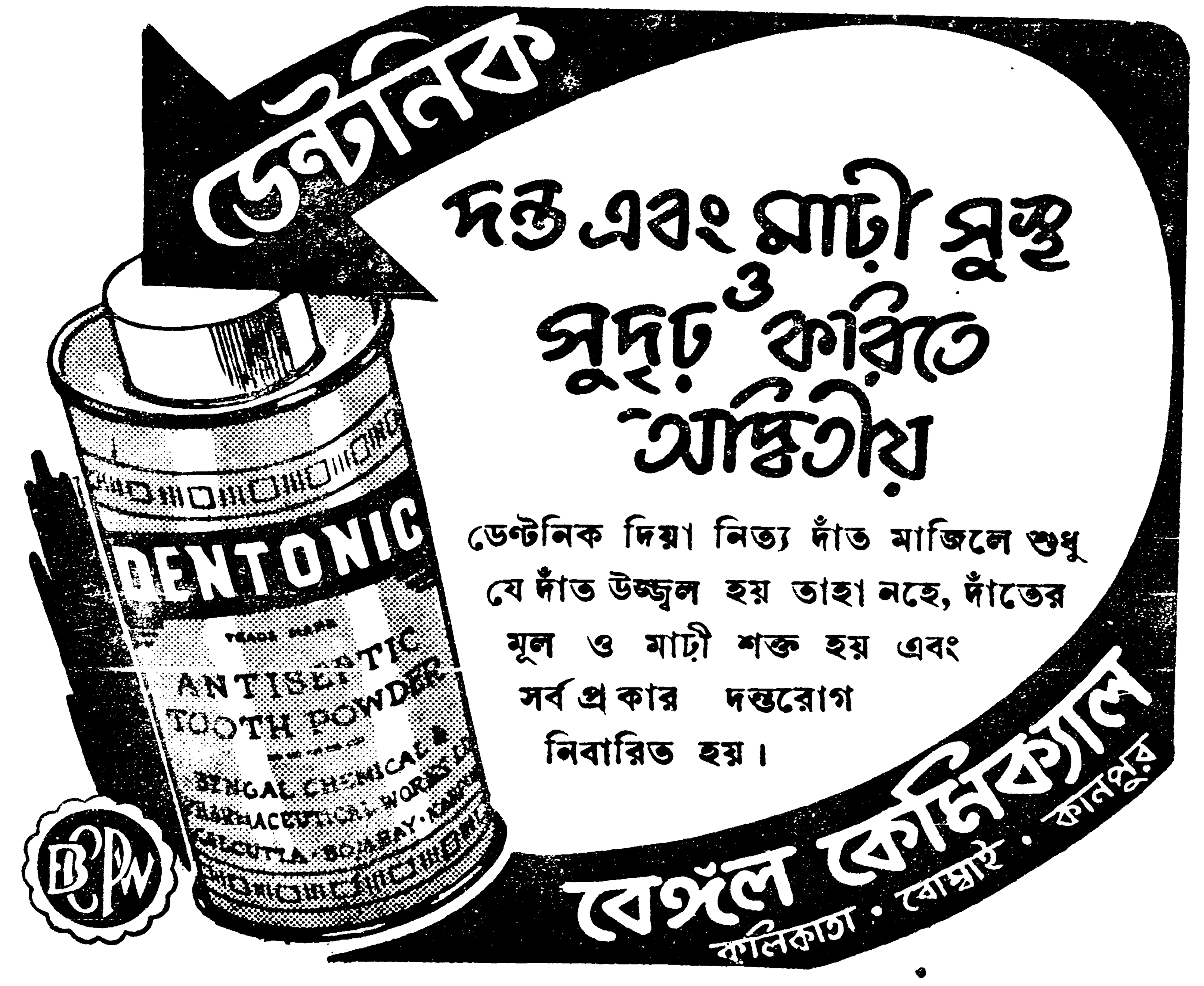

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বিএ

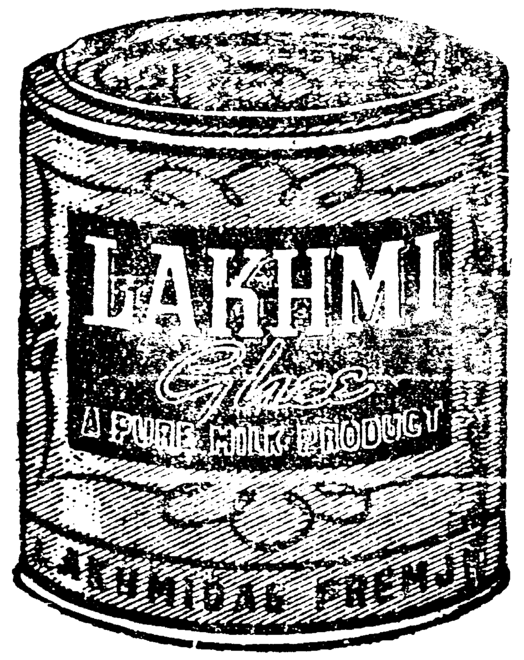

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়

লক্ষ্মী ঘি

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্ব্বত্র সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন-২২-৭২৪৩

বাহির হইল   বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৵০

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES by A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২॥০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১। নব পত্রিকা — ৪৲
২। জয়যাত্রা — ৪৲
৩। দেবালয় — ৪৲
৪। ইন্দ্রধনু — ৪৲
৫। বসুধারা — ৪৲
৬। পরশমণি — ৪৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸০

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥০

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥৵০

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানি বই]

এবার পুজায় বাহির হইল

১। যত হাসি ততই মজা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী— ২৲
২। পূজার দিনের উপহার—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বিএ

সুরিনা স্পেশাল কালি

আপনার কলমের আয়ু অক্ষুণ্ণ রাখে!

সুপ্রীম কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ • কলিকাতা

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়

লক্ষ্মী ঘি

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্ব্বত্র সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন-২২-৭২৪৩

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—৵০

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES by A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২॥০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১।	নব পত্রিকা	— ৪৲
২।	জয়যাত্রা	— ৪৲
৩।	দেবালয়	— ৪৲
৪।	ইন্দ্রধনু	— ৪৲
৫।	বসুধারা	— ৪৲
৬।	পরশমণি	— ৪৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸০

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥০

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৵০

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানি বই]

এবার পুজায় বাহির হইল

১। যত হাসি ততই মজা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী— ২৲
২। পূজার দিনের উপহার—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

Regd. No. C— 1841

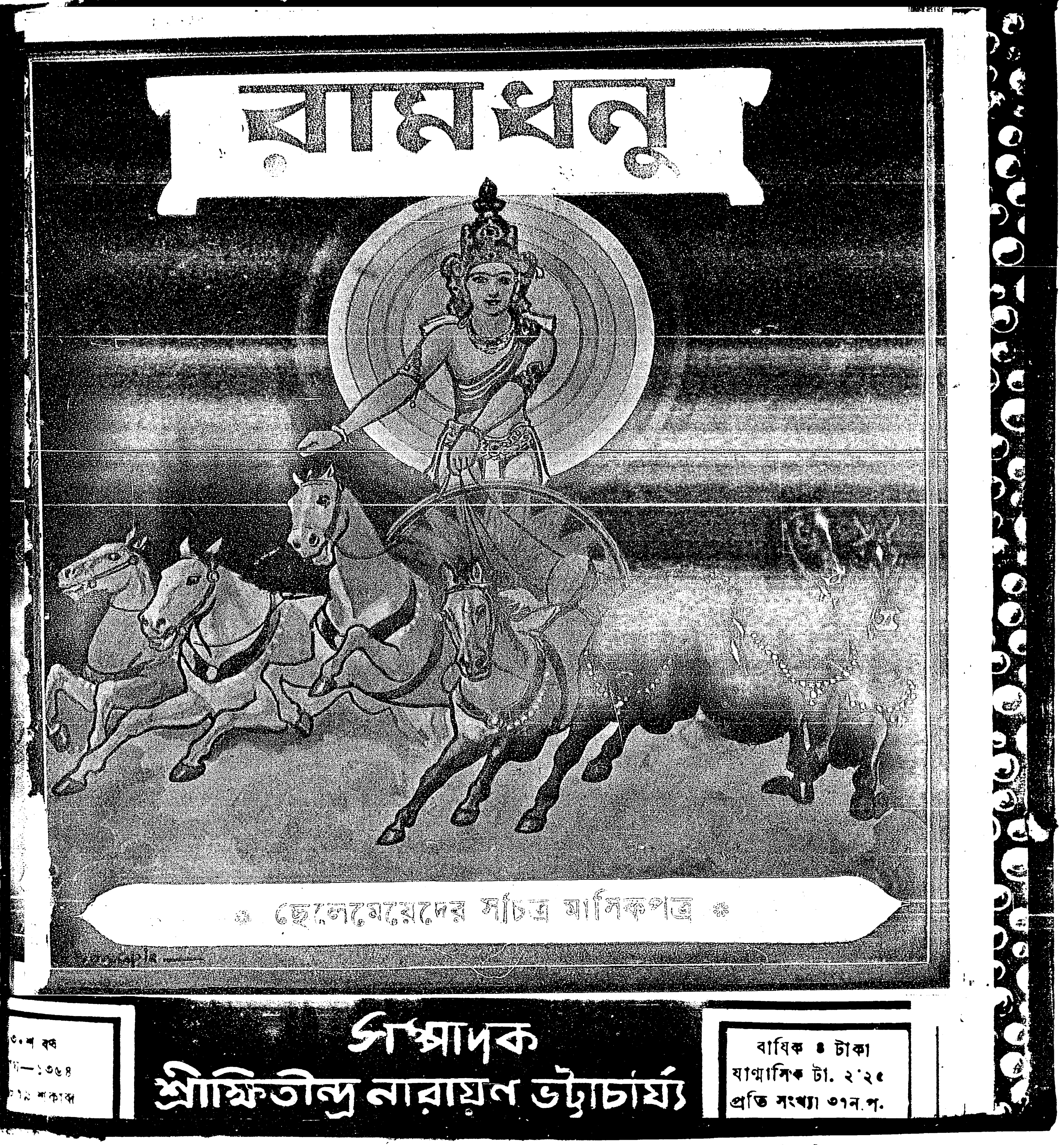

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন–৩৫–২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২৷৷৹, /৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

ছোটদের ভাল ভাল বই ঃঃ নামকরা বই

নলীগোপাল চক্রবর্ত্তীর

কাঠ ও কাঠের কাজ	।৷৷
বাঁশ, বেত, পাতা ও সোলার কাজ	১৲
তন্তুশিল্পের কাজ	১৲

আলোক চক্রবর্ত্তীর—

মনসামংগল	১৲
চৈতন্যমংগল	১৲
কুমারসম্ভব	১৲

শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তীর—

রঘুবংশ	১৲
রাণী রাসমণি	১৲
জাগ্রত মেদিনী	১৲

ছোটদের অভিনব মাসিক পত্রিকা

চয়নিকা

১৮ বছরে পড়ল : বার্ষিক মূল্য মাত্র ৩৲

যে কোন মাসে টাকা পাঠালেও বৈশাখ থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক হতে হয়। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা মাত্র । আনা। অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গ ও সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত।

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

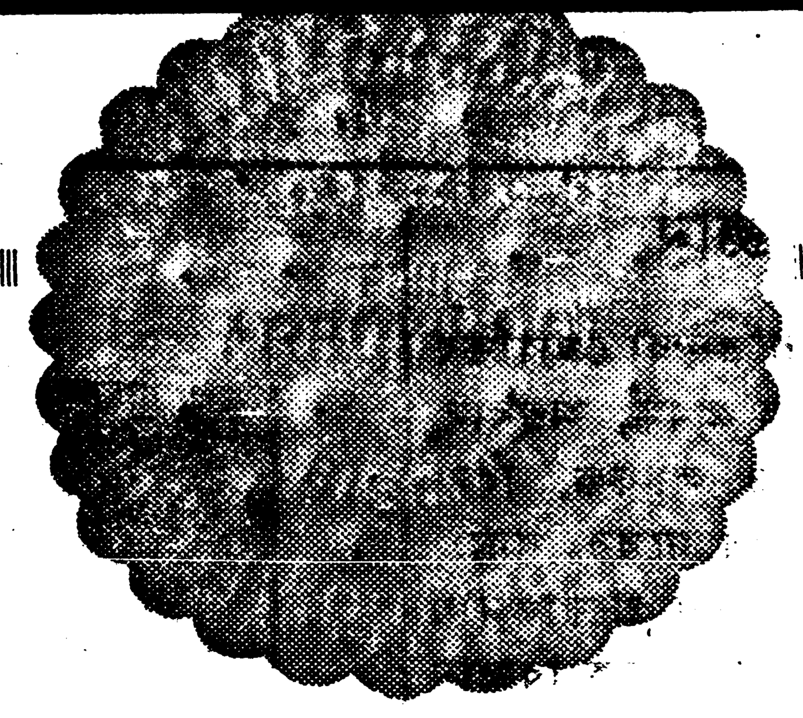

বিজ্ঞাপনের মতামতে

কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?

স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুণে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥• আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥• টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বিএ

সুরিনা স্পেশাল
কালি

আপনার কলমের আয়ু অক্ষুন্ন রাখে!

সুপ্রীম কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ • কলিকাতা

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়

লক্ষ্মী ঘি

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্ব্বত্র
সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন-২২-৭২৪৩

পৃথিবী কত সুন্দর!

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ } মাঘ,-১৩৬৪ {১০ম সংখ্যা

জগত্তারিণী সুবর্ণপদক প্রাপ্তিতে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

পেলাম যবে "বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক"—
তেইশ বছর বয়স আমার, হৃদয় ভরা সখ।
কাঁচা রোদে ভরা তখন বুকের এ অঙ্গন,
কোকিল ডাকে, কপোত ডাকে, নাচে রে খঞ্জন।
আনন্দ যে উথ্‌লে ওঠে—ধরে না বক্ষে
নূতন জগৎ নিত্য রঙায় কে যে অলক্ষ্যে।
পেলাম যাহা—তাহার চেয়ে পুলক যে প্রচুর,
পাতার বাঁশী—কিন্তু অনেক বড় তাহার সুর।

পেলাম যখন আমি 'জগত্তারিণী পদক'—
বয়স তখন পঁচাত্তর হে—নাইকো কোনো সখ।

মাথায় নিলাম মহীয়সী মহিলার এ দান—
গুণীগণের আশীর্ব্বাদ সে—অনন্ত সম্মান।
চাকি তখন ডুবুডুবু—আসছে হয়ে সাঁজ,
অঙ্গনেতে খুঁজি কেবল রাঙা পায়ের পাঁজ।
আনন্দের সে তীব্রতা নাই—আলোর ঝিলিমিল্,
চক্ষু মুদে বসে আছে বৃদ্ধ সে কোকিল।

বিনা মায়ের রাঙা পদ কিছুই চাহি না
খোকায় ভুলাতে কি হাতে পদক দিলেন মা ?

—কুড়ি—

তেমনি জোরের সঙ্গে বলে চলল অরুণ,—'আপনারা আমাকে জীবন্ত সমাধি দিতে পারবেন না কখনও। আপনার শিক্ষা, আপনার রুচি, আপনার সংস্কার আপনাকে বাধা দেবে। কারণ ডাকাত সর্দ্দার বসন্ত রায় আর ক্রিমিনোলজিষ্ট্ তাপস চৌধুরী এক নয়। তা ছাড়া …… '

—'তা ছাড়া—কি ?'

—'তা ছাড়া—ধরে নিলুম, অসম্ভব যদি সম্ভব হয়—আপনি যদি সত্যিই আমাকে খুন করে মতিলালের গোপন কবরে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দেন—তবু আপনি বসন্ত রায়ের মত রেহাই পাবেন না। কারণ পুলিশ আমার মৃতদেহকে গোপন কবর থেকে টেনে তুলবেই, আর আপনাকে ঝুলতে হবে ফাঁসির দড়িতে।'

—'আপনি ভুলে যাচ্ছেন অরুণ বাবু—ছ'শ' বছর আগেও পুলিশ ছিল. কিন্তু তারা শত চেষ্টা করেও মতিলালের মৃতদেহ আবিষ্কার করতে পারে নি।'

—'আমি কিছুই ভুলি নি তাপস বাবু! কিন্তু সে দিনের পুলিশ আর আজকের পুলিশের মধ্যে অনেক তফাৎ। তা ছাড়া আগামী কাল সকালে আমি বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকলে পুলিশ সুপার অজয় মিশ্র সমস্ত সংবাদ পেয়ে যাবে। কথাটা খুলেই বলি তা হ'লে। সম্ভব-অসম্ভব বিপদের সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়েই আমি এখানে পা বাড়িয়েছি। আমি জানি আপনি শেয়ালের মত ধূর্ত। তাই পূর্ব্বের থেকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছি। পুলিশ সুপার অজয় মিশ্র আমার বন্ধু। আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে একটা সীলমোহর করা খামের মধ্যে ভরে রেখেছি। খামটা দেওয়া আছে আমার এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের হাতে. আর তাকে নির্দেশ দেওয়া আছে—যদি সে আগামী কাল সকালে আমাকে বাড়ীতে অনুপস্থিত দেখে, তাহ'লে সেই মুহূর্ত্তে সে রওনা হবে পুলিশ সুপারের বাঙলোতে আর স্বয়ং অজয় মিশ্রের হাতে দেবে সেই সীলমোহর করা চিঠিটা।'

আর কিছু বললে না অরুণকুমার। শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে বসে রইল তাপস। তার পর বলল,—'আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি অরুণ বাবু! আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করব।'

'বেশ তো।'

দৃঢ়কণ্ঠে তাপস জিজ্ঞাসা করল,—'সুজিতের বদলে আপনি যদি রত্নসিন্দুক উদ্ধার করতেন—তাহ'লে আপনি কি করতেন ? দিতেন সুজিতকে অর্দ্ধেক অংশ ?'

অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠে অরুণকুমার বলল, – 'নিশ্চয়।'

বিস্মিত তাপস কয়েক মিনিট স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অরুণকুমারের দিকে। তার পর আবার জিজ্ঞাসা করল,—'আপনি যা বলছেন—সত্যি বলছেন তো ?'

অরুণকুমার মৃদু হাসল। বলল,—'আমি আপনাকে সত্য কথাই বলেছি তাপস বাবু। আমি আগেও বলেছি—বসন্ত রায়ের রত্নসিন্দুকের উপর আমার যতখানি অধিকার আছে, ঠিক ততখানি অধিকার আছে সুজিত মামার। সুজিত মামার ন্যায়-

সংগত অধিকারকে আমি অস্বীকার করব কেন? অবশ্য এই ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পর্কে মনে মনে একটা পরিকল্পনা খাড়া করেছি। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আমার সেই পরিকল্পনা মেনে নিতে বাধ্য করাতাম সুজিত মামাকে।'

আরও বিস্মিত হ'ল তাপস। জিজ্ঞাসা করল,—'আপত্তি না থাকে তো আপনার পরিকল্পনার কথা খুলে বলুন।'

—'আপনি জানেন তাপস বাবু, বসন্ত রায়ের রত্নসিন্দুকের কাহিনী যদি সত্য হয়, —তাহ'লে ধরে নেওয়া চলে—সিন্দুকের ভিতরে আছে লক্ষ লক্ষ টাকার হীরা, জহরৎ। আর সেই সঞ্চিত হীরা-জহরৎ সৎপথে উপার্জন করেন নি বসন্ত রায় আর মতিলাল। চুরি-ডাকাতি, লুঠ আর খুন-খারাপির রক্তাক্ত পথে সঞ্চিত হয়েছে সেই ধনরত্ন। কাজেই অসৎপথে যে ধনরত্ন উপার্জিত হয়েছে সে ধনরত্নকে ব্যয় করতে হবে সৎ পথে। আর এই নিয়ে মনে মনে সৃষ্টি করেছি— এক পরিকল্পনা। সত্যিই আমি যদি রত্নসিন্দুক উদ্ধার করতে পারতাম - তাহ'লে সিন্দুকে সঞ্চিত ধনরত্নের অর্ধেক ব্যয় করতাম সৎ কাজে আর অর্ধেক সমান অংশে ভাগ করে নিতাম আমি আর সুজিত মামা। সঞ্চিত ধনরত্নের অর্ধেক বিক্রী করে যে টাকা পেতাম, সেই টাকায় গরীব-দুঃখীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসার জন্যে গড়ে তুলতাম এক আধুনিক হাসপাতাল। আর সেই হাসপাতালে প্রথম দান হিসেবে আমি আমার হলুদকুঠির বাইরের মহলের সবটাই দান করতাম। হাসপাতালের নামকরণ করা হ'ত বসন্ত রায় আর মতিলালের নাম অনুসারে।'

তাপস বলল,—'সত্যি, চমৎকার আপনার পরিকল্পনা। সুষ্ঠু এবং সুচিন্তিত। এ ক্ষেত্রে, আমি যদি সুজিত হতাম, - তাহ'লে আপনার পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করতাম।'

অরুণকুমার বলল, - 'আমি যা বলেছি এর প্রতিটি কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি—এখন বিশ্বাস করা আর না করা আপনাদের ইচ্ছাধীন।'

সুজিত এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল। এবার বলল,—'অরুণের পরিকল্পনা এবং ইচ্ছা আমার মনে ধরেছে। চমৎকার আইডিয়া। কিন্তু যার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হ'ল, যে উদ্ধার করল রত্নসিন্দুক—তার অংশে যে একেবারে শূন্য পড়ছে! তার জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।'

সুজিতের কথায় সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে অরুণকুমার বলল,—'আমার আর আপনার অংশ থেকে সমান অংশে কিছুটা বিয়োগ করে তাপস বাবুর শূন্য অংশটা ভরাট করা হোক।'

সুজিত বলল,—'অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি সানন্দে সমর্থন করছি।'

গম্ভীর কণ্ঠে তাপস জিজ্ঞাসা করল,—'আমরা আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি তো অরুণ বাবু?'

অরুণকুমার সহাস্য দৃষ্টি তুলে ধরল তাপসের পরীক্ষারত দৃষ্টিপথে। জিজ্ঞাসা করল, - 'আমার উপর এখনও বিশ্বাস হয় নি তাপস বাবু?'

তীব্র পরীক্ষকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তাপস অরুণকুমারের দিকে। তার দৃষ্টির তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে এল—সহজ হয়ে এল কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে।

—'মলয়, অরুণ বাবুর বাঁধন খুলে দে।'

তাপস দৃঢ়পদে এগিয়ে গেল দেয়ালের ধারে, পরীমূর্ত্তিগুলির সামনে। পরীমূর্ত্তি শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে দিল গুপ্তপথের দ্বার।

তারপর সহজ কণ্ঠে বলল,—'সুজিত আর অরুণ বাবু, আপনারা যান—নিয়ে আসুন আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত রত্নসিন্দুক।'

তাপসের আদেশ পালন করল সুজিত আর অরুণকুমার। মিনিট দশেক পরে তারা রত্নসিন্দুক বহন করে নিয়ে ফিরে এল।

নানান্ যন্ত্রপাতির সাহায্যে মরচে ধরা সিন্দুক খোলা হ'ল।

গভীর আগ্রহ আর উত্তেজনা নিয়ে সবাই ঝুঁকে পড়ল সিন্দুকের উপরে।

সিন্দুকের খোলা ডালার ভিতরে দেখা গেল একতাল তূলো।

তূলোর আবরণ সরিয়ে দিল তাপস।

ঘরের তীব্র আলোয় ঝল্‌মল্ করে উঠল শত হীরার ঝলক।

—শেষ—

দাস রঘুনাথ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সপ্তগ্রামের রাজকুমার রঘুনাথ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আকর্ষণে সংসার ত্যাগ করিয়া কিভাবে পুরীতে আসিলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশে স্বরূপের শিষ্যত্ব লইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনের অঙ্গ হিসাবে প্রথমে জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে এবং শেষে অন্নসত্রে গিয়া কি ভাবে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন সে গল্প তোমাদের আগেই বলিয়াছি।

কথাটা মহাপ্রভুর কানে আসিলে তিনি বলিলেন, "রঘুনাথ এ কাজও বেশ ভালই করেছে। ভিক্ষার্থী হয়ে পরের মুখ চেয়ে থাকলে মন নীচে নেমে যায়, ভাব-ভক্তি হতে চায় না। অন্নসত্রে ভিক্ষা করে খাওয়াই ভাল! যখন যা পাওয়া গেল।" প্রসন্ন হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে এক ছড়া গুঞ্জামালা ও একটি গোবর্দ্ধন শিলা দিয়া বলিলেন, "এই শিলাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ জ্ঞানে পূজা করো—

"এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥"—চৈঃ চঃ

শুধু জল আর তুলসীমঞ্জরী দিয়ে পূজা ক'রো, তাতেই কাজ হবে।"

মহাপ্রভুর কথামত রঘুনাথ গোবর্দ্ধন শিলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা-পূজা আরম্ভ করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই শিলার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এইভাবে চলিল তাঁহার ভজন ও সেবা। কিছুদিন অন্নসত্রে ভিক্ষা করিয়া

এইবার রঘুনাথ তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। সারাদিন সেবা-পূজা করিয়া তিনি যান শ্রীমন্দিরে। সেখানে দর্শনাদি শেষ করিয়া যান সিংহদ্বারের নিকটে। সেখানে—

"প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত মড়ি যায় ॥"—চৈঃ চঃ

সেই পচা অন্ন দোকানীরা আনিয়া ফেলিয়া দেয় গরুর সামনে। গরুতেও তা সব খাইতে পারে না, এমন দুর্গন্ধ। রঘুনাথ করেন কি, সেই অন্ন কুটীরে লইয়া আসেন, তারপর জল দিয়া ধুইয়া—

"ভিতরের দড় মাজি যেই ভাত পায়।
নুন দিয়া রঘুনাথ সেই ভাত খায় ॥"—চৈঃ চঃ

"আর গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।"

শিষ্যের অপূর্ব্ব ত্যাগ দেখিয়া গুরু স্বরূপ দামোদর আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং একদিন কিছু অন্ন চাহিয়া খাইলেন। অন্ন খাইয়া স্বরূপ বলিলেন, "বাঃ ছেলে, রোজ তুমি এমন খাসা জিনিষ খাও আর আমাকে দাও না! এ বাপু, তোমার মোটেই উচিত হয় না।" চারিদিকে এই কথা প্রচারিত হইয়া গেল। মহাপ্রভুও ইহা শুনিতে পাইলেন। একদিন রঘুনাথ সেই রকম অন্ন প্রস্তুত করিতেছেন এমন সময় মহাপ্রভু আসিয়া বলিলেন—

"খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেও কেনে।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে ॥

আর গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
'তোমার যোগ্য নহে' বলি বলে কাড়ি নিলা ॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই ॥"—চৈঃ চঃ

ভক্তের দেওয়া ভোজ্য এইভাবে গ্রহণ করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন।

এই ভাবে দিন যায়। একদিন রঘুনাথ গুরু স্বরূপকে দিয়া মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে তিনি প্রভুর শ্রীমুখে কিছু উপদেশ শুনিতে চান। মহাপ্রভু তখনই রঘুনাথকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ, আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ খবর জানি না। এই জন্য তোমাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করেছি। তিনি যত জানেন আমিও তত জানি না। ধর্ম্মের সাধনতত্ত্ব তুমি তাঁর কাছেই শিখে নিও। তবুও যদি তোমার কিছু আমার কাছে জানতে ইচ্ছা হয় তবে শুনে রাখ—

"গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্য না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥
এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সবিশেষ ॥"– চৈঃ চঃ

আনন্দে অধীর হইয়া রঘুনাথ মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। মহাপ্রভুও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দীর্ঘ আঠার বৎসর নীলাচলে বাস করিয়া মহাপ্রভু দেহত্যাগ করিলেন। প্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া গুরু স্বরূপ দামোদরও দেহরক্ষা করিলেন। পর পর বিষম আঘাত পাইয়া রঘুনাথ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। প্রভুশূন্য নীলাচলে তাঁহার আর তিষ্ঠিতে ইচ্ছা হইল না। নিত্যপূজিত গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন তখন শ্রীরূপ ও সনাতনের কঠোর তপস্যায় মাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। শোকে কাতর, শীর্ণদেহ রঘুনাথ আসিয়া রূপ-সনাতনের চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গিয়া উহার উচ্চ চূড়া হইতে নীচে পড়িয়া সকল জ্বালার শেষ করিবেন। রূপ সনাতন তাহা বুঝিতে পারিয়া রঘুনাথকে তাহা হইতে বিরত করিলেন এবং কৃষ্ণকথায় তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিলেন।

কিছুদিন তাঁহাদের সঙ্গে বাস করার পর রঘুনাথের মন শান্ত হইল। তিনি

গিরি-গোবর্দ্ধনে গিয়া এক গাছের নীচে আসন গ্রহণ করিলেন। চারিদিকে নিবিড় বন—একেবারে জনমানবশূন্য। রঘুনাথ সেখানে বসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বৎসর কয়েক কাটিল এইভাবে! হঠাৎ একদিন এক ধনবান্ ভক্ত বণিক্ তাঁহার কাছে আসিলেন প্রচুর অর্থ লইয়া। অর্থের থলিয়া রঘুনাথের সামনে রাখিয়া বণিক্ বলিলেন যে মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন তখন রাধাকৃষ্ণের অন্যান্য লীলা-স্থলের সাথে শ্যামকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ডেরও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বণিকের ইচ্ছা এই অর্থে কুণ্ড দুইটির সংস্কার হয়।

সাশ্রুনয়নে মাতা জাহ্নবী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর আদেশ মনে করিয়া রঘুনাথ সানন্দে তাহাতে সম্মতি দিলেন। তারপর কুণ্ড দুইটির সংস্কার হইয়া গেলে তিনি শ্যামকুণ্ডের তীরে একটি কুটীর তৈয়ারী করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। নিজেকে শ্রীরাধার সখী কল্পনা করিয়া পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতে করিতে তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। ক্রমে রঘুনাথের আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। দুই-চারি দিন পর মাত্র "পল দুই তিন মাঠা" আহার করেন আর সর্ব্বক্ষণ চলে অখণ্ড কৃষ্ণভজন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইয়া উঠিল, কিন্তু ভজনের বিরাম হইল না।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী বৃন্দাবনে আসিয়া রঘুনাথকে দেখিতে গেলেন। রঘুনাথ কাতর হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া বলিলেন, "মাগো, বিষয়ীর ঘরে জন্ম নিয়ে জীবনটা কি বিফলে চলে যাবে? প্রভু কি কৃপা করবেন না?"

"জন্ম গেল অসাধনে কি সাধন করি।
দিবানিশি হেন পদ যেন না পাশরি॥"—প্রেমবিলাস।

সাশ্রুনয়নে মাতা জাহ্নবী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ও সান্ত্বনা দিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার কিছুকাল পরে একদিন রাধাকুণ্ডের তীরে বসিয়া যুগল মূর্ত্তির ধ্যান করিতে করিতে শ্রীরঘুনাথ পরমাগতি প্রাপ্ত হইলেন।

গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

পিণ্টু স্কুল থেকে ফিরে এলো। আজ পরীক্ষা হ'ল না। কোশ্চেন আউট হয়ে গেছে। কতগুলো দুষ্টু ছেলের কাণ্ড সন্দেহ নেই।

কোন কথা যদি গড়গড়া গাঙ্গুলী মশায়ের কানকে বাঁচিয়ে করা যায়! ঠিক গড়গড়া হাতে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। বুঝলাম এবার তাঁর স্মৃতিকথা থেকে একটি আস্ত গল্পাঘাত করবেন।

ভুড়ুক ভুড়ুক করে কয়েকটি সধূম টান দেবার পর প্রশ্ন করলেন,—কিরে হাঁদারা, কি একটা ঘটনা ঘটেছে শুনলাম!

ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত সার পিণ্টুই নিবেদন করল।

—এই ব্যাপার? এ আর নতুন কথা কি? গাঙ্গুলী মশায় প্রস্তুত হয়েই এসেছেন, সুতরাং সুরু করলেন:

—তবে শোন, আমাদের সময়কার এক কোশ্চেন আউটের কাহিনী। তোদের এ ঘটনা তার তুলনায় নস্যি।

যখনকার কথা বলছি, তোরা তো দূরের কথা, তোদের বাপেদেরও তখন জন্ম হয় নি। আমি সেবার এণ্ট্রাস ক্লাশে পড়ি,—এখন যেটাকে তোরা বলিস ক্লাস টেন। সে যুগে পানের দোকানের মত পথেঘাটে এত স্কুল ছিল না। তা ছাড়া আমি থাকতাম পাড়াগাঁয়ে। দশখানা গ্রাম নিয়ে এক একটি স্কুল। তাই যে গ্রামে স্কুল ছিল সেখানেই থাকতাম। সেখান থেকে আমাদের বাড়ী ছিল ছ' মাইল দূরে।

লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম বলে হেড মাষ্টার মশায় আমায় বড় ভাল বাসতেন। স্কুল-কম্পাউণ্ডের একধারে একটা ঘরে হেড মাষ্টার মশায় আর আমি থাকতাম। তিনিও ভীন্ গাঁয়ের লোক।

সেটা কার্ত্তিক মাস। টেষ্ট পরীক্ষার আর খুব বেশী বাকি নেই। রাত্তির দুটো অবধি প্রত্যহ পড়তে হচ্ছে। আমিও সেবার টেষ্ট দেব।

আমাদের সঙ্গে দুটো ছেলে পড়তো,—নাম রবীন আর সতীশ। ছেলে দুটি ছিল রত্ন বিশেষ। পাক্কা চারটি বছর ঐ ক্লাশ টেন্‌এতেই আটকে আছে। যাকে বলে নট্ নড়নচড়ন। সারা বছর ওদের ক্লাসের চৌহদ্দির মধ্যে পাওয়া যায় না। হয়ত মাঠে গিয়ে রাখালদের সঙ্গে গরু চরাচ্ছে, নয় ত' পদ্মার বুকে কোন জেলে ডিঙ্গির ভেতরে বসে মাছ ধরছে, নয় ত' কোন বাগানে ঢুকে নারকেল গাছের মাথায় বসে ডাব খাচ্ছে। তবে পরীক্ষার কাছাকাছি ওদের একটু চিন্তান্বিত দেখা যেত। এবং সে চিন্তা করতে করতেই পরীক্ষা এসে পড়তো। তারপর খাতায় যা-তা লিখে ভরে আসতো; অবশেষে ফল বেরুলে দেখা যেত – যা হবার তাই। অর্থাৎ উক্ত ক্লাশেই আরেকটি বছর থাকবার গ্যারান্টি পেয়ে গেছে। সাময়িক মন খারাপ হ'ত বটে, তবে তা ক্ষণিকের। দু'দিন বাদে যথা পূর্ব্বম্।

কিন্তু এবার উভয়েরই গার্জ্জেন ভীষণতম নোটিশ দিয়েছেন। তাঁদের ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এবার যদি ওরা পাশ না করতে পারে তাহ'লে চিরদিনের মত ঘরের ভাতও উঠে যাবে।

তাই এবার রবীন ও সতীশের মুখ একটু বেশীই চিন্তাক্লিষ্ট দেখা গেল। লোক-পরম্পরায় শুনেছিলাম এবার নাকি পড়াশোনায় উভয়েই ভীষণ মন দিয়েছে।

হু হু করে পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে।

প্রত্যহই অধিক রাত্তির অবধি পড়ি। সে দিনও পড়ছিলাম। রাত তখন একটা।

পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই চারদিক্ ভয়াবহ নিঝুম হয়ে আসে। শেয়ালের অনবরত ডাকে, কুকুরের বিকট এক একটা চীৎকারে আবহাওয়া লোমহর্ষক হয়ে ওঠে। তার ওপর রাত একটা। পৃথিবীর কেউ কোথাও জেগে আছে বলে মনে হয় না। পৃথিবী ভৌতিক অন্ধকারে আবৃত।

কেরোসিনের টেবল্ ল্যাম্পের আলোয় বসে পড়ছি। সহসা জানালা দিয়ে একখানা হাত নড়ে উঠলো। আমি প্রায় চীৎকার করেই উঠেছিলাম আর কি! পর মুহূর্ত্তেই দেখি জানালার বাইরে রবীন দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ইসারায় আমায় ডাকছে।

পাশের তক্তপোষে মশারির নীচে হেড মাষ্টার মশাই ঘুমুচ্ছেন। নাক ডাকছে গর-র্-র্ গর-র্-র্—ভস্-স্। 'ভস্' শব্দটা হবার আগে মাষ্টার মশায়ের মুখ বায়ু-পরিপূর্ণ হয়ে ছ'নম্বর ফুটবলের সাইজ হয়, তারপর ঠোঁটের ফাঁকে পাঙ্‌চার হয়ে হাওয়া বেরিয়ে আসে 'ভস্' শব্দে। বেশ প্রগাঢ় ঘুমের লক্ষণ।

রবীনদের আমি বাঘের মত ভয় করতাম। গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলে। ওরা না করতে পারে হেন কাজ নেই। ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। সঙ্গে দেখি সতীশও রয়েছে।

রবীন আমায় ফিস ফিস করে বললে, দেখ্ রাইমোহন, তোকে একটা কাজ করতে হবে।

—এখন কোন কাজ আমি করতে পারব না।

—পারবি না মানে? রবীন ফট্ করে আমার কানটা ধরে বললে, এক চড়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব জানিস? বল্ করবি কিনা?

কাঁদ কাঁদ হয়ে বললাম, বা-রে, কি কাজ করতে হবে বললি না, শুধু শুধু ধমকাচ্ছিস্! কথাটা খুলেই বল্!

সতীশ জিজ্ঞেস করলে, কোশ্চেনগুলো সব ছাপা হয়ে এসেছে?

বললাম, হ্যাঁ।

রবীন আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, কোথায় সেগুলো?

বললাম, জানি না।

—ফের মিছে কথা? - রবীন গর্জ্জে উঠলো।

সতীশ বললে, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না।

রবীন দাঁতে দাঁত চেপে বললে, এখনো বল্, না হলে প্রাণে মরবি।

বাধ্য হয়ে আঙ্গুল দেখিয়ে বললাম, ঐ লোহার সিন্দুকটার মধ্যে।

ওটার চাবি কোথায়?

ইতস্ততঃ করে বললাম,—হেড মাষ্টার মশায়ের বালিশের তলায়।

রবীন এবার বললে, এই তো গুড্ বয়! যাক্, তোর কোন ভয় নেই। যা করবার আমরাই করব। কেউ কিচ্ছুটি টের পাবে না। তবে তুই যদি কাউকে এ কথা প্রকাশ করিস তো তোকে মুণ্ডুকাটা অবস্থায় পাওয়া যাবে পদ্মার চরে।

শুনে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

মনে ভাবলাম, পড়েছি যখন যবনের হাতে তখন আর উপায় কি! মুখে বললাম, আচ্ছা বাবা, যা ইচ্ছে কর্। তবে দেখিস যেন আমায় বিপদে ফেলিস না।

ওরা পা টিপে টিপে এসে ঘরে ঢুকলো। আমি কাঠ হয়ে চেয়ারে বসে বইয়ের দিকে চেয়ে রইলাম। পা ছুটো আমার অসম্ভব রকম কাঁপতে লাগলো। হেড মাষ্টার মশায় যদি টের পান তাহ'লে কি আর রক্ষা আছে?

রবীন সন্তর্পণে মশারিটা উঁচু করে দেখে নিলে হেড মাষ্টার মশাই কোন্ দিকে মাথা করে শুয়েছেন,—তারপর বালিশ হাতড়ে ঠিক রিং-শুদ্ধ চাবির গোছাটি বের করে নিয়ে এলো।

এমনি সময় হেডমাষ্টার মশায় পাশ ফিরলেন বলে মনে হ'ল। আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা ঝড়ের কাঁপুনি বয়ে গেল—এই রে!—

কিন্তু দেখলাম, না, তিনি জাগেন নি। ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরেছেন। যাক্, বাঁচা গেল; ভীষণ ফাঁড়া কাটলো।

কাজ চলতে লাগলো। সতীশ কোত্থেকে একটা কাঁথা ভিজিয়ে এনেছে। সিন্দুকে চাবি লাগিয়ে ভিজে কাঁথাটা তার ওপর চাপা দিলে সে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভিজে কাঁথা চাপা দিল কেন গাঙ্গুলী দাছ?

—প্রথমে কি ছাই আমিও জানতুম! শেষে শুনলাম, সিন্দুক খুলতে গেলে কড়াৎ করে যে শব্দ হয়, ভিজে কাঁথা চাপা দিয়ে নাকি তাই বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। ওরা নাকি কোন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে ঐ রকম পড়েছিল।

যাই হোক্, ওতে শব্দ বন্ধ হয়েছিল কিনা মনে নেই, তবে সিন্দুক খোলা হয়ে গেল। তার ভেতর থেকে সীল্ করা ছুটো বাণ্ডিল বের করে এনে রবীন খুলতে যাবে এমন সময় গরর্‌র্—গরর্‌র্ আওয়াজ অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে 'ভ—স্' করে একটা শব্দ হ'ল। তারপর হেড মাষ্টার মশায় জেগে উঠলেন।

নিমেষের মধ্যে রবীন ও সতীশ তক্তপোষের তলায় ঢুকে গেল। আমার শরীরে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি—শিরদাঁড়া বয়ে যেন কুলপী মালাইয়ের ঠাণ্ডা নেমে গেল। তবু সেই কম্পিত কণ্ঠেই পড়তে আরম্ভ করলাম,—লেট্ এ বি সি বি এ ট্র্যাঙ্গল্'—

হেড মাষ্টার মশায় চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে খড়ম পায়ে দিলেন, তারপর আমার কাছে এগিয়ে এলেন। আমার কানের মধ্যে তখন সহস্র বজ্রের আর্ত্তনাদ স্থুরু হয়েছে,—বুকের মধ্যে আড়াই-মণী ঢেঁকির পাড় পড়ছে—চোখে অন্ধকার দেখছি।

কাছে এসে হেড মাষ্টার মশায় বললেন, এখনো পড়ছ রাইমোহন? রাত ক'টা?

—রাত একটা স্যার!

অনেক রাত হয়েছে, এবার শুয়ে পড়।—বলে তিনি কানে পৈতে জড়িয়ে, খড়ম খট্ খট্ করতে করতে বাইরে গেলেন। বুক থেকে যেন একটা আস্ত হাতী

নেমে গেল। উঃ, খুব বেঁচে গেছি। তা হ'লে টের পান নি। রোজই রাত্রে তিনি একবার বাইরে যান। তিনি বাইরে যেতেই আমি ফিস্ ফিস্ করে বললাম, এই র'বে, স'তে, তোরা চুপচাপ ওখানেই থাক। মাষ্টার মশায় এসে ঘুমুলে তারপর যা হয় করিস্।

বেশীক্ষণ নয়,—হেড মাষ্টার মশায় ফিরে এলেন। হায়, না এলেই বুঝি ভাল ছিল। সঙ্গে এলো দৈত্যসম ভোজপুরী দরোয়ান। নিজে হাতে করে নিয়ে এসেছেন প্রকাণ্ড এক বেত।

ঘরে ঢুকেই বজ্রকণ্ঠে হাঁকলেন, এই ভর্ত্তু সিং, চৌকিকা নীচুসে দোনো লেড়কোঁকো কান পকড়কে বাহার করো।

হিড় হিড় করে র'বে আর স'তেকে ভোজপুরী ভর্ত্তু সিং টেনে বের করলো।

দোনোকো কপড়া দেকে বাঁধো।—হেডমাষ্টার মশায় ফের আদেশ করলেন।

বাঁধা হ'ল।

তারপর চলতে লাগল বেত-বৃষ্টি। উঃ, ও রকম মার জীবনে আমি দেখি নি। সমস্ত শরীর ফুলে ঢোল হয়ে গেল।

আমিও বাদ পড়লাম না। আমার এমনিতেই বলির পাঁঠার মত অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থা হয়ে ছিল—দু'-এক ঘা বেত পড়তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

পরের দিন চার দিকের গ্রামের পর গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা।

রবীন আর সতীশকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। দলে দলে নরনারী, শিশু এসে ওদের দেখে যেতে লাগলো। সে আমলে হেড মাষ্টার মশায়ের ক্ষমতা বোধ হয় থানার দারোগার চেয়ে কিছু কম ছিল না।

তারপর ওদের দু'জনকে হেড মাষ্টার মশায় রাস্টিকেট করে দিলেন।

আর আমার বরাতে? আরও কুড়ি ঘা বেত।—ব'লে গড়গড়া গাঙ্গুলী মশায় নিভে-যাওয়া গড়গড়ায় কয়েকটা বিফল টান মারতে লাগলেন।

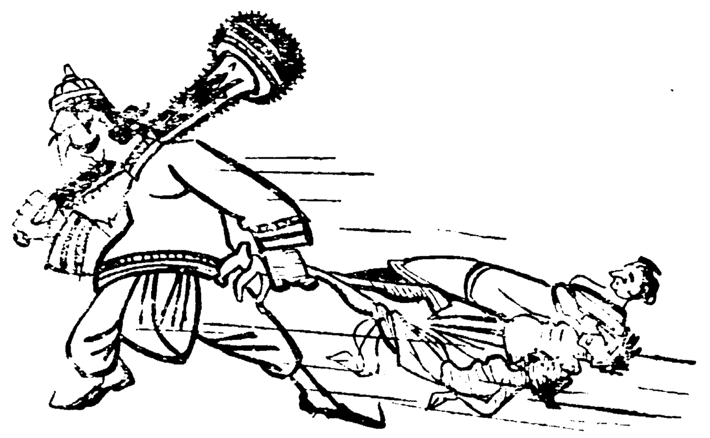

পুরানো পাতা

শিবাজীর অভিনয়

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

[মোগল সম্রাট্ ঔরংজেব মারাঠা বীর শিবাজীর সঙ্গে বার বার যুদ্ধ ক'রে কিছুতেই যখন তাঁকে বশে আনতে পারলেন না, তখন তিনি বন্ধুত্বের ভান ক'রে আর অনেক রকমের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে এলেন। তারপর কৌশলে তাঁকে বন্দী ক'রে কারাগারের কড়াক্কড় পাহারার মধ্যে রেখে দিলেন। শিবাজী যে আর কখনো মুক্তি পাবেন সে আশা একেবারেই রইলো না। এই কারাগারে শিবাজী সম্রাট্ ঔরংজেবের কাছে যে অসুখের অভিনয় করেছিলেন সেটা সত্যিকারের নাটকের মতোই মজাদার।]

শিবাজী বিছানায় শুয়ে। তাঁকে ভয়ানক পীড়িত বলে মনে হচ্ছে। তাঁর বালক পুত্র শম্ভুজী বিছানার পাশে বসে খেলা করছে। একজন সন্ন্যাসী আর একজন ফকীর ঘরের কোণে চুপটি ক'রে বসে আছেন। তাঁদের পেছনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দু'টো ঝুড়ি রাখা আছে।

দু'জন লোক পা টিপে টিপে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলে। এদের একজন বৈদ্য, আর একজন হকীম।

বৈদ্য। হকীমজী, আস্তে। রোগীর অবস্থা সাংঘাতিক। এখুনি দেখলুম, বেশ জ্ঞান আছে—দিব্যি কথাবার্তা কইছে, পরক্ষণেই একেবারে বেহুঁশ। ওই শুনুন, জড়িয়ে জড়িয়ে কি সব বলছে।

শিবাজী। (আপন মনে) আর আমি দেশের মুখ দেখতে পেলুম না। নীল পাহাড়ের বুকের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রতাপগড়ে ফিরে যেতে পেলুম না। বিদেশে শেষটায় কারাগারের ভেতরেই আমার জীবনটা গেল।

বৈদ্য। আহা বেচারি! গতিক বড় সুবিধের নয় হকীমজী!

হকীম। কিন্তু গলার আওয়াজ তো বেশ ভাল বলেই বোধ হচ্ছে!

বৈদ্য। ওটা ভারী খারাপ লক্ষণ, হকীম সাহেব! নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, এও ঠিক তেমনিধারা আর কি! (রোগীর প্রতি) হুজুর, হকীমজী এসেছেন। সম্রাট্ এঁকে পাঠিয়েছেন—আপনি এখন কেমন আছেন দেখে গিয়ে খবর দিতে।

শিবাজী। সম্রাটের অনুগ্রহ। আমি কিন্তু আর বেশীক্ষণ নেই, হকীমজী!

হকীম। ভয় নেই, ভয় নেই। আচ্ছা, দেখি' একবার হাতটা। বাঃ, দিব্যি নাড়ী তো! ভয় নেই বৈদ্যজী, রোগীর নাড়ী দস্তুরমাফিক জোয়ান দেখা যাচ্ছে।

বৈদ্য। (ব্যস্তভাবে) ওইটিই তো যত গণ্ডগোলের গোড়া কিনা! এই একদণ্ড আগে দেখে গেলুম, নাড়ীর গতি একেবারে অতি ক্ষীণ, আর এর মধ্যেই বদলে গেল? তবেই বুঝে নিন, ব্যপারটা গুরুতর কিনা।

হকীম। রোগীর মুখের চেহারা তো দিব্যি পরিষ্কার! চোখ দু'টো দপ্ দপ্ করছে।

বৈদ্য। (ঢোঁক গিলে) ওটা শুধু জ্বরের ধমকে আর কি!

হকীম। গা কিন্তু গরম নয়!

বৈদ্য। (মহাব্যস্ত ভাবে) গা গরম হবে কি করে? জ্বর বাইরে ফুটে বেরুলে তো। জ্বর তো শুধু এক রকমেরই হয় না, হকীম সাহেব! অনেক রকমের জ্বর আছে। বাইরে আর ভেতরে—

হকীম। (বিরক্ত ভাবে) অত করে আর আমায় তা বোঝাতে হবে না। আমি তা বিলক্ষণ জানি।

বৈদ্য। তা জানেন বৈ কি! তা জানেন বৈ কি! আপনি হলেন শাহান্‌শার হকীম— আপনি এ সব জানেন বৈ কি!

হকীম। (দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে) ব্যাপারটা যাই হোক্, ভারি বিদ্‌ঘুটে রকমেরই ঠেক্‌ছে। আচ্ছা বৈদ্যজী, রোগের আর কি কি লক্ষণ তুমি পেয়েছ, বল তো?

বৈদ্য। যা যা লক্ষণ পেয়েছি, হকীমজী, তাতে এই বুঝেছি যে ষোল আনাই অলক্ষণ। এর চেয়ে বেশী আর কি বলবো বলুন?

শিবাজী। (কাতরাতে কাতরাতে) আমার ছাতির কাছটায় কি একটা হয়েছে—কালো মতন কি যেন ফুটে বেরিয়েছে।

হকীম। (চমকে উঠে) কালো মতো ফুটে বেরিয়েছে?

বৈদ্য। সর্বনাশ! কই, দেখি দেখি?

শিবাজী। (অত্যন্ত কাতরভাবে) এই দেখ। আজ দু'দিন হোল। তোমায় বলি নি— পাছে ভয় পাও।

[বৈদ্য ও হকীম দু'জনেই ঝুঁকে পড়লেন দাগটা দেখবার জন্যে। হকীমজী অনেকক্ষণ ধরে দাড়ি নেড়ে নেড়ে সেটা দেখলেন]

বৈদ্য। কি দেখলেন, হকীম সাহেব?

হকীম। এটা যে কি, তা ঠিক মালুম করতে পারলুম না। তবে রোগীর গতিক সত্যি সত্যিই সুবিধের নয়।

শিবাজী। ওষুধ-পত্র আর খাব না আমি। তার চেয়ে দানধ্যান, কাল থেকে যা সুরু করেছি, তাই বরং ক'রে যাই। এতে তবু শান্তি পাব।

বৈদ্য। কাল থেকে সাধু আর ফকীরদের টুক্‌রি ভরে ভরে মিষ্টান্ন বিলানো হচ্ছে। আজ

সকালেও বিলানো হয়েছে, এ বেলাও হবে। ঐ ফকীর সাহেব আর ঐ সন্ন্যাসী বাবা এসে বসে রয়েছেন, দু'জনে দু'টুক্‌রি মিষ্টান্ন বিতরণ করতে নিয়ে যাবেন বলে।

হকীম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই ভাল, সেই ভাল। আমি যাই, শাহান্‌শাকে বলি গে যাই, রোগীর অবস্থা সঙ্গীন। তাঁর এখন এখানে এসে দেখা-শোনা করা আদপেই চলবে না। (চলে যেতে যেতে টুক্‌রি দু'টোর দিকে নজর পড়ায়) ইয়া আল্লা—এত্তো বড়া বড়া টোক্‌রি!

[প্রস্থান

[হকীমজী ঘরের বার হওয়া মাত্রই শিবাজী তড়াক্ ক'রে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তার পর কী সে হাসি!]

শিবাজী। আমার ছাতির ওপর এই কালো দাগটা—বুঝলে কিনা—এটা আমার জন্মকাল থেকেই আছে। খুব বোকা বানিয়েছি যা হোক্। আচ্ছা, এবার কাজের কথা হোক্। রণজী! সব প্রস্তুত?

রণজী। আজ্ঞে প্রভু, সবই প্রস্তুত। কিন্তু ছাড়পত্র কই?

শিবাজী। সে জন্যে ভাবনা নেই। এই দু'টো টুক্‌রি বুঝি?

রণজী। হাঁ প্রভু, সব-বড় এই-ই যোগাড় করা গেছে।

শিবাজী। এতে লাড্ডু ভরে ফেলেছ?

রণজী। না তো!

শিবাজী। ভর নি! মূর্খ! ঔরংজেবকে তো চেন না! সে এসে পড়লো বলে। শীগ্‌গির ভরে ফেল টুকরি দু'টো। যা পাও তাই দিয়ে বোঝাই কর। আর উপর দিক্‌টাতে খালি লাড্ডু ভরে রাখবে। তারপর আলোর কাছ থেকে সরিয়ে ওই কোণে অন্ধকারে নিয়ে রেখে দাও। বুঝলে? শম্ভুজী! শম্ভু! এখনো বসে কেন? শীগ্‌গির বিছানায় ঢোক। আর চিন্তা কিসের? ভোর হবার আগেই তোমায় নিয়ে মথুরায় গিয়ে পৌঁছুব। এখন ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে পড় দেখি! যেন অকাতরে ঘুমুচ্ছ এই ভাব দেখাবে। বুঝলে?

[তারপর শিবাজী নিজেও বিছানা নিলেন। সেই আগেকার অবস্থা—যেন সাংঘাতিক পীড়িত—একেবারে মরণাপন্ন। এমন সময় হঠাৎ সম্রাট্ ঔরংজেব ধীর গম্ভীরভাবে প্রবেশ করলেন।]

ঔরংজেব। (তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শিবাজীর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে) কথাবার্তা কইতে অক্ষম নাকি?

বৈদ্য। কখনও কখনও বেশ কথা ক'ন। (শিবাজীর বিছানার কাছে গিয়ে) প্রভু, চেয়ে দেখুন একবার। শাহানশা স্বয়ং এখানে উপস্থিত।

শিবাজী। (অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে) বৈদ্‌জী, আর না। ওষুধ খেতে আর পারছি না।— সম্রাট্ তো কই এলেন না! আমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছি না—

ঔরংজেব। সম্রাট্ এই তোমার পাশেই। কি প্রয়োজন তোমার বল।

শিবাজী। (অত্যন্ত অবসন্ন দৃষ্টিতে ঔরংজেবের দিকে চাইলেন, তারপর সেলাম করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এতই দুর্বল যে হাত ওঠাবারও বুঝি শক্তি নেই! শেষে, হাতটি আস্তে আস্তে

শম্ভুজীর বুকের উপর রাখলেন) এই বালক—দুঃখে একেবারে জরজর। এ তো আর আপনার শত্রু নয়। আমি মরলে একে আপনি মুক্তি দেবেন তো? জাঁহাপনা, এ বালক—একে আপনি যেতে দিন।

ঔরংজেব। কোথায় ও যাবে?

শিবাজী। মথুরায়—ওর মার কাছে। শাহান্‌শা, এই আমার শেষ প্রার্থনা জানবেন।—আহা, মৃত্যু! তোমার কাছে শত্রুমিত্র সব সমান।

(অত্যন্ত হাঁপাতে লাগলেন—যেন আর কথা বেরুচ্ছে না।)

ঔরংজেব। আচ্ছা, তাই হবে। তোমার ছেলেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

শিবাজী। (অতি কষ্টে) কিন্তু ছাড়পত্র? ছাড়পত্র কই? আমি তা দেখে যেতে চাই, জাঁহাপনা! ছেলে মুক্তি পাবে—তার ছাড়পত্র। চোখে দেখলে শান্তিতে মরতে পারি, জনাব! কাগজ? কাগজ কই?

ঔরংজেব। (বৈদ্যের প্রতি) কি বল্‌ছে ও? কিসের কাগজ?

বৈদ্য। খোদাবন্দ, উনি শম্ভুজীর ছাড়পত্র দেখতে চান। সেটা লেখা হয়ে গেছে, জনাব! এখন তাতে কেবল আপনার সীল-মোহর লাগিয়ে দিলেই হয়। এই দেখুন।

(কাগজখানা সম্রাটের হাতে দিলেন)

কেবল দু'জনের ছাড়পত্র চাই, জনাব! শম্ভুজী—আর তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে—রণজী বলে একজন সন্ন্যাসী। ওই সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

(রণজী সম্রাটের কাছে এসে কুর্ণিশ করলেন।)

ঔরংজেব। (কাগজখানা দেখতে দেখতে আপন মনে) তাই তো! এর ভেতর কোন রকম ফন্দী-টন্দী নেই তো? নাঃ, সে সব কিছু না!—আচ্ছা, নিয়ে এস কালি।

(আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে ছাপ লাগিয়ে দিলেন, তারপর ছাড়পত্রটি ফিরিয়ে দিয়ে শিবাজীর বিছানার কাছে গেলেন।)

শোনো বন্দী, তোমার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করেছি। কিন্তু সাবধান, এ থেকে কোন রকম বিভ্রাট যেন না হয়।—আচ্ছা, ও কোণে ও-দুটো কি?

বৈদ্য। খোদাবন্দ, ও-দু'টো মিষ্টান্নের ঝুড়ি। শাহান্‌শার হুকুম নিয়েই সাধু আর ফকীরদের দু'বেলাই এখন মিষ্টান্ন বিতরণ করা হচ্ছে।

ঔরংজেব। ও!—আচ্ছা, খোল তো! ভেতরটা আমি একবার দেখবো। (ঢাকনা খুলে দেওয়া হ'ল) তাই তো! কেমন কেমন যেন ঠেক্‌ছে! (শিবাজীর প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলেন)—তবে আজ রাত্রির জন্যে কোন রকম ভাবনা নেই।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

শিবাজী। (বিছানা থেকে একেবারে লাফ দিয়ে পড়লেন) জল্‌দি, জল্‌দি। আর এক মুহূর্ত দেরী করা নয়! কি হবে জানলে? এক্ষুণি পাহারার ওপর পাহারা বসবে। আর চারদিকের

ফটক বন্ধ হয়ে যাবে। রণজী, শীগ্‌গির তৈরী হও। চট্ ক'রে। শম্ভু, দাঁড়িয়ে দেখছ কি? ঝুড়ির ভেতর বসে পড়।

(শম্ভুজীকে ঝুড়ির ভেতর বসানো হ'ল। তার উপরে একখানা রুমাল ঢাকা দিয়ে, উপর-দিক্‌টাতে লাড্ডু ভরে দেওয়া হ'ল। দেখে মনে হতে লাগলো, ঝুড়িটা আগাগোড়াই লাড্‌ডুতে বোঝাই করা।)

এইবার আমার নিজের পালা।—থাম, থাম। একটুখানি কাজ কিন্তু বাকি রয়ে গেছে।

(বিছানার কাছে ছুটে গিয়ে তোষকটাকে গোল ক'রে পাকিয়ে, নিজের পাগড়ীটা তাতে ঘুড়ে দিলেন—আর লেপখানা আগাগোড়া বেশ ক'রে ঢেকে দিলেন—শুধু পাগড়ীটা বেরিয়ে রইলো।)

ব্যস্, প্রহরীগুলো এই দেখেই খানিকক্ষণ ধোঁকা খেয়ে থাকবে। এবার তাহলে আমি ওই টুকরির ভেতর ঢুকে পড়ি। (টুকরির ভেতর বসলেন) রণজী, তুমি প্রস্তুত তো?

রণজী। আজ্ঞে, হাঁ প্রভু!

শিবাজী। তবে রওনা হও।

রণজী। যে আজ্ঞে।

(দু'টো টুকরি দু'জনে তুললেন)

বৈদ্য। বিদায় প্রভু!

শিবাজী। (টুকরির ভেতর থেকে) মথুরাতে কাল আমরা একত্র হবো।

(টুকরি সহ রণজীর প্রস্থান)

বৈদ্য। (একটুখানি অপেক্ষা ক'রে থেকে) এতক্ষণে ওঁরা কারাগারের ফটক পার হয়ে গেছেন। যাক, নিশ্চিন্দি। খুব ভালয় ভালয় কাজ মিটে গেল। আমিও এবার আলো নিবিয়ে সরে পড়ি।

[প্রস্থান

(একজন প্রহরী আলো হাতে আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো। তার পাশে আর একজন এসে দাঁড়ালো।)

প্রথম প্রহরী। কয়েদী তো দেখছি বিছানায় অসাড়ে পড়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রহরী। তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে বেঁচে আছে, কি মরে গেছে, সেই যা কথা!

প্রথম প্রহরী। তাতে তোর-আমার কি? বাদ্‌শাকে খবর পাঠাই গে চল্, প্রথম প্রহরে যেমন-কে-তেমন সব ঠিকই আছে।

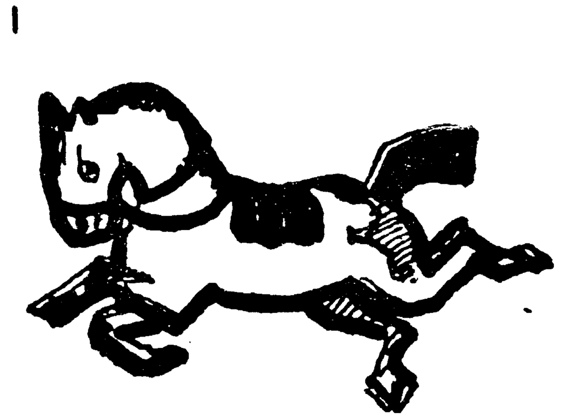

৪

দিন যায়। দিনের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর মাস। দেশের বাড়ীতে যখনই আসি বেদীর উপর পঞ্চানন্দ দেবের শূন্য স্থানটায় একখানা ইটের উপর সিঁদূর-চন্দন-লিপ্ত তাঁর প্রতীককে দেখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আপনা হতেই বেরিয়ে আসে। কোনও সন্ধানই করা সম্ভব হোল না। ভাঙ্গা একটা প্রস্তরখণ্ডে কার কি প্রয়োজন বা স্বার্থ থাকতে পারে ভেবে পাই না।

আশ্বিন মাস এসে গেল। কলকাতার বাজারে পথেঘাটে লাল সালুতে লেখা —অমুক পাড়ায় সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব আর দোকানের সামনে পূজার বিপুল আয়োজন —বিজ্ঞপ্তিতে সহর প্লাবিত হয়ে গেল।

আমাদের আফিসের ডেপুটি ম্যানেজার মিষ্টার মজুমদারের বড় ছেলেটি বিলেত থেকে এন্‌জিনীয়ারিং পাশ করে এসেছে, সে জন্য একটা টি-পার্টি হবে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে-- তার কার্ড পেলাম একদিন।

সমারোহ ব্যাপার। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা প্রায় দেড় শো কিংবা তারও বেশী। সবাই বিশিষ্ট ব্যক্তি। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং জননায়কও আছেন অনেকে। মজুমদার সাহেব প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

অনেকের সঙ্গে হোল পরিচয়। অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি, যাঁদের কেবল নামটা মাত্র শোনা ছিল, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হোল। এমন সময় একজনের দিকে চেয়ে মিঃ মজুমদার বললেন,—আসুন, এবারে একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে আপনাকে ইনট্রোডিউস করিয়ে দিই।

উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি আমাদের দিকে পিছন করে একটা চায়ের টেবিলে বসে ছিলেন, মজুমদার সাহেব বললেন,—ডক্টর রামশাস্ত্রী অফ ইনটারন্যাশানাল ফেম, আর ইনি অজয় চৌধুরী।

উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর রামশাস্ত্রী। দামী ক্রিম সিল্কের আলখেল্লা, মাথায় সেই রংয়ের টুপী, হাত বাড়িয়ে করমর্দ্দন করলেন। আমি চমকে উঠলাম। পা থেকে যেন গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের মেঝেতে পাতা কার্পেট সরে যাচ্ছে বোধ হোল। কে এই ডক্টর রামশাস্ত্রী? আমার চোখের কি এত ভুল হবে?

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমারই বাড়ীতে অতিথিরূপী ভ্যাগাবণ্ড পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতি পরিচয় দিয়ে যে লোক এসেছিল খালি পায়ে, আধময়লা একটা হাফ শার্ট গায়ে, কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে, সন্দেহের বশে যাঁকে চোর বলে খুঁজে বেড়িয়েছি অনেক জায়গায়, সেই লোক এবং গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের অভিজাত টি-পার্টিতে দেশের গণ্যমান্য কৃতী সন্তানদের মধ্যে যিনি ডক্টর রামশাস্ত্রী অফ ইনটারন্যাশানাল ফেম বলে পরিচিত হলেন—দু' জনে কি এক এবং অভিন্ন? মাথায় টুপি থাকার জন্য, সামনের টাক এবং পিছনের ঝাঁকড়া চুলটা ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু মুখের অবয়ব দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। নবদ্বীপের পোড়ামা-মন্দিরের সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথাও মনে পড়ল। তিনিও পরশুরামের পরিচয়ে বলেছিলেন যে তিনি ইয়ুরোপ ও অমেরিকায় যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন। দীর্ঘ নামটার সুরু এবং শেষটুকু বাদ দিয়েই কি বর্ত্তমান নাম রামশাস্ত্রী হয়েছে? ভবঘুরের ভূমিকায় সে কি তবে তাঁর অভিনয়?

অথচ আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিজাত ডক্টর রামশাস্ত্রীকে তো সোজা কথায় বলাও যায় না যে বাপু হে, তুমিই কি চুরি করে নিয়ে এসেছো আমাদের পূর্ব্বপুরুষের গৃহদেবতা পঞ্চানন্দ দেবকে? অথচ এই লোকটাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য কত চেষ্টাই না করেছি!

মনের ভেতর যেন একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করলাম। টি-পার্টি যে কখন শেষ হোল, জানতেও পারি নি,— এতই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। শেষে, যখন দেখলাম যে অতিথিরা প্রায় সবাই উঠে পড়েছেন, তখন আমিও তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম।

অল্পক্ষণ পরেই ডক্টর রামশাস্ত্রী এলেন। সঙ্গে আরও ৩।৪ জন রয়েছেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, এক্‌স্‌কিউজ্‌ মি ডক্টর শাস্ত্রী! আপনার সঙ্গে কয়েক মিনিট একটু আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল।

তিনি হাতের রিষ্টওয়াচটা দেখে বললেন, —ভেরি সরি। এখন পোনে পাঁচটা।

ঠিক পাঁচটায় আমাকে একটা মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করতে হবে বরানগর পাটবাড়ীতে। মোটে পনেরো মিনিট সময় আছে, যেতে হবে সাত-আট মাইল। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আর এক সময়—

আমি বললাম, - বেশ তো, কখন কোথায় দেখা করবো বলুন দয়া করে।

তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই বললেন, - সেও তো বলা মুস্কিল। আজকেই রাত্রি সাড়ে আটটায় দিল্লী মেলে চলে যাচ্ছি দিল্লী। সেখান থেকে যাবো বম্বে, তার পরের প্রোগ্রাম আন্‌সার্টেন। আপনার য়্যাড্রেস্‌টা বরং দিন। আবার যখন কলকাতায় আসবো, আপনাকে জায়গা এবং সময় ঠিক করে চিঠি দেবো।

হতভম্ব হয়ে গেলাম। কি বলবো এ অবস্থায়? একখানা কাগজে নাম এবং আমার কলকাতার বাড়ীর ঠিকানাটা দিয়ে দিলাম। প্রকাণ্ড গাড়ীখানা সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে উঠলেন। আরও কয়েকজন তাঁর সঙ্গী হলেন। গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন,—আপনার কথা রাখতে পারলাম না, সে জন্য খুবই দুঃখিত।

গাড়ী চলে গেল।

৫

মাস তিনেক কেটে গেল। ডক্টর রামশাস্ত্রীর কোনও খবর নেই। খবর যে সত্য সত্যই পাবো এমন আশাও যে সম্পূর্ণভাবে করেছিলাম তাও নয়। রামশাস্ত্রী এবং পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি, এ বিষয়ে যদিও আমার এতটুকু সন্দেহ ছিল না, তবু সে কথা প্রকাশ্যে বলাও দুঃসাহসের ব্যাপার।

একদিন মজুমদার সাহেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ডক্টর রামশাস্ত্রীর পূর্ণ পরিচয়। তিনি বললেন,—ওরে বাপ রে, অত বড় পণ্ডিত লোক আজকালকার দিনে আমাদের দেশে খুব বেশী নেই। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব—এ সব বিষয়ে ইনি একজন অথরিটি। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত যতগুলি পাওয়া গিয়েছে, সবগুলোই যে কাল্পনিক এ কথা উনি হার্ভার্ড ইউনিভারসিটিতে বক্তৃতা দিয়ে ও-দেশের পণ্ডিতদের একেবারে চমকে দিয়েছেন। বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় উনি চারটে বক্তৃতা দেন, তারই জন্য একটা মোটা রকমের টাকা পান। তা ছাড়া যাওয়া-আসার খরচও সেই দেশেরই বইতে হয়। একটা জিনিয়াস্‌।

এই সব বিবরণ শুনে আমার কিন্তু মনের সামনে ভেসে উঠলো পরশুরাম শাস্ত্র-

বাচস্পতির মূর্ত্তি—ঝাঁকড়া চুল, ময়লা হাফ শার্ট, কাঁধে ঝোলা, শুধু পা। এখনও মনের ধাঁধা গেল না। আমারই কি ভুল হয়েছে তবে?

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। মা ধরেছেন যে পঞ্চানন্দ দেব হারিয়ে যাওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি একবার গঙ্গাসাগরে গিয়ে স্নান করে পাপমুক্ত হবেন।

এমন সময়ে একখানা চিঠি এসে উপস্থিত হোল। বালিগঞ্জ গোল পার্কের কাছে একটা ঠিকানা থেকে কে. ভেনু গোপালন নামে এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক জানিয়েছেন যে ডক্টর রামশাস্ত্রীর আদেশে তিনি আমাকে জানাচ্ছেন যে ডক্টর শাস্ত্রী কলকাতায় এসেছেন। আমি যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করি তাহ'লে আগামী কাল বেলা দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে এই ঠিকানায় এলে তিনি বাধিত হবেন।

মা'র গঙ্গাসাগর যাত্রার অন্য ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি যথা সময়ে এলাম নির্দিষ্ট ঠিকানায়। ঢুকেই দেখলাম একটা ছোট অফিস ঘরের মত, সেখানে বসে আছেন এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক। জানা গেল তিনিই ভেনুগোপালন, ডক্টর শাস্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। আমার নামের স্লিপ নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ওপরে।

সত্য কথা বলতে কি, আমার যেন বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করে উঠলো। যদি সত্যিই তিনি পরশুরাম না হ'ন, তাহলে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে কি বলবো? কি জন্য তাঁর মূল্যবান্ সময় নষ্ট করে দেখা করতে চেয়েছি জানতে চাইলে কি উত্তর দেবো? যদি কোনও বিষয়ে আলোচনাই করতে হয়, তা হলে পুরাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর রামশাস্ত্রীর সঙ্গে কি সম্বন্ধে আলোচনা করবো?

কয়েক মিনিট পরেই আমার আহ্বান এলো। পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকেই তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হ'লাম। মাথায় টুপি নেই। যাক, এবারে আমার সন্দেহ ঘুচে গেল। মাথার সেই টাক এবং পিছনের ঝাঁকড়া চুল এবং উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ দুই চক্ষু দেখে এবার আর কোনও সন্দেহ রইলো না।

(ক্রমশঃ)

—জলপরীর খেলা—

আজকের খেলাটা বিদেশী হলেও আমাদের দেশে খুব কম লোকেই দেখান। বিশেষ করে এটা ছোটদের খেলা। এই খেলাটার নাম দিতে পার তোমরা "জলপরীর খেলা"। নীচের ছবিটীর মত একটা দুই মুখ খোলা চোঙ্গা নিয়ে দর্শকদের দেখান হ'ল যে তার মধ্যে কিছুই নেই। তারপর সেই চোঙ্গাটা টেবিলের ওপর রেখে, যাদুকর সেই খালি চোঙ্গা হতে একে একে চারখানা চার রংএর সিল্কের রুমাল বের করলেন। এই রুমালগুলিই হোলো পরী— অর্থাৎ লাল পরী, নীল পরী, সবুজ পরী ও হলদে পরী। পুনরায় যাদুকর রুমালগুলি চোঙ্গাটীর মুখে চাপা দিয়ে একটা সরু ম্যাজিক-ওয়াণ্ড (যাদুর কাঠি) দিয়ে রুমালগুলো চোঙ্গার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর তিনি চারটে খালি কাচের গ্লাস দেখিয়ে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে চোঙ্গা থেকে গ্লাসটার মধ্যে কিছুটা লাল রংএর জল ঢাললেন। একে একে অপর গ্লাসগুলোও তুলে নিয়ে তিনি খালি গ্লাসে নীল জল, সবুজ জল ও হলদে জল ঢেলে চোঙ্গাটা আবার খালি দেখালেন, অর্থাৎ রুমালগুলো জলপরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। শেষে তিনি চোঙ্গাটার তলায় একটা খালি কাচের ডিস রেখে গ্লাস হতে জলগুলো একে একে আবার চোঙ্গার মধ্যে ঢেলে দিয়ে চোঙ্গাটা তুলে নিলেন এবং ডিসটা দর্শকদের দেখালেন যে তাতে জল নেই। শেষে তিনি চোঙ্গার ভিতর হতে আবার একে একে রুমাল চারখানা বের করে এনে চোঙ্গাটা খালি দেখালেন। এতে সকলেই খুব অবাক্ হ'ল।

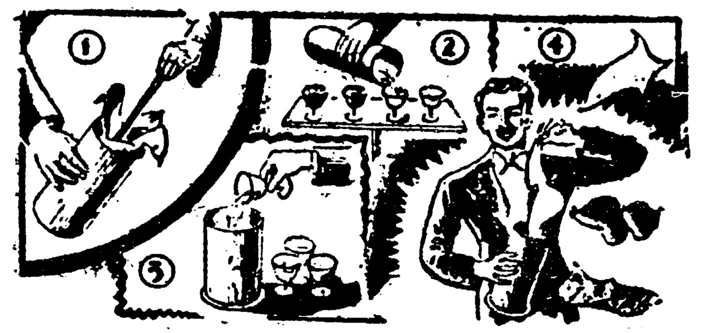

এখন খেলার কৌশলটা প্রকাশ করছি। একটা দু' মুখ খোলা টিনের চোঙ্গা বা টীউব তৈরী কর। টীউবটা লম্বায় সাত ইঞ্চি এবং ব্যাস পাঁচ ইঞ্চি করবে। এবারে গ্লাসের তলাটা কেটে দিলে যে রকম হয় ঐ রকম এক দিক্ সরু আর একটা টীউব তৈরী কর। এই টীউবটাও লম্বায় সাত ইঞ্চি হবে, কিন্তু এর মুখের মাপ পাঁচ ইঞ্চি এবং অপর সরু মুখের মাপ চার ইঞ্চি করবে। এইবার সরু টীউবটা আগের টীউবের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পাঁচ ইঞ্চি দিকের গোল মুখ দুটো একত্র করে ভাল করে রাংঝাল করে নাও। এই পাঁচ ইঞ্চি দিক্ দিয়ে টীউবটা দেখলে, টীউবটা খালি দেখাবে। কাজেই এই দিক্‌টা দিয়ে দর্শকদের টীউবের ভেতরটা দেখাবে এবং এই দিক্‌টা টেবিলের ওপর নীচের দিকে রাখবে। খেলা দেখাবার আগে টীউবটার ফাঁকের মধ্যে কিছু স্বচ্ছ জল ভরে রাখবে এবং রঙীন রুমালগুলো গুটিয়ে বলের মত করে দুটো টীউবের মুখের দিকে যেখানটা সামান্য ফাঁক আছে সেখানে গুঁজে রাখবে। খালি কাচের গ্লাসগুলোর মধ্যে রুমালের রংএর মত গুঁড়ো রং সামান্য করে রেখে দেবে। জল পড়লেই রংটা গুলে যাবে। প্রথমে টীউবটা দেখাবার সময়ে সাবধানে সামান্য কাৎ করে দেখাবে যেন রুমালগুলো ভিজে না যায়। রুমালগুলো একে একে বের করে পুনরায় টীউবের মাথায় চাপা দিয়ে সরু ম্যাজিক-ওয়াণ্ড দিয়ে আবার দুই টীউবের মধ্যের খাঁজে ঢুকিয়ে দিয়ে তার পর গ্লাসে জল ঢালবে। জলগুলো আবার ঐ খাঁজের মধ্যে ঢেলে দিয়ে, রুমালগুলো বের করবে। খুব পাৎলা সিল্কের রুমাল ব্যবহার করবে এবং টীউবটাও বেশ সুন্দর করে রং করে নেবে।

তটস্থ

শ্রীঅলক চক্রবর্ত্তী

কান করে কট কট,
দরজাতে খট খট—
দাদা আসে গট গট
ওরে বাবা রে!
পড়া করি চট চট,
নয় - চাঁটি পট পট,
মাথায় বিরাট নট,
হ'নু হাবা রে!

বাকী আছে এক লট—
আগেতে করি নি থট,
দাদা যদি করে শট,
পড়া বাকী রে!
বারে বারে করে টট,
রোজ বলে ধরে জট—
বুদ্ধিতে শুধু ঘট
আছে নাকি রে?

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস

তীর্থঙ্কর

—আলমোড়া থেকে বেরীনাগ—

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাসের ডাকে রওনা হয়েছি কলকাতা থেকে। ট্রেনে হলদুয়ানি; সেখান থেকে বাস্। বাস্ ছাড়ল বেলা দশটায়।

দুর্গম পার্ব্বত্য পথ ধরে আমাদের বাস্ চলতে লাগল ধীরে ধীরে। ভিতরে আমরা প্রায় আঠারো জন যাত্রী। বেলা বারোটা নাগাদ 'গরম পানি' বলে ছোট্ট একটা জায়গায় বাস্ এসে থামল। সেখানকার বাজারে খান দশ-বারো দোকান। যাত্রীরা অনেকেই নেমে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলেন। এর পর আবার বাস্ ছাড়লো।

আলমোড়ার একটি সুন্দর রাস্তা

বেলা তিনটে নাগাদ আমরা এসে পেঁছিলাম রাণীক্ষেত সহরে। রাণীক্ষেতের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। যেন ছবির মত। সহরটি ছোট্ট হলেও বেশ সাজানো-গোছানো। ইংরাজ সেনানিবাসের মহিমায় এখানে এই সহরটি গড়ে উঠেছে। তার চেয়ে বড় কথা, এখানে নাগরিক সভ্যতারও সব কিছুই একটু-আধটু আছে। মিনিট কয়েক পরে বাস্ এখান থেকে ছেড়ে চল্‌ল আলমোড়ার উদ্দেশে। পথের আশেপাশে চীর ও পাইন গাছের শোভা, কোথাও বা বন্য চেরী। এর পর সুরু হ'ল কোশী নদী। দূর থেকে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হঠাৎ হাস্যোজ্জ্বল পার্ব্বতী কন্যার

মত যখন সে প্রকাশ পেল তখন দেখলাম এর শুভ্রতা রূপোর কানবালার মতই। ধরা দিল সে হাতের কাছে যখন কোশীর ব্রীজের উপর আমাদের বাস্ উঠল। তার পরই হঠাৎ কোশী অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বুঝলাম আমরা কোশীকে ফেলে এখন আলমোড়া সহরের অনেকখানি কাছে এসে গিয়েছি।

আলমোড়ায় এসে সটান উঠলাম অভয় মহারাজের আশ্রমে। বন্ধুরাও পরে এসে জুটলেন। এখানে যোগাড়যন্ত্র করতে কাটল তিন দিন।

আলমোড়ার সাধারণ দৃশ্য

আমাদের মনে এই সময় দূর দুর্গমে যাত্রার তাড়া বেশী থাকায় আমরা আর অন্য কোনখানে যেতে পারি নি, শুধু এখানকার ঐতিহাসিক বিখ্যাত নন্দা দেবীর মন্দিরটি সবাই একদিন দেখে এলাম। মন্দিরটি ছোট এবং নূতন। আসলে এই দেবী ছিলেন জুনিয়াগড়ে, দুর্গের মধ্যে। সেখান থেকে এনে তাঁকে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এরপর কুলি ঠিক করা, মালপত্র ওজন করানো, এটা-সেটা সংগ্রহ করা—এই সবে কোথা দিয়ে যে তিনটি দিন মৌমাছির ব্যস্ত পাখার মত উড়ে বেরিয়ে গেল তা বুঝতেই পারলাম না। এখানে সব চেয়ে বেশী যাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেলাম তিনি হচ্ছেন এখানকার একাউন্টেন্ট—কিশোরীলাল সা। (পরে এখান থেকে তিনি পিথোরাগড়ে উচ্চপদ পেয়ে বদলী হয়ে গেছেন।) তা ছাড়া ছিল অভয় মহারাজের উপদেশ-নির্দেশ। তার কথা ভাষায় বোঝান অসম্ভব।

এরপর আবার—

"আমাদের যাত্রা হোল সুরু, এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।"

বেলা ৪টা নাগাদ আমরা বিদায় নিলাম আলমোড়ার কাছ থেকে। আমাদের অনেক আগে সকাল ৮টায় কুলির দল জিনিষপত্র নিয়ে রওনা হয়ে গেছে বড়াছিনার উদ্দেশে। সুতরাং তাদের সাথে গিয়ে আমাদের এখন মিলতে হবে। আলমোড়া থেকে বড়াছিনা মোট আট মাইল রাস্তা। বাসে করে যেতে ঘণ্টা দুই সময় লাগে। বেলা ৬টা নাগাদ আমরা বড়াছিনায় পেঁ‌ছে গেলাম। একটি দোকান ঘরের উপরতলায়

রাত্রিবাসের মত আশ্রয় পাওয়া গেল। আমরা ত' পৌছেই চায়ের উদ্যোগ করতে লাগলাম। তারপর গল্পগুজবে ও কাজকর্ম্মে রাত্রিটা অতিবাহিত হয়ে গেল।

রাত্তিরে বৃষ্টি নামল। সারা রাত বৃষ্টি চল্‌ল। আমাদের পথের অবস্থা জায়গায় জায়গায় খুবই খারাপ পি. ডব্লিউ. ডি. রাস্তা সারাচ্ছিল। তার উপর এই বৃষ্টিতে সেই সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথ এমন পিছল হোল যে চলা ভার।

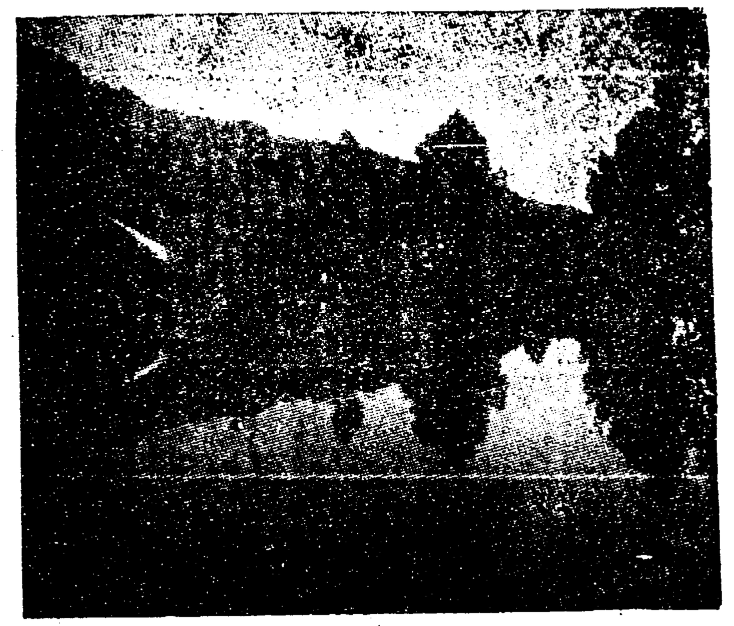

আলমোড়ার আর একটি দৃশ্য
হ্রদ ও পাইন-বন

সকালে যখন আমরা কৈলাসপতির নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তা উঁচু-নীচু। দু' পাশে চেনার গাছ। সুন্দর ভাবে সাজানো। বড়াছিনা থেকে ধত্তলছিনার দূরত্ব মাইল পাঁচেক। এখানে এসে পৌছাতে বেলা ৮টা বেজে গেল। কিন্তু শুনলাম কানাড়ীছিনা পর্য্যন্ত যেতে পারলে সেদিনকার মত নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে পারবো। ধত্তলছিনা থেকে, বেশী নয়—আড়াই মাইল দূরে কানাড়ী-ছিনা। এখানে এসে পৌছাতে আমাদের ১২টা বেজে গেল। পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত। আশ্রয় পেলাম একটু সেখানকার পোষ্ট অফিস ঘরের দোতলায়। ষ্টোভ জ্বালিয়ে আমাদের সামান্য রকম রান্না সেরে নেওয়া হ'ল। রাত্রিটা এখানেই অতিবাহিত হ'ল। অবসর সময়ে পোষ্ট অফিসের সামনের আম্রকুঞ্জের দিকে চেয়ে মনে পড়তে লাগল বাংলা দেশেরই কথা।

পাখীর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে এই আমাদের জীবন। মানসযাত্রী হংসবলাকার মতই ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে নীড় ছেড়ে আবার সদলবলে মোটঘাট নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম। এবার লক্ষ্য সরযূতীরের সেরা ঘাট। দূরত্ব পাঁচ মাইলের কিছু উপর। দুপুরের পরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সেরাঘাট পৌছাতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেল। কাজে কাজেই এখানেই আমাদের রাত্রিবাস স্থির হ'ল—গোপাল সিংএর বাড়ীতে। তাঁর স্ত্রী আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন তাঁদের কাঠের বাড়ীর দোতলার উপর। একেবারে সরযূ নদীর তীরে এই বাড়ীটি। এখান হ'তে সরযূ নদীর দৃশ্য বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার নির্ম্মল উজ্জ্বলতা বসে থাকতে থাকতেই, কিছুক্ষণের মধ্যে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো—যখন পাহাড়ের শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ ডিঙ্গিয়ে আকাশে দেখা দিল চাঁদ।

কতটুকুই বা সরযূর সঙ্গ পেয়েছিলাম, কিন্তু তার মধ্যেই অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল দুঃখিনী সীতার রূপ ধরেই সরযূ যেন আমার সামনে এসে দেখা দিয়েছে। করুণ সে মূর্ত্তিখানি যেন ভোলা যায় না! তার পিছু পিছু মনে এসেছিল রামায়ণের হাজার স্মৃতি। ভীড় করে তারা আমার মনকে পিষে ফেলবার উপক্রম করছিল। আবার যখন জানালা ছেড়ে উঠে আসি তখন বার বার মনে হচ্ছিল—দুঃখিনী সীতার চোখের জলে গড়া এই সরযূ।

পরদিন ভোর বেলায় আবার আমরা রওনা হলাম। অনেকক্ষণ চলার পর আমরা গনাই এসে পৌছিলাম। এক ভদ্রলোক নমস্কারান্তে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। পরিচয়ে জানতে পারলাম তিনি গভর্ণমেন্ট-নিযুক্ত একজন ডাক্তার। রাস্তার উপরেই তাঁর ডিসপেন্সারী ও থাকবার বাড়ী। তিনি সপরিবারে এখানে কয়েক বছর ধরে আছেন। ১৯৫১ সালে তিনি কৈলাস দর্শন করে এসেছেন। আমাদের এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন এবং কৈলাস থেকে ফেরবার পথে মায়াবতীর আশ্রমটি দেখে নিতে অনুরোধ করলেন। এখানে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থার জন্যও তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমরা কিন্তু তপোবনে গিয়ে দুপরের খাওয়ার ব্যবস্থা করব ঠিক করেছিলাম।

গনাই থেকে এক মাইল দূরে তপোবন। তপোবনে এসে দেখলাম দু'টি মাত্র দোকান। তাও তারা মামুলি চাল, আটা ও ডাল ছাড়া কিছুই রাখে না। তপোবনে, মনে করেছিলাম, নদীতীরে স্থানটির পরিবেশ ভালই হবে। কিন্তু দেখলাম তা নয়। যাই হোক এখানে এক ব্রাহ্মণের দোকানে রাত্রি কাটাবার ব্যবস্থা হ'ল। ব্রাহ্মণ অতি যত্নের সঙ্গে আমাদের সকল বিষয়ে সাহায্য করলেন। কুলিদের মধ্যে একজনের জ্বর হওয়ায় নূতন কুলি ঐ ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটিই ঠিক করে দিলেন।

পরদিন খুব ভোরে আমরা রওনা হ'লাম বেরীনাগের উদ্দেশে। উঁচু-নীচু আঁকা-বাঁকা পথ ধরে চলেছি ত' চলেইছি। অনেকটা উৎরাই ডিঙ্গিয়ে নামছি ক্রমে নীচের দিকে। পাহাড়ের যেন আর শেষ নেই! এক পাহাড় পার হয়ে আবার এক পাহাড়ে এসে পড়লাম। পাখীর মিষ্টি ডাক আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট নদীর কুলু-কুলু শব্দ যেন এক সঙ্গীতের সৃষ্টি করছিল। চীর গাছের ঝরা লাল পাতাগুলি পথের উপর পড়ে পথটিও রাঙ্গা ক'রে দিয়েছিল। তাই রাস্তা চলতেও লাগছিল খুব ভাল। এখানটায় ওঠানামা খুবই কম, কিন্তু একটু পরেই সুরু হ'ল চড়াই আর চড়াই।

সামনেই বেরীনাগ। এখানকার স্বর্ণকার শ্রীপরসীলাল বর্ম্মার নাম বহুদিন আগেই শুনেছিলাম। লোকটি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ। তার উপর কৈলাসযাত্রীদের উপর তাঁর

অশেষ শ্রদ্ধা। তাদের সেবা করবার জন্য তিনি সব সময়েই প্রস্তুত। আমরা খোঁজ করতে করতে তাঁর বেরীনাগের দোকানের কাছে এলাম।

বেরীনাগকে কেউ কেউ বেণীনাগও বলে থাকেন। এর এই রকম নাম হবার কারণ এখানকার সর্পরাজ্য। বড় বড় পাহাড়ে বোড়া সাপ এখানে প্রায়ই এদিক্-ওদিক্ পড়ে থাকতো বেড়ী বা বেণীর আকার নিয়ে। পেঁাছে প্রথমেই দেখা হ'ল স্বর্ণকারের সঙ্গে। তিনি একখানি ঘর আমাদের ছেড়ে দিলেন। তাঁর চাকর এসে ঘরখানি পরিষ্কার করে একখানি গালিচা পেতে দিয়ে গেল। আমরা যে যার বিছানা খুলে তার ওপর কাৎ হলাম। এমন সময় স্বর্ণকার মশাই এলেন। সকলে মিলে কৈলাস সম্বন্ধে আলাপ করছি, এমন সময় এল কফি, সঙ্গে প্যান কেক্। অভয় মহারাজের আশ্রমে থাকতেই দেখে ছিলাম প্যান কেক্ তৈরীর পদ্ধতিটা। আটা, চিনি একসঙ্গে মেখে তাতে একটু হলুদ ও বেকিং পাউডার দিয়ে বেশ ঘেঁাটা হয় জল দিয়ে। তারপর প্যানে করে ঘিয়ের সাহায্যে ভাজা হয়। ভাজতে ভাজতে কেকের মতই ফুলে ফেঁপে ওঠে। তাই এর "প্যান কেক্" নাম।

কথার ফাঁকে ফাঁকে খোলা জানালাটা দিয়ে যতবার বাইরের দিকে দৃষ্টি পড়ছিল ততবারই মনে হচ্ছিল আমার আগের পরিচিত হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গগুলি যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এই সব শৃঙ্গগুলির নাম তোমরা সকলেই বোধ হয় জান— নন্দাদেবী, নন্দাকোট, ত্রিশূল ইত্যাদি।

মুগ্ধ চোখে তাই দেখতে লাগলাম। ওদিকে স্বর্ণকার মশাই সমানে গল্প বলে যেতে লাগলেন।

রবিনসন ক্রুশোর ছায়ায়

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা রবিনসন ক্রুশোর কথা বলতে গিয়ে তোমাদের বলেছিলাম ঐ বইএর ছায়ায় আরও অনেক বই লেখা হয়েছে, তার মধ্যে জোহান ওয়াইস্-এর লেখা 'সুইস্ ফ্যামিলি রবিনসন' একখানা খুব নাম-করা বই। তার গল্পটা সংক্ষেপে বলি :

রবিনসন ও তাঁর স্ত্রী সঙ্গে চারটি ছেলে নিয়ে রওনা হলেন দক্ষিণ মহাসাগরের নতুন এক দেশে বসবাস করবেন এই রকম মনস্থ করে। সমুদ্রপথে ভীষণ ঝড় দেখা দেয়। ফলে জাহাজের মাস্তুল ভেঙ্গে পড়ে। জাহাজ অচল হয়ে দাঁড়ায়। বাতাসের

বেগে জাহাজ গিয়ে ঠেকে সমুদ্রের মাঝখানে একটা পাহাড়ের গায়ে। তখন জাহাজের অন্যান্য আরোহীরা জাহাজের উপরকার একটা নৌকো ভাসিয়ে তাতে চড়ে একদিকে চলে যান। পড়ে থাকেন শুধু রবিনসন পরিবার। তাঁরা জাহাজের কয়েকটি তক্তা সংগ্রহ করে সেগুলি পাশাপাশি বেঁধে একটা ভেলা তৈরী করে ভেসে চললেন কোথাও আশ্রয় নেওয়ার জন্য। সঙ্গে জাহাজ থেকে সংগ্রহ করে নিলেন তাঁবু ও কিছু আসবাবপত্র, আর সেই সঙ্গে গোটাকতক গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, শূয়োর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি জন্তু।

ভাসতে ভাসতে সন্ধান পাওয়া গেল এক দ্বীপের। ঐ দ্বীপে কোন মানুষ থাকে বলে মনে হ'ল না। দ্বীপটি জংগল ও ঝোপঝাড়ে ভরা। রবিনসন পরিবার দেখতে পেলেন অনেক রকম পশু ও পাখী ঐ দ্বীপে ঘুরছে। তাঁরা ঐ দ্বীপে তাঁবু খাটিয়ে বাসা বাঁধলেন।

দিনের পর দিন্ কাটতে লাগল। তারপর মাসের পর মাস। কোন দিনও সমুদ্রপথে কোন জাহাজ যেতে দেখা গেল না। তারপর হঠাৎ একদিন একটা সুযোগ উপস্থিত হ'ল। দূরে দেখা গেল একটি জাহাজ। তাঁরা দেখতে পেলেন ছ'টি লোক জাহাজে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বোধ করি কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজের কোন কর্মচারী হবে। জাহাজটিকে ভাল করে লক্ষ্য করে বোঝা গেল ওটা ইংরেজদের জাহাজ। তাঁরা নৌকো চড়ে গিয়ে উঠলেন ঐ জাহাজে। জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে তাঁদের বেশ আলাপ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ রবিনসন ও তাঁর স্ত্রী ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন তাদের ভিতর কে কে জাহাজে চড়ে ইউরোপে ফিরে যেতে চায়। ছ'টি ছেলে ফিরে যেতে চাইল। আর বাকী ছেলেরা রইল বাবা-মায়ের সঙ্গে। বৃদ্ধ রবিনসন ছেলেদের ঐ দ্বীপ থেকে সংগ্রহ করা অনেকগুলি মূল্যবান্ পাথর সঙ্গে দিয়ে দিলেন, যাতে তারা ঐ পাথরগুলি বিক্রী করে প্রচুর টাকা পেতে পারে ও ঐ টাকা দিয়ে ইউরোপের কোন দেশে নতুন জীবন সুরু করতে পারে। জাহাজ আবার ভেসে চলল।

গল্পটি খুব সংক্ষেপে লেখা হ'ল। মূল বইখানি ইংরেজীতে লেখা। যখন মূল গল্পটি পড়বে, দেখবে সেটা পড়তে কত ভাল লাগে।

তোমাদের ভিতর যারা দেশবিদেশের গল্প পড়েছ তারা হয়তো লক্ষ্য করে দেখেছ আরও বহু দেশের গল্পের উপর রবিনসন ক্রুশোর গল্পের ছায়া পড়েছে। ষ্টিভেনসনের বিখ্যাত উপন্যাস 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'এর উপরও বোধ করি এ গল্পের ছায়া পড়েছে।

রবিনসন ক্রুশোর মত পরিস্থিতিতে পড়ে এ্যাডভেঞ্চার করার সখ বহু কিশোর ও যুবকের মনে লুকিয়ে আছে। নাগরিক জীবনের ইট, কাঠ, লোহার পরিবেশের ভিতর

বাস করে অনেকেরই মন হাঁপিয়ে ওঠে। তারা চায় চলে যেতে কোন নির্জন স্থানে—গাছ, পাথর, পাহাড়, ঝরণা, নদী-পরিবেষ্টিত কোন স্থানে গিয়ে দিন কাটাতে। রবিনসনের গল্প পড়তে পড়তে গল্পের নায়কের মত পাঠক ঐ ধরণের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ফেলতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে অথচ রবিনসনের গল্প কখনও পুরোনো হয় নি।

শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী, এম্. এ

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দিনাজপুর থেকে বারো মাইল উত্তরে কাহারুলের ইন্‌স্‌পেকশন বাংলোয় যখন আমি অন্তরীণ ছিলাম সেই সময় দু'টি ঘটনা আমার জীবনে বৈচিত্র্য এনেছিল। বাঘের ব্যাপার নিয়ে একটার কথা অগ্রহায়ণ মাসের রামধনুতে বেরিয়েছে। আজ অপরটির কথা এখানে লিখছি। এক ভরা বানের মাঝে যেমন করে আমাকে পড়তে হয়েছিল তা সত্যই রোমাঞ্চকর।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। আমার বাংলোর পাশ দিয়ে একটা ছোট নদী (নাম বোধ হয় পুনর্ন'বা) বেশ এঁকেবেঁকে গিয়েছে। জল বেশী না, প্রায় বারো মাস হেঁটে পার হওয়া যায়। তবে বেশ স্রোত। শুধু বর্ষাকলে এক একদিন জল বাড়তে থাকে—বাড়তে বাড়তে দুই মানুষ উঁচু পাড় ছাপিয়ে অনেক দুর অবধি মাঠঘাট ঢেকে দিয়ে একদিন দেড়দিন ঘোলা জলের স্রোত চলে। তারপর নদীর জল ক্রমশঃ কমে আবার সেই হাঁটুজলে দাঁড়ায়। নদীর কিনারায় অনেক দূর অবধি ছোট ছোট ঝোপজঙ্গল। তার মাঝ দিয়ে—এদিক্ সেদিক্ দিয়ে বানের সময় যখন জলস্রোত বয়ে যায় আমার বাংলোর উঁচু বারান্দায় চৌকির উপর বসে দেখতে বেশ লাগে।

কিন্তু একদিন দেখা দিল বানের এক বিরাট রূপ - নদীর সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক উদ্দাম প্রয়াস। শেষ রাত থেকে বৃষ্টি চলেছে। সকালে উঠে দেখি

নদীর জল বাড়তে সুরু করেছে। বেলা দশটার মধ্যে উঁচু পাড় ছাপিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এদিক্ সেদিক্ গেরুয়া জলের স্রোত চললো। বেলা একটা নাগাদ জল বেড়ে উঠে আমার বাংলোর সামনের মাঠের উপর দিয়ে স্রোত বয়ে চললো। দেড় বছরের বেশী এখানে আছি কিন্তু অত দূর বন্যার জল উঠতে একবারও দেখি নি। ভাবছি এইবার আবার জল কমতে সুরু করবে। কিন্তু কোথায় কমা? বিকেল নাগাদ আমার বাংলোর সিঁড়ি ডুবিয়ে বাংলোর চারদিক্ দিয়ে জলের স্রোত বইতে লাগলো। বাংলো আর রান্নাঘরের মধ্যের জায়গায় উরুপর্য্যন্ত জল আর স্রোত। ঠাকুরকে বললাম, "গতিক ভাল নয়। রান্নাঘর থেকে সব নিয়ে এসো, রাত্রে বাংলোর এই বড় ঘরেই ষ্টোভে খিচুড়ী চড়িয়ে দাও।"

সন্ধ্যার মুখে জল বেড়ে আমার বাংলোর ঘরের মধ্যে দিয়ে স্রোত যেতে আরম্ভ করল। জিনিষপত্র, বাক্স আর চাল-ডাল যা ছিল চৌকির উপর তুললাম। একটি কোরোসিন কাঠের বাক্সের উপর ষ্টোভ জ্বেলে খিচুড়ী রান্না হ'ল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তখন দেখি চৌকির নীচে দিয়ে স্রোত চলেছে, জল আরো বাড়ছে, ঘরের মধ্যে হাঁটুজল। আর একটু পরেই তো বিছানা, চৌকি সব ডুবে যাবে! চারিদিকে চলেছে উদ্দাম জলস্রোত, লোকালয় কাছে কোথাও নেই। গাঢ় অন্ধকার রাত্রি। এখন উপায়? ঠাকুর আমার দিকে চায়, আমি ঠাকুরের দিকে তাকাই।

হঠাৎ আমার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। দিনের বেলা রাখালরা আমার সামনের মাঠে গরু গোছড় দিত। কিন্তু সন্ধ্যার সময় গরুর সঙ্গে আর দড়িগুলি বয়ে বাড়ী নিয়ে যেতো না; আমার বাংলোয় রেখে যেত—পরদিন আবার ঐ দড়ি দিয়ে গরু গোছড় দেবার জন্য। অনেক দড়ি ছিল। সেই দড়ি দিয়ে কোণের দিকে ঘরের ভিতরের দুই দিকের শালের খুঁটিতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মইএর মত ক্রমশঃ উঁচু করে বেঁধে চললাম। তারপর দা দিয়ে দরমার ছাউনি (সিলিং) খানিকটা কেটে উপরে উঠবার মত জায়গা করে নিলাম। নীচে মোমবাতি জ্বেলে আমি রইলাম, আর ঠাকুর লণ্ঠন নিয়ে উপরে উঠে গেল। গিয়ে চালের মটকার সঙ্গে দড়ি বেঁধে লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে দিল। তখন আমি যত বিছানাপত্র, বাক্স ইত্যাদি এক এক করে ঠাকুরের কাছে তুলে দিলাম। খাবার জিনিষ—চাল, ডাল মায় কুলের ও আমের আচারের হাঁড়ি ওপরে তোলা হলে আমি উঠলাম। সেই দরমার ছাউনির উপর পুরু বিছানা পেতে আমি আর ঠাকুর শুলাম। আর এদিকে ঘরের ভিতর দিয়ে জলের স্রোত বয়ে চলেছে খোলা দরজা দিয়ে। চারদিকে জলস্রোতের কল্লোলধ্বনি, আর সেই বাংলোর মাথার

উপর আমরা ছু'টি প্রাণী—প্রকৃতির প্রমত্ত ঝংকারের শ্রোতা। আমার কিন্তু সেই অভিনব অভিজ্ঞতা মন্দ লাগছিল না। ঠাকুরকে বললাম, "কিছু ছোলা ভিজিয়ে দাও, সকালে ছোলার ঘুঘনি আর চা তৈরী করা যাবে ষ্টোভে।

আশ্চর্য্য, সেই অবস্থায়ও জলের কল্লোলধ্বনি শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি! সকালে উঠে দেখি জল আর বেশী বাড়ে নি, ঘরের মধ্যে হাঁটুজলই আছে, স্রোত সমানে বয়ে চলেছে। কোন রকমে বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বাঁধা বাঁশের উপর বসে হাতমুখ ধুয়ে আবার উপরে উঠে এসে ষ্টোভ জ্বেলে সেই রাত্রের ভিজান ছোলা দিয়ে ঘুঘনি বানিয়ে ও চা তৈরী করে চা-যোগ করছি, দেখি বারান্দার সামনে জলের উপর এক নৌকো এসে হাজির। থানা থেকে জমাদার বাবু কনেষ্টবল সহ এসেছেন। খুব দুঃখ করতে লাগলেন যে রাত্রে কোন রকমে নৌকো যোগাড় করতে পারেন নি, আমার জন্য খুব দুর্ভাবনায় রাত কাটিয়েছেন। তখন সেই নৌকোয় আবার জিনিষপত্র সব তুলে নিয়ে থানায় আসা গেল।

এসে দেখি আসল থানা-বিল্ডিংয়ে যা জল ওঠে নি। দারোগা বাবুদের কোয়ার্টার্সেও জল। থানার ইন্‌স্‌পেকশন রুমে আমার থাকার ব্যবস্থা হ'ল। দারোগা বাবুর ষ্টোভ ও আমার ষ্টোভে সকলেরই একসঙ্গে খাবার তৈরীর ব্যবস্থা হ'ল। কনেষ্টবলরা নৌকো করে বাজারে গিয়ে ঘি, ময়দা, সুজি, চাল – সব নিয়ে এলো। সকালে বিকেলে হালুয়া, চা, দুপুরে খিচুড়ী আর রাত্রে লুচি-পরোটা সবাই মিলে খাই, আর সকালে বিকেলে নৌকো চড়ে চারদিকে বেড়াই। বান তিন-চার দিন ধরে ছিল। এমন বান নাকি বুড়োদের বয়সেও কেউ দেখে নি। বান সরে গেলে নিজের আস্তানায় ফিরে এলাম আরো ৩।৪ দিন ওখানে কাটিয়ে। নূতন করে আবার ঘর-সংসার পাতা গেল। স্মৃতির মাঝে অক্ষয় হয়ে রয়ে গেল বন্যার ভরা রূপ।

পুতুলের বিয়ে

শ্রীসাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, এম্. এ

শহর কলকাতা। রাস্তার উত্তর দিকে থাকে ইতি, স্বাগতাদের বাড়ী রাস্তার দক্ষিণে। যেমন এক পাড়ায় ওদের ঘর, সে রকম পড়েও ওরা একই স্কুলে, একই ক্লাসে।

স্বাগতা বাপ-মার একমাত্র সন্তান। ইতি সাত বোনের বোন,—সকলের ছোট। অফিসে যাবার সময় স্বাগতার বাবা মেয়েকে হাতে ধরে নিয়ে ওকে স্কুলে ঢুকিয়ে তবে অফিসে যান। ইতি একা একা যায় ভীড় ঠেলে-ঠুলে।

স্বাগতার বই যেমন ঝকঝকে, জামাও সে রকম নতুন তকৃতকে। দিদিরা যে সব বই পড়ে পড়ে উঠিয়ে রেখেছিলো ইতি সেই সব পুরোনো বই-ই পড়ে। দিদিদের তুলে রাখা ফ্রক্ গায়ে দেয়।

একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন রাম বাবু। পাড়ার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তাঁকে মামা মামা বলে ডাকে। ইতি ঠোঁট ফুলিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—আচ্ছা, মামা, স্বাগতার নতুন জামা, নতুন বই। আমার বেলা কেন সব পুরোনো? স্বাগতার বাবা স্বাগতাকে স্কুলে পৌঁছে দেন। আমার বাবা দেন না কেন? মামা একটু কেসে গলাটা ঠিক করলেন। চশমা আর চোখ দুটি মুছে ভালো করে ইতিকে দেখলেন। তারপর বললেন, তুমি সাত মেয়ের ঘরে এক মেয়ে, আর স্বাগতা হচ্ছে তার বাড়ীর একমাত্র মেয়ে। কারণ তো, মা, এইখানেই।

ইতি কি যেন ভাবে। ভেবে প্রশ্ন করে,– আচ্ছা, মামা, গল্পে তো কত রকম আজগুবি দেশের কথা পড়ি। এমন দেশ কি নেই যেখানে যে ঘরে বেশী ভাইবোন আছে রাজা সেই ঘরে নতুন নতুন জামা কাপড়, নতুন নতুন পুতুল আর ভালো ভালো খাবার পাঠিয়ে দেন? আছে মামা, এ রকম দেশ? না থাকলে এ রকম দেশ হয় না কেন?

মামা আবার চোখ আর চশমা মুছে ইতিকে দেখেন। বলেন,—পড় তো মা, তুমি ক্লাস ফাইভে। কথা বলছ কিন্তু পাকা বুড়ার মত! দেশের রাজা এ রকম হ'লে তোমার মত মেয়েদের দুঃখ ঘোচে, না?

হ্যাঁ, মামা! ইতি তার ছোট্ট মাথাটি নেড়ে জবাব দেয়। তার পর বলে,— স্বাগতা কিন্তু বেশ মেয়ে। আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে।

মামা বলেন,—সব ছেলেমেয়েই ভালো থাকে প্রথম প্রথম। তার পর শিক্ষার গুণে কেউ ভালো হয়, শিক্ষার দোষে কেউ খারাপ হয়।

স্বাগতার সঙ্গে ইতির বেশ ভাব জমে ওঠে। একদিন স্কুলে স্বাগতা বলে,—আয় ভাই ইতি, তোর পুতুলের সঙ্গে আমার পুতুলের বিয়ে দি। তখন তুই হবি আমার বেয়ান। বেশ মজা হবে।

ইতি রাজী হ'ল। স্বাগতা প্রশ্ন করে,—তুই ছেলের মা হবি, না মেয়ের মা?

ইতি উত্তর দেয়,—আমার মা মেয়ের মা, কত দুঃখ করেন। আমি ভাই, মেয়ের মা হব না, আমি ছেলের মা।

স্বাগতা বলে,—তোর মা কি রকম রে! আমার মা তো বলেন, 'মেয়ে হয়েছে, গয়নাগাঁটি পরাবো, লাল টুকটুক শাড়ী পরিয়ে দেবো, মজা করে সাজাব।' বেশ, আমিই মেয়ের মা হব তা হ'লে।

পুতুলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। স্বাগতার মা বাজার থেকে কনে কিনে আনলেন। কী সুন্দর দেখতে পুতুলটি! পিসি সিল্কের কাপড় কিনে এনে পুতুলের শাড়ী তৈরী করে দিলেন। কাকা, মামা—এঁদেরও উৎসাহ কম নয়। পুতুলের উপযোগী খাট, বাসনকোসন আলমারী, বাক্সপ্যাঁটরা, আয়না এবং আরও কত কি কিনে আনলেন তাঁরা!

ওধারে ইতির চিন্তার শেষ নেই। গত বছর রথের মেলা থেকে পাড়ার সেই মামা ওকে একটা মাটির পুতুল কিনে দিয়েছিলেন। এধারে ওধারে তেবড়ে-তুবড়ে গেছে। ইতি স্কুল থেকে ফিরে জল মাটি নিয়ে বসল সেই পুতুলটা ঠিক করতে। কোনো রকমে ঘষে-মেজে তাকে মানুষের মত করে তুলবার চেষ্টা করল। এখন দরকার ধুতি-চাদর। বাড়ীতে বাড়তি ধুতি. শাড়ী কারুরই নেই। একটা ছেঁড়া গামছা কয়লার গাদা থেকে সংগ্রহ করল ইতি। সেই গামছাটাকে ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে বরের ধুতি-চাদর বানালো বরের মা।

মেয়ের বাড়ীতে ভারী ধুমধাম। পুতুলের বিয়ে হলে কি হয়, খাবে তো মানুষরাই! তাই পনেরো পদ রান্না হ'ল। নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। মেয়ের মা ঘুরে-ফিরে তদারক করছে। ফ্রক্ ছেড়ে সে আজ শাড়ী পরেছে। মার অনেক অলঙ্কার তার গায়ে। বেশ দেখাচ্ছে স্বাগতাকে। স্বাগতার পিসি মুচকি হেসে বলেন,—হাঁরে স্বাগতা, বর কি রকম বিচ্ছিরী দেখতে! আর বরের ধুত-চাদর ও-রকম কেন, ছি ছি, মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দিলি না তো?

মুখ গম্ভীর করে স্বাগতা উত্তর দেয়,—বরদের চেহারা ওরকম খারাপই হয়। বড় মামা তো বলেনই. বাবা যখন বিয়ে করতে গেলেন তখন বাবাকে দেখে নাকি দিদিমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পিসিও অবিশ্যি ছেড়ে কথা কইবার মেয়ে ন'ন, বলেন,—তোর মামাদের ভাগ্য ভাল যে তোর বাবার মত জামাই পেয়েছিল।

আমিও তো তাই বলছি।—আট বছরের মেয়ে স্বাগতা বিজ্ঞের মত বলে,—আমার মেয়ের বর দেখতে খারাপ হলে কি হবে, পাত্রের গুণ কত!

বিয়ের পর কনে বরের বাড়ী চলে গেল। স্কুলে স্বাগতা প্রশ্ন করে,—ইতি, বৌ-ভাতটা তাড়াতাড়ি কর্। মেয়েটার জন্য মন কেমন করছে। পরশু রবিবার। বৌ-ভাতটা পরশুই সেরে ফেল্। ইতি রাজী না হয়ে পারে না।

বৌভাতের চিন্তায় রাত্রিতে ইতির ঘুম হয় না। কন্যাপক্ষকে কি খাওয়াবে? বিয়ের রাত্রিতে বরযাত্রীরা কত কিছু খেয়ে এসেছে। মা, বাবা এবং দিদিদের সেই এক কথা—নিজেরাই ভাল খেতে পাই না, তা আবার তোমার পুতুলের বিয়েতে নেমন্তন্ন খাওয়াতে হবে!

পাড়ার সেই মামাটি থাকলে ইতি তাঁর পরামর্শ নিতে পারত, কিন্তু লোকটি মাঝে মাঝে কোথায় যে চলে যান কেউ টের পায় না।

দেখতে দেখতে রবিবার এসে পড়ল। সকাল পার হয়ে দুপুর, দুপুরের পর বিকেল, এবং তারপর রাত্রি। ইতি পাথরের মূর্ত্তির মত দরজার ধারে বসে আছে। মুখটি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। চুল আঁচড়ানো হয় নি, চোখ দু'টি জলে ভরা।

পিসির হাত ধরে স্বাগতা এল। সঙ্গে আরও তিনটি মেয়ে এসেছে। ওদের আসতে দেখে ইতি স্থির থাকতে পারে না, দৌড়ে গিয়ে বাড়ীতে ঢোকে।

স্বাগতারা শুনলো, ইতি বলছে,—মা, মা, ওরা সব এসে পড়েছে। কি খেতে দেব বল। আজ যে বৌভাত!

ইতির মা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন,—মেয়ের সখ দেখে বাঁচি না! রান্নাঘরে আটার রুটি একটা আছে। একটু একটু চিনি আর ঐ রুটি একটু একটু ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাতে দে গিয়ে। যা, বিরক্ত করিস না। দূর হ সামনে থেকে।

পিসি স্বাগতাকে এক রকম ঠেলতে ঠেলতে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনেন। স্বাগতার মাকে বলেন,—আজ রাত্তিরে তো খাবই না, কাল সকালেও না। যা খেয়ে এসেছি বৌভাতে, বলবার নয়।

ইতির জল-ভরা চোখ দু'টির কথা ভেবে তিনি কি বিচলিত হয়েছিলেন? কে জানে!

রুশ বিজ্ঞানী মেনডেলীফ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম্. এস্-সি

আজ তোমাদের একজন রুশ বৈজ্ঞানিকের গল্প বলিব। অষ্টাদশ শতাব্দী বা উনবিংশ শতাব্দীতে রুশ বৈজ্ঞানিকদের তেমন নামডাক ছিল না। ধরিতে গেলে একমাত্র ইনিই ঐ দেশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। ইঁহার পূরা নাম ডিমিট্রি আইভানোভিচ মেনডেলীফ (Dmitri Ivanovitch Mendeleef)। রসায়ন শাস্ত্রের একটি মূল ভিত্তি রচনা করিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ইনি ছিলেন একাধারে যেমন বড় গবেষক তেমনি বড লেখক। ইঁহার কাছে যে আমরা কত ঋণী তাহা তোমরা বড় হইয়া যখন ঐ শাস্ত্র পাঠ করিবে তখন বুঝিতে পারিবে। যেমন মানুষের মধ্যে, প্রাণিজগতের মধ্যে গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ আছে সেইরূপ রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের মধ্যেও যে শ্রেণী-বিভাগ আছে তাহাই ইনি আবিষ্কার করিয়াছেন। এ যে কত বড় আবিষ্কার তাহা ভাষায় বলা কঠিন।

মেনডেলীফ অল্প বয়সে পিতৃহীন হন, তার উপর আর্থিক অবস্থাও তাঁহাদের সচ্ছল ছিল না। কিন্তু মায়ের চেষ্টা ছিল যেরূপেই হউক ছেলেকে মানুষ করিতে হইবে। মস্কো হইতে বহু দূরে সাইবেরিয়ার এক প্রান্তে ইঁহারা বাস করিতেন। তা সত্ত্বেও মা দীর্ঘ পথের বেশীর ভাগই পায়ে হাঁটিয়া, রাস্তার ভয়ভীতি তুচ্ছ করিয়া ছেলেকে মানুষ করিবার অভিলাষে মস্কো সহরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। মায়ের স্নেহ ও আন্তরিকতা ছেলের পক্ষে যে অপূর্ব্ব সম্পদ্ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এখানে পাওয়া যায়। মেনডেলীফও মায়ের সুপুত্র ছিলেন। রীতিমত পড়াশুনা করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি বৈজ্ঞানিক ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্য তাঁহাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু শুধু শিক্ষকতার বৃত্তিই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণাও আরম্ভ করিয়া দেন। ভদ্রলোক ছিলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল। গবেষণাগারে কাজকর্ম্ম যত না করিতেন তার চেয়ে কল্পনা-সাগরে ডুবিয়া যাইতেন বেশী। ইনি ভাবিতে লাগিলেন, এই যে ৭০।৭৫টী রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ আছে ইহাদের মধ্যে কি কোন শ্রেণী-বিভাগ নাই? পৃথিবীতে তো এমন দেখা যায় না যে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান, একের সঙ্গে অপরের সঙ্গতি নাই। সব কিছুর মধ্যেই যখন জাতি বা শ্রেণী-বিভাগ আছে তখন ইহাদের মধ্যেই বা কেন থাকিবে না? নিশ্চয়ই আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে ডুবিয়া গেলেন এবং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের গুণাগুণ বিচার করিয়া তাঁহার সূত্র খাড়া করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তখন ফ্রান্সেই ছিল রসায়নের উন্নতি সর্ব্বাধিক। তিনি সেখানে আসিয়া স্থানীয় রাসায়নিক পণ্ডিতের সহায়তায় আবার গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমশঃ মৌলিক পদার্থের শ্রেণী-বিভাগের সুন্দর ও অভিনব একটি তালিকা প্রস্তুত করিলেন। পৃথিবী-শুদ্ধ বিজ্ঞানীগণ এই তালিকা ও তাহার সিদ্ধান্তাদি পাঠ করিয়া অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। এ যে বিজ্ঞান-জগতে এক অপূর্ব্ব দান! এ যে নূতন গবেষণার জন্য দিকে দিকে দ্বার উদ্‌ঘাটন। নিঃস্ব, নগণ্য মেনডেলীফ দেখিতে দেখিতে বিশ্ববিখ্যাত মনীষী বলিয়া গণ্য হইলেন।

মেনডেলীফ একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। আপনভোলা পণ্ডিত, খেয়ালের তাঁর অন্ত ছিল না। তাঁহার একখানা ছবি হাতের কাছে পাইলে তোমাদের দেখাইতাম। একেবারে আমাদের দেশের সেকালের মুনি-ঋষিদের মত। তেমনি লম্বা দাড়ি, তেমনি অনাড়ম্বর, সৌম্য মুখচ্ছবি। শোনা যায় তিনি নাকি বছরে একবার মাত্র চুল-দাড়ি ছাঁটিতেন।

মেনডেলীফকে দেশের সকলেই শ্রদ্ধা ও মান্য করিত। এই দার্শনিক বিজ্ঞানীর সঙ্গে একটু রঙ্গরস করিবার জন্য একবার রুশ সম্রাট্ মহামান্য জার তাঁহাকে সভায় আহ্বান করেন। মেনডেলীফ সভায় উপস্থিত হইলে জার খুব উল্লসিত হন কিন্তু তাঁহাকে পরীক্ষার করিবার জন্য বলেন, "এই অদ্ভুত লম্বা লম্বা চুল-দাড়ি আমি দেখতে পারি না। আপনাকে এখনই চুল-দাড়ি কাটতে হবে।"

জারের হুকুম অমান্য করিতে পারে এমন স্পর্দ্ধা সে আমলে রাশিয়ায় কাহারও ছিল না। কিন্তু মেনডেলীফ খোসামুদি কাহাকে বলে জানিতেন না এবং লোকটিও ছিলেন অত্যন্ত জেদী। তিনি অমনি উত্তর দিলেন, "অসম্ভব। আমার দ্বারা ও-কাজটি হবে না। যখন সময় হয়েছে বুঝব তখনই কেবল কাটব, তার আগে নয়।" জার মনে মনে খুবই খুসী হইলেন। তোষামুদেদের কেহই পছন্দ করে না এমন কি যাহার তোষামোদ করা হয়—সেও না। জার মেনডেলীফকে প্রচুর শ্রদ্ধা জানাইয়া বিদায় দিলেন।

শোনা যায় মেনডেলীফ অত্যন্ত উচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা বলিতেন। তাঁহার কথার শব্দে কানে তালা লাগিত। এই অসম্ভব শব্দ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য নিম্নস্থ কর্ম্মচারীগণ কানে তূলা গুঁজিয়া তাঁহার কাছে আসিতেন। ইনি স্ত্রীশিক্ষারও খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অধীনে এজন্য কিছু মেয়ে চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তখনকার দিনে উহার তেমন চল ছিল না। ইনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের

পথ অবলম্বন করিতে গিয়া তাঁহাকে এক সময় মহামহিমান্বিত সম্রাটের বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে হইয়াছিল। কালক্রমে ইনি সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হ'ন এবং সরকারের একটী প্রধান দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়াতে মেনডেলীফ-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। তখন ডাক-টিকিটে তাঁহার ছবি ছাপা হইয়াছিল। সে সময় তাঁহার রচিত মৌলিক পদার্থের শ্রেণী-বিভাগ তালিকাটী লেনিনগ্রাডের রাস্তায় ইষ্টক-নির্ম্মিত এক বিশাল ফলকে অতি মনোরম ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল। আজও তাহা যথাস্থানে দাঁড়াইয়া আছে। বড় হইয়া তোমরা যদি কেউ সেখানে যাও তবে উহা দেখিতে ভুলিও না।

সুর-যাদুকর বিঠোফেন

শ্রীনীলিমা চক্রবর্ত্তী, বি. এ

ছোট সহরের বড় জমিদার-বাড়ীর গায়ক জোহান ফন বিঠোফেন বিয়ে করলেন জমিদার-বাড়ীর প্রধান পাচকের কন্যাকে। অতি সাধারণ পরিবার। নেই কোন গরিমা, নেই ভদ্রভাবে জীবন যাপন করার মত অর্থসচ্ছলতা। উচ্চশিক্ষার বালাই তো এ পরিবারে ছিল না কোন দিনই।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এই গরীব বাপ-মার ঘরে জন্ম নিল বিনা আড়ম্বরে একটি পুত্র সন্তান। বাপ-মা নাম রাখলেন লাড্‌উইগ। তখন কি তাঁরা স্বপ্নেও ভেবেছিলেন—এই ছেলেই একদিন সুরজালের সৃষ্টি করে সারা জগৎকে মুগ্ধ করে দেবে?

লাড্‌উইগের চেহারায় ছিল না কোন মাধুর্য্য, তবু নীল অতল চোখ দুটিতে যেন বয়ে যেত সাগরের ঝড়। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, চওড়া কাঁধ, অতি সাধারণ মানুষটি। কিন্তু যখন পিয়ানোয় আঙ্গুল চালাতেন, তখন মুগ্ধ শ্রোতাদের শিরায় শিরায় বয়ে যেত অপূর্ব শিহরণ। মনে হ'ত, পিয়ানোর বুকে যেন গুমরে উঠছে দুরন্ত সুরের তুফান। মেরু-আকাশের শুকতারার নিঃসঙ্গতা, হিমবাহী পার্ব্বত্য নদীর বাঁধহারা বেগ যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠত সেই সুরকারের সুরসৃষ্টিতে।

বাদক পিতা অতি শৈশবেই ছেলের প্রতিভা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ছিল ভীষণ মদের নেশা, আর সে জন্য সর্বদাই টাকার টানাটানি। তাই ছেলের প্রতিভা-স্ফুরণের চাইতে তাকে নিয়ে অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করাই ছিল তাঁর চেষ্টা।

ফলে যে সঙ্গীত ছিল শিশুর মনে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, পিতার ইচ্ছায় বাধ্যবাধকতায় তাই হয়ে দাঁড়াল বিভীষিকা। খেয়ালী বাপ আর যক্ষ্মারোগাক্রান্তা রুগ্না মা—দু'জনের সংস্পর্শে লাড্‌উইগের চরিত্রে দেখা দিল এক দুর্বোধ্য বিপরীত ভাবের সংমিশ্রণ। বাপের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মা ও ছেলে যেন দু'জনে দু'জনকে আশ্রয় করে নিরাপদ হতেন।

বাবা বাড়ীতে থাকলেই লাড্‌উইগকে বসে বসে পিয়ানো বাজান অভ্যাস করতে হ'ত। এক একদিন মাঝ রাতে মদ খেয়ে এসে জোহান ঘুমন্ত শিশু লাড্‌উইগকে ঠেলে তুলে এনে পিয়ানোর সামনে বসিয়ে দিতেন। ভীত শিশু ঘুম-ভাঙ্গা চোখে ক্লান্ত আঙ্গুল চালিয়ে যেত পিয়ানোয়—ভয়ে থামতে পারত না।

কিছুদিন যেতে না যেতেই জোহান লক্ষ্য করলেন, পুত্র বাঁধা-ধরা গৎ ছেড়ে নিজের খুসীতে নূতন সুর সৃষ্টি করতে চাইছে।

এমনি ভাবে চল্‌ল কিছুদিন। লাড্‌উইগ তখন একটু বড় হয়েছেন। তাঁর তখন একমাত্র চিন্তা গুরুর মত গুরু পাওয়া যায় কি করে। কে সেই গুরু? আর কেউ নয়, সুরযাদুকর মোৎসার্ট,—যিনি, যে বয়সে বাদ্যযন্ত্রের নাগাল পাওয়া যায় না সেই বয়সেই, সুর নিয়ে খেলা করতে পারতেন,—শিশু বয়সেই যিনি সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের কাছে স্নেহ ও সম্মান পেয়েছেন এই গানের জন্য,—তাঁকেই চাই গুরু রূপে।

অবশেষে অনেক কষ্টে পাথেয় সংগ্রহ হ'ল। লাড্‌উইগ যাত্রা করলেন ভিয়েনায়। গুরু শিষ্যের দেখা হ'ল। উপযুক্ত শিষ্য পেয়ে মোৎসার্টও তাঁর সুরসাধনা উজাড় করে দিতে চাইলেন।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেশ থেকে খবর এল—মার অন্তিম সময়। লাড্‌উইগকে ফিরে আসতে হ'ল, ছোট ছোট ভাইবোনগুলির সম্পূর্ণ ভার তুলে নিতে হ'ল নিজের ঘাড়ে। সাংসারিক নানান্ কষ্ট-দুঃখের মধ্যে অমৃতের মত এই সুরপ্রীতিই তাঁকে সঞ্জীবিত করে রাখল।

ইতিমধ্যে নিজের সুরপ্রতিভায় কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধুলাভের সুযোগ হয়েছিল তাঁর, এবং সেই সব প্রতিষ্ঠাবান্ বন্ধুদের সাহায্যেই আবার তিনি বাইশ বছর বয়সে পুনরায় রাজধানী যাত্রা করলেন। রাজধানীতে অভিজাত সম্প্রদায় এই তরুণ সুরকারের সুরজালে মুগ্ধ হলেন, জয় জয়কার পড়ে গেল এই নতুন অতিথির। সকলের মুখেই এক কথা—বিঠোফেন!—লাডউইগ বিঠোফেন! তাঁর রুক্ষ, ভদ্রতাশূন্য ব্যবহার বিরক্ত করেছে সবাইকে, তবু ওঁর সেই মন-ভোলানো সুর মুহূর্ত্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সব রকম দৈন্য।

সুরের সে কি অদ্ভুত কল্পনা!—হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে নিংড়ান সুর! দরিদ্র

সুরকারের কাছে খুলে যায় নতুন জগতের রুদ্ধ দ্বার—অর্থ, প্রতিপত্তি, যশ, সম্মান। মুগ্ধ ভক্তদল ঘিরে রাখে সকল অবসর। কিন্তু শত সফলতার মাঝে সকলের অগোচরে নীরবে এগিয়ে আসে এক দুর্দ্দমনীয় শত্রু—তার পদধ্বনি অনুভব করে ভীত হয়ে ওঠেন শিল্পী। ভয় রূপ নেয় বদ্‌মেজাজে। লোকের সঙ্গ আর তখন ভাল লাগে না।

তার পর? সুর নিয়ে যাঁর কারবার ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়। ক্রমে পৃথিবীর সব সুর হারিয়ে যায় সুরের ঐন্দ্রজালিকের কাছে। ভালোমন্দ কোন শব্দই সাড়া জাগায় না তাঁর কানে। গভীর দুঃখে বিঠোফেন হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ, বিশ্বদ্বেষী। শেষটায় এমন হ'ল, পিয়ানোর রিড্‌এ উঁচুনীচু সুরের তারতম্যও তাঁর কানে পৌঁছুত না বলে কখনও বা তিনি এত জোরে বাজাতেন যে তারই ছিঁড়ে যেত, আবার কোথাও এত মৃদু সুর তুলতেন যে তা শোনাই যেত না। আত্মবিমুগ্ধ শিল্পী হতবাক্ হয়ে দেখতেন একটি প্রাণেও সাড়া জাগে নি। নিজে বাজানো ছেড়ে দিতে হ'ল তাঁকে। তখন থেকে তিনি শুধু অর্কেষ্ট্রা পরিচালনা করতেন।

শ্রোতাদের দিকে পেছন ফিরে হস্তসঞ্চালনে সুরের মাত্রা রেখে পরিচালনা করে চলেছেন; ঘর ভেঙ্গে পড়ছে মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর করতালি-ধ্বনিতে। স্বর্গীয় মধুর সুরে কেউ বা হাসছে, কেউ বা কাঁদছে; কিন্তু সুরের জনক বিঠোফেন নির্ব্বিকার। মুগ্ধ জনতার উল্লাস তাঁর বদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে বাধা পেয়ে ফিরে আসে। একটি গায়ক ধীরে ধীরে এসে হাত ধরে ফিরিয়ে দেয় শিল্পীকে, "দেখ, তোমার জয় দেখ, দেখ তোমার সুরসৃষ্টি কী আনন্দের স্রোত বইয়ে দিতে পারে!" বিঠোফেনের চোখে ঝরে অশ্রু।

১৮২৭ সালের ২৬শে মার্চ্চ কিছুকাল রোগভোগের পর তাঁর মৃত্যু হয়। ক্ষুব্ধ আত্মা মুক্তি পায়।

পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

(আশ্বিন, ১৩৬৪)

যে উত্তরটি তৈরী করা ছিল সেটি এই রকম:—

১। মায়া হয় না। ২। ঠকতে হবেই। ৩। তোমায় আমলই দেবে না। ৪। অবাক্ হতে হয়। ৫। দোষ ঢাকতে চেষ্টা করবেন। ৬। মেইন সুইচ বন্ধ করবে।

এই উত্তরের সঙ্গে ঠিক ঠিক উত্তর মিলে যাওয়ায় পুরস্কার পেলেন শ্রীশিবানী বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা-২৯) ও শ্রীনিরাপদ দত্ত (কলিকাতা-২৬)। দু'জনকেই এক রকম (১ম) পুরস্কার দেওয়া হ'ল।

এ ছাড়া আর যাঁদের উত্তর কাছাকাছি হয়েছে তাঁদের নাম—শ্রীঅজয়কুমার মাল (দেবলপুর—হাওড়া), শ্রীগুণধর বর্দ্ধন (ঝাড়বনি—মেদিনীপুর), শ্রীশিপ্রা নন্দী (নয়া দিল্লী) ও শ্রীমমতা সেন (কলিকাতা-৬)।

জাভার মৃত্যুগুহা

শ্রীমুরারিমোহন মণ্ডল

জাভায় একটি গুহা আছে। এটির পরিধি প্রায় আধ মাইল। উঁচুতেও এটি প্রায় ২০ হাত। এর ভেতরটা শুধু মানুষের আর নানা রকম জীবজন্তুর কংকালে পূর্ণ। একটা কুকুরকে এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, দেখা গেছে, সেটি ১৪ সেকেণ্ডের মধ্যে মারা পড়ে। একবার একটা পাখীকে এর ভিতরে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটিও মাটিতে পড়বার আগেই মারা গেল।

কেন এমনটা হয়? এ কি ভৌতিক গুহা? না, ভৌতিক নয়; এই গুহাটির মধ্যে জমে আছে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। তোমরা জান, অক্সিজেন গ্যাস ছাড়া কোন জীবজন্তুই বাঁচতে পারে না। ওখানে ঐ কার্বনডাই-অক্সাইডের প্রাচুর্য্যে অক্সিজেন থাকতে পারে না, তাই কেউ ওখানে ঢুকলে, অক্সিজেনের অভাবে তার মৃত্যু হয়।

নেপালেও গ্রোচট্রা-ডেল-কেন্ নামে এই রকম একটি গুহা আছে। তবে এই গুহায় কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস মাটী থেকে মাত্র দেড় হাত থেকে দু'হাত উঁচু জায়গা যুড়ে আছে, তাই এতে কোন মানুষের ক্ষতি হয় না। তবে কুকুর বা ঐ রকম ছোটখাট জীবজন্তু, যাদের উচ্চতা দেড় হাত দু'হাত,—তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে।

যে গল্প জানা নেই

শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী

—ষোল—

অচেনা হাতের চিঠিটাই গোপাল আগে খুলে ফেলল। খুলেই বুঝল এটার লেখকও নতুন কেউ নয়, তার সেই দার্জ্জিলিঙের পথের বন্ধু সুমিত। গোপাল চিঠিটা মনোযোগ সহকারে পড়তে লাগল। সুমিত লিখেছে: গোপাল, তোমার মামার বাড়ীতে তোমার খোঁজে গিয়ে-

ছিলাম, কিন্তু দেখা পাই নি। তোমার সম্বন্ধে যে অপবাদ শুনেছি তা আমরা এখনও বিশ্বাস করতে পারি নি। যা হোক, তুমি এ সম্বন্ধে আমায় খুলে জানিও।

তারপর গোপাল খুলল অশোক বাবুর চিঠিটা। অশোক বাবুও তার কাছে প্রকৃত সত্য খবর কি জানতে চেয়েছেন। এই সব চিঠির উত্তর লিখতে গোপালের মাথা কাটা যেতে লাগল। কিন্তু তবু সে গুছিয়ে জবাব লিখে দিল।

* * *

গোপাল এখনও বাড়ীতেই আছে। গোপাল যে সুমিতকে চিঠি দিয়েছিল কয়েকদিন পরেই তার উত্তর এল। সুমিত লিখেছে, "গোপাল, আমরা তোমার চিঠিতে সবই জানলাম। তোমার সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব ধারণা একটুও বদলায় নি। তোমার চিঠি বাড়ীর সবাইকে দেখিয়েছি। মা, বাবা, দিদি—সবাইকে। বাবা তোমার চিঠি দেখে বললেন, 'এমন একটি প্রতিভাবান্ শিশুর জীবন শুকিয়ে যাবে তা হয় না। সুমিত, তুমি ওকে একটা পত্র লিখে দাও, যদি সুবিধা বোঝে তা হলে যেন আমাদের বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করে। আমাদের বাড়ীতে তার কোনই কষ্ট হবে না। নিজের বাড়ীর মত ও নির্বিঘ্নে থাকতে পারবে।' তাই লিখছি তোমায়, যদি কোন আপত্তি না থাকে ত' তুমি আমাদের বাড়ীতে চলে এস।"

গোপালের মা-বাবাও সব কথা শুনলেন। তার পর গোপালের মত জিজ্ঞাসা করাতে সে, বহু দ্বিধার পর. সুমিতদের বাড়ীতে থেকে পড়বে বলল। তা ছাড়া সুমিতের মত সহপাঠীর সঙ্গে থাকতে তার আনন্দও লাগবে। সুমিতের দিদিও তার নিজের দিদির মতই তাকে স্নেহ করবেন বলে তার বিশ্বাস। অবশ্য ওঁরা মামাদের চেয়েও অনেক বড়লোক, কিন্তু সব বড়লোকই তো সমান নয়! গোপালের মা-বাবাও তাই শেষ পর্য্যন্ত তাকে সুমিতদের বাড়ী পাঠানো মনস্থ করলেন।

গোপাল আবার ফিরে চলল সেই কর্ম্মকোলাহলময় সহরের বুকে। কিন্তু এবারে এক নতুন পরিবেশে। কে জানে এবারে তার ভাগ্য তাকে কোন্ দিকে টেনে নেবে! (ক্রমশঃ)

ক্লান্ত মন

শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সবুজের ভীড়ে দিগন্ত ঢাকে
ঘন বনানীর তলে,
সুপ্ত প্রকৃতি মেতে ওঠে আজি—
সূর্য্য অস্তাচলে।
নীল আকাশের ভুরু-কাঁপা মেঘ
কি বারতা বয়ে আনে,
গীতিময় রূপ ফুটে ওঠে তাই—
চেয়ে দেখি ধরা পানে।

মেঠো রাস্তার ধারে তালগাছ,
পাশে তার বাঁশঝাড়,
নাম-নাহি-জানা ছোট পাখী এক
ডেকে চলে বার বার।
ক্লান্ত মনের শেষ বাঁশীখানি
সুর শুধু খুঁজে মরে,
নতুন প্রাণেতে নতুনের গান
চারিদিকে ভীড় করে।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

গত বারে তোমাদের কতকগুলি সভা-সম্মেলনের কথা বলেছি। তারপর গেল মাদ্রাজে বিজ্ঞান কংগ্রেস আর এখন চলছে গৌহাটীর কাছে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর উপনগরীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৬৩তম অধিবেশন। এবারেও কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হয়েছেন শ্রীযুক্ত ডেবর (পর পর চতুর্থ বারের জন্য)। এবারকার কংগ্রেসে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী থেকে পুরোপুরি হিন্দীতে পরিবর্তিত করার ব্যাপার নিয়ে। হিন্দীভাষী রাজ্যগুলি স্বভাবতঃই তাড়াতাড়ি এই পরিবর্তনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু যে সব রাজ্যের লোকদের মাতৃভাষা হিন্দী নয়—এমন কি যাঁরা হিন্দী কিছুই বোঝেন না—তাঁরা এই ব্যস্ততার প্রতিবাদ করেছেন তীব্র ভাবে। দক্ষিণ ভারত—বিশেষ করে মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্য এঁদের দলে। পশ্চিম বঙ্গেও এই ব্যাপারে প্রতিবাদ হয়েছে। কংগ্রেসী সদস্যদের অনেকে তো বটেই, বেশীর ভাগ সাহিত্যিকরাও, দেখা যাচ্ছে, এই হিন্দীকরণের অতিব্যস্ততার বিরোধী। এ ছাড়া আরও একটা কথা আছে। ভারতের সংবিধানে ১৪টি ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করা হয়েছে। প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব ভাষা সে রাজ্যের সরকারী ভাষা বলে গণ্য হোক এই তাঁরা চান, এবং বাস্তবিকই তাঁদের প্রস্তাব খুব যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়। দুঃখের বিষয়, পশ্চিম বাংলার সরকারী কাজকর্ম চালাবার ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষাকে এখনও সে সম্মান দিতে পারেন নি—যা পূর্ব বাংলা দিতে পেরেছেন।

কলকাতার অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থাগার তালতলার পাবলিক লাইব্রেরীর ছোটদের বিভাগটির (মুকুল বিভাগ) এ মাসে ২৫ বছর পূর্ণ হ'ল। এই উপলক্ষ্যে একটি উৎসবে অংশ গ্রহণের সুযোগ আমার হয়েছিল। ২৫ বছর আগেও যে সব কর্মী ছোটদের পৃথক্ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র।

আরও একটা সুখবর আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনের সময় প্রতি বছর বাংলা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে যে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দেন তা এবারে দেওয়া হ'ল কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যুগে এবং তার পরে যে সব কবি বাংলা সাহিত্যকে নিজস্ব প্রতিভায় সুরভিত করে রেখেছেন কবি কুমুদরঞ্জনের স্থান নিশ্চয়ই তাঁদের শীর্ষদেশে।

অনেক আগেই তাঁকে এ সম্মান দেওয়া উচিত ছিল। এ সম্বন্ধে কবির মন্তব্য একটি কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন— এ সংখ্যার প্রথমেই তা ছাপা হ'ল। কবি কুমুদরঞ্জন রামধনুর একান্ত আপনার জন, তাই বিশ্ববিদ্যালয় যে এতদিন পরেও তাঁর কথা মনে করেছেন সে জন্য আমরাও তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এবারে তোমাদের চিঠির জবাব দেই :

শ্রীসুপর্ণা ঘটক (কলিকাতা-২৬) লেখনীবন্ধুর তালিকা এখন বেশ পুষ্ট হয়েছে, শীঘ্রই তা পাঠাতে সুরু করব ; স্বদেশী এবং বিদেশী সব রকম বন্ধুর। বারোয়ারী উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়ায় দেখে তার পর বিবেচনা করব আবার এর অনুরূপ আর একটি উপন্যাস সুরু করা হবে কিনা। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাকা হাতের লেখা না হলে বড় লেখা প্রকাশ করা চলে না। শ্রীঅমল মিত্র (আগরতলা)—কার্তিক সংখ্যার 'সিংহ' প্রসঙ্গে পোষা সিংহের ছবি দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। পোষা সিংহের গল্প আর একদিন বলবার ইচ্ছা আছে। শ্রীপরেশনাথ চক্রবর্ত্তী (কৃষ্ণপুর)— তোমাদের হিজিবিজি চিঠিই তো আমাদের বেশী ভাল লাগে, কারণ ওরই মধ্যে আমরা তোমাদের মনের ছবি দেখতে পাই। বৈষ্ণব গোস্বামীদের গল্প পড়ে খুব ভাল লাগছে ? ভাল জিনিষ ভাল লাগা তো উচিতই। শ্রীগুণধর বর্ধন (ঝাড়বনি)—'লেখা চাই'-এর প্রতিযোগিতায় তোমার সাফল্যের সংবাদে খুব খুসী হলাম। 'সাধনা' নামটি পত্রিকার পক্ষে ভালই হবে। সেকালের বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাধনা'র কথা নিশ্চয়ই শুনেছ ? শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—প্রায় প্রতিবারেই শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি ছাপবার মুখে জায়গার টান পড়ছে। এবারও পড়ল। এর পরে একসঙ্গে বেশ কয়েকজনের পরিচয় দিয়ে এর শোধ তুলে নেওয়া যাবে। কেমন ? অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও তাই। বারোয়ারী উপন্যাসে একবার লেখা বেরোলেও আবার লেখা পাঠাতে কোন বাধা নেই। শ্রীকৃষ্ণা সুর (কলিকাতা ৪)—"হাতের কাজ" গল্পটি তোমার খুব ভাল লেগেছে ? আরও অনেকে এ কথা জানিয়েছেন। তোমার ভ্রমণকাহিনীটি ছাপতে দেরী হচ্ছে দেখে নিশ্চয়ই চটে আছ। আর বেশী দেরী হবে না। তোমার তালিকাও তৈরী হলেই পাঠান হবে, ডাক-টিকেটের প্রয়োজন নেই। শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায় চৌধুরী (সিউড়ী) ও শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ (নিউ দিল্লী)— রামধনু পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে ধাঁধার উত্তর পাঠালেই চলবে। পোষ্ট কার্ডে পাঠাতে দোষ কি ?

আজ এখানেই দাঁড়ি টানি। আন্তরিক প্রীতিসম্ভাষণ জেন।

— ইতি তোমাদের সম্পাদক মশাই

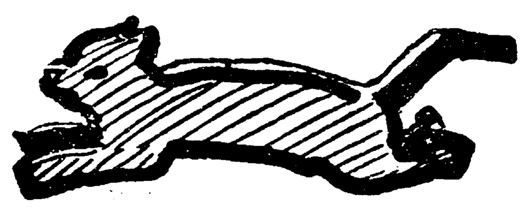

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

কমলালেবু। কলার 'ক' (অর্দ্ধেক), কামরাঙার 'ম' (সিকি ভাগ), গোলাপজামের 'লা' (একপঞ্চমাংশ) লেডিকেনির 'লে' (সিকি ভাগ), সাবুদানার 'বু' (সিকি ভাগ) — এই মিশিয়ে তৈরী হ'ল ক ম লা লে বু।

উত্তরদাতাদের নাম :—রত্নাবলী ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা-২৫) ; জ্যোতিকান্ত (মিহিজাম) ; দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-১২) ; কৃষ্ণা সুর (কলিকাতা-৪) সুগত সেনগুপ্ত (কলিকাতা-২৬) ; অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর) ; শেফালি, আলোক, মীনাক্ষী ও মঞ্জুশ্রী দত্ত (কলিকাতা-২) ; সঞ্জয় চন্দ (লাবান—শিলং) ; শুক্লা, তপতী, দীপু, ছন্দা, সেবা (লাবান—শিলং) ; বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, চম্পা দেবী, সুমিত্রা দেবী, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা-৪০) ; লালমণি মাল (জালালসী) ; ছাত্রছাত্রী, দেউলপুর জাতীয় বিদ্যামন্দির (দেউলপুর—হাওড়া) ; বিজলী, ঝণ্টু, দুলাল, শুধু, আগমনী (উচলপুকুরী) ; মানসী চৌধুরী (কুলিয়া) ; জয়া, বিজয়া ও ছন্দা রায় (আইজটনগর) ; অমিতাভ ও মুকুলিকা ঘোষ (কলিকাতা-২৫) ; কল্যাণ কীর্ত্তি (এলাহাবাদ) ; সুচেতা ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা)।

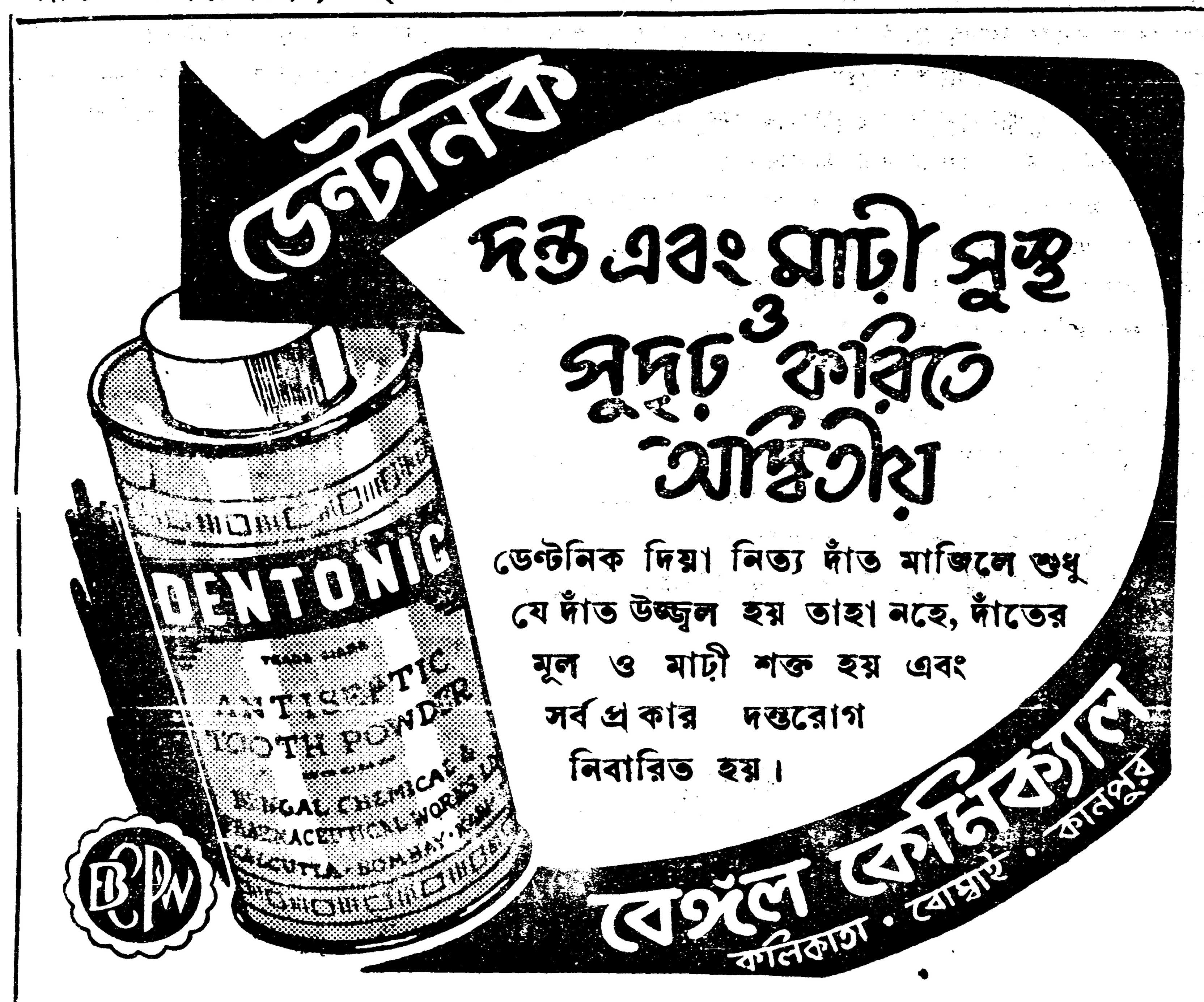

নূতন ধাঁধা

নীচের লেখাটি পড়ে কিছু বুঝতে পারছ না তো ? কিন্তু প্রত্যেকটি সংখ্যার বদলে একটি করে মাছের নাম বসালেই লেখাটি ঠিক মত পড়া যাবে। কোথায় কোন্ মাছের নাম বসবে বার কর দেখি :—

দৌড়ে এসেও দেখি আগেই সব দ ১ এক কাণ্ড ! কিন্তু আসান২ আসতেই আবার কামরা খালি। নিমেষের মধ্যে বেঞ্চিতে সবাই ৩গেজ রেখে আমিও ৪ হয়ে শুয়ে পড়লাম। বোন ৫কে বললাম, শুয়ে পড়। জানালা দিয়ে দেখি ৬, গত বছর চাষারা যেখানে ধান ৭য়েছিল সেখানে তো কিছুই নেই ! নদীতে ৮ ডেকে মাঠ ভেসে গেছে। ৯ পাথরগুলো পর্য্যন্ত ডুবে গেছে। ১০গুঁড়ি ঝরছিল, হঠাৎ ও ১১গুর করে মেঘও ডাকতে লাগল। এমন সময় কে বলে উঠল, ঐ কু১২ ! চেয়ে দেখি, যেদিক্‌টায় নদীর ১৩ সে দিকে একটা কাঠ, স১৪ হবে, ভেসে চলেছে। গাড়ীর ভিতর একটি ছোকরা, পরনে চক্‌চকে পাৎলুন, ভেল১৫না কে জানে। ছোকরা বড় ১৬ল। কথা তো নয়, যেন লঙ্কা১৭, এমনি ঝাঁঝ ! বললে, আজকাল রেলে চড়া যে কি ১৮ হাড়ে হাড়ে বুঝছি। কী ১৯ দেখুন তো। দিনের বেলা এদের উ২০স্থা হয়ে শোয়া ? একটু পরেই দেখবেন, এরাই উঠে বন্যার জন্য ২১ তুলতে সুরু করবে। ২২তের সময়ই বটে।

লে খা চা ই

অভিনব কিশোর-মাসিক ; বার্ষিক সডাক ২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১।০, প্রতি সংখ্যা ৶০। কার্ত্তিক (৭ম) সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে "যেই ভকত, সেই জানে" শিশু-উপন্যাস বাহির হইতেছে। নবীন লেখক-লেখিকাদিগকে লিখিতে উৎসাহ দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। ছোটদের 'লেখা' ব্যতীত, বড়রাও লিখিয়া থাকেন। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমলকুমার মিত্র, যাদুশ্রী শঙ্কর দাস, প্রভৃতিও ইহাতে লেখেন। আগামী বৈশাখ হইতে ২য় বর্ষ আরম্ভ হইবে, কলেবর বর্দ্ধিত হইবে ও বার্ষিক চাঁদা ৩ টাকা হইবে। এখনই গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইলে, অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না।

ঠিকানা :— শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, বি-টি, সম্পাদক, 'লেখা চাই", দেবালয়—২৪ পরগণা।

চ য় ন

১৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ (হিন্দুস্থান মার্টের সন্নিকটে)

সব রকম বই—বিশেষ করে রামধনু পত্রিকা (যে কোন সংখ্যা) এবং রামধনু কার্যালয় থেকে প্রকাশিত সব রকম বই আমাদের কাছে পাওয়া যাবে।

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৶০

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২।০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১।	নব পত্রিকা	— ৪৲
২।	জয়যাত্রা	— ৪৲
৩।	দেবালয়	— ৪৲
৪।	ইন্দ্রধনু	— ৪৲
৫।	বসুধারা	— ৪৲
৬।	পরশমণি	— ৪৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸০

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥০

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১।০

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥৶০

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানি বই]

এবার পূজায় বাহির হইল

১ যত হাসি তত্তই মজা —শিবরাম চক্রবর্ত্তী— ২৲
২। পূজার দিনের উপহার—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা, ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

Regd. No. C—1641

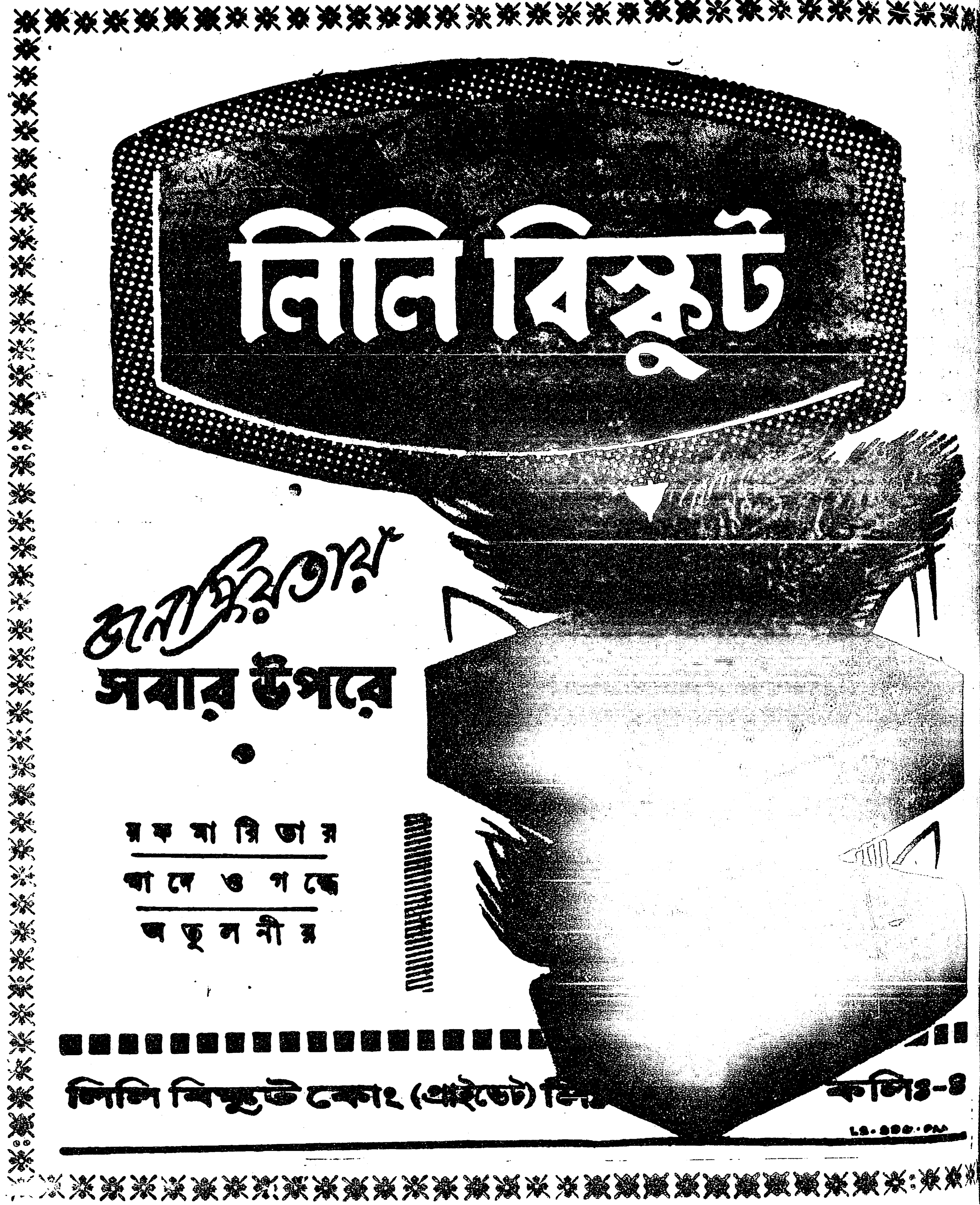

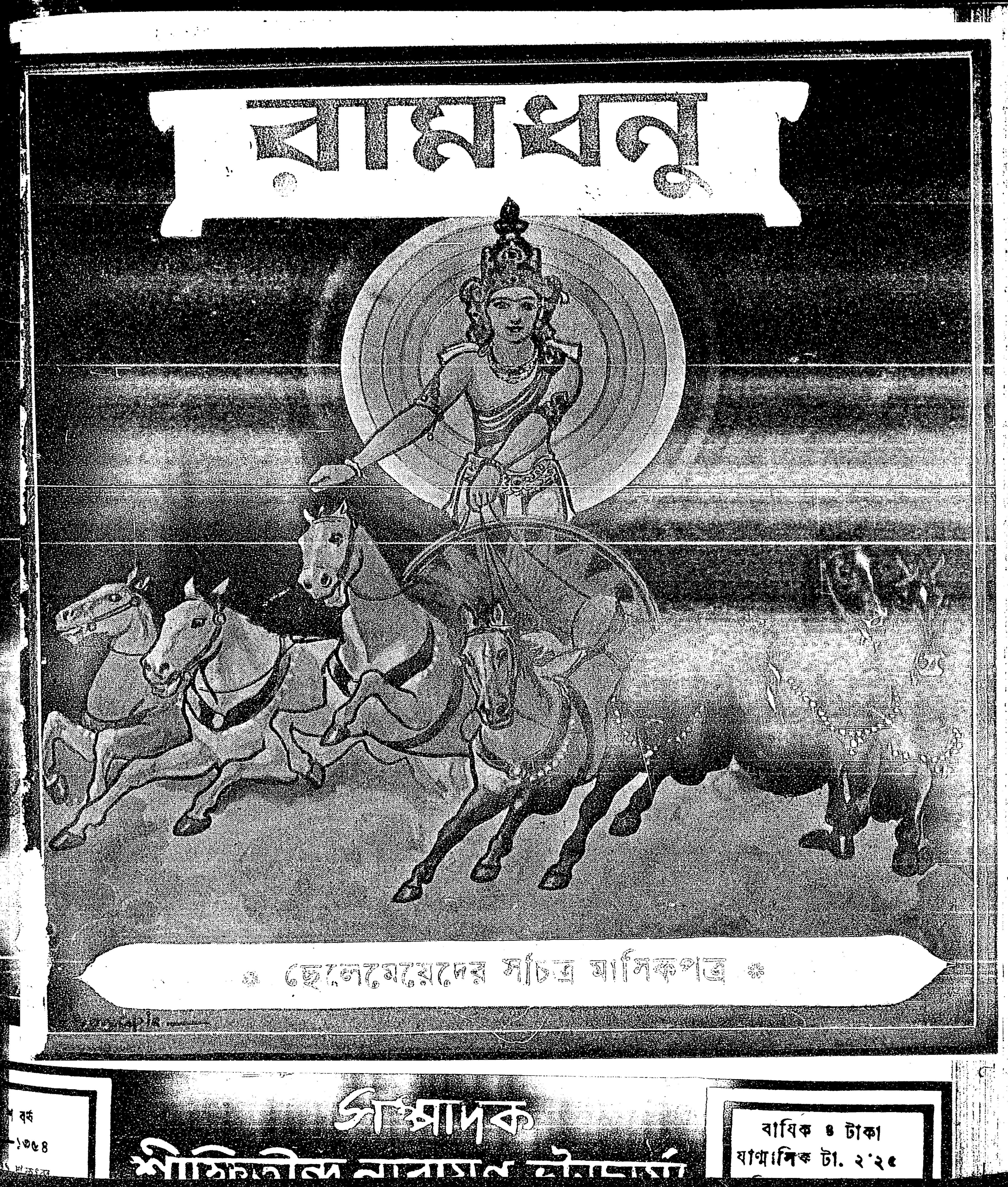

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন–৩৫–২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

/২।।০, /৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

ছোটদের ভাল ভাল বই ঃঃ নামকরা বই

নলীগোপাল চক্রবর্ত্তীর—

কাঠ ও কাঠের কাজ	১।।০
বাঁশ, বেত, পাতা ও সোলার কাজ	১৲
তন্তুশিল্পের কাজ	১৲

আলোক চক্রবর্ত্তীর—

মনসামংগল	১৲
চৈতন্যমংগল	১৲
কুমারসম্ভব	১৲

শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তীর—

রঘুবংশ	১৲
রাণী রাসমণি	১৲
জাগ্রত মেদিনী	১৲

ছোটদের অভিনব মাসিক পত্রিকা।

চয়নিকা

১৮ বছরে পড়িল : বার্ষিক মুল্য মাত্র ৩৲

যে কোন মাসে টাকা পাঠালেও বৈশাখ থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক হতে হয়। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা মাত্র ।০ আনা। অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গ ও সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত।

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনের মতামতে :
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে ; গুনে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

ভিটামিন সমৃদ্ধ

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—৷৵৹

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২৷৹

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬৷৷৹
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১। নব পত্রিকা — ৪৲
২। জয়যাত্রা — ৪৲
৩। দেবালয় — ৪৲
৪। ইন্দ্রধনু — ৪৲
৫। বসুধারা — ৪৲
৬। পরশমণি — ৪৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸৹

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৷৷৹

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷৷৹

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷৹

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৷৷৹

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৷৷৵৹

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানি বই]

এবার পুজায় বাহির হইল

১। যত হাসি ততই মজা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী— ২৲
২। পূজার দিনের উপহার—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

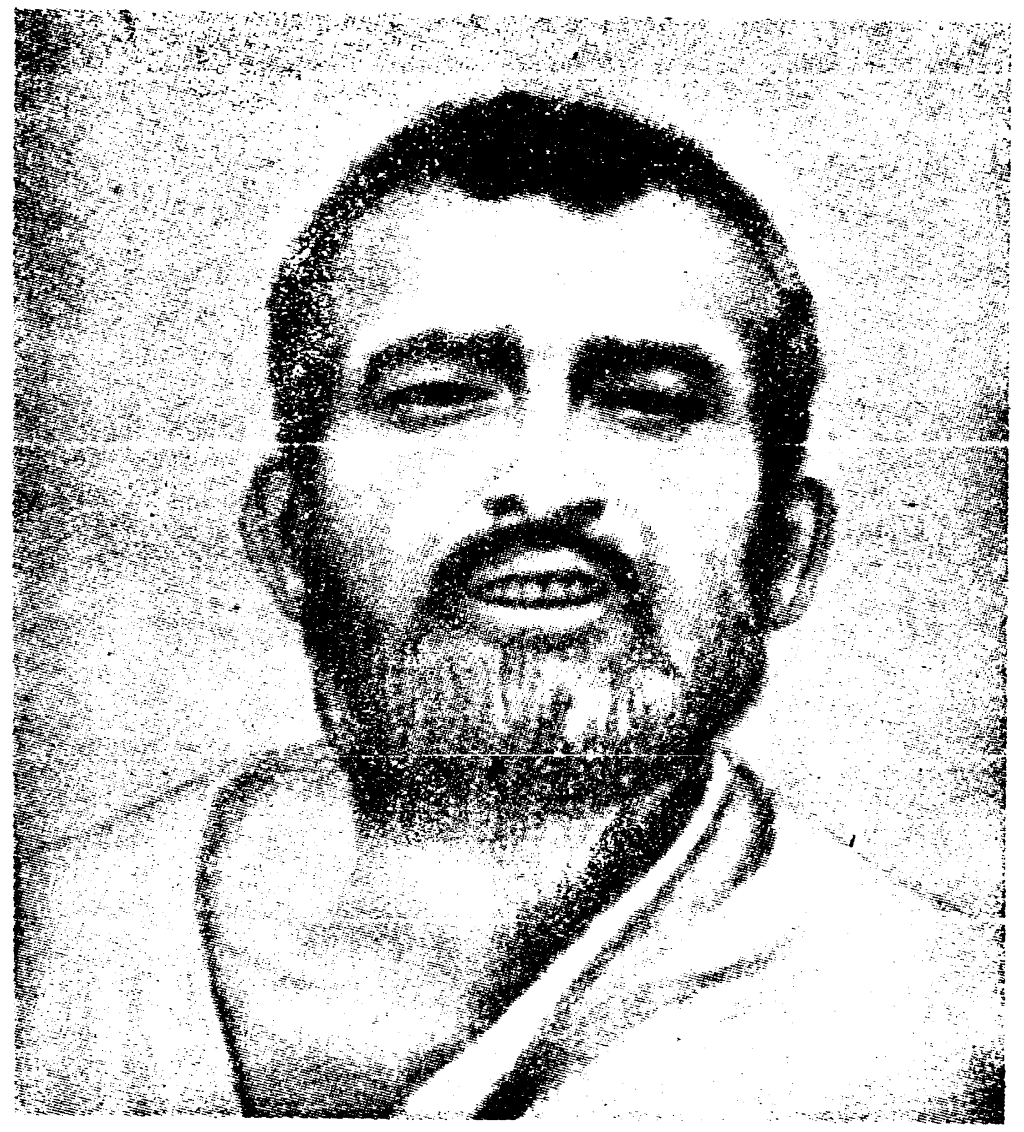

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৬৪ {১১শ সংখ্যা

জিজ্ঞাসা

শ্রীনবগোপাল সিংহ

চাষার ছেলে বৃষ্টিধারা
যাহার কাছে যাচে
বড়ি দিয়ে রোদ্দুর চায়
বুড়ী তারই কাছে ;
বুড়ীর বড়ি শুকোয়, আবার
বাঁচায় চাষার ধান—
সেই কি ভগবান্ ?

জবারে দেয় লাল শাড়ী, আর
অপরাজিতায় নীল,

রামধনুকের জামায় আবার
সাতটা রঙের মিল ;
প্রজাপতির পাখায় যাহার
নিপুণ তুলির টান—
সেই কি ভগবান্ ?

গাছের মাথায় সাজিয়ে রাখে
একসাথে জল রুটি,
পাহাড়েতেও ঝরণা দেওয়ার
নেইকো যাহার ত্রুটি ;
মরুর মাঝেও পান্থপাদপ
যাহার স্নেহের দান —
সেই কি ভগবান ?

সারি সারি ফলের দোকান
রাখলো খুলে গাছে,
ফুলের মধু—দাম লাগে না
কিনতে কারো কাছে :

রাজ্যে যাহার খাজনা দেওয়ার
নেই কোনো বিধান—
সেই কি ভগবান্ ?

বইছে হাওয়া শন্‌শনিয়ে
সর্ব্বদা, সর্ব্বথা,
রবি শশীর দীপে যাহার
আলোক দেওয়ার প্রথা ;
আকাশেতে 'দীপালি' যার
নিত্য অনুষ্ঠান—
সেই কি ভগবান্ ?

কালো কোকিল, গানে তাহার
মিষ্টি ঢেলে দিলে,
রূপ দিয়ে সে শিখীরে, তার
কণ্ঠ কেড়ে নিলে।
সৃজন, পালন, বিনাশ যাহার
খেলারই সমান—
সেই কি ভগবান ?

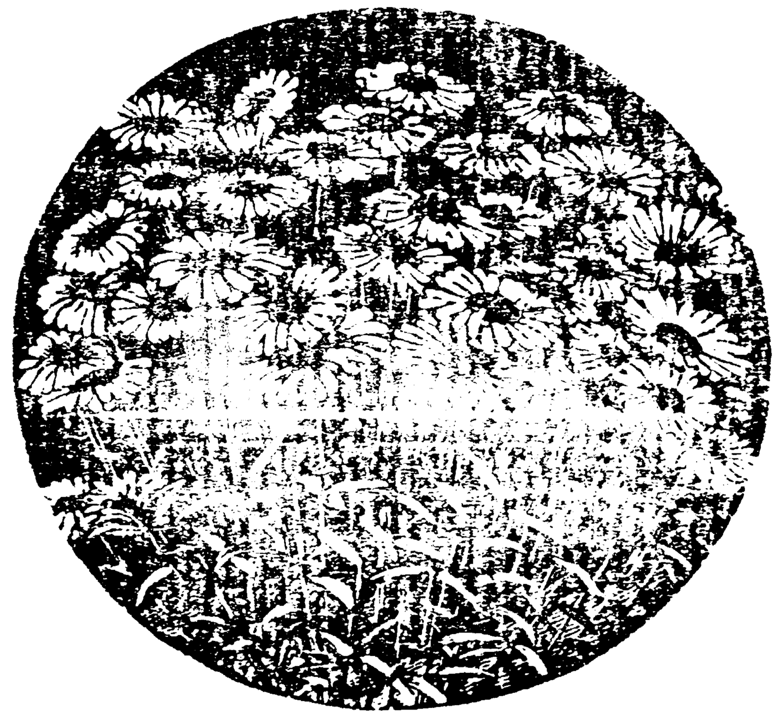

মহাকালের অভিশাপ

অপূর্ব্বমণি দত্ত

৬

বেশ হাসিমুখেই ডক্টর শাস্ত্রী আমাকে বসবার চেয়ার দেখিয়ে বললেন, আসুন আসুন, অজয় বাবু ! অনেক কষ্টই আপনাকে দিয়েছি, সে জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আমার সন্ধানে আপনি যে কত জায়গায় ঘুরেছেন, সবই আমার কানে এসেছে। রাণাঘাটের চায়ের দোকান, নবদ্বীপ ঘাটের চায়ের দোকান, পোড়া মা-তলা···তার পর যেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হোল গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে, সেদিন সত্যিই আমার নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ ছিল না। সেই রাত্রেই রওনা হতে হোল দিল্লী, সেখানে আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে কয়েকটা জরুরী কাজ সেরে ওখান থেকেই পাড়ি দিতে হোল বম্বে। সেখান থেকে বিভ্রাট ঘটলো বীর হনুমানকে নিয়ে।

বীর হনুমান। আমি সবিস্ময়ে চাইলাম তাঁর দিকে।

হ্যাঁ, বীর হনুমান। কৃত্তিবাসী রামায়ণে পড়েন নি রামচন্দ্র যখন লঙ্কায় দূত পাঠাবেন সীতার খবর আনতে, তখন কে লাফ দিয়ে সমুদ্রের ওপারে লঙ্কায় যেতে পারে তাই নিয়ে হোলো চিন্তা। নল, নীল, অঙ্গদ—এঁরা সব জানালেন তাঁরা এক লাফে কতদূর যেতে পারেন। কিন্তু লঙ্কার দূরত্ব শতেক যোজন। শেষে হনুমান বললেন, 'লাফ দিতে পারি আমি শতেক যোজন।' সুতরাং হনুমানই গেলেন লঙ্কায়।

এ বক্তৃতার সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ বুঝতে না পেরে আমি চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তিনি বলতে লাগলেন, এক যোজন হোল চার ক্রোশ অর্থাৎ আট মাইল। সুতরাং শতেক যোজন মানে আটশো মাইল। এখন কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষের প্রান্ত—সেতুবন্ধ—অর্থাৎ রামেশ্বরম্ বা ধনুষ্কোটি সেখান থেকে বর্ত্তমান সিলোনের দূরত্ব আর কতই বা ? মাত্র ২২ মাইল। এপারের ধনুষ্কোটি থেকে ওপারের তালাইমানারে ফেরি ষ্টিমার গিয়ে

পৌঁছায় মাত্র ২ ঘণ্টায়। তবে হনুমান আটশো মাইল লাফ দিয়ে যে লঙ্কায় গিয়ে পৌঁছুলো সে লঙ্কা কি করে বর্ত্তমান সিলোন হতে পারে? সে লঙ্কা তবে কোথায়?— এই ব্যাপার নিয়ে যেতে হোল মহারাজা ট্রাভাঙ্কোরের আমন্ত্রণে ট্রিভাণ্ড্রামে। সেখানেই দেরী হয়ে গেল। তারপর কলকাতায় ফিরেই আপনাকে খবর দিলাম।

অবাক্ হয়ে আমি শুনছিলাম তাঁর কথা। এইবার সুযোগ পেয়ে বললাম, দেখুন, আপনি যখন সর্ব্বজ্ঞ,—মানে আমার রাণাঘাটে যাওয়া, নবদ্বীপে যাওয়ার খবরও যখন আপনার অজানা নেই, তখন আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ ছাড়া আর কি বলবো? আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দয়া করে দিন। আমাদের পঞ্চানন্দ দেবের বিগ্রহ কি আপনিই নিয়ে এসেছিলেন?

তিনি বললেন, দেখুন, আজ আমি ভয়ানক ব্যস্ত। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, সেই জন্যই আজ দেখা করতে লিখেছিলাম। আমাকে এখনই বেরুতে হবে। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একটা পুরোনো ঐতিহাসিক কাহিনী আগাগোড়া বলতে হবে। তার সময় এখন নয়।. আপনি দয়া করে পরশু সন্ধ্যার পর এখানে আসবেন; আমি একা থাকবো, তখন হবে সব কথার আলোচনা। আচ্ছা, নমস্কার।

বলেই তিনি উঠলেন। আমি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। কি আর করবো, প্রতিনমস্কার করে বেরিয়ে চলে এলাম।

৭

তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার পর আবার গিয়ে উপস্থিত হলাম বালিগঞ্জে তাঁর বাড়ী। নীচের অফিস ঘরে বসে রয়েছে সেই ভেনুগোপালন, তার কাছে স্লিপে আমার নাম লিখে দেওয়ার কয়েক মিনিট পরেই আহ্বান এলো। গেলাম দোতলার সেই ঘরে।

বেশ সাজানোগোছানো ঘর। দেওয়ালে কয়েকখানা অয়েলপেন্টিং, ভারতীয় কলাশিল্পের ইতিহাসে যাঁরা স্বনামধন্য তাঁদেরই আঁকা। পাথরের মূর্ত্তি কয়েকটা, ব্রোঞ্জের মূর্ত্তিও কয়েকটা রয়েছে। একপাশে কাচের আলমারীতে ঠাসা বই। পূর্ব্বে যেদিন এসেছিলাম সেদিন এত ভাল করে ঘরের অবস্থা দেখবার অবসর হয় নি। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবল, তার তিন পাশেই গদীমোড়া চেয়ার। সমস্ত পারিপার্শ্বিকতাটাই একটা আভিজাত্যব্যঞ্জক।

মিনিটখানেক পরেই ডক্টর রামশাস্ত্রী অথবা পরশুরাম শাস্ত্রবাচস্পতি এসে ঢুকলেন। অত্যন্ত অমায়িকভাবে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। চা খাবো কিনা প্রশ্নের উত্তরে আমি জানালাম, যদিও চা খেয়েই এসেছি, তবু দ্বিতীয় বার চা-পানে আমার আপত্তি নেই।

ঘণ্টা টিপতেই এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকলো। তাকে চুপি চুপি কি বললেন। সে চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রে নিয়ে সে লোকটি এসে উপস্থিত। একটা রেকাবে কয়েকখানি কচুরি এবং চায়ের সরঞ্জাম।

তিনি বললেন, খেয়ে দেখুন চা-টা। আমার এই চা হোল দার্জ্জিলিঙের একটা বাগানের সবচেয়ে সেরা চা। এ চা আপনি বাজারে পাবেন না।

আমি চমকে উঠলাম। মনে পড়লো যাযাবর-বেশী পরশুরামের সেই প্রশ্ন রাণাঘাট এবং নবদ্বীপ ঘাটের চায়ের দোকানে, কোথাকার চা?—দার্জ্জিলিঙ না আসাম? আজকের এই আড়ম্বরপূর্ণ পরিস্থিতিতে বসে কল্পনাও করা যায় না যে আমার সামনে উপবিষ্ট বিশ্ববিখ্যাত ডক্টর রামশাস্ত্রী সেখানে গিয়ে ধূলোমাখা লোহার চেয়ারে বসে চার পয়সা দামের ভাঁড়ের চা উদরস্থ করছেন। জীবনে এতখানি বয়সের মধ্যে দেখেছি অনেক জিনিষের মধ্যেই সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

চা এবং কচুরি-পর্ব্ব শেষ হোল। চা সত্যিই খুব ভাল বটে। কচুরিও ঠিক বাজার-মার্কা নয়।

তিনি বললেন, এইবার বলুন আপনার বক্তব্য।

এই সোজা প্রশ্নটা শুনে আমি যে এমন হতবুদ্ধি হয়ে যাবো সেটা ভাবতে পারি নি। সিঁড়িতে ওঠবার সময়ও ভাবতে ভাবতে এসেছি যে আজ বেশ কড়া ভাবে শুনিয়ে দেবো দু'-চার কথা। বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর চুরি করে যে ব্যক্তি পালাতে পারে, সে বিশ্ববিখ্যাত হোক আর যত বড় পণ্ডিতই হোক বা হনুমানের লাফ নিয়ে লঙ্কা কোথায় ছিল এ নিয়ে যতই কেন গবেষণা করুক না কেন, সে চোর ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু জিভে যেন কথাটা আটকে গেল। বলতে পারলাম না কিছুই। শেষে যেন কোন রকমে বললাম, আপনি আজ আসতে বলেছিলেন এবং কি একটা ঐতিহাসিক কাহিনী বলবেন—

শেষে জিভে যেন হঠাৎ শক্তি ফিরে পেয়ে বললাম, জানি না সে কাহিনীর সঙ্গে আমাদের গৃহদেবতা পঞ্চানন্দ দেবের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা।

তিনি বললেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং বাংলাদেশের পুরোনো ইতিহাস ভাল করে পড়া আছে?

আমি বললাম, ভাল করে পড়া নেই। স্কুল-কলেজে যেটুকু পড়েছিলাম সেই-টুকু বিদ্যে।

তিনি বললেন, মহারাজ শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের নামটা নিশ্চয়ই জানা আছে তো?

শিশুপাঠ্য ইতিহাসেও তাঁর কথা আছে। তাঁরই সময়ে ভারতবর্ষে আসেন চীনপরিব্রাজক হিউয়েন্থ সাং,—খুব সম্প্রতি যাঁর অস্থি এ দেশে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে।

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, হর্ষবর্দ্ধন আর হিউয়েন্থ সাংয়ের কথা আর কে না জানে বলুন ?

তিনি বললেন, শুনে সুখী হলাম। এইবার একেবারে নীরস ইতিহাসের কাহিনী অনেকখানি আপনাকে শোনাবো। শুনতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান ঘটনায় পেঁছতে হলে সেই সিঁড়ির ধাপ ভাঙ্গতে হবে।

আমি বিস্ময় বোধ করলাম। আমাদের গৃহদেবতা পঞ্চানন্দ দেব চুরি হওয়ার ব্যাপারে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কিংবা হিউয়েন্থ সাংএর কি সম্বন্ধ সেটা মাথায় ঢুকলো না। কাজেই বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি বলতে লাগলেন,—হর্ষবর্দ্ধনের ভাই ছিলেন রাজ্যবর্দ্ধন আর বোন ছিলেন রাজ্যশ্রী। রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয় গ্রহবর্ম্মার সঙ্গে। তিনি ছিলেন মৌখরী। এই মৌখরীরাই এক সময়ে এ দেশ থেকে হূণদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। শুনছেন তো মন দিয়ে ?

কচি ছেলেদের গল্প শোনার মত বললাম, হুঁ।

হর্ষবর্দ্ধন ছিলেন শৈব, অথচ বৌদ্ধধর্ম্মের ওপরেও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল খুবই। সে কথা হিউয়েন্থ সাংও স্বীকার করে গিয়েছেন। বাংলার রাজা তখন শশাঙ্ক। তিনি ছিলেন ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী। গয়ার বোধিদ্রুম তিনি কেটে ফেলেছিলেন এবং বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন, এ কথা স্কুলপাঠ্য ইতিহাসেও হয়তো পড়েছেন।

যাই হোক, মহারাজ হর্ষ যখন শৈব আর বৌদ্ধধর্ম্মের গুণগান করছিলেন, সেই সময় গ্রহবর্ম্মার এক ভাইপো, অর্থাৎ হর্ষর ভগ্নী রাজ্যশ্রীর স্বামীর ভাইপো,—অনন্তবর্ম্মা তাঁর নাম, তিনি ছিলেন কৃষ্ণভক্ত,—তিনি গোপনে এক কৃষ্ণমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করলেন। রাজবংশের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ রয়েছে, কিন্তু তবুও ওই সময়ে কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা কতখানি দুঃসাহসের কাজ বলুন তো ?

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয় ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে, কাজেই কৃষ্ণমূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয় আজ থেকে প্রায় তেরশো বছর আগে। তাই নয় কি ?

ওদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম তখন হয়েছে রাজধর্ম্ম, আর বাংলা—মানে গৌড় দেশ হয়েছে বৌদ্ধবিদ্বেষী। কাজেই সেই সময় অনন্তবর্ম্মার পক্ষে কৃষ্ণমূর্ত্তি নিয়ে ওদেশে থাকা ঠিক সম্ভব হোল না, নিরাপদও নয়। তার উপর, ওই যা বললাম, রাজবংশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা।

অবশেষে একদিন অনন্তবর্ম্মা নিজেও বুঝলেন আর সেখানে থাকা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। তখন তিনি তাঁর সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি নিয়ে পালিয়ে এলেন গৌড়ে। কোথায় রইলেন এবং কি ভাবেই বা দিন কাটাতে লাগলেন সে ইতিহাস আজ কেউ জানে না।

সেই হারানো ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া গেল প্রায় তিনশো বছর পরে। গৌড়ের রাজা তখন প্রথম মহীপাল দেব। তাঁর সময় নির্ণয় করেছেন ঐতিহাসিকেরা ৯৯২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০৪০ খৃষ্টাব্দ। তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল জানেন ?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, আজ্ঞে না।

তিনি একটু খেদোক্তি করে বললেন, আমাদের দেশে পুরোনো ইতিহাসের চর্চ্চা খুব বেশী লোকে করে না এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে ? পাল ডাইন্যাষ্টির সময় বাংলা দেশের একটা গৌরবময় যুগ। মহীপাল দেবের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। জায়গাটা হচ্ছে নলহাটি থেকে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে লাইন গিয়েছে তারই কাছে। দুটো ষ্টেশন থেকে যাওয়া যায়—কারালা কিংবা সাগরদীঘি। সাগরদীঘি তো রাজা মহীপাল দেবই করিয়েছিলেন, তবে তিনি প্রথম মহীপাল কিংবা দ্বিতীয় মহীপাল তা নিয়ে গবেষণার শেষ হয় নি। দুই মহীপালের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান।

যাক্, ইতিহাসের কথা এখন ছেড়ে দিই। আমরা এই সময়ে, অর্থাৎ রাজা মহীপাল দেবের সময়ে সন্ধান পাই সেই অনন্তবর্ম্মার বংশধর সোমদেব বর্ম্মার। সেই যে কৃষ্ণমূর্ত্তি নিয়ে চলে এসেছিলেন অনন্তবর্ম্মা, সেই মূর্ত্তি তখনও ছিল সোমদেব বর্ম্মার কাছে। মাঝে অবশ্য তিনশো বছর অর্থাৎ আট-দশ পুরুষ কেটে গিয়েছে। সোমদেব বর্ম্মা ছিলেন রাজা মহীপালের একজন ন্যায়াধীশ।

বাংলাদেশে সে সময়ে একটা নূতন ধর্ম্মমত প্রচলিত হোল, যার নাম বৌদ্ধতান্ত্রিকতা। গোঁড়া হিন্দু মতের যাঁরা ছিলেন আচার্য্য, তাঁদের সঙ্গে বাধলো বিরোধ, এবং আবার হতে লাগলো নানা অত্যাচার। এ ঘটনা অবশ্য ঘটেছিল মহীপাল দেবের রাজত্বের কিছু পরে।

সোমদেব বর্ম্মা তখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর ছেলে মুকুন্দদেব বাপ মারা যাওয়ার আগেই মারা গেলেন। তাঁর ছেলে গোবিন্দদেব বর্ম্মা বুড়ো ঠাকুরদা সোমদেবকে নিয়ে তখনও বাস করতে লাগলেন মহীপালনগরে। এই নগরে বেধে উঠলো এক ধর্ম্মবিপ্লব—বৌদ্ধতান্ত্রিক, হিন্দুতান্ত্রিক এবং বিষ্ণুপূজকদের মধ্যে।

রাজা তখন দুর্ব্বল, শাসনযন্ত্র শিথিল। দেশ অরাজক না হলেও কবির ভাষায় বলতে গেলে 'সহস্ররাজক'।

অবশেষে একদিন আক্রান্ত হোল সোমদেব বর্ম্মার বাড়ী। বুড়ো সোমদেব বাধা দিতে গিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, সে মূর্চ্ছা তাঁর আর ভাঙ্গলো না। গোবিন্দদেবও শরীরের কয়েক জায়গায় আঘাত পেলেন, তাঁদের বাড়ী হলো লুণ্ঠিত।

একটু সুস্থ হয়ে গোবিন্দদেব দেখলেন তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণমূর্ত্তি মন্দিরে নেই। পাগলের মত ছুটে বেড়ালেন এদিক্ ওদিক্। ওদিকে সোমদেবের সৎকার করাও এক সমস্যা।

যাই হোক, সে সব কাজ মিটে গেল, মায় সোমদেবের শ্রাদ্ধকার্য্য পর্য্যন্ত। গোবিন্দদেব তখন দেশ ছেড়ে অন্যত্র যাওয়াই স্থির করলেন।

এই পর্য্যন্ত বলে ডক্টর রামশাস্ত্রী থামলেন। একটু হেসে আমাকে বললেন, নীরস ইতিহাসের কাহিনী অনেকখানি চালিয়ে গেলাম এক নিঃশ্বাসে। হাঁপিয়ে পড়েছেন নিশ্চয়। কাজেই আর একটু চা আনতে বলি। তিনি আবার ঘণ্টার বোতাম টিপলেন।

(ক্রমশঃ)

আজব চুল দাড়ি গোঁফ

শ্রীঅমলেন্দু সেন

গোঁফের মত গোঁফ যদি দেখতে চাও, তবে 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' বইখানা খুলে দেখ। 'শঙ্খমালা'-র গল্পে যেখানে ছবি আছে 'রাজা তপস্যায় গেলেন', সেইটের কথা বলছি। গোঁফ বটে একখানা! গোঁফটি রাজার, না রাজাটি গোঁফের, তা জোর করে বলা শক্ত। তবে সেটা হলো গিয়ে আঁকা ছবি। অতটা আমরা দেখি নি, কিন্তু যা দেখেছি তাও নেহাৎ নিন্দের নয়। নাকের তলা থেকে রওনা হয়ে দু' গাল বেয়ে থুতনি ছাড়িয়ে ইঞ্চি ছয়েক ঝোলা গোঁফ দেখেছি—শুনেছি যে উঠতি অবস্থায় তার দুই আগা নাকি দুই কাঁধ ছুঁতো।

আর দাড়ির কথা এ যাবৎ যা শুনেছি, তার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বড় দাড়ি ছিল জর্জ কিলিংওয়ার্থ সাহেবের। তাঁর দাড়ি ছিল পূরো পাঁচ ফিট লম্বা! রাণী এলিজাবেথের সময়ে তিনি রাশিয়ার সম্রাট্ আইভ্যান-দি-টেরিব্‌লের সভায় ইংরেজ রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এই পেল্লায় দাড়িতে মধ্যে মধ্যে টান মেরে সম্রাট্ একটু আমোদ করতে ছাড়তেন না, এমন কথাও জানা যায়।

তবে সবচেয়ে আজব দাড়ি গজিয়েছিল বলতে হবে উরাইয়া হেঙ্কেল বলে একটি লোকের। সে ছিল আমেরিকার কান্‌সাস্ প্রদেশের পার্স‌ন্‌স্ বলে একটি শহরের অধিবাসী। একবার বন্দুকের গুলি লেগে তার চিবুকের খানিকটা চামড়া উড়ে যায়। একটা বিশ্রী দাগ থেকে যাবে—তাই ডাক্তার তার ঐ জায়গায় একটু বাচ্চা-মুরগীর চামড়া লাগিয়ে দিলেন। বেশ বেমালুম জুড়ে গেল, কিন্তু মজাটা হলো তার পরেই। মুরগীর চামড়া থেকে পালক গজিয়ে গেল তার চিবুকে। বেশ নানা-রঙা, ঘন, একগোছা পালকের দাড়ি।

আর, সবচেয়ে বড় চুলের কথা যা জানা গিয়েছে, সেটাও আমেরিকাতেই। তবে সাহেব কিংবা মেমসাহেবের চুল নয়—তারা তো আর বড় চুল রাখে না! বড় চুল রাখে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরা। তাদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বড় চুল রাখে 'ক্রো' বলে এক জাতের লোকেরা। এক 'ক্রো' সর্দ্দারের চুল বেড়ে বেড়ে নাকি পঁচিশ ফিট লম্বা হয়েছিল। এই চুলের কাঁড়ি সে খোঁপা করে মাথায় রাখতো কিনা জানি না, তবে ছবিতে দেখেছি যে সে বিনুনি পাকিয়ে চুল ছেড়ে দিয়েছে, তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে পড়ে রয়েছে—ঠিক যেন সেই 'ঠাকুমার ঝুলির' দেড়-আঙ্গুলে ছেলেটির টিকিটির মতো।

আর একজন লোক চুলের জন্যে বিখ্যাত। তিনি হচ্ছেন রোমের কাউণ্ট অক্টেভিয়াস মেরাল। তাঁর চুল অবশ্য আর পাঁচজনের মতোই, তবে তাঁর বিশেষত্ব হচ্ছে টেড়ি কাটবার কায়দায়। চিরুণী না লাগিয়ে, শুধু মাথার চামড়া কাঁপিয়ে তিনি টেড়ি বাগিয়ে থাকেন।

ইচ্ছাপূরণ

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

অনেক—অনেক কাল আগেকার কথা। রূপনগরে মধুমতী নদীর ধারে এক জেলে বাস করত।

কিন্তু এমন অভাগা লোক বোধ হয় দুনিয়াতে আর দুটি মিলবে না। সব সময় তার ঘরেতে সব কিছুই বাড়ন্ত। একমাত্র অফুরান ছিল তার মুখের স্নিগ্ধ হাসিটি। শত দুঃখেও তার মুখের হাসি কখনো মলিন হ'ত না। ঝড়-জল হলে ওর জালই আগে উড়িয়ে নিয়ে যেত। যেদিন কোন মাছ ধরতে পারত না সেই দিনই বাজার খুব চড়া থাকত। আর ওর জালে যেদিন মাছ ধরা

পড়ত সেদিন বাজার এমন নেমে যেত যে মাছ ধরার পরিশ্রমই পোষাত না। কিন্তু তাতে জেলের মনে কোন দুঃখ ছিল না। হাসিমুখেই সে সমস্ত অভাব-অভিযোগ মাথা পেতে নিত।

কিন্তু জেলের বৌয়ের স্বভাবটি ছিল ঠিক তার বিপরীত। দম দেওয়া ঘড়ির মত সব সময় সে বক্ বক্ করত। পান থেকে চুণ খসলে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলত। বৌটি ছিল যেমন দজ্জাল তেমনি বদ্‌মেজাজী।

সারা দিনের পরিশ্রমের পর হা-ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরছে লোকটি। মুখের স্নিগ্ধ হাসিটি অম্লান। স্বামীর হাসিমুখ দেখেই জেলেনী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বললে—'এত হাসির কি হয়েছে জিজ্ঞেস করি? এসেছ ত' খালি হাতে, অথচ এমন ভাবখানা দেখাচ্ছ যেন কত মাছ ধরেছ! মুখপোড়া বিটকেল মিনসে, হাসতে লজ্জা হয় না?'

—'লজ্জার কি আছে? হাসব না কেন?' হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করেই বললে জেলে—'যার ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই নিয়েই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয় সংসারে। মন্দ ভাগ্যও নয়।'

—'বলিহারি বুদ্ধি! দেখছি যখন খালি হাতে বাড়ী ফের বুদ্ধিশুদ্ধিও তোমার লোপ পেয়ে যায়।'—জেলের কথায় জেলেনী আরো দাপাতে থাকে।

—'দেখ, সংসারে যাদের খেটে খাবার গতর আছে তারাই সত্যিকার ভাগ্যবান্। আমাদের ত' তার একটুরও অভাব নেই।'

বৌকে নানা মিষ্টি কথায় ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে জেলে। এমনি চলে রোজ রোজ।

কিন্তু একদিন সত্যিই ওদের ভাগ্যের মোড় ফিরল। প্রসন্না হলেন ভাগ্যদেবী।

নদীতে এক বিরাট রুই মাছ এসেছে। অনেকেই দেখেছে। কিন্তু ভারী চালাক মাছটা, কারুর জালেই ধরা দিচ্ছে না। খবরটা সাত কান হয়ে জমিদারের কানেও উঠল। যে ধরতে পারবে মাছটাকে তাকে প্রচুর বখশিস দেওয়া হবে— ঢেঁড়া পড়ল জমিদারের। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হ'ল, যেদিন ঢেঁড়া পড়ল সেই দিনই মাছটা আপনা হতেই গরীব জেলের ডিঙ্গিতে লাফিয়ে উঠল। একটু চেষ্টা নয়, একটুও ঝকমারি পোহাতে হ'ল না জেলেকে।

জেলে মাছটাকে ভাল করে ধুয়ে একটা বড় বারকোশে শুইয়ে চলল জমিদারবাড়ী। কিছু দূর যেতেই পথে শততালি-দেওয়া নেংটি পরা একটি লোকের সঙ্গে দেখা। তার এতই হতদরিদ্র অবস্থা যে গরীব জেলেও তার কাছে মস্ত বড়লোক। লোকটি বসে কপাল চাপড়ে করুণ বিলাপ করছিল।

—'কাঁদছ কেন ভাই?'—লোকটির কান্নায় জেলের ভারী দুঃখ হ'ল।

হাত দিয়ে সে পেট দেখিয়ে বললে—'পেটের জ্বালায়। আজ ক' দিন হ'ল একটি দানাও পেটে পড়ে নি। তুমি ত' তিন জনে বইতে কষ্ট হয় এত বড় একটা মাছ ধরে নিয়ে চলেছ। তুমিই ভাগ্যবান্।'

—'আজ সে কথা বলতে পার ভাই! কিন্তু রোজ যখন খালি হাতে বাড়ী ফিরি কেউ ত' দেখে না! আমারও দু'বেলা শাক-ভাত জোটে না। আমিও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাই না।'

—'দেখ বাপু, হঠাৎ যদি ভাগ্য ফেরে, তবে ভাগ্যহীনের সঙ্গেই ভাগ্যের ফল ভাগাভাগি করে ভোগ করা ভাল। এস দু'জনে ভাগাভাগি করে নি মাছটা।'

—'মাছটা জমিদারকে দিতে হবে।'

—'ও, বুঝেছি। যারা ধনী, ভাগ্যমন্ত তাদের সঙ্গেই তুমি ভাগ্যের ফল ভাগ বাঁটোয়ারা করে খেতে চাও। আর যে ক্ষুধার্ত, এক মুঠো ভাতের কাঙাল, সে খিদেতে মরুক। এই তোমার ন্যায় বিচার হ'ল?'—লোকটি আবার করুণ কণ্ঠে বিলাপ সুরু করে দিল।

—'ও কথা তো আমি বলি নি ভাই!'—জেলে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে—'পৃথিবীতে এক দল লোক জন্মায় যারা শুধু ভোগ করবে। আর একদল থাকে যারা সেই ভোগের রসদ জুগিয়ে মরে। একদল সোনার থালায় খায়, আর একদল হা-অন্ন হা-অন্ন করে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।'

—'থাক, থাক। ওসব নীতিকথা আমি শুনতে চাই না। আমি মরছি পেটের জ্বালায় আর উনি এলেন আমাকে তত্ত্বকথা শোনাতে!'

—'না বন্ধু',—জেলে তাকে বাধা দিয়ে বললে—'তোমার যখন এত দরকার, মাছটা আমি তোমাকেই দিলাম।'

জেলে মাছটা ভিখারীর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল।

তখন সেই ছেঁড়া নেংটি পরা লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে জেলের পিঠ চাপড়ে মিষ্টি হেসে বললে—'সাবাস্ ভাই। তোমায় এতক্ষণ পরীক্ষা করছিলাম। আমি হচ্ছি ইচ্ছা-দেবতা। তোমার সাধুতায় খুব খুসী হয়েছি। কোন সৎকাজই পৃথিবীতে অপুরস্কৃত যায় না। এই মুহূর্তে তুমি যা ইচ্ছা করবে আমি পূরণ করব। বল, কি চাই?'

—'এখনই বলা কঠিন। ভাবতে হবে ত'!'

—'পনের মিনিট সময় দিচ্ছি, তার মধ্যে ভেবে বল।'

—'এত জিনিষ চাইবার আছে।'

—'আর মাত্র দশ মিনিট তোমার হাতে আছে। এক—দু-ই—'

—'তাহ'লে দিনের আর বাকী সময় আমি যা যা চাইব, আমার সে-ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। —তাড়াতাড়ি বলে ফেলল জেলে।

—'খুব চালাক তুমি। বেশ, তাই হবে। তবে একটা কথা মনে রেখ। ভাল জিনিষ চাইবে, আর যখনই যা কিছু চাইবে অন্যের কথা ভুলো না যেন। কারুর অমঙ্গল কামনা ক'রো না। রাত বারোটা অবধি যা যা চাইবে সে-সব ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হবে।'

জেলেকে আর দ্বিতীয় কথা বলার অবসর না দিয়ে ছেঁড়া নেংটিপরা লোকটি মাছ মাথায় করে একদিকে চলে গেল, আর জেলে গভীর চিন্তা করতে করতে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ ওর খেয়াল হ'ল রাস্তাটা বড় দীর্ঘ আর দিনটা ভারী ঠাণ্ডা—কন্‌কনে। তক্ষুণি না ভেবেই বললে—'এখুনি যেন আমি বাড়ী পৌঁছে যাই। একেবারে আগুনের ধারে টুলে বসে থাকি।'

মুখ থেকে কথাটি খসাবার যা অপেক্ষা। অমনি দেখলে, বাড়ীতে আগুনের সামনে টুলে বসে আছে সে। জেলে যে টুলে বসেছে তার বৌ এতক্ষণ সেই টুলেই বসে ছিল।

—'আ মরণ। মিন্‌সের ঢং দেখে বাঁচি নে!'—খাম্বাজ কণ্ঠে জেলেনী গর্জাচ্ছে। তার ধারণা, স্বামীই চুপি চুপি এসে পিছন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে তাকে।

—'আমি বার বার বলে আসছি বাড়ী এলেই তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায়।'

—'ক্ষান্ত হও। ক্ষান্ত হও।'—হাত জোড় করে হাসিমুখে নাটুকে ভঙ্গীতে বলে উঠল জেলে।—'এখন আর সামান্য জিনিষ নিয়ে ঝগড়া করার সময় নেই। আমি বোকার মত ইচ্ছে করেছিলাম, তাইতে এ রকমটা ঘটেছে। এখন দেখছি যা তা চাইলেই হ'ল না। অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা ঠাণ্ডা করে চাইতে হবে। তা না হলেই মহা ফ্যাসাদ।'

জেলে তখন রুই মাছ ধরা থেকে ছেঁড়া নেংটিপরা অদ্ভুত লোকটি সম্বন্ধে একে একে সকল কথা বলল বৌকে। লোকটা বর দিয়ে গেছে যা চাইবে তক্ষুনি পাবে। আর এই বরের মেয়াদ রাত বারোটা অবধি। তার পরে চাইলে আর কিছু হবে না। তখন কি চাইবে তাই নিয়ে দু'জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। জেলে যা চায় জেলেনী চায় ঠিক তার উল্টো। জেলে যদি যায় উত্তরে, জেলেনী যায় দক্ষিণে। মতের আর মিল হয় না।

অবশেষে অনেক কথা কাটাকাটির পর অন্যদের কথা চিন্তা করে জেলে চেয়ে বসল—'এখুনি গ্রামের আর সবাইকার—তারা যে বাড়ীতে বাস করে তার চেয়ে একশ' গুণ বড় বাড়ী হোক। তেমনি সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্তর, ভাল ভাল খাবারদাবার।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে হৈ চৈ সুরু হয়ে গেল। ওরা ছুটে গেল জানালার কাছে কি হয়েছে দেখতে। সে এক অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা! যেখানে ছিল খড়ের ছাউনি দেওয়া হাড়-জিরজিরে কুঁড়ে, সেখানে তখন আকাশ-ছোঁয়া বড় বড় বাড়ী দাঁড়িয়ে। গায়ে গায়ে লাগোয়া নানা বাড়ীর জটলা। অত বড় বাড়ী ওরা জীবনে কখনো দেখে নি। এক একটা বাড়ী গাছপালা ফুঁড়ে উঠেছে। কোনটা বেঁকে, কোনটা হেলে মাথা তুলেছে কোন মতে। সে এক ভারী কদাকার দৃশ্য। লোকজন হতবুদ্ধি। ভীতসন্ত্রস্ত। তারা ব্যাপার-স্যাপার দেখে এদিক্ ওদিক্ ছুটোছুটি সুরু করে দিয়েছে। কে জানে কি মহা সর্বনাশ ঘনিয়ে এল।

যারা খেত শাকভাত তাদের সামনে পাহাড় প্রমাণ ভাল ভাল খাবার থরে থরে সাজান। এমন খাবার খাওয়া ত' দূরের কথা, তারা চোখেই দেখে নি কোন দিন।

জেলেনী সব দেখেশুনে ত' চটেই আগুন। ওর মুখে এবার যেন গালমন্দের খই ফুটতে লাগল।

—'সবাই এখানে বড়লোক হয়ে গেল, আমাদের কপালে শুধু যে কে সেই। ভাঙ্গা কুঁড়ে' ঘরে খাবার নেই, গায়ে ছেঁড়া কাপড়—'

—'আমি ত' পরের ভালর জন্যেই চেয়েছি,'- বললে জেলে।—'এখন দেখছি চাওয়াটাই সব নয়, পাওয়ার দুঃখও অনেক।'

—'ওসব হাড়-জ্বলুনি কথা রেখে দাও। এখন আমি এমন বাড়ী চাই যা ওদের বাড়ীর চেয়েও একশ' গুণ বড় হবে। আর বাড়ীর উপযুক্ত জিনিষপত্তর, খাবারদাবার। কোন কিছুর অভাব যেন না থাকে।'

জেলেনীর ইচ্ছে মত তাই চাইতে হয় জেলেকে।

চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা গুড় গুড় ঘড় ঘড় আওয়াজ হতে লাগল। দেখতে দেখতে কুঁড়েটা বড় হতে হতে চারিপাশের সকল বাড়ীর মাথা ছাড়িয়ে গেল। আকাশ ছোঁয় আর কি! জেলে এতক্ষণ আগুনের দিকে পিছন ফিরে বৌয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। বৌ বসেছিল সেই টুলটায়। হঠাৎ এমন আগুনের তাত লাগল যে গায়ের চামড়া পুড়ে যাবার যোগাড়। সারা গা যেন ঝলসে যেতে লাগল। এক লাফে জেলে সরে এল সেখান থেকে। আর লাফাতে গিয়ে একটা কাঠের গুঁড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সে কি গুঁড়ি! দু'হাত উঁচু আর বিশ হাত লম্বা। অথচ এক মুহূর্ত আগে ওটা ছিল সামান্য একটা চেলা কাঠ মাত্র।

এমন সময় স্ত্রীর আর্ত চীৎকারে পিছন ফিরে দেখে, যে-টুলটায় বৌ বসেছিল সেটা এমন উঁচু হয়ে গেছে যে টুল থেকে নামতে না পেরে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে সে। জেলে একটা মই যোগাড় করে এনে কোন মতে বৌকে নামিয়ে নিয়ে এল টুল থেকে। ঘরের জানালাগুলো এত উঁচুতে উঠে গেছে যে ওদের নাগালের বাইরে। দরজাগুলোও এত বড় হয়ে গেছে যে মেঝেতে দাঁড়িয়ে খোলাও ওদের পক্ষে অসম্ভব। যে চৌকিতে ওরা শুত সেটাও কত বিরাট আর উঁচু হয়ে গেছে! মই ছাড়া তাতে ওঠা যাবে না।

ঠিক সেই সময় কোত্থেকে মিনি বেড়ালটা এসে হাজির। কী ভীষণ আর বড় হয়ে গেছে দেখতে সেটা! থাবার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালে ওদের মাথা ছাড়িয়ে যায়। সবুজ চোখ দুটো থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। কী বড় বড় গোঁফ, আর তেমনি বড় বড় ধারাল দাঁত! মিনি বেড়াল তো নয়, যেন একটা কেঁদো বাঘ!

পা টিপে টিপে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে বেড়ালটা। আর চোখে সেই হাড়-হিম-করা তীব্র দৃষ্টি। লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। লেজটা দোলাচ্ছে। এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওদের ঘাড়ে। এই মারলে বুঝি লাফ!

—'শীগ্‌গীর কিছু চাও।' জেলে-বৌ ভয়ে কেঁদে ফেলল। জড়িয়ে ধরলে স্বামীকে।

—'এই মুহূর্তে আমরা যেন টেবিলের ওপর চলে যাই—'

সঙ্গে সঙ্গে ওরা টেবিলের উপর রাখা বিরাট জলের গামলায় এসে ঝপাং করে পড়ল। ছোট্ট জলের গামলা কত বড় হয়ে গেছে। ওদের কোমর অবধি জলে ডুবে গেল। টেবিলের উপর পাশ-বালিসের মত বড় একটা পাঁউরুটি আর তার পাশে মোষ-বলি-দেওয়া খাঁড়ার মত পাঁউরুটি-কাটা ছুরিটা পড়ে আছে। টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে বেড়ালটা ক্ষুধার্ত চোখে ওদের দেখছে। নীচের দিকে চাইতেই ওদের মাথা ঘুরে গেল। বেড়ালটা যে গুটি গুটি ওদের দিকেই আসছে!

হঠাৎ জেলের বরের কথা মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে চলে যাওয়ার বর চাইলে। চাইতেই তাকে উঠে এল ওরা। ঠিক সেই সময় বেড়ালটাও এক লাফে টেবিলের উপর এসে হাজির। ওরা বাইরে পালিয়ে যেতে পারত, বেড়ালের চেয়ে বড় হওয়ার বর চাইতে পারত, অথবা বেড়ালটা সরে যাক্ এ বরও চেয়ে নিতে পারত। কিন্তু ভয়ে ওদের মাথা একেবারে গুলিয়ে গেছে। ওদের তখন একমাত্র চিন্তা কি করে এই ভয়ঙ্কর প্রাণীটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

কিন্তু তাকের উপর উঠেই কি সোয়াস্তি আছে? নীচের দিকে চাইতেই আঁতকে উঠল ওরা।

ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। বুক ঢিব ঢিব করতে লাগল। অত উঁচু থেকে পড়ে গেলে হাত-পা গুঁড়িয়ে একেবারে ছাতু ছাতু হয়ে যাবে। আবার এদিকে বেড়ালটা ওদের ধরবার জন্ম তাড়া করছে। মারবে লাফ এখুনি।

হঠাৎ আবার আর এক বিপদ দেখা দিল। ও বাবা রে! ও কি? তাকের এক ফোকর থেকে দু'টো বিরাট দাড়া এগিয়ে আসছে ওদের দিকে আর দু'টো ভাঁটার মত বড় বড় চোখ! তার পর একটি দু'টি করে ছ'টি লোমশ পা! আর রক্ষে নেই। বিরাট এক মাকড়সা গুটি গুটি ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাকের মাঝখানটায় এসে মাকড়সাটা একাক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার পর আবার নাচতে নাচতে এগিয়ে আসতে লাগল। ভাবখানা যেন, শিকার যখন হাতের মুঠোয়—অত ভাবনা কিসের?

জেলে বৌ ভয়ে কুঁকড়ে পিছু হটতে লাগল, জেলেও একটু একটু করে পিচনে সরে আসতে লাগল। এমন সময় সামনে একটা মোটা কাছি ঝুলছে দেখতে পেলে ওরা। প্রথমে জেলে-বৌ, তারপর জেলে সেই কাছির মত মোটা দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল শূন্যে।

ভয়ে, দুঃখে জেলে-বৌ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললে। —'উঃ, কী সাংঘাতিক ইচ্ছের মার! আগে যা ছিল তাই যদি ফিরে পেতাম আর কিছু চাই না। হায় হায়! কী সর্বনাশ হয়ে গেল গো!'

—'কিন্তু তা এখন আর কি করে সম্ভব?'- সেই ঝুলন্ত অবস্থায় জেলে কুটুস কামড় ছেড়ে বললে—'আমাদের সবই ত' অন্যায় চাওয়া হয়ে গেছে। প্রতিবেশীদের সর্বনাশ করলাম। নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনলাম। রাত বারোটার আগে সব ঠিক না হ'লে আমাদের আর বাঁচবার কোন আশা নেই।'

—'লোভই যত অনর্থের মূল।' অনুশোচনায়—অনুতাপে জেলে-বৌ হা-হুতাশ করতে লাগল। —'জন্মে আর কখন লোভ করব না।'

জেলেরও কম দুঃখ হয় নি। ভাবলে—'কেন মরতে বৌএর কথা শুনতে গেলাম? হায় রে, এখন যদি এমন কোথাও চলে যেতে পারতাম যেখানে আমাদের প্রতিবেশীদের অবস্থা আগে যা ছিল তাই আছে, যেখানে আমরা আগের মত শাকভাত খেয়ে দুঃখে আনন্দে দিন কাটাতে পারতাম! চাই না ধনদৌলত। আমাদের কুঁড়েঘরই ভাল।'

যেমন ভাবা অমনি দেখতে পেল এমন একটা দেশে এসে পড়েছে ওরা যেখানে জলে প্রচুর মাছ, ক্ষেতভরা সোনার ফসল। কোন দুঃখ নেই, অভাব-অভিযোগ নেই। চারিদিকেই প্রাচুর্য, অজস্রতা।

সে এমন এক দেশে এসে পড়েছে ওরা যেখানে লোকেরা নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে সন্তুষ্ট। যেখানে নেই কোন লোভের হানাহানি, যেখানে লোকেরা ছোটে না মায়া-মরীচিকার মত অসম্ভবের পিছনে।

সেদিন থেকে জেলে-বৌয়ের জীবনেও এক আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে জেলে-বৌ আর নেই। সে এখন অদ্ভুত শান্ত, নম্র। মেজাজও অদ্ভুত রকম ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ভাগ্যের বিরুদ্ধেও আর কোন নালিশ, কোন আক্ষেপ জানায় না সে।

রকেটে আকাশ জয়

শ্রীরজত চন্দ

প্রাচীন কাল থেকে মানুষ মহাকাশ জয়ের কল্পনা করেছে। বৈজ্ঞানিকদের বহুদিনকার স্বপ্ন সফলতার পথে পা দিল গত ৪ঠা অক্টোবর। সারা বিশ্বের মানুষকে বিস্মিত ক'রে রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের ২৩ ইঞ্চি ব্যাস ও ১৮৩ পাউণ্ড ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহটি সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খেতে সুরু করল।

উঁচু আকাশপথের যাত্রীর পোষাক
মহাশূন্যে যেতে হলে এ পোষাকও যথেষ্ট নয়।

এই সঙ্গে বিজ্ঞানেরও নবযুগ সূচিত হ'ল; আমরা যে শীগ্‌গিরই একদিন মা বসুন্ধরার আঁচল ছেড়ে চাঁদামামার অভিমুখে অভিযান চালাতে পারব তাই প্রমাণ করল মানুষের তৈরী উপগ্রহ।

এর পর রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা আরও বড়—১৪ মণ ওজনের আর একটি দ্বিতীয় উপগ্রহ মহাশূন্যে পাঠিয়েছেন, এবং তার ভেতর একটি কুকুরকেও ভরে দিয়েছেন। সে সব কাহিনী তোমরা আগেই রামধনুতে পড়েছ। সম্প্রতি কয়েকদিন হ'ল্ আমেরিকান্ বিজ্ঞানীরাও একটি ছোট, ৩০ পাউণ্ড ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে ছাড়তে সমর্থ হয়েছেন। রাশিয়ার তৈরী উপগ্রহের সঙ্গী হয়ে সেটিও এখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ কি ভাবে পাঠান হ'ল, কেন পাঠান হ'ল ইত্যাদি সম্বন্ধেও তোমরা রামধনুতে কিছু কিছু পড়েছ। অনেকেই মনে করছেন এই হ'ল মানুষের চন্দ্রলোকে যাত্রার তোড়জোড়ের প্রথম ধাপ।

বাস্তবিক, চাঁদের পথে পাড়ি জমাবার ইচ্ছে মানুষের অনেক দিনের। কিন্তু, পথে বাধা-বিপত্তিরও অন্ত নেই। দিন কতক আগে প্যারিসের একটি নামকরা কাগজে

একজন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক চাঁদে যাবার একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। তার খানিকটা আভাস দিচ্ছি। প্রথমে মাধ্যাকর্ষণের টান যেখানে খুব কম, বাতাসও নেই—এমন জায়গায় মানুষের অনুভূতি কেমন হবে তা জানবার জন্য কয়েকটি বাঁদর জাতীয় জীবকে আরও উন্নত ধরনের উপগ্রহে চড়িয়ে মহাশূন্যে, অর্থাৎ ৫০০ থেকে ১০০০ মাইলের মধ্যে, পাঠান হবে। এই উপগ্রহটি অবশ্য আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে। বাঁদরদের অবস্থা দেখে মহাশূন্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হবে। তারপর পরমাণবিক শক্তি-চালিত অত্যন্ত জোরালো রকেটের সাহায্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সমেত

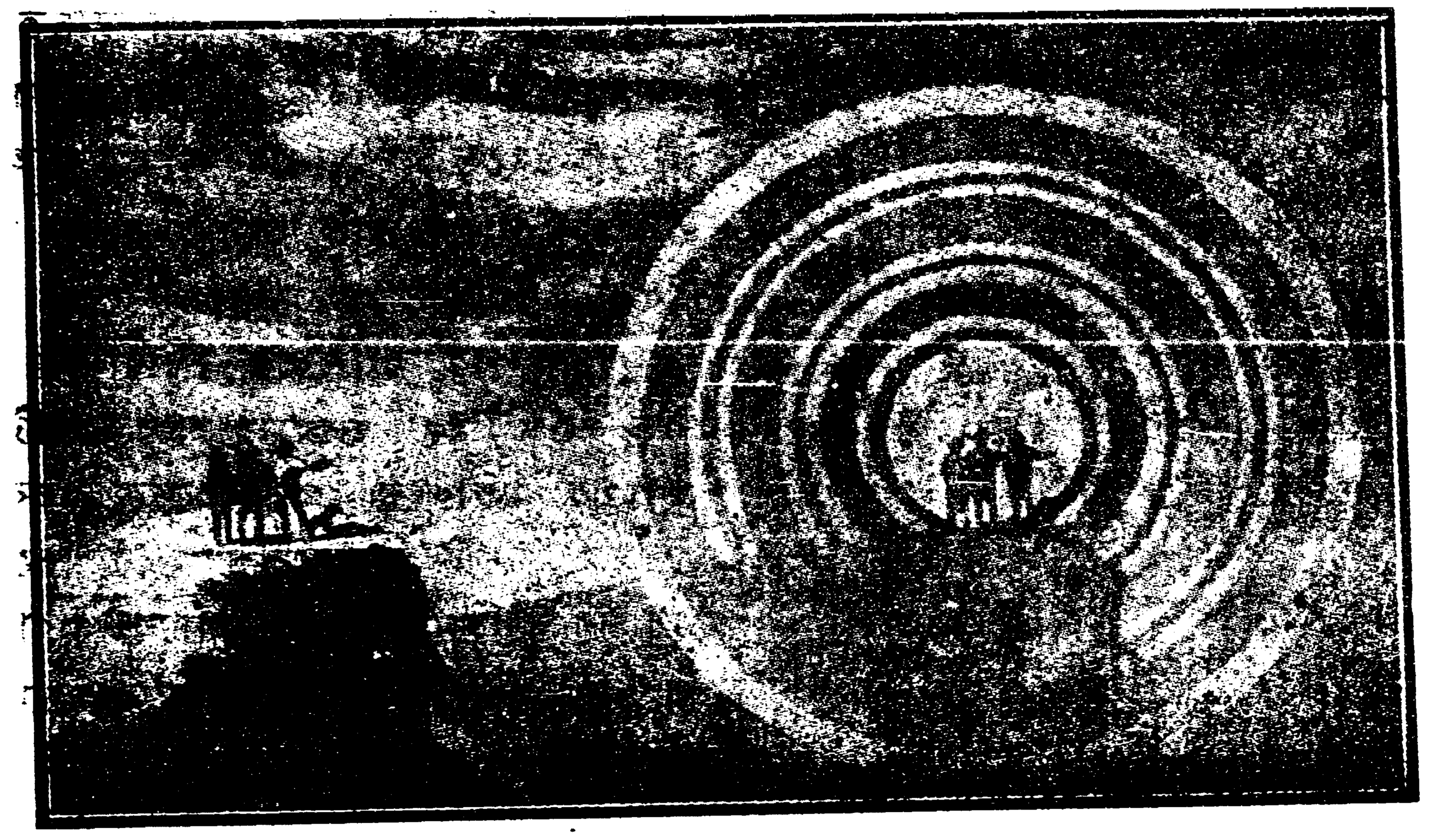

চাঁদের গায়ে মানুষ !
আসলে ওরা কিন্তু সত্যি চাঁদে যায় নি, প্রকৃতির তাজ্জব খেয়ালে আকাশে মেঘের বুকে এই রকম ছায়া পড়েছে।

একটি পর্য্যবেক্ষণ-কেন্দ্র বা অবজারভেটারি চাঁদে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। বেতার-সংকেতের সাহায্যে ঐ পর্য্যবেক্ষণ-কেন্দ্র থেকে চাঁদ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যাবে। তারপর মানুষের চাঁদের পথে রওনা হবার পালা। এর জন্য শূন্যে একটি প্রকাণ্ড কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠান হবে এবং একে ষ্টেশন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব হবে ১০৭৫ মাইল। মাধ্যাকর্ষণের অভাবে এই ষ্টেশনে বেশীক্ষণ বাস করা সম্ভব হবে না। যদি ষ্টেশনটি পৃথিবীর আহ্নিক গতির মত নিজ মেরুদণ্ডের চারপাশে ঘুরপাক খায়, তবেই ষ্টেশনের দেয়ালগুলোকে মেঝে হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এই ষ্টেশন

থেকে চাঁদে যাবার রকেটটি হবে প্রকাণ্ড একটি মাকড়সার মত দেখতে। দূরবীণ দিয়ে দেখা গেছে, চাঁদে সমতল মাঠের অত্যন্ত অভাব; তাই সাধারণ রকেটে ওখানে নামতেই পারা যাবে না। এই বিশেষ রকেটের মাকড়সার মত পা থাকার জন্য এটি অসমান জায়গাতেও অনায়াসে নামা-ওঠা ক'রতে পারবে—অনেকটা হেলিকোপ্‌টারের মত।

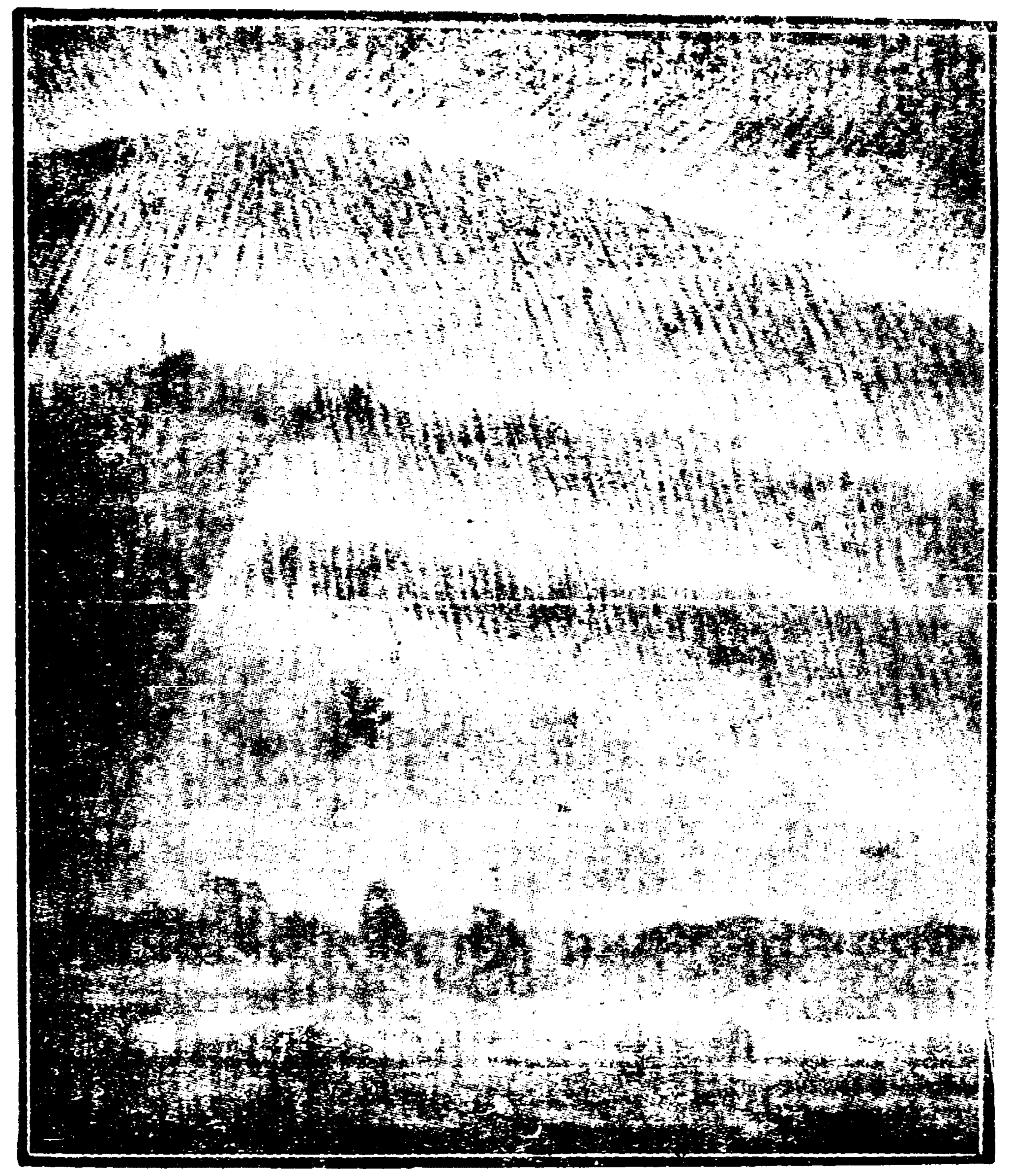

মেরুর দেশের অদ্ভুত আলো
এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহও কৃত্রিম উপগ্রহের একটা কাজ।

এখন, কথা হ'চ্ছে, কি ধরণের পোষাক পরে চাঁদে যাওয়া যায়? পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আলাস্কা বা সাইবেরিয়ায় — যেখানে তাপমাত্রা শূন্য থেকে বহু ডিগ্রী নীচে—লোহা বা ইস্পাতও অতি সহজেই বেঁকে বা ভেঙ্গে যায়। মহাশূন্যে তাপমাত্রা সম্ভবতঃ আলাস্কা বা সাইবেরিয়া থেকেও অনেক কম, কাজেই বিশেষ কোন ধাতু দিয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ ও যন্ত্রপাতি তৈরী করতে হবে যাতে প্রচণ্ড শীতেও কোন ক্ষতি না হয়। সূর্য্যের বিভিন্ন রশ্মির হাত থেকে বাঁচবার ব্যবস্থাও করতে হবে। অনেকে সন্দেহ করেন, মহাশূন্যে নানা ধরণের মারাত্মক রশ্মি ছড়িয়ে আছে। বাতাসের অভাবে সেখানে তাপ সমভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ফলে শরীরের যে অংশে রোদ পড়বে তা অত্যন্ত গরম হ'য়ে উঠবে, আবার অপর অংশ ভীষণ শীতে জমে যাবার উপক্রম হবে। কাজেই, তাপ যাতে ছড়িয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শরীর প্রয়োজন মত গরম বা ঠাণ্ডা রাখবার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা তো থাকবেই। শ্বাস-

প্রশ্বাসের জন্য সিলিণ্ডারের মধ্যে অক্সিজেন ও হিলিয়াম গ্যাস থাকবে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্ব্বন-ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসে তা থেকে আবার অক্সিজেন তৈরী করে নেবার যন্ত্রও থাকবে পোষাকের মধ্যে। চারদিক্ দেখবার জন্য চোখের সামনে থাকা চাই কোন স্বচ্ছ পদার্থ ; কিন্তু পোষাকের ভেতর ও বাইরের তাপের ভীষণ পার্থক্য সহ্য করবার ক্ষমতা কোন কাচেরই নেই। কোনও বিশেষ ধরণের প্লাষ্টিক দিয়ে এই জানালা তৈরী করতে হবে।

তারপর উল্কাপিণ্ডের কথায় আসা যাক্। প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে শূন্য থেকে হাজার হাজার ধাতু বা পাথরের টুকরো দিন রাত ঝরে পড়ছে পৃথিবীর বুকে। রাত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ —হঠাৎ একটি তারা খসে পড়ল। এরই নাম উল্কা। বাতাসের ঘর্ষণে অধিকাংশ উল্কাই মাটীতে পৌঁছবার আগে জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। আবার, বড় আকারের উল্কাপিণ্ডগুলো জ্বলতে জ্বলতে সেকেণ্ডে প্রায় সাত মাইল বেগে মাটীতে এসে পড়ে। এ ধরণের উল্কাপিণ্ড তোমরা কলকাতার যাদুঘরে দেখতে পাবে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে একটি বিরাট উল্কাপিণ্ড ভীষণ শব্দে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়ে। সমস্ত লিসবন সহর এতে আলোকিত হ'য়ে যায়। ১৯০৮ সালে সাইবেরিয়াতে যে প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ডটি পড়েছিল তার ওজন ছিল তিন হাজার টন। এখন, কথা হচ্ছে, এই সব উল্কাপিণ্ডের হাত এড়িয়ে চাঁদে পৌঁছনো যাবে কি ? পণ্ডিতেরা কিন্তু বলছেন, উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে রকেট বা ষ্টেশনের ধাক্কা খাবার সম্ভবনা খুবই কম। কারণ, পৃথিবীর তুলনায় ঐ ষ্টেশন বা রকেটের আয়তন নগণ্য এবং মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও অত্যন্ত কম। কাজেই, উল্কাপিণ্ডগুলির এদের দিকে আকৃষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। ষ্টেশন থেকে চাঁদে যাবার যে রকেটের কথা আগে বলেছি, তা মোড়া হবে দু'টো পাতলা এলুমিনিয়াম পাতের দেয়াল দিয়ে এবং দেয়াল দুটোর মধ্যে থাকবে বাতাস ভরা। এ অবস্থায় বাতাস গরম বা ঠাণ্ডা হবে খুব ধীরে। ফলে রকেটটি শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত থাকবে ; আবার, ছোট ও মাঝারি উল্কাপিণ্ডের হাত থেকেও এ দেয়াল রকেটকে রক্ষা করতে পারবে।

চাঁদে যাবার আরো অনেকগুলো বাধাবিঘ্ন রয়েছে, কিন্তু তার অধিকাংশই আজ সমাধানের পথে। এখন যদি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো একযোগে কাজ করে তবে চাঁদের বুকে মানুষের পদচিহ্ন পড়তে বিশেষ দেরী হবে না।

চাঁদে গেলে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানীদের গ্রহনক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণের মস্ত সুবিধা হবে। —বায়ুমণ্ডল নেই ব'লে ওখানকার আকাশ সর্বদাই ঝক্ঝকে পরিষ্কার,—কোন রকম ধোঁয়া, কুয়াশা বা মেঘ নেই, দৃষ্টিকে কোন কিছুতেই ঝাপ্সা ক'রবে না। চাঁদে পৌঁছতে

পারলে মানবসভ্যতা যে এক লাফে বহুদূর অগ্রসর হয়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ যারা রামধনু পড়ছ, তাদের মধ্যেই কেউ হয়ত চাঁদের পথে প্রথম অভিযাত্রীদের সঙ্গে যোগদান করে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বইয়ের যত্ন

শ্রীবিনায়ক সেন

নিশ্চয় ধরে নিতে পারি তোমার বই পড়বার সখ আছে ; তা' নইলে আমার এই লেখাই পড়তে না তুমি। আর যদি বই পড়বার সখ থেকে থাকে তা হ'লে এও ধরে নিতে পারি যে বইয়ের যত্ন তুমি করবেই। কারণ পড়তে ভালবাসা আর বই ভালবাসা প্রায়ই চলে একেবারে পাশাপাশি।

তোমরা বয়সে এখনও নিতান্তই ছোট, তাই তোমাদের বইয়ের সম্পত্তিও হয়তো এমন কিছু নয়। তবু, সেই অল্প সম্পত্তির উপর দিয়েই, তোমাদের বইয়ের যত্ন-শিক্ষার আরম্ভ হওয়া উচিত। কারণ ভবিষ্যতে তোমাদের কে যে কত বইয়ের মালিক হবে, কার পড়বার সখ বা প্রয়োজন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কিছু নিশ্চয় ক'রে বলা যায় কি ?

প্রথমেই ধর, বইয়ের পাতা কাটা। কখনো কখনো তোমরা দেখে থাকবে যে বইয়ের দু'টো-একটা পাতা জোড়া থাকে, অর্থাৎ ও পাতাটা বা পাতাগুলো বই তৈরীর সময় কাটার কলের ফলার মুখে ঠিক ভাবে পৌঁছয় নি। সে সব পাতা কখনো বা থাকে সম্পূর্ণ জোড়া, কখনো বা আংশিক। এ জিনিষটি যে কত অযত্নে, কত অবহেলায় কাটা হয় তা দেখে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। কেউ কাটে আঙ্গুল ঢুকিয়ে, কেউ পেন্সিল দিয়ে, কেউ স্কেল দিয়ে, কেউ হাতপাখার ডাণ্ডা দিয়ে—কি দিয়ে নয় ? তবে বেশীর ভাগই কাটে আঙ্গুল দিয়ে। এটা অন্যায় ; এ হ'চ্ছে অলসতা, এ আগাগোড়া রুচির অভাব। সে ভাবে পাতা কাটলে তার অবস্থাটা যে কি হয় এবং সে পাতা দেখতে কেমন লাগে তা তোমরা সহজেই অনুমান করতে পার। তাই বলি যদি তোমাদের নিজেদের কখনো ও-অবস্থায় পড়তে হয় ও-ভাবে কখনোই কেটো না। কাটবে রীতিমত যত্ন নিয়ে, ঠিক মত ছুরি দিয়ে। ঠিক মত ছুরি বলছি এই জন্য যে বইয়ের পাতা কাটবার ছুরি অত্যধিক ধারাল হওয়া উচিত নয়, কারণ বেশী ধারাল ছুরি কাগজের দাঁড়াবার শক্তির বাইরে চলে' গিয়ে যেখান-সেখান দিয়ে বেরিয়ে

চলে যায়—যাতে তোমার প্রয়োজনের সবই নষ্ট। ঐ একই কারণে কামাবার ব্লেড দিয়েও বইয়ের পাতা কাটা উচিত নয়। ব্লেড প্রয়োজনাতিরিক্ত ধারাল, অত্যধিক নরম এবং আকারে অত্যন্ত ছোট হওয়ায় কাজের সুবিধা হয় না। সেও পাতা যেদিকে-সেদিকে কেটে দিয়ে কাজ যথেষ্ট নষ্ট করে দিতে পারে। বইয়ের পাতা কাটবার পক্ষে সব চাইতে ভাল জিনিষ হচ্ছে 'স্লাইস',—ইংরাজীতে যাকে বলে 'টেবল্ নাইফ্'। নিতান্ত অভাবে সাধারণ ছুরি, একটু ভোঁতা রকম। পারলে ও-কাজের জন্য বিশেষ ছুরিই (বা পেজ্ কাটার) রাখা উচিত।

এর পর ধরা যাক্ ভাঁজকরা পাতা কাটা। অনেক সময় দেখা যায়, বইয়ের পাতা বই তৈরীর সময় হয়তো ভাঁজ হয়ে রয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তা ঠিক মত কাটা হয় নি, আর এখন মেলে দিলেই তা বেরিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য তাকে ঠিক করতে প্রথমেই দরকার হয় কাঁচি। এ ক্ষেত্রে নানা রকম অবস্থা হ'তে পারে এবং নানা জিনিষের প্রয়োজনও হ'তে পারে। যেমন আঠা, তেলা কাগজ ইত্যাদি। মোটের উপর ঠিক ভাবে সমস্ত কাজটি করতে গোড়ার কথা হচ্ছে চাই নিরলস যত্ন এবং মন।

বইয়ের ভেতরে কখনোই কোন জিনিষ রাখা উচিত নয়। বহু লোকেরই বইয়ের মধ্যে চিঠিপত্র রাখা অভ্যাস। একখানা চিঠি বা একখানা কাগজ হয়তো কিছু এসে যায় না, কিন্তু একখানাই ধীরে ধীরে ছ'খানা, ছ'খানা থেকে তিনখানা, তার পর চার—পাঁচ—ছয় করে বেড়ে উঠতে থাকে। শেষে কালক্রমে মোটা হ'য়ে সেটা এমনি হয় যে সে বই আর মুখ বন্ধই করতে চায় না। সমস্ত জিনিষ বার করে ফেলে বই বুঁজিয়ে খোলবার চেষ্টা করলে দেখা যায় বার বার ঐ একই পাতায় বই প্রথম খুলছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই একই অবস্থা, অর্থাৎ বইয়ের পত্রগুচ্ছের ভারসমতা নষ্ট হয়ে গেছে, যা আর কিছুতেই ফেরে না। উপরন্তু বইয়ের ভেতরে জিনিষ রাখলে বইয়ের সেলাই ঢিলে হ'য়ে বইয়ের আয়ুও অনেক ক'মে যায়।

কেউ কেউ বই পড়েন বইটি একেবারে ঘুরিয়ে, উল্টে মুড়ে নিয়ে। যেহেতু তাতে ধরবার জন্য একটি হাত ব্যবহার করলেই চলে। এ কাজ কখনোই করা উচিত নয়। বই পড়তে হ'লে ওটা দু' হাতেই ধরা উচিত, কারণ বই ঘুরিয়ে মুড়লে তার সেলাই ছিঁড়ে যায়। বাঁধানো বই হলে, অমনি ভাবে দোমড়ানোতে মলাটটাই অনেক সময় খুলে আসে। অবশ্য এ অভ্যাসটা বড়দের মধ্যেই বেশী দেখা যায়—যাঁরা শুয়ে শুয়ে বই পড়েন আর একটির বেশী হাত ব্যবহার করতে চান না। মনে রেখো, বদ্-অভ্যাস চিরদিনই বদ্-অভ্যাস। তোমরা নিজেরা যেন কোন কারণেই কোন দিনই তার ভেতরে প'ড়ো না।

বহু লোকেরই আরও দু'টি অত্যন্ত বদ্-অভ্যাস আছে বইয়ের কোন বিশেষ জায়গায় নিজের মনোমত কোন উল্লেখে লাইনের নীচে নীচে দাগ কাটা বা বইয়ের পাতায় কোন মন্তব্য করা। এ ব্যাপারে দেখা যায় প্রায় লোকেরই কোন আত্মপর জ্ঞান থাকে না। তোমার নিজের প্রয়োজনে নিজের বইতে যদি তা করবার দরকার হয় তা হ'লে নিশ্চয়ই করবে, কিন্তু পরের বইতে ও কাজ কখনো যেন করতে যেও না। সর্ব্বদাই মনে রেখো যে ও বই অপরের, তোমার কোন অধিকারই নেই তা নোংরা করবার। লাইব্রেরীর বই হলেও নয়,—কারণ সেটাও সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি, তোমার অধিকার সেখানে শুধু আংশিক। এটা হচ্ছে ভদ্রতা, সামাজিকতা এবং সু-নাগরিকতা-জ্ঞান।

ঠিক ঐ কারণেই কখনো বইয়ের পাতা মুড়ে তোমার পাঠ-চিহ্ন রাখবে না। আমি দেখেছি, বিশেষ করে লাইব্রেরীর বইএ,—অনেকেই এ কাজটি করে থাকেন। কেউ কেউ আবার কোণটি একবার মুড়েই ক্ষান্ত হন না, পাতার একটা সুবৃহৎ অংশ নিয়ে দু'-তিন ভাঁজও দেন। কি অন্যায় বল দেখি! বইয়ের পাতা একবার ভাঁজ করে দিলে সে ভাঁজ আর কখনো যায় না এবং দিনের বিবর্ত্তনে ঐ ভাঁজের জায়গাটি আরও নরম হয়ে বইয়ের পাতার ঐ অংশটুকু শেষে একদিন খুলে আসে। অনেক সময়ই তার সঙ্গে লেখার খানিকটা অংশও চলে যায়।

আর একটি অত্যন্ত নোংরা অভ্যাস হ'চ্ছে মুখের থুতু দিয়ে বইয়ের পাতা ওল্টানো। জিনিষটা দেখতে খারাপ, অস্বাস্থ্যকরও, কোনদিক্ থেকেই কোন রুচির পরিচয় এতে নেই। এ অভ্যাসেও যেন প'ড়োনা কখনো। পাতা ওল্টাবার খুব সহজ উপায় হচ্ছে যেখানকার পাতা ওল্টাবার দরকার সে জায়গাটি মুখের সামনে ধ'রে তাতে আস্তে ফুঁ দেওয়া। যদি এমন হয় যে বার বারই পাতা ওল্টাবার দরকার হচ্ছে আর ফুঁয়ের সাহায্য ছাড়া তা হচ্ছেনা, তা হলে হাতের কাছে প্রয়োজন মত জল রেখে নিও। কিন্তু থুতু? কিছুতেই নয়।

আর একটি কাজ, যারই বইয়ের যত্ন নেবার সখ বা সে দায়িত্ব-বোধ আছে, তারই করা উচিত। সেটি হচ্ছে প্রয়োজন মত বই সেলাই করবার একটা ব্যবস্থা হাতের কাছে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখা। এটা করতে হবে সাধারণ পাতলা চটি বইয়ের জন্য, বাঁধানো বই বাঁধাই-ওয়ালার কাছে দেওয়া ভাল। বই সেলাই করবার সরঞ্জাম হচ্ছে—কিছু টোন সুতো, একটা বড় সুচ, একটি ধারাল মাঝামাঝি আকারের পেরেক, একটি ছোট হাতুড়ি এবং একটি আঠার শিশি। পেরেক যথেষ্ট ধারাল না পেলে কোন একটা পাথরে বা ভাঙ্গা শ্লেটে নিজেই ধার দিয়ে নেওয়া চলে।

প্রথমে বইটি বেশ ভাল ক'রে গুছিয়ে নিয়ে যেখানে যেখানে সূচ বসবে পেরেক দিয়ে সে সে জায়গায় দু'—তিন—চার পাঁচ—প্রয়োজন মত ফুটো ক'রে নিয়ে দরকার মত ডবল সেলাই করে নেবে। সেলাই-শেষে গিঁঠ দেবার পর টাসেলের মত বেশ খানিকটা সূতো রেখে দেওয়া ভাল। কারণ গিঁঠের কাছ ঘেঁষে সূতো কেটে দিলে কিছুদিন বাদে গিঁঠ খুলে বই আবার আল্‌গা হয়ে যেতে পারে। এ সব সরঞ্জাম তোমাদের এই বয়স থেকেই কাছে রাখা উচিত; তাতে একটা গোছানো কাজকর্ম্মের অভ্যাস হয়, সারা জীবন ভ'রেই যার সুফল মেলে।

আর একটি মাত্র বিষয় ব'লে আজকের এই লেখা শেষ করব। বই ধার নেওয়া এবং ধার দেওয়া। বইয়ের একটা দুর্নাম আছে যে বই কাউকে পড়তে দিলে তা আর ফিরে আসে না। এর মত সত্য কথা—অন্যান্য দেশের কথা জানি নে—আমাদের দেশে আর নেই। এই যে বই খোয়া যাওয়া, এর অধিকাংশই হয় মানুষের দায়িত্ববোধ আর কর্ম্মকুশলতার অভাবে। তা নইলে বইটি ইচ্ছে করে নিয়ে নেবার মতলব অনেকেরই থাকে না। তোমার বই হয়তো কেউ পড়তে নিয়ে গেল, তুমিও পরে আর চাইলে না বা চাইতে ভুলে গেলে, আর সেও ঠিক সময় মত নিয়ে এল না বা আনতে ভুলে গেল। তারপর কিছু দিন বাদে হয়তো তোমারও মনে রইল না বই কাকে দিয়েছিলে, আর তারও মনে পড়ল না সে বই কার কাছ থেকে এনেছিল। তার পর সে বই হয়তো বন্ধুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারই সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হ'ল, কিংবা তার কাছ থেকে আর কেউ নিয়ে গেল, তার কাছ থেকে আর একজন। শেষ পর্য্যন্ত কোথায় যে সে উধাও হ'ল কেউ জানতেও পারল না। সে ক্ষেত্রে খুব ভাল অভ্যাস বই কিনেই বইতে নাম লিখে ফেলা। এতে বন্ধুবান্ধব, জানাশোনা লোকের হাতে পড়লে তা ফিরে আসাই সম্ভব—যদি না সে মানুষ নেহাৎই অমানুষ হয়। নিজের হাতের লেখা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রীতির মনোভাব না থাকলে রাবার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করতে পার। রাবার ষ্ট্যাম্প করতে হ'লে সর্ব্বদাই করা উচিত গোল এবং তার ভেতরে কোন সোজা লাইনই থাকা উচিত নয়। কেন এমন ব্যবস্থা এ প্রশ্ন তোমরা করতে পার। হাঁ, কারণ একটা আছে বই কি! বইয়ের ভিতরকার লেখা সব সময়েই হয় সোজা, সমান্তরাল; সেখানে ষ্ট্যাম্পের লাইনও যদি অপরাপর লাইনের সঙ্গে ঠিক সমান্তরাল ভাবে না পড়ে তবে দেখতে ভারী বিশ্রী দেখায়। রূপ-রুচিবিদ্‌ লোকের পক্ষে তা অতি মানসিক অস্বস্তির কারণ হ'য়ে ওঠে। সোজা লাইনের ষ্ট্যাম্প ঠিক মত সমান্তরাল করে বসানো এক মহা কঠিন ব্যাপার। অনেক ধীরেসুস্থে, মেপেজুঁকে, কায়দা-কানুন করে তা লাগাতে হয়। তার পরও তা ঠিক হয় না, একটু না একটু

বেঁকে যাবেই। কিন্তু গোল ষ্ট্যাম্প হ'লে কোন গোলযোগ না করেই যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে তা লাগানো চলে।

কাজে কাজেই, বই যদি কাউকে ধার দিতেই হয়, যতদূর সম্ভব তা মনে করে রাখবার চেষ্টা ক'রো। ঘন ঘন সে কাজ করতে হলে তার বিবরণ লিখে রাখবার খাতাও ব্যবহার করতে পার। উচিত মতো সময় পেরিয়ে গেলে বন্ধুর কাছ থেকে তা চেয়ে আনবারও ব্যবস্থা ক'রো ঠিক মত। এতে লজ্জার কিছু নেই। অপর পক্ষে, নিজে কখনো কারুর কাছ থেকে কোন বই পড়তে আনলে সর্ব্বদাই মনে রেখো ওটি ঠিক ভাবে এবং ঠিক সময় মত ফেরৎ দেওয়া তোমার নৈতিক কর্ত্তব্য। কোন ক্রমেই যেন এ ব্যাপারে ভুল না হয়। জীবনে এই কথাটি ধর্ম্মীয় অনুশাসনের মত মেনে চলা দরকার।

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস

তীর্থঙ্কর

—বেরীনাগ থেকে জলজিবি—

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাসের উদ্দেশে রওনা হয়ে বেরীনাগে এসে পৌঁছেছি এবং এখানকার খ্যাতনামা স্বর্ণকার শ্রীপরসীলাল বর্ম্মার আতিথ্য গ্রহণ করেছি—এ কথা তোমাদের আগের বারেই বলেছি।

স্বর্ণকার মশাইএর মুখ থেকে সেদিন রাত্রে বেরীনাগ অঞ্চলের কত গল্পই না শুনলাম! তার মধ্যে নারায়ণস্বামীর গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এখানে আসবার পূর্ব্বেই তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। হিমালয়ের এই অঞ্চলটায় তাঁর স্মৃতি-

চিহ্ন কিছু কিছু রয়ে গেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজ আছে—এখান থেকে খুব দূরে নয়, কিন্তু আশ্রমটি বেশ খানিকটা দূরে। এখানকার পার্ব্বত্য উপজাতির লোকেরা স্বামীজীর দানের ও সেবার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ।

পরদিন সকালে দ্রুতহস্তে রান্না-খাওয়া সেরে নিয়ে এগারোটা আন্দাজ আমরা রওনা হলাম থলের উদ্দেশ্যে। এবার আমাদের সঙ্গী হলেন স্বর্ণকার মশায়ের পুত্র ভবানীপ্রসাদ বর্ম্মাজী। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল আলাদা। তিনি যাচ্ছিলেন গার্বিয়াং এ, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে।

বেরীনাগ থেকে থলের দূরত্ব সাড়ে ন' মাইল। তাই আমাদের থলে এসে পৌছাতে বেলা চারটে বেজে গেল। থল জায়গাটি বড় মনোরম। এখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রামগঙ্গা নদী। এই নদী পার না হয়ে কেউ থল ছেড়ে যেতে পারে না। নদীর উপর আছে ঝোলান সেতু। সেতুর ওপারেও থলের খানিকটা অংশ রয়ে গেছে। সে-টুকুর পরিচয় 'বাঁ দিক্' বলে। এখানে থাকে যত শ্রমিক ও পার্ব্বত্য চাষীর দল,—পশু ও পরিশ্রম যাদের সম্বল। এখানকার দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বলেশ্বর মহাদেবের মন্দির বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে। থলে স্বর্ণকার মশায়ের বাড়ী ও ব্যবসা-কেন্দ্র আছে। আমরা তাঁর ছেলের সঙ্গী বলে সহজেই এসে তাঁর বাড়ীতে উঠলাম।

বাড়ীটি দোতলা এবং নেহাৎ ছোটও নয়। আমাদের স্থান হ'ল দোতলার উপরেই। মোটঘাট নামিয়েই আমরা ষ্টোভ জ্বালিয়ে রাত্রের খাবারের জোগাড় করতে লাগলাম। বিকাল বেলার চা খাওয়া ব্যাপারটা আমরা দোকানেই সেরে নিয়েছিলাম।

আবার যাত্রার জন্য এখানে আমাদের নতুন করে কুলি ঠিক করতে হ'ল। পর দিন সকালে আবার আমাদের যাত্রা শুরু। আমাদের আগেই ভবানীপ্রসাদ একটি কুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কথা ছিল রাস্তায় একটি দোকানে আমাদের সাক্ষাৎ হবে এবং সেখানেই আমরা মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিতে পারবো। নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌছতে বেলা তিনটে বেজে গেল। দোকানটি রাস্তার উপরে একটি গাছের তলায়। চমৎকার জায়গাটি। গিয়ে দেখলাম আহার্য্য প্রস্তুত। আমাদের আগেই ভবানীপ্রসাদ পৌছে গিয়ে দোকানীকে দিয়ে রাঁধিয়ে রেখেছিলেন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে আবার আমাদের চড়াই ভাঙ্গা সুরু হ'ল। চড়াইএর পর চড়াই, যেন তার আর শেষ নেই। ডিডিরহাটে এসে পৌছতে বেলা পাঁচটা বেজে গেল। চরমা নদীর উপর অবস্থিত এই জায়গাটা। বড় সুন্দর এর দৃশ্যাবলী। এখান থেকে খানিকটা দূরে দিকতাদে স্কুল, দোকানপাট আছে। আমরা

অবশ্য ডিডিরহাটে একটি দোকানে রাত্রিকালীন আশ্রয় পেয়েছিলাম। ভবানীপ্রসাদ আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। ডিডিরহাটের গালিচা-শিল্প খুব বিখ্যাত। দেখলাম ঘরের মেয়েরা এবং বুড়োরা কেমন পশম দিয়ে গালিচা তৈরী করছেন।

পরদিন সকালে উঠে আমরা আস্কোটের পথে রওনা হলাম। বর্ম্মাজী তখনও আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। আস্কোটের পোষ্ট মাষ্টারকে আমাদের যাত্রার খবর দিয়ে এর আগেই আলমোড়া থেকে কিশোরীলাল শা পত্র দিয়েছিলেন। তাই তাঁর কাছে এসে উঠতে আমাদের কোনও অসুবিধা বোধ হ'ল না। পৌছতে বেলা ১১টা বেজে গেল। এখানকার বহু প্রাচীন ধর্ম্মশালার দোতলার উপর আমাদের থাকার ব্যবস্থা হ'ল।

হিমালয়ের দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে ধর্ম্মশালার প্রায় দেখাই পাওয়া যায় না। তাই বহুদিন পরে আবার পোষ্ট মাষ্টার সাহেবের কল্যাণে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পাওয়ায় মনটা খুসি হয়ে উঠলো। জায়গাটিও চমৎকার। বাজার, পোষ্ট অফিস, মন্দির, রাজবাড়ী—সব কিছুই আছে।

আস্কোটের এই ধর্ম্মশালাটির নাম ভূপেন্দ্রনারায়ণ ধর্ম্মশালা। এত বড় ধর্ম্মশালা পথে কোথাও আর চোখে পড়ে নি। মস্ত বড় দোতলা বাড়ীটি, অনেক কালের পুরোনো বলেই জরাজীর্ণ দেখাচ্ছিল। এখানকার পোষ্ট মাষ্টার মশায় আমাদের সঙ্গে নানা গল্প করতে করতে ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত এসে আমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে বিদায় নিলেন।

মধ্যাহ্নভোজনের সময় আমাদের মধ্যে স্থির হ'ল খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে জায়গাটি দেখতে। এখানকার জনকতক লোক আমাদের বলে দিলেন আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক ও নিরাপদ হবে যদি গার্জ্জিয়া পৌঁছে নদীর তীরে রাত্রিযাপন করি। আমরা প্রায় বেড়াতে বেড়াতেই বেলা ৫টা নাগাদ গার্জ্জিয়া পৌঁছে গেলাম।

গার্জ্জিয়া জায়গাটি বাস্তবিকই মনোরম। প্রথম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মন এক অপূর্ব প্রসন্নতায় ভরে গেল। সামনেই দেখলাম বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা নদী গৌরীগঙ্গা। নদীর উপর একটা ঝোলা সেতু। সেতুর ধারে নদীর তীরে ছোট একটি দোকানে আমরা এসে কিছুক্ষণের জন্য বসে বৈকালিক চা-পান শেষ করলাম। এখানে হয়তো রাতও কাটানো যেত কিন্তু তিন দিক্ খোলা, কাজেই এখানে রাত্রি যাপন করা উচিত হবে না ভেবে আমরা আজ জলজিবি পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির করলাম।

জলজিবি পৌছতে প্রায় সন্ধ্যা ৮টা হ'ল। "সন্ধ্যা" ৮টা শুনতে কেমন লাগছে, না? তোমরা হয়ত জান না, হিমালয়ের এই পার্বত্য অঞ্চলে আমাদের সমতলভূমির চেয়ে দিন বেশ কিছুটা বড়। তাই সন্ধ্যাও হয় দেরীতে,—বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। পাঞ্জাবেরও কোন কোন জায়গায় রাত (?) ৯টার সময় সন্ধ্যা হতে দেখেছি। এতক্ষণ

আমরা উৎরাইয়ের পথে চলছিলাম, তাই একটু দ্রুত বেগেই অনেকটা পথ পার হওয়া গিয়েছিল।

জলজিবিতে কালীগঙ্গা ও গৌরীগঙ্গার সঙ্গম ঘটেছে। এই সঙ্গমের দৃশ্য অতি চমৎকার। এর আগে কেদার-বদরী যাবার পথে পঞ্চপ্রয়াগের কথা শুনেছিলাম। এখানে এসে এবার সপ্তপ্রয়াগের কথা শুনলাম। চক্ষে অবশ্য সাতটা প্রয়াগ, কিনা নদীসঙ্গমের স্থান এ পথে দেখি নি। পুরাকালে নদীসঙ্গমের স্থানগুলিকে প্রয়াগ নামে অভিহিত করা হ'ত। আমাদের দেশে কিন্তু নদীসঙ্গম বোঝাতে "বেণী" শব্দেরই ব্যবহার দেখা যায়।

যাই হোক. পাহাড়ের পর পাহাড়ের ফাঁকে সাদা-কালো নদীতে মিলে যে বেণী রচনা করছে তার দৃশ্য অপরূপ। পাহাড় যেন এক বিরাট তপস্বী, তার কোলে জলভরা নদীর কলনৃত্য আমাদের মনে যে ছবি এঁকে দিয়েছিল তা ভূমার কোলে উমার মতই।

ব্যবসা-ব্যাণিজ্যেরও এক উল্লেখযোগ্য স্থান এই জলজিবি। এখানে কয়েকজন বড় ব্যবসাদারও আছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বোধ হয় আহাম্মদ হোসেন। কৈলাসযাত্রীদের উপর তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা। তিনি আমাদের তাঁর বাড়ীতেই রাত্রিকালীন আশ্রয় নেবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমরা কিন্তু তাঁর অনুরোধ রাখতে পারি নি। আমাদের থাকার ব্যবস্থা তার আগেই শিবমন্দিরের ধারে একটি দোকানে হয়ে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য এ অবশ্য ভবানীপ্রসাদেরই ব্যবস্থা।

এখানে যে ধর্ম্মশালাটি আছে তা খুবই ছোট, তবে সঙ্গমের ধারেই। আমাদের কিন্তু দোকান ঘরেই বেশ আরামে সে রাত্রি কেটে গেল।

শান্তির প্রস্তাব

শ্রীঅজিতকুমার তারণ

ভিন্ গাঁ থেকে এসেছে জামাই রামচিজ্, ওর দুলাহিন অর্থাৎ স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুর-বাড়ী। থাকবে দশ-পনেরো দিন। বুড়ো কিষাণ পান্নালাল এবং ওর স্ত্রী বাড়ীতে জামাই আর মেয়েকে পেয়ে খুব খুশী।

ছাতিফাটা রোদ। ভীষণ গরম পড়েছে। কানপুরী গরম। অভদ্র। অসহ্য! কারুরই মন-মেজাজ নেই ঠিক। তাপ উঠেছে একেবারে এক শ' ষোল-সতের ডিগ্রীতে। মাঝখানে একদিন বৃষ্টি হ'য়ে জমিগুলোকে একটু নরম ক'রে দিয়ে গেলেও আবহাওয়াটাকে আরো দুরন্ত করে দিয়ে গেছে।

কিন্তু গরমের জন্য ঘরে বসে থাকলে তো চলে না। পান্নালালকে সকালে উঠেই চাষের ক্ষেতে যেতে হ'ল। রামচিজ্ও বসে থাকবার লোক নয়। সকাল বেলা কিছু খেয়েদেয়ে সেও গেল মাঠে, শ্বশুরের কাজে সাহায্য করতে।

বেলা ধীরে ধীরে বেড়ে চল্ল। পান্নালালের মেয়ে সাবিত্রী বাপ ও স্বামীর জন্য কূয়োর অতল তল হ'তে ঠাণ্ডা জল তুলে তাতে পোড়া আম, নুন ও খানিকটা গুড় ঢেলে সরবৎ তৈরী করে রওনা হ'ল মাঠের পানে। ছ'-সাত বছর বয়সের ছোট ভাই রঘু সাবিত্রীর পিছু ছাড়লে না। সেও চল্ল দিদির সঙ্গে সঙ্গে।

যেতে যেতে সাবিত্রী বল্ল,—"রঘুয়া, তুই রোজ মন দিয়ে পড়াশোনা করছিস তো? তোকে ভাল করে পড়াশোনা করতেই হবে। জওহরলালজীর মত বড় পণ্ডিত হতে হবে। তারপর বড় চাকরী করে বাবাকে অনেক—অনেক টাকা এনে দিতে হবে। বাবার তো সব টাকাই শেষ হ'য়ে গেল আমার বিয়েতে দহজ (যৌতুক) দিতে।"

—"আমিও বিয়ে করে অনেক টাকা আর জিনিষ-পত্তর পাব। তা'র সবই বাবাকে দেব, তবেই তো হবে দিদি?"

—"ধ্যেৎ পাগ্‌লা! দহজ নেওয়া কি ভালো কাজ রে ভাইয়া? মোটেই ভালো নয়। আমাদের দেশে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে কত মা-বাপ যে ফতুর হয়ে যান তার ঠিক নেই। খবরদার, তুই তোর বিয়েতে শ্বশুরের কাছ থেকে মোটেই টাকা নিতে পারবি না।"

—"তবে বাবা কেন তোমার বরকে অত টাকা দিয়ে নিজে গরীব হলেন?"

—"সে কথা ছেড়ে দে।"

—"ছাড়বো কেন ? তোমার বরেরও, বাবা, দোষ আছে। ও এত টাকা নিল কেন ? আর বাবাই বা দিতে গেলেন কেন ?"

হঠাৎ অদূরে একটা চীৎকার শুনে ভাইবোনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা দেখল, সামনের মাঠে শ্বশুরে আর জামাইয়েতে তুমুল বচসা শুরু করে দিয়েছে। আশপাশের ক্ষেত থেকেও অন্যান্য কিষাণেরা এসে জড় হয়েছে ওদের ক্ষেতে।

সাবিত্রী আর রঘু তীরবেগে দৌড়ে গেল ঘটনাস্থলে। যেতে যেতে রঘু বলল, "দিদি, বাবা নিশ্চয়ই বোনাইকে বলেছেন টাকা ফিরিয়ে দিতে, আর ওতেই আরম্ভ হ'য়েছে ঝগড়া, তাই না ?"

—"ধ্যোৎ পাগ্‌লা ! তোর মগজে বুঝি ঐ একই চিন্তা ঢুকে রয়েছে ? চ'—চ', দেখি আগে আসল ব্যাপারটা কি।"

ব্যাপারটা আর বিশেষ কিচ্ছুই নয়, অতি সামান্য। হ'য়েছে কি, ক্ষেতে কাজ করতে করতে শ্বশুর বলছে, মাঠ পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে যে গ্রামটা রয়েছে তা দু' মাইলের বেশী দূর হবে না, আর জামাই জোরের সঙ্গে বলছে, "ন্-না, না,—না। কম-সে-কম তিন মাইল হবেই।"

সামান্য ব্যাপার। কিন্তু এই নিয়েই তর্কাতর্কি। বুড়ো পান্নালাল ভারী এক-রোখা। আবহাওয়ার গরমে তার মাথাও গরম হয়ে আছে। জামাইয়েরও রক্ত গরম। তাই মীমাংসা হচ্ছে না, কথার ঝাঁঝ বেড়েই চলেছে।

অন্যান্য কিষাণরাও ফোড়ন দিচ্ছে। কেউ বলছে, দূরত্বটা মাপা হোক্ না, তবেই তো গণ্ডগোল মিটে যায়। কেউ আবার বল্‌ছে, বাজী রেখে মাপতে হবে, যে হারবে সে অপরকে পঞ্চাশ টাকা দেবে, ইত্যাদি।

ভাইবোন এসে হাজির হ'ল এবং সব কথা শুনল। কাণ্ড দেখে সাবিত্রীর খুব লজ্জা করছিল, কিন্তু রঘুয়া চট্‌পট্ কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলল। বাপকে টেনে বসিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে, "দিদির বিয়ের সময়ে তুমি বোনাইকে কত টাকাপয়সা, জিনিষপত্তর দিয়েছ, আর এখন কিনা……"

কথায় বাধা দিয়ে পান্নালাল বল্লে, "হ্যাঁ, তারই তো এই পরিণাম ! কী আর বলবো বেটা ? নিমকহারামটা এখন সে সবই ভুলে গিয়ে আমাকে অপমান করছে।"

—"বাবা, আমার একটা কথা শোনই না ! তুমি যখন ওকে বিয়েতে অত কিছু দিতে পেরেছ তবে আর এখন কেন মিছিমিছি কঞ্জুষী করছ ? এখন আরো একটা মাইল দিয়ে দাও না ওকে। এতে তো আর কোন খরচা নেই এক পয়সাও, ঝগড়াও থেমে যাবে এক্ষুণি। শুধু তুমি বল্লেই হবে, ঐ গ্রামটা তিন মাইল দূরে।"

রঘুয়ার প্রস্তাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে মাঠে এক নাটকীয় পরিবর্ত্তন হ'ল। শ্বশুর, জামাই আর অন্যান্য কিষাণরা, সঙ্গে সাবিত্রীও, সমস্ত ভুলে হো হো করে হেসে উঠল। রঘুয়ার শান্তি-প্রস্তাবে নিমেষে সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি কোথায় মিলিয়ে গেল। বাপ রঘুয়াকে আদর করে বল্‌ল, "ঠিক বলেছিস বেটা ! লেখাপড়া শেখালে তুই হয়তো একদিন দ্বিতীয় জওহরলালজী হবি।"*

*উত্তর প্রদেশের কানপুর অঞ্চলের একটি গ্রাম্য কাহিনী।

প্রবাদের ছবি

বলতে পার এটা কোন্ প্রবাদ ?

এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেস

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে গেল মাদ্রাজে। তোমাদের মধ্যে যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড় কিংবা ভাল করে রামধনু পড় তারা নিশ্চয়ই জান যে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মিলনের এবং আলোচনার স্থল হ'ল বিজ্ঞান কংগ্রেস। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত থাকা এবং নানা বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা বৈজ্ঞানিকদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। বৈজ্ঞানিকদের ধর্ম বিজ্ঞান, কাজেই তাঁদের পক্ষে বিজ্ঞান কংগ্রেসে উপস্থিত থাকা এবং তীর্থক্ষেত্র দর্শন করে পুণ্য সঞ্চয় করা একই কথা বলা যেতে পারে।

এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে দু' হাজারের উপর প্রতিনিধি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। দেড় হাজারের বেশী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠান হ'য়েছিল এই উপলক্ষে। বিজ্ঞান কংগ্রেস এগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে থাকেন। অন্যান্য বছরের মত প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুও উপস্থিত ছিলেন এবং দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন উপস্থিত বৈজ্ঞানিকদের।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত মাদ্রাজ প্রদেশও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে। তা ছাড়া বিশ্বের দরবারে যে একজন বিজ্ঞানী ভারতের মুখ রেখেছেন, বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করে, তিনি এই মাদ্রাজ প্রদেশেরই অধিবাসী। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক সি. ভি. রামনের কথাই আমি বলছি। তা ছাড়া এখানকার গণিতজ্ঞ রামানুজমের নামও পৃথিবীর বিজ্ঞানী-মহলে বিশেষভাবেই পরিচিত। মাদ্রাজ প্রদেশে ভারতের প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি গবেষণাগার আছে। এগুলির মধ্যে সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, সেন্ট্রাল ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ইরিগেশন রিসার্চ ষ্টেশন ও ইনটিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী প্রধান। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ও ভারতের একটি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেই বিরাট প্যাণ্ডেলে এবারকার অধিবেশন বসেছিল। প্রথম দিনের অধিবেশন সুরু হয় ৬ই জানুয়ারী বিকেল ৩টের সময়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির স্বাগতসম্ভাষণের পর মাদ্রাজের রাজ্যপাল বক্তৃতা করেন। তারপর শ্রীনেহরু বলেন, বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক বিরোধ থেকে দূরে রেখে বিজ্ঞানীদের অশেষ গুণাবলী অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর মধ্যে রাশিয়ায়ই নাকি বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রকর্ত্তৃক সব রকম ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা পান বেশী। এবারকার অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন

ভারতের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা-পরিষদের ডিরেক্টর-জেনারেল অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকার। এরপর তিনি তাঁর ভাষণ পাঠ করেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দেশের উপযোগী বিজ্ঞান অনুশীলন করার কথা বলেন।

তারপর বিদেশী বিজ্ঞানীদের একে একে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে। এঁদের মধ্যে ছিলেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্মান বৈজ্ঞানিক রিচার্ড কুন, আমেরিকার ফ্রেডারিক রোসিনি, রাশিয়ার অধ্যাপক বারডিন ও অধ্যাপক বার্ডম প্রভৃতি। সম্প্রতি রাশিয়া যে 'কৃত্রিম চাঁদ' উড়িয়ে এত নাম করেছে সে সাফল্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অধ্যাপক বারডিন।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের অধিবেশনগুলি পরে ৫।৬ দিন ধরে চলে। বিভিন্ন বিভাগে যে সব বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সভাপতিত্ব করেছিলেন তাঁদের পরিচয় তোমাদের জেনে রাখা ভাল। নিজের নিজের বিষয়ে যে এঁরা বিশেষ খ্যাতিমান তা বোধ হয় তোমাদের বলে দিতে হবে না।

মূল সভাপতি অধ্যাপক থ্যাকার জন্মগ্রহণ করেন আমেদাবাদে। বোম্বাই থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা অর্জনের জন্য তিনি ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। এখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রী লাভ করে তিনি ব্রিষ্টলেই চাকরী নেন। ১৯৩১ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনে যোগ দেন। প্রায় ষোল বছর চাকরী করার পর তিনি বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব্ সায়েন্সে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং দু' বছর পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা-পরিষদের ডিরেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত হন। তোমরা বোধ হয় জান যে জাতীয় গবেষণাগারগুলি (যার সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৮) এই সংস্থারই অন্তর্গত। কত বৈজ্ঞানিক সংস্থার সঙ্গে যে অধ্যাপক থ্যাকার নানা ভাবে জড়িত রয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না। কলকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স এবং ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশনের তিনি সহ-সভাপতি।

গণিত শাখার সভাপতি ছিলেন ডক্টর বি. এস. মাধবরাও। ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করে ২১ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি পাশ করেন এবং ১৯৩৮ সালে এখানকার ডি. এস-সি হন। আজীবন অধ্যাপনা করে ডাঃ রাও ১৯৫৫ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে অবসর গ্রহণ করেছেন।

জটিল গণিত শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডাঃ রাও প্রায় ৬০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ দেশী বিদেশী বহু পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক রাও শুধু গণিতজ্ঞই ন'ন, ইনি একজন নামকরা হকি এবং টেনিস খেলোয়াড়ও। উদ্ভিদ্‌বিদ্যায়ও এঁর যথেষ্ট আগ্রহ এবং খ্যাতি আছে।

সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি ডক্টর কে. কিষেণ। এঁর জন্মস্থান আজমীরে। ১৯৩৪ সালে লাহোর থেকে গণিত শাস্ত্রে এম. এ পাশ করে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটিতে ইনি চাকরী গ্রহণ করেন। এর পর তিনি দু' বছর অধ্যাপক পি. সি. মহলানবিশের তত্ত্বাবধানে সংখ্যাতত্ত্বে গবেষণা করেন। বর্ত্তমানে ইনি উত্তর প্রদেশ সরকারের প্রধান সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌। ১৯৫০ সালে ইনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

শ্রী এস. এল. মুলারকার হয়েছিলেন পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি। ইনি জন্মগ্রহণ করেন মহীশূর রাজ্যের হাসান নামক স্থানে। ১৯২৩ সালে বি. এস-সি পাশ করে ইনি গবেষণা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এলাহাবাদে ডাঃ মেঘনাদ সাহার অধীনে ইনি কিছুদিন গবেষণা করেছেন। এঁর কর্মস্থল ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ।

রসায়ন শাখার সভাপতি ডাঃ এস. ঘোষের জন্মস্থান রাজস্থানের ঢোলপুর। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি পাশ করে ইনি ১৯২৬ সালে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। বর্ত্তমানে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ। ইনি ন্যাশনাল একাডেমী, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রী প্রভৃতির ফেলো।

জীববিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি ছিলেন ডাঃ পি. ভট্টাচার্য। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ্‌. ডি। ইনি আইজৎনগরের ইণ্ডিয়ান ভেটেরীনারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের প্রাণিতত্ত্ব শাখার বিভাগীয় কর্ত্তা।

ইণ্ডিয়ান ভেটেরীনারী রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের পশুপুষ্টি (য়্যানিম্যাল নিউট্রিশন) বিভাগের গবেষক (রিসার্চ অফিসার) ডক্টর এস. এন. রায় ছিলেন শরীরতত্ত্ব শাখার সভাপতি। এঁর পূরো নাম শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১ সালে রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম. এস্‌-সি পাশ করার পর ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়াল সোসাইটির সভাপতি স্যার এফ. জি. হফ্‌কিন্‌সের অধীনে গবেষণা করে ১৯৩৪ সালে পি-এইচ্‌, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে অধ্যাপনা করেছেন কিছুদিন। ১৯৩৮ সালে ইনি বর্ত্তমান কাজে যোগদান

করেন। ১৯৪৬ সালে ডক্টর রায় আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের বহু স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু প্রায় ৭০টি প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। ডক্টর রায় রামধনুরও একজন বিশিষ্ট বন্ধু। এক সময়ে এঁর বহু লেখা রামধনুতে বেরিয়েছে। বিশেষ করে কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবন নিয়ে লেখা এঁর রচনাগুলি পরম উপাদেয়। যারা পড় নি তারা সুবিধা পেলে পুরোনো রামধনু খুলে সেগুলো পড়ে নিও।

নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখায় সভাপতি ছিলেন ডাঃ জি. এম. কুরুলকার। ইনি ১৯২২ সালে চিকিৎসা-বিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করেন। স্বদেশী আন্দোলনে ডাঃ কুরুলকার বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছেন। বোম্বাইএর শেঠ জি. এস. মেডিক্যাল কলেজে ইনি এনাটমির অধ্যাপক। ইনি কয়েকখানা বিখ্যাত পুস্তকের প্রণেতা।

চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা শাখায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর এ. কে. বোস। ডাঃ বোসের বাল্যজীবন কেটেছে বনগাঁ সহরে। শরীরতত্ত্বে ইনি এম. এস-সি পাশ করার পর এম. বি পাশ করেন। ইনি লণ্ডনের এল. আর. সি. পি, এম. আর. সি. পি, ও এম. আর. সি. এস। ইনি কলকাতা করপোরেশনের একজন অল্‌ডারম্যান।

ডক্টর পি.এন. ভাদুড়ী কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের উদ্ভিদ্‌ বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক। ইনি ছিলেন কৃষিবিদ্যা শাখার সভাপতি। কলকাতা থেকে এম. এস-সি পাশ করে ইনি ইয়োরোপে যান এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বছর পাঁচেক উদ্ভিদ্‌বিদ্যার লেক্‌চারার ছিলেন। তারপর নিউ দিল্লীর ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে কিছুদিন কাজ করে বর্ত্তমান কাজে যোগ দেন। ইনি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট, লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটি এবং রয়াল হর্‌টিকালচারাল সোসাইটির ফেলো।

মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখার কার্য্য পরিচালনা করেন অধ্যাপক এ. কে. পি. সিংহ। ইনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ, আমেরিকার মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি ও পি-এইচ. ডি। ইনি বর্ত্তমানে পাটনা কলেজের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

এঞ্জিনীয়ারিং এবং ধাতুবিদ্যা বিভাগে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সি. এস. ঘোষ,—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যার এম. এস-সি এবং আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজীর এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার এম. এস-সি। ইনি বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের অধ্যাপক।

ভূতত্ত্ব ও ভূ-বিজ্ঞান শাখা পরিচালনা করেন ডক্টর এ. জি. ঝিনগ্রান। ইনি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে এম. এস-সি পাশ করে ডারহাম থেকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী পান। বর্ত্তমানে ইনি জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডেপুটি ডাইরেক্টার।

ডক্টর টি. এস. সদাশিবন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি পাশ করার পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ইনি বর্ত্তমানে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌শাখার ডাইরেক্টার। ১৯৫৫ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর সদাশিবনকে ডি এস-সি ডিগ্রী দেন। ইনি ছিলেন এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেসে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শাখার সভাপতি।

প্রবাদের ছবি

বলতে পার এটাই বা কোন্ প্রবাদ ?

মুক্তি

শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত

রবিবার।

তিন দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আজ দুপুরে বৃষ্টিটা যেন একটু ধরে এসেছে। যে দিকে চোখ পড়ে—শুধু জল আর কাদা।

পণ্ডিত মশাই এক গাল পান মুখে পুরে এই বাদলা দুপুরের সাথী 'রামায়ণের' পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। জানালার বাইরে সারি সারি পেয়ারাগাছগুলো বৃষ্টিতে ভিজে পাকা ফলের ভারে নুয়ে নুয়ে পড়ছিল।

হঠাৎ জানালার দিকে দৃষ্টি পড়তেই পণ্ডিত মশাই চমকে উঠলেন। ঘন গাছপালার মাঝখান থেকে একটা হাত একগোছা পেয়ারার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

তিনি বিকটভাবে হুঙ্কার ছাড়লেন—"কে রে? কে উঠেছিস গাছে?—কেষ্টা না শিবে! দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি। বাঁদর!" দুটো নিথর গাছের ডাল যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠলো। পরমুহূর্ত্তেই ঝুপ ঝাপ্ শব্দ। তারপর সব চুপ।

এই গ্রামে যাদের বাড়ীতে বাগান আছে তারা প্রত্যেকেই এই দুটি বাঁদরকে চেনে। স্কুলে মাষ্টার মশাইরা এদের আরও সন্মান দেন, বলেন—'হনুমান'। কেষ্টা, শিবু সত্যিই হনুমান; দিন নেই, রাত নেই, সর্ব্বদা দৃষ্টি পড়ে আছে কখন কার বাগানে কি ফল পাকল।

কেষ্টা এবং শিবুদের বাড়ীর মাঝামাঝি পথে একটা বিরাট বটগাছ। বহুদিনের পুরানো সে গাছ। ঝুরিগুলো পর্য্যন্ত মাটির রস টেনে গুঁড়ির আকার ধারণ করে অনেকগুলো গাছে পরিণত হয়েছে। ঘন গাছের ছায়ায় ঢাকা চারিদিক্। দিনের বেলাতেই অন্ধকার বলে মনে হয়। এখানেই একটা নির্দ্দিষ্ট গুঁড়ির উপর দুটো বিরাট ডালের উদ্গম-স্থানে কৃত্রিম-অকৃত্রিম ফাটল এবং ফোকরের মাঝে কেষ্টা ও শিবু নিজের নিজের পেয়ারাগুলো রাখলো—তারপর ডালের ওপর হেলান দিয়ে বসে একটা একটা করে পেয়ারা নিয়ে পরম আনন্দে পা দুলিয়ে দুলিয়ে খাওয়া আরম্ভ করলো। এটাই এদের প্রধান আড্ডা।

পেয়ারা চিবোতে চিবোতে কেষ্টা বললে, 'সেদিনের সেই মাছ চুরির ব্যাপার মুখুয্যে মশাই বাবাকে বলে দিয়েছেন। জানিস্ শিবে, বাবা কাল মা'র সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন, আমাকে নাকি কলকাতায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখানো হবে। এখানে থাক্‌লে আমি নাকি সত্যিই একটা আস্ত হনুমান হয়ে যাবো!' শেষের কথাটা বলে একটু মুচকী হাসলো কেষ্টা।

'সত্যি !··· সত্যি তুই আমাদের ছেড়ে চলে যাবি ?' শিবু একটু ব্যথাতুর কণ্ঠে বললে।

আধ খাওয়া পেয়ারাটা দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে দুই হাতের বুড়ো আঙুল দুটো একত্রে শিবুর চোখের সামনে নাচিয়ে দিয়ে কেষ্টা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো,—'হুঁ ! যাবে না হাতী ! কলকাতায় আবার মানুষে যায় ? না আছে একটা বাগান, না আছে একটা মাঠ। শুধু বাড়ী—আর বাড়ী—আর লোকের ভীড় ! একেবারে বিচ্ছিরি !!'

কিন্তু এই বিচ্ছিরি কলকাতাতেই কেষ্টাকে আসতে হোল। ড্রোভার লেনের একটা বড় বাড়ীর দোতলায় তার পড়ার ঘরে বসে কেষ্টা আনমনে ইংরিজী বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টিপ্ টিপ্ করে। পড়ায় কিছুতেই মন বসে না। বই খুললেই শিবুর মুখখানা যেন ভেসে ওঠে ওর মধ্যে।···এমন বাদলার দিনে কোথায় মুখুয্যেদের পুকুরের মাছ আর রায়দের বাগানের জামরুল, তা না···কেষ্টা আর ভাবতেও পারে না, চোখ ছল ছল করে ওঠে।

বিকেল পাঁচটার সময় নৌকো থেকে নেমে মাটিতে পা রাখতেই কেষ্টার সমস্ত শরীরে যেন আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। দীর্ঘ দেড় বছরে ব্যস্ত কলকাতা তার কাছে কিছুটা সয়ে গেলেও ছায়াসুনিবিড়, শান্তসৌম্য এ গ্রামখানির প্রতিটি ধূলিকণা তার অনেক বেশী প্রিয়—অনেক বেশী আপনার। মনের আবেগে একটা গান গুণ্ গুণ্ করে গাইতে গাইতে কেষ্টা এগিয়ে চললো। পায়ে-চলা কালো মাটির সরু পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে গাঁয়ের ভেতর। সবই কেষ্টার চিরচেনা। চল্‌তে চল্‌তে সে রায় মশাইদের বাড়ীর পেছনে এসে পড়লো। গোয়াল ঘরের পাশে মাদ্রাজ থেকে আনা কি একটা ভাল জাতের আমগাছটা দিব্যি বড় হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে, এবারই বৈশাখে ফল দেবে হয়তো। কেষ্টা শিবু যে সেই বহু-আকাংক্ষিত সময়ের জন্য দিন গুণছে এটা বোধ হয় রায় মশাই জানেন না।

রায় মশাইয়ের বাড়ী পেছনে ফেলে একটা সাঁকো পার হ'য়ে কেষ্টা এবার বাড়ীর ধারে এসে পড়লো। তারপর সোজা বাড়ীর ভিতর ঢুকে স্যুটকেসটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে 'মা' বলে একটা হাঁক ছেড়েই ছুটে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো মাকে। প্রদীপ হাতে মা যাচ্ছিলেন তুলসীতলায়, অকস্মাৎ এ ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে তিনি প্রথমটা চম্‌কে উঠলেন। তারপর একটু সাম্‌লে নিয়ে স্নেহহাস্যে বল্‌লেন—"আরে, ছাড় ছাড়, দেখো দিকিনি ধেড়ে খোকার কাণ্ড !"

মুহূর্ত্তমধ্যে আশপাশের বাড়ীতে খবর পৌঁছে গেল ওদের পুরোনো কেষ্টা পূজোর ছুটিতে বাড়ী এসেছে।

শিবুর সাথে সেই রাত্রেই দেখা করবার ইচ্ছা প্রবল থাকলেও মা'র আজ্ঞানুযায়ী সে রাত্রে আর কোথাও বেরুল না কেষ্টা।

পরদিন সকালে উঠেই কেষ্টা বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে। শিবুর সাথে আগে দেখা করতে হবে, তারপর সারা গ্রাম ঘুরে আসতে হবে। দেড় বছর তো কম সময় নয় !

শরতের মেঘমুক্ত রোদ গা এলিয়ে দিয়েছে গাঁয়ের উপর। চলতে চলতে কেষ্টা সেই বুড়ো বটগাছটার সামনে এসে দাঁড়াল। এই দেড় বছরে যেন কোন পরিবর্ত্তনই হয় নি বুড়ো গাছটার। বটের ছায়ার অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে জমি থেকে তেমনি একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসছে। আড়চোখে ওদের বহুস্মৃতিজড়িত আড্ডাটা দেখে নেয় কেষ্টা, তারপর জোর পায়ে এগিয়ে চলে শিবুর বাড়ীর দিকে।

কয়েক পা এগিয়ে মোড় ঘুরে সামনে দৃষ্টি পড়তেই কেষ্টা যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। নির্জ্জন পথের উপর দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে এগিয়ে আসছে ও কে ? শিবু না ? শিবুই তো !

—'শিবে !' কেষ্টা ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে ডাকলো।

অন্যমনস্ক শিবু চমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।—'এ কি ! কেষ্টা, তুই ! তুই কবে এলি ?'

—'কাল বিকেলে। কিন্তু এ তোর কি চেহারা হয়েছে রে ? রোগা পাংশুটে হয়ে গেছিস্ যে একেবারে !'

কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিল শিবুর মুখে, সমস্ত আনন্দ যেন এক মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল শিবুর চেহারা থেকে। ব্যথাতুর হয়ে উঠলো ওর সমস্ত মুখমণ্ডল। বললে, 'আর বলিস্ কেন, এই তো সবে টাইফয়েড থেকে উঠলাম। একাই ঘুরি ফিরি, কিচ্ছু ভালো লাগে না আর।'

'যাঃ ! কি বাজে বকছিস ! চল্, বাড়ী চল্, সবার সাথে দেখা করে আসি।' একটা হাত ধরে টান দিলো কেষ্টা —'ইস্, কি ঠাণ্ডা রে তোর হাত !'

একটা করুণ হাসি খেলে গেল শিবুর মুখে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো ও।

'চ' না, কি ভাবছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?'

অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো যেন শিবু। এগিয়ে যেতে যেতে বললে, 'আচ্ছা, তুই এগো, বাড়ীর সবার সাথে দেখা কর্ গে, আমি এলাম বলে।

'ওঃ ! তোর কাজটাই বেশী হোল ! আমি এ্যাদ্দিন পর এলাম, আমার কথার বুঝি কোন মানেই হোল না ?' অভিমানের সুর কেষ্টার কণ্ঠে।

এগোতে গিয়ে যেন হোঁচট খেয়ে ফিরে দাঁড়াল শিবু। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এসে কেষ্টার দুই কাঁধে হাত রেখে কয়েক মুহূর্ত্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। 'তোকে আমি কেমন করে বোঝাই কেষ্টা, তোকে আমি কেমন করে বোঝাই ? তুই যা, যা না, আমি এই আসছি।'

শিবুর চোখে চিক্ চিক্ করছে দু' ফোঁটা অশ্রু।

কেষ্টা অবাক্ হয়ে গেল। আশ্চর্য্য ! এই দেড় বছরেই কী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে শিবুর !

শিবুদের বাড়ী পৌঁছেই কিন্তু কেষ্টা যা শুনল তা সত্যই অভাবনীয় ! শিবুর বাবা চোখের জল মুছতে মুছতে বাগানের এক কোণে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন।

শিউলিগাছের নীচে পোড়া ঘাসের উপর কিছুটা ছাই আর পোড়া কাঠ রাশি রাশি শিউলি ফুলে ঢাকা পড়ে গেছে যেন ! কয়েকটা ভ্রমর ঝরে-যাওয়া ফুলগুলোর ওপর ঘুরছে আর ঘুরছে।

'ওখানে ওখানে ঐ শিউলিতলায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে শিবে। এ ঘুম আর ওর ভাঙ্গবে না।'

—উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ সামলে নিয়ে শিবুর বাবা বললেন। 'তখন বর্ষাকাল। জানিস তো, তখন এখানে চারদিকে জল থই থই করে, দূরে নিয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না। তাই ঐ শিউলিতলাতেই...'

কেষ্টা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো শিবুর অশ্রুসজল চোখ দুটো। কাঁধের উপর দু'টো শীতল হাতের পরশ দিয়ে শিবু বলেছিলো—'তোকে আমি কেমন করে বোঝাই কেষ্টা, তোকে আমি কেমন করে বোঝাই ?'

নিস্তব্ধ, নিঝুম রাত।

কৃষ্ণপক্ষের একফালি চাঁদ আকাশের গায়ে। ম্লান আলোয় ঢাকা গাছের ছায়ায় কালো আঁধার চারিদিকে। বাইরের ঘরে একা শুয়ে কেষ্টা। ঘুম নেই আজ ওর চোখে। সকালে শিবুর সাথে সাক্ষাতের কথাটা কাউকে বলে নি সে। যে শিবু অল্প কয়েক দিন আগে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে সেই শিবুর সাথেই সাক্ষাৎকাহিনী কে-ই বা বিশ্বাস করবে ? কিন্তু ভেবে ভেবে কোনও কিনারা পায় না কেষ্টা। সত্যি শিবুই কি তার সঙ্গে কথা বলেছিলো ? তাকে ছুঁয়েছিলো ? আবার শিবুর অশ্রুসজল চোখ দু'টো ভেসে ওঠে, কাঁধের উপর যেন দু'টো শীতল হাতের পরশ পায়। সেই ধ্বনি—'কেমন করে বোঝাই কেষ্টা, তোকে কেমন করে বোঝাই ?' নিজেকে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা করে কেষ্টা।

অকস্মাৎ একটা ঠাণ্ডা প্রবাহের স্পর্শ পেয়ে কেষ্টা সচকিত হয়ে উঠলো। কে যেন ওর একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। উঃ, কী ভীষণ ঠাণ্ডা। সমস্ত শরীরে যেন শিহরণ জাগিয়ে তোলে ! অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু কার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট কানে আসে। মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে যায়, পায়ের কাছে রাখা চাদরটা টেনে গায়ে দেবার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলে কেষ্টা।

কয়েক সেকেণ্ড ! তারপর সেই নিথর অন্ধকারের বুক চিরে জেগে ওঠে অসহ্য যন্ত্রণাকাতর এক করুণ কণ্ঠস্বর—'জ্বলে গেলাম কেষ্টা, জ্বলে গেলাম ! আর পারি না সইতে।'

বিদ্যুতাহতের মত এক লাফে বিছানার উপর উঠে বসে কেষ্টা—'কে—কে ? শিবে ?'

— 'হ্যাঁ, আমি। তুই আমায় বাঁচা, আমায় মুক্তি দে, আমায় মুক্তি দে ভাই !' শিবুর কণ্ঠস্বর যেন ক্রমে ভারী হয়ে আসে।

কেষ্টা কিছু বুঝতে পারে না। এ কি স্বপ্ন ! অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। ভাল করে চোখ রগড়ে স্নেহার্দ্রস্বরে বলে, 'কি বলতে চাস তুই, বল্ ? কি করলে তুই মুক্তি পাবি ? কি আমি করতে পারি ?'

—'আমাদের শাস্ত্রে বলে গয়ায় শেষ কৃত্য করলে মানুষ মুক্তি পায়। আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহদের এই বিধান, জানি না কতখানি সত্যি। তবু একবার তুই চেষ্টা কর্ না। আমি যে আর সইতে পারি না !—সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে। দারুণ যন্ত্রণা। দিনের আলোয় তবু কিছুটা শান্তি পাই কিন্তু আঁধারের সাথে সাথে সমস্ত শরীর ছেয়ে নেমে আসে অগ্নিজ্বালা ! তার ওপর এই নিঃসঙ্গ জীবন ! তুই একবার চেষ্টা কর্ ভাই !'

পরদিন কেষ্টা যখন শিবুদের বাড়ী গিয়ে গত রাত্রির এবং পূর্ব্বের সমস্ত ঘটনা বললো, শিবুদের বাড়ীতে তখন উঠলো আর একবার কান্নার রোল। অতি কষ্টে মাসীমা এবং মেসোমশাইকে বুঝিয়ে কেষ্টা যখন পথে এসে দাঁড়ালো তখন বেলা প্রায় আটটা।

আনমনে শিবুর কথা ভাবতে ভাবতে কেষ্টা ওদের আড্ডার সামনে এসে দাঁড়ালো। আচম্বিতে কে যেন পেছন থেকে ওর নাম ধরে ডাকলো। পথে কেউ নেই, কেষ্টা পেছন ফিরে তাকাল। সামনে বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে শিবু।

শিবু কথা বলবার আগেই কেষ্টা বললে—'তোর কথা রাখব ভাই ! আজই আমি রওনা হচ্ছি গয়ায়। কিন্তু তুই যে মুক্তি পেয়েছিস্ বুঝবো কি করে ?'

'যাবার সময় আমি তবে এ গাছেরই একটা ডাল ভেঙ্গে দিয়ে যাবো।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল শিবু।

'এবার আমি চলি।'—কেষ্টা সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে দেখলে অনেক বেলা হয়ে গেছে। সে হন্ হন্ করে এগিয়ে চললো। কিছুদূর এগিয়ে এসে পিছু তাকালো। শিবু তেমনি দাঁড়িয়ে। বাঁকের পথে মোড় ঘুরবার সময় আবার কিসের আকর্ষণে আপনা থেকেই যেন ঘাড় ফিরে গেল কেষ্টার। অপস্রিয়মান বটের ছায়ায় শিবু তখনও দাঁড়িয়ে।

গয়া থেকে গ্রামে ফিরেই কেষ্টা ছুটে এলো বটগাছটার নীচে। অবাক্ হয়ে দেখল, বহুদিনের স্মৃতি-বিজড়িত দু'টি ডালের উদ্গম-স্থানে তৈরী ওদের আড্ডা নষ্ট করে দিয়ে একটা ডাল কখন মাটীর উপর ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে।

ঝুম্‌না বনে

শ্রীসুচেতা ভট্টাচার্য্য

ঝাউঝিরি বনে সোনা-মাখা রোদ
পড়েছে ঢ'লে,
হেথা এস কবি, একটু বসিবে
বনের কোলে।
কত সুরে মাখা কত না কাহিনী
রয়েছে মনে,
কত কথা বলা হয় নাই—এস,
বসি দু'জনে।

উড়ে উড়ে চলা পাখীদের শোন
কাকলী যত,
সুদূরের পথে যেতে চায় মন
ওদেরি মত।
নয়নে আমার ঘুম নেই আজ
কেন না জানি,
কত কথা করে মনের কোণায়
কি কানাকানি !

চেয়ে দেখ ঐ ঝুপসী নদীর
অতল জলে,
তন্দ্রার মত করুণ আবেশে
কে কথা বলে !
আর চেয়ে দেখ ঝুম্‌না বনেতে
জাজিম পাতা,
গাঢ় সবুজের রঙে রঙে লেখা
যেন সে খাতা !

থোকা থোকা ঐ ডালিমের ফল
দোলে ওধারে,
ঝুরু ঝুরু হাওয়া বাঁশবনে – সেও
বলে কথা রে !
ঘরে যাব নাকো, এস এস কবি,
একটু বসি,
ফিরে যেয়ো যবে আকাশে উঠিবে
উজল শশী।

ধরিত্রীর সৃষ্টি

শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

(ইরাণ দেশের পৌরাণিক কাহিনী)

ইরাণ দেশে পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে একটী সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। সেই কাহিনীটিই তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম।

যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয় নি, চারিদিকে অসীম অন্ধকার, মহাশূন্যে স্তব্ধ নীরবতা, তখন ঈশ্বরের করুণায় প্রথম জন্ম নিলেন জর্বন—আমরা যাকে বলি মহাকাল। তার পর জন্মালেন তাঁর স্ত্রী।

ঈশ্বর জর্বনকে সৃষ্টি করে যাগযজ্ঞ করবার নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। যজ্ঞ শেষ হলেই তিনি লাভ করবেন এক পুত্র—তাঁর নাম হবে অরমিণ্ড। সমস্ত পৃথিবী পরিচালনা করবার দায়িত্ব থাকবে তাঁর উপর।

জর্বন আরম্ভ করলেন যজ্ঞ। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর কেটে গেল - যজ্ঞ শেষ হোল না।

জর্বন ভাবলেন, "তবে কি কোন অপরাধ হোল আমার ? তা না হলে ঈশ্বরের কোন করুণা হচ্ছে না কেন ? নাকি তাঁর কথা সত্য নয় ?"

কিন্তু ঈশ্বরের নির্দ্দেশ কখনও মিথ্যে হতে পারে না। যজ্ঞ সম্পূর্ণ হোল, জর্বনের স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলেন। কিন্তু ছেলে এলো দু'টি। একটী অরমিণ্ড, অপরটী অহ্‌র্মেন।

জগতে ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়, মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল হয়। জর্বনের যজ্ঞরূপ পুণ্যকর্ম্মের ফলে একটী ছেলের মধ্যে সাধু পুরুষদের সব লক্ষণ দেখা যেতে লাগলো, তার নাম অরমিণ্ড। আর তাঁর মনে ঈশ্বরের প্রতি যে অবিশ্বাসের ভাব এসেছিলো, তার ফলে অন্য একটী ছেলের মধ্যে দুষ্ট লোকের সমস্ত লক্ষণ দেখা যেতে লাগলো। নাম তার অহ্‌র্মেন।

জর্বন খুব চিন্তার মধ্যে পড়লেন। কা'কে তিনি দেবেন জগতের ভার ? দু' ভাইয়ে ঝগড়া লাগিয়ে যে প্রলয় বাধাবে—তা হতে দেওয়া যাবে না। যে আগে মায়ের পেট থেকে বেরোবে সে-ই হবে এই পৃথিবীর অধীশ্বর।

মায়ের পেটের ভিতর থেকেই অরমিণ্ড কথাটা শুনে অহ্‌র্মেনকে বললে। অহ্‌র্মেন শুনে হিংসায় জ্বলে গেল, কোন কথা বললে না।

আরমিণ্ডেরই আগে বেরোবার কথা। কিন্তু একদিন যখন অরমিণ্ড ঘুমিয়ে আছে তখন অহ্‌র্মেন নিঃসাড়ে মায়ের পেট হতে বেরোল। এসেই সোজা জর্বনের কাছে উপস্থিত। জর্বন তাকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি ? কি চাও ?"

অহ্‌র্মেন তীব্র মেজাজে জবাব দিলে, "আমি আপনার পুত্র।"

জর্বন বললেন, "আমার পুত্রের এমন কদাকার চেহারা হতেই পারে না। স্বয়ং ঈশ্বর বলেছেন, আমার ছেলে জন্মালে তার মুখের জ্যোতিঃতে চারদিক্ হয়ে উঠবে উদ্ভাসিত —যশ তার পৌঁছবে দিগ্‌দিগন্তে।"

কঠিন স্বরে অহ্‌র্মেন বললে—"আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমি আপনার পুত্র।"

জর্বন বললেন, "তোমার সারা অঙ্গে সে উজ্জ্বলতা কোথায় ?"

এমন সময় চারদিক্ উদ্ভাসিত করে একটী ছেলে জর্বনের সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "পিতা, ও আপনার পুত্রই বটে।"

ঐ সুশ্রী ছেলেটীকে দেখে জর্বন খুব তৃপ্তি বোধ করলেন। আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন তাকে বুকে। তারপর একটী যজ্ঞদণ্ড তার হাতে তুলে দিয়ে নানারূপ সৎ উপদেশ দিয়ে বললেন, "এই দণ্ডটীর সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীর ভার তোমার হাতে তুলে দিলাম। এখন হতে এই পৃথিবীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হলে তুমি।"

অহ্‌র্মেন তখন কাছে এসে রাগত স্বরে বললে, "পিতা, আপনি কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনি নিজে বলেছেন যে যে আগে ভূমিষ্ঠ হবে তাকেই আপনি দেবেন পৃথিবী শাসনের ভার। আপনার সে কথা, আশা করি, স্মরণ আছে ?"

জর্বন এই কথা শুনে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। দুঃখে, হতাশায়, অনুতাপে তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

অরমিগু তখন পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আপনি যখন প্রতিজ্ঞা করেছেন তখন আপনার সে প্রতিজ্ঞা রাখা উচিত। আপনি পৃথিবী শাসনের ভার অহ্‌র্মেনকেই দিন।"

জর্বন তখন অরমিগুর কথায় সান্ত্বনা লাভ করে অহ্‌র্মেনের হাতেই পৃথিবী শাসনের ভার অর্পণ করে বললেন, "তোমাকে দিলাম এই পৃথিবী। তুমিই হলে পৃথিবীর রাজা। কিন্তু তোমার উপরেও রাজা রইলো অরমিগু। তোমার অন্যায়, অসত্য, অধর্ম্মের সমস্ত বিচার করবে সে। আর মনে রেখো, তোমার হাতে পৃথিবীর ভার থাকবে ন' হাজার বছর। তারপর একচ্ছত্র অধীশ্বর হবে অরমিগু।"

সে দিন থেকে জর্বনের দু' পুত্রই পৃথিবী গড়ার কাজ আরম্ভ করলো।

অরমিগু তৈরী করে—আলো, বাতাস, বৃক্ষলতা, ফুল-ফল, আশা-আনন্দ, সুখ-শান্তি।

অহ্‌র্মেন তৈরী করে—রোগ, শোক, দুঃখ, হতাশা, জরা, ব্যাধি. মৃত্যু।

অরমিগু তৈরী করে—নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ, রত্ন-মণিমাণিক্যে ভরা অসীম সমুদ্র, সবুজ শস্যে টলমল করা সতেজ ধরিত্রী।

অহ্‌র্মেন তৈরী করে—ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ।

অরমিগু পৃথিবীতে আনে সৌন্দর্য্য, অহ্‌র্মেন নিয়ে আসে বীভৎসতা।

ইরাণ দেশের পুরাণ বলে, অহ্‌র্মেন আর অরমিগুর পরস্পরবিরোধী কাজ আজও চলছে। একজন গড়ে ভাল, একজন গড়ে মন্দ। তাদের সেই ভাঙাগড়ার খেলা আজও শেষ হয় নি। কবে শেষ হবে কে জানে?

রামকৃষ্ণ-স্তুতি

(গান)

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পাপ-তাপহারী,
এ মরজগতে অমর দেবতা,
মানবদেহধারী!
ধর্ম্মের গ্লানি বিনাশ করিতে,
পবিত্রতায় হৃদয় ভরিতে,
যুগে যুগে তুমি এসেছে ধরায়
বিলাতে করুণা-বারি।
পুরুষসিংহ বিবেকানন্দ
ঘুচালে তাহার মনের দ্বন্দ্ব,

গণমনজয়ী হৃদয়ানন্দ
অমৃত-লোকচারী!
সত্যের পথে চলেছিল তব রথ,
তুমিই শিখালে যত মত তত পথ,
ধরিয়া তোমার ও দুটি চরণ
জয় করে গেল তুচ্ছ মরণ,
পাপতাপ হ'তে পাইল মুক্তি
শত শত নর-নারী।

—ইংরেজ সাহিত্যিকদের নিয়ে—

ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হচ্ছেন চার্ল্‌স্ ডিকেন্স। তাঁর প্রথম গল্পটি যখন ছাপার অক্ষরে বেরোল তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। শোনা যায়, ছাপার হরফে নিজের লেখা গল্প দেখে তিনি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে মনের আনন্দে সারাদিন শুধু রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ান। কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কোন কিছুই তাঁর খেয়াল ছিল না। সারাদিন কেবল ঘুরছেন আর ঘুরছেন।

ঐ গল্পটি লিখে তিনি কিছু দক্ষিণাও পেয়েছিলেন। কত জান? আমাদের টাকার হিসেবে প্রায় পূরো দু' পয়সা।

এই ডিকেন্সই তাঁর শেষ বইখানির জন্য কি দক্ষিণা পান সেটাও শুনে রাখ। অবশ্য তার পূরো অঙ্কটা জানা নেই, তবে হিসেব করে দেখা গেছে যে সে বইয়ের প্রত্যেকটি শব্দের জন্য তিনি আমাদের হিসেবে প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা করে পেয়েছিলেন। তা হলে আন্দাজ কর—গোটা বইখানির জন্য না জানি কত!

রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং ইংরেজী সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা লেখক। যেমন গদ্যে, তেমনি পদ্যে। সাহিত্যের জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন। এই কিপ্‌লিং ছোটদের জন্যও লিখতেন। তাঁর জঙ্গলের গল্প—'দি জাঙ্গ্‌ল্ বুক্' ছোটদের একখানি বিখ্যাত বই। এর মুগলীর গল্প তোমরা অনেকেই হয়তো জান।

কিপ্‌লিং কিন্তু জন্মেছিলেন এই ভারতবর্ষেই—বোম্বাই সহরে। তোমরা বোধ হয় ভাবছ, ভারতে জন্মেছিলেন বলে ভারতের উপর নিশ্চয়ই তাঁর খুব টান ছিল। মোটেই নয়। বরঞ্চ সুবিধা পেলেই তিনি ভারতের নিন্দা করে গেছেন। তাই বড় লেখক হয়েও তিনি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন নি। কবি সত্যেন দত্ত তো এ নিয়ে কবিতাই লিখে গেছেন—"শেক্সপীয়ারের স্বজাত বলে পুঁছবে না কেউ কিপলিং-এরে।"

কিপ্‌লিংএর মত আরও একজন নামকরা ইংরেজ লেখক ভারতে জন্মেছিলেন—এই কলকাতাতেই। তাঁর নাম উইলিয়াম থ্যাকারে। কলকাতার ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে তিনি জন্মেছিলেন সেখানে আজও একটা পাথরের ফলকে তাঁর নাম লিখে রাখা হয়েছে।

কিপ্‌লিং যে রকম ভারতীয়দের নিন্দা করে গেছেন, ইংরেজ লেখক মেকলেও তেমনি করেছেন। এঁরা ছিলেন পণ্ডিত লোক। কুখ্যাত মিস্ মেয়ো (আমেরিকার) বা বেভার্লি নিকল্‌স্‌এর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু এর উল্টোটাও দেখা গেছে। আধুনিক যুগের বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক সামারসেট্ ম'ম্ আর আল্‌ডাস্ হাক্সলি ভারতের ঐতিহ্যের প্রচুর প্রশংসা করেছেন। আল্‌ডাস্ হাক্সলি গীতা সম্বন্ধে বলেছেন—ধর্মগ্রন্থ ও দার্শনিক গ্রন্থ হিসেবে এর তুলনা নেই। ম'ম্ তো তাঁর একখানি বিখ্যাত উপন্যাসের নামকরণই করেছেন উপনিষদ্ থেকে নাম নিয়ে। বইখানার নাম 'রেজর্‌স্ এজ্' (ক্ষুরের ধার)।

কি পুষতে চাও

কুকুর, বেড়াল তোমরা অনেকেই পোষ। পাখী পোষার শখও হয়তো অনেকের আছে। বানর, খরগোস, বেজী, সাপ, হরিণ ইত্যাদি হরেক রকম জানোয়ার পোষার শখ আছে অনেক লোকের। বাঘ-সিংহও বাদ যায় না। অষ্ট্রেলিয়ায় অনেকে ক্যাঙ্গারু পোষে, কুমীর পোষে, সীল, কচ্ছপ—এ সবও পোষার রেওয়াজ আছে। কিন্তু পোষা ব্যাঙের কথা শুনেছ? একজন প্রাণিবিজ্ঞানীর এই শখ ছিল। তিনি ঐ ব্যাঙের নাম ধরে ডাকলে সে দিব্যি সাড়া দিত। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগেও এই রকম পোষা ব্যাঙের কথা আছে।

যোশেফ ব্যাঙ্কস্ নামে এক ভদ্রলোকের মাছ পোষার বাতিক ছিল। – পালা নয়, পোষা। তাঁর মাছেরাও তাঁর ডাকে সাড়া দিত বলে শোনা গেছে। লর্ড আভেরি ছিলেন আর একজন প্রাণিতত্ত্ববিদ্। তিনি একটি পিঁপড়েকে পুষেছিলেন এবং সাত বছর বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। গুবরে পোকা, টিকটিকি, মাকড়ষা, শুঁয়োপোকা, মায় আরশোলা পর্যন্ত পোষার নজীর আছে।

ছদ্মনাম

বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে আজকাল ছদ্মনামের বাতিকটা যেন একটু বেড়েছে। অনেক নামকরা লেখকই একাধিক নামে লিখতে সুরু করেছেন। এ সম্বন্ধে রামধনুতে তোমরা আগেও পড়েছ। বিশ্বসাহিত্যে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁদের মধ্যেও কিন্তু এই ছদ্মনামের চল বড় কম নেই। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকজনের নাম নীচে দিচ্ছি। এঁদের আসল নাম বলতে পার? না পারলে পরপৃষ্ঠায় দেখ!

(১) জর্জ ইলিয়ট, (২) মেরি করেলি, (৩) জন গল্‌স্‌ওয়ার্দি, (৪) আনাতোল ফ্রাঁস, (৫) মার্ক টোয়েন, (৬) ও. হেন্‌রী, (৭) জুল ভার্ণ।

কে আগে গাড়ী চড়ল

আজকাল বড় বড় সহরে মোটরের ভিড়ে পথ চলাই দায়; পশ্চিমের কোন কোন বড় সহরে এখনও এক্কা, টঙ্গা প্রভৃতিও চলে কিন্তু কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ী ক্রমেই লোপ পেয়ে আসছে। মোটরের চল হওয়ার আগে এখানে অবশ্য নানা রকম চেহারার ঘোড়ার গাড়ী চলত। ছ্যাক্‌রা গাড়ী তো ছিলই, তা ছাড়া ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো, ফিটন, টম্‌টম্,—আরও কত কি। দু' ঘোড়ায় টানা জুড়িগাড়ী যখন রাস্তা কাঁপিয়ে চলত তখন তার মধ্যেও একটা মস্ত আভিজাত্য ছিল। তারও আগে কিন্তু ফ্যাশন ছিল কাঁধে-বওয়া পাল্কী, আর বড়লোকদের তান্‌জান। সাধারণ লোকে পারতপক্ষে গাড়ী চড়ত না। শোনা যায় বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম ঘোড়ার গাড়ী কেনেন চুঁচুড়ার নীলমণি হালদার। কলকাতার বাবুরা তাঁর দেখাদেখি পরে গাড়ী কেনা সুরু করেন। নীলমণি হালদারের গাড়ীর কোচম্যান ছিল এক সাহেব।

খোস গল্প

(সংগ্রহ)

দোকানদার: বাবু, বাবু, এক্ষুণি একবার দমকল আফিসে টেলিফোন করে দিন না!

বাবু: বল কি! কোথায় আগুন লাগল?

দো: আজ্ঞে, আমাদের কয়লার ডিপোতে।

বা: অঃ! তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও গিয়ে। আগুনেও কয়লার কিচ্ছু হবে না। আমাদের বাড়ীতে তো তুমিই কয়লা দাও, আজ পর্যন্ত কোন দিন তো তোমার কয়লা জ্বলতে দেখলুম না!

সমঝদার—আপনার ছবি তো শেষ হয়ে গেছে দেখছি, আর বাকি কি?

চিত্রকর—আসলটুকুই তো বাকি। ছবি বিক্রী করা।

* *

৫৬০-৬১ পৃষ্ঠার ছদ্মনাম: আসল নামগুলি পর পর এই রকম হবে: ১। মেরি য়্যান ইভান্স, ২। ইভা মেরী ম্যাককেব, ৩। জন সেনজন, ৪। জাকুই আনাতোল থিবল্‌ৎ, ৫। স্যামুয়েল ক্লিমেন্স, ৬। উইলিয়াম সিডনী পোর্টার, ৭। এম. ওলশ্‌উইজ্।

প্রবাদের ছবি: ৫৬১ পৃষ্ঠার—গাধা পিটিয়ে ঘোড়া। ৫৬৬ পৃষ্ঠার—দু' নৌকোয় পা।

খেলোয়াড়দের কাহিনী

—বিনু মানকড়—

অধ্যাপক শ্রীঅমলকুমার মিত্র, এম.এড্., সাহিত্যভারতী

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অল রাউণ্ডার বিনু মানকড়ের বর্ত্তমান বয়স চল্লিশের কোঠায়, কিন্তু বয়সকে তিনি থোড়াই কেয়ার করেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে একটানা পাঁচ দিনের ম্যাচে তিনি যে ভাবে খেলেন তাতে অনেক তরুণ খেলোয়াড়েরও তাক্ লেগে যায়। ১৯৩৭ সালে লর্ড টেনিসনের টিম ভারত সফরে আসে। সেই তখনকার বিনু এবং এখনকার বিনু—দু'জনে একই লোক। অন্ততঃ ক্রিকেটের প্রতি তাঁর অনুরাগ, একাগ্রতা ও সাধনা—সবই পুরোপুরি বজায় রেখেছেন তিনি, এবং পূর্ব্বেকার নিপুণতাও হারিয়ে ফেলেন নি একটুও।

বিনু মানকড় নবনগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং খুব অল্প বয়সেই ক্রিকেট খেলায় হাতেখড়ি হয় তাঁর। নবনগরের নাম তোমাদের কাছে অজানা নয় নিশ্চয়। ক্রিকেটের ইতিহাসে নবনগরকে চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছেন ভারতের দুই অমর খেলোয়াড়—কাকা ও ভাইপো, রঞ্জিৎ এবং দলীপ। ক্রিকেটের ব্যাট হাতে নিলেই বিনুর মনে পড়ে যেত বিশ্ববিখ্যাত এই দুই খেলোয়াড়কে। সঙ্গে সঙ্গে এক অনাস্বাদিত প্রেরণায় তাঁর মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠত। তিনিও সঙ্কল্প করতেন—আমিও একদিন ওঁদেরই মত নাম করব, জগতের ক্রিকেট-সভায় ভারতের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করব।" বালকের এই সঙ্কল্পের কথা তার কাকা জেনে ফেল্লেন একদিন। তাঁর কাছ থেকে বিনু পেতে লাগল প্রচুর উৎসাহ। ইংরেজ ক্রিকেট শিক্ষক ওয়েন্স্লীও তাঁর মধ্যে দেখতে পেলেন একজন প্রতিভাবান্ খেলোয়াড়কে। তিনি বিনুর ব্যাটিংএর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে লাগলেন; তাঁর সব রকম সমস্যায় সমাধান করতে এগিয়ে এলেন। তারপর বড় হয়ে, বোম্বাইতে এসে বিজয় মার্চ্চেণ্টের কাছে বিনু নানা বিষয়ে উপকৃত হন।

১৯৩৭ সাল থেকে বিনু মানকড় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলে আসছেন, এবং ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং তিনটি বিভাগেই তাঁর মত নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় বিরল। তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি প্রথম উইকেটে তাঁর এবং পঙ্কজ রায়ের এক সাথে ৪১৩ রান্ তুলে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করা। মনে আছে কোন্ খেলায়? মাদ্রাজে, ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ডের টেষ্ট ম্যাচে। মানকড় একলাই ২২৩ রান্ করেন।

মানকড়ের তিনটি ছেলে—অশোক, অতুল এবং রাহুল। মানকড়ের বিশেষ ইচ্ছে—তাঁর তিন ছেলে তাঁরই মত ক্রিকেট খেলায় ওস্তাদ্ হোক। এ জন্যই তো কখনও কোথাও কোন বড় খেলা থাকলে তিনি তাঁর তিন ছেলেকেই খেলা দেখাতে মাঠে নিয়ে যান। মানকড় গ্রীষ্মের সময় চলে যান ইংল্যাণ্ডে—ল্যাঙ্কেশায়ার লীগে ক্রিকেট খেলতে। অনেক ভারতীয় খেলোয়াড়ই ল্যাঙ্কেশায়ার লীগে ক্রিকেট খেলে অর্থ উপার্জ্জন করেন। মানকড় তাঁর স্ত্রী মনোরমা দেবী ও তিনটি ছেলেকেও নিয়ে যান ও-দেশে।

মানকড় খেয়াল ও রাগপ্রধান সঙ্গীতের খুব ভক্ত। অবসর সময় তিনি নাকি স্ত্রী ও ছেলেদের সঙ্গে তাসও খেলতে ভালবাসেন।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

প্রতি বছর এই সময়টায় তোমাদের হাতে অবসর থাকে প্রচুর, কিন্তু এ বছর মধ্যশিক্ষা পর্ষৎএর নতুন নিয়মে তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই বোধ হয় এখন পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। যারা স্কুল ফাইনাল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের তো কথাই নেই! তবু মনে হচ্ছে, তোমাদের মত ঐ ছাত্রজীবন যদি আবার ফিরে যাওয়া যেত! কবি নবীনচন্দ্র কি সাধে লিখেছিলেন—'হায় রে শৈশবকাল সুখের সময়!'

শিশুসাহিত্য পরিষদ্ থেকে ৺কবি ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে প্রতি বছরের শ্রেষ্ঠ ছেলে-মেয়েদের বইএর জন্য ফটিক স্মৃতি-পদক নামে একটি পদক দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এঁদের বিচারে শ্রীঅখিল নিয়োগী রচিত 'স্বপনবুড়োর শৈশব' বইখানি ১৩৬৩ সালের শ্রেষ্ঠ ছোটদের বই বলে স্থির হয়েছে। প্রথম বছরের এই সম্মান তাই শ্রীঅখিল নিয়োগীই পেলেন। শীঘ্রই একটি অনুষ্ঠানে এই পদক দেওয়া হবে স্থির হয়েছে। অখিল বাবু তোমাদের মত আমাদেরও—রামধনুরও একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তাঁকে আমরা এই সুযোগে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

যুগান্তরের "সব পেয়েছির আসরের" এবারে যুগজয়ন্তী উৎসব হ'ল। প্রতি বছর বার্ষিক উৎসবে এই আসর থেকে একজন বিশিষ্ট প্রবীণ সাহিত্যিককে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। এবারে এই সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়েছিল প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে। অনুষ্ঠান-সভায় বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন, ছেলেমেয়েরা তো ছিলই। সভাপতিত্ব করেন আর একজন প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক শ্রীযামিনীকান্ত সোম। যোগেন্দ্র বাবুও আমাদের এবং রামধনুর পরম হিতৈষী বন্ধু। তাঁকেও আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ভারত ও পাকিস্তান থেকে বহু আমন্ত্রণ-লিপি আমরা পেয়েছি। প্রত্যেককে পৃথক্ ভাবে জবাব দিতে পারলাম না—কিন্তু মনের মধ্যে তোমাদের সে স্নেহের ডাক জমা রইল।

এবারে তোমাদের চিঠির জবাব দেই।

শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—হ্যাঁ, একখানি নতুন বৈজ্ঞানিক রহস্য-উপন্যাসের কথা আমরাও ভাবছি। দেখা যাক্ কি হয়। শিশুসাহিত্যিক-পরিচিতি নিশ্চয়ই আবার বেরোবে। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কথা তো এবারেই দেওয়া হ'ল। রেডিও বোধ হয় তুমি নিয়মিত শোন না, তা হলে ও প্রশ্ন করতে না। শ্রীঅতুল সাহা (চণ্ডীপুর বালক লাইব্রেরী)—সন্দেশ, কৈশোরক, কৈশোরিকা এবং খোকাখুকু—এর কোনখানিই এখন নেই। প্রবাসীর ঠিকানা—১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। শ্রীমধুসূদন সেন (গোরক্ষপুর)—রামধনুর জন্য হাতে আঁকা ছবি বা নিজের তোলা ফটো

পাঠাতে কোনই বাধা নেই। উপযুক্ত হলে অবশ্যই তা প্রকাশিত হবে। তবে দু'টির মধ্যেই কিছুটা মৌলিকত্ব থাকা চাই। ছবি একরঙা হওয়া দরকার, রঙিন নয়। আবু কায়ছার (টাংগাইল)—রামধনু তোমার এত ভাল লেগেছে জেনে আমাদেরও খুব ভাল লাগছে। ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকের জন্য অবশ্যই লেখা পাঠাতে পার। ছবি, ফটো সম্বন্ধে তো আগেই লিখলাম। লেখনীবন্ধু-বিভাগে তোমার নাম তালিকাভুক্ত করা গেল। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের নৃমুণ্ডশিকারী ১২শ বর্ষের (১৩৪৫-৪৬), অমৃতদ্বীপ ১৩শ বর্ষের (১৩৪৬-৪৭) এবং রুণুটুনুর এ্যাডভেঞ্চার ২২শ বর্ষের (১৩৫৬) রামধনুতে বেরিয়েছিল। ওগুলো পাওয়া যাবে। শ্রীআনন্দগোপাল বিশ্বাস (ধর্মদা)—তুমি অনেক ভেবেচিন্তে প্রশ্ন করেছ মনে হচ্ছে। সাইকেলের টিউবের যেখান দিয়ে বাতাস পোরা হয় তা যতই জোরে আঁটা থাক, নিখুঁত ভাবে আঁটা কোন রকমেই সম্ভব নয় (এক অঙ্কের বইএ ছাড়া)। কাজেই খুব ক্ষীণ ভাবে হাওয়া বেরুতে বেরুতে একদিন তা বেশ খানিকটা কমবেই। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ডাকাত কে? এর উত্তর বোধ হয় 'মানুষ'। শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায় চৌধুরী (সিউড়ী)—রামধনু বাংলা মাসের গোড়ার দিকেই বার করার চেষ্টা করা হয়,—নানা অপ্রতিরোধ্য কারণে মাঝে মাঝে মাসের শেষ দিকেও বেরোয়। ভবিষ্যতে ভাল লেখক হতে হ'লে লেখার চর্চা তো চাই-ই, তা ছাড়া ভাল ভাল লেখকদের লেখাও খুব ভাল করে পড়া উচিত। শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ (নিউ দিল্লী)—পৌষের ধাঁধার কথা লিখেছ। তৈরী বলতে সত্যি যদি 'তৈরী' করাই বোঝায় তা হলে আর ধাঁধা কি? কথার মারপ্যাঁচই তো ধাঁধার প্রাণ! তোমার উত্তরে 'কামরাঙা'ই বাদ সেধেছে। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সরদার (চন্দনেশ্বর)—মানুষ কি ভাবে 'মানুষ' হতে পারে? সত্যিকার মানুষের যা গুণ তাই অর্জন করলে।

আজ এখানেই ইতি। প্রীতি ও স্নেহসম্ভাষণ জেন।— তোমাদের সম্পাদক মশাই।

—ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক—

ঋতুরাজ

শ্রীরত্নাবলী ভট্টাচার্য্য

এল সোনালী রোদেতে ভরা মিষ্টি সকাল,
সুরু জংলা ফুলের ফোটা— টুকটুকে লাল।
সেই সবুজ পাতার গায়ে রবির আলো,
আজি কে আসি মুছিয়া দিল রাতের কালো।
তাই গহন বনের মাঝে জটলা পাখীর,
বুঝি ভেঙে দিল সকলের সুপ্তি আঁখির।

ঐ ধবল সবুজ পাতা শাখায় শাখায়,
মধু বয়ে আনে মধুকর পাখায় পাখায়।
শুধু কৃষ্ণচূড়ারা মাখে রক্ত আবীর,
আনে ছন্দ কিসের তারা মনেতে কবির।
জাগে ধরার বুকেতে এ কি হাসি-হিল্লোল,
শোন ঋতুরাজ এল জুড়ে পৃথিবীর কোল।

"যে গল্প জানা নেই"—এবারেও যে ক'টি লেখা এসেছে তার কোনটিই ছাপবার মত হয় নি। আরও ভাল লেখা চাই তোমাদের কাছে।

ভ্রম সংশোধন: মাঘ সংখ্যায় 'জাভার মৃত্যুগুহা' প্রবন্ধে ৩য় প্যারাগ্রাফের গোড়ায় 'নেপালের' জায়গায় 'নেপ্‌ল্‌স্‌' হবে। ''গ্রোচট্টা' কথাটা হবে 'গ্রোট্টো'।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১—খলসে, ২—সোল, ৩—কাৎলা, ৪—আড়, ৫—পুঁটি, ৬—কই, ৭ ফলি, ৮—বান, ৯—বেলে, ১০—ইলশে, ১১—মাগুর, ১২—মৌরগেল, ১৩—ভাঙ্গন, ১৪—রুই, ১৫—ভেটকি ১৬—বাচা, ১৭—বাটা, ১৮—পাপতা, ১৯ ল্যাঠা, ২০—চিতল, ২১—চাঁদা, ২২—খয়রা।

উত্তরদাতাদের নাম:- সুজাতা, ছনু, লুলু ও খোকন ভট্টাচার্য্য (সাঁত্রাগাছী); বারীন, আলোক, মীনাক্ষি, মঞ্জুশ্রী, শেফালিকা দত্ত (কলিকাতা-২); কল্যাণ ও দিলীপ সমাজদার (কলিকাতা-১২); শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতিরেখা, বিন্দুবাসিনী দেবী (রাঁচী), যমুনা, শুক্লা, বাবা, বাচ্চাকাকা, কুট্টিকাকা, জাহ্নবী, ঘুঘনে, দীপ, ভীম, মা-কাকীমা (ধুবড়ী); দিলীপ, রমলা, মণ্টু, সণ্টু, জণ্টু, অশোক, বীরেন, কাকা (নিউ দিল্লী); বৃন্দাবনচন্দ্র সরদার, গুণসিন্ধু (চন্দনেশ্বর); সুগত সেনগুপ্ত (কলিকাতা-২৬); রণেন্দ্র, রবীন্দ্র, রণজিৎ, অজিত (ঘৈরালি); মুরারিমোহন মণ্ডল (চন্দননগর). অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর); বিবেকানন্দ এক্সারসাইজ ক্লাব (একব্বারপুর); সুচেতা ও রত্নাবলী ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা ২৫); বিজলী, মণ্টু, দুলাল, গালন, কাশী (উচলপুকুরী)।

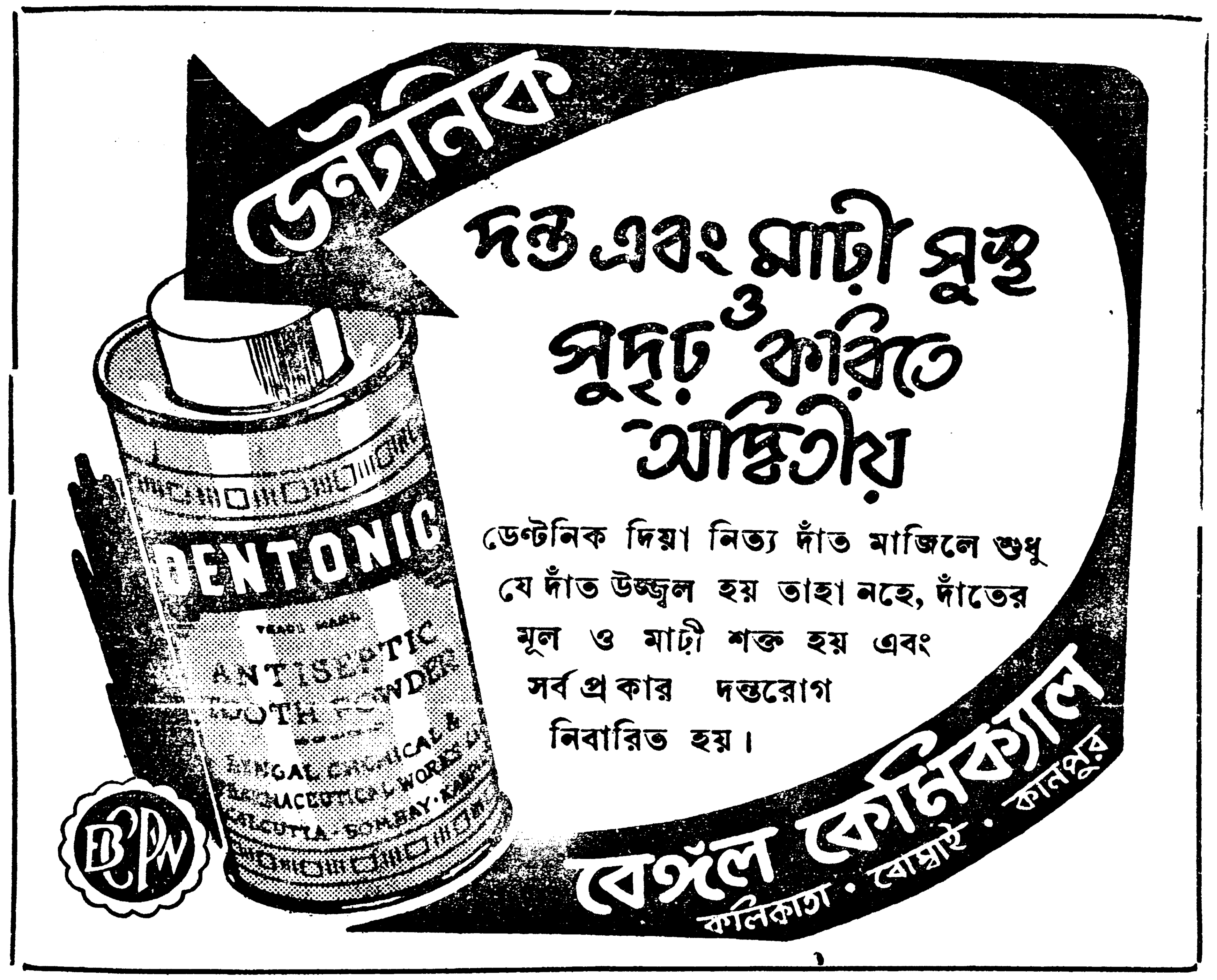

নূতন ধাঁধা

শ্রীরাধারাণী দেবী

১। খবর গোপন করাই আমার স্বভাব, আর এই ব্যাপারেই সবাই আমায় কাজে লাগায়। এজন্য তারা আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পিষে মারে। আমায় চেন কি ?

২। দুনিয়ার সবাই তার মা'র কাছে আদর পায়, কিন্তু আমার এমনই বরাত, মা আমাকে ছুঁলেই আমার মৃত্যু হয়। অন্ততঃ লোকে তাই বলে। কিন্তু সত্যি কি তাই ? মৃত্যু হলেও মা র সঙ্গেই তো আমি মিশে এক হয়ে যাই। আমায় চিনতে পারছ ?

৩। জলের কাছে না গেলে আমার দেখা পাওয়া ভার। শুধু তাই নয়, মা আর মেয়ে একত্র এলে তবেই আমি দেখা দেই। বল তো কে আমি ?

লে খা চা ই

লেখা চাই

অভিনব কিশোর-মাসিক ; বার্ষিক সডাক ২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১।০, প্রতি সংখ্যা ৵০। কার্ত্তিক (৭ম) সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে "যেই ভকত, সেই জানে" শিশু-উপন্যাস বাহির হইতেছে। নবীন লেখক-লেখিকাদিগকে লিখিতে উৎসাহ দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। ছোটদের 'লেখা' ব্যতীত, বড়রাও লিখিয়া থাকেন। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমলকুমার মিত্র. যাদুশ্রী শঙ্কর দাস. প্রভৃতিও ইহাতে লেখেন। আগামী বৈশাখ হইতে ২য় বর্ষ আরম্ভ হইবে, কলেবর বর্দ্ধিত হইবে ও বার্ষিক চাঁদা ৩ টাকা হইবে। এখনই গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইলে, অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না।

ঠিকানা :— শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, বি-টি, সম্পাদক, "লেখা চাই", দেবালয়—২৪ পরগণা।

শ্রীচরণেষু

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।
* ষাণ্মাসিক চাঁদা ১৷৷০ এবং বার্ষিক ৩৲। যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া চলে।

অন্যান্য বিষয়ের জন্য পত্রালাপ করুন।

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি, রাজাকালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫
ফোন : ৫৫-৪০৪৬

চ য় ন

১৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ (হিন্দুস্থান মার্টের সন্নিকটে)
সব রকম বই—বিশেষ করে রামধনু পত্রিকা (যে কোন সংখ্যা) এবং রামধনু কার্যালয় থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বই আমাদের কাছে পাওয়া যাবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ. অনুবাদ

STATEMENT IN FORM IV AS REQUIRED BY RULE 8 OF THE REGISTRATION OF NEWSPAPERS (Central) RULES, 1956

Name of the Newspaper···Ramdhanu.

1. Place of Publication···16, Townshend Road, Calcutta-25.
2. Periodicity of its publication··· Monthly.
3. Printer's Name···Kshitindra Narayan Bhattacharyya.
   Nationality·· Indian.
   Address 16, Townshend Road, Calcutta-25.
4. Publisher's Name···Kshitindra Narayan Bhattacharyya.
   Nationality···Indian.
   Address···16, Townshend Road, Calcutta-25.
5. Editor's Name···Kshitindra Narayan Bhattacharyya, M.Sc.
   Nationality·· Indian.
   Address···16, Townshend Road, Calcutta-25.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital···Kshitindra Narayan Bhattacharyya.
   16, Townshend Road, Calcutta-25.

I, Kshitindra Narayan Bhattacharyya, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date···1. 3. 58.

Sd. Kshitindra Narayan Bhattacharyya
Signature of Publisher.

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্বত্র সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন-২২-৭২৪৩

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥• আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥• টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কার্য্যালয়
১৩১বি, রসা রোড
কলিকাতা-২৬

সম্পাদক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বিএ

সুরিনা স্পেশাল কালি

আপনার কলমের আয়ু অক্ষুণ্ন রাখে!

সুপ্রীম কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ • কলিকাতা

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে

অতুলনীয়

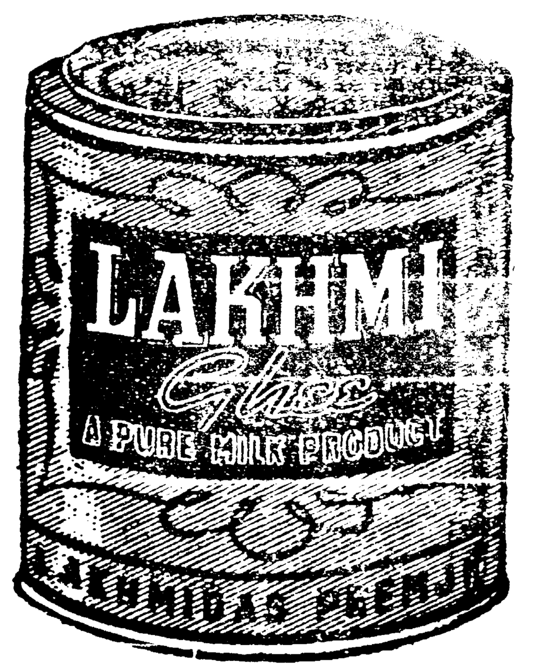

লক্ষ্মী ঘি

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্ব্বত্র সমাদৃত

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন-২২-৭২৪৩

Regd. No. C—1641

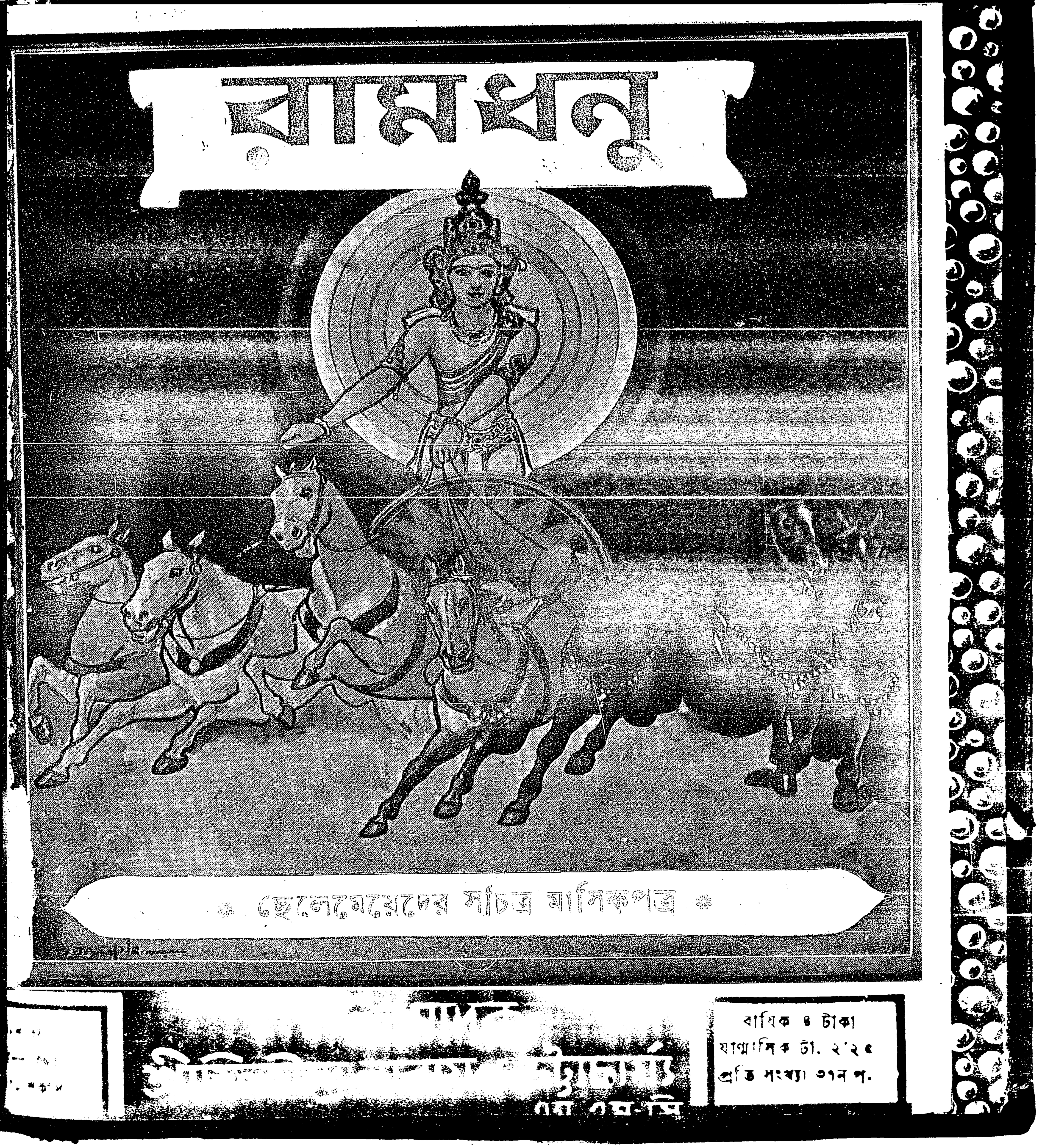

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন–৩৫–২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

৵২৷৷০, ৵৫, ৷৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ– শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস – ২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

ছোটদের ভাল ভাল বই ঃঃ নামকরা বই

নলীগোপাল চক্রবর্ত্তীর—

কাঠ ও কাঠের কাজ	১৷৷০
বাঁশ, বেত, পাতা ও সোলার কাজ	১৲
তন্তুশিল্পের কাজ	১৲

আলোক চক্রবর্ত্তীর—

মনসামংগল	১৲
চৈতন্যমংগল	১৲
কুমারসম্ভব	১৲

শ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তীর—

রঘুবংশ	১৲
রাণী রাসমণি	১৲
জাগ্রত মেদিনী	১৲

ছোটদের অভিনব মাসিক পত্রিকা।

চয়নিকা

১৮ বছরে পড়িল ঃ বার্ষিক মূল্য
মাত্র ৩৲

যে কোন মাসে টাকা পাঠালেও বৈশাখ থেকে পত্রিকা নিয়ে গ্রাহক হতে হয়। নমুনার জন্য ৵০ আনার ডাক টিকিট অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যা মাত্র ।০ আনা। অভিজ্ঞ পরিচালকবর্গ ও সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত।

ভারতী বুক ষ্টল

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনের মতামতে :

কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?

স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,

'থিনের' মধ্যে ; গুণে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,

সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ

বাহির হইল বাহির হইল

প্রত্যেক কপি—।৶৹

শুকতারা বার্ষিক ৪৲

ফাল্গুনে ১০ম বর্ষে পড়িল

DICTIONARIES
by
A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
ঐ পাতলা কাগজে	৪৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৫৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২॥০

Bengali to Bengali

নূতন বাংলা অভিধান	২০
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲

পূজাবার্ষিকী

কয়েকখানি নাম দিলাম

১। নব পত্রিকা — ৪৲
২। জয়যাত্রা — ৪৲
৩। দেবালয় — ৪৲
৪। ইন্দ্রধনু — ৪৲
৫। বসুধারা — ৪৲
৬। পরশমণি — ৪৲

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই

=প্রহেলিকা সিরিজ=
[৪৯ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কুমারিকা সিরিজ=
[১২ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ৸০

=বিশ্বচক্র সিরিজ=
[৫৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥০

=বিচিত্রা সিরিজ=
[৩ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ২৲

=জীবন-চরিতাবলী=
[প্রায় ১০০ খানি বই]

=বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ=
[১০ খানি বই]

=ছেলেদের নাটক=
[২২ খানি বই]

=কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ=
[২৪ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১৲

=কৃষ্ণা সিরিজ=
[৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=অনুপমা সিরিজ=
[৫ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=পিরামিড সিরিজ=
[২৬ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ১॥০

=জনশিক্ষা গ্রন্থমালা=
[১৭ খানি বই]
প্রত্যেকখানি ॥৶০

=পৌরাণিক গল্প=
[প্রায় ৪০ খানি বই]

=মেয়েদের নাটক=
[৪ খানি বই]

এবার পূজায় বাহির হইল

১। যত হাসি ততই মজা—শিবরাম চক্রবর্ত্তী— ২৲
২। পূজার দিনের উপহার—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲

এ ছাড়া

উপন্যাস, ভ্রমণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চার, শিকার-কাহিনী, রূপকথা ধর্ম্মগ্রন্থ, উপনিষদ্‌ গ্রন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর ও সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থমালা বাহির হইয়াছে।

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

— তিন সত্যি —

মন্দ জিনিষ দেখব না, মন্দ কথা শুনব না, মন্দ কথা বলব না।

আলোকচিত্র—শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

৩০শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৬৪ { ১২শ সংখ্যা

চিরদিনের বোনটী

৺ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরদিনের বোনটী!
চৈতী ভোরের কনকচাঁপা
সোনায় ভরা মনটী।

অসীম নীলের রূপটী!
বোন হয়ে মোর ঘরে এলো
স্নেহে কোমল মুখটী।

ফুলের পরী আস্‌লো;
ভাইটী ব'লে চুমো দিয়ে
সোনার হাসি হাস্‌লো।

পড়লো সুধা উপচে ;
ছোট্ট বুকের স্নেহের ধারায়
ফুট্‌ল নতুন রূপ যে !

ডাকছে সবাই—বোন রে।
পাখীর গানে উঠ্‌ল দুলে
সবুজ বনের কোণ রে।

দুষ্টু হাওয়ার দোলটী—
নতুন খেলায় চাইছে যে আজ
মিষ্টি বোনের কোলটী।

কেউ বাকি আর নাই রে—
বোনের কাছে আস্‌ছে ছুটে
তিন ভুবনের ভাই রে !

চিরদিনের বোনটী।
স্নেহে গড়া— মধু-ভরা
কনকচাঁপা মনটী।

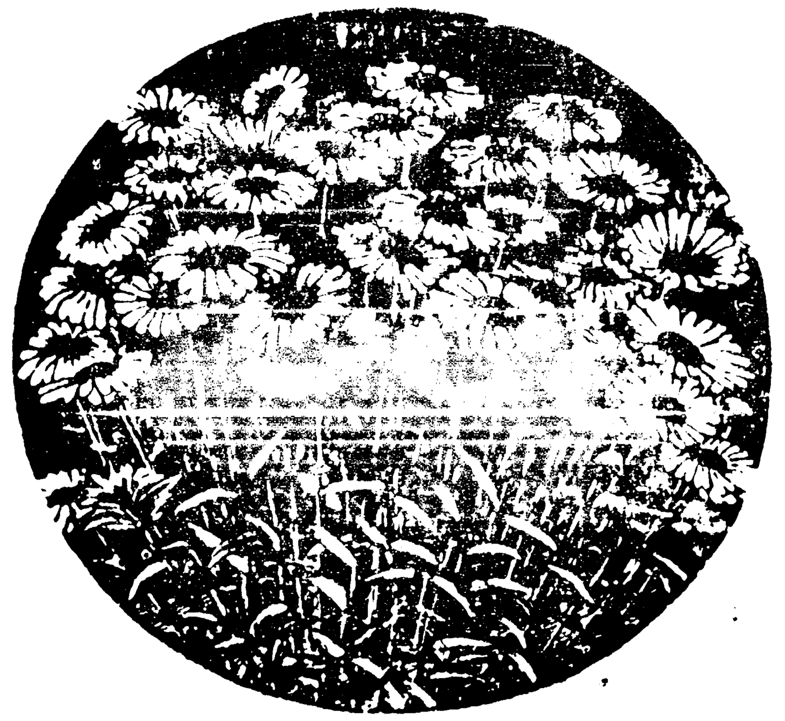

তুষারতীর্থ শ্রীকৈলাস

তীর্থঙ্কর

—জলজিবি থেকে গার্ব্বিয়াং—

কৈলাস দর্শনে রওনা হয়ে পথে জলজিবি পর্য্যন্ত এসেছি। সে গল্প আগের বারেই বলা হয়েছে। এর পরের গন্তব্য স্থল বালভাকোট। চড়াই ও উৎরাই ভেঙ্গে আমাদের বালভাকোটে এসে পৌঁছতে বেলা দু'টো বেজে গেল। তখন মাথার উপর যেমন প্রখর রোদের আগুন, তেমনি পেটের মধ্যে জ্বলছে ক্ষিদের আগুন। একটি দোকানের সামনে এসে আমরা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম। একটু অপেক্ষা করতেই আমাদের পিছনের সঙ্গীরা এসে গেলেন। তখন ব্যস্ত হয়ে পড়লাম খাদ্যের সন্ধানে। কাছাকাছি খোঁজ করে বিশেষ কোন খাদ্যবস্তু পাওয়া গেল না। তখন, সেই অবসন্ন দেহ নিয়েই, আবার শুরু হ'ল পথ চলা। শুনলাম এখান থেকে মাইল খানেক গেলে আহার্য্য মিলতে পারে। মা ভৈঃ। দুর্গমের জয়যাত্রাকে যারা বরণ করে নিয়েছে তাদের ত' ব্রতই "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

ঠিক এই সময় কি করে যে ফের উঠে সেই চড়াই-উৎরাইসঙ্কুল পার্ব্বত্য পথে চলতে পেরেছিলাম তা বাবা কৈলাসপতিই জানেন।

সুখের বিষয়, আমাদের বালভাকোটের সীমা ছাড়াতে হয় নি। বেলা যাবার আগেই আমরা এমন একটি লোকালয়ের কাছে এসে পড়লাম যেখানে খোঁজ করতে কিছু খাদ্যবস্তু পাওয়া গেল। ঝরণার জলে শরীরের উত্তাপ খানিকটা শীতল করে রান্নার যোগাড়ে লেগে গেলাম।

এখানকার পাহাড়ী দৃশ্য খুব মনোহর লাগলো। উপরের পাহাড়গুলোয় ছায়া, নীচের পাহাড়ের চূড়ায় বিলীয়মান অস্ত-আলো দেখে সেদিন মনে হয়েছিল পার্ব্বত্য দেবতা শঙ্করের চরণে পার্ব্বতী উমা বুঝি এমনই করেই নত হয়ে প্রণাম জানান। তা যাই হোক, এই হরগৌরীর পায়ের তলায় থেকে নিরাপদ-নিশ্চিন্তে আমাদের রাত্রিটা কেটে গেল।

উষায় ঘুম ভেঙ্গে গেল পাখীদের কলরবে। আবার পথ চলা সুরু। এখানে একটা নতুন জিনিষ দেখলাম। মালপত্র বইছে ঘোড়ার বদলে ভেড়া ও বকরীর পাল। আরও চোখে পড়লো, পথের পাশে মক্কার ক্ষেত আর পশমের শিল্প। পথ চলতে চলতে পাহাড়ীরা কি সুন্দর ভাবেই না পশমের গুটি থেকে এক একটি সরু পশমের সুতো বুনে চলেছে। বেলা দুপুর নাগাদ আমরা অনেকখানি উৎরাই ডিঙ্গিয়ে কালিকা গ্রামে এসে পৌছলাম।

আমাদের গাইড্ কিচ্ খাম্পা

চোখের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা কালী নদী। তার উপরে কাঠের একটি পুল। আশেপাশে ভোটিয়াদের ঝোপড়ী: আমরা ভবানীপ্রসাদের পরামর্শ মত একটি দোকানের দোতলায় আশ্রয় নিলাম। সেদিন ভবানীপ্রসাদের রাঁধা তরকারি আমাদের সকলের রসনাকে তৃপ্তি দিল।

আমাদের পরবর্ত্তী লক্ষ্য ধারচূলা। পথে হঠাৎ একখণ্ড মেঘ এসে খানিকটা বৃষ্টি দিয়ে আমাদের যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটালো। উৎরায়ের পথে একটু থেমে যেতে হ'ল।

সূর্য্য অস্ত যায় যায়। দূর থেকে ধারচূলা সহর দেখা যাচ্ছে। কিছু বস্তি ও কিছু পাথরে তৈরী দোতলা বাড়ী। তবে শহরের আয়তনটি বেশ বড়। এখানে একটি চেক-পোষ্ট ও পোষ্ট অফিস রয়েছে। সহরের একপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কালী নদী। এর ঠিক বিপরীত দিকে নেপাল রাজ্যের সীমানা।

চেক-পোষ্টের অফিসার আমাদের রাত্রিকালীন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন। ডাকবাংলোয় আমরা ইচ্ছা করেই গেলাম না—কিছুটা দূরে বলে। লোকালয়ের মধ্যে নিশ্চিন্ত বিরামে রাত্রিটা কেটে গেল। পরদিন সকালে স্থানীয় লোকদের মুখে শুনলাম, আমাদের যাত্রাপথে লিপুলেক পাস বন্ধ রয়েছে সঙ্কটের সম্ভাবনায়। তখনও পর্য্যন্ত সরকার গিরিপথটি উন্মুক্ত করে দেন নি। তাই বাধ্য হয়ে ধারচূলায় একটি দিন থেকে যেতে হ'ল।

এখানে নেপাল-যাত্রীদের কালী নদী পার হওয়ার অদ্ভুত দৃশ্যটি আজও চোখের সামনে ভাসছে। নদীর এপার থেকে ওপারে বিস্তৃত আছে একটি দড়ি। সেই দড়ি ধরে লোক ক্রমাগত এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে আর ওপার থেকে এপারে আসছে। অদ্ভুত কৌশলে একটা তে-কাঠার মধ্যে নিজের শরীরটাকে উপুড় করে বেঁকিয়ে নিয়ে সামনে হাত-পা চালিয়ে দড়িটি ধরে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হয়। অথবা এপারে ওপারে দু'টি দু'টি চারটি লোক দাঁড়িয়ে থেকে দড়ির সাহায্যে টানাটানি করেও পার করে নেয়। তবে তার জন্য দক্ষিণা দিতে হয় এক টাকা।

পরের দিন চেক-পোষ্টে গিয়ে আমাদের নাম-ঠিকানা লেখাতে হ'ল। চেক-পোষ্ট অফিসারটি আমাদের সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর অতিথিবৎসলতায় আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

এখানকার আর একটি স্মরণীয় ঘটনা এক সিংহলবাসিনী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে পরিচয়। কি অদ্ভুত ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁর! তিনি বৌদ্ধ আর আমরা হিন্দু, তবু তিনি একজন স্ত্রীলোক হয়ে কত বাধার বিন্ধ্য ডিঙিয়ে এত দূর এগিয়ে এসেছেন মানস-কৈলাস দর্শন করবার উদ্দেশ্যে!

এইভাবে পূরো একটা দিন ধারচূলায় কাটিয়ে আবার আমরা অগ্রসর হলাম। ধারচূলা থেকে তপোবন মাইল দুই হবে। এখানে এসে দেখলাম একটি সুন্দর আশ্রম শূন্য পড়ে রয়েছে। আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাতা অনুভবানন্দজীর অভাবে আশ্রমটিকে পাখীশূন্য খাঁচার মতই দেখাচ্ছিল। বেলা চারটেয় আমরা তাওয়াঘাটে এসে পৌছলাম। ধারচূলা থেকে তাওয়াঘাট পর্য্যন্ত পথটি যেমন সঙ্কীর্ণ তেমনি দুর্গম। কিন্তু স্থানটির দু' দিক্ দিয়ে কালী ও ধৌলী গঙ্গা এসে মিলিত হওয়ায় অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পেয়েছে। আমরা পি. ডব্লিউ. ডি-র [illegible]ন গড়া বাংলোয় এসে আশ্রয় নিলাম

পরদিন ভোর বেলায় উঠে পড়ে আবার আমরা রওনা হ'লাম পাঙ্গুর উদ্দেশ্যে। পাঙ্গুর পথে কুলিরা সাবধান করে দিল, "পাঙ্গুকা চড়াই, কাবুলকা লড়াই।" বুঝলাম পথ বড় দুর্গম। মোট দূরত্ব মাত্র চার মাইল। কিন্তু এই পথটুকু চলতেই যেন দশ মাইল চলার পরিশ্রম হয়।

দুপুরের একটু আগেই আমরা সোসা ব'লে একটি ছোট গ্রামে পৌছে গেলাম। এখানে নারায়ণ স্বামীর আশ্রমে আমরা আশ্রয় পেলাম। একজন ব্রহ্মচারী আমাদের সমাদরে ডেকে নিয়ে গিয়ে আশ্রমে তুললেন।

আশ্রমটি একটি পার্ব্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত। জাঁকজমক বিশেষ কিছুই নেই। একটি মন্দির, আর মন্দিরের সামনে একটি বড় বাড়ী। এই বাড়ীটারই কয়েকখানি ঘর নিয়ে পোষ্ট অফিস, লাইব্রেরী প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। এর এক কোণে মধুমক্ষিকা পালনের ব্যবস্থা আছে। তারপর অতিথিশালা। আশ্রমের সমস্ত আয়তনটি ফল ও ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা। আশ্রমটি দেখে, কি জানি কেন, আমার বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠের কথা মনে পড়ে গেল। ব্রহ্মচারী যখন আমাদের ঘরের পর ঘর দেখিয়ে মন্দিরের সামনে উপস্থিত করলেন তখন তাঁর আরতির সময় হয়েছে। তিনি আমাদের সেই কথা জানালেন।

গাব্বিয়াং
কৈলাসের পথে ভারতের সর্ব্বশেষ সীমান্ত

মন্দিরের স্থাপত্য দেখে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির ভিতর দিকের গঠনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সাদৃশ্য আছে বটে। মন্দিরের মধ্যে নারায়ণের মূর্ত্তি বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেকেলে ধরণের একটি বৃহৎ দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছিল। প্রদীপের আলোকে সব কিছু স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না।

ব্রহ্মচারীর নির্দ্দেশে আমরা চারজন বসে পড়লাম। তিনি আরতি শুরু করলেন ও ভজন গাইতে লাগলেন। এই আরতি ও ভজন প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে চললো। সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য উপত্যকায় সেদিনকার ধূপগন্ধ-সুরভিত, ভজনগান-মুখরিত শুচি-সন্ধ্যার কথা কখনও ভুলব না। এর পর সুরু হ'ল তাঁর আতিথিসৎকার। এখানে এসেই আমরা প্রথম হিমালয়ের ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। উত্তর মেরু কি দক্ষিণ মেরুতে সব সময়ে যে ঠাণ্ডার ভাব বজায় থাকে হিমালয়ের উচ্চ থেকে উচ্চতর প্রদেশে সেই রকম ঠাণ্ডা পাওয়া যায়।

একটানা ঘুম দিয়ে রাত্রি কাটিয়ে প্রত্যূষে উঠলাম ব্রহ্মচারীর ডাকে। চেয়ে দেখি সামনে চা উপস্থিত। একেই বলে অতিথিসেবা। আমরা বোধ হয় সমতল বাংলার কলকাতা সহরেও লোক'কে এমন করে সেবা-যত্ন করতে পারি না।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী আমাদের সমস্ত আশ্রমের ও তার প্রত্যেকটি

খুঁটিনাটি জিনিষের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিলেন। আশ্রমসীমার মধ্যেই একটি ছোট্ট কুঠিতে নারায়ণ স্বামী থাকতেন। সেটি এখনও যথাযথ ভাবে বজায় রয়েছে। তাই দেখে ভাবছিলাম, যাঁর নিজের বাসগৃহ এত ছোট ছিল তিনি কেমন করে গড়ে তুললেন এত বড় একটা কলেজ! এঁরা পরমাত্মা দর্শন করেছেন কিনা বলতে পারি না— তবে এঁদের মহাত্মা বলা যায়।

পূরো একটি দিন নারায়ণ স্বামীর আশ্রমে কাটিয়ে আমরা ফের সদলবলে অগ্রসর হলাম। এবার আমাদের যাত্রাপথ সিরিখা গ্রামের পাশ দিয়ে জিপ্তি, মাল্‌পা হয়ে চলে গেছে গার্ব্বিয়াংএর দিকে। পথের ধারে ধারে আপেল, ন্যাসপাতি, আখরোটের গাছ। গাছগুলি ফলে ভরা। বেলার শেষাশেষি আমরা জিপ্তিতে গিয়ে পৌছালাম। সে রাত্রে সেখানেই বিশ্রাম।

পরদিন সকালে আবার শুরু হল পথ চলা। এবার লক্ষ্য মাল্‌পা। পৌঁছতে বেলা বারোটা বেজে গেল। জিপ্তি থেকে মাল্‌পার রাস্তা যেমন সংকীর্ণ, তেমনি চড়াই-উৎরাই-সঙ্কুল। মাল্‌পায় লোকজনের বাস বিশেষ নেই,—পাহাড়ের গায়ে গায়ে দেখা যায় কতকগুলি গুহা। এখানকার লোকে গুহাকে বলে ওড়িয়ার। সাধু-সন্ন্যাসীরা এই সব ওডিয়ারে আশ্রয় নেন। দরিদ্র দেশ। খাদ্যবস্তু কিছুই প্রায় পাওয়া যায় না।

পরদিন সকালে দারুণ ঠাণ্ডার মধ্যে উঠে আমরা বেরিয়ে পড়লাম গার্ব্বিয়াংএর উদ্দেশে। দুপুর নাগাদ বুদিতে এসে একটু বিশ্রাম ও আহারাদি করা গেল। তার পর আবার উৎরাইএর পথে হোঁচট খেতে খেতে বেলা তিনটে নাগাদ গাব্বিয়াংএ এসে পৌছান গেল। এ পথে এই গ্রামটিই ভারতের সর্ব্বশেষ সীমান্তে অবস্থিত।

কেশকলাপ

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

সম্প্রতি মাথা নিয়ে আমি বড়ো গোলমালে পড়েছি। হ্যাঁ, নিজের মাথার কথাই বলছি। না, না, মাথার ভেতরে কোনো গোলমাল নয়, মাথার বাইরের দিকের কথা হচ্ছে। পোষাকী বাঙলায় যাকে কেশসৌন্দর্য বলে, সেটি বজায় রাখতে গিয়ে আমাকে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হ'তে হচ্ছে।

আমার চুলের একখানা বর্ণনা দেবো? কালো কুচকুচে চুল ঘন, কোঁকড়ানো। যে দেখে সে-ই বলে—হ্যাঁ, মাথা বটে একখানা! ও-চুল সোনার চিরুণী দিয়ে আঁচড়াতে হয়। বাজি রেখে বলতে পারি আমি যদি মেয়ে হ'য়ে জন্মাতাম তো এই চুলের জোরেই আমার রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হ'তো। কিন্তু হায়, বিধাতা আমাকে মেয়ে রূপে পৃথিবীতে পাঠান নি। মেয়ে হ'লে আমার আর দুঃখ ছিলো কী? মেয়েদের তো চুল ছাঁটাতে হয় না!

পৃথিবীতে কোনো সুখই অবিমিশ্র নয়। সব সুখের সঙ্গেই কিছু-না-কিছু দুঃখের যোগ আছে। যেমন, আমার এই কেশসুখ। তার সঙ্গে কোন্ দুঃখ?

বলছি। ধীরেসুস্থে সেই শোকসংবাদ বলছি। শোকের কাহিনী ধীরে-সুস্থে বলাই প্রশস্ত।

কলকাতায় ইটের সেলুন দেখেছো? ফুটপাথের পাশে ইট পেতে নাপিত ভায়া ব'সে আছে। পাশে যন্ত্রপাতির বাক্স। মুখে অনর্গল বক্তৃতা দিচ্ছে। তা ওদের কারো সামনে কি আমার মাথা এগিয়ে দেওয়া উচিত?

কিন্তু তা-ও দিয়েছিলাম একবার। সেবার নাপিত ভায়া বললো,—কী রকম ছাঁট দেবো বলুন? জামাই-ছাঁট দেবো? নাকি দশাচল হবে?

আমি জামাই-ছাঁটও চাই না, দশাচলও চাই না। চাই দশ আনা-ছ'আনা ছাঁট। নাপিত ভায়াকে সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলাম। কোথায় কাঁচি চালাতে হবে, কোথায় ক্লিপ, কেমন কায়দায় ছাঁটতে হবে। নাপিত ভায়া হাসলো। বললো, জলের মতো পরিষ্কার বাবু! বসুন। পনেরো মিনিটে সেরে দিচ্ছি।

নাপিত ভায়া কথা রেখেছে। পনেরো মিনিটেই সে সেরে দিয়েছে। আমার চুলের দফা।

নাপিত ভায়ার ছোটো আয়নায় নিজের চুলের চেহারা দেখে আমি ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছি। এই কাকে-ঠোকরানো মাথা নিয়ে আমি মনুষ্যসমাজে কেমন ক'রে মুখ দেখাবো? কেমন করে ট্রামে-বাসে উঠবো?

আমার কান্নায় নাপিত ভায়া বিগলিত হ'লো। ঝট্ ক'রে বাক্স থেকে ক্ষুরখানা টেনে বের করলো। ক্ষুর টেনে চুলের বংশ সাফ করে দিলো। ন্যাড়া মাথার আবার দুঃখ কী? আমি আর কাঁদবো কেন?

নাপিত ভায়া হাসলো। বললো, চুল আর টাকা, থাকলেই দুঃখ। চুল আপনার একেবারে নির্মূল করে দিলাম। যে-ক'দিন না গজায় সে-ক'দিন নিশ্চিন্তি। খান, খান দান, বগল বাজান। একটা কথা বলি বাবু! চুল-দাড়িই বলুন আর বিষয়-আশয়ই বলুন, মায়া পড়ে গেলে সবই সমান, সবই দুঃখ-দুর্দশার হেতু, সবই মায়ার খেলা। একটু চিন্তা করে দেখবেন। লাখ কথার এক কথা বলে দিলাম বাবু! মনে রাখবেন। কেশসৌন্দর্যের কথা বলছেন? কার কেশ, কিসের সৌন্দর্য? মায়া, সবই মায়া! ঠাকুর বলতেন—

ন্যাড়া মাথা নিয়ে আমার দিন কেটে যেতে লাগলো, কেন না পরম দুঃখীরও দিন কাটে। আহারে রুচি নেই। ঘুম হয় না ঠিক মতো। ঘুমোলেও শান্তি নেই। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি, শত শত ক্ষুর নিয়ে হাজার হাজার নাপিত তেড়ে আসছে। চুল গজালেই আবার নির্মূল করে দেবে। এ কি বিপদে পড়লাম ভগবান্!

ন্যাড়া মাথা কালো টুপিতে ঢেকে জনসমাজে ঘুরে বেড়াই। চিত্তে সুখ নেই। মুখে হাসি নেই। নাকে নিশ্বাস বয়, কিন্তু ওটুকুই বা আর কেন?

আমাদের আপিসে অমল রায় বলে এক ভদ্রলোক আছেন। মোটা মাইনে পান। অক্লান্ত ভাবে সকলকে উপদেশ দেন। অমল রায়কে আপিসে কেউ কেউ 'পিসীমা' ব'লে ডাকেন, কেন ডাকেন আমি জানি না। আমি যতদূর জানি, কোনো পুরুষ মানুষ কক্ষণো কারো পিসীমা হ'তে পারেন না। সে-পথ বিধাতাই বন্ধ করে রেখেছেন। নিষ্ঠুর বিধাতা!

অমল রায়ের মাথাজোড়া টাক। টাকের চেহারা যে ও রকম প্রচণ্ড হ'তে পারে তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। সে টাকে সরষে রাখলে অবলীলায় গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। সে-টাক বেলের মতো, হাতের তালুর মতো, পায়ের তলার মতো, পালিশ-করা মেঝের মতো। ও-টাক দেখলে দুর্ভাবনায় চুলের তেলের কারবারীর মাথায়ও পলকে টাক পড়ে যাবে।

এই অমল রায় আমাকে একদিন ডাকলেন। বললেন,—তোমার ব্যাপারটা অনেকখানি ভেবে দেখলাম হে! আরে, চুপ করে শুনে যাও। শুকনো মুখে কেন ঘুর ঘুর করে বেড়াও সে কি আমি বুঝি না? বুঝি বুঝি, সবই বুঝি। আমারো একদিন সব ছিলো হে, সব ছিলো।

অমল রায়ের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। নাকি আমি ভুল শুনলাম?

অমল রায় বলে চললেন,—সব সমস্যার আমি সমাধান করে দিতে পারি। দিতে পারি কি, দেবো। আলবৎ দেবো।

আমি অবাক্ হয়ে অমল রায়ের টাকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দ্রষ্টব্য বস্তু বটে।

অমল রায় একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন,—ও, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? দামী উপদেশ দেবো তোমাকে, বিনা মূল্যেই দেবো। আচ্ছা, আজ বিকেলে তুমি একবার আমার বাড়ি যাবে? যেয়ো। অভিজ্ঞতা ছাড়া জীবনে কিছু হয় না। মোক্ষম একটা অভিজ্ঞতা হবে আজ তোমার। যেয়ো কিন্তু। তাহলে এই কথাই রইলো।

সেদিন বিকেলেই গেলাম অমল রায়ের বাড়ি। আমার জন্যেই ভদ্রলোক সামনের বারান্দায়

অপেক্ষা করছিলেন। অমল রায় আমার কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন,—কাজটা আগে সেরে ফেলি। আগে দেখাই জিনিসটা।

কোন কাজ? কী জিনিস? দেখি?

অমল রায় আমাকে নিয়ে গেলেন সটান দোতলায়। একটা বন্ধ দরজার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে বললেন,—এই ঘরে আমি কাউকে ঢুকতে দিই না। কিন্তু আজ তোমাকে নিয়ে ঢুকবো। এমন জিনিস তোমাকে দেখাবো যা তুমি সারাজীবন মনে রাখবে।

কী জিনিস রে বাবা! স্পুটনিক-টুটনিক কিছু দেখাবে নাকি? কার মধ্যে কি আছে কে বলতে পারে?

অমল রায় তো আমাকে নিয়ে ঢুকলেন সেই ঘরে। আলো জ্বালালেন। মস্ত ঘরের মধ্যে দেখি প্রকাণ্ড এক লোহার সিন্দুক। সিন্দুকটায় কম পক্ষে বাষট্টিটা তালা।

অমল রায় একের পর আরেক তালা খুলে যাচ্ছেন। অমল রায়ের টাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠছে।

সিন্দুকের তালাপর্ব সমাপ্ত হলো। দেখি কী বেরোয়। ও মা, এ দেখি আরেকটা বিশাল কাঠের বাক্স! সেটাতেও অজস্র তালার বাহার। নাঃ, আমি পাগল হয়ে যাবো।

তা সেই কাঠের বাক্সের তালা খুলতেও কিছু কম সময় লাগলো না। অমল রায়ের টাক ঘামে ভেসে যাচ্ছে। যাক গে!

কাঠের বাক্সের ভেতরে আরেকটি বাক্স। অমল রায় সেটিকে বুকের কাছে তুলে ধরলেন। বললেন, এটি হাতীর দাঁতের বাক্স।

সেটি খুলে আমার চোখের সামনে মেলে ধরলেন ভদ্রলোক। বললেন,—নাও, ভাখো। নিজের চোখে ভাখো।

দেখলাম। কালো, ঘন, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল; রাশি রাশি চুল।

অমল রায় বললেন,—সব আমার। স্মৃতিচিহ্ন। একদা এরাই আমার মাথা আলো করে ছিলো। এরা আমার মাথা ছেড়েছে কিন্তু আমি ওদের ছাড়ি নি। সযত্নে রেখে দিয়েছি। নিজের চোখে দেখে এখন তোমার বিশ্বাস হ'লো তো যে এই শর্মা জন্মটেকো নয়, এই শর্মার মাথায়ও একদিন চুলের বাহার ছিলো?

হাতীর দাঁতের বাক্সের সেই রাশি রাশি চুলের মধ্যে অমল রায়ের চোখ থেকে টপটপ করে আঠারো ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়লো। অমল রায় বললেন, এই চুল—এদের আমি মর্মে মর্মে চিনি। এই চুলের জন্যে কতো দুঃখ-দুর্দশা সয়েছি, সব বলতে গেলে একখানা আঠারো পর্ব মহাভারত হয়। কতো তেল দিয়েছি এদের, কিন্তু কিসের কী! চুল বড়ো শয়তান, বড়ো বিশ্বাসঘাতক। ওদের সৌন্দর্যে ভুলো না। ওদের ভুলে যাও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো আর নিজেও চেষ্টা করো মাথা যেন সাফ হয়, চুল যেন আর না হয়, যেন অপার অনন্ত টাক হয়। তারপর ভাগ্যে থাকলে টাক নিয়েও মানুষ মহাসুখী হতে পারে। কেন, সংসারে কি টাকের কোনো দাম নেই?

মাস দেড়েক বাদে আমার মাথাভর্তি চুল গজালো আবার। আবার সেই আগের মতো। কালো কুচকুচে চুল। ঘন, কোঁকড়ানো, ঘাড় পর্য্যন্ত ঝোঝুল্যমান। নাপিতের ওপর অভিমান করে দাড়িও কামাই নি বহুদিন। দাড়িও দেখতে দেখতে দিব্যি পরিপুষ্ট হয়ে উঠলো। সারা মুখ কুটকুট করে। ভেবে দেখলাম, দাড়িও টাকার মতো। না কামালেই কষ্ট।

মাসের শেষ দিক্। পয়সাকড়ির অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। এমতাবস্থায় একদিন ঢুকে পড়লাম 'জয়কালী সেলুনে'। ঢুকেই মনে হলো—কোথায় এলাম বাবা! যে ক্ষুরশিল্পী আমাকে সাদরে নিয়ে চেয়ারে বসালো, তার চেহারা দেখলে মনে হয় এটা সেলুন নয় কসাইখানা। তার মস্ত দুটো লাল চোখ, বাবরি, পরনে লুঙ্গি, গলায় সরু সোনার হার, ঘসঘস করে একমুখ পান চিবুচ্ছে।

ক্ষুরশিল্পী বললো,—চুল ছাঁটবো? আর কি? ড্রেসিং? শ্যাম্পু?

আমি ঘাড় নাড়লাম। পয়সার বড়ো টানাটানি। শ্যাম্পু-ট্যাম্পূতে বিস্তর খরচ। শ্যাম্পূ দরকার নেই।

কী রকম চুল ছাঁটতে হবে সেই নির্দেশ দিতে যাচ্ছিলাম ক্ষুরশিল্পীকে, কিন্তু সে কিছু শুনতে চায় না। বলে—আমায় কিচ্ছু বলতে হবে না। দেখেশুনে আমিই ছেঁটে দিচ্ছি বাবু। পছন্দসই করে দিচ্ছি বাবু! কিন্তু শ্যাম্পূ?

আমি প্রবলভাবে ঘাড় নাড়লাম—না, শ্যাম্পূ না।

গলায় চাদর ঝুললো আমার। ক্ষুরশিল্পী কাঁচি, ক্ষুর, ক্লিপ ইত্যাদি সহযোগ কাজ স্থরু করে দিলো। আমি ঘাড় নিচু করে চুপচাপ বসে আছি। কিন্তু ক্ষুরশিল্পী দেখি ফাঁকে ফাঁকে সেই শ্যাম্পূর কথা তোলে। বলে—শ্যাম্পূটাও করে নিন না বাবু!

আমি প্রত্যেকবার বলি,—না, শ্যাম্পূ না।

হাজার বার ও বলে—শ্যাম্পূ? হাজার বার আমি বলি—না।

শেষ পর্যন্ত চুল ছাঁটা হয়ে গেলো। আয়নায় দেখলাম, দিব্যি হয়েছে। তা এখানেই আসবো এবার থেকে। এই ক্ষুরশিল্পীর ক্ষুরধার সৌন্দর্যবোধ আছে দেখা যাচ্ছে।

তারপর দাড়ি। গালে ক্ষুর চালাতে চালাতে ও দেখি পুনরায় হাঁকে—বাবু, শ্যাম্পু? আমি বলি—না, না, না।

তখন ক্ষুরশিল্পী বললো—নরেশচন্দ্র পাগল হয়ে গেছে বাবু! ঘোরতর পাগল। তাকে শিকল বেঁধে রাখতে হচ্ছে।

—কে নরেশচন্দ্র?

—আজ্ঞে, নরেশচন্দ্র আমার ভাই। আমার যমজ ভাই। এখানেই কাজ করতো। কেন পাগল হলো জানেন?

—না তো!

—পর্শুদিন বিকেলে এখানে একজন খদ্দের এলো। এই চেয়ারেই বসলো। এই যে চেয়ারে আপনি বসে আছেন।—ক্ষুরশিল্পী একটি নাতিদীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো। কিন্তু তারও আপনার মতো জেদ। চুল ছাঁটাবেন, দাড়ি কাটাবেন, অথচ শ্যাম্পূ করাবেন না। নরেশচন্দ্র হাজার বার তাঁকে বললো—

শ্যাম্পুটাও করে নিন না বাবু। বাবুটিও হাজার বার বললেন—না। আমাদের ব্যবসার অবস্থা তো ভালো যাচ্ছে না, আপনারা কেউই যদি শ্যাম্পু না করান তো আমাদের চলে কী করে? তা ভদ্রলোকের দাড়ি কাটতে কাটতে নরেশচন্দ্র আবার শুধোলো—শ্যাম্পু? ভদ্রলোক আবার বললেন—না, না, না। সঙ্গে সঙ্গে নরেশচন্দ্রের আশ্চর্য রূপান্তর। নরেশচন্দ্র দেখি ক্ষুর বাগিয়ে ভদ্রলোকের গলায় কোপ বসাতে যাচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে না ফেললে সেদিন এখানেই একটা নরহত্যা হয়ে যেতো। তা নরেশচন্দ্রকেই বা কি দোষ দেবো? ব্যবসার অবস্থা তো বিশেষ ভালো না, কেউই যদি শ্যাম্পু না করে তো আমাদের আয় হবে কোত্থেকে? যাক গে। নরেশচন্দ্র তো পাগল হয়ে বেঁচেছে, এখন আমারো বোধ করি পাগল হবার আর বিশেষ দেরি নেই। তা আপনাকে কি শ্যাম্পুটা করে দেবো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আপাততঃ তো শ্যাম্পু করিয়ে নিজের গলা বাঁচাই। শ্যাম্পু না করালে, এই ক্ষুরশিল্পী সম্ভবতঃ আমার গলাটি কেটে ফেলবে। গলাকাটা কবন্ধ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। কবন্ধের মাথা থাকে না। আর মাথাই যদি না থাকে তো কিসের কেশ, কিসের সৌন্দর্য?

কিন্তু এই সেলুনে আর না। 'জয়কালী সেলুনের' ক্ষুরে ক্ষুরে শতকোটি প্রণাম।

মাসখানেক বাদে আবার মাথাভর্তি চুল। এবার?

সস্তার তিন অবস্থা। সস্তার সেলুনে আর যাচ্ছি না। অনেক বেশি পয়সা খরচ করে চুল ছাঁটাবো। তেমন দামী সেলুন কি কলকাতায় নেই? নিশ্চয়ই আছে। সে রকম একটা সেলুন খুঁজে পেলে হয়তো আমি একটু শান্তি পাবো, হয়তো কেশসৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। খুঁজে দেখি।

আপিস কামাই করে তিন দিন তিন রাত খুঁজে একটা আশ্চর্য সেলুনের হদিশ পাওয়া গেলো। সেলুনটা চৌরঙ্গি পাড়ায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম, বহু নামজাদা ব্যক্তি ওখানে চুল ছাঁটাতে আসেন। যেমন ওদের আচার-ব্যবহার, তেমনি ওদের কাজ-কর্ম। তবে চার্জটা একটু বেশি। তা হোক। আরো শোনা গেলো, পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো শহরে নাকি এই সেলুনের ব্রাঞ্চ আছে। আর, ওদের হেড আপিস হলো গিয়ে দিল্লীতে। এলাহি কাণ্ড!

বলবো কি, চুল ছাঁটাতে যেদিন ঢুকলাম, কাণ্ডকারখানা দেখে তো আমার দু' চোখ স্থির। সামনে কাউন্টারে প্যান্ট-কোট-নেকটাই-পরা একজন ম্যানেজার বসে আছেন। দেয়াল-টেয়াল জুড়ে নানা রকম ছবি। লতাপাতা এঁকে কোন কবির একটা ইংরেজি পদ্য অবধি কোটেশন মার্কা দিয়ে একখানা বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে—

"Babies haven't any hair;
Old men's heads all just as ball;—
Between the cradle and the grave
Lies a hair cut and a shave."

[ভাবার্থ: শিশুদের চুল গজায় না, বুড়োদেরও মাথা হয় বলের মত ফাঁকা; শিশুর দোলনা আর মৃতের কবর—এ দু'য়ের মাঝামাঝি জায়গায় যারা আছে চুল-ছাঁটা আর দাড়ি-কামানো তাদেরই জন্য।]

ম্যানেজার বিনীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার কি?

বললাম,—চুল।

ম্যানেজার আমার সামনে ছাপানো একখানা লম্বা হলদে কাগজ ফেলে দিলেন। হলদে কাগজে লাল কালির ছাপা। বললেন,—কী রকম ছাঁট চান?

শ' আড়াই ছাঁটের নাম ছাপানো আছে কাগজে। চুল যে অত রকমে ছাঁটানো যায়, তাই কি আগে কখনো শুনেছি? পলকের জন্যে আমার মাথাটা ঘুরে উঠলো। বিমূঢ় কণ্ঠে বোকার মতো একটা প্রশ্ন করে ফেললাম,—আজ্ঞে, কোন ছাঁটটা সবচেয়ে ভালো?

ম্যানেজার বললেন,—সব ছাঁটই উৎকৃষ্ট। আপনার যে রকম পছন্দ হয়, বেছে নিন।

বাঁশবনে ডোম কানা। আমি কোনটা বাছি?

লিষ্টে চোখ ফেললাম। নানা দেশীয় ছাঁটের শেষে দেখি বাঙলায় একগাদা ছাঁটের নাম—'লৌহকপাট', 'পরশপাথর', 'বিদ্যাসাগর', 'শ্রীরামকৃষ্ণ', 'স্বামীজি' ইত্যাদি ইত্যাদি।

'লৌহকপাট' বইখানা আমার খুব পছন্দ। ধাঁ করে বলে দিলাম—আজ্ঞে, 'লৌহকপাট' লাগান।

একখানা দশ টাকার নোট আগাম দিতে হ'লো। চমকে উঠলে চলবে না, ঐ এখানকার রেট। হুঁ—হুঁ, জগদ্বিখ্যাত সেলুনের চাল চলনই আলাদা।

ম্যানেজার খস খস ক'রে আমাকে একখানা রসিদ কেটে দিলেন। হাতে দিলেন একটি লোহার চাকতি। একজন চাকরকে ডেকে হুকুম দিলেন তিনশো বিরানব্বুই নম্বর সীট।

চাকরের সঙ্গে ভেতরে গেলাম। না, ভেতরের বর্ণনা আর দেব না। আন্দাজ করে নাও। মোট কথা, সেই বিশাল ব্যাপার বর্ণনা করতে হ'লে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ভাষার জোর চাই, আমি কে বাবা!

বসলা'ম তো গিয়ে তিনশো বিরানব্বুই নম্বর সীটে। একজন চীনেম্যান এসে আমার কাছ থেকে সেই লোহার চাকতিটুকু নিয়ে গেলো। তারপর এলো একজন জাপানী। সে আমার গলায় একটি কালো রঙের চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে গেলো। তারপর এলো একজন ইংরেজ। সে লাগিয়ে গেলো ঘাড়ে পাউডার। ক্লিপ লাগাতে এলো একজন রাশিয়ান, কাঁচি চালিয়ে গেলো একজন পাকিস্তানি, পুনরায় পাউডার লাগাতে এলো একজন ইহুদী। মোটমাট ছাব্বিশ জন এলো। সর্বশেষে যার শুভাগমন ঘটলো সে একজন বৈষ্ণব। সে-ই বিশ মিনিট ক্ষুর চালালো।

সবশেষে আয়নার দিকে চোখ পড়তেই—অ্যাঁ, আমি কে! দশ টাকা দিয়ে এ কি হ'লো?

সব ভদ্রতা ভুলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—এই, এ কি? এ কি দশা করেছো আমার! বৈষ্ণব বানিয়ে দিয়েছো আমায়? সমস্ত মাথা কামানো আর পিছনে একগোছা চুল! জোচ্চোর, সব জোচ্চোর!

একজন সাহেব এসে আমায় দরজা দেখিয়ে দিলো। ইংরাজীতে বললো—জানোয়ারের মতো চেঁচাবেন না। দরকার হ'লে হেড-আপিসে নালিশ জানাবেন।

হেড-আপিস মানে দিল্লী।

বিশ্বাস করো, তাই করেছি। দেড় মাস ধ'রে হেড-আপিসের সঙ্গে চিঠিপত্তর লেখালেখির ফলে আমি একদিন রেজিষ্ট্রি ডাকে একটি প্যাকেট পেলাম। এক প্যাকেট চুল। আমারই চুল।

এবং তৎসহ হেড-আপিসের একখানা চিঠি :

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের কলকাতাস্থিত সেলুনের একটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা যারপরনাই লজ্জিত। অনুসন্ধানে জানা গেল, 'লৌহকপাট' ছাঁটের বদলে আপনাকে ভ্রমক্রমে 'নীলাচলে মহাপ্রভু' ছাঁট দেওয়া হয়েছে। এই ত্রুটির জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করি।

আমাদের কোম্পানীর নিয়মানুসারে টাকাকড়ি ফেরৎ দেওয়া হয় না। দুঃখিত।

আমাদের কোম্পানীর নিয়মানুসারে আপনার সমস্ত কাটা চুল ফেরৎ পাঠানো হ'লো। প্রাপ্তিসংবাদের প্রতীক্ষায় রইলাম।

আশা করি, ভবিষ্যতে আপনার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবো না।

নমস্কারান্তে
ডব্লু. বি. বাটাশারিয়া,
ডিরেক্টর

যথাকালে আবার মাথাভর্তি চুল গজিয়েছে। কালো কুচকুচে, ঘন কোঁকড়ানো। কিন্তু এবার ভাবছি আর কোথাও যাবো না। ভাবছি—চুল বাড়ুক, দাড়ি বাড়ুক—স্বাধীনভাবে বাড়ুক। ওরা দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট হোক। তারপর অদূরভবিষ্যতে একদিন,—মনে মনে ভাবছি,—শুভক্ষণ দেখে সন্ন্যাসী হ'য়ে গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধ'রে 'ব্যোম ভোলানাথ' ব'লে হিমালয়ের দিকে চ'লে যাবো।

অঙ্ক মাথায় ঢুকবে না তা করব কি ?

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

অঙ্ক মাথায় ঢুকবে না তা করব কি ?
বৃথাই মামু, শুভঙ্করী যাও বকি'।
যতই বুঝাও ততই আমার বাড়ছে ভুল,
ধরছে মাথা, দেখছি চোখে সর্ষেফুল।
না হয়, বলো, শশাঙ্ককে দেই খবর—
সঙ্গে নিয়ে আসুক সে তার লটবহর।
আনুক রাঁদা, আনুক পেরেক, করাত আর,
ডজন খানেক ইলেকট্রিকের শক্ত তার ;
আসুক নিয়ে সঙ্গী সাথী দু'-চার জন—
অঙ্ক মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া যাদের পণ।

শশাঙ্ক কি অঙ্ক জানে ? – ভাবছ তাই ?
নাই বা জানুক ; জানার কোনো অর্থ নাই।
শক্ত লোহায় পোক্ত পেরেক ভরতে তার
দেশ বিদেশে সত্যি জুড়ি মেলাই ভার।
আসবে সটান, মাথার চাঁদি ধরবে সে,
পেরেক ঠুকে করবে ফুটো অক্লেশে ;
ফুটোর ফাঁকে ঢুকবে যতো শক্ত আঁক,
মগজ জুড়ে উঠবে জবর আঁকের চাক।
'সরল কুসীদ' বলবে, এ কি কর্মভোগ,
'ক্ষেত্রফলে' বাঁধল বাসা 'মিশ্রযোগ'।
ভাবছ মামু, ভড়কে যাব ?—ভয়টা কি ?
না হয়, বলো, শম্ভু সা'কেই নেই ডাকি'—
দশটি বছর আমেরিকায় কাটিয়ে সে
কালকে রাতে ফিরল নাকি ফের দেশে।
শক্ত মাথা নরম করার ফিকির তার
শুনছি নাকি সবার চেয়ে চটকদার।
একটুখানি ভয় যা আছে তাও বলি,—
ভড়কে গেলে ভেস্তে যাবে সক্কলি।
ঢুকবে তখন নরম মাথায় তাল-বেতাল,
অঙ্ক ছাড়া হাজার রকম বদ্খেয়াল।

৮

নীরস ইতিহাসের কাহিনী, সে বিষয়ে ভুল নেই। আমি কিন্তু অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এই অতি বিচিত্র লোকটির বলবার ধরণও এক আশ্চর্য্য রকমের। অভিভূত হয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই।

চা এবং কচুরি আবার এলো। চা পান করতে করতে এতক্ষণে আমার মনের মধ্যে আবার উদয় হোল আমি যে তাঁকে পঞ্চানন্দ বিগ্রহ চুরির কথাটা সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করবো বলে সঙ্কল্প করেছিলাম, সে কথা তো এখনও উত্থাপন করতেই

পারলাম না! চায়ে চুমুক দিয়ে এইবার বললাম, আমাদের পঞ্চানন্দ বিগ্রহ হারানোর কাহিনী জিজ্ঞাসা করতে এসে আমাকে কিন্তু শুনতে হোল এক হাজার বছর আগেকার আর এক বিগ্রহ হারানোর কাহিনী।

তিনিও চায়ে চুমুক দিয়ে একটু হাসলেন। বললেন, ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন ঘটে। হিষ্ট্রী রিপীটস্ ইট্‌সেল্‌ফ্। সুতরাং ধীরে বন্ধু, ধীরে। ব্যস্ত হয়ো না। ঐ যা—একেবারে তুমি বলে ফেললাম! আশা করি রাগ করবেন না।

বললাম, না না, নিশ্চয়ই না। আপনি আমার চেয়ে বয়সে এবং জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় অনেক বেশী বড়. সুতরাং 'আপনি' বলে এতক্ষণ বলছিলেন, তাতেই বরং দুঃখ বোধ করছিলাম।

তিনি বললেন, ভাল, এখন তাহ'লে তোমার এবং আমার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বলা যেতে পারে।

চায়ের দ্বিতীয় পর্ব শেষ করে তিনি বললেন, এবার তোমাকে যে কাহিনী বলবো সেটার উপর আমার নিজেরও ষোল আনা বিশ্বাস নেই। যে ব্যাপারটা বিজ্ঞানসম্মত নয় সে ব্যাপার মেনে নিতে আমার মন ঠিক সায় দেয় না। কাজেই স্বপ্নাদেশ কিংবা দৈববাণীর ওপরে আমার আস্থা কম। অথচ আমাদের দেশে স্বপ্নাদেশের কৃপায় বহু ব্যাপারই হয়ে গিয়েছে। আজকের দিনেও বাংলা খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাবে স্বপ্নলব্ধ মাদুলী কিংবা স্বপ্নে-পাওয়া ওষুধের মহিমা প্রচারিত হচ্ছে।

যাই হোক, আমার বিশ্বাস থাকুক আর না থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না। ঘটনাটা যেমন জেনেছি তোমাকে সেই রকমই বলছি।

পূর্ব্বপুরুষের বিগ্রহ লুঠ হয়ে যাওয়ায় এবং সেটাকে আর খুঁজে না পাওয়ায় গোবিন্দদেব খুবই আঘাত পেলেন মনে। এমন সময়ে একদিন স্বপ্নাদেশ পেলেন। সেই ইষ্টদেবতা গোপাল তাঁকে বলছেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে।—আমাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে জলের ভিতর ফেলে দিয়েছে ওরা। সাগর দীঘির পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে যে নিমগাছ আছে সেখান থেকে জলের ভেতর নেমে যা, এক বুক জলের মধ্যে আমাকে পাবি।

ধড়-মড় করে উঠে পড়লেন গোবিন্দদেব। তখনও সকাল হয় নি। কিন্তু তাতে কি? তখনই চলে গেলেন সাগর দীঘির তীরে। পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকের নিমগাছ চিনতে ভুল হোল না। দীঘির পাড় যেখানে খাড়া উঁচু হয়ে উঠেছে, কোনও জিনিষ পাড়ের উপর থেকে সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া সোজা, কিন্তু সেখান দিয়ে নেমে আসা শক্ত। কিন্তু অসম্ভবকেও সম্ভব করবার সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছেন গোবিন্দদেব।

এক বুক জলে এসে মনে হোল কি যেন একটা কঠিন পদার্থ পায়ে ঠেকেছে। তখনই ডুব দিলেন। তুলে নিলেন প্রস্তরখণ্ড। হ্যাঁ, মিথ্যা নয় স্বপ্নাদেশ। গোপালই বটে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বেকার নির্ম্মিত—তাঁর পূর্ব্বপুরুষ অনন্তবর্মার প্রতিষ্ঠিত সেই গোপাল-মূর্ত্তি। কিন্তু এ কি! এ যে কেবল ঊর্দ্ধাঙ্গ! মাথা থেকে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত! আর কোথায় গেল মূর্ত্তির অঙ্গাবশেষ? শ্রীমূর্ত্তির চরণকমল?

আবার ডুব দিলেন গোবিন্দদেব। পাওয়া গেল না। আশেপাশে অনেক খুঁজলেন, আরও গভীর জলে ডুব দিয়ে আঁকুপাঁকু করে হাতড়াতে লাগলেন সাগর দীঘির তলার মাটি, তবু পাওয়া গেল না।

অবশেষে সেই ভগ্ন বিগ্রহ নিয়ে ফিরলেন। আবার যদি দেবতা কোনও স্বপ্নাদেশ দেন, তার প্রতীক্ষায় কয়েক রাত্রি অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে কাটালেন। কিন্তু গোপাল আর দেখা দিলেন না স্বপ্নে।

দেশ ছাড়বার সংকল্প গোবিন্দদেব স্থির করেই ফেলেছিলেন। যে দেশে রাজদণ্ড শিথিল, যেখানে তাঁর পিতামহের হোল শোচনীয় অপমৃত্যু, যেখানে তাঁদের ইষ্টদেবতা হলেন লাঞ্ছিত, সে দেশে আর বাস করবেন না তিনি।

বাংলার পাল রাজত্বের তখন প্রভাব স্তিমিত। যে মহীপালদেব একদা দেশ-যোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন, তাঁর বংশধর তখন হতশ্রী। মহীপালনগর থেকে ধনী বণিক্ সম্প্রদায় ক্রমে নিজেদের বাণিজ্যসম্ভার সরিয়ে নিতে লাগলেন অন্যত্র। মহীপালনগর ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে লাগলো ধ্বংসের পথে।

গোবিন্দদেব মহীপালনগর ছেড়ে ভাঙ্গা বিগ্রহ নিয়ে কোথায় গেলেন সে ইতিহাস আজ কারও জানা নেই। মাঝখানের খানিকটা যোগসূত্র গিয়েছে হারিয়ে। এর পর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে বাণেশ্বর চতুর্ব্বেদীর—গোবিন্দদেবের পৌত্র। বাংলার সিংহাসনে তখন সেন বংশের অধিষ্ঠান হয়েছে। বাণেশ্বর চতুর্ব্বেদী ছিলেন বল্লাল সেনের সভাসদ্। বল্লাল সেন বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার ছেড়ে প্রায়ই থাকতেন নবদ্বীপে। শোনা যায় গঙ্গার পলি পড়ে উদ্ভূত হয়েছিল এই নূতন দ্বীপ। চারিদিকে গঙ্গা-বেষ্টিত এই দ্বীপটি ভারি ভালো লেগেছিল মহারাজ বল্লালের. তিনি এখানে একটি প্রাসাদ তৈরী করে থাকতেন। কাজেই দেখতে দেখতে নবদ্বীপ হয়ে উঠলো দ্বিতীয় রাজধানী। বাণেশ্বরকে তিনি একটা গ্রাম দান করেছিলেন। সেইখানে তিনি তাঁর পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ভাঙ্গা গোপাল-মূর্ত্তিরই প্রতিষ্ঠা করলেন। সকলকে বলতে লাগলেন,—আমার গোপাল অনেক জায়গায় ঘুরেছেন—দূর অতীতে অনন্তবর্ম্মা যখন এঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন সম্রাট্ হর্ষের সময়, তার পর তাঁর বংশধরেরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন,

সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন গোপাল-মূর্ত্তিকে। এবার গোপালের পা গিয়েছে ভেঙ্গে, আর তাঁর চলে যাওয়ার ক্ষমতা হবে না; কাজেই এতকাল পরে গোপাল চিরদিনের মতই বাঁধা হয়ে গেলেন বাণেশ্বর চতুর্বেদীর ঘরে।

কিন্তু এ তো গেল মাত্র চারশো বছরের ইতিহাস। সাড়ে ছ'শো খৃষ্টাব্দে যদি গোপাল-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে তবে তখন থেকে বল্লাল সেনের সময়—সাড়ে চারশো বছরের বেশী নয়। কিন্তু তার পরে আজকের দিনের হিসেব ধরলে আরও সাড়ে আটশো বছর গিয়েছে পেরিয়ে। সেই দীর্ঘকালের হারানো সূত্র মিলিয়ে পাওয়া বড় শক্ত।

ইতিহাসে আমরা দেখি যে তারপর হোল বক্তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপজয়। দেশব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবের তাণ্ডব। বহু লোক পালালো, বহু লোক হোল ঘরছাড়া। গৌড় থেকে দূরে —নবদ্বীপ থেকে দূরে—লোকযাত্রার আর বিরাম নেই।

তেমনি একদিনে আবার গোপাল বিগ্রহকে নিয়ে ঘরছাড়া হলেন রঘুদেব শিরোমণি—বাণেশ্বরের পৌত্র। তিনি এসে বাস স্থাপন করলেন গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায়, —আরও কয়েক শতাব্দী পরে যেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাস।

কিন্তু বাণেশ্বর চতুর্ব্বেদী যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে গোপালের যখন পা নেই তখন তিনি নড়তে পারবেন না, সে কথাটা খাটলো না। বাণেশ্বরের পৌত্র এলেন ফুলিয়ায়, গোপালদেবও, পা না থাকলেও নড়ে এলেন ফুলিয়ায়। তাঁকে কিন্তু আবার নড়তে হোল। রঘুদেব শিরোমণির ছেলে, কি কারণে জানা যায় না, ফুলিয়ার বাস ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা জায়গায় বসবাস শুরু করলেন। সে জায়গার নাম এখন আর প্রকাশ করবার দরকার নেই।

এই সব বিবরণ একটা পুঁথির মধ্যে লিখে রেখেছিলেন রঘুদেব শিরোমণি। তাঁর বংশে, বহুকাল পরে, অর্থাৎ প্রায় সাত-আটশো বছর পরে যে বংশধর জন্মগ্রহণ করেন তিনি বড় হয়ে যখন লেখাপড়া শিখলেন, একদিন তাঁর হাতে পড়লো পূর্ব্বপুরুষের সেই পুঁথি। পড়ে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময় থেকে সুরু করে এই যে বিবরণটা আমি তোমায় বললাম, এটা সেই পুঁথিরই কাহিনী।

সেই ছেলেটির মনে তখন প্রশ্ন জাগলো, গোপাল-মূর্ত্তি সেই যে বহুকাল পূর্ব্বে —অর্থাৎ রাজা মহীপালদেবের সময়ের কিছু পরেই—অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ন'শো বছর আগে—ভেঙ্গে দু' টুকরো হয়ে গেল, তার উপরের টুকরোটা অর্থাৎ পায়ের খানিকটা পর্য্যন্ত পাওয়া গেল, বাকী অংশটুকুর পরিণাম কি হোল?

উপরের অংশটুকুরও পরিচয় পাওয়া গেল রঘুদেব শিরোমণি পর্য্যন্ত। কিন্তু তার পর সে অংশটুকুরই বা কি হোল? কোথায় গেল সেই গোপাল-মূর্ত্তি?

ডক্টর রামস্বামী এবার থামলেন। বললেন, কি বল অজয় বাবু, এ প্রশ্নটা কি তার মনে ওঠা অবান্তর?

আমি অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম। তাঁর উজ্জ্বল চক্ষু দুটি যেন জ্বলছে। আমি বললাম, এইবার বুঝতে পেরেছি সেই ছেলেটি আপনি স্বয়ং। আপনিই তাহলে মৌখরি-রাজ অনন্তবর্ম্মার বংশধর—তেরোশো বছর আগে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন গোপাল-মূর্ত্তির।

এবারে তিনি হাসলেন। বললেন, এখনও অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আজ থাকুক এই পর্য্যন্ত। আমাকে বেরুতে হবে। কালই আবার যাবো কলকাতার বাইরে। ফিরতে বোধ হয় ৭।৮ দিন লাগবে। তখন আবার তোমাকে ডেকে পাঠাবো। তোমাকে আমার খুব দরকার।

(ক্রমশঃ)

প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো চি মিন্‌হ

শ্রীঅজিতকুমার তারণ

সম্প্রতি ইন্দোচীনের শ্রেষ্ঠ নেতা এবং গণতন্ত্রশাসিত উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো চি মিন্হ আমন্ত্রিত হ'য়ে ভারত সফর ক'রে গেলেন।

তিনি ভারতবর্ষকে দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বলেছিলেন, তাঁর আবার ভারতকে বিশেষ ভাবে দেখবার ইচ্ছে রয়েছে, এবার কাশ্মীর দেখে না যাওয়ায় তাঁর ভারতদর্শন অপূর্ণই রয়ে গেল।

এই অদ্ভুত লোকটির জীবন-কাহিনীও আশ্চর্য রকম বৈচিত্র্যময়। তারই কথা বলি শোন।

অতি প্রাচীন কালে আমাদেরই দেশের লোকেরা ইন্দোচীনের পূর্ব সীমানায় গিয়ে একটা উপনিবেশ স্থাপন ক'রে তার নাম দিয়েছিল 'চম্পা'। সেই চম্পারই একটী অতি নগণ্য, অজ্ঞাত, অখ্যাত ও দরিদ্র পরিবারে হো'র জন্ম হয় ১৮৯২ সালে। তখন চম্পাকে বলা হ'ত আন্নাম এবং ওটা ছিল ফরাসীদের দখলে। এখন অবশ্য ওটা ভিয়েৎনামেরই অংশ বিশেষ।

হো'র বাবা ছিলেন গরীব, তাই ইচ্ছা থাকলেও হো উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পেলেন না। তার ওপর ফরাসারাও চাইত না ওদেশের লোকেরা শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে তাদের রাজত্বে বাধা সৃষ্টি করুক।

কিন্তু গরীব হলে কি হবে, তাঁদের পরিবার বরাবরই রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন। ফলে শুধু ফরাসী সরকারের কারাগারই নয়, ফাঁসাকাঠও জুটেছিল অনেকের ভাগ্যে।

এ হেন পরিবারের ছেলে হো-ও যে ছেলেবেলা থেকেই ফরাসীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবেন এতে আর আশ্চর্যের কি? তাই ছেলেবেলা থেকেই ফরাসীদের দেশ-ছাড়া করবার মহড়া দিতে গিয়ে হোকেও খুব কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। তাঁদের ক্ষুদে দলের তিনিই সর্দার ছিলেন কিনা!

দুই নেতা
ভারতের জওহরলালজী ও ভিয়েৎনামের হো চি মিন্হ
ফটো: লেখক

কিশোর বয়সেই হো একটী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক দলে বার্তাবহের কাজ নেন। সেখানে কাজ করতে করতে শিক্ষিত লোকদের সঙ্গে মেলমেশা ক'রে কিছু কিছু জ্ঞানলাভেরও সুযোগ পেলেন। তখন তিনি সংকল্প করলেন—ছলে, বলে, কৌশলে—যে ভাবেই হোক একবার ফরাসী ও রুশ দেশে যেতেই হবে! ঠিক এই সময়ে তিনি খবর পেলেন, ফরাসী পুলিশ ফের তাঁর পেছনে লেগেছে। ধরতে পারলে কি করবে কে জানে! তখন সুরু হ'ল তাঁর আত্মগোপন।

এইভাবে গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হো, এমন সময় এক মালবাহী ফরাসী জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে দেখা জাহাজে লোকের দরকার ছিল। হোকে দেখে ক্যাপটেন বলল,—"এই ছোক্‌রা, এদিকে এসো। চাকরি খুঁজছ, তাই না? আমি দেখলেই বুঝতে পারি। ইয়ে, তোমার বয়স কত?"

"আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন। জাহাজের চাকরিই তো খুঁজছি। আপনার সুনাম শুনে এলাম। আমার বয়স এখন আঠারো বছর।"

হো'র তখন পোয়া বারো। জাহাজে নাবিকের কাজে ভর্তি হ'লেন তিনি। ক্যাপ্টেন কিন্তু তাঁকে লাগিয়ে দিলেন রান্নাবান্নার কাজে

হো শাসকদের চোখে ধুলো দিয়ে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী সহরে এসে পৌছুলেন। এর পর সেখানেই রয়ে গেলেন তিনি। কষ্টেসৃষ্টে একটা ফটোর দোকানে কাজ জুটিয়ে নিলেন এবং অবসর সময়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই হো ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী হ'য়ে উঠলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি প্যারীতে 'ল্য পারিয়া' নাম দিয়ে একটী পত্রিকাও বের ক'রে তার সম্পাদক হ'লেন। প্রথম প্রথম সম্পাদক মশাইকেই রাস্তায় রাস্তায় কাগজটী ফেরি করতে হ'ত। এই পত্রিকার মাধ্যমেই হো ওখানকার অনেক গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল তাঁর রাজনৈতিক জীবন। প্রথমে একটি সমাজতন্ত্রী দলের সক্রিয় সদস্য হলেন তিনি, তার পর চলে এলেন এক বামপন্থী দলে। এবং তার কিছুদিন পরেই কয়েকজন সঙ্গী-সাথী জুটিয়ে একটা সাম্যবাদী দল গঠন করে ফেললেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে হো ফরাসী দেশ থেকে আন্তর্জাতিক কৃষক কংগ্রেসে যোগদানের জন্যে রুশ দেশে আসেন আমন্ত্রিত হয়ে। সেই যে এলেন আর ফ্রান্সে ফিরলেন না। রাশিয়াতেই থেকে গিয়ে ওদেশের ভাষা, সাহিত্য এবং ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে লাগলেন। এর পর একদিন দেখা গেল হো অনুবাদকের কাজ নিয়ে ক্যান্টনে রুশ বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরে চলে এসেছেন।

১৯২৭ সালে কম্যুনিষ্ট-কুয়োমিণ্টাংএর যুদ্ধে বন্দী হন হো, কিন্তু পরে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে তিনি দূর প্রাচ্যের নানা দেশে ঘুরে বেড়ান এবং নানান্ অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। এইবার সুরু হ'ল তাঁর আসল কাজ, ফরাসীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রস্তুতি। কিন্তু নিজের দেশেরই কয়েকজন লোক তাঁর পেছনে লাগল। আর ফরাসীদের উৎপীড়ন তো ছিলই! হংকংএ পালিয়ে আসতে হ'ল তাঁকে ১৯৩০ সালে। কিন্তু জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ। হংকংএ ইংরেজরা তাঁকে বন্দী করল। তবে খুব বেশী দিনের জন্য নয়,—স্বাস্থ্যহানির অজুহাতে মুক্তি পেয়ে তিনি ফের ফিরে এলেন ইন্দোচীনে। ফিরে এসে, ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইএর জন্যে আবার তিনি দেশবাসীকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানীরা এসে দেশের নানা জায়গা দখল করল। হো মার্কিন শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজের গেরিলা বাহিনী নিয়ে উত্তর ইন্দোচীনের তংকিন এলাকা থেকে দখলকারী জাপদের বিতাড়িত করলেন।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে জাপদের তাসের ঘর ধ্বসে পড়ল। তখন হো সদলবলে গিয়ে ইন্দোচীনের বিখ্যাত হানোই এবং সায়গন সহর দু'টী দখল করে বসলেন।

ফরাসীদের হাতের পুতুল অলস, আরামপ্রিয়, অকর্মণ্য এবং নামে-মাত্র ভিয়েৎনাম-সম্রাট্ বাও দাই ভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতেই হো ১৯৪৫এর সেপ্টেম্বর মাসে ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিক অব ভিয়েৎনামের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে বসলেন। এতে ফরাসীরা মিত্র শক্তির সহায়তা নিয়ে হো'র বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ সুরু করে দিল। উপায়ান্তর না দেখে হো তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে অরণ্য ও পাহাড় এলাকায় চলে গেলেন এবং সেখান থেকেই শত্রুদের প্রতিরোধ করে চল্লেন দীর্ঘ আট-ন' বছর ধরে। শাসকেরা দেশে অর্থসঙ্কট ও দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করল। ওরা শহরে শহরে দেশীয় কাগজগুলোর প্রকাশ বন্ধ করে দিলে। হো-ও দমবার পাত্র ন'ন। তিনি তাঁর অদ্ভুত সংগঠনী শক্তি ও কর্মকুশলতার বলে দুর্ভিক্ষ দমনে কৃতকার্য হ'লেন, এবং নিজেরাই বনে-জঙ্গলে থেকে নোট ছাপাতে লাগলেন। সে নোটই (ডং) এখনও ঐ দেশে চালু রয়েছে। হো সে অবস্থায়ই এক খবরের কাগজ বার করে সমস্ত ইন্দোচীনের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানাতে লাগলেন।

১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন হ'ল তাতে ভিয়েৎনাম জাতীয় সভার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন হো।

১৯৫৪ সনের ৭ই মে ইন্দোচীনের ইতিহাসে একটী অতীব স্মরণীয় দিন। ঐ দিন হো তাঁর গেরিলা সৈন্যের সাহায্যে ফরাসীদের অতি গর্বের 'দিয়েন বিয়েন ফু' দুর্গটী দখল করে সারা বিশ্বের লোকদের অবাক্ ক'রে দিলেন।

জেনেভা চুক্তি অনুসারে নিযুক্ত আন্তর্জাতিক তদারকী কমিশনের সাফল্যের ব্যাপারেও হো যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

ইন্দোচীন থেকে ফরাসীরা পাত্‌তাড়ি গুটালেও উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম একত্র না হ'লে হো'র মনে ও প্রাণে স্বস্তি নেই।

ইন্দোচীনের স্বাধীনতা সংগ্রামে বরাবরই ভারতের নৈতিক সহানুভূতি ছিল, তা স্মরণ ক'রে হো সর্বদাই আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক'রে থাকেন। আমাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতির প্রমাণ স্বরূপে গেল বছরও তিনি ভারতের খাদ্যসঙ্কটের কথা শুনে প্রচুর পরিমাণে চাল পাঠিয়েছিলেন এ দেশে। পরে ওঁদের দেশের পাটজাত দ্রব্যাদির চাহিদা মেটাবার জন্যে চালের বিনিময়ে নেহরুও ওখানে পাঠিয়েছেন ওই সব জিনিষ।

মুখে লম্বা পাৎলা পাৎলা দাড়ি, রুগ্নদেহ কিন্তু সদা-হাস্যময় হো চি মিন্‌হ যখন কলকাতায় আসেন তোমরা অনেকে হয়তো দেখে থাকবে তাঁকে। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী তিনি। মাতৃভাষা (ভিয়েৎনামী) ছাড়াও রুশ, চীনা, ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী প্রভৃতি আট-ন'টী ভাষা জানেন। অত ভাষা জেনেও কিন্তু তিনি স্বল্পভাষী লোক। তাঁর কাজই যেন কথা বলে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পরে অতি অল্প

সময়ের মধ্যেই তিনি দেশে যে ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা, কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যাপারে যুগান্তর এনেছেন তা নিজ চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না।

কর্মবীর হো'র জীবনযাত্রার প্রণালীও অতিশয় অনাড়ম্বর। কথাবার্তায়, চালচলনে, পোষাক-পরিচ্ছদে ও খাদ্য-পানীয়ের ব্যাপারেও তিনি খুব সাদাসিধে। সম্রাট বাও দাইএর পরিত্যক্ত জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদে তাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিন-চার দিনেই তিনি ওখানে হাঁপিয়ে উঠলেন। শেষে সাধারণ লোকের মতই অতি সাধারণ একটা বাড়ীতে উঠে এসে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখনও তিনি সেই ছোট বাড়ীটাতেই থাকেন।

হো চি মিন্‌হ কথাটার মানে জান? ওর মানে হচ্ছে 'অতি উজ্জ্বল অধ্যবসায়ী ব্যক্তি'। এ ছাড়া স্বদেশে হো'র আর একটা নাম আছে—'ঙুয়েন আই গুয়াক'। ওর অর্থ 'অতিশয় স্বদেশভক্ত লোক'।

দেখেছি চিরকুমার * হো দেশের নানান্ গঠনমূলক কাজে খুব ব্যস্ত থাকলেও দেশের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কথা ভুলে যান নি। প্রায়ই ওদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশেন, ওদের সঙ্গে খেলাধূলায় যোগ দিয়ে থাকেন। তারাও ওঁকে 'বাক হো' অর্থাৎ 'কাকা হো' বলে ডাকে।

আন্তর্জাতিক তদারকী কমিশনের সদস্য হিসাবে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আমাকে অনেক দিন ইন্দোচীনে থাকতে হয়েছিল। সেই সময় ভিয়েৎনাম ভাষাও কিছুটা শিখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। হো'র সঙ্গেও কিছুটা আলাপের সৌভাগ্য হয়েছিল সে দেশে। তাই হো চি মিন্‌হ কলকাতায় এলে আমারও ডাক পড়ল। ফলে তাঁর সঙ্গে নতুন করে অনেক আলাপের সুযোগ পেয়েছি।

চলে যাবার দিনও দমদম বিমান-বন্দরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফের তাঁর সঙ্গে কথা হ'ল। ওড়বার পূর্বক্ষণে হো আমাকে আবার তাঁর দেশে যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে বল্লেন, "ওখানকার ছোট ছেলেমেয়েরা আপনাকে খুবই ভালবাসে, তাই আবার যেতে হবে আপনাকে।" আমি হেসে সম্মতি জানাতেই তিনি ভারী খুশী হয়ে বল্লেন, "আপনি শিশুদের জন্যেও লিখে থাকেন বলে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের দেশের অন্যান্য শিশুসাহিত্যিকদেরও আপনি দয়া করে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাবেন।"

আবেগ ভরে বল্লাম, "হো চি তিচ্ মৃয়ন নাম" - প্রেসিডেণ্ট হো দীর্ঘজীবী হোন।

* ও-দেশের তখনকার রীতি অনুযায়ী হোকে শৈশবেই বিয়ে করান হয়েছিল, কিন্তু তাঁর বউটির, শৈশবকাল না যেতেই, মৃত্যু হয়। হো'র আর তাঁর কথা কিচ্ছুই মনে নেই। পরেও তিনি আর বিয়ে করেন নি. তাই তাঁকে চিরকুমারই বলা হয়।

— —

পুরানো পাতা

হার-জিত

⁄অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার হইতে সুরু হইয়া পৃথিবীতে প্রত্যহ যে কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘটনা— কত বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে কে তার হিসাব রাখে? ব্যাপারটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সিনেমায় রবিন্সন ক্রুসো ফিল্ম দেখিয়া আসিয়া অহিভূষণ এবং তার বন্ধু অবিনাশ দু'জনার মধ্যে তর্ক আরম্ভ হইয়াছিল। উভয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ'শিক্ষিত যুবক; তার উপর অবিনাশ আবার বিপুল ধনশালী.— অহিভূষণ ধনী না হইলেও সম্প্রতি পাটের ব্যবসায়ে বেশ কিছু কিছু রোজগার করিতেছে। তর্কটা ছিল এই রকমের: অহিভূষণ বলিতেছিল, রবিন্সন ক্রুসোর মত একটা জনমানবশূন্য জায়গায় কোন লোককে যদি আবদ্ধ রাখা যায় এবং সে যদি তার ইচ্ছামত সমস্ত কাজ করিবার সুযোগ পায়, ইচ্ছানুযায়ী সব রকমের মানসিক এবং শারীরিক খোরাক পায়, তবে তার পক্ষে সারা-জীবন নিঃসঙ্গ অবস্থায় সেই নির্জ্জন স্থানে কাটাইয়া দেওয়া কিছুই কষ্টকর ব্যাপার নয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস রবিন্সন ক্রুসো সেরূপ সুযোগ পায় নাই বলিয়াই তার মন কেবল দ্বীপ হইতে পালাই-পালাই করিতেছিল।— পাইলে অক্লেশেই সে সেই নির্জ্জন দ্বীপে সারা জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিত।

অবিনাশ কহিতেছিল, অহিভূষণের ধারণা একেবারেই ভুল, কেন না ভগবান্ মানুষকে এমন ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন যে অপর মানুষের মুখ না দেখিতে পাইলে, সদাসর্ব্বদা লোকের সঙ্গ না পাইলে, সে কিছুতেই পৃথিবীতে টিকিতে পারে না, জীবন তার মরুভূমি হইয়া যায়। মানুষ যে কথা বলার ক্ষমতা পাইয়াছে সে কি ঘরের কোণে একা একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য, নাকি পরস্পরের সহিত মেলামেশা করিয়া সমাজবদ্ধ ভাবে কাল কাটাইবার জন্য? মানুষের কথা বলার ক্ষমতা হইতেই বোঝা যায় তার সম্বন্ধে ভগবানের আসল অভিপ্রায়টা কি। তার এই শেষ যুক্তি সমাপ্ত করিয়া অবিনাশ বলিল, "দেখ বাপু, মুখে অমন লম্বা-চওড়া বক্তৃতা অনেকেই করতে পারে, কাজের বেলাতেই বোঝা যায় কার কত মুরদ। আমি জোর করে বলতে পারি তুমি যদি রবিন্সন ক্রুসো হতে তা হলে অমন জেলখানার বন্দীর মত সারা জীবন তো দূরের কথা, দশটা বচ্ছরও কাটাতে পারতে না—না।" উত্তেজিত অবিনাশ টেবিলের উপর জোরে জোরে দুইটি চাপড় মারিয়া তার কথা শেষ করিল।

অহিভূষণও কম উত্তেজিত হয় নাই, সেও উত্তর দিল, "দেখ অবিনাশ, জোরে জোরে টেবিল চাপড়ালেই যদি তর্কে জেতা যেত তবে আর ভাবনা ছিল না। আমি কি পারি না পারি, তোমার চাইতে বোধ করি সেটা আমারই বেশী জানা আছে। তুমি বাজী রাখতে রাজী আছ? তোমার

প্রস্তাবেই আমি রাজী। দশ বছর নয়, এক যুগ অর্থাৎ বারো বছর তুমি আমায় লোকালয়ের সম্পূর্ণ বাইরে, নির্জ্জন কারাগারের মত একটা বাড়ীতে আটকে রাখবে। মানুষের সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক আমি তাদের মুখ পর্য্যন্ত দেখব না। শুধু আমার যখন যা চাই আমায় তুমি তাই জুগিয়ে দেবে। অবশ্য সাধারণ মানুষের যা যা দরকারে লাগতে পারে তাই আমি চাইব—যেমন বই, খাবার, কোনও একটা কাজ করবার উপোযোগী সাধারণ যন্ত্রপাতি;—অন্যায় কোনও কিছু আমি চাইব না। কেমন রাজী?"

অবিনাশ টেবিলের উপর আর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া কহিল, "একলাখ টাকা বাজী।"

পাঁচ মিনিট আগে দু'জনার একজনও যাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই, মুহূর্ত্তের কথা

কেমন, রাজী?

কাটাকাটিতে তাহাই হইয়া গেল—সে ঘরে আরও বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত ছিল, সকলের সম্মুখে চুক্তির পত্রে দু'জনে সই করিয়া দিল। কথাটা শুনিতে এমনই অবিশ্বাস্য যে বোধ করি একমাত্র গল্প-উপন্যাসেই এর জুড়ি মেলে।

কিন্তু সত্য ঘটনা অনেক সময় গল্পকেও ছাড়াইয়া যায়। ইংরাজরা বোধ হয় সেই জন্যই বলেন, "ফ্যাক্টস্ আর ষ্ট্রেঞ্জার দ্যান্ ফিক্‌শনস্"।

কলিকাতা হইতে কিছু দূরে অবিনাশের বাবা একটা বাগান-বাড়ী কিনিয়াছিলেন, সহরের জন-কোলাহলে মাথা খারাপ হইবার উপক্রম হইলে মাঝে মাঝে সপরিবারে সেখানে গিয়া তিনি বাস করিতেন। কোম্পানীর প্রথম আমলে সেটা নাকি ছিল কোন জমিদারের কয়েদখানা। কয়েদী রাখার

উপযুক্ত স্থানই বটে সন্দেহ নাই। জেলখানার মত উঁচু প্রাচীরে সমস্ত বাড়ীখানা ঘেরা, ভিতরে অনেকখানি ফাঁকা জমি ও মাত্র গুটিকয়েক ঘর। সামনের দিকটা এমনি ভাবে তৈরী যে বাহির হইতে তালাচাবি আঁটিয়া দিলে মশামাছির পর্য্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করার ক্ষমতা থাকে না।

আশপাশে লোকের বসতিও অত্যন্ত কম। যারা আছে তারাও প্রায় সকলেই অবিনাশদের আশ্রিত প্রজা। মোটের উপর দরজা-কপাট বন্ধ করিয়া দিলে উঁচু পাঁচীল-ঘেরা সে বাড়ীটার সঙ্গে জনপ্রাণিশূন্য নির্জ্জন দ্বীপের কোনই পার্থক্য থাকে না। ঠিক হইল, বাজীর সর্ত্ত অনুসারে অহিভূষণকে একযুগ এখানেই থাকিতে হইবে। দিনের বেলা পাঁচীলের মধ্যে খোলা জায়গায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতে বা ইচ্ছানুযায়ী কাজকর্ম্ম করিতে পারে কিন্তু রাত্রে তাকে থাকিতে হইবে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ। পোষ্ট অফিসে দেওয়ালের গায়ে খোপ কাটিয়া লোকে যেমন চিঠিপত্র ফেলে ঠিক সেই রকমই একটা ব্যবস্থা অহিভূষণকে করিয়া দেওয়া হইবে—তার যখন যা দরকার কাগজে লিখিয়া ঐ ভাবে সে অবিনাশকে জানাইতে পারে। তাদের কারো সঙ্গে কথা বলা বা তাদের কারোর মুখ দেখা অবিনাশের বারণ, সেরূপ কোনও চেষ্টা হইলেই বাজীর সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। ঠিক ঐ রকম একটা উপায়ে অহিভূষণের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র অবিনাশ তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবে। বাগান-বাড়ীটির ঠিক সামনেই অবিনাশের গোমস্তার বাস, তিনি এবং সেখানকার দরওয়ান নানা কাজের মধ্যেও অষ্টপ্রহর কারাগারের প্রতি কড়া নজর রাখিবেন।

অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবস্থানুযায়ী কাজ আরম্ভ হইল। প্রথম প্রথম অহিভূষণ ভাবিল বাগ-বাগিচার কাজ করিয়া সে সময় কাটাইবে। ফল ও ফুলের বাগিচা সম্বন্ধে ভাল ভাল বিলাতী বই আনাইয়া হু হু করিয়া সে পড়িয়া ফেলিল। তারপর সকাল-বিকাল নিয়মিত পরিশ্রমের ফলে যে বাগানটির সৃষ্টি হইল তা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! অবিনাশকে সে লিখিয়া জানাইল বাগানের কাজে আশাতিরিক্ত সাফল্য পাওয়া গেছে। প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি ফল ও ফুলের নমুনা পাঠাইতেও সে ভুলিল না।

কিন্তু পাঁচ-ছ' মাসের বেশী এ কাজে অহিভূষণের উৎসাহ টিকিয়া রহিল না। তার কেবলই মনে হইতে লাগিল নিজের কাজে নিজের তৃপ্তিই যথেষ্ট নয়, আরও পাঁচজনকে তৃপ্তি না দিতে পারিলে সে কাজের যেন কোন সার্থকতাই থাকে না। মানুষের তৃপ্ত মুখ সে দেখিতে চায়। আঃ, মানুষের মুখ—ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মুখ! কতদিন সে দেখে না!

সে বছরের বাকী কয়টা মাস অহিভূষণের কাটিতে লাগিল বড়ই অশান্তিতে। কত রকমের কাজে সে আপনাকে ভুলাইয়া রাখার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সর্ব্বক্ষণই তার সকল রকম কাজকে, সকল রকম চিন্তাকে চাপাইয়া উঠিয়াছে শুধু একটি মাত্র চিন্তা—ওই যে কয়েক ইঞ্চি পুরু ইটের দেওয়াল, ওর ওপারে কি অপূর্ব্ব রাজ্য মানুষের সমাজ—সুখে-দুঃখে গড়া মানুষের সমাজ! থাক সেখানে দুঃখ, অহিভূষণ সেখানেই পড়িয়া থাকিতে চায়, এখানকার রাজত্বেও তার অরুচি। ভুল বলিয়াছেন তাঁরা যাঁরা নির্জ্জনতার জয়গান গাহিয়াছেন। তাঁরা যে কেবল পরের মুখেই ঝাল খাইয়াছেন অহিভূষণের অবস্থায় পড়িলে নিশ্চয়ই তা স্বীকার করিতেন। কতবার সে ভাবিয়াছে ইটের এ ব্যবধানটুকু সে তো এক মুহূর্ত্তেই ঘুচাইয়া ফেলিতে পারে। শুধু অবিনাশকে একখানা চিঠি লেখা মাত্র, পরমুহূর্ত্তে

সে খুসী হইয়াই রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত করিয়া দিবে। কেবল তার বাজীতে হার হইবে এই মাত্র। কতবার সে লোভ তার হইয়াছে। কি করিয়া সে যে তা সামলাইয়াছে নিজেই জানে না।

অহিভূষণ জানিত দুনিয়ায় একটি মাত্র কাজ আছে যার দৌলতে মানুষ পৃথিবী তো দূরের কথা, আপনাকেও ভুলিয়া যায়।—পড়াশুনা। দ্বিতীয় বছর হইতে সে এই কাজেই মনোনিবেশ করিল। মানুষের সঙ্গে মুখের আলাপ না ঘটুক, মানুষের মধ্যে সেরা যারা, বইয়ের ভিতর দিয়া তাদের সহিত আলাপ সে তো করিতে পারিবে!

অবিনাশের নিকট বই সরবরাহের জন্য চিঠি আসিল। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে টাকা জমা দিয়া অবিনাশ বই পাঠাইতে সুরু করিল অহিভূষণের কয়েদখানায়—রাশি রাশি বই। সমস্তই প্রায় গল্পের,—দেশী, বিলাতী, ফরাসী, রাশিয়ান। কিছুকাল পরে অহিভূষণ লিখিয়া জানাইল—গল্পের মানুষের কথা আর তার ভাল লাগিতেছে না, সে এখন জানিতে চায় আসল মানুষের কথা, কাজেই অতঃপর তাকে আর গল্পের বই না পাঠাইয়া যেন জীবনী পাঠান হয়,—মহাপুরুষদের জীবনী, ভাবুকদের জীবনী, কর্ম্মীদের জীবনী।

এইভাবে বছর দুই কাটিয়া গেল, অহিভূষণের নিকট হইতে একদিন আবার সংবাদ আসিল—লোকের জীবনী আর নয়, এখন সে জানিতে চায় জাতির জীবনী। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হইতে এবার চালান যাইতে লাগিল ঝুড়ি ঝুড়ি দেশ-বিদেশের ইতিহাস।

পঞ্চম বৎসরের পর অহিভূষণ সুরু করিল দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা, পড়ার নেশা এখন তার চরমে উঠিয়াছে। হাল্কা গল্পের বইগুলি পড়িয়া ফেরৎ পাঠাইতে আগে তার সপ্তাহ খানেক লাগিয়া যাইত, এখন সেই সময়ের মধ্যেই সে জটিল দর্শনের বইগুলি নিঃশেষ করিয়া ফেরৎ পাঠায় যা আয়ত্ত করিতে সাধারণ লোকের মাসের পর মাস কাটিয়া যাইবার কথা। অবিনাশের কেমন সন্দেহ হইল লোকটা বাস্তবিকই বইগুলি পড়ে তো? অনেক দিন আগেই সে রাজমিস্ত্রি লাগাইয়া উঁচু পাঁচীলের মাথার কাছাকাছি একটা ছোট ফুটা তৈয়ারী করাইয়া লইয়াছিল। মইএ চড়িয়া সে ফুটায় চোখ রাখিলে অহিভূষণের কয়েদখানার সমস্তটাই চোখে পড়িত অথচ ভিতর হইতে অহিভূষণের পক্ষে বাহিরের লোককে লক্ষ্য করার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। একদিন বিকালে অবিনাশ সেই রন্ধ্রপথে দেখিতে পাইল বারান্দার দেয়ালে বালিশ লাগাইয়া এবং সেই বালিশে ঠেসান দিয়া অহিভূষণ পুস্তক-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে—সকাল হইতে এতটা বেলা পর্য্যন্ত তাকে যে তিন বার তিন রকমের খাবার দেওয়া হইয়াছে সেগুলি সে অবস্থায় সেখানেই পড়িয়া, অহিভূষণের তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই।

দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচ বছর কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে অবিনাশের অনেকখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গত কয়েক বছর হইতেই তার ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছিল, বর্ত্তমানে দুর্দ্দশা চরমে আসিয়া পড়িয়াছে। দেনার দায়ে অনেকখানি সম্পত্তি ইতিমধ্যেই তাকে বিক্রী করিতে হইয়াছে। বছর দশেক আগে যে অবিনাশ একলক্ষ টাকাকে নিতান্ত হেলাফেলার বস্তু মনে করিত আজ তার এমন অবস্থা যে দু' বছর পরে অহিভূষণ কয়েদখানা হইতে বাহির হইয়া সে টাকা দাবী করিলে তাকে স্ত্রী-পুত্র নিয়া নির্ঘাৎ পথে দাঁড়াইতে হইবে। লক্ষ টাকার লোভে যে লোক দশ বছর

এই অদ্ভুত জীবন যাপন করিতে পারিয়াছে বাকী দুটি বছর তার পক্ষে আর কী ? অবিনাশ আর পূর্ব্বের মানুষ নাই। শরীর ও মন দুই-ই তার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মাত্র দুটি বছর, তারপর ধনীর দুলাল অবিনাশ ভিখারীর বেশে রাজপথে দাঁড়াইবে, আর সেই পথ দিয়াই লক্ষপতি অহিভূষণের মোটর গর্ব্বিত সিংহনাদ করিতে করিতে ছুটিতে থাকিবে।

অহিভূষণেরও কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেছে। কয়েদের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে বলিয়াই কিনা জানি না, তার লেখাপড়ায় বিলক্ষণ ভাঁটা পড়িয়াছে। যে গ্রন্থকীট অহিভূষণ গভীর দর্শনের বইগুলি সপ্তাহে সপ্তাহে পড়িয়া ফেরৎ পাঠাইত গত দেড় বছর হইতে সে একখানিও নতুন বই চায় নাই। দেড় বছর আগে সে একখানি তুলসীদাসের রামায়ণ আনাইয়াছিল, তারপর এতদিন যাবৎ সে কেবল সেখানাই পড়িতেছে। অথচ এমন নয় যে হিন্দী ভাষা তাকে নতুন শিখিতে হইতেছে ; ছেলেবেলা তার কাটিয়াছে কাশীতে, উৎকৃষ্ট হিন্দীই তার জানা আছে।

অহিভূষণের মুক্তির ঠিক আগের দিন। সকালে উঠিয়াই অবিনাশের স্ত্রী অবিনাশের মুখের দিকে তাকাইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এক রাত্রের মধ্যে অবিনাশের মাথার প্রায় সমস্ত চুল সাদা হইয়া গেছে।

বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত বহু সাধ্যসাধনা করিয়াও যখন অবিনাশকে কেহ জলস্পর্শ করাইতে পারিল না হঠাৎ সেই সময় কয়েদখানার গোমস্তার নিকট হইতে এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ আসিল— অহিভূষণের উন্মাদ রোগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কিছু দিন হইতেই সে লক্ষ্য করিতেছিল অহিভূষণ আপন মনেই উচ্চস্বরে কথা বলে, বিড় বিড় করিয়া সারা উঠান ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনো কখনো তুলসীদাস হইতে আবৃত্তি করে, কখনো আবার হু-হু করিয়া কাঁদিতে থাকে। আজ সে ধারণা তার বদ্ধমূল হইয়াছে।

অবিনাশ তড়াক করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অহিভূষণ পাগল হইয়া গেছে? চুক্তির লক্ষ টাকা তবে সে চেষ্টা করিলেই বাঁচাইতে পারে! তাকে স্ত্রী-পুত্র নিয়া পথে দাঁড়াইতে হইবে না!

আশার আলোক অবিনাশের চোখের সম্মুখে ধাঁধিয়া উঠিল। এমন পিশাচও মানুষ হয়! যাকে একদিন বন্ধু বলিয়া সে গ্রহণ করিয়াছিল, স্বার্থের অনুরোধে আজ তার সর্ব্বনাশ করিতেও সে পিছ-পা নয়।

রাত্রি তখন একটা, সমস্ত জগৎ ঘুমে অচেতন। ধীরে, অতি সন্তর্পণে অবিনাশ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল। তারপর এক পাঞ্জাবীর ট্যাক্সি ধরিয়া গাড়ী চালাইতে হুকুম দিল—কয়েদখানার দিকে।

রাত্রি গোটা দুইএর সময় কড়া নাড়ার আওয়াজ পাইয়া গোমস্তা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সম্মুখে 'বাবু'কে দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অবিনাশ তৎক্ষণাৎ ঠোঁটে তর্জ্জনী চাপিয়া গোমস্তাকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল, তারপর গলা খাটো করিয়া কহিল, "আপনি লিখেছেন অহিভূষণ পাগল হয়ে গেছে। এই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। এই অবস্থাতে এখুনি আমরা তাকে

কয়েদখানার বাইরে এনে ছেড়ে দেব। কাল বেলা বারোটায় তার মুক্ত হবার কথা, বাজী রাখবার সময়ে যাঁরা যাঁরা কাগজে সই করেছিলেন তাঁরা আমাকে নিয়ে সে সময় কয়েদখানার ফটকে এসে হাজির হবেন। তাঁদের কাছে প্রমাণ হয়ে যাবে অহিভূষণ পাগল অবস্থাতে জেলখানা থেকে আপনিই ভেগে পড়েছে। আমার লাখ টাকা বাঁচাবার কেবল এই একমাত্র উপায় আছে—নতুবা আমায় পথে দাঁড়াতে হবে।"

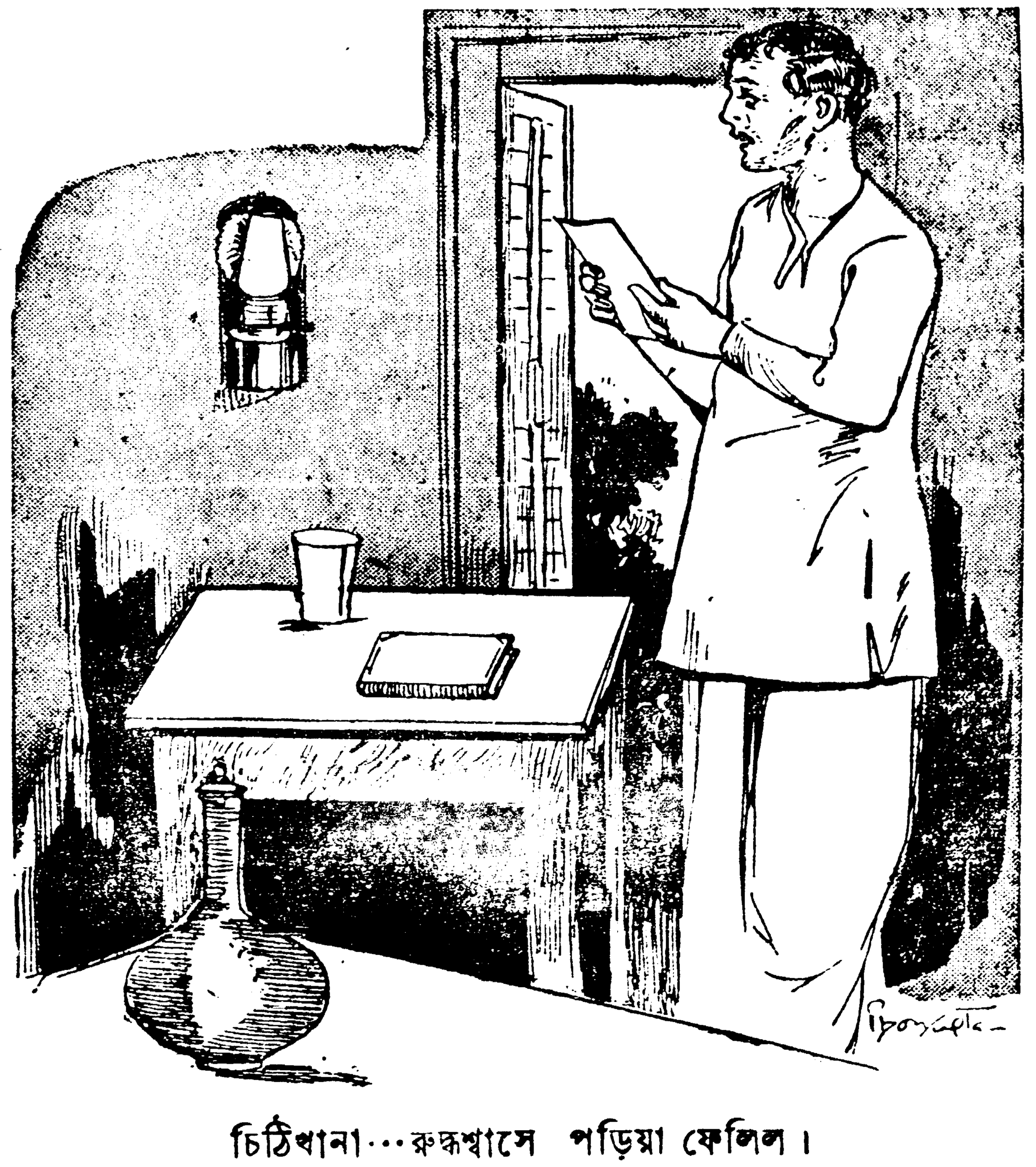

চিঠিখানা···রুদ্ধশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল।

গোমস্তা চালাক লোক, মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাপারটি আঁচিয়া নিয়া কহিল, "চমৎকার মৎলব। পাঁচালের গায়ে গোটা-কতক লোহা পুঁতে রাখলেই সবাই ভাববে ওই পথেই পাগল সটকেছে। আর তা ছাড়া গাঁ আমাদের, সাক্ষী-সাবুদ জোটাতেও কষ্ট হবে না।"

দরওয়ানকে সঙ্গে লইয়া উভয় তখন কয়েদ-খানার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু কোথায় অহিভূষণ? তার ঘর খোলা, সে ঘরে তো জনপ্রাণী নাই! সে কি তবে রাত দুপুরে উঠানময় টহল দিয়া বেড়াইতেছে?

আলো জ্বালাইতেই অবিনাশ দেখিল টেবিলের উপর গেলাস চাপা দেওয়া একখানা চিঠি। চিঠিখানা হাতে নিয়া তাড়াতাড়ি রুদ্ধশ্বাসে সে পড়িয়া ফেলিল। তাতে লেখা ছিল :

"ভাই অবিনাশ,

বারো বছর লোকালয়ের বাইরে রেখে তুমি আমার কাছে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়েছ। তার ফলে আজ আমি এমন জিনিষ পেয়েছি যার কাছে তুচ্ছ একলাখ টাকা কিছুই নয়। এমন একদিন ছিল যখন লাখ টাকা পেলে আমি হাতে স্বর্গ পেয়েছি মনে করতাম, কিন্তু আজ আমার চোখে তা পথের ধুলো ছাড়া আর কিছুই নয়। জগতের কাছে এ কথাই আজ আমি প্রমাণ করতে চাই। কাল বেলা বারোটার সময় আমার কয়েদের মেয়াদ পূর্ণ হবে ; ঠিক তার বারো ঘণ্টা আগে,

অর্থাৎ আজ রাত বারোটার সময় আমি এই চিঠি লিখে এই ঘরের স্কাই-লাইটের ফুটো দিয়ে ভেগে পড়ছি। বাজীর কাগজে যাঁরা সই করেছিলেন তাঁদের এই চিঠিখানা দেখিও।"

—ইতি অহিভূষণ।

অবিনাশ চিঠিখানা দুইবার পড়িয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া গোমস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল। তার চোখের কোণে ও কি? জল নাকি? গোমস্তা তখন চিঠিখানা 'বাবু'র হাত হইতে তুলিয়া নিয়া নিজেই চোখ বুলাইয়া নিল, তারপর তুড়ি মারিয়া কহিল, "আর কি, কেল্লা ফতে! রেখে দিন বাবু, চিঠিটা যত্ন করে— দলীলের সিন্দুকে তুলে রাখবেন।"

তার পানে চাহিয়া একটু ম্লান হাসির সহিত অবিনাশ কহিল, "কোন দরকার নেই, চক্কোত্তি মশাই। অহিভূষণ এখন অনেক উঁচু স্তরের জীব, তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী-প্রমাণের দরকার নেই। চলুন বাইরে যাই, রাত প্রায় কাবার হয়ে এলো।" *

*একটি রাশিয়ান গল্পের ভাবাবলম্বনে।

একটি সত্যিকার বাঘের গল্প

শ্রীএস্. ডি. মুখার্জ্জী

আমার দুই ছেলে, বাবু আর ঝুনু, বালিগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়ে। ক'দিন ধরেই তারা ধরে বসেছে তাদের বাঘের গল্প বল্তে হবে। নানা পত্রিকাতে তারা বাঘের গল্প পড়ে আর মধ্যে মধ্যে ঘরে বসে বসেই বাঘ শিকার করবার চেষ্টা করে। তোমরা বোধ হয় বুঝলে না ঘরে বসে কলকাতাতে আবার বাঘ শিকার করে কি ক'রে! তাই না? আমিও প্রথম প্রথম তাদের শোবার ঘরে বালিস-তোষকের মধ্যে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে, হাতে খবরের কাগজের চোঙ্গাতে মুখ রেখে দুম্—দুম্ ফটাস্ আওয়াজ করতে দেখে অবাক্ হতাম। কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে বিছানাটা ওদের মাচা, বালিশগুলো জঙ্গল আর খবরের কাগজের চোঙা ওদের বন্দুকের নল তখন থেকে আর কিছু বলি না।

আলিপুরের চিড়িয়াখানা ছাড়া জ্যান্ত বাঘ দেখবার আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আজ পর্য্যন্ত হয় নি। কাজেই, বাঘ শিকার-কাহিনী বই বা মাসিক পত্রে পড়ে জানা ছাড়া আমার কোন গত্যন্তর নেই। যেটার কথাই ওদের কাছে বলতে যাই সেটাতেই ওরা বলে ওঠে, 'ও আমাদের জানা গল্প।'

কি মুশকিল! অবশেষে বন্ধু-বান্ধবদের শরণ নিলাম, তাঁরা যদি কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারেন। শুনে আমার সহকর্মী শ্রীদীনেশচন্দ্র হালদার মশাই এমন এক

মজার কাহিনী শোনালেন যে সেটা বাবু-ঝুনুর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও না শুনিয়ে থাকতে পারলাম না। যাদুর সম্বন্ধে লিখে থাকি বলে তোমরা আমায় যাদুকর বলেই হয়তো চেন। এই কাহিনী পড়ে আবার আমায় মস্ত বড় শিকারী ভেব না যেন! শ্রীযুক্ত হালদার মশায়ের কাছে যা শুনেছিলাম তা তাঁরই ভাষায় বলছি। ঘটনাটি নাকি সত্যি ঘটেছিল।

—হালদার মশায়ের কাহিনী—

পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক গ্রামে আমাদের বাড়ী। গ্রামের পাশ দিয়ে ছোট্ট একটা নদী চলে গেছে। গরমের সময় নদীর জল প্রায় শুকিয়ে যায় এবং পাশের ছোট্ট একটুকরো জঙ্গল থেকে মধ্যে মধ্যে বন্য জানোয়ার গ্রামের মধ্যে ঢুকে গ্রামের বাসিন্দাদের ওপর উৎপাত সুরু করে। গ্রামের লোকেরা সাধারণতঃ সজাগই থাকে এবং দরকার পড়লে খোঁচ্, ল্যাজা প্রভৃতির দ্বারা আত্মরক্ষা করে।

আমাদেরই গ্রামে কয়েক ঘর চাষী বাস করে যারা সারাদিন নদীর ধারের জমিতে চাষ করে আর রাত্রে চালাঘরে শোয়। যারা জোয়ান তারা আবার বাহাদুরি নেবার জন্য মাটীর দাওয়াতেও শোয়। পাশে থাকে তাদের রামদা, খোঁচ্ বা ল্যাজা। পাড়ায় কয়েক ঘর মুসলমান চাষীরও বাস আছে, তারাও চাষবাস করে খায়।

অমাবস্যার রাত, টিপ্ টিপ্ করে সামান্য বৃষ্টি পড়ছে। পাড়ার সবচেয়ে জোয়ান মরদ রামায়ণ দাস একটা কাঁথা গায়ে চাপা দিয়ে চালাঘরের দাওয়ায় শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘরের ভিতরে আছেন তার আর দুই ভাই, বউদিদিদের দল আর ছেলেমেয়েরা।

রাত্রি তখন আন্দাজ দুটো কিংবা আড়াইটে, হঠাৎ রামায়ণের ঘুমটা গেল ভেঙ্গে, —কে যেন কাঁথা ধরে টানছে। ঘুম-চোখে রামায়ণ কাঁথার ভেতরেই কনুইটা একটু তুলে দিলে। আর যেই না কনুই তোলা, অমনি হ্যাঁচকা টানে কে যেন কাঁথাটা তার গা থেকে তুলে নিয়ে দিলে এক দৌড়। রামায়ণের তখন ঘুম একেবারে ভেঙ্গে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ রগ্ড়ে ঘন কালো অন্ধকারের দিকে তাকালে। চকিতের মধ্যে একবার মাত্র দেখা গেল একটা ৪।৫ হাত লম্বা বাঘ, আর তার কাঁধে ও মাটিতে লুটোচ্ছে রামায়ণের কাঁথা।

বাঘের কাণ্ড দেখে কিন্তু রামায়ণ, ভয় পাবে কি, হেসেই আকুল। হাসির আওয়াজে ঘরের ভেতরের লোকেদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। এক বউদি জিজ্ঞাসা করলেন,— "ঠাকুরপো, হাস ক্যান?" রামায়ণ কোন রকমে হাসি থামিয়ে বলে—"বউ ঠাইরেণ, এড্ডা বাঘ আমার সাথে মশ্করা কইরা কাথা লইয়া গ্যাছে। দ্যাও, আমারে আর এড্ডা কাথা দ্যাও দেহি, বড় শীত লাগতে আছে।"

বউদিরা ভাবলেন রামায়ণ ঠাট্টা করছে, তাই তাঁরা আর কোন কথাবার্ত্তা না বলে পাশ ফিরে আবার শুলেন।

সকালে বউদিরা, দাদারা ঘুম থেকে উঠে সব ব্যাপার শুনে অবাক্।

এদিকে রামায়ণ ভীষণ একগুঁয়ে। কাল রাতে সে চাইতেও তাকে একটা কাঁথা দেওয়া হয় নি এতে তার মেজাজ বিগড়ে গেছে। সে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল,

আবার যেই লাফ মারতে যাবে ··

"বেশ, না দিলা আমারে কাথা, বঙ্গীয়া গেল! আমি বাঘের কাছ থেইকাই আমার কাথা ছিনাইয়া আনুম।" তার পরেই, কথা নেই বার্তা নেই, পরনে ছিল মস্ত এক গামছা, তাই গাছকোমর বেঁধে দৌড়—জঙ্গলের দিকে। হাঁ-হাঁ করে উঠলো সবাই, কিন্তু কে কার কথা শোনে? ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ুচ্ছে তখন রামায়ণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই রামায়ণকে আর দেখা গেল না।

এখন কি করা? রামায়ণ বরাবরই একরোখা, তার অসাধ্য কিছুই নেই। কিন্তু তাই বলে···! আমরা তখন একত্র বসে ঠিক করলাম, যে যার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে রামায়ণের খোঁজে যেতে হবে জঙ্গলে। সাজ সাজ রব উঠে গেল ঘরে ঘরে। ভিজে মাটির উপর বাঘের পায়ের ছাপের পাশে পাশে রামায়ণের পায়ের ছাপ দেখে দেখে আমরা চলতে লাগলাম নদীর উপরের বাঁশের সাঁকোটার দিকে।

রামায়ণ এদিকে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলে তার কাঁথাটা একধারে পড়ে আছে, আর তার উপর তিনটি বাঘের বাচ্চা খেলা করছে। পাশে বাঘিনী বসে বসে খেলা দেখছে। বাঘের পাত্তা নেই। রামায়ণ ভয় পেল না, হঠাৎ এক হুংকার দিয়ে সে কাছে এগিয়ে এলো। বাঘিনী হঠাৎ রামায়ণের হুংকার শুনে একটু থমকে গেলেও পরমুহূর্ত্তে মারলো এক লাফ রামায়ণের দিকে। রামায়ণও খোঁচ তুলেছিল মারবে বলে, কিন্তু হঠাৎ একটা গাছের ডালে সেটা আটকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হোল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে বাঘিনীর থাবাটা তার কাঁধ ছুঁয়ে চলে গেল। রামায়ণ সামান্য সরে গিয়েছিলো বলেই সে যাত্রা বাঘিনী তার ঘাড়ে পড়তে পারে নি, টপ্‌কে পাশের ঝোপে গিয়ে পড়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে আবার যেই সে লাফ মারতে যাবে, অমনি রামায়ণ তার অসম্ভব শক্তি দিয়ে বাঘিনীর সামনের দুই থাবা ধরে ফেলে প্রাণপণে তাকে ঠেলে রাখলো ও চিৎকার করতে লাগলো। ঠিক সেই সময়েই কিছু দূরের বন্য পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক মুসলমান রাখাল, তার গরু নিয়ে। সে ঐ অবস্থা দেখে গরু ফেলে ছুটে এলো রামায়ণকে সাহায্য করতে। রামায়ণের তখন অবস্থা কাহিল, নীচের পায়ের থাবার নখের আঁচড়ে জামাকাপড় হয়ে গেছে টুকরো টুকরো, পা দিয়ে দর দর করে রক্ত ঝরছে। বাঘিনীর মুখ ও সামনের থাবা দুটী একটু দূরে থাকায় কামড়াতে বা থাবা মারতে না পারলেও বাঘিনী তার জিভ বার করে রামায়ণের কপাল চেটে চেটে একপুরু ছাল-চামড়া সাবাড় করেছে। মুসলমান চাষী তখন সাহসে ভর করে এগিয়ে এসে ধরলো বাঘিনীর দুটী নীচের পা, এবং টানাটানি করে বাঘিনীকে ফেলল শুইয়ে। ইতিমধ্যে আমরাও এসে পড়েছি যুদ্ধক্ষেত্রে। তখন সুরু হোলো সমবেত ভ্যাবে বাঘিনীকে ঠ্যাঙ্গান—লাঠি দিয়ে। বাঘিনী মৃত্যু বরণ করলো। আমরা বাঘিনীর মৃতদেহ, তিনটী বাচ্চা আর আধমরা রামায়ণকে নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

রামায়ণকে শয্যাগত থাকতে হয়েছিল অনেক দিন। বাচ্চা তিনটীর মধ্যে একটীকে পরের দিন বাঘ এসে কোন্ ফাঁকে নিয়ে পালিয়েছিল। অন্য দু'টী স্থানীয় এক জমিদার বেশ কিছু টাকা দিয়ে কিনে নিলেন এই ঘটনার পর বাঘের উপদ্রব আরো বেড়ে গেল। বাঘ যেন বাঘিনীর মৃত্যুর শোধ তুলবার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। রোজই রাত্রে এসে হাঁস, মুরগী, বাছুর তুলে নিয়ে যেতে লাগলো। শেষে ফাঁদ পেতে ঐ বাঘকে জ্যান্ত ধরা হ'ল ও কোন এক সার্কাস্ পার্টির কাছে বিক্রী করা হ'ল। চুরি-যাওয়া বাচ্চাটার কিন্তু কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

মজার ম্যাজিক

যাত্নশ্রী শঙ্কর দাস

ছোট্ট বন্ধুরা, আগের বারে তোমাদের যে খেলাটা শিখিয়ে দিয়েছিলাম তা তোমরা অনেকে করতে পেরেছ জেনে খুবই খুসী হলাম। আজ তোমাদের আর একটা মজার ম্যাজিক শিখিয়ে দিচ্ছি। খেলাটীর নাম "রং-বদলানো রুমাল"।

লেখক শ্রীশঙ্কর দাস
(যাত্নকরের বেশে)

যাত্নকর একটা লাল রংএর সিল্কের রুমাল দর্শকদের দেখিয়ে, তাঁর ডান হাতটী মুঠো করে, ডান হাতের তলা দিয়ে লাল রংএর রুমালটী ঢুকিয়ে মুঠোর উপর দিয়ে রুমালটী টেনে বের করতেই দেখা গেল লাল রুমালটী নীল রংএ রূপান্তরিত হয়েছে। যাত্নকর রুমালটী দর্শকদের পরীক্ষার জন্য দিলেন এবং আরও দেখালেন যে তাঁর হাতের মধ্যে কিছুই নেই। এতে সকলেই খুব অবাক্ হলেন।

এখন খেলার কৌশলটী প্রকাশ করছি। ছোট্ট সাইজের একই মাপের খুব পাতলা একটী লাল ও একটী নীল রংয়ের সিল্কের রুমাল চাই। ফটো তোলার ফিল্মের কৌটো একটী এবং আধ হাত লম্বা সরু রবার ইলাষ্টিক সংগ্রহ কর। ফিল্মের কৌটোটীর তলাটা গোল করে কেটে ফেলো। এটীর হু'মুখ খোলা থাকবে। ইচ্ছা করলে রাংঝাল করার দোকান হ'তে আঙ্গুলের মত সরু একটী হু'মুখ খোলা (হুই ইঞ্চি লম্বা) চোঙ্গা করিয়ে নিতে পার। ইলাষ্টিকের এক মুখ চোঙ্গার গায়ে ভাল করে বাঁধো। ইলাষ্টিকের অপর মুখটা একটা সেফ্‌টীপিনের সঙ্গে বেঁধে, সেফ্‌টীপিনটী তোমার কোটের ডান হাতের হাতার ভিতর দিকে কনুইয়ের কাছে আটকে রাখ। নীল রংএর রুমালটী

খেলা দেখাবার আগে ঐ চোঙ্গার মধ্যে চেপে ঢুকিয়ে রাখবে। এই অবস্থায় চোঙ্গাটী তোমার ডান হাতের হাতার মধ্যে ঝুলে থাকবে। খেলা দেখাবার সময় লাল রংএর রুমালটী দর্শকদের দেখিয়ে ডান হাতের মুঠোর মধ্যে ঢোকাবার সময় দর্শকদের সতর্ক দৃষ্টি বাঁচিয়ে কৌশলে বাঁ হাত দিয়ে চোঙ্গাটী টেনে, ডান হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে, লাল রুমালটী ঐ চোঙ্গার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে. নীল রুমালটি চাপে বেরিয়ে আসবে। নীল

আমেরিকার শ্রেষ্ঠ যাত্নকর—"দি গ্রেট ভার্জ্জিল" যাত্নকর শঙ্কর দাসের অটোগ্রাফ খাতায় সই করছেন।

দেশবিদেশের বিখ্যাত যাত্নকর
বাঁদিক্ থেকে—মিঃ জারকু. যাত্নকর শঙ্কর দাস. দি গ্রেট ভার্জিল .আমেরিকা . যাত্নসম্রাট্ পি সি সরকার, কালানাগ (জার্মেনী) ও শ্রী চক্রবর্তী।

রুমালটী টেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের মুঠো আল্গা করে চোঙ্গাটী ছেড়ে দিলে তা হাতার মধ্যে চলে যাবে। এখন অনায়াসে নীল রুমালটী দর্শকদের পরীক্ষার জন্য দিতে পার। খেলাটী খুবই সুন্দর এবং তৈরী করতে খরচও বিশেষ নেই। আজই তৈরী করে বন্ধুবান্ধবদের দেখাও। খেলাটী কেমন লাগল জানিও। পরের বার নূতন খেলা নিয়ে আসছি। যাত্নবিদ্যা সম্বন্ধে কোন কিছু জানতে ইচ্ছা হলে, আগেই বলেছি, আমায় উপযুক্ত ডাকটিকিট সহ যাত্নকর শঙ্কর দাস—কলিকাতা-১০ এই ঠিকানায় পত্র দিও। আমি সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলাম।

রসময় ভাদুড়ী

শ্রীশামুক

ইস্কুলে একবার প্রবন্ধ লিখতে দিল – 'ভ্রমণের উপকারিতা'। কলম কামড়ে কামড়ে কিছুই খুঁজে পেলাম না যে কি লেখা যায়।

পুজোর ছুটিতে মধুপুর কি শিমুলতলা কি দেওঘর গেছি কয়েকবার। আর বড়দের মাছ ধরার সঙ্গী হয়ে শহরের মোড় ছাড়িয়ে আন্দুল, আমতা, বেলঘরিয়া, চিংড়িপোতা প্রভৃতি।

প্রবন্ধের জন্যে ভাবতে গিয়ে, দেখি খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হল্লা, হয়েছে প্রচুর আর নিয়ম মত পড়ার হাত থেকে রেহাই প্রতি বারই। উপকার হ'ল কার ও কোথায়—ভেবে ভেবে কিছু বার করতে পারলাম না।

অথচ আশ্চর্য এই যে সেদিন বাবলু যেই জিজ্ঞেস করলে তার ইস্কুলে ঐ একই প্রবন্ধের জন্যে কি লেখা যায় - সোজা মনে এসে গেল রসময় ভাদুড়ীর কথা।

রসময় বাবু খাকী পিরান ও খাটো ধুতি পরে মুঠো-করা হাত দু'পাশে আড়ষ্ট ঝুলিয়ে নিঃশব্দে পথে যাওয়া-আসা করতেন। কোনদিন কারুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে হেসে কথা বলতে বা কোন ভিড়ের মধ্যে উঁকি মারতে দেখি নি।

গলিতে আমাদের টেনিস বল খেলার ক্লাব। কতবার ওঁর সঙ্গে 'কলিশন' হয়ে গেছে। লজ্জায় সরে গিয়ে পথ দিয়েছি, আর উনিও সামলে নিয়ে চলা সুরু করেছেন। অবশ্য তখন শহরের সহিষ্ণুতা ছিল অনেক বেশী— সব পক্ষেরই। আজ 'নয়া পৈসার' গোসা-ঘুষি ও ঠেসাঠেসি দেখে মনে একটুও সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে সত্যি এক 'নয়া দুনিয়ার' সূত্রপাত হতে চলেছে মহাবিক্রমে।

রসময় বাবু আপিস যেতেন, ফিরতেন, আর বাকি সময় বাইরের ঘরে তক্তপোষে শুয়ে কি ব'সে কাগজ পড়তেন। বাড়ীর কোন কাজ করতে দেখি নি—এমন কি নিজের ছেলেমেয়েকে নিয়ে আদর বা গল্প করা —তাও নয়।

কিন্তু পথে দেখলে মনে হ'ত বড় ব্যস্ত মানুষ। ভাল করে চুল আঁচড়ানোর সময় পান নি, কাঁচা-পাকা জুলফির একটা বড়, অন্যটা ছোট, দাড়ি কামাতে গিয়ে শূন্যে ক্ষুর চালিয়েছেন, জামার সব ক'টা বোতাম কোনদিন এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যেত না।

মুঠো-করা হাত ঝুলিয়ে হন্ হন্ করে যেতে দেখলে মনে হ'ত সত্যি উনি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন না—যেন পৃথিবীকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। আর হাতের মুঠো যদি হঠাৎ খুলে যায় তো ভ্যাকুয়াম ব্রেকে থমকে দাঁড়িয়ে যাবেন—আর চলতে পারবেন না।

একদিন বেণুর সঙ্গে মহানন্দে ছুটে চলেছি, হঠাৎ ডাক এল—বেণু, শোন।

দু'জনে খুব শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে যাই।

—তোমার মামা বাঁকিপুরে থাকেন ?

—আজ্ঞে না।

—আরে, বাঁকিপুর মানে পাটনা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমার বাবার কাছে থেকে তাঁর ঠিকানাটা আমায় দিও তো। মানে এবারে আমায় আফিসের কাজে বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে। চেনা-জানা লোক থাকলে বিদেশে অসুবিধায় পড়তে হয় না।

এর পর থেকে বিছানার বাণ্ডিল আর সুটকেস নিয়ে রসময় বাবু প্রায়ই বাইরে যান আর আসেন। যাবার সময় গম্ভীর আঁটসাঁট চেহারা, ফিরে আসেন ঢিলেঢালা খুসি।

ধীরে ধীরে বেশভূষা ও স্বভাব বদলে যেতে লাগল। চুলের সিঁথি একটানা পরিষ্কার, ঝোলা পাঞ্জাবীর সঙ্গে কোঁচার খুঁট নীচে নামল। পথ চলতে চেনা মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে হেসে কথা বলেন, হঠাৎ কিছু কেন্দ্র করে ভিড় জমলে উনিও উঁকি মেরে তার আস্বাদ চেখে নেন।

শুধু এই নয়। সন্ধ্যের পর ছেলেকে কোলে নিয়ে লাইব্রেরীর রকে এসে বসেন। অন্যের গল্পে মেতে যান, আবার নিজের ভ্রমণ-কাহিনী মনোরঞ্জক করে বলেন। সব চেয়ে আশ্চর্য হলাম—ওঁর চলার সময় আড়ষ্ট হাতের শক্ত মুঠো কখন খুলে গেছে—সহজ ভাবে খোলা হাত দুলিয়ে চলেছেন।

আমাদের সঙ্গেও ভাব বেশ জমে উঠলো। একদিন তো জামা তুলে কোমরের চোরা-বেল্টও দেখিয়ে দিলেন— তার খোপে খোপে টাকাকড়ি নিয়ে যেখানে ইচ্ছে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানো যায়, পকেট মারার দুর্ভাবনা থাকে না।

ঠিক কত দিন মনে পড়ে না, তবে কয়েক বছর পরে। আবার আমি ও বেণু চলেছি, বেণু খপ্ করে হাত ধরে বলে—ঐ দেখ।

উলটো দিক্ থেকে রসময় বাবু আসছেন। সেই আগেকার চালে ঝুঁকে পড়ে থপ্ থপ্ করে সব কিছু এড়িয়ে হাঁটছেন, আড়ষ্ট হাত দুটো শক্ত মুঠো করা।

মন খারাপ হয়ে যায়। বেণু কাছে গিয়ে মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করে—আবার হাত মুঠো করে হাঁটছেন যে ? কি হয়েছে আপনার ?

—কই, না ! কিছু তো হয় নি ! ওঃ, হাত মুঠো করেছি বুঝি ? জানো বেণু,

আমাকে আর বাইরে যেতে হয় না। আমার প্রমোশন হয়েছে, মানে কাজে উন্নতি হয়েছে। এখন সারা বছর এক জায়গায় বসে বসেই কাজ করতে হবে।

—আপিসের কাজে না গেলে বুঝি আর বাইরে যাওয়া যায় না ?

—ও, তাই তো—তাই তো ! নিজেও যেতে পারি বৈ কি মাঝে মাঝে - নিশ্চয়ই। তুমি ভাল ছেলে, ভাল হোক তোমার।

এর পর থেকে রসময় বাবু বাড়ির সকলকে নিয়ে বাইরে যেতেন, মাঝে মাঝে, অল্প দিনের জন্যে— নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী। তবে আর কোনদিন ওঁকে হাত মুঠো করে পথ চলতে দেখি নি।

—মুর্শিদাবাদে—

শ্রীকৃষ্ণা স্থর

ইংরেজ রাজত্বের আগে স্বাধীন বাংলার শেষ রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। কলকাতা থেকে ১২২ মাইল দূরে। মুর্শিদাবাদ বলতেই অনেকের মুর্শিদাবাদী সিল্ক আর মটকার কথা মনে পড়ে, আর মনে পড়ে ওখানকার আমের কথা। কিন্তু সত্যি কি তাই ? একবার ঘুরে এসো ওখানে – ফিরে যাবে অতীতে, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের কর্মভূমিতে। ইতিহাসে আমরা সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা অনেক পড়েছি, তাঁর চরিত্র সম্বন্ধেও এমন অনেক ঘটনা জানা গেছে যার কথা শুনলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আসে না মোটেই। কিন্তু এই ২০।২২ বছরের যুবকের দেশপ্রেম—বিশেষ করে দেশ থেকে বিদেশী

প্রাধান্য উৎপাটিত করার আপ্রাণ চেষ্টা—সে কথা তো ইংরেজদের তৈরী ইতিহাস আমাদের শোনায় নি ! তা জানতে হ'লে হয়তো ইতিহাসেরও ইতিহাস হাতড়াতে হবে।

যাই হোক, সেবার সুযোগ জুটে গেল এই ঐতিহাসিক জায়গাটি দেখবার, এবং এক শীতের ভোরে মোটর যোগে হাজির হলাম সেখানে।

প্রথমেই এলাম মতিঝিলে। এটি ছিল সিরাজের মাসী ঘসেটি বেগমের প্রমোদ-উদ্যান। ঝিলটা দেখতে ঘোড়ার ক্ষুরের মত, কিন্তু বিরাট। বালিগঞ্জের লেকের চারগুণ হবে।

মুর্শিদাবাদ শহরের নামকরণ হয়েছে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর নাম থেকে। ইনিই এই রাজধানীর পত্তন করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথম জীবনে ছিলেন হিন্দু—ব্রাহ্মণ। পরে তিনি এক মুসলমান বণিকের কাছে পালিত হন এবং মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় মহম্মদ হাদী আরও পরে, বড় হয়ে, যখন তিনি নিজের প্রতিভা-বলে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন তখন দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁকে উপাধি দিলেন—"মুর্শিদ-কুলি মতিমন উল্ মুল্ক্ আলাউদ্দৌল্লা জাফর খাঁ নাসিরি নাসির জঙ্গ"। তাই থেকে সংক্ষেপ করে হ'ল মুর্শিদকুলি খাঁ।

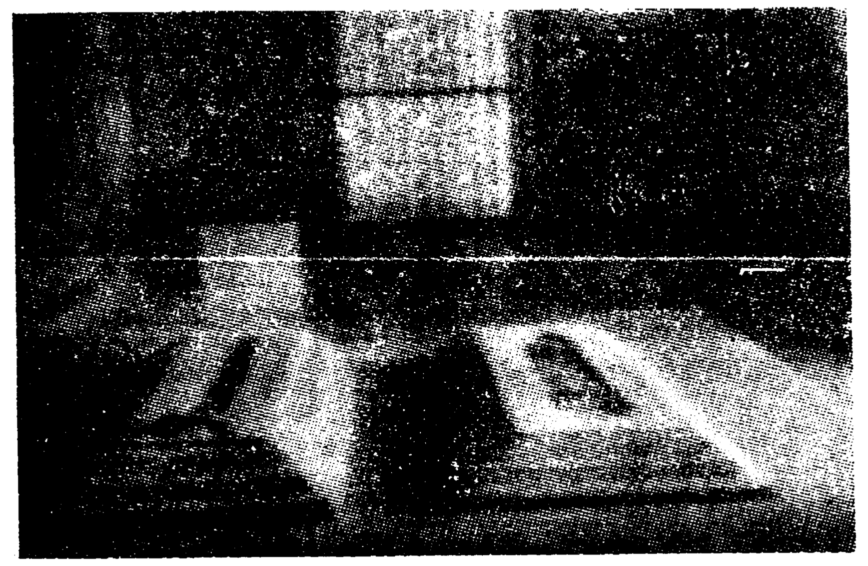

সিরাজ ও তাঁর বেগমের কবর—খোসবাগ

তা মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদ শহরটিকে রাজধানীর মত করেই গড়ে তুলেছিলেন, যদিও এখন তার সামান্য চিহ্নই অবশিষ্ট আছে। যা আছে তার মধ্যে কাটরার বিরাট মসজিদ একটা দেখবার জিনিষ। কাটরা মানে বাজার। নবাব ওখানে একটা বাজার বসিয়েছিলেন বলে এই নাম। মসজিদটির এখন অবশ্য খুবই ভগ্ন দশা। ৫টি বিরাট গম্বুজের অনেকখানিই ধ্বসে গেছে—তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় নীল আকাশ। চার ধারে চারটি উঁচু উঁচু মিনার ছিল, তারও মাত্র হু'টি অবশিষ্ট আছে। কিন্তু মসজিদের ভিতরকার চতুষ্কোণ উঠানটা দেখলেই বোঝা যায় সেটা কত বড় ছিল। আয়তনে ২৭ হাজার বর্গ ফুটেরও বেশী। এই মসজিদেই ঢুকবার সিঁড়ির তলায় ছোট্ট একটা কুঠরীতে মুর্শিদকুলি খাঁর সমাধি রয়েছে। শোনা যায় তাঁরই ইচ্ছায় ঐখানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল। প্রথম জীবনের নানা অন্যায় কর্মের কথা ভেবে শেষ জীবনে তাঁর

বোধ হয় অনুশোচনা হয়েছিল ; তাই প্রায়শ্চিত্ত করছেন সাধারণের পদধূলির যোগ্য হয়ে।

খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল, তাই সন্ধ্যায় ফিরে এলুম সহরের আস্তানায়। পরের দিন সকালেই নৌকা-যোগে "খোসবাগে"—সিরাজের দাদামশাই নবাব আলিবর্দী খাঁ, সিরাজ-পত্নী লুৎফা ও সিরাজের সমাধিস্থল দেখতে গেলাম। শ্রদ্ধাভরে ফুলের মালা দেওয়া হ'ল সমাধির উপরে। কিন্তু মন হ'ল ভারাক্রান্ত। অত্যন্ত অনাদরে পড়ে রয়েছে স্থানটি। বনজঙ্গলে ভরে গেছে। অথচ কলকাতায় দেখি, এখনও কত তুচ্ছ ইংরেজের প্রতিমূর্ত্তি কত জাঁকজমকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে শহরের বুকে। অবশ্য ইংরেজের চোখে তাঁরাই তখন ছিলেন এক একজন অসামান্য পুরুষ!

মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাসাদ হচ্ছে নববের হাজার-দুয়ারী রাজভবন। এই বাড়ীটির বয়স অবশ্য এখনও পূরো একশ' বছর হয় নি। ১৮৬৭ সালে নবাব হুমায়ূন জা'র আমলে এটি তৈরী হয়। কলকাতার রাজভবনের চার গুণ হবে বাড়ীটা। কেউ কেউ বলেন, লণ্ডনের বা কিং হাম প্রাসাদের অনুকরণে ইংরেজ এঞ্জিনীয়ারের প্ল্যান নিয়ে এটি তৈরী করা হয়। তৈরী করতে লেগেছিল আট বছর। স্থাপত্যটি নাকি ইটালিয়। এক হাজার দরজা আছে এই বাড়ীতে—তাই নাম হাজার-দুয়ারী। কিন্তু হাজারটি দুয়ারের জন্যই এর নাম নয়, এর আসলে পরিচয় এর ভেতরকার ছবি আর আসবাবপত্রে।

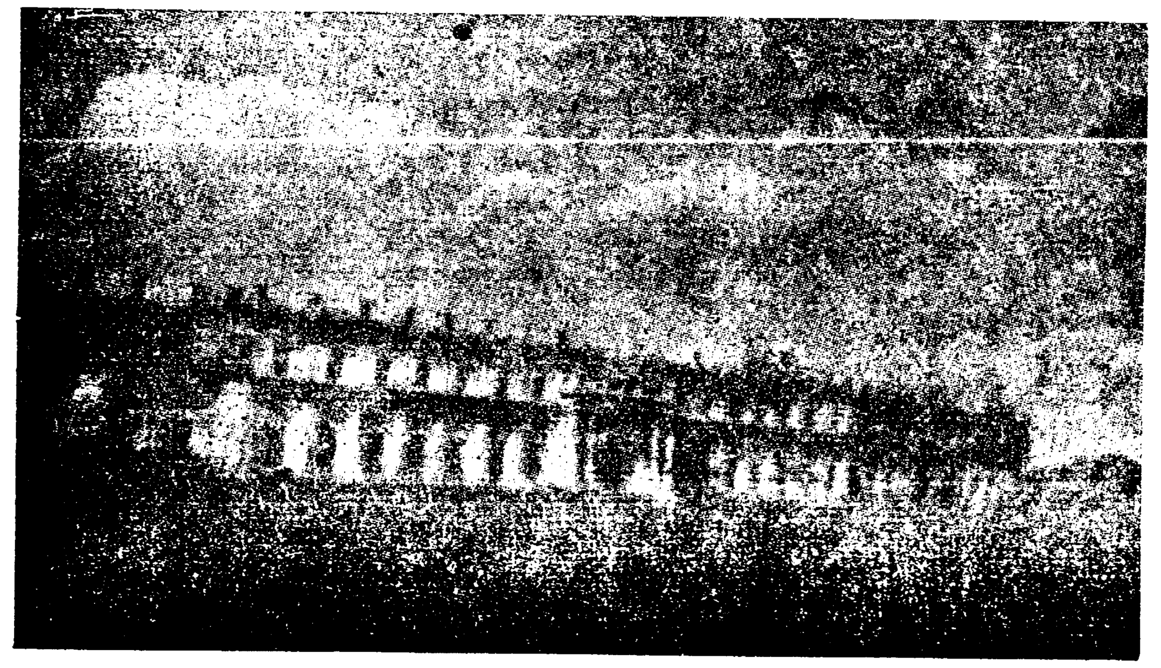

মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত ইমামবরা

সত্যি সৌখীন লোক ছিলেন নবাবেরা। কত দামী দামী ছবি,—পৃথিবীবিখ্যাত শিল্পী র‍্যাফেল, টিসিয়ান প্রভৃতির আঁকা মূল ছবি, কত বড় বড়, সুন্দর সুন্দর অয়েল পেটিং, দুষ্প্রাপ্য ফটো রয়েছে প্রাসাদে। রয়েছে অপূর্ব সব ভাস্কর্যের নিদর্শন, পাথরের আসবাব, কত রকম শিল্পের নমুনা। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সংগৃহীত।

কোনটা রেখে কোন্‌টা দেখি? হাতীর দাঁতের তৈরী হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিরও অভাব নেই।

প্রাসাদের নীচের তলায় একটি ঘর হচ্ছে অস্ত্রাগার। যে ছুরিকার আঘাতে মহম্মদী বেগ নিহত করেছিল সিরাজকে তাও দেখা গেল সেখানে। আলিবর্দী ও সিরাজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের তরবারী ও অন্যান্য অস্ত্রও দেখা গেল। সিরাজের তরবারীটা আমার কাঁধ স্পর্শ করে যায় অনায়াসে। ক' ফুট লম্বা ছিলেন বাংলার শেষ যুবক নবাব? পলাশীর যুদ্ধের সময় সিরাজের দু' পাশে যে রাজকীয় পতাকা ছিল তাও রয়েছে সাজান,—যদিও ময়লা, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

হাজারদুয়ারীর সামনে বিরাট ময়দান, তার ওধারেই বিরাট ইমামবরা,—৬৮০ ফুট লম্বা। এত বড় ইমামবরা বাংলা দেশে আর কোথাও আছে কিনা জানি না। ইমামবরার ভেতরে এক জায়গায় এক-মানুষ-সমান মাটী কেটে সরিয়ে সেখানটা সুদূর কার্বালা থেকে মাটী এনে ভরাট করা হয়েছিল।

ময়দানের মধ্যে একটি কামান বসানো আছে। লোহার তৈরী বিরাট কামান.—লম্বায় ১৮ ফুট, বেড়ে সাড়ে চার ফুট। কামানের গায়ে কামান-নির্মাতার নাম খোদাই করা। হিন্দু কামার—জনার্দন কর্মকার। কামানের নাম জাহানকোষা।

মুর্শিদাবাদের আর একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত স্থান হ'চ্ছে জাফরাগঞ্জ—যেখানে মীর জাফর নবাব হবার আগে বাস করতেন। এও একট. কেল্লার মত বাড়ী, তবে ভেতরটা এখন ভেঙ্গে গেছে, বিরাট ফটক বা তোরণটাই শুধু আছে। এই বাড়ীতেই ইংরেজ কুঠিয়াল ওয়াট, জগৎ শেঠ, মীর জাফর প্রভৃতি সিরাজের বিরুদ্ধের চক্রান্ত করেন। ওয়াট লুকিয়ে পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকের বেশে পাল্কী চড়ে এসেছিলেন। এই প্রাসাদেরই এক ঘরে মহম্মদী বেগের অস্ত্রের ঘায়ে সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড মাটীতে লুটিয়ে পড়েছিল। মহম্মদী বেগ ছিল আলিবর্দী খাঁর আশ্রিত ও অনুগৃহীত। এই কৃতঘ্নতার জন্য ইতিহাসে তাই সে বিখ্যাত হয়ে আছে। আজও তাই ঐ জায়গাটাকে বলা হয় "নিমকহারামী দেউড়ী"। সে ঘরটা অবশ্য এখন আর নেই, কিন্তু জায়গাটি পাঁচীল দিয়ে ঘিরে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে দেখলাম।

জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের কাছেই রাস্তার ধারে পাঁচীল-ঘেরা একটি জায়গায় নবাবদের সমাধি-স্থান। পাশাপাশি বহু নবাবের কবর রয়েছে। এ জায়গাটি সিরাজউদ্দৌলার কবরের মত নয়—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দেখাশোনা করার লোকও আছে। বিশ্বাস-ঘাতক মীর জাফরকেও (জাফর খাঁ) দেখলাম এখানেই কবর দেওয়া হয়েছে। তার পাশে দেওয়াল-ঘেরা ছোট একটা জায়গায় বেগমদের কবর।—মণি বেগম, বেচু বেগম প্রভৃতি।

বেচারারা মরেও রেহাই পান নি, ওঁদের কবরগুলিকেও যেন পর্দানশীনের মত করে রাখা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক জায়গাগুলির কথাই কিছু কিছু বললাম। এ ছাড়া বহরমপুর সহর, গঙ্গা, গঙ্গার ধারের বেড়াবার রাস্তা, একশ' বছরেরও পুরোনো কৃষ্ণনাথ কলেজ—কত কিছু দেখবার আছে। কিন্তু তার ফর্দ দেওয়াও যেমন সম্ভব নয়, আমাদের হাতে তা ভাল করে দেখারও সময় ছিল না। ভবিষ্যতে আবার একদিন দেখবার আশা নিয়ে ফিরতে হ'ল কলকাতায়। তোমরাও, যারা দেখ নি, সুযোগ পেলেই এই ঐতিহাসিক নগরীটি একবার দেখে এসো।

মগজের গল্প

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস্-সি

"আয় তোর মুণ্ডুটা দেখি, আয় দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে,
দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।"

কবি সুকুমার রায়ের লেখা এই মজার কবিতাটা তোমরা অনেকেই হয়তো পড়েছ। টেলিস্কোপ দিয়ে যদি বহুদূরের অ-দেখা জিনিষ দেখা যায়, মাইক্রস্কোপ দিয়ে যদি কাছের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য জিনিষগুলি ধরা পড়ে, তবে এই ফুটোস্কোপ দিয়ে মগজের ভেতরটাই বা কেন দেখা যাবে না ?

দুঃখের বিষয় কবির কাল্পনিক এই 'ফুটোস্কোপ যন্ত্র' এখনও আবিষ্কার করা যায় নি—কোন দিন যাবে বলেও মনে হয় না। হ'লে অবশ্য খুবই ভাল হ'ত। কিন্তু মগজ এমনি এক জটিল জিনিষ যে বিজ্ঞানীরা ওর রহস্য বার করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেছেন। বহুদিনের বহু চেষ্টায় ওর সম্বন্ধে যেটুকু জানা গেছে তা এত সামান্য যে তাকে "মহাসিন্ধুর" কাছে "বারিবিন্দু" বললেও হয়তো বাড়িয়ে বলা হয়। অন্যান্য জীবের তুলনায় আবার মানুষের মগজ অসম্ভব রকম জটিল।

ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কীটপতঙ্গের মধ্যে পিঁপড়েকে আমরা বেশ বুদ্ধিমান্ বলে মনে করি। পিঁপড়ের জীবনযাত্রা ভাল করে পরীক্ষা করলে অনেক বড় বড় জীবজন্তুর তুলনায় সত্যি ওদেরকে বেশ বুদ্ধিমান্ বলেই মনে হয়। এই বুদ্ধি জিনিষটা হচ্ছে মগজের ব্যাপার, কিন্তু পিঁপড়ের সত্যি কোন মগজ আছে কিনা জানা

যায় নি। বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা করে পিঁপড়ের দেহে শ' আড়াই মাত্র স্নায়ুকোষের সন্ধান পেয়েছেন। ওরই সাহায্যে নাকি পিঁপড়ে তার ঐ সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে। আর মানুষের বেলায়, দেখা গেছে, তার মগজের মধ্যেই যে স্নায়ুকোষ আছে তার সংখ্যা কম করে হাজার কোটি হবে। তফাৎটা কল্পনা কর। কী জটিল জিনিষ মানুষের এই মগজ! নয় কি ?

বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই মগজ কেটেকুটে, ছিঁড়ে, ছাড়িয়ে কোন ভাবেই পরীক্ষা করতে ছাড়েন নি। বাইরে থেকে যেটুকু জানা সম্ভব তা তাঁরা জেনেছেনও, এবং দীর্ঘদিনের পরীক্ষা, নিরীক্ষা, গবেষণার পর অনে-ক নতুন কথাও শুনিয়েছেন। কিন্তু তবু মনে হয়, এখনও ও সম্বন্ধে তাঁদের অনেক কিছুই জানতে ও শোনাতে বাকি আছে।

বাইরে থেকে এই মগজকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সামনের দিক্‌কার অংশ, মাঝের অংশ আর পেছনের অংশ। বিজ্ঞানীরা এদের ৩টে নামও দিয়েছেন—'সেরিব্রাম', 'সেরিবেলাম' আর 'মেডুলা অবলঙ্গেটা'। সামনের অংশটাকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায় এবং এরই ওপর হচ্ছে মগজের সবচেয়ে প্রধান অংশ, যাকে বলা চলে 'নতুন মগজ'। মগজের বাকিটুকুকে 'পুরোনো মগজ' বলতে পার।

তোমরা হয়তো হাসছ, ভাবছ মগজের আবার নতুন পুরোনো কি ? জন্মের সময় থেকেই তো গোটা মগজটা মাথার খুলির মধ্যে ভরে দিয়েছেন ভগবান্। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা আকারে হয়তো বেড়েছে, কিন্তু ওর আবার পুরোনো নতুন কি ?

কথাটা কতকটা ঠিক, কিন্তু এই নামকরণের একটা কারণ আছে বৈকি! একজন বিশেষ মানুষের মগজ নিয়ে দেখলে হয়তো কথাটার কোন মানে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো একজনের ব্যাপার নিয়ে নামকরণ করেন না—তাঁদের চোখের সামনে ভাসছে সমস্ত জীবজগৎ। কেমন করে সেই সৃষ্টির গোড়া থেকে সুরু করে এক জাতের প্রাণী থেকে এল আর এক জাতের প্রাণী, তার থেকে এল আর এক জাতের প্রাণী—এই ভাবে সমস্ত জীবজগতের ক্রমবিকাশের কথাটাই ভেবেছেন তাঁরা। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কথাই ধরা যাক্ না। প্রথমে এল মাছ, তার পর উভচর, সরীসৃপ ; সরীসৃপ থেকে একদিকে গেল পাখী, আর একদিকে স্তন্যপায়ী এই ভাবে স্তন্যপায়ীর শেষ স্তরে এসেছে সবচেয়ে নতুন প্রাণী মানুষ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাছ আর উভচর—এই দুই প্রাণীর মাথায় কেবল পুরোনো মগজটুকুই দেখা যায়, নতুন মগজ বলে তার মধ্যে কিচ্ছু নেই। সরীসৃপের মধ্যেই প্রথম ঐ মগজের সাক্ষাৎ মেলে—কিন্তু খুব অস্পষ্ট ভাবে। পাখীর বেলাও প্রায় তাই। কিন্তু যেমন স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হ'ল অমনি আস্তে আস্তে এই নতুন মগজের অস্তিত্ব দেখা যেতে লাগল। তার পর যখন বানর

জাতীয় জীব দেখা দিল তখন এই নতুন মগজ বেশ বেড়ে উঠেছে। অবশেষে সভ্যতম জীব মানুষের বেলায় এসে দেখা গেল এই মগজের পরিপুষ্টি হয়েছে সব চেয়ে বেশী,—ছোট্ট পুরোনো মগজকে টুপির মত ঢেকে ফেলেছে এই অতিকায় নতুন মগজ এবং এরই জন্য অন্য সব প্রাণীর তুলনায় মানুষের মগজ আয়তনে ও ওজনে হয়েছে সব চেয়ে বড়। সৃষ্টির গোড়ার দিকে অর্থাৎ প্রথম যুগের প্রাণীদের এ মগজ ছিল না বলেই এর নাম দেওয়া হয়েছে 'নতুন মগজ'।

পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর চাইতে মানুষ বেশী বুদ্ধিমান্। শুধু বেশী বললেই ঠিক বলা হয় না—মানুষের বুদ্ধির কাছে অন্য কোন প্রাণীর তুলনাই হয় না। এ থেকে স্বভাবতঃই মনে হবে মানুষের এই অতিবুদ্ধির কারণ হচ্ছে ঐ নতুন মগজ। বাস্তবিকই তাই। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে এ কথা প্রমাণও করেছেন।

শুধু তাই নয়, পুরোনো আর নতুন মগজের কোন্‌টার কি কাজ, কোন্‌টার সাহায্যে কোন্‌টা নিয়ন্ত্রিত হয় তাও মোটামুটি ধরে ফেলেছেন তাঁরা। তাঁদের মতে পুরোনো মগজ নিয়ন্ত্রিত করছে সেই সব কাজগুলোকে বেঁচে থাকতে গেলে যেগুলো না করলেই নয়। যেমন ধর—হৃৎপিণ্ডের কাজ, নিঃশ্বাস নেওয়ার কাজ, খিদে পেলে খাবার খোঁজা, হাঁটা, বসা, শোয়া ইত্যাদি। সব প্রাণীই এগুলি করতে পারে এবং করেও। কিন্তু যখনই আরও উঁচুদরের কোন কাজ করার দরকার হয় তখনই পুরোনো মগজ আর কাজে আসে না—তখন দরকার হয় নতুন মগজের। একটা মাছ কিংবা একটা পাখী কি চিন্তা করতে পারে? কখনোই না। তর্ক করতে পারে? কবিতা লিখতে পারে? কল্পনা করতে পারে? মোটেই না। অন্ততঃ তার কোন প্রমাণই আমরা পাই না,—এক রূপকথা আর হিতোপদেশের গল্পে ছাড়া। কিন্তু সেও তো মানুষেরই কল্পনা। জীবজন্তুরা কোন অংশই নেয় না তাতে। মানুষের এই যে মন, অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় তার এই যে বিশেষ ক্ষমতা, এইটেই নিয়ন্ত্রিত করছে তার নতুন মগজ। এদিক্ দিয়ে মানুষের পরেই স্থান হচ্ছে বানর জাতীয় জীবের। তাই দেখতে পাই মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবের তুলনায় বানরের মগজই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী পুষ্ট।

মনের কথা বলতে গেলে আমরা বুকে হাত রেখে দেখাই। ভাবটা যেন, 'মন'?—ও তো হৃদয়ের ব্যাপার! বুকের মধ্যেই ওর স্থান। আসলে মন যে মগজেরই একটা ব্যাপার—মগজই যে সেটাকে চালাচ্ছে—সে কথা সহজে মনে আসতে চায় না। ভয় পেলে, মনে আঘাত পেলে, দুঃখে বা উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে ঠিকই। কিন্তু তাই বলে মনে আঘাত মানে হৃৎপিণ্ডে আঘাত নয়। ঐ রকম অবস্থায় হৃৎপিণ্ড হঠাৎ দ্রুত চলতে থাকে তাই বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করে। কিন্তু খোঁজ নিলেই জানা যাবে

ঐ হৃৎপিণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করছে আমাদের মগজ। মনের আঘাত মগজের ভেতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে।

অত্যন্ত কর্মব্যস্ত আমাদের এই মগজ। সর্বদাই নানা দিকে তাকে নজর রাখতে হয়। দৈহিক বা মানসিক কোন খুঁটিনাটি ব্যাপারই তাকে বাদ দিয়ে হবার উপায় নেই। সব কিছু চালাবার ভার তারই ওপর। তোমরা যদি কখনও কোন শারীর-বিজ্ঞানের বই পাও তা হ'লে ওর 'এনাটমি'র অংশটুকু ভাল করে দেখবার চেষ্টা ক'র। এনাটমি মানে শরীরের গঠনপ্রণালী, অর্থাৎ শরীরের কোথায় কি আছে। ছবি দেখে ভাল করে বুঝবার চেষ্টা ক'র। দেখবে কত অসংখ্য স্নায়ুর সুতো জালের মত আমাদের সারা দেহে ছড়িয়ে আছে! শরীরের মাঝখানে আছে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া। তার মাঝখান দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ড—ডাক্তারেরা যাকে বলেন 'স্পাইনাল কর্ড'। স্নায়ুগুলো প্রায় সবই এসে মিশেছে এইখানে। আর এই সুষুম্নাকাণ্ড দিয়েই মগজের সঙ্গে শরীরের বেশীর ভাগ অংশের যোগাযোগ ঘটছে। যা কিছু আমরা অনুভব করি তার প্রায় সবই কোন-না-কোন স্নায়ুর ভিতর দিয়ে পৌঁছচ্ছে আমাদের মগজে, মগজ সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে নিয়ে ফের আবার তার সঙ্কেত জানাচ্ছে স্নায়ুগুলিতে। পায়ে একটা চিমটি কাটলে। সঙ্গে সঙ্গে তার সাড়া স্নায়ুর ভিতর দিয়ে মগজে পৌঁছল, মগজ অনুভব করল তার বেদনা, সঙ্কেত পাঠাল স্নায়ুতে—পা সরিয়ে নাও বা সাবধান হও। এত দ্রুতগতিতে এই কাজ হ'ল যে তোমার মনে হবে তোমার পায়ের ভিতরেই বুঝি এ সব ঘটে গেল। কিন্তু তা নয়। মগজের সাহায্য না পেলে ওর কিছুই হবে না। কোন জায়গার স্নায়ু যদি অসাড় হয়ে যায়, যেমন পক্ষাঘাত-রোগীর হয়, তা হ'লে মগজ সে খবর পাবে না—তুমি সেখানে চিমটি কাটলেও তা টের পাবে না। কিংবা মগজ যদি নিষ্ক্রিয় থাকে,—যেমন হয় অজ্ঞান অবস্থায়, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগ করলে,—তা হলেও তা টের পাওয়া যাবে না।

মগজ তার কাজ এত সুষ্ঠুভাবে করে যে তার অনেক কাজ আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ঘটে যায়। ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মে নিজের কাজ সে ঠিক করে যাচ্ছে এবং সেই ভাবে সমস্ত শরীরকে চালনা করছে। আবার, খুব দরকারী কতকগুলি কাজ—যা নাকি খুব চট্‌পট্ করতে হবে, তার জন্য মগজ সুষুম্নাকাণ্ডেরও অপেক্ষা রাখে না—সোজাসুজি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি, কান দিয়ে যা শুনি, নাক দিয়ে যা শুঁকি, জিভ দিয়ে যার স্বাদ নেই—সে সবই এই ভাবে সোজাসুজি, সুষুম্নাকাণ্ডের সাহায্য ছাড়াই, মগজে পৌঁছয়। মনে কর, পথে চলতে চলতে একটা পাগলা কুকুর চোখের সামনে পড়ল। চোখ অমনি সেই খবর

মগজে পাঠাল। মগজ তার স্মৃতিশক্তি থেকে জানতে পারল এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক জীব। অমনি সে পা-কে সঙ্কেত করে হুকুম দিল—শীগ্‌গির পালাও, কিংবা হাতকে হুকুম দিল—লাঠি নিয়ে আত্মরক্ষা কর।

আগেই বলেছি মগজের গঠন অতি জটিল। একজন সুস্থ, পূর্ণবয়স্ক লোকের শুধু নতুন মগজটিরই ওজন হবে প্রায় তিন পাউণ্ড। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যায় অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে স্নায়ুকোষ দিয়ে এটি তৈরী। এই সব স্নায়ুকোষ থেকে অগণিত স্নায়ু—সুতোর মত সূক্ষ্ম স্নায়ু বেরিয়ে এসে এমন ভাবে জড়াজড়ি করে আছে যে মনে হবে এ যেন স্নায়ুর এক গহন অরণ্য। এত জটিল যার গড়ন, তার রহস্যও যে তেমনি জটিল হবে এতে বিচিত্র কি? এই সূক্ষ্ম জটিল যন্ত্রকে সর্বদা বাইরের বিপদ্ থেকে সুরক্ষিত রাখাও দরকার। তাই মগজকে রাখা হয়েছে মাথার খুলির ভেতর। শক্ত পুরু হাড়ের তৈরী এই খুলি যেন একটা মজবুত কৌটো। কোথাও ফাঁক নেই—শুধু মাথার পেছন দিকে, নীচে, শিরদাঁড়ার সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার গর্তটি ছাড়া।

বিখ্যাত লোকদের মগজ—পরীক্ষার জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

দিবারাত্র খাটতে হচ্ছে মগজকে,—"মানুষের" তুলনা করে বলতে গেলে যাকে আমরা বলি "অমানুষিক" খাটুনি। সর্বদা সতর্ক "দৃষ্টি" রাখতে হচ্ছে সর্বদিকে, আর কাজ করতে হচ্ছে নিমেষের মধ্যে। এক বিজ্ঞানী হিসেব করে দেখেছেন—কোন জিনিষ চোখে দেখে, মগজে সেটা বুঝে নিয়ে, যথাস্থানে সঙ্কেত পাঠাতে এক সেকেণ্ডের ১৩ ভাগ সময়ও লাগে না। একে ব্যস্ত বলব না তো কাকে বলব?

এই জন্যই মাঝে মাঝে মগজকে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। মগজ বিশ্রাম পায় কি ভাবে? ঘুমই হচ্ছে মগজের এই বিশ্রাম। মানুষ যদি একটুও না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন—রাতের পর রাত জেগে থাকে তা হ'লে তার মগজ ক্ষণিকের জন্যও বিশ্রাম পায় না। এর ফল সময় সময় ভয়াবহ হতে পারে। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষা করে তাঁরা সকলেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মানুষ অনেক কিছুই সহ্য করতে

পারে কিন্তু মগজকে বিশ্রাম না দিলে তার চলে না। পর পর চার-পাঁচ দিন না ঘুমোলেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এমন কি উন্মাদের লক্ষণ দেখা দেওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। পরীক্ষার সময় তোমরা অনেকেই একটুও বিশ্রাম না করে রাত জেগে পড়। এটা যে কত খারাপ তা একবারও ভাব না। এতে স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে যাবার ভয় তো থাকেই, আরও মারাত্মক সব কাণ্ড ঘটতে পারে—এমন কি মস্তিষ্কবিকৃতিও। মগজই সাধু ভাষায় হ'ল মস্তিষ্ক। সুতরাং তাকে বিশ্রাম দিতেই হবে।

মগজের সঙ্গে স্মরণশক্তির সম্পর্ক কি রকম গভীর তা হয়তো বলে দিতে হবে না। কিন্তু ঐটুকু ছাড়া এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও প্রায় কিছুই জানেন না। কি করে পুরোনো দিনের ঘটনা মগজের মধ্যে স্মৃতির রূপ ধরে জমা হয়ে থাকে, কখনও তা টেনে বার করা যায়, কখনও যায় না—এ সব তথ্য আজও অজানা রয়ে গেছে। শুধু একজন বিজ্ঞানী নানা রকম হিসেব করে বলেছেন মগজের এই ধারণাশক্তি এত বেশী যে কল্পনা করাও কঠিন। বিলেতের বিখ্যাত বৃটীশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে যত বই আছে তার মধ্যে যত কথা লেখা আছে তা যদি একত্র করা যেত তা হ'লেও তা আমাদের যে কোন লোকের মগজের মধ্যে অনায়াসে ঠেসে রাখা যেত—মগজের ধারণাশক্তি এত প্রচণ্ড!

মগজ নিয়ে পরীক্ষার তাই আর অন্ত নেই। পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের মগজ তাঁদের মৃত্যুর পর বার করে নিয়ে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে। অতি বড় বৈজ্ঞানিক, অতি বড় সাহিত্যিক, অতি বড় রাজনীতিক—সকলের মগজ। সাধারণ মানুষের মগজের সঙ্গে কোথায় তাদের তফাৎ? তেমনি অতি বড় বোকা বা অতি বড় অশিক্ষিত—অসভ্য জাতির মগজ নিয়েও পরীক্ষা হয়েছে। মগজে অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসাও সুরু হয়েছে আজকাল। কিন্তু সত্যি কি মানুষ মগজের সমস্ত রহস্য বার করতে পারবে কোন দিন?

মনোরঞ্জন-স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি উপলক্ষে ওই পুরস্কার দেওয়া হবে।

বিষয়—তোমার "হবি" (Hobby) বা শখ কি? কেন তুমি ওতে আনন্দ পাও?—এই সম্বন্ধে ছোট একটি লেখা পাঠাতে হবে ৫০০ শব্দের বেশী না হয়।।

লেখা আগামী ২০শে বৈশাখের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবে। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

পুরস্কার—একটি রৌপ্য পদক

—পশ্বাবলী—

কথাটা নতুন নতুন ঠেকছে ? কিন্তু নতুন কথা নয়, পশ্বাবলী মানে হচ্ছে পশু-সমূহ, এবং এক সময়ে ঐ নামে এ দেশে একখানি মাসিক পত্রিকা বেরোত। ঠিক সাধারণ পত্রিকা নয়, বরঞ্চ তাকে পুস্তিকা বলতে পার। এতে প্রতি মাসে একটি করে পশুর বিষয় লেখা হ'ত—ঐ পশুর একটা কাঠ-খোদাই ছবি সমেত। এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন লসন্ নামে এক পাদরী সাহেব। ছবিও তিনিই করে দিতেন, তবে বাংলাটা নাকি তাঁর নিজের ছিল না,—পিয়ার্স নামে আর একজন সাহেব ঐ বাংলা লেখার ভার নেন। পশ্বাবলীর প্রথম সংখ্যা বেরোয় ইং ১৮২২ সনে, বিদ্যেসাগর মশাইএর বয়স যখন দু' বছর।

পশ্বাবলীর ভাষা ও বিষয়বস্তু কেমন ছিল ? একটু তুলে দিচ্ছি :

"...সাহাবাদপুর গ্রামে শ্রীপল্লিন বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি মুছলমান ছিল। সে প্রতিদিন রোজা করিত তাহাতে ঐ গ্রামের উত্তর দিকে গিয়া পাক করিয়া সন্ধ্যাকালে আহার করিত শৃগালেরদিগকেও অন্ন দিত। ঐ অন্নাশাতে অনেক শৃগাল সেই স্থানে একত্র হইয়াছিল। যখন বিশ্বাস পাকারম্ভ করিত তখন সকল শৃগাল নির্ভয়ে অশব্দে বসিয়া থাকিত।...যাবৎ বিশ্বাসের আজ্ঞা না পায় তাবৎ ঐ অন্নের নিকট বসিয়া থাকে। আজ্ঞা পাইলে স্ব ২ ভাগ মাত্র খায়।"

শেষ পর্যন্ত ঐ বিশ্বাসের নাতনী মারা গেল। বিশ্বাস সেদিন কিছু খেল না। কিন্তু যথারীতি রান্না করে শেয়ালদের খেতে দিল। শেয়ালরা কিন্তু কেউ সেদিন সে অন্ন গ্রহণ করল না। শুধু তাই নয়, তারা ঐ নাতনীর কবর খুঁড়ে বের করা দূরে থাক—"বরং ঐ গোরের রক্ষা করিল।" সব শেষে গল্পটি পড়ে কি উপদেশ পাওয়া গেল তাও লেখা ছিল। বইএর ভাষাতেই বলি : "ইহাতে হে মনুষ্যেরা শৃগালের প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়া তোমারদিগেরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

— বড়দের সম্বন্ধে মজার কাহিনী —

বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন বেশ একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প আছে। লোকে ঠাট্টা করে বলত নিউটন হাসতে জানেন না—যাকে বলে অট্টহাস্য। জীবনে একবার মাত্র নাকি তিনি ঐ রকম হেসেছিলেন। ঘটনাটা এই : নিউটন একবার তাঁর এক বন্ধুকে একখানা ইউক্লিডের নীরস জ্যামিতি পড়তে দেন। কয়েকদিন পরে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন—"কেমন লাগল হে বইখানা ?"

"ভাল লাগে নি।"—বন্ধু উত্তর দিলেন।

"ইউক্লিডের জ্যামিতি ভাল লাগে নি! বল কি হে!" নিউটন শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন ; কারণ এমন অবিশ্বাস্য কথা কল্পনা করাও যে তাঁর পক্ষে কষ্টকর।

*

বিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন পরম বন্ধু। আবার দু'জনেই ছিলেন খুব রসিক। একবার দীনবন্ধু কোথায় বেড়াতে গেছেন। সেখানে সস্তায় বেশ ভাল জুতো পাওয়া যায়। দীনবন্ধু এক যোড়া জুতো কিনে বঙ্কিমকে উপহার পাঠালেন। সঙ্গে তিন শব্দের একটি চিঠিও লিখে দিলেন—"বঙ্কিম, কেমন জুতো ?"

বঙ্কিমের উত্তর এল। সেও তিন শব্দের চিঠি।—"তোমার মুখের মত।"

*

জুতো নিয়ে বিদ্যাসাগর মশাইএর সঙ্গেও বঙ্কিমের রসিকতার গল্প আছে। তালতলার শুঁড়-তোলা চটী (যা তাঁর নাম থেকেই বিদ্যাসাগরী চটী বলে পরে পরিচিত হয়) প'রে বিদ্যাসাগর এসেছেন নেমন্তন্নে। চটীর শুঁড় পুরোনো হয়ে কুঁচকে আরও উর্দ্ধমুখী হয়েছে। বঙ্কিম বল্লেন, "আপনার চটীর মুখ যে ক্রমেই উর্দ্ধদিকে চলেছে, কালে হয়তো স্বর্গে গিয়ে ঠেকবে!" বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন—"হুঁ, চট্টোপাধ্যায়ের. স্বভাবই ঐ, পুরোনো হলেই বঙ্কিম হয়ে যায়।"

*

দীনবন্ধুর আর একটি গল্প বলি। দীনবন্ধু নাটক লিখেছেন 'সধবার একাদশী'। তার একটি চরিত্র হচ্ছে নিমে দত্ত। নিমে রাতদিন মদ খায় আর কথায় কথায় শেক্সপীয়ার আওড়ায়। কেউ কেউ বল্ল, "নিশ্চয় এ মাইকেল মধুসূদনকে ঠাট্টা করে লেখা।"

কথাটা দীনবন্ধুর কানেও উঠল। তিনি হেসে বললেন, "মধু কি কখনও নিম হতে পারে ?"

—তুমি কি জান—

"ইনার্সিয়া"—এই বৈজ্ঞানিক শব্দটি আমরা প্রায়ই অনেককে বলতে শুনি। অভিধানে ইনার্সিয়ার মানে করা হয়েছে 'জাড্য' বা 'জড়তা'। জাড্য শব্দটি বাংলা শব্দ বলে বলা হলেও সমান দুর্বোধ্য—এক বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ২য় ভাগের বাইরে ওর প্রচলন আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু জড়তা বললেই কি ঠিক ব্যাপারটা বোঝা যায়? মোটেই না। আসলে জিনিষটা এই: প্রত্যেক জড়বস্তুরই এমন একটা গুণ বা ধর্ম আছে যে সে যদি স্থির থাকে তবে স্থিরই থাকবে, যদি চলতে থাকে তবে চলতেই থাকবে,—যতক্ষণ না অন্য কোন শক্তি এসে তাতে বাধা দেবে। জড়বস্তুর এই ধর্মকেই বলা হয় ইনার্সিয়া। একটা উদাহরণ দেই। চল্‌তি ট্রাম থেকে নামবার সময়, তোমরা জান, সব সময়ে যে দিকে ট্রাম চলছে সেদিকে মুখ করে নামতে হয়, এবং মাটীতে নেমেও যে দিকে ট্রাম চলছিল সেদিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতে হয়। নইলে পেছন দিকে মুখ করে বা সোজা নামলে মাটীতে গড়াগড়ি খাবার ভয় থাকে। এরও কারণ ঐ ইনার্সিয়া। চলতি ট্রামের মারফৎ তোমার শরীরে যে গতিবেগ এসেছিল, মাটীতে নামবার পরও তা তোমার শরীরে থেকে যাবে, যতক্ষণ না মাটীর ঘর্ষণজাত বাধা (ফ্রিক্‌শন্) তা থামিয়ে দেবে।

'ভাইরাস্'—ডাক্তারদের মুখে এই কাথাটা আজকাল হামেশাই শোনা যায়। জীবাণু বা ব্যাক্‌টিরিয়ার দরুণ আমাদের নানা রকম রোগ হয়। এই জীবাণুগুলো খালি চোখে বোঝা না গেলেও অনুবীক্ষণ যন্ত্রে স্পষ্ট ধরা পড়ে। কিন্তু এমন কতকগুলি রোগ আছে যাদের রোগ-জীবাণু অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। এগুলিকেই বলা হয় 'ভাইরাস্'। এতদিন পর্যন্ত 'ভাইরাস্'কে বিজ্ঞানীরা আন্দাজেই সূক্ষ্মতম জীবাণুকণা বলে ধরে নিতেন। এখন ইলেক্‌ট্রন মাইক্রস্‌কোপ্ আবিষ্কৃত হবার পর এদের কোন কোনটাকে চোখে দেখা সম্ভব হয়েছে। কোন কোন বিজ্ঞানী আবার মনে করেন, এগুলি এক রকম খুব জটিল ধরণের প্রোটিনের কণা—তবে এরা যে ভাবে বংশ বিস্তার করে তাতে এরা যে জীবন্ত পদার্থ সে বিষয়েও তাঁরা একমত। ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, জন্‌ডিস্ প্রভৃতি রোগও এই ভাইরাস্ থেকেই হয়।

যে গল্প জানা নেই

শ্রীসুচিত্রা দাশগুপ্ত

— সতেরো —

আবার কলকাতা। যদিও গোপালের এই প্রথম বার একা কলকাতায় আসা নয়, এবং ইতিমধ্যে এই সহর সম্বন্ধে তার কিছু অভিজ্ঞতাও হয়েছে, তবু তাদের বিরাট এঞ্জিনটা যখন ভস্ ভস্ করতে করতে হাওড়ার বিপুলকায় প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল তখন কি এক আজানা অনুভূতিতে গোপালের বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

কিন্তু দাঁড়িয়ে ভাববার বা ইতস্ততঃ করবার জায়গা এ নয়। কেউ তার দিকে ফিরে চাইবে না, সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে কেউ তাকে সান্ত্বনা দেবে না এখানে। গোপাল তাই ছোট্ট টিনের সুটকেসটি হাতে করে আর শতরঞ্চি-জড়ানো ছোট্ট বিছানাটা বগলদাবা করে নেমে এল গাড়ী থেকে।

৩।৪৭২-এ বনি পার্ক। রাস্তাটার নাম মনে আছে তো? হ্যাঁ, বালিগঞ্জে। ওদিক্‌টায় সে বেশি যায় নি। গরীবদের জন্য ও পাড়া নয়,—তাও সে জানে। একবার মনে হ'ল—কেন এলাম? এরা তো আরও বড়লোক! অবশ্য সুমিত তাকে বন্ধু বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু বন্ধু যখন আশ্রিত হয় তখনও কি সে বন্ধু থাকে? ছোট্ট গোপাল এরই মধ্যে অনেক কিছু ভাবতে শিখেছে।

ভীড় ঠেলে বাস্ ষ্ট্যাণ্ডের দিকে এগোচ্ছিল সে, হঠাৎ কে তার জামা ধরে টানল। ফিরে দেখে, ইয়া বড় পাগড়ী মাথায়, লাঠি হাতে পেয়াদার মত একটা লোক এসে তাকে জাপটে ধরেছে। "কুথা পালাচ্ছ খোঁকা? উধার চলো। সাহেব বুলাচ্ছে। চলো—চলো।"

ব্যাপারটা এত আচম্‌কা ঘটল যে হক্‌চকিয়ে গেল গোপাল। কই, সে তো কিছু করে নি, তবে তাকে এরা ধরল কেন?

পেয়াদাটা শুন্‌ল না, টানতে টানতে নিয়ে চল্‌ল তাকে প্লাটফর্ম থেকে বেরোবার আর একদিকে—একগাদা মোটর ভীড় করে আছে যেখানে। কাছে এসে লোকটা কা'কে যেন সেলাম ক'রে বল্‌ল, "ঐ উধার দিয়ে চুপসে ভেগে যাইছিলেন, হামি ধরিয়ে এনেছি।"

পরক্ষণেই একটা খিল্ খিল্ হাসি শুনে ফিরে দেখে সুমিত হাসছে তার দিকে চেয়ে।

সুমিত বল্‌ল, "বাপ্‌স্, কত খুঁজছি চারদিকে, বাবুর পাত্তাই নেই! শেষটায় লছমন সিং গিয়ে ঠিক ধরে এনেছে। ওকে চিনতে পাচ্ছিস না গোপাল? ও তো আমাদের দরোয়ান। দার্জিলীংএ ও-ও তো গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে।"

দামী মোটরের নরম গদীতে সুমিতের পাশে বসে গোপালের সত্যি কেমন লজ্জা করছিল। কিন্তু সুমিতের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। 'তুমি' ছেড়ে প্রথমেই সে 'তুই' করে নিয়েছে গোপালকে। এখন রাজ্যের যত গল্প, পেটের যত কথা অনর্গল বকে চলেছে ওর দিকে চেয়ে। গোপাল জবাব দেবে কি. তার মনের মধ্যে তখন যেন ঝড় বয়ে চলেছে। সব কথা তার কানেও যাচ্ছে না।

হঠাৎ একটা ঝট্‌কা মেরে গাড়ীটা একদম থেমে গেল। (ক্রমশঃ)

স্বর্ণ-কুসুম

(বিদেশী কবিতা অবলম্বনে)

শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীহারা মেঘের মতো ঘুরতেছিলাম একা,
পাহাড়তলে যেথায় ঝলে সুনীল হ্রদের রেখা ;
হঠাৎ আমার পড়ল চোখে সোনার ফুলের দল
উদাস হাওয়ার মাতাল দোলায় দুলছে অবিরল।

মুগ্ধ চোখে দেখনু চেয়ে রূপের ছটা তার,
স্বর্গলোকের অরূপ শোভা ফুটল অনিবার।
এরা যেন এই পৃথিবীর বাধা-বাঁধনহারা,
পরীরাণীর কেশের গোলাপ, ছায়াপথের তারা।

ধূসর চূড়ার 'পরে যেথা নেহাৎ নিরিবিলি,—
হ্রদের জলে রবির আলো করছে ঝিলিমিলি,
মনে হল সেথায় বুঝি মর্ত্যলোকের মাঝ
পারিজাতের রূপের ডালি আন্‌ল এরা আজ।

কুসুম রঙে সুখের তুফান জাগল হৃদয়েতে,
অমল রূপের সেই সে ছবি রাখনু মনে গেঁথে।
দুঃখ যখন দেবে আমায় চিন্তা-কাতরতা,
আনবে এরাই আমার মনে সতেজ নবীনতা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা, দেশপ্রেমিক মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুতে দেশমাতা একজন সুযোগ্য সন্তানকে হারাল। অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ছিল তাঁর জীবন। ভারতের লোক হলেও জন্ম হয় তাঁর মুসলিম-তীর্থ মক্কা সহরে আর শিক্ষালাভ হয় মিশরের আল-আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমি ভারতেই তাঁর কর্মময় জীবন কেটেছে।

আরবী, ফার্সী ও উর্দু সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান ও দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তিনি একখানা উঁচুদরের উর্দু পত্রিকা সম্পাদনা করে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেন। পরে 'আলহেলাল' নামক বিখ্যাত উর্দু পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি আরও খ্যাতিলাভ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধা হিসাবে আজাদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। বিদেশী শাসনের হাত থেকে ভারতের মুক্তি যে একমাত্র কংগ্রেসই আনতে পারে—কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সাধ্য নেই তা

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

আনবার—এ তিনি তরুণ বয়সেই বুঝেছিলেন, তাই সেই বয়সেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কংগ্রেসের কাজে। এ জন্য তাঁকে বহুবার ইংরেজের কারাগারে বন্দী হতে হয়েছে, কঠোর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তাতে তাঁকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি। ১৯২৩, ১৯৩০ এবং ১৯৪০—এই তিন বার তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এবং শেষ বারে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত একটানা ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ভারত যেদিন স্বাধীন হ'ল সেদিনও তিনিই ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি।

স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাঁকে দেওয়া হয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ। এ পদ ঠিক তাঁর উপযোগী ছিল কিনা এ নিয়ে অবশ্য মতদ্বৈধ আছে। হয়তো অন্য কোন বিভাগের ভার পেলে তাঁর প্রতিভার আরও বেশী পরিচয় দেবার সুযোগ পেতেন তিনি, তবু নিষ্ঠার সঙ্গেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কাজ করে গেছেন।

হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে ভালবাসত। তাঁর মৃত্যুতে তারা একসঙ্গেই অশ্রু বিসর্জন করছে।

* *

বিলেতের রয়্যাল সোসাইটি হচ্ছে একটা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। এর ফেলো বা সদস্যদের বলা হয় এফ্. আর. এস্। এফ আর এস্ হওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই একটা সম্মান। এ পর্যন্ত তিন জন বাঙ্গালী—৺জগদীশ চন্দ্র বসু, ৺মেঘনাদ সাহা এবং শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এই সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তোমরা শুনে সুখী হবে, সম্প্রতি আরও দু'জন বাঙ্গালী বিজ্ঞানীকে এই সম্মানজনক পদ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র এবং অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

* *

সম্প্রতি শশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক প্রবীণ বাঙ্গালীর মৃত্যুসংবাদ কাগজে বেরিয়েছে। মৃত্যুকালে এঁর বয়স হয়েছিল ১১৭ বছর। সিপাহীযুদ্ধের সময় ইনি ছিলেন ষোল বছরের তরুণ যুবক এবং সে সময়ে সমর-বিভাগে এক ঠিকাদারের সঙ্গে কাজও করেছিলেন। ১১৭ বছর বয়সেও তাঁর দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক ছিল,

দাঁত একটিও পড়ে নি। দশ বছর আগে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁর বয়স তখন ৯২ বছর।

*   *

এ মাসের রামধনুতে যাদুকর শ্রীশঙ্কর দাসের লেখা তোমরা পড়েছ। ইনি শুধু সুলেখক এবং ভাল যাদুকরই ন'ন—যাদুবিদ্যা সম্পর্কীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করতেও সুপটু। সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত যাদু সংস্থা আই-বি-এম্ এর রিং ৮৩র সম্পাদক ঘোষণা করেছেন যে তাঁদের দেশের সবচেয়ে সেরা যে সব যাদুর যন্ত্রপাতি আছে তার চেয়ে শ্রীশঙ্কর দাসের তৈরী যন্ত্রপাতি উন্নত ধরণের। বাঙ্গালী যাদুকরের এই কৃতিত্বে তোমরা নিশ্চয়ই খুসী হবে।

*   *

সম্প্রতি শিশুসাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন ও নির্বাচন হয়ে গেছে। এ বছর যাঁরা নতুন কর্মকর্তা নির্বাচিত হলেন তাঁদের নাম ঃ সভাপতি—শ্রীনরেন্দ্র দেব। সহ-সভাপতি—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীলীলা মজুমদার। সম্পাদক—শ্রীঅমলশঙ্কর রায় ও শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল। সহ-সম্পাদক - শ্রীপ্রভাসরঞ্জন দে ও শ্রীঅজিত কুমার তারণ। হিসাব-পরীক্ষক—শ্রীসুকুমার দে সরকার। কার্যনির্বাহক সমিতি—সর্বশ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার রায় চৌধুরী, অজিতকৃষ্ণ বসু, যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রলাল রায়, সৌরীন্দ্রকুমার দে, কমলা দত্ত, ইন্দিরা দেবী।

*   *

ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা 'রণজি ট্রফি'র খেলা' এবারের মত শেষ হ'ল। এতদিন এই প্রতিযোগিতা হ'ত 'নক্ আউট্' প্রথায়। এবারই আঞ্চলিক ভিত্তিতে লীগ্ প্রথায় এ খেলা হ'ল। তবে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা (এবং প্রয়োজন বোধে কোয়ার্টার ফাইনালেরও একটা খেলা) নক্ আউট্ প্রথায় হয়েছে। ফাইনালে বরোদা দল সার্ভিসেস্ দলকে এক ইনিংস ও ৫১ রানে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। এই তাদের ৪র্থ বিজয়। বরোদা দলে প্রবীণ খেলোয়াড় বিজয় হাজারে একাই ডবল সেঞ্চুরি (২০৩ রান্) করেছেন। অধিনায়ক গাইকোয়াড়ও করেছেন ১৩২ রান্। বরোদার মোট রান্ হয়েছে ৪৯৫ (১ম ইঃ)। উত্তরে সার্ভিসেস্ দল করে ১ম ইনিংস্এ ২৩৯ ও ২য় ইনিংস্এ ২০৫ রান। বাংলা দলও এবারে বেশ শক্তিশালী ছিল, কিন্তু সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠে তারা সার্ভিসেস্ দলের কাছে পরাজিত হয়।

লে খা চা ই

অভিনব কিশোর-মাসিক ; বার্ষিক সডাক ২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১।০, প্রতি সংখ্যা ৵০। কার্ত্তিক (৭ম) সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে "যেই ভকত, সেই জানে" শিশু-উপন্যাস বাহির হইতেছে। নবীন লেখক-লেখিকাদিগকে লিখিতে উৎসাহ দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। ছোটদের 'লেখা' ব্যতীত, বড়রাও লিখিয়া থাকেন। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমলকুমার মিত্র, যাদুশ্রী শঙ্কর দাস, প্রভৃতিও ইহাতে লেখেন। আগামী বৈশাখ হইতে ২য় বর্ষ আরম্ভ হইবে, কলেবর বর্দ্ধিত হইবে ও বার্ষিক চাঁদা ৩ টাকা হইবে। এখনই গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইলে, অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না।
ঠিকানা :— শ্রীরোহিণীকুমার মণ্ডল, বি-টি, সম্পাদক, "লেখা চাই", দেবালয়—২৪ পরগণা।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

দেখতে দেখতে আর একটি বছর ফুরিয়ে এল। গরম হাওয়া সর্বদাই সে কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। গাজনের গানও এরই মধ্যে সুরু হয়ে গেছে পথে পথে। সত্যি, কত তাড়াতাড়ি দিন চলে যায়।

রামধনুও যাত্রাপথের আর একটি ধাপ পেরিয়ে এল। পূর্ণ হ'তে চল্ল তার তিরিশ বছর। আগামী বছরের জন্য তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

প্রতি বছরের মতই তোমাদের অসংখ্য চিঠি পাচ্ছি, রোজই। আগামী বারের রামধনুর জন্য কৌতূহল-ভরা চিঠি। এবারে আর কিছু বলব না। মুখে বড় বড় কথা না ব'লে কাজে করে দেখাতে পারলে তবেই না··· ?

'মহাকালের অভিশাপ' তোমাদের ভাল লাগছে? ওটা তো আগামী বছর চলবেই, আরও একটা নতুন ধরণের উপন্যাস সুরু হবে আগামী বছর। কার লেখা? বেরোলেই দেখবে। রসভঙ্গ করি কেন আগে? নতুন নতুন বিভাগ? তারও তো অনেক প্রস্তাব করেছ অনেকেই। না দিয়ে উপায় কি? কৈলাস ভ্রমণের কাহিনীর পর শ্রীধীরেন্দ্রলাল তাঁর সুপটু হাতের আর একখানি ভ্রমণ-কাহিনী দেবেন বলে ভরসা দিচ্ছেন। শ্রীযুক্তা আশা দেবীও আশা দিয়েছেন তাঁর থেমে-পড়া 'পথিক মেঘের দল' নিয়ে হাজির হবেন যথা সময়ে। শিশুসাহিত্যিকদের পরিচিতিও বন্ধ হবে না নিশ্চয়ই। আর তোমাদের লেখা?—তার জন্য দরজা তো সর্বদাই খোলা।

চিঠির জবাব ঃ শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় (গড়বেতা)—এত চিঠি লিখছ তুমি যে তোমার চিঠির জবাব এবারেও সবার আগেই দিতে হচ্ছে। অনেক প্রশ্ন করেছ, প্রস্তাবও করেছ অনেক। ২।১টি ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দেব শুধু আজ। হ্যাঁ, আমাদের বাড়ী ছিল ফরিদপুর জেলায়। গ্রামের নাম কাউলিবেড়া। কিন্তু তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে পারলাম কই? আমাদের কোনও পূর্বপুরুষ নদীয়া জেলার ফুলিয়া থেকে পূর্ববঙ্গে চলে যান। এই ফুলিয়াই ছিল মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ও কর্মভূমি, বোধ হয় জান। শুনে খুসী হবে, আমরাও তাঁরই বংশে জন্মেছি। ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। আমার বিষয় ছিল ফলিত রসায়ন (য়্যাপ্লায়েড্ কেমিষ্ট্রী)। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ রায় ও ডক্টর পি. এন্. ভাদুড়ী—দু'জনেই আমার সহপাঠী। ব্যস্, অন্য প্রশ্নের জবাব এবার আর নয়। শ্রীশিশিরকুমার মণ্ডল (একবারপুর)—প্রশ্ন করতে হবে এই জন্যই কি প্রশ্ন করেছ? নাকি

সত্যিই তুমি এই সব প্রশ্নের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাও ? আমেরিকাই এখন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ধনী দেশ বলে মনে হয়। শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৩. লেক প্লেস, রাঁচী)—তোমার "কাঁচা হাতের লেখা"র জন্য ১২ বছরের অনধিক বয়স্ক লেখকদের লেখা চাও ? বয়সের বাধা রাখছ কেন ? তুমি বোধ হয় জান না—আমাদের কাছে কত প্রবীণ লেখকের লেখাও আসে যা একেবারে কাঁচা হাতের লেখা। শতকরা ৮০টা লেখাই বোধ হয় তাই। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ (বরাভূম)—তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে হলে যে ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে হয়। কত কারণে কত কি ঘটে, আন্দাজে জবাব দেওয়া ঠিক কি ? শ্রীলোকনাথ আগরওয়ালা (শিল্পীচক্র. পলাশী, নদীয়া) —তোমরা একটা সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছ ? খবরটা দৈনিকে দিলেই ভাল হ'ত। যাই হোক. আশা করি পাঠকেরা, যারা এ বিষয়ে উৎসাহী, তারা তোমার ঠিকানায় চিঠি দিয়ে বিশদ খবর জেনে নেবে। শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত (ভাগলপুর)—আনন্দগোপাল বিশ্বাসের ঠিকানা—বিশ্বাসবাড়ী, দহকুলা, পোঃ ধর্মদা (নদীয়া)। ব্যায়াম বিষয়ে লেখক প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেন নি, ফলে আমরাও লজ্জায় পড়েছি। দেখি এবার কি ব্যবস্থা করা যায়। তোমার ইতিহাস সম্পর্কীয় সন্দেহের কথা লেখককে জানাব। বর্তমানে এ দেশে ইতিহাস নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে—কাজেই অনেক নতুন কথা (যা শোন নি বলছ) শোনা অস্বাভাবিক নয়. এবং এত দিন যে সব গ্রন্থ প্রামাণ্য বলে ধরা হ'ত— যে সব তথ্য সঠিক বলে মেনে নেওয়া হ'ত, পরবর্তী কালে তার পরিবর্তন হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। শ্রীজয়া রায় (আইজংনগর)— তুমি তা হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ হ'তে শান্তিনিকেতনে চললে ? রবীন্দ্রসঙ্গীত আমারও খুব প্রিয়। তোমার গানও তাই ভারী শুনতে ইচ্ছে করছে। অন্য জবাবগুলি পরে দিচ্ছি। শ্রীঅলোকেন্দ্রমণি দত্ত (কলিকাতা-২) —তুমি নিজেকে যখন 'অলোকেন্দ্র' বলছ তখন 'আলোকেন্দ্র' লেখা খুবই অন্যায় হয়েছে বই কি ! কিন্তু রবার ষ্ট্যাম্পে আবার 'অলকেন্দ্র' করেছ কেন ? কি রকম ধাঁধা চাও। ধাঁধার সমালোচনা করলেও সঠিক জবাব কিন্তু বার করতে পার নি। শ্রীপঞ্চানন শাসমল (একবারপুর)—চাঁদে জল-বাতাস কিচ্ছু নেই। মানুষ থাকবে কি করে ? আত্মা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছ সে তো জগতের চিরন্তন প্রশ্ন। কার সাধ্য তার জবাব দেয় ?

কিন্তু আজ আর জায়গা নেই। তাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করি আজকের চিঠি।

—ইতি রাঃ সঃ

চয়ন

১৫৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ (হিন্দুস্থান মার্টের সন্নিকটে)

সব রকম বই—বিশেষ করে রামধনু পত্রিকা (যে কোন সংখ্যা) এবং রামধনু কার্যালয় থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বই আমাদের কাছে পাওয়া যাবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। গালা ২। লবণ ৩। মাঝি

উত্তরদাতাদের নাম :- অমিতাভ ও অশোকনাথ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর); দিলীপ সমাজদার (কলিকাতা-১২); মুরারিমোহন মণ্ডল (চন্দননগর); দীপ্তি, অপর্ণা, প্রীতি, তৃপ্তি, রণজিৎ ও বিমল (উচলপুকুরি); চপলা প্রামাণিক (কলিকাতা-১২), সিদ্ধেশ্বর বসু (বারাণসী); সোমা ও চন্দ্রা নিয়োগী (নূতন দিল্লী); কল্পনা দেবী (কৃষ্ণনগর); সৈয়দউদ্দীন (ঢাকা); চিন্ময় ঘোষাল (এলাহাবাদ); সাবিত্রী মজুমদার (পাটনা); শ্যামল ও অমল (কলিকাতা-২৬); খোকন, বলাই ও সন্ধ্যা (কলিকাতা-৬); নির্মল চক্রবর্তী (বাঁকুড়া); নীলিমা, লালিমা ও প্রতিমা মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ); দিলীপ, রমলা, অশোক, মঞ্জু, সন্ধ্যা, বাবলা, বীরেন্দ্র, খুকি, জয়শ্রী, কাকা, রবিদা, মাসিমা (নিউ দিল্লী)।

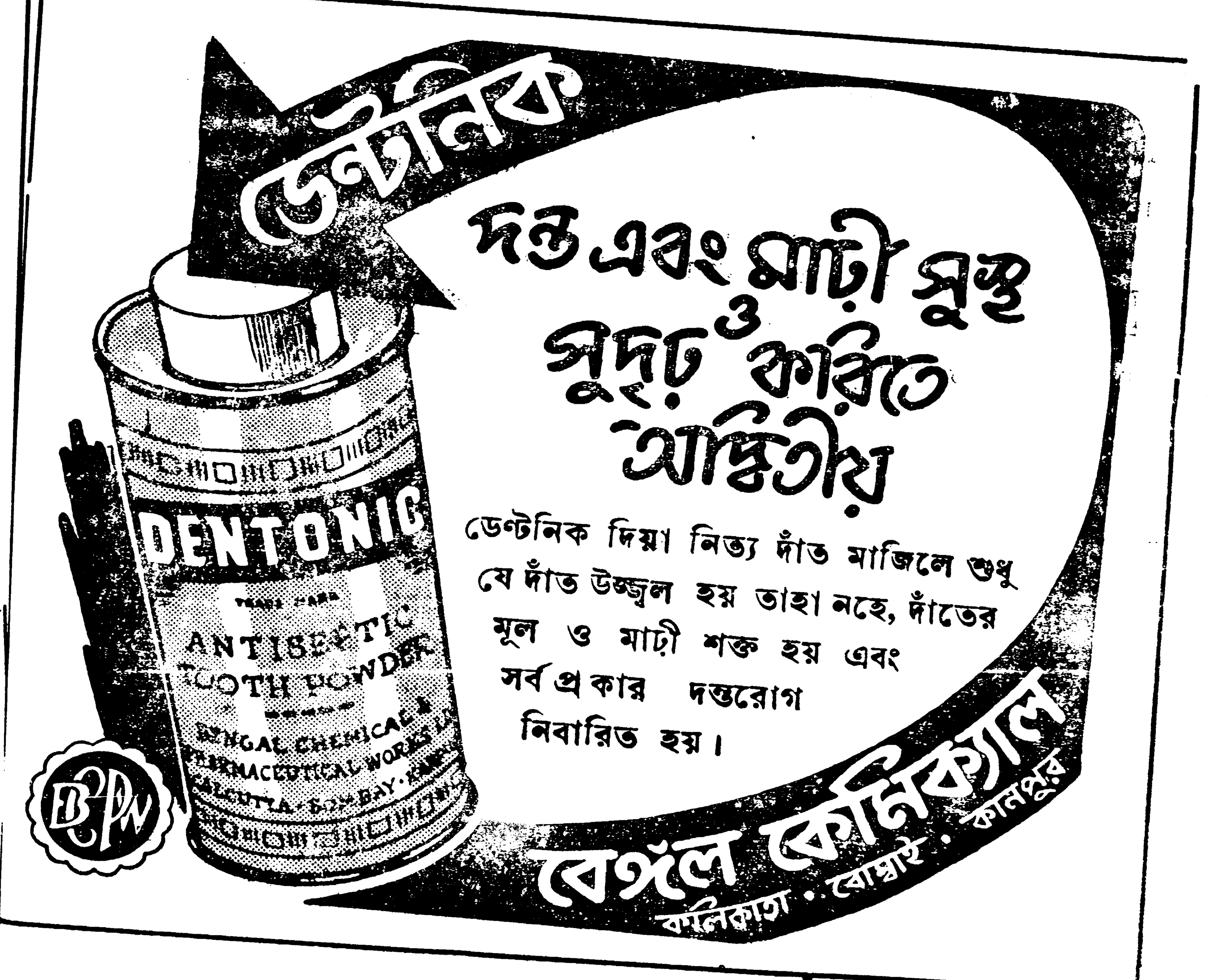

নূতন ধাঁধা

শ্রীফণীন্দ্রমণি দত্ত

সেদিন পুরানো চিঠির ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একখানা চিঠি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। চিঠির তারিখের ওপর কালির ছাপ পড়ে সবটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না, শুধু শুক্রবার, আর ১৯৫৬ সাল—এটুকু বোঝা যাচ্ছে। চিঠিখানা আমার দাছুর এক দাহুকে লিখেছেন।

চিঠিখানা এই রকম:

ভাই অটল,

সামনের বুধবার আমার ২১শতম জন্মদিন। তুমি নিশ্চয়ই ওইদিন আমার এখানে এসে এই অনুষ্ঠান পালন ক'রো। জীবনের প্রান্তদেশে এসে উভয়েই দাঁড়িয়েছি, হয়তো পরের জন্মদিন পালনের জন্যে আমরা থাকবো না···ইত্যাদি।— তোমার অমৃত।

দাছুর এই বন্ধুটিকে আমরা সবাই জানতাম; তিনি বছর তুই হ'ল ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। অথচ মৃত্যুর মাসখানেক কি দিন ১৫।২০ আগে তিনি এই চিঠি লিখেছিলেন। তবে কি তাঁর ভীমরতি ধরেছিল? না, মোটেই না। চিঠিতে তিনি সত্যি কথাই লিখেছিলেন। কি করে এটা সম্ভব বলতে পার?

শ্রীচরণেষু

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

* নতুন আদর্শ এবং পরিকল্পনা নিয়ে প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
* প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রতি সংখ্যা সুসমৃদ্ধ।
* ষাণ্মাসিক চাঁদা ১৷৽ এবং বার্ষিক ৩৲। যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া চলে।

অন্যান্য বিষয়ের জন্য পত্রালাপ করুন।

'শ্রীচরণেষু' কার্য্যালয়,
৪বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫
ফোন: ৫৫-৪০৪৬

নতুন বছরের রামধনু

এই চৈত্র সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর ৩০শ বছর শেষ হ'ল, আসছে বৈশাখে রামধনু ৩১ বছরে পড়বে। রামধনুর পুরোনো গ্রাহক-গ্রাহিকারা সকলেই আগামী বছরও রামধনুর গ্রাহক-তালিকাভুক্ত থাকবেন এই আমরা আশা করি। কোন বিশেষ কারণে কারও পক্ষে তা সম্ভব না হলে এই সংখ্যা পাবার সাত দিনের মধ্যে তাঁদেরকে একটা চিঠি দিয়ে আমাদের তা জানিয়ে দিতে অনুরোধ করছি।

যাঁরা গ্রাহক থাকবেন তাঁদেরকেও ঐ সময়ের মধ্যে অনুগ্রহ করে আগামী বছরের বার্ষিক চাঁদা চার টাকা বা ষাণ্মাসিক (বৈশাখ-আশ্বিন) চাঁদা ২ টাকা চার আনা (২.২৫ টাকা) মনি অর্ডারে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। মনি অর্ডারে চাঁদা পাঠানই সুবিধাজনক, কারণ ভি. পি. তে নিলে চাঁদার ওপরে আরও ৭১ নয়া পয়সা অতিরিক্ত দিতে হয় ভি. পি. মাশুল হিসাবে। অর্থাৎ মনি অর্ডারে যেখানে লাগে ৪ টাকা বা ২.২৫ টাকা, ভি.পি. তে নিলে সেখানে লাগে ৪.৭১ টাকা কিংবা ২.৯৬ টাকা। এ ছাড়া ভি. পি. তে কাগজ পেতেও অনেক দেরী হয়। এ সত্ত্বেও যদি কোন গ্রাহক ভি. পি. তে রামধনু নেওয়াই পছন্দ করেন তা হলে তাঁর জন্য সেই ব্যবস্থাই হবে। অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে কোন গ্রাহকের চাঁদা বা নিষেধজ্ঞাপক চিঠি না পেলে আমরা বুঝব যে তিনি ভি. পি.-তেই রামধনু নিতে চান। আমরা তাঁকে ভি. পি.-তেই রামধনু পাঠাব। আশা করি তা ফেরৎ দিয়ে তিনি অযথা আমাদের অর্থদণ্ড করাবেন না।

যাঁরা কলকাতায় থাকেন তাঁরা লোক পাঠিয়ে হাতেও চাঁদার টাকা জমা দিতে পারেন। রামধনুর চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা:

ম্যানেজার, রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

ছোটদের সেরা কাগজ—রামধনু ছোটদের নিজস্ব কাগজ

ছোটদের নিজস্ব কাগজ—রামধনু—ছোটদের সেরা কাগজ

গল্পে-কবিতায়, চিত্রসম্পদে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে আর জ্ঞানের খনি হিসাবে রামধনু অতুলনীয়। বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকারাই রামধনুতে লিখে থাকেন। বর্তমান তুর্মূল্যের তুলনায় রামধনুর দাম কিছুই না। প্রত্যহ একটি করে নয়া পয়সা আর সেই সঙ্গে দশ দিন পর পর আর একটি নয়া পয়সা জমালেই এক বছর রামধনু নেওয়া যেতে পারে।

মৌমাছি-র
কালটু গুলটু ১ম ০·৭৫
কালটু গুলটু ২য় ১·০০

শৈল চক্রবর্তীর
অ্যাং ব্যাং ০·৭৫
ম্যাও ম্যাও ০·৭৫

রেবতীভূষণ ঘোষের
সবুজ টিয়া ০·৭৫

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের
এবংপুরের টিকটিকি ১·০০

চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর
গল্প লেখা হল না ১·৫০

যামিনীকান্ত সোমের
পুঁথিপুরাণের গল্প ২·০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
দেশ-বিদেশের রূপকথা ২·৫০

তেজেশচন্দ্র সেনের
হারানো ছেলে ১·২৫

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের
ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব ১·২৫

জানবার কথা

দশ খণ্ডে 'বুক অব নলেজ'। সহজ ভাষা, সুপরিকল্পিত বিষয়বিন্যাস, উপযোগী চিত্র।

মতামত :

"বিষয় নির্বাচন উত্তম হয়েছে, এক-একটি বিজ্ঞান ও শিল্পের বিস্তর তথ্য না দিয়ে বাছাবাছা উদাহরণ দিয়েছেন। ...বর্ণনার পদ্ধতিও ভাল, ছেলেবুড়ো সকলেই উপভোগ করবে।"

রাজশেখর বসু॥

"প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর পড়ার টেবিলে স্থান পাবার মতো বই।"

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়॥

সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
প্রতি খণ্ড ২·৫০॥

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জ্যোতির্বিজ্ঞান

বঙ্গের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতিষ মাসিক পত্র। নানাবিধ প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠিপত্র, মাসিক রাশি ও লগ্নফল, বিনা মূল্যে প্রশ্নসমাধান, বাজার দরের পূর্ব্বাভাস ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় অমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ! আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে জটিল জ্যোতিষকে সর্ব্বজনের বোধগম্য করা হইয়াছে। প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা, পরিবর্দ্ধিত পূজা ও নববর্ষ সংখ্যা প্রতিটি ১॥০ টাকা মাত্র। বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা ও ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান কার্য্যালয় সম্পাদক
১৩১বি, রসা রোড শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য,
কলিকাতা-২৬ বিএ

সুরিনা স্পেশাল
কালি
আপনার কলমের আয়ু অক্ষুন্ন রাখে!
সুপ্রীম কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ • কলিকাতা

বিশুদ্ধতায়, স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়

লক্ষ্মী ঘি

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর সর্ব্বত্র
সমাদৃত
ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় অদ্বিতীয়

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন-২২-৭২৪৩

Regd. No. C—1641

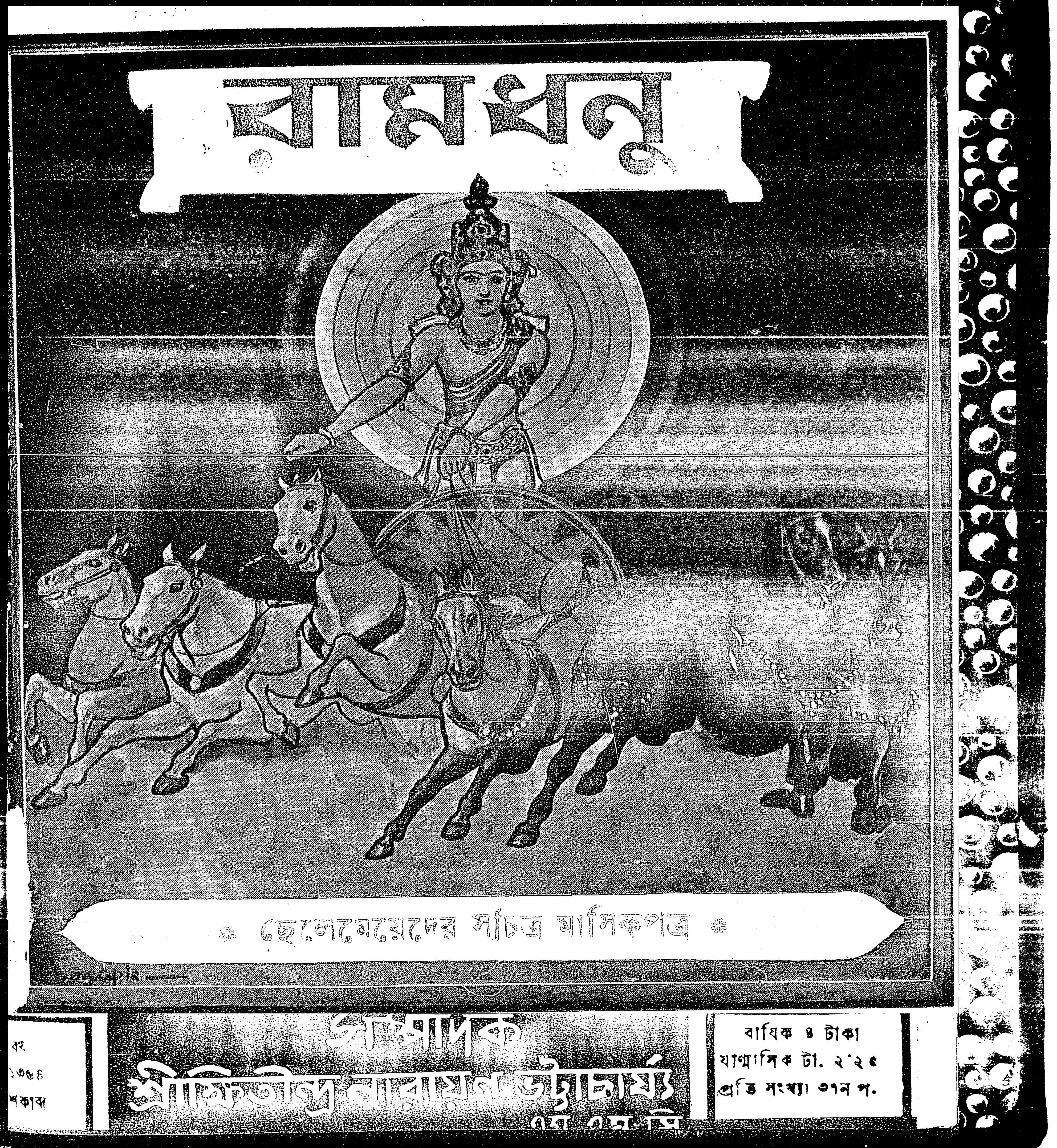

রামধনু
৩১শ বর্ষ
ম সংখ্যা
শাখ, ১৩৬৫
সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
বার্ষিক ৪ টাকা
ষাণ্মাসিক ২.২৫
প্রতি সংখ্যা .৩৭

স্থাপিত – ১৩৩৭ ফোন-৩৫-২৭৭৪

ভারত অয়েল মিলের

আদি ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট

পতাকা মার্কা

খাঁটী সরিষার তৈল

৴২॥০, ৴৫, ।৮ সেরা ডাইস্ টীনে,
মীনাকরা চাকী দেখিয়া লইবেন।

প্রোঃ—শ্রীঅমৃত লাল কুমার।
মিল ও অফিস—২৪৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

রামধনুর নিয়মাবলী

১ রামধনুর বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২ টাকা ২৫ ন. প., প্রতি সংখ্যা ৩৭ ন. প.। ভি. পি তে আরও ৭১ ন. প. বেশী লাগে। নমুনার জন্য ৩৯ ন. প.র ডাকটিকেট পাঠাতে হয়।

২। বৈশাখে বছর সুরু, যে কোনও মাসে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যায় কিন্তু পত্রিকা নিতে হবে বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক থেকে।

৩। কোন মাসে পত্রিকা না পেলে ডাকঘরে খোঁজ নিয়ে তাঁদের উত্তরসহ সেই মাসের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে।

৪। গ্রাহকদের সব চিঠিতেই গ্রাহক নং দিতে হবে। চিঠির জবাবের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট দিতে হবে।

৫। লেখা, কপি রেখে, সম্পাদকের নামে পাঠাবেন। টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাবার ঠিকানা—ম্যানেজার, রামধনু। ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫ (টেলিফোন : ৪৮-৩১৮১)

বিজ্ঞাপনের হার (সংশোধিত)

প্রতি বারের জন্য :—

সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ৫০ টা., অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২৮ টা., সিকি পৃষ্ঠা ১৬ টা.। প্রতি কলম ইঞ্চি ৬ টা.

মলাট : ৪র্থ পৃষ্ঠা ১০০ টা.

মলাট : ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা – ৮০ টা. অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৪ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২৪ টা.

ছবি বা লেখার সামনের পৃষ্ঠা ৬০ টা., অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৩৬ টা., সিকি পৃষ্ঠা ২০ টা.

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

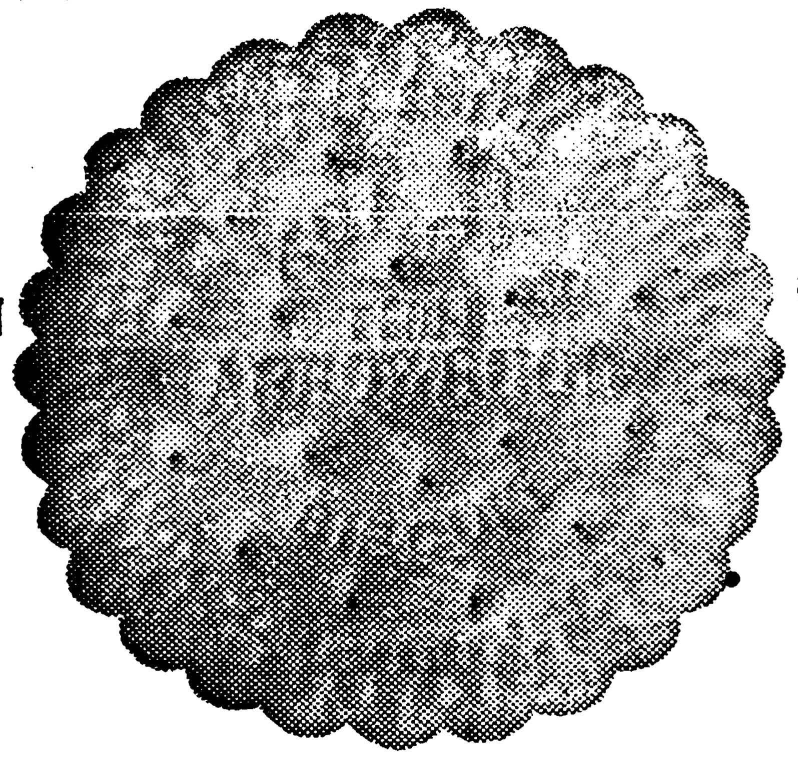

বিজ্ঞাপনের মতামতে
কি প্রয়োজন বিশ্বাসেতে ?
স্বল্পব্যয়ে, আপনি খেয়ে, যাচাই করা চলে,
'থিনের' মধ্যে; গুনে, স্বাদে সবার সেরা "কোলে"

অভিজ্ঞজন বলেন তখন, শুধু "থিনই" নয়,
সবরকমের "কোলে বিস্কুটেই" সেরার পরিচয়।

বিস্কুট শিল্পে ভারতের নিজস্ব চরম উৎকর্ষ